সূচীপত্র।

ভারতী ও বালক।

নূতন বৎসরে ভারতী।

দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারতীর জীবনে একটি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আজ আর একটি পরিবর্ত্তন,—সে দিন তিনি বালিকা বেশে গৃহ হইতে গৃহান্তরে পদার্পণ করিয়াছিলেন—আজ তিনি বালক ক্রোড়ে আর এক নূতন বেশে দেখা দিলেন। আজ হইতে "বালক" ভারতীর সহিত মিলিত হইল।

পাঠকেরা মনে করিবেন না, ইহাতে ভারতীর গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইল—কিম্বা ইহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। কারণ, "বালক" নামে মাত্র বালক ছিল—প্রকৃত পক্ষে ইহা বয়স্ক পাঠকদিগেরই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল, এরূপস্থলে এই মিলনে ভারতীর বল বৃদ্ধি হইবে আশা করিয়া আমরা সুখী হইতেছি, ভরসা করি পাঠকেরাও সুখী হইবেন। এই উপলক্ষে ভারতীর কলেবরও বৃদ্ধি করা গেল।

নববর্ষ।

আকাশ-তলে, সাগর-জলে
পেতে বিশাল রঙ্গ ভূমি—
নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে
দিচ্চ দেখা কে আজ তুমি?
ভবিষ্যতের আঁধার-কোলে
তোমার সকল অঙ্গ ঢাকা,
আশার চোখে দেখ্‌ছি কেবল
মুখখানি ও হাসি মাখা!

আস্‌চ ব'লে তুমিই কি হে
নব দূর্ব্বাদলে মিলে,
মাঠে ঘাটে হরিদ্বর্ণ
আসনগুলো বিছিয়ে দিলে?
গুল্ম তরু লতাগুলা
বনের মাঝে সাজিয়ে মঠ,
চার-দিকেতে খুলে দিলে
নানা রঙের দৃশ্য পট?
ভিতর থেকে বেরিয়ে এল
চেনা চেনা পাখীগুলি,
অভিবাদন করতে কি তাই
নিয়ে কিচির মিচির বুলি?

কপিল-বস্তু নগরের উৎপত্তি।

(ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত শাক্যবংশের উৎপত্তির পর।)

সুজাত রাজার নির্ব্বাসিত পুত্রেরা বহুলোক সমভিব্যাহারে হিমালয়ের উৎসঙ্গ-প্রদেশে কপিল ঋষির আশ্রম-নিকটস্থ শাকোট বনে বাস করিলে, ক্রমে তথায় অন্যান্য লোক গতায়াত আরম্ভ করিল, নানা দেশীয় বণিক্ তথায় গতিবিধি করিতে লাগিল। তখন তাঁহাদের ইচ্ছা হইল যে, আমরা এই স্থানেই থাকিব, অন্য কোথাও যাইব না। এখানে যখন বহুলোকের গমনাগমন আরম্ভ হইয়াছে, তখন এই স্থানেই আমাদের নগর নির্ম্মাণ করা সহজ হইবে; কিন্তু কপিল ঋষির আদেশ ব্যতীত আমরা আমাদের ঈপ্সিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। ঋষি যদি আমাদিগকে এই স্থানে নগর নির্ম্মাণ করিতে দেন, তাহা হইলেই আমরা নগর নির্ম্মাণ নির্ব্বাহ করিতে পারিব, অন্যথা পারিব না। কুমারগণ এইরূপ মন্ত্রণার পর ঋষির নিকট আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, ঋষি তাহাতে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই শাকোট বন কর্ত্তন করিয়া অতি উত্তম এক নগর প্রস্তুত করিলেন। কপিল নিজ আশ্রমে কুমারগণকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে দিয়াছিলেন, তৎকারণে সেই নবপ্রবর্ত্তিত নগরের "কপিল বস্তু" এই নাম প্রচারিত হইয়াছিল। এই বৃত্তান্তটী বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু অবদান নামক প্রাচীন পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"তেষাং দানি কুমারানাং এতদ ভবৎ" ; ইত্যাদি।

অনুবাদ। কিছুদিন পরে কুমারেরা মনে করিলেন, আমরা এই শাকোটবনে নিবাস রচনা করিব। বহু মনুষ্য এখানে আগমন করিতেছে; এজন্য নিশ্চিত আমরা এই স্থানে নগর প্রস্তুত করিতে পারিব। পরে কুমারেরা কপিল ঋষির নিকট গমন করিলেন তাঁহারা ঋষির পদে বন্দন করিয়া বলিলেন, যদি ভগবান্ কপিল অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমরা এই স্থানে ঋষির নামে "কপিল-বস্তু" নামে নগর নির্ম্মাণ করি। ঋষি বলিলেন, যদি আমার এই আশ্রম তোমরা নগর করিয়া রাজধানী কর, তাহা হইলে আমি অনুমতি দিই। কুমারগণ ঋষিকে বলিলেন, যাহা ঋষির অভিপ্রায় তাহাই করিব। এই আশ্রম রাজধানী করিয়া নগর প্রস্তুত করিব। ঋষি তখন কমণ্ডলু হইতে জলগ্রহণ করিয়া রাজপুত্রদিগের বাসের জন্য আপনার সেই আশ্রম-পদ রাজপুত্রদিগকে দান করিলেন। কুমারেরাও ক্রমে সেই স্থানে রাজধানী ও নগর প্রস্তুত করিলেন। কপিল ঋষি রাজপুত্রদিগকে বসতি করিতে দিলেন, তৎকারণে সেই প্রস্তুত-নগর কপিলবস্তু নামে খ্যাত হইল। এইরূপে কপিলবস্তু নগর স্থাপিত

হইলে, ক্রমে তাহা সমৃদ্ধ হইল, বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সুখের স্থান হইল, সুভিক্ষ হইল, জনাকীর্ণ হইল, ধনীর বাসস্থান হইল, অনেক পরিবার-যুক্ত হইল, দেশ বিদেশ, বিখ্যাত হইল, উৎসব-যুক্ত হইল, সমাজবদ্ধ হইল, একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান ও বণিকদিগের প্রিয় স্থান হইল।

কপিল ঋষির নামে কপিলবস্তু নগর ও রাজধানী প্রস্তুত হইলে তথায় পূর্ব্বোক্ত রাজপুত্রগণের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ "ওপুর" অভিষিক্ত রাজা হইলেন।

"ওপুরস্য রাজ্ঞো পুত্রো নিপুরো নিপুরস্য রাজ্ঞোপুত্রো করকণ্ডো করকণ্ডস্য রাজ্ঞো-পুত্রো উল্কামুখো উল্কামুখস্য পুত্রো হস্তিকশীর্ষো হস্তিকশীর্ষকস্য পুত্রো সিংহ হনুঃ। সিংহহনুস্য রাজ্ঞো চত্বারিপুত্রাঃ শুদ্ধোদনো ধৌতদনো শুক্লোদনো অমৃতোদনো অমিতা চ নাম দারিকা।"

রাজা ওপুরের পুত্র নিপুর, নিপুরের পুত্র করকণ্ডক, করকণ্ডকের পুত্র উল্কামুখ, উল্কামুখের পুত্র হস্তিকশীর্ষক, হস্তিকশীর্ষের পুত্র রাজা সিংহহনু। এই সিংহহনুর চারি পুত্র হইয়াছিল এবং এক কন্যাও হইয়াছিল। পুত্রগণের নাম শুদ্ধোদন, ধৌতদন, শুক্লোদন, ও অমৃতোদন এবং কন্যার নাম অমিতা। শুদ্ধোদন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া সিংহহনুর পরলোকের পর পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই শুদ্ধোদন রাজার ঔরসে ও কোলীয় বংশীয় ভার্য্যা মায়াদেবীর গর্ভে ভগবান্ বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইক্ষাকুবংশীয় "সুজাত" রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র "ওপুর" বিখ্যাত শাক্য বংশের মূল। এই মূল পুরুষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ অতীত হইলে মহাত্মা শাক্য মুনির উদয় হইয়াছিল।

শাক্য সিংহের মাতামহকুলের ইতিহাস।

শাক্যসিংহের মাতামহ কুলের ইতিহাস নিতান্ত অদ্ভুত। রাজা শুদ্ধোদন যে কুলে বিবাহ করেন সে কুল বা সে বংশ শাক্য হইলেও তাঁহার পাণিগৃহীতী ভার্য্যা "কোলিয়" বংশের দৌহিত্রী ছিলেন। এই কোলিয় কুল বা কোলিয় বংশ শাক্য

বংশের কন্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এক পরিত্যক্ত শাক্যকন্যার গর্ভে কোল নামক জনৈক ঋষির ঔরসে এই বংশের মূল পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা আমরা মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি। কোলিয় বংশ উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এইরূপঃ—

"সুজাত রাজার পুত্রেরা ও তৎ সহাগত অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা শাক্য আখ্যা প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে তাহাদের বংশ বিস্তার হইল। ক্ষরকণ্ডক শাক্যের রাজ্যকালে কোন এক শাক্যকন্যার গলৎ কুষ্ঠ ব্যাধি হইয়াছিল। বৈদ্যেরা অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই তাহার ব্যাধি শান্তি হইল না। কন্যাটীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই একব্রণ হইয়া গেল, কোনও স্থান অক্ষত থাকিল না। হতভাগিনী কন্যা গলৎকুষ্ঠিণী হইয়া প্রত্যেক লোকের ঘৃণার্হ হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে পর্ব্বতে পরিত্যাগ করা বিধেয় বোধ করিলেন। অনন্তর তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে এক শকটে আরোহণ করাইয়া হিমালয় সমীপে লইয়া গেল। হিমালয়ের ক্রোড়-পর্ব্বতের একটী গুহার মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করাইল, তন্মধ্যে প্রভূত খাদ্য, বহুতর ভক্ষ, প্রচুর পানীয়, কতকগুলি কম্বল ও অন্যবিধ শয্যা প্রদান করিয়া গুহার মুখ কাষ্ঠরাশির দ্বারা প্রচ্ছন্ন করতঃ বালুকারাশির দ্বারা তাহার ছিদ্র ভাগ বন্ধ করিয়া দিয়া কপিল বস্তু নগরে ফিরিয়া আসিল।

"তস্যাদানি দারিকায়ে তহিং গুহায়ে বসন্তীয়ে তেন নিবাতেন চ সংরোধেন চ তস্যা গুহায়ে উষ্মেন চ সর্ব্বঙ্গ কুষ্ঠ ব্যাধিং বিক্রান্তং শরীরং চোক্ষং নির্ব্রণং সংবৃত্তং উত্তমরূপ কল্পাতং নাপি জ্ঞায়তে মানুষিকা এবা তি।"

মৃতকল্পা শাক্য দুহিতা কয়েক দিবস সেই গুহা মধ্যে বাস করিয়া, বায়ুহীন স্থানে বাসের দ্বারা অথবা তাদৃশ নিরোধের দ্বারা কিংবা সেই গুহার উষ্মার দ্বারা তাহার সমুদায় ব্যাধি সারিয়া গেল, শরীর কলঙ্ক শূন্য হইল, ব্রণ শূন্য হইল, অধিকন্তু তাহার এরূপ নূতন শরীর ও এরূপ মনোহর রূপ হইল যে, দেখিলে তাহাকে আর মানুষী বলিয়া বিবেচনা হয় না। *

---

* মুলতান দেশে এক ফকির আছে; সে কুষ্ঠ ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া থাকে। শুনা যায় অনেক লোক তাহার চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়াছে। আমার জনৈক বন্ধু তাঁহার পরিচিত এক ব্যক্তিকে ঐ ফকীরের চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফকিরের চিকিৎসা প্রণালী এইরূপ :—

ফকির প্রথমে রোগীর গাত্রে একপ্রকার ভস্ম মাখাইয়া দেয়। তৎপরে রোগীর গাত্র এক, কখনো বা দুই খণ্ড কম্বলের দ্বারা আচ্ছাদিত করে। অনন্তর তাহাকে এক পর্ব্বত গুহার মধ্যে শোয়াইয়া দেয়। রোগীর গাত্র হইতে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইলে রোগী যখন অসহ্য যাতনা অনুভব করে, তখন তাহাকে বাহিরে আনিয়া গাত্রের কম্বল খুলিয়া দেয়। তৎপরে তাহার আহারের ব্যবস্থা করে। ৩।৪ দিন ব্যবস্থা মত আহার করাইয়া বাটী যাইতে দেয়।

একদা এক ব্যাঘ্র যদৃচ্ছাক্রমে সেইস্থানে আসিলে, অত্যুত্তম মনুষ্য গন্ধ তাহাকে ব্যাকুলিত করিল। কথিত আছে যে, পশুরা গন্ধের দ্বারা জানিতে পারে। ব্যাঘ্র আজ মনুষ্য গন্ধ পাইয়া গুহামধ্যে মানুষ আছে, ইহা অনুমান করিল। মনুষ্য-লোলুপ ব্যাঘ্র গুহার মুখস্থিত পাংশুরাশি পদের দ্বারা আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে সমস্ত বালুকা পদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত করিল। এই স্থানের অনতি দূরে "কোল" নামে জনৈক রাজর্ষি বাস করিতেন। ঋষি ফল আহরণার্থে সেই স্থানে আসিয়া দেখেন, এক ব্যাঘ্র গুহামুখস্থ পাংশু রাশি অপকর্ষণ করিতেছে। তদ্দর্শনে ঋষির কৌতূহল জন্মিল, তিনি ক্রমে তাহার নিকটগামী হইলেন। ঋষির প্রভাবে ব্যাঘ্র পলায়ন করিলে, ঋষি সেই গুহা দ্বারে গিয়া দেখেন, গুহাদ্বারের বালুকারাশি ব্যাঘ্র কর্তৃক উৎসারিত হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি কাষ্ঠের দ্বারা আবৃত আছে। ঋষি আরও কুতূহলী হইলেন, হইয়া কাষ্ঠগুলি একে একে উৎপাটিত করিলেন। দেখিলেন, তন্মধ্যে যেন এক দেবকন্যা উপবিষ্টা আছে। ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কন্যা প্রত্যুত্তর করিল, আমি কপিলবস্তু নগরের অমুক শাক্যের কন্যা; আমার শ্বেতকুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল, তৎকারণে আমার প্রতি আমার ভ্রাতৃগণের ঘৃণা হওয়ায় আমাকে এই স্থানে জীবিতাবস্থায় বিসর্জন দিয়া গিয়াছিল; কয়েকদিন মধ্যে আমার সে রোগ সারিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে আমি মনুষ্য মুখ দেখিয়া পুনর্জন্ম তুল্য বোধ করিলাম।

রাজর্ষি কোল সেই কন্যার রূপে মুগ্ধ হইলেন, ক্রমে তাঁহার মান, জ্ঞান, সমস্তই অন্তর্হিত হইল, তিনি সেই শাক্য কন্যা লইয়া আশ্রমে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সেই শাক্য দুহিতার গর্ভে, কোল ঋষির ঔরসে যমজ ক্রমে ১৬ সন্তান জন্মিল। ঋষি পুত্রেরা যখন দার পরিগ্রহ যোগ্য বয়ো প্রাপ্ত হইল; তখন তাহাদের মাতা তাহাদিগকে কপিলবস্তু নগরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। "পুত্রগণ, কপিলবস্তু নগরের অমুক শাক্য আমার পিতা, তোমাদের মাতামহ অমুক, অমুক তোমাদের মাতুল আমার ভ্রাতা; এক্ষণে তোমরা সেই স্থানে তাঁহাদের নিকট যাও—অবশ্যই তাঁহারা তোমাদের বৃত্তি বিধান করিবেন। তোমরা মাতামহ বংশে সম্ভব; অবশ্যই তাঁহারা তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন"।

শাক্য কন্যা ঐরূপ বলিয়া পুত্রদিগকে শাক্যবংশের আচার ব্যবহার রীতি নীতি ধর্ম্ম সমস্তই উপদেশ করিলেন। তাহারা মাতৃকুলের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া কপিল

---

* এই চিকিৎসা প্রণালীর সহিত উপরি উক্ত আখ্যায়িকার সম্পূর্ণ মিল আছে। ফকির বোধ হয় আখ্যায়িকাটী জানিতেন, তাই তিনি উক্ত প্রকার অনুমান-চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কোন কোন বৈদ্যক গ্রন্থেও উক্ত প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা দৃষ্ট হয়।

বস্তু নগরে গমন করিল। আশ্চর্য্য-ঋষিকুমার আগমন করিতে দেখিয়া পথিমধ্যে জনসঙ্ঘ উপস্থিত হইল। ঋষি বালকেরা ক্রমে শাক্যদিগের মহাসভা স্থানে গমন করিল। মাতার নিকট যেরূপ যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিল সেইরূপ সেইরূপ নিয়মে শাক্য-সভায় প্রবেশ করিল ও আত্ম পরিচয় প্রদান করিল। শাক্যগণ ঋষিকুমারগণের শাক্যাচার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ, এবং কাহার বংশধর? তাহারা প্রত্যুত্তর করিল, আমরা কোলাশ্রম হইতে আসিয়াছি আমাদের মাতা অমুক শাক্যের কন্যা, আমাদের পিতা কোল ঋষি। আমাদের মাতার কুষ্ঠ ব্যাধি হইলে অমুক শাক্য তাঁহাকে গিরি গহ্বরে পরিত্যাগ করেন অনন্তর তিনি অরোগিনী হইলে রাজর্ষি কোল তাঁহাকে বিবাহ করেন। আমরা তাঁহাদের পুত্র। মাতামহ মাতুলদিগকে দেখিতে আসিয়াছি।

উক্ত বালকবৃন্দের মাতামহ এপর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র পৌত্র-সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কথিত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহারা সকলেই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে, রাজর্ষি "কোলকে" তাঁহারা চিনিতেন। রাজর্ষি কোল বারাণসীর রাজা! তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হিমালয়ে তপস্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্তৃক শাক্য কন্যা পরিগৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহারই ঔরসে দৌহিত্র উৎপন্ন হইয়াছে ইহা অবশ্যই আনন্দের বিষয়।

শাক্যগণ তখন প্রীত হইয়া সেই দৌহিত্র ও ভাগিনেয়দিগকে গ্রহণ করিলেন এবং যথোচিত বৃত্তি প্রদান করিলেন। যে বালকের যে নাম, সেই বালককে সেই নামে এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ও কিছু কিছু কৃষি যোগ্য ভূমি প্রদান করিলেন। যাহার নাম করভদ্র, তাহাকে করভদ্রনিগম এই নামের গ্রাম দেওয়া হইল; সে সকলগ্রাম তাহাদের স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ হইল এবং তাহারা কোল ঋষি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া "কোলীয়" নামে খ্যাত হইল।

এইরূপে শাক্য কন্যা হইতে কোলিয়া বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল। সুভূতি নামক জনৈক শাক্য এই কোলীয় বংশের এক- সুন্দরী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তদগর্ভে মায়া দেবীর জন্ম হয়।

কপিল বস্তু নগরের অদূরে "দেবড়হো" নামকগ্রামে সুভূতিশাক্য বাস করিতেন। সুভূতি এই গ্রামের অধিপতি ও শাস্তা। ইনি পূর্ব্বোক্ত করভদ্র গ্রামের কোলীয় কুলের যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সুভূতি সেই কোলিয় কন্যার গর্ভে সাত কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন; পুত্র হইয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় না। কন্যাগুলির নাম যথাক্রমে বর্ণিত হইল। যথা—মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চুলীয়া, কোলীসোবা ও মহাপ্রজাপতি। . .

রাজা সিংহহনু পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শুদ্ধোদন রাজ্য-

ধিকার প্রাপ্ত হইয়া, উপরি উক্ত সুভূতি শাক্যের প্রথমা কন্যা মায়া, তাহার কনিষ্ঠা কন্যা মহাপ্রজাপতি এই দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার ভ্রাতৃগণ তদ্ভিন্ন মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চূলীয়া ও কোলীসোবার ইহাঁদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের দ্বাদশ বর্ষ পরে মহারাজ শুদ্ধোদনের ঔরসে ও মায়া দেবীর গর্ভে ভগবান্ শাক্যসিংহের উদয় হইয়াছিল। *

শ্রীরামদাস সেন।

—:o:—

প্রয়াগ যাত্রা।

কিছু দিন হইতে মনে করিয়া আছি—পূজার ছুটিতে এলাহাবাদ যাইব, কিন্তু কবে যাইব কিছুই জানিনা হঠাৎ একদিন বিকালে ঠিক হইল, কাল যাইব।

পর দিন জিনিস পত্র গোছানর বন্দবস্ত, ঢাকর দাসীদের ডাক হাঁক, ছেলেদের প্রাণ-ভরা আনন্দের ছুটাছুটির গণ্ডগোলে আমি এমনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, কাজের ভাবনায় এমনি বিব্রত হইয়া পড়িলাম—যে তার উপর অধিক বাক্য ব্যয় আর আমার কিছুতেই পোষাইয়া উঠিল না। যে সকল বন্ধু বান্ধবেরা আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, সমস্ত দিন তাঁহাদের সহিত বিছানায় বসিয়া, পড়িয়া, গল্প করিয়া, আর মিনিটের মধ্যে পাঁচ শ পাঁচ বার হাই তুলিয়া, আদরযত্নের অভাব, কাজের ভিড় ও ব্যস্ততার পরিমাণটা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াস পাইয়া গেলাম। এক রকম ওজর করিয়া দিলাম। যাই হোক যাবার জন্য যে কাজ কর্ম পড়িয়া রহিল তাহা নহে, আমি ছাড়াও গোছান গাছান সব একরকমে হইয়া গেল। ঐ রকম সকল কাজেই যদি, মনে মনে ব্যস্ত হইয়া, আর পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া নিশ্চিন্তে চালান যাইত—ত বড় সুবিধা হইত, তাহা হইলে খাটে শুইয়া শুইয়া আমি প্রয়াগ যাত্রাও করিতে পারিতাম—কিন্তু একেবারে পথ যাত্রার বন্দবস্তে রাজি না হইলে নাকি খাট তুলিবার কোন লোক মেলে না, কাজেই বিছানা খোলাটা কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া দু একটা ডাক হাঁকে আর দু একবার এঘর ওঘর পায়চারি করিয়া, যাইবার শেষ বন্দবস্তটা সারিয়া ফেলিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া বিদায় পর্ব্ব কাঁদিয়া সারিলাম। বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, ছেলেবেলাতেই হাঁচড়ে পাকিয়াছি, প্রথম ভাগ শেষ না হইতে হাতেখড়িখানা ছন্দোপুস্তকের পাতা উল্টাইয়া ছেলেবেলা হইতেই মনে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে অশ্রুজল নহিলে বিদায়ের মাহাত্ম্য থাকে না,

* এই ইতিহাস বৌদ্ধদিগের মহাবস্তু অবদান গ্রন্থে সংকলিত আছে। বৌদ্ধদিগের গাথা-ভাষা নিতান্ত দুর্বোধ্য ও কর্কশ; এজন্য ইহার মূল গুলি উদ্ধৃত করিলাম না।

সুতরাং বিস্তর আশা করিয়া, গম্ভীর মুখে—'জন্মের মত বিদায়,' "এই দেখা শেষ দেখা" ইত্যাদি নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। দুঃখের কথা বলিব কি, হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল, ইতিপূর্ব্বে যাহার চোখে জল পড় 'পড়' হইয়া উঠিয়া ছিল—আমার কথায় তাহা পর্য্যন্ত মিলাইয়া গেল। আমার সমস্ত আশা ভরসা লোপ পাইল। আমি আর এক রকম ভাবিতাম—আমি জানিতাম, বাঙ্গালীর হৃদয়ে আর্য্যশোণিতের অভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার স্থলে বাঙ্গালিনীর ধমনীতে ধমনীতে আর্য্য-অশ্রু এত বাড়িয়া উঠিয়াছে—যে এখন ফুলের ঘায়ে তাহা যেমন উথলিয়া উঠে, আগে কঠিন অস্ত্র-স্পর্শেও তেমন হইত না। অনেক ভুক্তভোগী লোক এরূপও বলিয়া থাকেন যে একবার কেহ ইহার জোর-বেগ তোড়ের মুখে পড়িলে হাড়ে হাড়ে সেই লোনা জলে মজিয়া এমন চাটিনি বনিয়া যায় যে তখন আর তাহাতে স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না। সুতরাং সমুদ্রের মধ্যে বসাইয়া বিধাতা আমার অদৃষ্টে এক ফোঁটা জল মিলাইলেন না, কাঁদাইব কি—সেই দুঃখ ভাবিয়া আপনিই আজ কাঁদিয়া মরিতেছি,—(সে দিন জানিতাম না যে জাতীয় মানটা শেষে আমা হইতেই আজ বজায় থাকিয়া যাইবে) কিন্তু সে দিন আর এ কথাটা ঠিক এমন করিয়া মনে আসে নাই, সে দিন তাঁহারাও হাসিতে হাসিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমিও আমার ভবিষ্যতের যষ্টি-স্বরূপ-স্বরূপিনী পুত্র কন্যা দুইটিকে লইয়া হাসিতে হাসিতে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। আন্দাজ রাত ৮টার সময় আমাদের গাড়ীখানা হাবড়া ষ্টেসনের সম্মুখে আসিয়া লাগিল, কি একটা ভীষণ অট্ট গোলের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম, যাত্রীদিগের দৌড়াদৌড়ি, মুটেদের ছুটাছুটি—জিনিসপত্র বোঝাই হাত গাড়ীর ঠেলাঠেলি, লোকজনের চীৎকার কোলাহলঅট্টরবের একটা অকূল পাথারের মধ্যে যেন পড়িয়া গেলাম। সঙ্গে দু একজন যাঁহারা আসিয়াছিলেন—তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন, আমি ভাবিতে লাগিলাম—প্লাটফর্ম্মরূপ ভবসাগর পার হইয়া কি করিয়া প্রাণে প্রাণে তিনটি নিরীহ প্রাণী রেলগাড়ীর কামরায় গিয়া উঠি; ভাবনাটা এমন বলবৎ হইয়া দাঁড়াইল যে শেষ উইলের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত মনের মধ্যে আসিয়া গেল। এমন সময় একজন সাহেবকে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম,—কিন্তু সাহেবটি নিকটে আসিবা মাত্র তাহার হাটকোটের খোলষের মধ্য হইতে সক্রেটিস দাদার পরিচিত বাঙ্গালী মুখটি, এবং সে মুখের নীরব আস্ফালনটা পর্য্যন্ত যেই চোখে পড়িয়া গেল—অমনি মনে মনে অনেকটা ভরষার উদয় হইল, তাহার পর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে যখন গাড়ীর কামরায় গিয়া উঠিয়া বসিলাম—তখন মনে হইল—আমিত আর্য্য নারী; একবার ছাড়া একশবার ঐ প্লাট ফর্ম্মটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারি। তখন আগেকার সঙ্কোচটা মনে করিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না।

এইখানে আপাততঃ অন্য কথা রাখিয়া সক্রেটিস দাদার একটু পরিচয় দিয়া লই,—

কেন না ইহাঁকে ছাড়িয়া এখানে আর যাহা বলিতে যাইব—তাহা অন্য সব হইতে পারে কেবল যাত্রার কথা হইবে না,—ইনি আমাদের সঙ্গে করিয়া প্রয়াগ পৌঁছাইয়া দিতে সম্মত না হইলে এ যাত্রা আমাদের ভাগ্যে অযাত্রা বই আর কিছু ঘটিত কি না সন্দেহ।

এখন পরিচয়টা আরম্ভ করি কোথা হইতে? নামেই লোকের প্রধান পরিচয়, সেটাত আগেই বলিয়া সারিয়াছি। তবে একটা বিষয় চুক করিয়াছি এই, ইচ্ছা ছিল—নামটা বলিবার আগে নামের সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয়টা আগে দিয়া লইব—সেইটিই ভুল করিয়া বসিয়াছি। কেন না—নামটি ভাল হউক ছাড়াই হউক—আর সুদেশ বৎসলতার অভাব প্রভৃতি অন্য যে দোষই প্রকাশ করুক—নামধারীর পক্ষে যে ইহা কি রূপ উপযুক্ত হইয়াছে তাহা যাঁহারা তাঁহাকে জানেন—তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তাই বলিতে ছিলাম—সে প্রশংসাটা শুনিবার আগে বলিয়া রাখিলেই হইত—নামটি অন্নপ্রাশনের নহে—আমার দেওয়া। যাক্ তাহাতে বড় ক্ষতি দেখিতেছি না, জ্ঞানী ব্যক্তিরা আত্ম-প্রশংসা হেয় জ্ঞান করেন।

এখন বাজে কথা ছাড়িয়া,—সত্য সত্যই ইহাঁর মত নিঃক্রোধ প্রসন্নচিত্ত মানুষ আমি আর কখনো দেখি নাই, আমি কেন,—কেহ মারিতে কাটিতে আসিলেও—হাসিমুখে হাত ধরা ছাড়া কেহ ইহাঁকে রাগ করিতে দেখে নাই। আমি কখনো ইহাঁর ক্রুদ্ধ রূপ কল্পনাতে পর্য্যন্ত আনিতে পারিলাম না—তাই আমি ইহাকে বাঙ্গলার সক্রেটিস বলি। কিন্তু এই এক নামেই ইহাঁর পরিচয় শেষ হয় না ইহাঁর এমন অনেক নাম আছে। আর একজন ইহাঁর নাম রাখিয়াছেন—ব্যস্তবাগীশ। কেন না ইনি যেখানে যান—গিয়াই ঘড়ি খুলিয়া যাই যাই আরম্ভ করেন—আর অগাধ কাজের হিসাব খুলিয়া রেল গাড়ির সহিত নিজের জীবনের তুলনা করিতে বসেন। সময়ের মূল্য তাঁহার মত আর কেহ বোঝে না—তাই তিনি একবার যেখানে গিয়া বসেন—সেইখানেই দিনটা কাটাইয়া আসেন।

তাঁহার ব্যস্ততা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম—তাঁহার কাজ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তিনি কাজ করেন অনেক অথচ সচরাচর যাহাকে কাজের লোক বলে তিনি তাহা নহেন। কেন না পরের জন্য মাথা ব্যথা করিতে তিনি যত সময় দেন নিজের জন্য তাহার সিকি দিতে পারিলে পৃথিবীতে একটা নাম রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কাহারো ব্যাম হইয়াছে দেখ—সক্রেটিস দাদা সেইখানেই পড়িয়া আছেন—কাহারো চাকরী নাই—তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়াছে—তিনি এ সাহেবের কাছে ও সাহেবের কাছে তাহার উমেদারীতে ঘুরিতেছেন, কাহারো মকদ্দামা হয় না—তাঁহাকে জানাইয়াছে—তিনি না খাইয়া দাইয়া তাহার তদবিরে বেড়াইতেছেন। কোন একটা মিটিং করিতে হইবে—কিম্বা কাহাকেও সম্মান দিতে হইবে, সে ভার সক্রেটিস দাদার উপর ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, তিনি রাতকে দিন করিয়া

তাহা সম্পন্ন করিবেন। ইহা ছাড়া—তাঁহার হাতে নিত্য নিয়মিত সাধারণের কাজে—হুজুকে ব্যাপারের ভারের ত অভাব নাই। সুতরাং ১৬ আনার মধ্যে তাঁহার জীবনের ১৫ আনা তিন পয়সা—পরের দখলে। কেবল তিনি নহেন—তাঁহার জিনিসপত্র বাড়ী ঘরও তাঁহার মত সাধারণের অবৈতনিক কর্ম্মচারী। তিনি নিজে যেমন সদাই পরের কাজে ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহার গাড়ী ঘোড়াগুলিও সেইরূপ অপরকে বহন করিয়াই প্রায় ঘোরে। তাঁহার যে জিনিসে অন্যের একবার চোখ পড়ে—তাহা আর তাঁহার নিজের থাকে না—আর একটি মজা এই—তাঁহার জিনিসপত্র মুক্ত হস্তে গ্রহণ করিয়া—সকলে তাঁহাকেই বাধিত করে, এ পর্য্যন্ত এজন্য তাঁহার নিকট কেহ বাধিত জ্ঞান করে নাই। এমন কি—তাঁহার নিজের বাড়ী ঘরও তাঁহার কি না বলিয়া এক এক সময়ে সন্দেহ জন্মে, কেন না সেখানে অন্যদের হুকুম, ইচ্ছা যত দূর চলে—তাঁহার নিজের হুকুম—নিজের ইচ্ছা সেরূপ চলিতে প্রায় দেখা যায় না।

ইঁহার সম্বন্ধে এমন আরো অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ এই খানেই থামা যাউক, তবে এই মাত্র এখানে বলিয়া লই যে—যতটুক উপরে বলিলাম—তাহার একটুও বাড়ান নহে, সকলি খাঁটি সত্য কথা।

ইঁহার কাজের লোক বলিয়া একটা নাম আছে বটে কিন্তু কেহ কেহ ইঁহাকে বলে হুজুকে। আমিও ত তাই বলি—এরূপ লোককে কাজের লোক বলিলে কথাটার অর্থই যে লোপ পায়। কিন্তু এ জন্য যে তিনি বড় একটা অসন্তুষ্ট তাহা নহেন, নিজেই তিনি দিনের মধ্যে দশবার করিয়া আপনাকে হুজুকে বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এ নামের সার্থকতা আমরা এবার বিলক্ষণ দেখিতে পাইলাম। আমার অপরাধের মধ্যে যাত্রার আগের দিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"এবার পূজার ভিড়ের সময় যাইতেছি—আমরা চার জন হইলেও এ সময় এবার অন্য লোকে গাড়ীতে উঠিতে পারে—এবার কি রিজার্ভ করিতে হইবে" তিনিত শুনিয়া খড়্গাহস্ত,—বলিয়া বসিলেন—"আমি থাকিতে গাড়ীতে অন্য লোক উঠিবে—বল না কেন আমি বাঁদর।" আমি ভাবিলাম-সর্ব্বশুদ্ধ বাঁদর না হইতে হইলেই বাঁচি।" কিন্তু ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলাম কথাটা ওজন না করিয়া তিনি বলেন নাই। আমরা আসিবার আগেই তিনি ত ষ্টেসনে আসিয়াছিলেন,—এখানে আসিয়া ষ্টেসন মাষ্টারের সঙ্গে আপ্যায়িত করিয়া লইয়া আগে হইতেই কাজ অনেকটা গোছাইয়া রাখিয়াছিলেন,—আমরা আসিবা মাত্র তাড়া তাড়ি গাড়ীর একটা কামরায় জিনিস পত্র বোঝাই করিয়া আমাদের সঙ্গে—আমাদের যাঁহারা পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন—তাহাদের শুদ্ধ গাড়ীতে উঠাইয়া—এমন একটা হুজুক করিয়া তুলিলেন যে অন্য কেহ আর সে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল না,—ষ্টেসন মাষ্টার পর্য্যন্ত সেই আড়ম্বরে এমন কানা হইয়া গেলেন যে অন্য কাহাকেও তিনি আমাদের গাড়ীর দিকে কটাক্ষপাত পর্য্যন্ত করিতে দিলেন না। যখন প্রথম

ঘণ্টা পড়িল, আমাদের আর সকলে নামিয়া গেল—ষ্টেসন মাষ্টার দূরে চলিয়া গেলেন, কেবল আমরা চারজন মাত্র রহিলাম, তখন সক্রেটিষ দাদাকে বলিলাম "এই ষ্টেসনে যেন রক্ষা পাওয়া গেল—অন্য ষ্টেসনে যদি কেহ আসে" ?

তিনি লাঠি গাছা দেখাইয়া হাসিয়া বলিলেন—"আসিবে বই কি, একবার হাবড়া ছাড়াইলে হয় তাপর আমার এই লাঠি আছে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল—আমরা তখনকার মত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, সক্রেশিস দাদা জিনিস পত্র থিতাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন—আমরা তিন জনে আঁকু বাঁকু করিয়া চারিদিকের জানালা গুলি খুলিয়া দিয়া জানালার ধারে আসিয়া বসিলাম।

অন্ধকার রাত, উপরে অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্র, নীচে আশে পাশে একটা গাঢ় অন্ধকার—আর সে অন্ধকারের বুকে মাঝে মাঝে জোনাকীদের লুকোচুরী খেলা, ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না; আর যা দেখা যায়—সে কেবল চারিদিকের একটা ছুটাছুটি ভাব। আকাশে আলোকের ছোট ছোট মুখ গুলি ফুটাইয়া নক্ষত্রেরা ছুটিয়া চলিয়াছে, গাড়ীর দুই পাশ দিয়া দুইটা ভীম অন্ধকার নিঃশব্দ হুঙ্কারে ছুটিয়া চলিয়াছে—ক্ষুদ্র জোনাকীর দল সে অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিতে একবার কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছে আবার সভয়ে হটিয়া পড়িতেছে—কাহারো বিরাম নাই,—কাহারো বিশ্রাম নাই, চারিদিকে জীবন সংগ্রাম, চারিদিকে পাল্লা পাল্লি। অথচ আমাদের মত আমাদের এই রেলের গাড়ীর মত উহাদের ডাক হাঁক গর্জ্জন নাই, মুখে একটা পরিশ্রমের চিহ্নও নাই, নিঃস্তব্ধে নিঃশব্দে উহারা কাজ করিয়া চলিতেছে, তাই ঐ অবিশ্রান্ত গতির মধ্যেও কি সুগভীর স্তব্ধতার ভাব, শান্তির ভাব বিরাজমান।

হঠাৎ পূর্ব্বদিকে দিগন্তের সীমানায়—একধারে একটুখানি শাদা আলোক দেখিতে পাইলাম, ভাল করিয়া দেখিলাম চাঁদ উঠিতেছে। গাছ পালার মধ্য দিয়া একটু একটু করিয়া মুক্ত নীলাকাশে চাঁদ ফুটিয়া উঠিল—অন্ধকার গাছপালার অবয়ব ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, গাছের তলায় তলায় ছায়া পড়িল, প্রসারিত ক্ষেত্র প্রান্তর জ্যোৎস্নাময় হইয়া উঠিল। একটা জলাশয়ে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিকচিক করিতে লাগিল, তাহার একপার্শ্বে চাঁদের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিতে লাগিল—আমাদের গাড়ীর এক খানা আয়নায় সেই প্রতিবিম্বিত আলোক পড়িয়া চোখ ঝলসিয়া দিবার উপক্রম করিল—আয়না খানা আমরা নামাইয়া দিলাম। সেই জ্যোৎস্না-দীপ্ত মুক্ত সৌন্দর্য্য সংস্পর্শে আমার হৃদয় কপাট আস্তে আস্তে মুক্ত হইয়া গেল—প্রকৃতির সেই সর্ব্বগ্রাসী সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমি আস্তে আস্তে হারাইয়া গেলাম, কত দিনের পুরাণ কথা, পুরাণ গান আমার মনের ভিতর সুখের তান তুলিল।

আর একদিন এইরূপ রেলের গাড়ীর জানালার ধারে বসিয়া কি আনন্দ হইয়াছিল,

সেই কথা মনে পড়িয়া গেল, সে আজ কত দিনের কথা? তাহার আগে আর কখনো বাড়ীর বার হই নাই—কথাটা ঠিক হইল না, দুএক বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণে যাইতাম—আর একবার দিন কতক গঙ্গার ধারের একটা বাগানে গিয়া বাস করিয়াছিলাম। সুতরাং তখন আমার কাছে ভূগোলের সীমা ঐপর্য্যন্ত। তাহার পর যেদিন প্রথম, আমার কারামুক্ত চক্ষের সামনে বিশ্বের অনন্ত প্রসারিত মূর্ত্তি বিভাসিত হইল, প্রভাতের মুক্ত আকাশে যে দিন প্রথম সূর্য্য উঠিতে দেখিতে পাইলাম, উদার বিস্তৃত শ্যামল দিগন্ত পার্শ্বে মেঘের ন্যায় ছোট ছোট পাহাড় শ্রেণীর উপর যেদিন প্রথম সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হইতে দেখিলাম, সে দিন কি আনন্দ! আমার সে আহ্লাদ দেখিয়া—যিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন—তাঁহার প্রশান্ত দেবোপম মুখখানি যখন জ্বলিয়া উঠিল তখন যে আমার আনন্দ শতগুণ বেগে উথলিত হইয়া উঠিয়াছিল! তিনি কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন? তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন—সে কেবল বাহিরেরই সৌন্দর্য্য দেখিয়া। তাহার পর কত দিন গিয়াছে—কিন্তু এখনো তাঁহার সে মুখচ্ছবি মনে পড়িলে হৃদয়ে একটা সুখের তরঙ্গ উঠে। তারপর কতবার রেলে চড়িয়াছি, কত নূতন দৃশ্য দেখিয়াছি—কিন্তু তেমন আনন্দ আর কখনো হয় নাই।

সে দিনের প্রতি কথা আমার মনে অঙ্কিত আছে, সেদিন বৃহস্পতিবার, মা সেজন্য কতই ভাবিয়াছিলেন, একেলে ছেলে মেয়েরা কিছুই মানে না বলিয়া কত কথাই বলিয়াছিলেন—সহস্র বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেও এখন কেহ আর তেমন করিয়া ভাবে না—তাঁহার স্নেহ তাঁহার সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে।

আর,—আর একজন—আপনার বোন হইতেও আপনার যে একজন—বুকফাটা চোখের জলে বুক ভিজাইয়া বিদায় দিয়াছিল—কোথায় গেল সে? তার আপনার ঘর চিরদিনের জন্য অন্ধকার করিয়া—কোথায় কোন ঘর সে উজ্জল করিতে গিয়াছে। যে কান্না সে সে দিন কাঁদিয়াছিল তখন জানিতনা সারাজীবন সেই কান্না কাঁদাইয়া সে নিষ্ঠুরের মত চলিয়া যাইবে!

কি কথা বলিতে কি কথা আসিয়া পড়ে, স্মৃতির আলোক সহসা মেঘে ঢাকিয়া যায়—আনন্দের গীত শোকাশ্রু হইয়া পড়ে—গীত গান আপনা হইতেই থামিয়া আসে, তবে থাক পুরান গান এই খানেই ভুলিয়া যাই।

গাড়ী একটা বড় ষ্টেসনে আসিয়া লাগিল, এতক্ষণ আমরা একটা কামরায় নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতে ছিলাম এইখানে দুই জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীকে গাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা গেল, ভাবিলাম যাঃ এইবার আমাদের রাজত্ব যায় বুঝি—আমরা তিনজনে মহা জড়সড় হইয়া পড়িলাম—কিন্তু সক্রেটিস দাদার সে ভাব দেখিলাম না; তিনি আমাদের দিকের জানালা গুলা ফেলিয়া দিতে ইঙ্গিত করিয়া, নিশ্পরোয়াভাবে মুখ টিপিয়া

একবার হাসিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ইংরাজি কোট ও হ্যাটটা পরিয়া লইলেন—অমনি সে সোনার কাটির স্পর্শে তাঁহার বাঙ্গালীত্ব যেন ঘুচিয়া গেল, তিনি দশ হাত শরীর আরো দশ হাত ফুলাইয়া দুএকটা গম্ভীর হুঙ্কার ছাড়িয়া গাড়ীর দরজায় মুখ বাহির করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সে সাহেবি বেশভূষা আর অদ্ভুত ভাবভঙ্গী দেখিয়া ছেলেগুলা হাসিয়া আকুল হইল, আমিও যে বড় বাদ পড়িয়াছিলাম এমন বলিতে পারি না। ভদ্রলোক দুইটি কামরার মধ্যে একবার চাহিয়া না দেখিয়া মেমসাব মেমসাব করিয়া নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন—সাহেবের আড়ম্বর দেখিয়াই আর কি তাঁহাদের চক্ষুস্থির।

ষ্টেসন ছাড়াইয়া তিনি সে পোষাক ছাড়িলেন। কিন্তু দুএকটা ষ্টেসনের পর আবার তাঁহার সাজসজ্জা করিতে হইল—এবার হ্যাট কোট নয়—চাপকান টুপী পরিয়া বাঙ্গালী বাবু সাজিয়া লইলেন—কেন না এবার দুইজন ইংরাজ স্ত্রী পুরুষ এই দিকে আসিতেছিল। সক্রেটিস দাদার বিশ্বাস বাঙ্গালীর গাড়ীতে পারত পক্ষে ইংরাজ উঠিতে চাহে না। এ বিশ্বাসের মূল্য কত-দূর জানি না, তবে সে ইংরাজেরা আমাদের গাড়ীতে উঠিল না বটে, জেনানা জেনানা করিয়া অন্য কামরা দেখিতে চলিয়া গেল। ইহার পর সমস্ত রাত আর কেহ আমাদের গাড়ীর দিকে আসে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে সক্রেটিস দাদার অশোয়াস্তি কিছু কমিয়াছিল তাহা নহে, পরদিন শুনিলাম তিনি প্রায় সারারাত ধরিয়া জাগিয়া পাহারায় ছিলেন—শেষরাতে শুইয়া পড়িয়াছেন।

আমরা আর সকলেই সকাল সকাল শুইয়া পড়িয়াছিলাম, আর একেবারে সকাল হইলে উঠিলাম। মাঝের সময়টা যে একেবারে এক ঘুমে কাটিয়া গিয়াছিল এমন বলিতে পারি না। প্রথমতঃ গাড়ীর ঘুমকে কিছু আর ঘুম বলা যায় না। রেল গাড়ীর ঘড়ঘড়ানীর অবিশ্রান্ত সমতান শব্দে মাথার মধ্যে ভাবনাগুলা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়, স্বপ্নগুলা ভাবনার আকার ধারণ করে, শেষে উভয়ে মিশিয়া একরকম জড়ভরত করিয়া ফেলে, সে অনেকটা ঘুমের মত বটে, কিন্তু যতক্ষণ কোন মুনি এরূপ অবস্থাকে ঘুম বলিয়াছেন বলিয়া কোন নজীর নাপাইতেছি ততক্ষণ আমি অন্ততঃ ইহাকে ঘুম বলিতে পারি না। যাহোক্ ঘুমাইয়া না পড়ি—রাতের মধ্যে বেশীবার জাগিয়া উঠি নাই। ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী থামিলে চারি দিকের ডাক হাক গণ্ডগোলে প্রায় এক একবার জাগিয়া উঠিতে হয়—তাহার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিলেই আবার যে কে সেই। একবার বেশী রাতে একটা ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে এক অদ্ভুত আওয়াজ শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—কিন্তু কথাটা কি ঠিক ধরিতে পারিলাম না—চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম সক্রেশিস দাদা তখনো শোন নাই—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি বলিতেছে"? তিনি বলিলেন—"পাণিপাঁড়ে"। জিজ্ঞাসা করিলাম "মানে কি"? তিনি আমার এই অজ্ঞতায় এতদূর শোকান্বিত হইয়া পড়িলেন যে খানিকক্ষণ তাঁহার মুখে কোনই কথা ফুটিল না।

শেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর বলিয়া দিলেন—"পানি পাঁড়ে অর্থাৎ বামুনের জল।"

রাত্রের মধ্যে এই যা এক ঘটনা হইয়াছিল—তারপর যখন চোখ মেলিলাম, তখন একেবারে সকাল। প্রভাতের আলোকে বাহিরের পরিস্ফুট শ্যামল দৃশ্য যখন চোখে পড়িল—তখন কি মধুর বলিয়া মনে হইল, চতুষ্কোন ক্ষেত্রে সবুজ শষ্য, প্রকাণ্ড প্রান্তরে সবুজ ঘাস, সবুজ গাছপালা, সবুজ লতা পাতা, আশে পাশে যে পাহাড়গুলি দেখা যাইতেছে—তাহাও সবুজ গাছে গাছে আগা গোড়া ঢাকা,—ঠিক যেন তাহা গাছেরি পাহাড়—পাহাড়গুলি এত কাছে যে তাহার প্রত্যেক পাতাটি পর্য্যন্ত চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার নীচে যে কঠিন জমি আছে তাহার একটুও দেখা যায় না। যেখানে গাছপালা কিছুই নাই, যে চষা জমা টুকুতে এখনো একটি শষ্য অঙ্কুরিত হয় নাই, সেস্থানটিও কি তকতক ঝর ঝর করিতেছে—তাহারো কি একটা কাঁচা কাঁচা—কি একটা নবীন ভাব। গাছ পালার মধ্য হইতে যে বাতাসটুকু মুখে চোখে ঝাপটা দিয়া যাইতেছে—তাহারও যেন কি একটা নূতনতর নবীনত্ব আছে। এই নবীন, শ্যামল দৃশ্যের মধ্যে অধিকক্ষণ থাকিলে কলিকাতার সেই কঠিন শুষ্ক ভাব ক্রমে যেন ভুলিয়া যাইতে হয়। প্রাতঃকাল আন্দাজ ৬ টার সময় আমরা লক্ষীসরাই পৌঁছিলাম, এইখানে হঠাৎ দৃশ্যটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, স্থলের পরিবর্ত্তে চারিদিক জলে জলময় দেখিতে পাইলাম। গাড়ীটা আমাদের একটা উচ্চ রাঁস্তা দিয়া চলিতেছে তাহা ছাড়া চারিদিকে অকুল-সমুদ্র। যত দূর দেখা যায়, আর কিছু না, কেবল জল কেবল জল, জলের সীমানা দিগন্তে গিয়া এক হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখিলাম সেই অগাধ জলের এক স্থলে একটা শকুনি পাখা ছড়াইয়া বসিয়া আছে, সে যেন তাহার সেই ক্ষুদ্র পাখার মধ্যে সেই প্রকাণ্ড জল রাশিটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চায়। দেখিয়া আমার প্রলয়ের দৃশ্য মনে হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শকুনি অদৃশ্য হইয়া গেল। মাঝে মাঝে জলে ডোবা গাছের এক একটা আগা চোখে আসিয়া পড়িতে লাগিল। দূর হইতে তাহা স্থল বলিয়া ভ্রম হয়, আবার গাড়ী নিকটে আসিবামাত্র সে ভ্রম দূর হইয়া যায়। দু এক জায়গায় সত্য সত্যই জল সরিয়া একটু দ্বীপের মত হইয়াছে। কি ভয়ানক বন্যা! দেখিয়া হাসি খুসী সব দূর হইয়া গেল। আন্দাজ ৭৷৷০টার সময় মোকামা ছাড়াইয়া আমরা উচ্চ ভূমিতে উঠিলাম—আর জল দেখিতে পাইলাম না। আবার সেই পুরাতন দৃশ্য,—গাছ পালা—পাহাড় মাঁঠ ক্ষেত্র, ঢেউ খেলিতে খেলিতে চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। একটা কথা বলা হয় নাই, পাহাড় দেখিয়া ছেলে দুইটির আনন্দ ধরে না—বড়টি আগেই পাহাড় দেখিয়াছিলেন—ছোটটির এই প্রথম হাতে খড়ি,—সুতরাং পাহাড় দেখিয়াই তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওকি ওকি" আমি বলিলাম—"ঐ পাহাড়"। আমি ভাবিয়াছিলাম—এইখানেই তাঁহার জিজ্ঞাসা তৃষ্ণাটা নিবৃত্তি হইবে—কিন্তু তিনি বলিলেন—"এই পাহাড়। তা

পর্ব্বতও কি এই রকম ?" কি উত্তর দিই মুস্কিলে পড়িলাম, আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়িল, তখন পাহাড় পর্ব্বত কল্পনা করিতে গেলেই—আমাদের বাগানের সেই ছোট মাটির ঢিবিটা মনে পড়িত—আর চিরকাল কাব্যে আকাশের সহিত সমুদ্রের তুলনা করিতে দেখিয়াছি—সুতরাং সমুদ্র ভাবিতে গেলেই আকাশ ভাবিয়া বসিতাম—অথচ আকাশটা মাটিতে কি করিয়া আসিবে—সে সম্বন্ধে মনের মধ্যে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া যাইত, শেষ কালে বিরক্ত হইয়া খুকু রানুটিকে কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম—"সমুদ্র কেমন বল দেখি—" সে ছোট ছোট কচি আঙ্গুলগুলি গোল করিয়া দেখাইত—"এমনি"। তখন তাহাকে চুমো খাইয়া খাইয়া আমার সমুদ্র দেখিবার আশ মিটিয়া যাইত। যাইহোক অনেক দিন হইতে সেরূপ বুঝাবুঝির দায় এড়াইয়াছি,—তাহার পর পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নিজের আনাড়ীত্ব যদিবা ঘুচিল—আবার আর এক আনাড়ীর হাতে পড়িয়া গেলাম; আমার পাহাড় দেখা ঘুরিয়া গেল—আমি বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া বলিলাম—দাঁড়া একটু ভাবিতে দে" কি জানি এত হাসির কথা কি বলিলাম, মেয়েটিত ইহাতে হাসিয়া অনর্থ করিয়া দিলেন। পাশেই তাঁহার বিজ্ঞ দাদাটি বসিয়াছিলেন—তাঁহার এ উচ্ছ্বাসটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইল। এ সম্বন্ধে ছোট বোনের সহিত বড় ভাইয়ের মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য, কেন না তাঁহার সকল সময় সকল কথায় এরূপ হাসি আসে না, তাঁহার উচ্ছ্বাসের প্রকৃতিটাই কিছু স্বতন্ত্র;—তিনি পুকুরের ডোবা নৌকাখানা জলে ডুবিয়া তুলিবেন, বেসুরো হারমোনিয়মটাকে সারিতে গিয়া একেবারেই সারিয়া ফেলিবেন—ঘড়িটা খারাব হইলে তাহাকে ভাল করিবার সম্পূর্ণ শুভ ইচ্ছা সত্বেও তাহাকে ভাঙ্গিয়া বসিবেন, গ্যানোর ফিজিক্স্‌খানা দিনের মধ্যে দশবার নাড়া চাড়া করিয়া—নানা রূপ কল করিবার ফন্দীতে আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিবেন—তবে তাঁহার আমোদ হইবে। বলিব কি তাঁহার কলের ফ্যাসাদে—বাড়ীটার বাড়ীত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে (ঘরের ঘণ্টা কলের দড়িদড়া চারিদিকে পড়িয়া বাড়ীটা যেন জাহাজের মত দেখিতে হইয়াছে) আর আমার যত কিছু অসুবিধা তাহাও একেবারে এমন দেশ ছাড়া হইয়া পড়িয়াছে যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আবশ্যক হইলেও (নূতন সৃষ্টি না করিলে) আর তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ইহাঁরি মত সৃষ্টিছাড়া রকমের ইহাঁর যে দু একটি বন্ধু আছেন—তাঁহাদের পাইলে আবার সোনায় সোহাগা, সে দিন উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে—পুকুরের জল বাগানে আসে, বাগানের মাটী পুকুরে যায়, আর আমার যে সকল অসুবিধা আমি কখনো জানিতাম না—তাহা পর্য্যন্ত সে দিন রাশি রাশি আবিষ্কার হইয়া পড়ে। যাইহোক ঔর্ব্বের মত কোন একটা কাণ্ডকারখানা হেঙ্গাম হুজ্জুত কিম্বা দু চারিটা বন্ধু বান্ধব না পাইলে—তাঁহার উচ্ছ্বাসটা বড় জমে না,—সুতরাং নিরীহ ছোট্ট খাট্ট একটা

ব্যাপারে—কি কথায় তাঁহার বোনটিকে হাসিতে দেখিলেই তিনি বলিয়া বসেন—"তোর সকল তাতেই হাসি—"

বাস্তবিক মেয়েটির এই অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসটা কমাইতে পারিলে আমিও পীরের কাছে সিন্নি দিয়া আসি। মেয়ের জন্য দিদিমাদের কাছে তিরস্কার খাইতে খাইতে মায়ের পর্য্যন্ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। কেন না—তিনি শত্রু মুখে ছাই দিয়া (কথাটা ঠিক সার্ব্বভৌমিক ভালবাসার কথা নহে—বলা উচিত ছিল মিত্রের মুখে ফুল চন্দন দিয়া। পাঠকেরা কথাটা বদলাইয়া লইবেন) এখন আর ঠিক খাঁটি দুই চারি বৎসরের মেয়েটি নাই; তবু এখনো তাহার বয়সোচিত দেশোচিত বিজ্ঞতা হইল না! (আমি বলিতেছি 'হইল না' কিন্তু দিদিমারা বলেন—মায়ের শিক্ষার দোষে হইল না। মেকলেও নেটিভদের এমন বৃথা অপবাদ দেন নাই)। তাঁহার বিজ্ঞতা যে একেবারে নাই—তাহা বলিতেছি না,—তবে তাঁহার যেরূপ বিজ্ঞতা দেখা যায় সেও এমন নূতনতর যে সে ফ্যাসানটা বিজ্ঞতার বাজারে এখনো চলে নাই। সুতরাং সে বিজ্ঞতাটুকু কাহারো চোখে পড়ে না—তাহার অভাবটাই সকলে দেখিতে পান। তিন চার বছরের ছোট ছেলে মেয়ে পাইলে তিনি এখনো তাহাদের সহিত খেলা করিতে বসেন—পরিচিত অপরিচিত সকল লোকের কাছেই, কোন দিন ঘরে বেগুণপোড়া দিয়া ভাত খাইয়াছি—এবং তাহার কোনটা বা কানা ছিল, তাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করেন। আর হাসির কথাত আগেই বলিয়াছি, এমন কি—ভঁদোচন্দ্রকে কথা কহিতে শুনিলে আর হাঁদারামকে হাঁটিয়া যাইতে দেখিলে পর্য্যন্ত তিনি হাসিয়া কুটি কুটি হন। কেবল ইহা হইলেও রক্ষা ছিল, বিশ্বের কাহারো যাহাতে হাসি আসে না—এমন অনেক বিষয় তাঁহার মহা হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। ঝকমারী করিয়া একবার আমি গল্প করিয়াছিলাম যে প্রথম যখন আমি রেলের গাড়ীতে উঠি তখন পাল্কী গাড়ীর কাছে নামাইয়াছিল—আমি পালকী হইতে গাড়ীতে চড়িলাম" এই গল্পটা তাঁহার এতদূর অদ্ভুত ঠেকিয়াছে সে সে কথা মনে পড়িলে এখনো তিনি হাসিয়া বাঁচেন না। তাঁহার মতে এমন হাসির কথা এমন লজ্জার কথা ভূভারতে নাই।

প্ল্যাটফর্ম্মে পালকীখানার প্রতি রাজ্যের লোকের চোখ পড়িয়া যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল—তাহাতে যে আমি লজ্জায় মরিয়া যাই নাই—ইহাতেই তিনি আশ্চর্য্য হন। এবড় নূতনতর লজ্জা! আমরাত এরূপ লজ্জার-মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি। আমরাত জানি লোকের মধ্যেই লজ্জা করে। আমার মনে আছে প্রথম যে রাত্রে লোকজন জনতার মধ্যে আমি ষ্টেসনে নামি, আমার কিরূপ লজ্জা কিরূপ হৃৎকম্প হইয়াছিল, বেড়াইবার সমস্ত সুখটা যেন এক মুহূর্ত্তে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাহার পর এতবার গাড়ী উঠিয়াছি, এখনো ষ্টেশন দিয়া গাড়ীতে উঠিবার সময় কেমন যে একটা অশোয়াস্তি উপস্থিত হয়—তাহা কোন ক্রমেই কাটা-

ইয়া উঠিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে সমাজে কি পরিবর্ত্তন! কে জানে দিনকতক পরে আরো কি হইবে!

এখন বাজে কথা ছাড়িয়া আসলে আসি। মেয়েটির হাসি শুনিয়া সক্রেটিস দাদা—কি ব্যাপার বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। কি ভাবিয়াছিলেন তিনিই জানেন, চারিদিকে চাহিয়া আশ্বস্ত হইয়া ছেলেদের কাছে আসিয়া বসিলেন, তারপর নানারূপ ভণিতা করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন, তাঁহার রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া মেয়েটির ত কথাই নাই, ছেলেটি শুদ্ধ হাসিয়া অস্থির হইল, হাসির এই অট্টগোলে আগেকার কথাটা একেবারেই চাপা পড়িয়া গেল, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম চারিদিকে বেশ রোদ হইয়াছে। দূরে গাছ পালার ভিতর পাতার কুটীর গুলি গায় গায় ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া রোদ পোহাইতেছে; বাতাসের শৈত্যটা ইহার মধ্যেই এত মৃদুতর—এত কোমলতর হইয়া পড়িয়াছে যে ঠিক যেন বসন্তের বাতাস বলিয়া মনে হইতেছে। বামে মাঠের মধ্যে পাশাপাশি চতুষ্কোন তিন চারিটি ক্ষেত্র জমীতে দুই জন করিয়া কৃষক হাতে গোল গোল ছোট ছোট দাণ্ডা ধরিয়া এক এক জোড়া বলদকে লাঙ্গল চষাইতেছে। মাঝে মাঝে তাহাদের লাঙ্গুল মলিতে মলিতে গান ধরিতেছে। ডাইনে ঠিক গাড়ীর রাস্তার পাশে একজন কৃষক বালক একপাল গরু পশ্চাতে রাখিয়া গাড়ীর পানে চাহিয়া আছে, বুঝি গাড়ীটা চলিয়া গেলেই সে এই রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবে। স্থানে স্থানে কেমন ঐ তাল গাছের কুঞ্জ, সরু সরু লম্বা ডালের আগায় বড় বড় পাতার মুকুট—কি সুন্দর দেখিতে। সুবিস্তৃত মাঠে কোথায় বা বড় বড় গাছের দলে দলে আলিঙ্গন, কোথায় বা এক একটি বড় গাছ সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সমুদ্রের মধ্যে দিশাহারা একাকী দাঁড়াইয়া।

দেখিতে দেখিতে একটা ছোট পাহাড়কাটা রাস্তা দিয়া ট্রেন চলিয়া গেল, একটা নদী ছাড়াইয়া আসিলাম, সম্মুখে ঐ একটা জলাশয় রৌদ্র কিরণে চিকচিক করিতেছে। ময়লা কাপড় পরা মোটাসোটা নথ নাকে একজন ধোপানি জলে হাঁটু ডুবাইয়া একখানা কাঠের উপর ধপাস ধপাস করিয়া কাপড় কাচিতেছে। পরের দোষ ধরা লোকের মত সে পরের ময়লা পরিষ্কার করিয়াই জীবন কাটায়, নিজের ময়লা ধুইবার আর আবশ্যক দেখে না। পুকুরটাকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল ঝপ করিয়া একটা ডুব দিয়া আসি—তবু এখনো গাড়ীটা কিছুই গরম হয় নাই—কিন্তু গরমের সময় রেলগাড়ীতে বসিয়া নদী পুকুর দেখিলে কি ভয়ানকই স্নান করিতে ইচ্ছা যায়।

এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি, গাছপালা জলাশয় প্রান্তর সমস্ত লইয়া দিগন্ত চক্রাকারে যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতেছে।

১১ টার সময় আমরা দানাপুর পৌঁছিলাম। দানাপুরে আগে হইতেই আমা-

দের জন্য ভাত ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছিল, গাড়ী ষ্টেসনে লাগিতেই হাঁড়ি হাঁড়ি অন্ন ব্যঞ্জন আসিয়া উপস্থিত। সক্রেশিস দাদা হাঁড়িগুলি দরজার ধারে গুছাইয়া রাখিয়া ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেসনে স্নান করিতে নামিলেন—এখানে আধ ঘণ্টা আন্দাজ গাড়ী থাকে। যদিও চারিদিকের জানালা দরজা আমাদের বন্ধ ছিল তবু ভয় হইতে লাগিল কেহ পাছে আসিয়া পড়ে। ঘরের হাঁড়ি কলসিগুলা যে আমাদের রক্ষকের কাজ করিতেছে তাহা তখন জানিতাম না। একটু পরে একজন ইংরাজ দরজাটা আধখোলা করিয়াই দরজাটা আবার দুম করিয়া ফেলিয়া দিল। ঘরের ভিতর কে আছে বা কি আছে তাহা দেখা পর্য্যন্ত সে আবশ্যক বোধ না করিয়া জেনানা জেনানা করিয়া চলিয়া গেল। আর কিছু নহে সমুখের হাঁড়ি কলসি গুলা তাহার নজরে পড়িয়াছিল। দানাপুর ছাড়াইয়া দুপুরের পর আমরা ভাত খাইতে বসিলাম—কিন্তু রেলের ঝন ঝনানি আর কয়লার গুঁড়া ও গরম বাতাস খাইয়া পেটএমন ভরিয়া গিয়াছিল, যে আর কিছু খাইবার বড় আবশ্যক ছিল না, ইহা ছাড়া সকালবেলা আমরা অল্প স্বল্প দুধ রুটিও খাইয়া লইয়াছিলাম। দানাপুরের পর বকসার, এইখানেই আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের বাঙ্গালার সীমা, কিন্তু আসল বাঙ্গলা অনেক আগে ছাড়াইয়াছি। এখানে আমাদের বামে বহুদূর বিস্তৃত শ্যামল ঘাস পূর্ণ প্রান্তর দেখা যায়—এইখানে আগে গভর্ণমেণ্টের ষ্টাডব্রেড ঘোড়ার কারখানা ছিল। যাইহোক দুপুরটা ত কাটিয়াছে—সক্রেশিস দাদার ষ্টেসনে ষ্টেসনে বহুরূপী সাজা দেখিয়া আর ছেলেদের সঙ্গে ছেলে হইয়া বিকালটাও এক রকমে কাট কাট হইল। মৃজাপুর পৌঁছিয়া আমরা এলাহাবাদে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইব ভাবিলাম কিন্তু অতটা সবুর সহিল না, চুনারে গাড়ী থামিবামাত্র আমরা নামিবার উদ্যোগ আরম্ভ করিলাম; চুনারের আসল নাম চণ্ডালগড়। চণ্ডালগড় পাহাড়ের উপর একটি চমৎকার দুর্গ,এই দুর্গে দিলীপ সিংহের মাকে ইংরাজরা বন্দী করিয়া রাখেন। চুনারে বড় সুন্দর মাটির পুতুল—মাটির জিনিস পত্র পাওয়া যায়। চুনারের পর মৃজাপুর। মৃজাপুরে একটি ছোট পাহাড়ের উপর একখানি ধবধবে কি সুন্দর বাড়ী! ক্রমে যতই রোদ পড়িয়া আসিতে লাগিল যতই এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আমাদের কথাবার্ত্তাও তত কমিয়া আসিতে লাগিল,শেষাশেষি সকলেই নিঃঝুম নিস্তব্ধভাবে ঔৎসুক্য পূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া কেবল ষ্টেসন গুণিতে লাগিলাম। গাড়ীতে ষ্টেসনই ঘড়ির কাজ করে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, গাড়ী নইনি ছাড়াইয়া আসিল, হঠাৎ একটা নূতন রকম গম্ভীর গুম গুম শব্দ আমাদের কাণে গেল, বুঝিলাম যমুনা পুলের উপরে গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে—দেখিলাম নীচে যমুনার কাল জল থই থই করিতেছে—আবার সে শব্দ থামিয়া গেল—সে জল অদৃশ্য হইল, আমরা এলাহাবাদ ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিলাম। *

---

* প্রবন্ধটি গত আশ্বিন মাস হইতে আমাদের কাছে আছে, স্থানাভাবে এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। ভাং সং

আর একটি প্রস্তাব।

গত বৈশাখ মাসের ভারতীতে 'একটি প্রস্তাব' নামক প্রবন্ধে লেখিকা দেশের স্ত্রীলোকদের সুশিক্ষার উপর দেশের উন্নতি কতদূর নির্ভর করে তাহা দেখাইয়া সাধারণ স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি ও উপায় স্বরূপ আমাদের দেশের শিক্ষিতা ও অন্তঃপুর বদ্ধা মহিলাদিগের পরস্পর মেলামেশা সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। কয়েকটি কৃতবিদ্য মহিলা সেই প্রস্তাবটি উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সেই উদ্দেশে এই বৈশাখ হইতে সখিসমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করিতেছেন। এই সমিতি আজ সাধারণের নিকট 'আর একটি প্রস্তাব' লইয়া আসিয়াছে। *

অল্পবয়স্কা হিন্দু বিধবাদের জন্যে সকলেই চিন্তিত। অনেকে তাঁহাদের দুঃখে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহাদের বিবাহ দিবার নিমিত্তে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন। অনেক বিধবা অল্প সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের গলগ্রহ স্বরূপ; গৃহস্থ অতি কষ্টের সহিত বিধবাকে অন্নবস্ত্র দান করেন; বিধবাও চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে সেই দান গ্রহণ করেন; একটুতেই দুই জনের মধ্যে খিটি খিটি বাধিয়া যায়; গৃহস্থ ভাবেন, আমি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া ইহাঁর ভাত কাপড় যোগাইতেছি তথাপি কিছুতেই ইনি সন্তুষ্ট হন্‌না; বিধবা ভাবেন, হায়! আমার কি পোড়া অদৃষ্ট, একমুটা ভাতের জন্যে এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে!

এক্ষণে সমিতির প্রস্তাবটি এই যে, অল্প বয়স্কা হিন্দু বিধবারা রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া, অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দান ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। অনাথা বিধবাগণ এইরূপ সৎকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে সক্ষম হইলে তাঁহারা অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা হইতে অব্যাহতি পাইবেন, তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনেরাও সন্তুষ্ট থাকিবে। যে সকল বিধবারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে আমরা নিষেধ করিতেছি না। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্মাচরণে বৈধব্যকাল অতিবাহিত করিতে চাহেন তাঁহাদিগকেই এই অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে হিন্দুরীতি নীতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিবে না। দান, ধর্ম্মই শাস্ত্রানুমোদিত বৈধব্যোচিত কর্ম্ম। বিদ্যাদানের পর দান আর নাই। পরোপকার পরম ধর্ম্ম। হিন্দুবিধবারা অন্তঃপুর-শিক্ষার ভারগ্রহণ করিলে অশেষ উপকার দর্শিবে। এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীলোক দ্বারা এই শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধর্ম্মের জন্যে অনেক পরিবার মধ্যে ইহাঁদের প্রবেশ নিষেধ। ইহাঁরা বাঙ্গলা ভাল জানেন না। অন্যান্য বিষয়েও

---

* ভারতীর উক্ত প্রবন্ধটির সহিত সমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী একত্রে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা দেখিতে চাহেন, ভারতী কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট চাহিয়া পাঠাইলেই পাইবেন।

ইহাঁরা যেরূপ শিক্ষাদান করেন তাহা বড় সন্তোষ জনক হয় না। আর বিশেষতঃ আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া এখন অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে সেরূপ শিক্ষা ইহাঁদের দ্বারা আদবেই হয় না। যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকদের মনে হিন্দুভাব বজায় রাখিয়া দেশানুরাগ প্রজ্বলিত করিয়া দিতে পারে, সেই শিক্ষাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। কি মেয়ে, কি পুরুষ সকল মানুষেরই বাল্য শিক্ষা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে। বাল্য শিক্ষাই সকল শিক্ষার ভিত্তি ভূমি। স্ত্রীলোকদের মনে প্রবল দেশানুরাগ প্রজ্বলিত হইলে তাহা অতি দ্রুত দেশময় ছাইয়া পড়িবে। এ শিক্ষা বিদেশী স্ত্রীলোক দ্বারা কথনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য হিন্দু বিধবাদিগকে আমরা বারবার অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহারা যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া মূর্ত্তিমতী দেশানুরাগের ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করুন, অন্তঃপুর সকল তাঁহাদের ভাবে পরিপূর্ণ করুন। ইহাতে তাঁহাদের বৈধব্যোচিত ধর্ম্মপালন হইবে; নিজের মঙ্গল, আত্মীয় স্বজনের মঙ্গল, সমস্ত দেশের মঙ্গল হইবে।

যদি কোন অল্পবয়স্কা, সঙ্গতিহীন বিধবা, দেশহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া শিক্ষা পাইতে চাহেন ত তাঁহাকে সাহায্য করা এই সমিতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এই অভিপ্রায়ে এই সমিতিতে দান সংগ্রহ করা হইতেছে, ইহার মধ্যেই যতটা অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহাতে আপাততঃ কয়েকটি বিধবাকে বেথুন স্কুলে দিতে পারা যায়। বেথুনস্কুলে দেওয়া অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়-সাধ্য আর সেখানে থাকিলে এই সমিতির কর্ত্রীগণ সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিতে পারেন, এই জন্যই বেথুন স্কুলে দিবার কথা বলিতেছি। বিধবারা স্কুলে বাস না করিয়া শুদ্ধ পড়িবার নিমিত্তে সেখানে যাতায়াত করিলে বোধ করি তাহাতে ধর্ম্মবিরোধী আচরণ ঘটিবে না। তাঁহাদের নিজের শিক্ষা শেষ হইলে তাঁহারা যখন অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন তখন সমিতির নিকট হইতে তাঁহারা বেতন পাইবেন।

এই প্রস্তাবটি সম্বন্ধে বিধবাদের নিজের এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনদিগের বক্তব্য শুনিবার নিমিত্ত আমরা বড়ই উৎসুক রহিলাম।

মিলন।

(বালকের রচনা)

জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একটা মজ্জাগত মিলন আছে। প্রতি বড় বড় জিনিষের মধ্যে একটি মিলন আছে আর প্রতি ছোটখাট জিনিষের মধ্যেও একটি মিলন আছে। পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের একটা মিলন আছে আবার পৃথিবীর সন্তানেরও তাহার

সঙ্গে একটা মিলন ভাব আছে। যখন চন্দ্রের প্রেমের হাসির উজ্জ্বল অথচ মধুর রশ্মিগুলি পৃথিবীর বক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া আবার চন্দ্রে গিয়া পঁহুছায় আর তাহার সঙ্গে গঙ্গার প্রেমের হাসি নৌকার প্রেমে প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথিবীর প্রেমের একটি কোঁটা হইয়া গিয়া চাঁদের প্রেমের সহিত গাঢ় আলিঙ্গন করে তখনই বুঝা যায় যে জগতে প্রেমের কিরূপ মিলন, অগাধপ্রেমের সহিত কণা প্রেমের কি মধুর সম্বন্ধ। আরও খুঁটাইয়া দেখিতে গেলে আরও মধুর ভাব দেখিতে পাইবে। এই প্রেমের মধ্যে সহস্র প্রেমকণা ভাসিতেছে। এইরূপে ক্রমে দেখিবে যে অসংখ্য প্রেমকণা অসংখ্য প্রেমসমুদ্রে মিলাইয়া গিয়া মধুরে মধুর মিশাইতেছে।

জ্যোৎস্না রাত্রে যদি নদী তীরে দাঁড়াইয়া থাকা যায় আকাশের নিবিড় নীলিমার মাঝে চাঁদের মুখের পানে এক একবার চাহিয়া দেখা যায় তাহা হইলে জগতের অনন্ত প্রেমের কিরূপ মিলন তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। তুমি যদি খানিক ক্ষণ চাঁদের দিকে এক মনে চাহিয়া দেখ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে চাঁদ তাহার সহস্র কিরণ-হস্ত বাড়াইয়া দিয়া তোমাকে—শুদ্ধ তোমাকে কেন সমস্ত পৃথিবীকে "কোলে আয়" বলিয়া ডাকিতেছে। জগতে যদি প্রেমের মিলন না থাকিত প্রেমের উৎস না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীর সন্তানকে কি কখনও চাঁদ স্নেহের চক্ষে প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিত। আরও দেখ সে সময়ে তোমার হয়ত চাঁদের কোলে যাইতে ইচ্ছা হইবে তথাপি যাইতে পারিবে না। কেন পারিবে না? জগতে প্রেমের মিলন আছে আকর্ষণী শক্তি আছে তাই পারিবে না। চাঁদ তোমাকে প্রেম ভরে স্নেহ ভরে ডাকিতেছে বটে কিন্তু পৃথিবীও তোমাকে তাহার প্রেমে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অনেক সময় আমরা পৃথিবীর স্নেহের গভীর তল স্পর্শ করিতে পারি না—মায়ের গভীর ভালবাসা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সন্তান হইলেই যদি মায়ের গভীর ভালবাসা বুঝিতে পারিত তাহা হইলে মিঠাইএর লোভে ছোট ছেলে ভুলিত না। কিন্তু সকলে বুঝে কি? এ স্নেহের গভীর জলে সকলে ডুবিতে পারে কি? সকলের সে ক্ষমতা কোথায়? সে মহত্ব কোথায়? এই জন্য অনেক সময় আমরা পৃথিবীর স্নেহ প্রেম ভাল রকম না বুঝিয়া চাঁদে যাইতে, হেথা যাইতে, সেথা যাইতে চেষ্টা করি। কিন্তু পৃথিবী নাকি আমাদিগকে তাহার প্রেমে বিষম জোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাই যাইতে পারি না—খানিক পরে আবার পৃথিবীর প্রেমের গভীরতা বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হই। এইরূপ জগতের প্রতি অণুপরমাণু পর্য্যন্ত প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে—কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

গঙ্গা যমুনা উভয়েই হিমালয়ের কন্যা, কিন্তু ভিন্ন পাত্রে সমর্পিতা,—সুতরাং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু প্রেমের এমনি মিলন, হৃদয়ের যথার্থ ভালবাসার এমনি মিলন যে যমুনা গঙ্গাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিল না—সে গঙ্গাতে

আসিয়া মিশিল, দুই ভগিনী একত্র হইল। এ দৃশ্য কি মধুর! আবার দেখ মুরশিদাবাদে আসিয়া গঙ্গার কত সন্তান সন্ততি হইল। তাহারা এ এদিকে ও সেদিকে করিয়া বিচ্ছিন্ন হইল—পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিল। তুমি বলিবে এ দৃশ্য বড় কঠোর—এদৃশ্যে বড় নিষ্ঠুরভাব বড় সঙ্কীর্ণতা, জগৎ যদি প্রেমময় হয় তাহা হইলে জগতে এরূপ দৃশ্য থাকিতে পারে না, ইহাতে প্রেমের মাধুরী একটুও নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে এ দৃশ্যে অতিশয় মাধুর্য্য আছে, প্রেমের কোমলভাব আছে, উদারভাবের পরিচয় আছে। মুরশিদাবাদে আসিয়া তাহারা কেন বিচ্ছিন্ন হইল, একত্র কেন রহিল না? ইহার কারণ তাহারা উদারতার ভাণ জানে না, উদারতার মধ্যেও যে সঙ্কীর্ণতা করিতে হয় তাহা তাহারা জানে না। তুমি একটা ছোট কার্য্যে হাত দিতে রাজি নহ কারণ তোমার মনে সঙ্কীর্ণতা বিদ্যমান। তুমি চাহ যে কিসে একটা মস্ত নামওয়ালা কাজ করিব, কাজ যত হোক্ না হোক্ নাম হইবে, উদারতার কার্য্য কর না কর বারকতক উদারতা উচ্চারণে তোমার জিহ্বার ব্যায়ামটা করিতে পারিবে। ইহাদের সে উদ্দেশ্য নহে, পৃথিবীর উপকার করিতে ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে—কার্য্য শেষ হইলেই আবার একত্র মিলিত হইবে। সমুদ্রের ধারে গিয়া ইহাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে, ইহারা সমুদ্রের কোলে মিলিত হইয়াছে। হৃদয়ের অন্তস্তলে যথার্থ প্রেমের বীজ না থাকিলে এরূপে মিলিত হইতে পারে না। জগতের প্রতি ছোটবড় জিনিষের মধ্যেই এইরূপ অল্প বিস্তর প্রেমের ছটা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেমের মিলনের চমৎকার মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারা যায়। এই প্রেম আছে বলিয়াই জগৎ টিকিয়া আছে নয়ত সে নিতান্ত মরুভূমি বা শ্মশানের ন্যায় হইত।

শ্রী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঈশ্বর প্রীতি।

শি। দেখ, ঈশ্বর প্রীতি বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ প্রীতি কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে। আমরা যাহাকে ভালবাসা বলি সেই ভালবাসার সুর সকলস্থলেই এক রকম নহে। পুত্র পিতাকে যে ভাবে ভাল বাসে, স্ত্রী স্বামীকে যে ভাবে ভাল বাসে, ভাই ভগিনীকে যে ভাবে ভাল বাসে এই সকল ভালবাসার মধ্যে পরস্পর প্রভেদ আছে ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আবার পারিবারিক প্রেমের সহিত গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ তুলনা করিয়া দেখ একটি প্রভেদ দেখিতে পাইবে। ভালবাসার সুর যখন সকলস্থলেই এক রকমের নয় তখন ঈশ্বর প্রেমের সুর কিরূপ তাহা প্রথমে সকলেরই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ভালবাসার রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিলে এই সত্যটি বুঝিতে পারিবে। ভালবাসার

যেরূপ সুরে আমার নিজের হৃদয় তন্ত্রী বাঁধা আছে আর একজনের হৃদয় তন্ত্রী যদি সেইরূপ সুরে বাঁধা থাকে তবেই পরস্পরে পরস্পরের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্র বলে দেবভাবাপন্ন না হইলে দেবতা পূজা দ্বারা দেবতার সহিত মিলন সম্ভবে না। (না দেবো দেবমর্চ্চয়েৎ—বশিষ্ঠ) অসুর ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিলে অসুরগণ আকৃষ্ট হন, পিশাচ ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিলে পিশাচের সম্বন্ধেই থাকিতে হয়। যিনি ঈশ্বরোপাসনা করিতে চান তাঁহাকে ঈশ্বরভাবাপন্ন হইতে হইবে ঈশ্বর প্রীতির সুরে আত্মাকে বাঁধিতে হইবে তবেই ঈশ্বরের সহিত প্রীতি সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে পারিবেন।

আমরা সাধারণ লোকে ভালবাসার যে সকল সুরের সহিত পরিচিত, ঈশ্বরপ্রীতির সুর তাহাদের অপেক্ষা যে কত বেশী গভীর তাহা তুমি আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। স্বভাবতঃ অন্তরে যে সুরের অনুরাগ প্রবল, ঈশ্বর উপাসনা করিতে গেলে সে সুর বদলাইতে হইবে। সচরাচর অন্তরে যে অনুরাগবৃত্তি প্রকাশ পায় তাহাই প্রখর করিতে পারিলেই তাহার সুর বদলায় না। ঐশ্বরিক ভাব কি তাহা বুঝিয়া সেই রকম ভাবে হৃদয় যন্ত্র বাঁধিতে হইবে তবেই নিরাকার ঈশ্বরের সম্বন্ধে আসিতে পারিবে।

মনুষ্য এই সংসার চক্রে পড়িয়া পত্নীপ্রেম পুত্রস্নেহ এই সকল সঙ্কীর্ণতর অনুরাগে বদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। কিন্তু যিনি ঈশ্বরানুরাগের আস্বাদ পাইয়াছেন তিনি অন্য সকল তুচ্ছ প্রেমের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন জানিও। সর্ব্বত্র সমদর্শীতা এই ভালবাসা-আস্বাদনের ফল। আমার পুত্রকে আমার পিতাকে আমার মাতাকে অন্য লোকের অপেক্ষা বেশী ভাল বাসি এ জ্ঞান যত দিন থাকিবে ততদিন আমার জানা উচিত যে আমি ঈশ্বর প্রীতির আস্বাদন পাই নাই। আমার দেশকে আমার ধর্ম্মকে অন্য দেশ অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা," আমার পূজা পদ্ধতিকে অন্যের পূজা পদ্ধতি অপেক্ষা যত দিন বেশী ভাল বাসিব ততদিন আমার ঈশ্বর প্রীতি অন্তরে জন্মায় নাই ইহা নিশ্চয় জানিও। আবার ইহাও জানিও যে যতদিন আমার স্ত্রী পুত্র অথবা অন্য কোন পদার্থ অপেক্ষা ঈশ্বরকে বেশী ভাল বাসি মনে করিব ততদিন আমার সমত্ব জ্ঞান জন্মায় নাই তত দিন আমার ঈশ্বর প্রীতি জন্মায় নাই।

ঈশ্বর প্রীতি যে বড় সুগভীর ইহা স্মরণ রাখিও। বাস্তবিক ঈশ্বর প্রীতি অতি বিরল পদার্থ। অনেক কষ্টে অনেক যত্নে মনের স্বাভাবিক প্রেমভাবের সুর ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া তবে ঈশ্বর ভক্তি-ভাব অন্তরে উদিত করিতে হয়। ঈশ্বর প্রীতি যে কি পদার্থ তাহা শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেবের ন্যায় লোকেই বুঝিতে পারেন; তুমি আমি তাহার কি বুঝিব বল।

যদি প্রীতি মার্গ অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনা করিতে চাও তবে প্রেমের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইতে শিখ। প্রেমের প্রখরতা জন্মিলেই সঙ্কীর্ণতা ঘুচে না এটি যেন বেশ স্মরণ থাকে। প্রেম প্রধান উপাসনায় যদি প্রেমের সঙ্কীর্ণতা যেমন তেমনি থাকে, যাহাদের ভালবাসি

তাহাদের প্রতি ভালবাসাটাই প্রখর হইতে থাকে তবে উপাসনার কোন ফল ফলে নাই জানিও। প্রত্যহ আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিও তোমার ভালবাসা-ভাব উন্নত হইতেছে কি না। ক্রমাগত আত্ম পরীক্ষার দ্বারা নিজের ভালবাসা বৃত্তি সঙ্কীর্ণ তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর; যিনি ক্রমাগত আত্ম পরীক্ষা করিতে চান না তিনি উন্নত হইতে সক্ষম হন না। নিজের ভক্তি বৃত্তি একটু তীক্ষ্ণ দেখিয়াই যিনি আপনাকে ঈশ্বর ভক্ত বলিয়া বুঝিয়া লন তিনি নিজের উন্নতির পথে কাঁটা দেন।

মনুষ্যের অন্তরের ভাব স্বপ্নাবস্থায় যেমন প্রকাশ পায় জাগ্রতাবস্থায় সামাজিক নিয়মের বশে থাকা নিবন্ধন সেরূপ প্রকাশ পায় না। সুতরাং আপনাকে পরীক্ষা করিবার সময় নিজের স্বপ্নাবস্থার ঘটনা সব আলোচনা করিয়া দেখিবে। যে পূজা পদ্ধতি অবলম্বনে প্রেম-বৃত্তির সঙ্কীর্ণতা ঘুচে না তাহা কখনই ঈশ্বরোপাসনা নহে।

বেদান্ত শাস্ত্রে মনুষ্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। মনুষ্য, অন্নময় কোষ প্রাণময় কোষ মনোময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ এই কয়েকটি পদার্থের সমষ্টি।

মনুষ্যকে তাঁহারা যেমন এই পাঁচভাগে ভাগ করিয়াছেন সেইরূপ মনুষ্যের অনুরাগ বৃত্তিও পাঁচভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন স্থূল শরীরানুরাগ, প্রাণানুরাগ, মনের অনুরাগ, বুদ্ধির অনুরাগ, আনন্দানুরাগ বা ঈশ্বরানুরাগ। এখন এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভালবাসা সম্বন্ধীয় ভাবগুলি কিরূপ তাহা মোটামুটি বুঝাই শুন।

পাতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের সূত্রে অনুরাগ কথাটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "সুখানুশরী রাগঃ।" অর্থাৎ যাহা পাইলে আমাদের সুখ হয় আমরা তাহাকেই ভাল বাসিয়া থাকি। মানুষ মাত্রেই সুখ খুজিয়া বেড়ান এবং যিনি যে জাতীয় সুখ খুঁজিতে সদাই ব্যস্ত তাঁহার অনুরাগ বৃত্তিকেও সেই জাতীয় অনুরাগ বলা যাইতে পারে।

যিনি স্থূল শরীরের সুখে মুগ্ধ, তাঁহার ভালবাসা স্থূল জাতীয়। যিনি কেবল গায়ের জোর বাড়াইবার জন্যই ব্যস্ত, দিন রাত গায়ের জোরের জন্য আহারের তদ্বির করিতেছেন, ব্যায়াম করিতেছেন, আর কোনও বিষয়ে লক্ষ্য নাই তাঁহার ভাল বাসা স্থূল শরীরের ভাল বাসা।

প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু এবং হস্ত পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া প্রাণময় কোষ।

ছা। প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ু কি কি?

শি। বেদান্ত মতে প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান ইহারা শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু। প্রাণ বায়ুর স্থান বক্ষঃস্থল, অপানের স্থান পায়ুদেশ, সমানের নাভি দেশ, উদানের স্থান কণ্ঠ এবং ব্যানের সর্ব্বশরীর ব্যাপী। প্রাণ পূর্ব্বগমন শীল, অপানের গতি অধোদিকে, উদানের উর্দ্ধদিকে, সমান বায়ুর দ্বারা সমীকরণ হয় এবং ব্যান বায়ু সর্ব্বদেহে গমনক্ষম।

ছা। প্রাণ বায়ু প্রভৃতি কথা গুলিতে কি ভাব ঠিক বুঝায় তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

শি। বাতি ইতি বায়ুঃ। যাহা বহে তাহার নাম বায়ু; আজ কালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ animal electricity ও Nerve aura কথায় যেরূপ পদার্থ বুঝেন আমাদের শরীরস্থ বায়ু কথায় অনেকটা সেই রকম অর্থ বুঝায়। শরীরস্থ বায়ুর গতি এই কথাটি আর ইংরাজী nerve current এই কথাটির অর্থ একইরূপ। যেরূপ স্নায়বীয় ক্রিয়া হইতে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য হইতেছে তাহা প্রাণবায়ুর কার্য্য। যেরূপ স্নায়বীর ক্রিয়া হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভুক্ত পদার্থ সকল রক্তে পরিণত হয় তাহা সমান বায়ুর কার্য্য। যে জন্য শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চারিত হইতেছে তাহা ব্যান বায়ুর কার্য্য এবং বাক্য উচ্চারণ প্রভৃতি কার্য্যের চেষ্টা উদান বায়ু হইতে জন্মে। হিন্দু দার্শনিকগণ ইহা বলেন যে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু একই পদার্থ তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ম্মে চেষ্টা জন্মায় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম পাইয়াছে এবং এই এক পদার্থ সাধারণতঃ প্রাণ নামেই অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রাণ পদার্থটি কোন জাতীয় তাহা যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদের কথানুযায়ী না বুঝাইলে বুঝিতে না পার তবে আমি সেই রকমে প্রাণ কথার অর্থটি বুঝাই শুন।

লোহা একটি স্থূল জড় পদার্থ, কিন্তু সেই লোহাকে চুম্বকে পরিণত করিলে উহা লোহা হইতে ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়। রিসনব্যাক নামে একজন পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে চুম্বকে এমন এক প্রকার নূতন রকমের পদার্থ আছে যাহা লোহায় নাই। এই নূতন পদার্থটি বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ। যাহাদের অনুভূতি শক্তি (Sensitivéness) একটু সূক্ষ্ম তাঁহারা চুম্বকের দুই প্রান্ত হইতে দীপশিখার ন্যায় একটি আলোক বহির্গত হইতে দেখিতে পান; যদি ফুঁ দেওয়া যায় তবে দীপশিখার ন্যায় এই আলোক শিখাও চঞ্চল হইতে থাকে। এইরূপ আলোক উদ্ভিদ শরীর হইতে এবং জীব শরীর হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। রিসনব্যাক্ এই উজ্জল পদার্থের, অড্ এই নাম দিয়াছেন। আজ কালকার সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির গবেষণায় এই অড্ নামক সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদের প্রাণ পদার্থ আর রিসনব্যাকের অড্ পদার্থ বোধ হয় একই। রিসন ব্যাক বলেন যে এই অড পদার্থই উদ্ভিদ্ ও জীবের জীবনী শক্তির কারণ এবং আমাদের প্রাণ কথাতেও ঐ অর্থ বুঝায়। কোন কোন লোক এই পদার্থকে স্নায়বীয় আভা (nerve aura) নাম দেন।

হস্তপদ, পায়ু, উপস্থ ও বাগেন্দ্রিয় ইহারা পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই সকল ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের চেষ্টা প্রাণ হইতেই জন্মে। যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে এই প্রাণ পদার্থের আধিক্য উপস্থিত হয় সেই ইন্দ্রিয় তখন উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সেই ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের চেষ্টা জন্মে। এবং সেই ইন্দ্রিয় সঞ্চালিত হইলে, উক্ত প্রাণ পদার্থ কখন বা স্থূলাকারে পরিণত হইয়া কখন বা সূক্ষ্মাকারেই, কর্ম্মেন্দ্রিয় পথ দিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলে কর্ম্ম দ্বারা যে সুখ লাভ হয় তাহাই প্রাণময় কোষের সুখ (Pleasures of orgánic Sensations)। উচ্চহাস্য, অনর্থক বাক্যব্যয়, মাদক দ্রব্য সেবনে প্রাণের

উত্তেজনা, ইত্যাদি হইতে যে সুখ লাভ হয় তাহা প্রাণময় কোষের সুখের উদাহরণ। যিনি এই জাতীয় সুখান্বেষণেই রত তাঁহার অনুরাগ প্রাণের অনুরাগ।

এইবারে মনোময় কোষের স্ফুরণে কিরূপ সুখেচ্ছা জন্মে তাহা বলি শুন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই লইয়া মনোময় কোষ। দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়। আমাদের সংকল্প ও বিকল্প যাহা হইতে জন্মে তাহার নাম মন। কি করিব কি না করিব এই বিষয়ে একটি মতলব ঠিক করার নাম সংকল্প, বিকল্প কথার অর্থ পাতঞ্জলি বলেন যে "শব্দার্থ জ্ঞানানুপাতো বস্তুশূন্য বিকল্পঃ "অর্থাৎ বস্তু নাই অথচ শব্দের অর্থ জ্ঞানানুসারে চিত্তের যে অবস্থা জন্মে তাহার নাম বিকল্প। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে আমরা যাহাকে কল্পনা বলি (Imagination) দর্শনশাস্ত্রে তাহাকেই বিকল্প বলে।

মনোময় কোষের স্ফুরণে যে সুখেচ্ছা জন্মে তাহা তিন প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে; ইন্দ্রিয় সুখ, সংকল্প সুখ এবং বিকল্প বা কল্পনার সুখ। রূপ রসাদি বিষয় হইতে যে সুখ জন্মে তাহার নাম ইন্দ্রিয় সুখ; সংকল্পানুযায়ী কার্য্য সমাধা করিতে পারিলে যে সুখ তাহার নাম সংকল্প সুখ; আর মনে মনে একটি সৌন্দর্য্য গড়ার যে সুখ তাহা কল্পনার সুখ। যে অনুরাগ যে জাতীয় সুখানুশয়ী তাহাকে সেই জাতীয় অনুরাগ বলিতে পারি। ছেলেটি দেখিতে ভাল বলিয়া তাহাকে যে ভাল বাসি তাহা ইন্দ্রিয়জ ভালবাসা; কিন্তু একটি ছেলেকে আমি এই ধরণে শিক্ষা দিতে চাই, এই রকমে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে চাই—এইরূপ সংকল্প প্রথমে স্থির করিয়া যদি ছেলেটীকে মনের মতন করিতে পারি তবে তাহার উপর যে ভালবাসা জন্মে তাহা সংকল্পাত্মক ভালবাসা আর কবির কল্পনার অনুকুল পদার্থের প্রতি যে অনুরাগ তাহাকে কল্পনাত্মক অনুরাগ বলিতে পারি। মনোময় কোষের স্ফুরণের পর বিজ্ঞানময় কোষের স্ফুরণ হইয়া থাকে; বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া বিজ্ঞানময় কোষ, অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি। বুদ্ধির স্ফুরণে নিশ্চয় কি, সত্য কি এই অনুসন্ধিৎসা প্রবল হয়, একটী জ্ঞানলালসা জন্মে, তখন অন্য কোন প্রকার নিম্ন দরের সুখে বড় আস্থা থাকে না। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল রূপরসাদি বিষয় ভোগ করিবার জন্য উৎসুক থাকে না, তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বৈজ্ঞানিক তত্ব আলোচনা করিবার জন্যই প্রযুক্ত হয়। বিভিন্নতার মধ্যে একতা অনুসন্ধান করাই বুদ্ধির কাজ; জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলের মধ্যে বিভিন্নতা দেখাইয়া দেয় এবং বুদ্ধি দ্বারা আমরা তাহাদের মধ্যে একতা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হই, এবং এইরূপে ব্যাপৃত হওয়ার নামই বিজ্ঞান চর্চ্চা; বিজ্ঞানময় কোষের স্ফুরণে বিজ্ঞান চর্চ্চাতেই সুখ এবং যাহা এই বিজ্ঞান চর্চ্চার অনুকূল আমরা তখন তাহাদেরই ভাল বাসিয়া থাকি। এই বিজ্ঞানময় কোষের অনুরাগও সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে। বিজ্ঞানময় কোষের স্ফুরণের পর আনন্দময় কোষের বিকাশ হইয়া থাকে, তখন চিত্তের যে অবস্থা জন্মে তাহা সদানন্দ অবস্থা; এই আনন্দকেই ব্রহ্মানন্দ বলে।

বুদ্ধি ও আত্মা লইয়া আনন্দময় কোষ। যে সূত্রে স্থূলদেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি একত্রে গাঁথা আছে, যে শক্তি নিবন্ধন উহাদের মধ্যে পরস্পর একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ঘটিয়া রহিয়াছে তাহারই নাম আত্মা। মনুষ্যের আনন্দকোষের স্ফুরণে বুদ্ধি আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানে উৎসুক হয়। আমি কি, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার কর্ম্ম ইহাদের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ, আমার অন্তরের সহিত বহির্জগতের কি সম্বন্ধ—এই সকল বিষয়ের নিশ্চিৎ সত্য জানিবার জন্য আগ্রহতা জন্মে। আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান পিপাসা প্রবল হইলে অন্য সমস্ত পিপাসা দূরে চলিয়া যায়, সর্ব্বভূতে সমান অনুরাগ উপস্থিত হয়। তাঁহার সহিত চেতন অচেতন পদার্থ সকলের কি সম্বন্ধ এই বিষয়ক জ্ঞান যেখানে পান সেই খানেই তাহার অনুরাগ জন্মে অন্য কোন রূপ অনুরাগে তিনি মুগ্ধ হন না; এইরূপ জ্ঞান চর্চ্চা করিতে করিতে ক্রমে তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁহার সহিত সকল পদার্থেরই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে সুতরাং সকল পদার্থ হইতেই তিনি তাঁহার আনন্দদায়ক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন; তাঁহার জ্ঞান পিপাসা নিবারক অমৃত সকল পদার্থেই দেখিতে পান; যদি কেহ তাঁহার শত্রুতাচরণ করে তবে শত্রুর মনের অবস্থা আলোচনা করিয়া সেখান হইতেও জ্ঞান লাভে সমর্থ হন, তাঁহার অভিলষিত সুখ প্রদানে সর্ব্বভূতই অনুকূলতাচরণ করে সেই জন্য সকল পদার্থকেই তিনি সমান ভাল বাসেন। তাঁহার ভালবাসার ইতর বিশেষ থাকে না এইরূপ সমদর্শীতাকেই ঈশ্বরানুরাগ বলা যায়। এইরূপ আনন্দময় কোষের স্ফুরণ জনিত আনন্দ নাকি অনির্ব্বচনীয়।

পবিত্রতাময় শান্তিসুখময় এই আনন্দ যে কি রূপ তাহার আস্বাদন পাইবার জন্য যত্ন করি এস; এই আনন্দের নাম শুনিয়া মন মাঝে মাঝে উহার জন্য ব্যগ্র হয়; কিন্তু চঞ্চল মন অন্য অনুরাগে আবার ফিরিয়া আসে, এস দুজনে মিলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি, আমি যদি হতাশ হইয়া ফিরিতে চাই তবে তুমি আমাকে উৎসাহ দিবে আর তুমি যখন হতাশ হইবে আমি তোমাকে সাহায্য করিব। যে আনন্দের আস্বাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব জগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন তাহার কণামাত্র পাইলেই আমরা চরিতার্থ হইব। এই আনন্দময় কোষের শান্তিময় ভাব যতদূর কল্পনা করিতে পারা যায়, ঈশ্বর কথাটির সহিত সেই ভাব সংশ্লিষ্ট করিতে শিখ; যখন সঙ্কীর্ণ অনুরাগের প্রাধান্য অন্তরে জন্মিবে তখন ঈশ্বর বা ঈশ্বর কে ইহা ভাবিতে ভাবিতে যেন বিষয়ানুরাগ দূরে চলিয়া যায়, আর পবিত্র সমদর্শীতা ভাব—বুদ্ধির ভাব অন্তরে উদয় হয়। ইহারই নাম ঈশ্বর মন্ত্র সাধনা।

ছা। আপনি অনুরাগ বৃত্তিকে যে কয় প্রকারে ভাগ করিলেন তাহা আমি বড় ঠিক ধারণা করিতে পারিলাম না।

শি। ভালবাসার দুটি অঙ্গ, একটি বিরহ ও অন্যটি মিলন; বিরহে ভিতরে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, মিলনে সেই চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি হয়। প্রীতিতত্ত্ব আলোচনা

করিবার জন্য নিজের ভিতরের চাঞ্চল্য কখন কিরূপ মিলনে শান্তিভাব পায় তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবে।

যখন দেখিবে যে শরীরে কোন রোগ নাই অথচ অন্তর চঞ্চল হইতেছে এবং কোন না কোন কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনায় সেই চাঞ্চল্য নিবারিত হইল তখন উহাকে প্রাণময় কোষের চাঞ্চল্য বুঝিবে। কিন্তু যখন তাহাতেও চাঞ্চল্য থামে না কিন্তু রূপ দর্শন বা সঙ্গীতাদিতে ব্যাপৃত থাকায় সে চাঞ্চল্য মিটিয়া যায় তখন উহাকে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য বলিয়া বুঝিতে হইবে; যখন তাহাতেও আকাঙ্ক্ষা মিটে না, নিজের সংকল্পানুযায়ী অপর কাহাকেও চালাইতে ইচ্ছা জন্মে—এবং তাহা না করিতে পারিলে বিরক্তি জন্মে—তখন মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু যখন দাস দাসী পুত্র কলত্র বন্ধু সকলেই তোমার সংকল্পানুযায়ী চলিতেছে অথচ নিজের কল্পনায় নিজে আর তৃপ্ত হইতেছ না—একটা জ্ঞান পিপাসা ভিতরে উদয় হইয়াছে, কাহার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিতে পার, সেই অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছ তখন বুদ্ধির অনুরাগ উদয় হইতেছে বুঝিতে হইবে। শেষে সেই অনুরাগ উৎকর্ষতা পাইলে ঈশ্বর প্রীতি জন্মে। বুদ্ধদেবের চরিত্র আলোচনা করিলে কি রূপ চাঞ্চল্যকে বুদ্ধির চাঞ্চল্য বলে তাহা বুঝা যায়।

ক্রমে ক্রমে নিম্নদিকের ভালবাসার চক্র হইতে উপরের চক্রে উঠিতে হয়, যিনি মাঝের কোন চক্রে বদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকেন তিনি ঈশ্বর প্রীতির আস্বাদ পাইতে সক্ষম হইবেন না। যদি ঈশ্বর প্রীতি কি তাহা শিখিতে চাও তবে প্রেমের যখন যে চক্রে পতিত হইবে তাহাতে আসক্ত হইও না নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে চেষ্টা কর। কি রূপে সেই চক্র হইতে উদ্ধার হইতে পার সতত তাহারই অন্বেষণ কর, সমত্বভাব ভিন্ন অন্য সকল প্রকার প্রেমে বৈরাগ্যই ঈশ্বর প্রীতির লক্ষণ। ঈশ্বর প্রীতি ভিন্ন আর সকল প্রকার প্রীতিই সাকার, সমত্ব ভাব ভিন্ন অন্য প্রেমচাঞ্চল্য উদ্দীপিত করিয়া যে উপাসনা করা যায় তাহা নিরাকার ঈশ্বরের কাছে পঁহুছায় না।

ছা। প্রীতি আবার সাকার নিরাকার কি?

শি। যাহার রকম ভেদ আছে তাহার ভিন্ন ভিন্ন আকার আছে, আর যাহা একাকার তাহাই নিরাকার। আ=সম্যক ক্রিয়তে অভিব্যঞ্জতে অনেন ইতি আকার। যাহা দ্বারা একটি পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক ভাবে ভাবা যায় তাহাই আকার। যেখানে পৃথকত্ব আছে তাহারই আকার আছে। ইংরাজী ফরম (form) কথাটি আর আকার কথাটির অর্থ একই রূপ। একজনের উপর তোমার যে আকারের ভালবাসা আর একজনের উপর সে আকারের ভালবাসা নাই, এইরূপ কথা যখন প্রয়োগ করি তখন এই অর্থ বুঝি যে তোমার ভালবাসার রকম ভেদ আছে, কিন্তু ঈশ্বর প্রীতির রকম ভেদ নাই, ঈশ্বর প্রীতি একাকার, যাহা একাকার তাহাই নিরাকার। দেখ বুদ্ধির কাজ বিভিন্নতার মধ্যে একতা অনুসন্ধান করা। প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন আকার সকল আলোচনা

করিয়া তাহাদের ভিতর যিনি একাকার দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি ঈশ্বর প্রীতি কি রূপ বুঝিতে পারেন।

এই সকল বুঝিয়া ঈশ্বরোপাসনার পথে অগ্রসর হইতে শিখ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

ইরেসমাস ডারুইন।

(বিবর্ত্তনবাদের আবিষ্কর্ত্তা)

There are more great men in the world than we know of—Max muller (quoted from memory)

পৃথিবীস্থ নানা প্রকার জীব, জন্তু, পতঙ্গ, উদ্ভিদ ইত্যাদি প্রথমেই তাহাদের বর্ত্তমান আকৃতি ও অবস্থা লইয়া সৃষ্ট হয় নাই। আদিতে কেবল একটী বা কয়েকটী মাত্র বীজ ছিল, যাহা হইতে ক্রমিক উন্নতি ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে এই সমুদয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। যেমন ডিম্বেতে পক্ষী শাবকের সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিণতি ও বিকাশ—তাহার চক্ষু, কর্ণ, ডানা, সুন্দর সুন্দর পাখা ইত্যাদির মূল নিহিত থাকে তেমনি এক অথবা ততোধিক আদি বীজে এই পৃথিবী গত সময়ে যাহা ছিল, এখন যাহা এবং পরে যাহা হইবে—তাহার হেতু বর্ত্তমান ছিল। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাই বিবর্ত্তনবাদের (যাহার ইংরাজী নাম theory of Evolution) মূল সত্য। কিন্তু এই কথাগুলি সাহসের সহিত প্রচার করিবার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদিগকে অনেক দেখিতে শুনিতে হইয়াছে, অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছে। হঠাৎ কোন দৈবঘটনা ক্রমে কাহারও মনে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বৈজ্ঞানিকেরা যতদুর পারিয়াছেন যত রকম প্রাণী ও যত রকম উদ্ভিদ আছে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। কেবল তা নয়; অনেক যুক্তি তর্কের পর তাঁহাদিগকে উপয়োক্ত মীমাংসাতে উপনীত হইতে হইয়াছে। আমরা যত সহজে তাহা উল্লেখ করিলাম, বাস্তবিক "বিবর্ত্তন বাদ" তত সহজ নয়। সম্পূর্ণ রূপে কারণাদি প্রদর্শন করিয়া এই মত বিবৃত করিতে কেবল অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন ডারুইন অথবা তাঁহার সুযোগ্য টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হক্‌স্‌লিই পারেন। এমন কি, সাধারণতঃ সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকা সকলেতে বিবর্ত্তনবাদ যে রূপ বিস্তৃত যদিও অনেকাংশে অসম্পূর্ণ ও অবোধগম্য ভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পারাও আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। তবে আসল বিষয় অবতারণা করিবার জন্য মোটামোটি ভাবে কিছু বলা গেল।

সকলে যাঁহাকে বিবর্ত্তনবাদের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া জানে, তাঁহার নাম চার্লস ডারুইন। এই শতাব্দার প্রারম্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেই দিন মাত্র ৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পর অনেকে হয়ত বলিবেন "ইরেসমাস ডারুইন বিবর্ত্তনবাদের আবিষ্কর্ত্তা! তিনি আবার কে?"

জগতের কোন আবিষ্ক্রিয়াই কোন এক জন লোকের—তাঁহার বুদ্ধি শক্তি ও বিদ্যা হাজার অসামান্য হউক না কেন—একচেটিয়া গৌরবস্থল নহে। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রত্যেক বিষয়ে যদিও এক একটী সত্য এক একজন মহাপুরুষের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী এক বা অধিক লোকের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তবে যে একজনই ঐ সত্যের উদ্ভাবন কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহার কারণ এই যে তাঁহার পূর্ব্ব সাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও তাহা অন্যকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার প্রচুর ক্ষমতা ছিল না। সচরাচর আমরা কি দেখিতে পাই? এক কথাই অনেক লোকে জানে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার, কি গ্রন্থ রচনা করিবার শক্তি কেবল দুই এক জনের আছে। অমুক স্কুলের অমুক শিক্ষক খুব বিদ্বান লোক বটেন। কিন্তু ছেলেদিগকে কোন একটা বিষয় ভাল করিয়া বুঝান' তাঁহার পক্ষে মুস্কিল। অমুক উকীল আইন বেশ বুঝেন। কিন্তু সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারে না, যেহেতু বিচারপতির সমক্ষে গিয়া তিনি নিজ বিদ্যা খাটাইতে পারেন না। বিজ্ঞান এবং সাহিত্যেও সেইরূপ।

কিন্তু কেবল এই বুঝাইবার শক্তি বলেই যে একজন লোক আর একজন লোকের সমান বিদ্বান হইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ হয় তাহা নহে। ইহার অন্য কারণও আছে। এই দুই জন যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোক হয়, তাহা হইলে ইহা সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্যান্য সুবিধা সমান থাকিলেও যিনি পরবর্ত্তী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জন অপেক্ষা; কেবল সময়ের দরুণই বেশী সুবিধা। অগ্রবর্ত্তী জন যাহা বাহির করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী জন তাহা বিনা আয়াসে পাইয়া আরও নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে থাকেন। প্রতিভার জোরেও অনেকটা হয়।

এই সকল নানা কারণে, কোন সত্যের আদি আবিষ্কর্ত্তা যে কে মানুষ তাহা ভাল করিয়া জানিতে পারে না। যদিও সেই এক জ্ঞান বাহির করিতে অনেকে খাটিয়াছেন ও কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন, তথাপি তাহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন ও যাঁহার অন্যকে বুঝাইবার শক্তি আছে, তিনিই একমাত্র প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন।

বিবর্ত্তনবাদের ইতিহাসে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। এই মহাসত্যের প্রকৃত পিতা Erasmus Darwin। কিন্তু তাঁহার মতগুলি পদ্যচ্ছন্দে লিখিত হওয়াতে লোকে কবিতার রসাস্বাদন করিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছে। অতি অল্প লোকই তন্নিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক

মতামতের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে। তাঁহার সময়ের বড় বড় পণ্ডিত লোকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার গ্রন্থ সমূহকে কবির কল্পনা-প্রসূত কাব্য ছাড়া অধিক কিছু মনে করিতেন না।

ইরেসমাস ডারুইনকে এই কবিতা লেখন-প্রিয়তার জন্য অনেক ভোগিতে হইয়াছে। কিন্তু তবুও তাঁহারে ভাগ্য ভাল যে বর্ত্তমান সময়ে লোকে যাঁহাকে বিবর্ত্তন বাদ আবিষ্কার করিবার গৌরব দেয়, তিনি ইরেসমাসের পৌত্র বই আর কেহ নন। এবং পৌত্র ডারুইন এমন সদাশয়, সচ্চরিত্র এবং ন্যায়বান ছিলেন যে তিনি আপনা আপনি পিতামহের মহত্ত্বের কথা শত মুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই আরো আমরা এই প্রবন্ধের যে নাম দিয়াছি, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। বরং যাঁহারা ইরেসমাসকে তাঁহার যথার্থ প্রাপ্য দিতে চান, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে চার্লস তাঁহা অপেক্ষা অনেক অংশে বড়। "পিতামহ যাহা কাচের ভিতর দিয়া দেখিয়াছিলেন, পৌত্র তাহা সাক্ষাৎ চোখের সাম্নে দেখিয়াছেন"।

ইরেসমাস ডারুইন যে কেবল বিজ্ঞানে তাঁহাদের সময়ের লোকদের 'অগ্রবর্ত্তী ছিলেন তা নয়। তাঁহার দৈনিক জীবন ও কার্য্যে এই অগ্রবর্ত্তীত্ব আরো অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইত। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার আমিষ ভক্ষণ ও মদ্যপানের প্রতি নৈতিক বিদ্বেষ ছিল। মদ্যপান কোন সময়েই করেন নাই, বড় হইয়া মাছ মাংসও ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিয়মিত রূপে নিরামিষভোজী হইয়াছিলেন। বিলাতের, কেবল বিলাতের কেন পশ্চিম জগতের লোকেরা, এই শেষোক্ত আত্মত্যাগের জন্য কোন সময়েই বড় প্রসিদ্ধ হন নাই। এখন যে সেদিকের সংবাদ পত্রে আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে এত লেখালেখি হইয়া থাকে, তবুও মাছ মাংস খায় না এমন লোকের সংখ্যা অতি অল্প, ইরেসমাসের সময়ের ত কথাই নাই। এমতাবস্থায় তাঁহার এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের ভাব দেখিয়া বাস্তবিকই আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয় ও ভক্তিরসে হৃদয় পূর্ণ হয়।

কিন্তু ইরেসমাসের গুণের কথা এখনও ফুরায় নাই। ইংরাজ ও ইয়ুরোপের অন্যান্য জাতির মধ্যে এখনও নগর অথবা গ্রামের চতুঃসীমানার মধ্যে মৃত দেহ কবর দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক বলিয়া তিনি তদ্বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। এ ছাড়া পাগল লোকদিগের প্রতি দয়ালু ব্যবহার, স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন ইত্যাদির ঔচিত্য, ও উপকারিত্ব গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতে তিনি যাবজ্জীবন উদ্যমশীল ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার কৃত এক পুস্তিকা জার্ম্মেণ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। জার্ম্মেণ দেশবাসীরা তাঁহাকে এ বিষয়ে Authority বলিয়া মানিত। তাঁহার উক্ত মত সকল নিজ পরিবারে কার্য্যে পরিণত করিতে ইরেশমাস এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপন কন্যাদিগকে সাঁতার শিক্ষা দিতেন।

রাজনীতিতে তিনি ঘোর সংস্কারবাদীছিলেন—ইংরাজীতে যাহাকে Radical বলে। তাঁহার ধর্ম্মমতও অত্যন্ত উদার ও উন্নত ছিল। তিনি যীশু খ্রীষ্টের দেবত্বে বিশ্বাস না করিয়া স্বকৃত গ্রন্থ সকলের নানাস্থানে কেবল এক মাত্র পরমেশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ইহা দেখিয়া গোঁড়া লোকগুলি তাঁহার উপর এত চটিয়াছিল যে তাহারা তাঁহাকে নাস্তিক বলিতে সঙ্কুচিত হইত না আজ কাল যেমন ইউনিটেরিয়ানদিগকে বলে।

ইংলণ্ড, এবং ইয়ুরোপের অন্যান্য স্থানের বড় বড় লোকদিগের মধ্যেও তাঁহার অনেক বন্ধুছিলেন। প্রতিবাসীরাও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিত। কিন্তু ইরেসমাস সর্ব্বাপেক্ষা গরিব দুঃখীদের অধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে দানশীল এই আখ্যা দিত।

লিচফিল্ড নামক এক লোকবিরল স্থলে তিনি ডাক্তারি করিতেন, এখানে তাঁহার বিস্তর পসার হয়। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ তাঁহার পারদর্শীতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে লণ্ডন নগরে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ধন মান কিছুতেই ইরেসমাসের আসক্তি ছিল না। এ সকল পরিমিত পরিমাণে পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল লোকের নিকট লণ্ডনের কোলাহল অপেক্ষা লিচফিল্ডের নির্জ্জনতা অধিক ভাল লাগিত।

ইরেসমাস ডারুইন ৭০ বৎসর (১৭৩১ ১৮০২) বৎসর জীবিত ছিলেন। চার্লস ডারুইন তাঁহার তৃতীয় পুত্র রবার্ট ডারুইনের সন্তান। উপযুক্ত দাদার উপযুক্ত নাতি।

এক জন জার্ম্মেন সুলেখক ইরেসমাস ডারুইনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"আমি অচিরেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে এই মহাপুরুষ যিনি একাধারে দরিদ্রের বন্ধু, চিকিৎসক, প্রকৃতিতত্ত্ববিদ, দার্শনিক এবং কবি ছিলেন, ভবিষ্যৎবংশীয়েরা তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা করেন নাই। এই নানা গুণের মধ্যে যাহা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয় তাহাই তাঁহার সমসাময়িকেরা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। একশত বৎসর পরে এখন আমরা তাঁহার একজন বংশধরের পরিশ্রমের গুণে, জীবতত্ত্বে তাঁহার কতদূর গভীর ও সূক্ষ্ম দর্শন ছিল তাহা প্রকৃত পক্ষে জানিতে সক্ষম হইতেছি। তাঁহার পৌত্রের ন্যায় তাঁহাতেও অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসা ও জীবতত্ত্ব জ্ঞানস্পৃহা বিদ্যমান ছিল। এবং ইহা বলিলে কিছুই অন্যায় বলা হয় না যে পৌত্র পিতামহ-রক্ষিত জ্ঞান-সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হইয়াছেন * এবং তিনি যে কার্য্য প্রণালী (programme) ঠিক করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন।

* এই কথাগুলি যখন লিখিত হয়, তখন চার্লস ডারুইন জীবিতছিলেন।

"ছোট ডারুইন যে যে বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার প্রায় সকল বিষয়েই বড় ডারুইনের গ্রন্থে এক এক অধ্যায় আছে ... ... তিনিই প্রকৃত পক্ষে বিবর্ত্তনবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা।"

—— :•: ——

কুমার ভীমসিংহ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

মিবারের রাণা রাজসিংহ, একাকী বিশ্রাম কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়াছে, মহারাজের আদেশ মতে ভৃত্যেরা একটি দীপ মাত্র প্রজ্জলিত রাখিয়া গৃহের অন্য দীপাবলী নিভাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে মৃদু আলোক প্রশস্ত ঘরে এমন একটি স্নিগ্ধতা আনিয়া ফেলিয়াছে যে তাহাতে স্নাত হইয়া মহারাজের এতক্ষণকার চিন্তা গুলিও ক্রমে স্নিগ্ধ বেশ ধারণ করিয়াছে। কুমার জয়সিংহের রাজ্যাভিষেকের দিন নিকটে,—প্রজারা এঘটনাটি কিরূপ চিত্তে গ্রহণ করিবে, একথা আর তাঁহার মনে নাই, উৎসবের দিন সকলের কিরূপ আনন্দ হইবে, সকলের অর্থাৎ জয়সিংহের মাতার সে দিন কিরূপ হর্ষের উচ্ছ্বাস হইবে, জয়সিংহ কিরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে—অন্য কথা ভুলিয়া মহারাজ এখন কেবল এই রকম কথাই ভাবিতেছেন। হঠাৎ গৃহ দ্বারটি অল্পে অল্পে মুক্ত হইয়া গেল, মহিষী কমল কুমারী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া রাজা যেন বিস্মিত হইলেন, ভটস্থ ভাবে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া তাঁহাকে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহিষী পার্শ্বে আসিয়া বসিলে বলিলেন—"একি এ সময়ে যে?"

মহিষী বলিলেন—"না আসিয়া কি করি? ডাকিলেত আর দেখা পাই না" রাজা একটু অপ্রস্তুত হইলেন, আজ দিনের মধ্যে দুই তিন বার মহিষী তাঁহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন—তাহা মনে পড়িয়া গেল; আস্তে আস্তে বলিলেন—"মহিষি, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" মহিষী মনে মনে বলিলেন—"আমার কপাল ক্রমে অনেক দিন ভুলিয়াছ—সে কি আর আজ নূতন"—কিন্তু মুখে আর সে কথার কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া বলিলেন—"মহারাজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। যা গুজব উঠিয়াছে তাহা কি সত্য?" একেবারে উত্তরটা দিতে কেমন মহারাজের বাধিয়া গেল, বলিলেন—"কি গুজব?"

মহিষী। "শুনিতেছি তুমি থাকিতে তোমার সিংহাসন জয়সিংহ অধিকার করিবে, কথাটা কি সত্য? তাহা হইলে এ যে দেখিতেছি মুসলমানের রাজ্য হইয়া পড়িল"।

জয়সিংহের প্রতি এ কটাক্ষটা রাজার ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন—"কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। জয়সিং সিংহাসন অধিকার করিতেছে না, আমার সিংহাসন আমি তাহাকে দান করিতেছি" মহিষী একটু তীব্র হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তুমি দিতেছ? ইহারি মধ্যে? কেন এত শীঘ্র বনে যাইবার সময় হইয়াছে কি?" রাজা উৎসারিত ক্রোধ সবলে দমন করিয়া বলিলেন।" "মহিষি ইহাতে হাসির কিছুই নাই, রাজা হইলে অনেক বিবেচনা করিয়া, অনেক ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কাজ করিতে হয়, ভাবিয়া দেখ রাজার উপর কত শত পরিবারের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আমি থাকিতে থাকিতে রাজ্যের একটা বন্দবস্ত করিয়া না গেলে শেষে এই অধিকার লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বাধাইয়া রাজ্য ছারখার করিয়া তুলিবে"।

মহিষী। "কিন্তু আমি ত বুঝিতেছি, তুমি ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ মিটাইতে গিয়া, বিবাদের সূত্রপাত করিয়া দিতেছ, রাজ্য রক্ষা করিতে গিয়া রাজ্য ছারখার করিবারই বন্দবস্ত করিতেছ। তুমি থাকিতে যদি পুত্রকে রাজা করাই বিধেয় মনে কর তবে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা না কর কেন? তাহার ন্যায্য অধিকার অন্যায় রূপে হরণ করিয়া সে সিংহাসনে কনিষ্ঠকে বসাও কি বলিয়া"?

কথাগুলি বড় সত্য, কিন্তু রাজার শুনিতে ভাল লাগিল না, অনেক সময় সত্য কথা শুনিতে বড় কষ্ট কর। রাজা বিরক্তির ভাবে বলিলেন—"ভীমসিংহ ও জয়সিংহ এত অল্প সময়ের ছোট বড় যে সে জন্য জ্যেষ্ঠ বলিয়া ভীমসিং রাজ্য দাওয়া করিতে পারে না। দুই জনে একই দিনে জন্মিয়াছে, একই সময়ে জন্মিয়াছে বলিলেও বেশী বলা হয় না, এরূপ স্থলে তাহাদের মধ্যে যে যোগ্য অধিক তাহারি রাজ্যে অধিকার। আমি জয়সিংহকেই অধিক উপযুক্ত মনে করি।"

রাণী হাসিয়া বলিলেন—"তুমি দেখিতেছি কালের নিয়ম উলটাইয়া ফেলিতে চাও, নহিলে ছোটকে ছোট না বলিয়া সমান বলিবে কেন? মুখের মধ্যে তোমার কথায় কালের নিয়ম ভাঙ্গিবে না। এক দণ্ড দূরে থাক, এক মুহূর্ত্ত আগেও যে জন্মিবে সেও বড়র অধিকার লইয়া জন্মিবে। লব কুশ ত যমজ ভ্রাতা, তবে লবই কেন পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইলেন? আর জিজ্ঞাসা করি—মহারাজ, জয়সিংহ ভীমসিংহ হইতে উপযুক্তই বা কিসে? শৌর্য্যে বীর্য্যে বুদ্ধি সততায় কিসে ভীমসিংহ জয়সিংহের উপরে? কাহার সাহসে সৈন্যগণ বশীভূত? সভাসদেরা কাহার সততার মুগ্ধ? প্রজারা কাহাকে তাহাদের রাজা রূপে বরণ করিতে চায়? সকলকে জিজ্ঞাসা কর কে উপযুক্ত শুনিতে পাইবে। তবে যদি তোমার প্রিয়মহিষীর পুত্র ও প্রিয় পুত্র বলিয়া জয়সিংহ উপযুক্ত হয় ত বলিতে পারি না।" এই বিদ্রূপ রাজার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইল—তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন "তবে তাই" রাণীও ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"ওকথা তবে স্পষ্ট না বলিয়া পাঁচ রকম কথার ভাণ কর কেন? রাজা হইয়া সত্য কথা বলিতে ভয় হয়

নাকি"? রাজা বলিলেন—"কে আমাকে আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে—আমি তাহার কাছে সত্য লুকাইয়াছি।" মহিষী বলিলেন—"কুমারদের জন্ম দিনের কথা মনে পড়ে কি?" বলিতে বলিতে মহিষীর কথা বাধিয়া গেল, আর বলিতে পারিলেন না, মুহূর্ত্তে বিশ বৎসর যেন পিছাইয়া পড়িল, সেই দিনকার ঘটনা নূতন হইয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। সেদিনকার সরলা বিশ্বস্তহৃদয়া অভিমানিনী বালিকা-বধূতে আর আজিকার এই প্রৌঢ়া, স্বামী প্রেম-বঞ্চিতা, দলিত-প্রাণা রাজরাণীতে কত তফাৎ। আজিকার এ মর্ম্মাহত গর্ব্বিত কমল কুমারী নয়—সে দিন যেন আর এক কমল কুমারী—নব প্রসূত সন্তান কাছে করিয়া—প্রেমপূর্ণ উৎসুক-হৃদয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, প্রসবের যন্ত্রনা আর তাঁহার মনে ছিল না, পুত্র মুখ দেখিয়া স্বামী কতনা আহ্লাদিত হইবেন—কিরূপ উৎফুল্ল হৃদয়ে নাজানি তিনি নবশিশুকে ক্রোড়ে লইবেন—এই ভাবিয়া হৃদয়ে সুখের উৎস বহিয়া যাইতেছিল। কিন্তু যখন পল গেল, দণ্ড গেল, স্বামী আসিলেন না, তখন সে সুখ কষ্টে পরিণত হইল, মহিষী ম্রিয় মান, কাতর হইয়া পড়িলেন। দুই দণ্ড পরে এক জন দাসী আসিয়া বলিল—"রাণী চঞ্চল কুমারীর এই মুহূর্ত্তে এক পুত্র হইল, মহারাজ তাহার পদে অমর কবচ বাঁধিয়া দিতেছেন। সেইখান হইতে এখানে আসিবেন।"

জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার পদে অমর কবচ বাঁধিয়া দেওয়া মিবার-রাজকুল পদ্ধতি। ইহা দ্বারা পিতার, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার ভবিষ্য-উত্তরাধিকারী বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কমল কুমারী যখন শুনিলেন—জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিবর্ত্তে অন্যায়রূপে কনিষ্ঠের পায়ে তিনি সেই কবচ বাঁধিয়াছেন—তখন একটি তীব্র কষ্টে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, মাতার অশ্রুজলে সে দিন নবশিশুর প্রথম অভিষেক হইল। মহিষী সেই প্রথম বুঝিলেন স্বামীর হৃদয়ে আর তাঁহার স্থান নাই, স্বামী তাঁহাকে ভাল বাসেন না। আগে কখন কখন মনে এরূপ সন্দেহ যে আসে নাই তাহা নহে, কিন্তু নিমেষে তাহা চলিয়া গিয়াছে, এই সন্দেহের জন্য আপনাকে দোষী ভাবিয়া শেষে আপনাকেই তিরস্কার করিয়াছেন—কিন্তু আজ সে সন্দেহ সত্যরূপে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল, মর্ম্মাহত হইয়া মহিষী মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন। স্বামী যখন পুত্রকে দেখিতে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কমল কুমারী একটি কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া উঠিল। ইহার কিছু দিন পরে একটা গুজব শুনিলেন যে মহারাজ জানিয়া শুনিয়া কনিষ্ঠকে কবচ পরান নাই, ভৃত্যদের কথার গোলমালে চঞ্চলকুমারীর পুত্রই অগ্রে জন্মিয়াছে বুঝিয়া ভুল ক্রমে তাহাকে কবচ পরাইয়াছেন। একথা সত্য কি না তাহা কিন্তু কমল কুমারী এপর্য্যন্ত কখনো রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। যাহার ভাল বাসায় বিশ্বাস নাই, যাহার কাছে গেলে নূতন কষ্টের কারণ পাইয়া হৃদয় ব্যথিত হইয়া পড়ে, তাহাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে মনের বল থাকে কি? যতবার তিনি একথা তুলিতে গিয়াছেন তাঁহার এত কষ্ট হইয়াছে যে ততবারই তিনি সে কথা অন্য দিনের জন্য রাখিয়া

অন্য কথা বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এত দিন পরে যখন কবচ বন্ধনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না, যখন শুনিলেন সত্যই জয়সিংহকে মহারাজ সিংহাসন দিতেছেন, তখন আর তাঁহার স্ত্রীর অভিমান মনে রহিল না, তখন তাঁহার কেবল মনে রহিল তিনি ভীমসিংহের মাতা, তাঁহার মত অভাগীর গর্ভে জন্মিয়া সে অভাগা সন্তান তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল! সেই দিন মহিষীর কষ্ট ক্রোধে পরিণত হইল, সেই দিন তিনি আর সকল ভুলিয়া সন্তানের পক্ষে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইয়া স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কিন্তু কথায় কথায় যখন আবার পুত্রের জন্ম ঘটনাটি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তখন হঠাৎ তিনি এমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার নয়নের ক্রোধ-জ্যোতি আবার অভিমানের অশ্রুজলে মলিন হইয়া গেল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহার সেভাব রহিল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্ম সম্বরণ করিয়া মহিষী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"তুমি যদি সত্য বলিতে না ডরাও তবে জেষ্ঠ পুত্রের প্রাপ্য কবচ কনিষ্ঠকে পরাইবার প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া লোককে অন্যরূপ বুঝিতে দিলে কেন?"

রাজা রাগিয়া বলিলেন—"আমি কখন কি ভাবিয়া কি কাজ করি—তাহা লোকের নিকট বলিয়া বেড়ান আমার একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। তবে লোকে যদি আমার মনের কথা আঁচিতে গিয়া এক বুঝিতে আর বুঝিয়া লয়—সে জন্য আমি দায়ী হইতে পারি না। লোকভয়ে সেদিন যদি সত্য কথা লুকাইতাম তাহা হইলে আজও লোকভয়ে জয়-সিংহকে রাজত্ব দিতে কুণ্ঠিত হইতাম। তখন যদি কোন রকমে লোকে ভুল বুঝিয়া থাকে, এখন সে ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমার রাজ্য আমি যাহাকে ইচ্ছা দিব—সে জন্য আমি লোকের ভয় করি না, লোকের তাহাতে কথা কহিবার অধিকারও নাই।"

মহিষীর আর সহ্য হইল না, শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলি-লেন—"না মহারাজ তাহা মনে করিও না, রাজ্য তোমার বলিয়া যাহাকে ইচ্ছা দিবার তোমার ক্ষমতা নাই, তুমি বিচারক বলিয়া অবিচার করিতে তোমার ক্ষমতা নাই, রাজা বলিয়া তুমি নিয়ম ভঙ্গ করিতে পার না, রাজা হইয়া যে নিয়ম ভঙ্গ করে যে অবিচার করে সে রাজা নহে, সে স্বেচ্ছাচারী, সে অধর্ম্মচারী। তাহার দান আর যে গ্রহণ করে করুক আমার পুত্র তাহা গ্রহণ করিবে না। নিজ বলে যখন সে তাহার প্রাপ্য-রাজ্য অধিকার করিবে তখনই এ রাজ্য তাহার। নহিলে তুমি দিতে চাহিলেও এখন তোমার হাত হইতে এ রাজ্য সে গ্রহণ করিবে না। কিন্তু মহারাজ তোমার এই অন্যায়া-চরণ হইতে যখন শত সহস্র নির্দোষী প্রজাদের রক্তে প্লাবিত হইয়া দেশ উৎসন্ন যাইবে, ভ্রাতৃ রক্তের কলঙ্কে মিবারের ভবিষ্যদ্বংশ চিরদিনের জন্য কালীমাখা হইয়া পড়িবে, তখন অন্যকে দোষী করিও না, তখন মনে থাকে যেন—তাহা তোমারি কার্য্যের ফল, তোমারি পাপের ফল। মহারাজ, যে সূর্য্য বংশের রাজা দশরথ সত্যের জন্য

ন্যায়ের জন্য প্রাণসম পুত্র রামকে বনবাস দিয়াছিলেন সেই সূর্য্য বংশে না তোমার জন্ম? আজ তুমি সে বংশের নাম ডুবাইলে—কিন্তু যত দিন আকাশে চন্দ্র সূর্য্য আছে, ততদিন অন্যায় দিয়া ন্যায়কে ডুবাইতে পারিবে না, সত্যের জয়ে বাধা দিতে তোমার ক্ষমতা নাই।”

সুস্পষ্ট ঘৃণার স্বরে কথা গুলি বলিয়া ধীর পদক্ষেপে গর্ব্বিতা রমণী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রে আর তিনি ভীমসিংহের সহিত দেখা করিলেন না, ভাবিলেন পরদিন তাঁহাকে সকল বলিবেন।

২

মহিষী চলিয়া গেলেন, তাঁহার তিরস্কার বজ্রের স্বরে রাণার মাথার মধ্যে অবিশ্রান্ত বাজিতে লাগিল—অবিশ্রান্ত তিনি শুনিতে লাগিলেন “যে বংশে দশরথ সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য প্রাণসম পুত্রকে বনবাস দিয়াছিলেন সেই বংশে নাকি তোমার জন্ম?” রাণার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মহারাজাধিরাজ রাণা রাজসিংহ আজ ক্ষুদ্র শিশুর মত অধীর হইয়া বলিলেন “ছি ছি কি করিয়াছি সত্যের বংশে জন্মিয়া স্নেহের পদতলে ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়াছি? ভগবান! এই অকলঙ্ক সূর্য্যবংশে কালীদিবার জন্যই কি এই কুলাঙ্গারকে এ বংশে প্রেরণ করিয়াছিলে!

মহারাজের অন্ধ নয়ন আজ হঠাৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এতদিন তিনি একথা এরূপ করিয়া কখনো ভাবেন নাই, তিনি ভাবিতেন যখন ভীমসিংহ জয়সিংহ এক দিনেই জন্মিয়াছে তখন বড় ছোট হিসাবে কাহারো রাজ্যে অধিকার জন্মে নাই, তাঁহার রাজ্য তিনি যাহাকে ইচ্ছা দিতে পারেন। স্নেহে অন্ধ হইয়া তিনি যে ইহার আর এক দিক একেবারেই দেখিতেছেন না এ কথা তাহার মনেই আসে নাই, আজ অতি ভীষণরূপে সে ভ্রম সে মোহ তাঁহার ঘুচিয়া গেল। সমস্ত রাত রাজসিংহের নিদ্রা হইল না, সমস্ত রাত ছট ফট করিয়া তাঁহার কাটিয়া গেল। প্রভাত হইবা মাত্র প্রহরীকে বলিলেন—“যুবরাজ ভীমসিংহকে এখানে আসিতে বল” “যুবরাজ ভীমসিং!” প্রহরী আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তাহারা জয়সিংহকেই যুবরাজ বলিয়া জানে। সে যো হুকুম মহারাজ বলিয়া বাহিরে আসিয়া একবার আশ্চর্য্য ব্যঞ্জক ‘হুম’ করিয়া লইল, তারপর গুম্ফ জোড়ায় সজোরে তা দিতে দিতে ভীমসিংহের নিকট গমন করিল। পিতা ডাকিতেছেন শুনিয়া ভীমসিংহেরও আশ্চর্য্য লাগিল, তাঁহার কাছে, ইহা বড় নূতন। পিতা তাঁহাকে আর কোন দিন ডাকিয়াছেন বলিয়া কই মনে পড়ে না। ভীমসিংহ ভাবিলেন “এ আবার কি? জয়সিংহকে রাজা করিয়া আমাকে তাহার ভৃত্য করিবার প্রস্তাব হইবে নাকি? কিন্তু এ হস্তে অসি ধরিবার ক্ষমতা যতদিন থাকিবে ততদিন যে জয়সিংহ সিংহাসনে বসিবে না তাহা বুঝি এখনো তিনি জানেন না” পিতার পক্ষপাতিতা স্মরণ করিয়া

ভীমসিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, একবার ভাবিলেন—'যাইব না' আবার ভাবিলেন 'না পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না—তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আজ মুক্তকণ্ঠে মনের কথা প্রকাশ করিব"—ভীমসিংহ একরাশি ক্রোধ লইয়া পিতার নিকট আগমন করিলেন—কিন্তু যখন রাণার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, রাজমুখে অস্বাভাবিক বিষণ্ণতা দেখিতে পাইলেন, পিতার চিন্তাকুল নয়নের স্নেহ দৃষ্টি তাঁহার প্রতি স্থাপিত দেখিলেন,—তখন ভীমসিংহ সে ক্রোধ কোথায় ফেলিয়া দিবেন যেন ভাবিয়া পাইলেন না। ক্রোধ, প্রতিশোধস্পৃহা তখন তাঁহার নিমেষে লয় পাইয়া গেল, সমস্ত হৃদয়ে কেবল একটি কষ্টের ভাব দুঃখের ভাব বই তখন আর কিছুই রহিল না। ভীমসিংহের সেই ক্রোধহীন, প্রশান্ত, সম্মান-পূর্ণ ভাব দেখিয়া রাজা অবাক হইয়া গেলেন। তিনি এতক্ষণ যে ভীমসিংহকে দেখিবেন ভাবিয়া ছিলেন, সে ভীমসিংহকে না দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার অন্যায়ের বিচারক, বদ্ধ ভ্রুকুটি, ক্রুদ্ধ মুখ ভীমসিংহের পরিবর্ত্তে তাঁহার আপনার স্নেহময় বালক সন্তানকে পূর্ণ সম্মান ভরে অভিবা[illegible] করিতে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। পুত্রের সে সম্মান সে প্রশান্ততা সে ভক্তির ভাব রাণার হৃদয়ে যেরূপ অনুতাপের অনল জ্বালিয়া দিল—ভীমসিংহের সহস্র ভ্রুকুটি [illegible]গ্র ক্রোধও তাহা পারিত না। লজ্জায় [illegible]নুতাপে রাজা আর তাহার দিকে চাহিতে পারিলেন না, মুখ নত করিয়া লইয়া ধীরেধীরে বলিলেন—"বৎস ভীমসিংহ?" সেই স্নেহের স্বরে ভীম[illegible] চমকিয়া উঠিলেন। মহারাজ ত কখনো তাঁহাকে এরূপ আদর করিয়া ডাকেন নাই! এ পর্য্যন্ত তিনি পিতার কাছে অনাদরই পাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মনে আছে, বা[illegible]ক কালে এক দিন দুই ভাইয়ে উদ্যানে খেলা করিতেছিলেন, রাণা সেই উদ্যান দিয়া যাইবার সময় জয়সিংহকে আদর করিয়া গেলেন—কিন্তু তাঁহার সহিত একটি কথাও কহিলেন না, অভিমানী বালক সেখান হইতে চলিয়া গিয়া মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কতনা কাঁদিয়াছিল—কিন্তু কাঁদিবার কারণ মাকেও সে বলে নাই। তাহার পর বড় হইয়া পদে পদে পিতার পক্ষপাতিতা দেখিয়া আসিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাও রাণা জয়সিংহকে সিংহাসন দিবেন বলিয়া পূরাইয়া দিয়াছেন। ভীমসিংহের জন্য তাঁহার পিতার হৃদয়ে যে একবিন্দু স্নেহের স্থান আছে তাহা ভীমসিংহ এ পর্য্যন্ত মনেই করেন নাই—হঠাৎ এতদিনের পর আজ যখন পিতা স্নেহভরে ডাকিলেন—"বৎস ভীমসিংহ!" তখন তাঁহার হৃদয় তোলপাড় হইয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে ভীমসিংহ বলিলেন—"পিতঃ"। এতদিন তিনি মহারাজ বলিয়াই সম্বোধন করিয়া আসিয়াছেন। মহারাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বৎস আমি তোমার উপর অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি—আমাকে ক্ষমা কর"—ভীমসিংহের বীর নেত্র দিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িল, এ অশ্রু সন্তানের অভিমানাশ্রু। পিতা তাহার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছেন এত দিন পরে যে তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন, এত দিন পরে যে তিনি তাহাকে পুত্রের স্নেহ দিলেন—সেই আহ্লাদে তাঁহার অভিমান আর রহিল না।

এরূপ ভাব আগে কখনো তিনি অনুভব করেন নাই। উথলিত-চিত্তে তিনি মনে মনে বলিলেন—"পিতঃ তোমার স্নেহে সন্দেহ করিয়া এতদিন দূরে দূরে যদি না থাকিতাম তাহা হইলে কি সে স্নেহ হারাই পিতা? সে জন্য আমিই তোমার কাছে দোষী, তুমি আমাকে ক্ষমা কর"। ভীমসিংহকে নীরব দেখিয়া রাজা বলিলেন—"বৎস তুমি ক্ষমা করিতে না পার—আমি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আমার অন্তর-দেবতার নিকট, আমার ঈশ্বরের নিকট দোষমুক্ত হইব। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমার ন্যায্য অধিকার আমি তোমাকেই দান করিব, রাজ মুকুট তোমারি মস্তকে বৎস শোভিত হইবে। কিন্তু আমি দিলেও সম্মুখে একটি প্রতিবন্ধক, যাহা জয়সিংহের ন্যায্য প্রাপ্য নহে, আমারি দোষে সে তাহা পাইবার আশা করিতেছে, এখন হঠাৎ নিরাশ হইয়া সে অল্পে ছাড়িবে না—রাজ্য লোভে দেশ অরাজক করিয়া তুলিবে—ইহার প্রতিকার এক ভিন্ন অন্য নাই।"—বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি কোষমুক্ত করিয়া উঠাইয়া ধরিলেন। প্রভাত রশ্মি তাহার উপর চক চক করিয়া উঠিল, তিনি তাহা ভীমসিংহের হাতের কাছে ধরিয়া বলিলেন—"লহ বৎস—এই অসি তাহার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া এস। এক জনের রক্তে শত শত প্রাণীর রক্ত পাত নিবৃত্তি হউক, অন্যায়ের পতনে নির্ব্বিবাদে ন্যায়ের জয় হউক। বৎস শিহরিয়া উঠিও না, কঠোর কর্ত্তব্যের নিকট পিতা মাতা ভাই ভগিনী পত্নী পুত্র স্নেহ মমতা কাহারো স্থান নাই"—রাজসিংহের স্বর কাঁপিয়া আসিল, এ সত্যের ভীষণতা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে আজ অনুভব করিতেছিলেন। ভীমসিংহ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজের মনের দারুণ অবস্থা ছবির মতন তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল, কর্ত্তব্যের জন্য তিনি যে আপনার অধিক স্নেহের ধনকে বিসর্জ্জন দিতেছেন—তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, পিতার সে উদারতা, সে মহত্ত্ব পুত্রের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল—তাঁহার পিতৃভক্তি সহস্র গুণে বাড়িয়া উঠিল, ভীমসিংহ বুঝিলেন, রাণা যে অসি জয়সিংহের বুকে বিঁধাইতে দিতেছেন তাহা প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নিজের বুকেই বিঁধাইতে দিতেছেন। মুখে আর ভীমসিংহের কোন কথা ফুটিল না, মনে মনে বলিলেন—"পিতা তুমি দেবতা।"

রাজসিংহ পুত্রকে নীরব দেখিয়া আবার বলিলেন—"বৎস শিহরিয়া উঠিও না; এ হত্যায় পাপ নাই, ন্যায়সিদ্ধির জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য তুমি একাজ করিতেছ—যদি ইহাতেও পাপ হয়, সে পাপ তোমার নহে, সে পাপ আমার। আমার আদেশে তাহা তুমি সম্পন্ন কর"। ভীমসিংহের কথা ফুটিল—ভীমসিংহ পিতার হস্ত হইতে অসি লইয়া তাঁহার চরণতলে রাখিয়া বলিলেন—"পিতঃ অসি ফিরাইয়া লউন—ইহাতে আমার আবশ্যক নাই। আপনি আমার প্রতি যে অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, আপনার কর্ত্তব্য আপনি পূর্ণমাত্রায় পালন করিয়াছেন—এখন আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিব, আমা হইতে যাহাতে রাজ্যের একবিন্দু শোণিত পাত

না হয়, যাহাতে কণা মাত্র পাপ চিন্তাও জয়সিংহকে স্পর্শ না করে তাহাই আমার কর্ত্তব্য, তাহাই আমি করিব। আপনি আজ আমাকে যে অধিকার দান করিলেন—আমার সেই অধিকার আমি আজ জয়সিংহকে দান করিলাম। আজ হইতে রাজ্য ন্যায্য রূপে তাহার হইল। এখানে থাকিলে কি জানি যদি মোহবশত কখনো রাজ্যে লোভ আসিয়া পড়ে—আমি মিবার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আজ আপনি যে স্নেহ দিয়াছেন, যে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন সেই দুর্লভ সম্পত্তি হৃদয়ে লইয়া আমি আজই জন্ম ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইব—ইহার যদি অন্যথা হয় ত আমি আপনার সন্তান নহি,"।

রাণাকে কথা কহিবার—বাধা দিবার সময় না দিয়া ভীমসিংহ পিতৃচরণ স্পর্শ করিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন—মহারাজ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেই দিনই ভীম সিংহ স্বহস্তে জয়সিংহকে রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া তাঁহার প্রিয় সৈন্য সামন্ত দলবল লইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—আর কখনো ফিরিয়া আসিলেন না। অনেক দিন পরে তাহার সঙ্গীরা অনেকে মিবারে ফিরিয়া আসিল কিন্তু তাঁহাকে লইয়া নহে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ লইয়া।

সমাপ্ত।

হেঁয়ালি নাট্য।*

নিমন্ত্রণ সভায়. চণ্ডীচরণ বাবু ও কেবলরাম।

কেবল রাম। মশায় ভাল আছেন?

চণ্ডী। "ভাল আছেন" মানে কি?

কেবল। অর্থাৎ সুস্থ আছেন।

চণ্ডী। স্বাস্থ্য কা'কে বলে?

---

* হেঁয়ালি বাহির করিবার নিয়ম এই; সমস্ত হেঁয়ালি নাট্যটার মধ্যে এমন একটা কথা রাখা হয়, যাহা দুই তিন ভাগে ভাগ করিলেও প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ পাওয়া যায়। যেমন—মনে কর পাগোল শব্দ। এই শব্দকে পা এবং গোল এই দুই ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে একটা অর্থ থাকে। এখন হেঁয়ালি নাট্যের মধ্যে স্থানে স্থানে কোথায় পা শব্দ কোথাও গোল শব্দ, এবং কোথাও বা পাগল শব্দের সমস্তটা ব্যবহার করা যায়। ইহা হইতে আসল কথাটি আন্দাজ করিয়া পাঠকদের বুঝিয়া লইতে হইবে।

গত বারের বালকের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর 'নানা'। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ পুণ্ডরীক ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

কেবল। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেম মশায়ের শরীর গতিক—

চণ্ডী। তবে তাই বল। আমার শরীর কেমন আছে জান্‌তে চাও। তবে কেন জিজ্ঞাসা করেছিলে, আমি কেমন আছি? আমি, আর আমার শরীর কি একই হল?

কেবল। আজ্ঞে না, এক কে বল্লে?

চণ্ডী। তবে? তবে কেন জিজ্ঞাসা করলে আমি কেমন আছি। আমি কে আগে সেইটে বল।

কেবল। আজ্ঞে, আপনি চণ্ডীচরণ বাবু।

চণ্ডী। সে বিষয়ে গুরুতর তর্ক উঠ্‌তে পারে।

কেবল। তর্ক কেন উঠ্‌বে! এ কথা সকলেই জানে। আপনি বরঞ্চ আপনার পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌বেন।

চণ্ডী। একটা কথা উঠ্‌লে তোমরা কেবল তার পল্লব গ্রহণ করে ক্ষান্ত থাক, তার মূল অনুসন্ধান করে দেখ না। নাম জিনিষটা কি? নাম তুমি কাকে বল?

কেবল। (বহু চিন্তার পর) নাম হচ্চে মানুষের পরিচয়ের—

চণ্ডী। নাম কি কেবল মানুষেরই আছে, অন্য প্রাণীর নাম নেই!

কেবল। ঠিক কথা। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর পরিচয়ের—

চণ্ডী। কেবল মানুষ এবং প্রাণীর ছাড়া আর কিছুর নাম নেই? বস্তুর নাম নেই?

কেবল। ঠিক বলেচেন—মানুষ, প্রাণী, এবং বস্তুর—

চণ্ডী। কেবল কি তাই? শব্দ, স্বাদ বর্ণ প্রভৃতি অবস্তুর কি নাম নেই?

কেবল। তা ও ত বটে! মানুষ, প্রাণী, বস্তু এবং শব্দ স্বাদ, বর্ণ, প্রভৃতি অবস্তুর—

চণ্ডী। এবং—

কেবল। আরও "এবং" আছে?

চণ্ডী। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির—

কেবল। এবং আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির—

চণ্ডী। এবং যাবতীয় পরিবর্ত্তনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার—

কেবল। এবং যাবতীয় পরিবর্ত্তনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার—

চণ্ডী। এবং—

কেবল। (কাতর হইয়া) "এবং" না বলিয়া এইখানে একটা "ইত্যাদি" বলা যাক্ না।

চণ্ডী। আচ্ছা, ইত্যাদিই বল। এখন সমস্তটা কি দাঁড়াল' শুনি!

কেবল। (মাথা চুল্‌কাইয়া) আমার স্মরণ নেই। তবে মর্ম্মটা কতকটা বলবার চেষ্টা কর্ত্তে পারি।

চণ্ডী। আচ্ছা তাই বল।

কেবল। নাম হচ্চে, মানুষের এবং অবস্তুর, না বস্তু, না বস্তু এবং অবস্তুর, এবং

যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন—না না ভিন্ন ভিন্ন যাবতীয়—না—যাবতীয় কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন, কিম্বা যাবতীয় অবস্থা কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন এবং যাবতীয় অবস্থা কিম্বা ঠিক তার বিপরীত—দূর হোক্ সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্চে—বড় বড় বাঙ্গলা কথা আমার মুখে ঠিক আসে না। এক কথায়, নাম হচ্চে মানুষের এবং প্রাণীর এবং—দূর কর—মানুষের এবং প্রাণীর এবং ইত্যাদির পরিচয়ের উপায়।

চণ্ডী। কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক ওঠে। পরিচয় কাকে বলে?

কেবল। (ব্যাকুল ভাবে) আমি কিছু জানিনে; মশায় বলুন।

চণ্ডী। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ কিম্বা অপদার্থের প্রভেদ অবগত হয়ে তাদের স্বতন্ত্র করে জানা। এই ঠিক কি না?

কেবল। হাঁ, এইত ঠিক কথা!

চণ্ডী। তুমি তা হলে অস্বীকার করচ না।

কেবল। আজ্ঞে না।

চণ্ডী। যদি অস্বীকার কর, তা হলে এ সম্বন্ধে গুটিকত তর্ক আছে।

কেবল। না আমি কিছুমাত্র অস্বীকার কর্‌চি নে!

চণ্ডী। মনে কর যদিই কর।

কেবল। (ভীত ভাবে) আজ্ঞে না, মনে করতেও পারিনে।

চণ্ডী। তুমি না কর, যদি আর কেউ করে!

কেবল। কারও সাধ্যনেই যে করে। এমন দুঃসাহসিক কে আছে।

চণ্ডী। আচ্ছা এটা যেন স্বীকার করলে; তার পরে; নামই যদি পরিচয়ের একমাত্র উপায় হবে, তবে কি আমার চেহারা আমার পরিচয়ের উপায় নয়? আমার অন্যান্য নানা লক্ষণ আমারি পরিচয়ের উপায় নয়?

কেবল। আমি আজ সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেচি যে, নাম কা'কে বলে তা আমি কিছুমাত্র জান্‌তুম না। আপনি অনুগ্রহ করে বলে দিন।

চণ্ডী। ভাষার দ্বারা স্বতন্ত্র পদার্থের স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দিষ্ট করবার একটি কৃত্রিম উপায়কে বলে নামকরণ। একথা যদি অস্বীকার কর—

কেবল। না, আমি অস্বীকার করিনে।

চণ্ডী। কেবল তর্কের অনুরোধে যদি অস্বীকার কর—

কেবল। তর্কের অনুরোধ কেন বাবার অনুরোধেও অস্বীকার করতে পারিনে।

চণ্ডী। এর কোন একটা অংশও যদি অস্বীকার কর!

কেবল। একটি অক্ষরও অস্বীকার কর্ত্তে পারিনে।

চণ্ডী। এই মনে কর, "কৃত্রিম" কথা সম্বন্ধে নানা তর্ক উঠ্‌তে পারে!

কেবল। ঠিক তার উল্টো, ঐ কথাতেই সকল তর্ক দূর হয়ে যায়।

চণ্ডী। আচ্ছা, তাই যদি হল তাহলে এস এস এখন মীমাংসা করা যাক্, আমার নাম কি?

কেবল। (হতাশ ভাবে) আপনিই মীমাংসা করুন। আমার ক্ষিধে পেয়েছে।

চণ্ডী। আমার শত সহস্র নাম আছে, তার মধ্যে কোন্ নামটা তুমি শুন্‌তে চাও!

কেবল। যেটা আপনি পছন্দ করেন।

চণ্ডী। প্রথমে বিচার কর্ত্তে হবে কিসের সঙ্গে আমার প্রভেদ নির্দ্দেশ কর্ত্তে চাও। যদি পশুর সহিত আমার প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তে চাও তবে আমার নাম মানুষ। যদি শ্বেত পীত প্রভৃতি পদার্থের সহিত আমার প্রভেদ নির্দ্দেশ কর্ত্তে চাও, তবে আমার নাম—

কেবল। কালো।

চণ্ডী। না, শামলা। যদি ছেলের সঙ্গে আমার প্রভেদ নির্দ্দেশ কর্ত্তে চাও, তবে আমার নাম—

কেবল। বুড়ো।

চণ্ডী। না, মধ্যবয়সী। যদি রোগার সঙ্গে চাও তবে আমার নাম—

কেবল। মোটা।

চণ্ডী। না দোহারা।

কেবল। তবে চণ্ডীচরণ কার নাম মশায়।

চণ্ডী। একটি মনুষ্য বিশেষের মধ্যে, একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মনুষ্য-বিশেষের মধ্যে, একটি পূর্ণযৌবন হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্য বিশেষের মধ্যে এবং উক্ত উজ্জ্বলশ্যাম পূর্ণযৌবন হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়া যে সকল পরিবর্ত্তন অহরহ সংঘটিত হইতেছে, সেই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে একটি সজ্ঞান ঐক্য বিরাজ করিতেছে, তাহাকেই একদল লোক চণ্ডীচরণ নামে নির্দ্দেশ করে।

কেবল। মশায়, বেলা বিস্তর হল, অত্যন্ত ক্ষুধানুভব হয়েছে, এবং আহারও প্রস্তুত, চলুন আহার কর্ত্তে যাওয়া যাক্।

চণ্ডী। রোস, (হাত চাপিয়া ধরিয়া) এখনো আসল কথাটার মীমাংসা হল না। তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলে, আমি ভাল আছি কি না। এখন প্রশ্ন এই, তুমি কি জান্‌তে চাও? আমার অন্তর্গত প্রাণী কেমন আছে জান্‌তে চাও না মনুষ্য কেমন আছে জান্‌তে চাও, না—

কেবল। গোড়ায় কি জানতে চেয়েছিলুম তা বলা ভারি শক্ত। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা কয়ে এখন এইরকম অনুমান হচ্চে যে, আপনার "সজ্ঞান ঐক্য" কেমন আছেন এইটে জানাই আমার অভিপ্রায় ছিল।

চণ্ডী। অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে।

কেবল। আমার অপরাধ হয়েচে, মাপ করুন, আমি খেতে যাই, আহারের পূর্ব্বে এরকম প্রশ্ন আমি আপনাকে আর কখনও জিজ্ঞাসা করব না।

চণ্ডী। (মনোযোগ না করিয়া) "আমি ভাল আছি কি না" জিজ্ঞাসা কর্‌লে প্রথমে দেখা আবশ্যক—আমি কে, তার পরে দেখা আবশ্যক ভাল মন্দ কাকে বলে। তার পরে স্থির কর্‌তে হবে আমার সম্বন্ধে ভালই বা কি আর মন্দই বা কি। তার পরে দেখতে হবে, বর্ত্তমানে যা ভাল তা—

কেবল। মশায়। আপাততঃ আমার ক্ষিধে পেয়েছে আমাকে ছেড়ে দিন। বরং "আপনি কেমন আছেন" এ কঠিন প্রশ্নের জবাব আপনি কবে দিতে পারবেন একটা দিনস্থির করে দিন—আমি যে নিতান্ত ব্যস্ত হয়েছি তা নয়—আড়াই সপ্তাহ পরে দিলেও চল্‌বে এবং না দিলেও আপত্তি করব না। আজ আমার অপরাধ হয়েছে ক্ষমা করুন, আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন ভবিষ্যতে এরকম কঠিন প্রশ্ন আপনাকে আর কখনও জিজ্ঞাসা করব না।

গান অভ্যাস।

রে স্বর কোমল হইলে রে না লিখিয়া রি লিখিতে হইবে। গা স্বর কোমল হইলে গা না লিখিয়া সেই স্থলে গ লেখা যাইবে। ধা স্বর কোমল হইলে ধা না লিখিয়া ধ লিখিতে হইবে। নী কোমল হইলে দীর্ঘ নী'র পরিবর্ত্তে নি লিখিতে হইবে। ম স্বর কড়ি হইলে ম না লিখিয়া মা লিখিতে হইবে।

মধ্য সপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন থাকিবে না, উপরের সপ্তকের স্বরের মাথায় কসি থাকিবে এবং নিম্ন সপ্তকের স্বরের নীচে কসি থাকিবে।

গানের পদের একেকটী ভাগের পর একেকটি দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে এবং একেকটি পদের পর দুইটী করিয়া দাঁড়ি থাকিবে। একেকটি স্বর যতগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকিবে ততগুলি কসি চিহ্ন তাহার পার্শ্বে স্থাপিত হইবে। অর্দ্ধ মাত্রার স্থলে কসির পরিবর্ত্তে বিন্দু চিহ্ন বসিবে। সহজে একটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে তাহাকে এক মাত্রা কাল কহে। তালের—১, ২, ৩, ০, যথাস্থানে স্বরের মাথার উপরে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

গানের যে অংশটুকু দুই বিন্দুযুক্ত দাঁড়ির মধ্যে (॥ঃ ঃ॥) লিখিত হইবে তাহা দুইবার করিয়া গাহিতে হইবে।

যে স্বরের নীচে হসন্ত চিহ্ন থাকিবে সেই স্বর স্পর্শ করিয়া যাইতে হইবে মাত্র।

"তুমি হে ভরসা মম" এই গানটীর তাল ঝাঁপতাল। ইহাতে চারিটি করিয়া তাল

থাকে। ইহার প্রত্যেক ভাগে দুটী তাল থাকে এবং সেই দুটী তাল পাঁচটি মাত্রা লইয়া থাকে। প্রথম ও তৃতীয় তাল প্রত্যেকে তিনটী মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ তাল প্রত্যেকে দুইটী মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। *

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম, অকুল পাথারে; আর কেহ নাহি যে, বিপদ ভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে।

এক তুমি অভয় পদ জগত সংসারে; কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে।
করিয়ে দুখ অস্ত সুর্বসন্ত হৃদে জাগে, যখনি মন আঁখি তব জ্যোতি নেহারে।
জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা, তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে।

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
ম—গ—রে—রে—রে—। ম০রে০ম০রে০ম—পা—পা—। (সানিধানি)— —নি০ধা০
তু মি হে ভ র সা ম ম অ কূ ল

০ ১ ২ ৩ ০ ১
নি—পা—। ম—গা—ম—গা০ম০পা—ঃ॥ ম—গ—গ—রে—রে—। ম—গ—রে—
পা থা রে আ র কে হ না হি

২ ৩ ০ ১ ২
সা— —। সা—সা—নী—সা—রে—। সা০নি০ধা০নি০নি০ধা০নি—পা—। ম—নি—
যে বি প দ ভ য় বা রে এ আঁ ধা

৩ ০ ১ ২ ৩ ০
নি০ধা০নি—পা—। ম—গা—ম—গা০ম০পা—। ম—গ—রে—রে—রে—। ম০রে০
রে যে তা রে তু মি হে ভ র সা

১ ২ ৩ ০ ১
ম০রে০ম—পা—পা—। (সানিধানি)— —নি০ধা০নি—পা—। ম—গা—ম— — —।
ম ম অ কু ল পা থা রে

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
পা০ম০পা—পা—পা—ধা—। নী—নী—সা—সা—সা—। সা—নী—সা—রে—গ্সা—।
এ ক তু মি অ ভ য় প দ জ গ ত সং

০ ১ ২ ৩ ০ ১
সা—নি—নি০ধা০নি— —। ধা০পা০ধা—পা—পা—ধা—। নী—নী—সা—সা—সা—।
সা রে এ ক তু মি অ ভ য় প দ

---

* পূর্ব্বে বালকে গান অভ্যাসের সঙ্কেত বিস্তারিত রূপে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতীর পাঠকগণ সম্ভবতঃ সে সঙ্কেত পড়েন নাই, তাই তাঁহাদের সুবিধার জন্য সেই বিস্তারিত সঙ্কেত সংক্ষেপে এইখানে এবার সমাবিষ্ট হইল। যদি তাঁহাদের বুঝিবার পক্ষে এ সঙ্কেত সুস্পষ্ট হয় নাই এমন বুঝিতে পারি ত অন্য বারে বালক হইতে সেই বিস্তারিত সঙ্কেতটি পুনঃ প্রকাশিত করা যাইবে।

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
সা—নী—সা—রে—গ্‌সা—। সা—নি—নি০ধা০নি০পা০—। পা—সা—নী—সা—
জ গ ত সং সা রে কে ম নে ব

০ ১ ২ ৩ ০
রে—। (সানিধানি)— —ধা—পা—ম—। পা০ধা০নি০সা০নি০ধা০নি—পা—। ম—
ল দী ন ন্দ ন ছা ড়ে তো মা

১ ২ ৩ ০ ১
গা—ম—গা০ম০পা—। ম—গ—রে—রে—রে—। ম০রে০ম০রে০ম—পা—পা—।
রে তু মি হে ভ র সা ম ম অ

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
(সানিধানি)— —নি০ধা০নি—পা—। ম—গা—ম— — —॥ ॥ঃ পা—সা—নী—সা—
কু ল পা থা রে ক রি য়ে ছ

০ ১ ২ ৩ ০ ১
রে—। (সানিধানি)— —ধা—পা—পা—। ম—গ—গ—গ—ম—। রে— —সা— — —॥ ঃ॥
খ অ স্ত সু ব স স্ত হৃ ন্দে জা গে

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
সা—সা—রে—রে—রে—। ম০রে০ম০রে০ম—পা—পা—। নি০ধা০নি—নি০ধা০নি—
য খ নি ম ন আঁ খি ত ব জ্যো তি

০ ১ ২ ৩ ০ ১
পা—। ম—গা—ম—গা০ম০পা—। ম—গ—রে—রে—রে—। ম০রে০ম০রে০ম—
নে হা রে য খ নি ম ন আঁ খি

২ ৩ ০ ১ ২
পা—পা—। নি০ধা০নি—নি০ধা০নি—পা—। ম—গা—ম— — —। পা০ম০পা—
ত ব জ্যো তি নে হা রে জী

৩ ০ ১ ২ ৩ ০
পা—পা—ধা—। সা০নী০সা—সা—সা— —। সা০নী০সা—গ০রে০গ—রে—। সা—
ব ন স খা তু মি বাঁ চি না তো মা

১ ২ ৩ ০ ১
নি—নি—নি—ধা০নি০। ধা০পা০ধা—পা—পা—ধা—। সা০নী০সা—সা—সা— —।
বি না জী ব ন স খা তু মি

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
সা০নী০সা—গ০রে০গ—রে—। সা—নি—নি—নি০ধা০নি০পা০। পা—সা—নী—
বাঁ চি না তো মা বি না তৃ ষি ত

০ ১ ২ ৩
সা—রে—। (সানিধানি)— —ধা—পা—ম—। পা০ধা০নি০সা০নি০ধা০নি—পা—।
ম ন প্রা ণ ম ম ডা কে তো

০ ১
ম—গা—ম—গা০ম০পা—॥
মা রে।

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

দ্রৌপদী।

দশ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদী চরিত্র সমালোচনা করিয়া ছিলাম। অন্যান্য আর্য্যনারী চরিত্র হইতে দ্রৌপদী চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথা সাধ্য দেখান গিয়াছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ত্ব, তাহার কোন কথা সে সময়ে বলা হয় নাই। বলিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয় সে কথাটা বলা যাইতে পারে।

সে তত্ত্বটার বহির্বিকাশ বড় দীপ্তিমান্—এক নারীর পঞ্চস্বামী, অথচ তাঁহাকে কুলটা বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য কোথা হইতে হইল?

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়েরা বর্ব্বর জাতি—তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ পদ্ধতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চপাণ্ডবের একই পত্নী। ইউরোপীয় আচার্য্যবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক না থাকুক্ এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথা গুলা বলিতে বড় মজবুত।

ইউরোপায়েরা এ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে, যে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত, বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য জগতে আর কিছুই হইতে পারে না; আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নূতন নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থ গুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের তুলনায় উইলো কি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গা সিন্ধু গোদাবরীর তুলনায় গ্রীক কবিদিগের প্রিয় পার্ব্বতী নির্ঝরিনী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য সেইরূপ গ্রন্থ। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, গৃহ্যসূত্র, শ্রৌত সূত্র, ধর্ম্মসূত্র, দর্শন, এই সকলের ভাষ্য, তার টীকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরনীয় প্রাচীন-

তত্ত্ব সমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুনাক্ষরে এমন কথা নাই, যে প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন পণ্ডিত (Fergusson সাহেব) ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না—সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাসুরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই বলিতে ছিলাম—এই সকল পণ্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্য সংসারে দুর্লভ।

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইবার স্থূল তাৎপর্য্য কি, এ কথার মীমাংসা করিবার আগে বিচার করিতে হয়, যে এ কথাটা আদৌ ঐতিহাসিক, না কেবল কবি কল্পনা মাত্র? সত্য সত্যই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল, না কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন? মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝাইয়াছি। কিন্তু মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই ঐতিহাসিক ইহা সিদ্ধ হয় না। যাহা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, তাহা ঐতিহাসিক নহে—এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দ্রৌপদী চরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না—দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত! তা হোক—কিন্তু মৌলিক মহাভারতে যত কথা আছে সকলেই যে ঐতিহাসিক, এবং সত্য, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ। যে সময়ে কবিই ইতিহাস বেত্তা, ইতিহাসবেত্তাও কবি, সে সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রন বড় সহজ। সত্য কথাকে কবি স্বকপোলকল্পিত ব্যাপারে রঞ্জিত করা বিচিত্র নহে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন, ইহা না হয় ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করা গেল—তিনি যে পঞ্চপাণ্ডবের মহিষী ইহাও কি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এই দ্রৌপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ সমুদ্র মধ্যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীগণের বহুবিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না! বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য বিবাহ করিত এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পতির ভার্য্যা ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা গিয়াছে যে কোন মনুষ্যের প্রতি হস্তে ছয়টি করিয়া, দুই হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে কোন মনুষ্য চক্ষুহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে মনুষ্যজাতির হাতের আঙ্গুল বারটি, অথবা মনুষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে। তেমনি কেবলি দ্রৌপদীর বহুবিবাহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে পূর্ব্বে আর্য্যনারীগণ-মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর মহাভারতেই প্রকাশ, যে এরূপ প্রথা ছিল না, কেন না দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন অলৌকিক ব্যাপার কেন

ঘটিল, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মহাভারতকার পূর্ব্বজন্মঘটিত নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদৃশ সমাজে অত্যন্ত লোক নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাণ্ডবদিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে, কবি এমন একটা কথা, তত্ত্ববিশেষকে পরিস্ফুট করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে।

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর ঔরসে পঞ্চপুত্র ছিল। কাহারও ঔরসে দুইটি কি তিনটি হইল না। কাহারও ঔরসে কন্যা হইল না। কাহারও ঔরস নিষ্ফল গেল না। সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। কেহই বাঁচিয়া রহিল না। সকলেই এক সময়ে অশ্বত্থামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্য্যকারিতা নাই। সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহন কেমন জীবন্ত!

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি দ্রৌপদী একা যুধিষ্ঠিরের ভার্য্যা ছিলেন, তবে কি আর চারি পাণ্ডব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার উত্তর কঠিন বটে।

ভীম ও অর্জ্জুনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহা আমরা জানি কিন্তু নকুল সহদেবের অন্য বিবাহ ছিল এমন কথা মহাভারতে পাই না। পাই না বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, যে তাঁহাদের অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন পাণ্ডবের অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের জীবনী; অন্য দুই পাণ্ডব তাঁহাদের ছায়া মাত্র—কেবল তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করে। তাহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে সেটা প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন। কথাটা তাদৃশ মারাত্মক নহে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হওয়ার পক্ষে আমরা উপরে যে আপত্তি দেখাইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর।

এখন, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চ বিবাহ কবিরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কবি কি অভিপ্রায়ে এমন বিস্ময়করী কল্পনার অনুবর্ত্তী হইলেন? বিশেষ কোন গূঢ় অভিপ্রায় না থাকিলে এমন কুটিল পথে যাইবেন কেন। তাঁহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যদি ইংরেজদিগের মত বলেন "Tut! clear case of polyandry!" তবে সব ফুরাইল। আর তা যদি না বলেন, তবে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সেই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাস্পদ লেখকের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিব। কথাটা প্রচারে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র"কে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারত-প্রণয়নের পূর্ব্বকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটী অতি-মানুষ ঐশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বসিত হইয়াছিল; তাহাও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই মহাভারত গ্রন্থেও যে সেই বোধের একটী অপূর্ব্ব প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর। তবে আমাদের বোধ হয়, মহাভারতরচয়িতা কর্ম্মকাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রভৃতি তাঁহার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্জ্জুন এবং ভদ্রাকে আদর্শ-নর-নারী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরে অচলা ভক্তি এবং তজ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণে একটী বিশেষ ঐশী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে ঐশী শক্তিটী কোন পার্থিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি-কর্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কবি বাল্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই—মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং তাহা যত দূর সম্পন্ন হইতে পারে, তত দূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ ঐশী শক্তির নাম "নির্লিপ্ততা"। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী 'নির্লেপ'।"*

এই "নির্লেপ," বৈরাগ্য নহে অথবা সাধারণে যাহাকে "বৈরাগ্য" বলে, তাহা নহে। আমি ইহার মর্ম্ম যতদূর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইতেছি।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তুবিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের) বিষয় সকল উপভোগ করিয়া সংযতাত্মা পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

অতএব নির্লিপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বর্জ্জন নিষ্প্রয়োজন। এবং বর্জ্জনে সংলেপই বুঝায়। বর্জ্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে ইন্দ্রিয়ে এখন আত্মা লিপ্ত আছে—বর্জ্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগে থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগ শূন্য, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বিজিত করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নির্লিপ্ত। তাঁহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও দুঃখের অতীত।

এইরূপ "নির্লেপ" বা "অনাসঙ্গ" পরিস্ফুট করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন—নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্ত্তী পুরাণকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যবর্ত্তী করিয়াছেন। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের সাধন প্রণা-

* এডুকেশন গেজেট, ১৮ বৈশাখ ১২৯৩।

লীতে এত বেশী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর আবির্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সেই নির্লিপ্ত। দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ ধর্ম্মের মূর্ত্তি স্বরূপিনী। তৎ স্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য। তাই গণিকার ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসর্গযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা। পঞ্চ পতি দ্রৌপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু, এবং ধর্ম্মাচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ্য। যেমন প্রকৃত ধর্ম্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র—ঈশ্বরই জ্ঞানির নিকট এক মাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পঞ্চ স্বামী অনাসঙ্গযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট এক মাত্র ধর্ম্মাচরণের স্থল। তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই; তিনি গৃহধর্ম্মে নিষ্কাম, নিশ্চল, নির্লিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহাই দ্রৌপদী চরিত্রে অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য। তবে ঈদৃশ ধর্ম্ম অতিদুঃসাধনীয়। মহাভারতকার মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্বে সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় কথিত হইয়াছে যে দ্রৌপদীর অর্জ্জুনের দিগে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল বলিয়া তিনি সেই পাপ ফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন না—সর্ব্বাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন।

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায়, যে দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন? হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম; গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম্ম। পুত্র উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে, ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্ম্মার্থে নিষ্প্রয়োজনীয়—কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ফল মাত্র। কিন্তু দ্রৌপদী ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত; ধর্ম্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, স্বামিগণের সঙ্গে তাঁহার ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। স্বামীর ধর্ম্মার্থ দ্রৌপদী সকল স্বামীর ঔরসে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন; তৎপরে নির্লেপবশতঃ আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য্য।

এই সকল কথার তাৎপর্য্য বোধ করি কেহই এমন বুঝিবেন না যে যে স্ত্রীলোক অনাসঙ্গ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনুষ্যকে স্বামিত্বে বরণ করিবে—তাহা নহিলে ধর্ম্মের সাধন হইবে না। তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্রৌপদীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছিল বলিয়া, তিনি সেই মহাপাপকেও ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন।

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, যে দ্রৌপদী ধর্ম্মবলে অত্যন্ত দৃপ্তা; সে দর্প কখন কখন ধর্ম্মকেও অতিক্রম করে। সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়জয়ের কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হুগলির ইমামবাড়ী।

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যে সন্ধ্যায় মুন্না নৌকায় স্বামীর উদ্দেশে গমন করিতেছিল, সেই সন্ধ্যায় মহম্মদের নৌকা হুগলী হইতে তিন চার ক্রোশ দূরের একটি গ্রাম-তীরে আসিয়া লাগিল, ঝড় বৃষ্টিতে মাঝিরা কোন মতে নৌকা আর বেশী দূরে লইয়া যাইতে পারিল না। কিন্তু বাড়ীর এত নিকটে আসিয়া নৌকায় বদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকা মহম্মদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল, বাড়ী যাইতে তিনি এত অধীর হইয়া পড়িলেন যে ঝড় নিবৃত্তির জন্য কোন মতে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, সেই দুর্যোগের মধ্যেই নৌকা হইতে নামিয়া স্থল পথে বাড়ী যাত্রা করিলেন, ভাবিলেন হুগলিত এখান হইতে অধিক দূরে নহে, দ্রুতপদে চলিয়া অতি শীঘ্রই বাড়ী গিয়া পঁহুছিবেন। কিন্তু অল্পদূর গিয়াই তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল, বৃষ্টি বাতাসে প্রতিপদে বাধা পাইতে লাগিলেন, অন্ধকারে পথ বিপথ তাঁহার চক্ষে সব একাকার হইয়া যাইতে লাগিল। এই সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমে—তিনি যখন গৃহ দ্বারে আসিয়া পঁহুছিলেন—তখন প্রায় প্রভাত হইয়াছে। কিন্তু এখানে পঁহুছিয়া তাঁহাদের সেই পুরাতন পরিচিত বাড়ীটা যখন তাঁহার চোখে পড়িল—তিনি শ্রান্তি অবসাদ সকল ভুলিয়া গেলেন, বহুদিনের পর মুন্নাকে দেখিবার আনন্দে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, তিনি কম্পিত হৃদয়ে দ্রুত পদে মুন্নার গৃহে প্রবেশ করিলেন—কিন্তু মুন্না কোথায়! দেখিলেন তাহার শয্যা অমনি পড়িয়া আছে, অনেক দিন যেন তাহা কেহ স্পর্শ করে নাই, একটা কষ্টের বিদ্যুৎ—একটা ভীষণ দুশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয় দিয়া বহিয়া গেল,—তিনি সে ঘর ফেলিয়া আকুল হৃদয়ে অন্য ঘরে ঘরে মুন্নাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না, মহম্মদ বিদীর্ণ হৃদয়ে অজ্ঞানের মত ভোলানাথের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ভোলানাথও নাই, তাঁহার স্ত্রী মহম্মদকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া তিনি উন্মত্তের মত তৎক্ষণাৎ জাহাখাঁর বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বার দেশে হঠাৎ ভোলানাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ভোলানাথ দুই দিন পরে সেইমাত্র নবাব বাটী হইতে বাহির হইতেছিলেন। ভোলানাথ যদিও আগেই কারামুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু হইলে কি হয়, জাহাখাঁর অনুরোধে পড়িয়া তাহার পর এ দুদিন তাঁহার নবাব বাটীতেই থাকিতে হইয়াছিল—দুই দিন ধরিয়া জাহাখাঁ তাঁহার নিকট অনুতাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কাটাইয়াছিলেন। জাহাখাঁর সেই কষ্টের অবস্থায় তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া ভোলানাথ থাকিতে পারেন নাই, বিশেষ, মুন্না নিরাপদ জানিয়া তিনি মনে মনে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন।

হঠাৎ মসীনকে দেখিয়া তাঁহার কিভাব হইল বলা বাহুল্য। কিন্তু যখন মসীন তাঁহাকে মুন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক কষ্টে তাঁহার যখন হৃদয়ঙ্গম হইল যে মুন্নাকে পাওয়া যাইতেছে না, তখন তাঁহার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, "তাইত পাওয়া যাইতেছে না, সে কি কথা?" মসীন বলিলেন, "আর কি? জাহা খাঁ লুকাইয়া রাখিয়াছে" ভোলানাথ বলিলেন "সেও কি, হয়! এমন কাজ আর নবাব শা করিবেন না, শাস্তি তাঁর যথেষ্ট হইয়াছে।" এই অবসরে ভোলানাথ নবাবশার অনুতাপের কাহিনী মহম্মদকে বলিতে ছাড়িলেন না। দুঃখের বিষয় তাহাতে মসীনের সমস্ত সন্দেহ তিরোহিত হইল না। তিনি বলিলেন "জাহাখাঁর সহিত একবার দেখা না করিলে তাঁহার সে সন্দেহ মিটিবেনা।" ভোলানাথের সে কথা মনে লাগিল না, তাহার মনে হইল, মিছা সময় নষ্ট। তিনি একটু দৃঢ়তার স্বরে বলিলেন, "হুজুর বলেন কি, একবার দিদেন আমাকে বাড়ীটা খুজিতে দিন।" ভোলানাথের কেমন মনে হইতে লাগিল, মুন্না এতক্ষণ বাড়ীতে আসিয়াছেন। মজ্জমান ব্যক্তি তৃণ গাছটিও আঁকড়িয়া ধরে, ভোলানাথের কথায় মহম্মদেরও কেমন একটু আশার সঞ্চার হইল—ভাবিলেন "হয়ত তবে তাড়াতাড়ি বাড়ীটা ভাল করিয়া খোঁজা হয় নাই, হয়ত বা আবার গিয়া সেইখানেই তাহাকে দেখিতে পাইবেন।" মসীন ভোলানাথের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধার দিয়া তাঁহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন, বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া সহসা দুইজনে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। শীর্ণ বিবর্ণ এলায়িত কুন্তল, কেও রমণী বৃক্ষ তলে পড়িয়া? তাঁহারা দ্রুতপদে রুদ্ধশ্বাসে বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইবা মাত্র সন্ন্যাসীর তেজস্বী মুর্ত্তি নেত্রপথে পড়িল, গাছের ব্যবধান বশতঃ দূর হইতে এতক্ষণ তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। সন্ন্যাসী রুদ্ধ-শক্তিরন্যায় স্তম্ভিত ভাবে মুন্নার শিয়রে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন, তাঁহারা মুন্নার নিমীলিত নির্জীব মলিন মুখের পানে চাহিয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সুষুপ্ত মুখে কি বিশ্রামের ভাব! কি স্বর্গীয় প্রশান্তি! মহম্মদ মুন্নার মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া উঠিল, কতদিন আগে এক দিন বাসনার মোহে যে জাগন্ত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই স্বপ্ন মনে পড়িয়া গেল, আজ সে স্বপ্ন স্বপ্ন না, আজ তাহা সত্য ঘটনা। যাহা সত্য হইবার জন্য এত দিন প্রাণপণে প্রার্থনা করিয়াছেন, আজ তাহা সত্য হইল, আজ তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল,--কিন্তু কি নিদারুণরূপেই পূর্ণ হইল! হায়! তিনি কি এই দিনের জন্যই এতদিন লালায়িত হইয়াছিলেন? তিনি যে মুন্নার শান্তি চাহিয়াছিলেন, সে কি এই শান্তি? তিনি যে কতদূর হইতে ছুটিয়া মুন্নাকে দেখিতে আসিয়াছেন, সে কি মুন্নার এই মৃত মুখ? স্নেহময় ভ্রাতার প্রাণ একবার মৃত বোনের গলা ধরিয়া, কাঁদিয়া, আদর করিয়া ডাকিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল, যেন সে স্নেহের স্পর্শে সে স্নেহের ডাকে মৃত মুন্নাও সাড়া দিয়া

উঠিবে। অথচ মহম্মদ অবশের ন্যায় সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, মুন্নার নিকট অগ্রসর হইতে যেন তাহার ক্ষমতা নাই। কিছুক্ষণ পরে সন্যাসী বলিলেন, "বৎস মুন্নাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাও, এ নিদ্রা আপনা হইতে যতক্ষণ না ভাঙ্গে তোমরা ভাঙ্গাইও না, যখন এ নিদ্রা ভাঙ্গিবে মুন্না সবল সুস্থকায় হইয়া উঠিবে।" তবে কি মুন্না মৃত নহে—নিদ্রিত! সে কথা যেন মহম্মদের হৃদয়ঙ্গম হইল না, অতদূর আশা করিতে তাঁহার ভরসা হইল না। তিনি কেবল কাতর দৃষ্টিতে সন্ন্যাসির দিকে চাহিয়া রহিলেন—সন্ন্যাসী আবার বলিলেন—"বৎস মুন্নাকে তুলিয়া লইয়া যাও" মহম্মদ কিছু যেন না বুঝিয়া, শূন্য বাষ্পাকুল দৃষ্টিতে মুন্নার প্রতি একবার চাহিয়া তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

পঞ্চ ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

মুন্নার প্রথম ঘুম ভাঙ্গিবা মাত্র মসীনের স্নেহময় করুণ দৃষ্টি যখন তাহার চোখে পড়িল, তাহার স্থির কটাক্ষ সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল—বদ্ধান্ধকার শুষ্ক শীর্ণ মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,সে তখনি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, তাহার মনে হইল সে স্বপ্ন দেখিতেছে। মুন্নাকে জাগিতে দেখিয়া, তাহার মৃতপ্রায় দেহে জীবন ফিরিতে দেখিয়া, মসীনের আহ্লাদের সীমা রহিল না। গাছতলা হইতে যেদিন তাহাকে তিনি গৃহে আনিয়াছেন সেই দিন হইতে কত না আগ্রহের সহিত এই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন, সে দিন হইতে কত না আশঙ্কায়,কষ্টে,কত না উৎকণ্ঠায় দিন গুলো অতিবাহিত করিতেছেন! কত যুগ পরে যেন আজ সেই প্রত্যাশিত দিন আসিয়াছে, আহ্লাদে আকুল হইয়া তিনি মুন্না মুন্না করিয়া তাহার হাত দুইখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইলেন, এত দিন দুঃখের কান্না কাঁদিয়াছেন, আজ নেত্র দিয়া দর দর করিয়া আহ্লাদের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তাঁহার স্নেহের স্বরে, স্নেহের স্পর্শে মুন্না আবার চোখ মেলিল। আস্তে আস্তে বিস্ময়ের স্বরে বলিল "মসীন? একি স্বপ্ন দেখিতেছি," মসীন উদ্বেলিত স্নেহ ভরে আর একবার কেবল মুন্না মুন্না করিয়া উঠিলেন, মুন্নাও নীরব উথলিত হৃদয়ে তাঁহার মুখ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন তাঁহার কথা কহিবার শক্তি হইল, তখন মুন্নাও আত্মস্থ হইয়াছে,তখন তাহার আগেকার কথা মনে পড়িয়াছে, সেই রাত্রের ঝড় বৃষ্টি, তাহার স্বামীর ব্যবহার, তাহার একাকিনী অবস্থা—সে সকলই মনে পড়িয়াছে, তাহার পর? তাহার পর আরো একটা যেন স্বপ্ন স্বপ্ন—ধুঁয়া ধুঁয়া দৃশ্য তাহার চোখের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, অথচ তাহা কি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না। মুন্না স্বপ্নটা মনে করিতে চেষ্টা করিল, ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ যেন সমস্তটা তাহার মনে পড়িয়া গেল—মুন্না জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"মসীন—পিতা?" মুন্না জানিতে চাহে সে যাহা স্বপ্ন মনে

করিতেছে তাহা সত্যই স্বপ্ন—কি প্রকৃত ঘটনা। হঠাৎ সে প্রশ্নে মসীন থতমত খাইয়া গেলেন, মুন্নার এই অবস্থায় কি করিয়া তাহাকে পিতার মৃত্যুসংবাদ দিবেন? তিনি নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। মুন্না বলিল—"বুঝিয়াছি স্বপ্ন নহে—সকলি সত্য। আমার কাছে লুকাইবার আবশ্যক নাই আমি তোমাদের সকল কথা শুনিয়াছি।" মুন্না অবিচলিত কণ্ঠে, নিরশ্রু নেত্রে কথা কহিয়া গেল। মহম্মদ বুঝিলেন মুন্নার ঘুমন্ত অবস্থায় ভোলানাথের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল,তাহা মুন্না সকল শুনিয়াছে। কিন্তু তাহার সেই পাষাণ ভাব দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন, কাতর হইয়া পড়িলেন; আ-বার পাষাণ মূর্ত্তি কথা কহিল—মুন্না আপন মনে বলিল, "যে ভালবাসার উপর স্থায়ী বিশ্বাস বাঁধিয়াছিলাম তাহাও ত একটা স্বপ্নের মত ভাঙ্গিয়া গেল, তবে যাহা পাই নাই, তাহার জন্যই বা দুঃখ কি? পাইলেই বা কি হইত, আর একটা মিথ্যা বিশ্বাসকে জড়াইয়া থাকিতাম বই আর কিছুই নয়।" মুন্নার মনের যথার্থ অবস্থা মহম্মদ এইবার বুঝিতে পারিলেন,তাহার সেই ঘোর বৈরাগ্য তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল। তিনি বলিলেন—"মুন্না, এখানে যাহা মিলিলনা তাহা অন্যত্র গিয়া পাইবে। ভগবান্ চিরদুঃখ কাহারো অদৃষ্টে লিখেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার করুণাময় নামে দোষ জন্মে।"

মুন্না একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "তা কে জানে? কে জানে যে অন্যত্র গিয়াও এই মিথ্যা সুখ দুঃখ হাসি তামাসা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে না; যেমন এই জন্মের উপর আমার হাত ছিলনা, আপনার ইচ্ছায় আসি নাই, একটা অদৃষ্ট চক্রে পড়িয়া অনবরত অনিচ্ছা সত্বেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছি, কে জানে যে ইহার পরও আবার এইরূপ মিথ্যা বাসনা কামনা লইয়া হাহা করিয়া বেড়াইতে হইবে না;" মসীন যেন চমকিয়া গেলেন,মুন্না এ সব কোথা হইতে শিখিল! ধীরে ধীরে বলিলেন "তাহা যদি হয় তবে এই মিথ্যাই সত্য, তোমার আমার মত লোকের এ মিথ্যা হইতে ত্রাণ পাই-বারও শীঘ্র আশা নাই" মুন্না বলিল—অতি দৃঢ় বিশ্বাসের ভরে বলিল, "তাহা হইতে পারে না। সত্য আছে—জগতের পর পারে সত্য লুকাইয়া আছে, আমরা যাহা দেখিতেছি তা-হার বাহিরে আশা লুকাইয়া আছে, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া সংসারের সুখ দুঃখের বাহিরে গিয়া তবে তাহা লাভ করা যায়" খানিকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল, ওকথা যেন ঐখানেই শেষ হইল,—অনেকক্ষণ পরে মুন্না বলিল, "মসীন আমার কাছে কিছু লুকাইও না, যা কিছু আছে এখনি বল, আমি সকলি সহ্য করিতে পারিব।" মসীন সজল নেত্রে তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহার পীড়ার অবস্থা, তাঁহার মৃত্যু ব্যাপার আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, মুন্না যেন বজ্র দিয়া হৃদয় বাঁধি-য়াছে, নীরব নিস্পন্দভাবে সে সকল শুনিয়া যাইতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে যখন মহম্মদ একবার থামিলেন—তখন মুন্না একবার চোখ বুজিয়া দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "পিতা তুমি শান্তির আশ্রমে গিয়াছ, আমার অশ্রুজল যেন তোমার

সে সুখে আর ব্যাঘাত না দেয়" মুন্নার স্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল—মুন্না দৃঢ় ভাবে প্রাণ পণে উথলিত অশ্রুকে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল, যখন কৃতকার্য্য হইল, তখন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া মসীনের দিকে চাহিয়া বলিল, "তার পর তিনি কি বলিলেন?"

মসীন উত্তর করিলেন, "বলিলেন, 'বৎস মুন্নার দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা জানিতাম, জানিয়া তাহার অসময়ের জন্য কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছি। মুন্নাকে তখন একথা জানাইলে ইহাও জামাতার হাতে যাইবে—এই ভয়ে তখন তাহাকে ইহা জানাই নাই'।" মুন্নার পাংশু মুখ আরো পাংশু হইয়া উঠিল; মুন্না আর চ'খের জল রাখিতে পারিল না—মনে মনে বলিল—"মৃত্যুকালেও এই হতভাগী তোমাকে শান্তিতে মরিতে দেয় নাই পিতা -" আবার কিছুক্ষণ দুই জনেই চুপচাপ হইয়া পড়িলেন—তাহার পর মহম্মদ বলিলেন, "মুন্না, পিতা তোমাকে যে ক্ষা কবচ দিয়াছেন, তাহা কই? তিনি তাহা খুলিয়া দেখিতে বলিয়াছেন।" মুন্না বাহু হইতে তাহা খুলিয়া মসীনকে দিয়া বলিল, "তিনি যাইবার সময় এখানি দিয়া বলিয়া যান, তাঁহার অবর্ত্তমানে সহস্র বিপদের মধ্যেও ইহা আমাকে রক্ষা করিবে, যেন কখনো কাছ ছাড়া না করি। তাঁহার আজ্ঞা আমি পালন করিয়াছি, এ কবচ আমাকে রক্ষা না করুক সহস্র বিপদেও আমি ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। আজ আবার তাঁহার আজ্ঞাতেই ইহা উন্মোচন করিলাম।" মহম্মদ কবচখানি তুলিয়া লইলেন, উলটিয়া পালটিয়া তাহার চারিদিক দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, এক জায়গায় টিপিয়া খুলিবার একটা কল রহিয়াছে, তিনি তাহা টিপিয়া কবচের একদিক খুলিয়া ভিতরে একখানি কাগজ দেখিতে পাইলেন, বাহির করিয়া পড়িয়া দেখিলেন উহা একখানি দান পত্র, তাঁহার বাগানের একস্থানে বৃক্ষতলে স্বর্ণ মুদ্রা-পূর্ণ কতকগুলি কলস পোঁতা আছে ঐ পত্রে সে কথার উল্লেখ করিয়া তাহাই মতাহার মুন্নাকে দান করিয়া গিয়াছেন। পড়িয়া মহম্মদের মুখে হর্ষের ভাব ফুটিয়া উঠিল, মহম্মদ এখন নির্ধন, তাঁহার এই দৈন্য দশা মুন্নার আর একটা অসুখের কারণ হইবে মহম্মদের মনে এই বড় ভাবনা ছিল, আজ এই দানপত্র দেখিয়া তাহা দূর হইল—তিনি বলিলেন, "মুন্না তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দাও, অসহায়ের যিনি সহায় তাঁহারই এ করুণা।"

মুন্না শুষ্ক অধরে একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল—"ভাই অসহায়ের যিনি সহায়, তাঁহার যে কত করুণা, তাহা ধনহারা হইয়া আমি যেমন বুঝিয়াছি ধন থাকিতে তেমন বুঝি নাই। ঐশ্বর্য্যহীন হইয়া আমি যে শান্তি, যে অমৃত লাভ করিয়াছি সহস্র সম্পদও তাহা দিতে পারে না, তবে আজ এই সামান্য ধনের জন্য নূতন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ কি দিব? আমার ধন কাড়িয়া লইয়া তিনি আমাকে যে করুণা করিয়াছেন তাহার জন্য আমার সর্ব্বান্তঃকরণ তাঁহাকে আগেই দান করিয়াছি"।

মুন্না বলিতে বলিতে একবার দম লইতে থামিল, পরে বলিল—"মসীন, আমি ধনের প্রত্যাশী নহি। ধন রত্ন লইয়া আমি কি করিব? যেদিন একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে

দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিলাম, সেদিন হয়ত এই ঐশ্বর্য্য পাইলে সন্তুষ্ট হইতাম, কিন্তু সে দিন আর নাই, সে দিন যে ভিকারিণী ছিল আজ সে সন্ন্যাসিনী। ভাই ঐশ্বর্য্যে কি কাহাকে সুখী করিতে পারে, এতদিন কি আমাদের ঐশ্বর্য্য ছিল না? কিন্তু কত সুখী ছিলাম বল দেখি?" মহম্মদ কোন কথা কহিলেন না, তাঁহার মনে সুখ কি দুঃখ কি ভাব বহিয়া গেল কিছুই বোঝা গেল না—তিনি কেবল আশ্চর্য্য নেত্রে মুন্নার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুন্না বলিল—"ভাই তুমি এই ধন গ্রহণ কর, যাহা কিছু আমার মনে কষ্ট আছে, শান্তির মধ্যে যে কিছু অশান্তি আসিয়া আমাকে বেদনা দেয়, সে কেবল তোমার জন্য। ভাই তুমি এই অর্থে বাড়ী ঘর বিবাহ করিয়া সুখে থাক, সংসারে এই আমার একমাত্র ইচ্ছার অবশিষ্ট আছে।" বড় বড় দুই ফোটা জল মসীনের চোখ হইতে মাটীতে পড়িল, এ তাঁহার কষ্টের অশ্রু নহে, এ তাঁহার স্নেহ-হৃদয়ের আনন্দাশ্রু। তিনি বুঝিলেন মুন্না এত দিন পরে সত্য পথ পাইয়াছে, এখন আর সংসারের শোক তাপ তাহাকে পাড়া দিতে পারিবে না। এত দিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। মসীন কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"মুন্না তোর যা দশা, আমারও তাহাই হইবে। তুই সংসার ত্যাগ করিতে চাস্ আমারো সংসারে ইচ্ছা নাই, অনেক দিন হইতে আমার ভোগ তৃষ্ণা মিটিয়া গিয়াছে, সংসারে অনিচ্ছা জন্মিয়াছে, কেবল তোর জন্যই তবু এত দিন আমি সংসারী ছিলাম—তুই যদি সংসার ছাড়িতে চাস্ আমাকে বাঁধিয়া রাখিবার তবে কিছুই নাই, আমিও সংসার ছাড়িব, এ ধন যদি তোর না হয়, ইহা আমারো নহে, তবে ইহা দেবতার হউক।" সন্ন্যাসী র সৌম্যমূর্ত্তি সহসা তাঁহাদের নেত্র পথে পতিত হইল, তিনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

* * * *

তাহাই হইল, নব অধিকৃত ধনে সলেউদ্দীনের বন্ধকী বিষয় মুক্ত করিয়া লইয়া তাহা তাঁহারা ধর্ম্ম কার্য্যে অর্পণ করিয়া আপনারা ভ্রাতা ভগিনীতে সামান্য অবস্থায় ঈশ্বরের চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ভোলানাথও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। মুন্নার আর আকাঙ্ক্ষা রহিল না অতৃপ্তি রহিল না, তাহার হৃদয়ে মহাশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, সংসার হারাইয়া মুন্না হৃদয়ে স্বর্গ ধারণ করিল।

প্রতি দিন উষাকালে তাঁহারা নদী তীরে আসিয়া বসেন, ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠে, আবার সন্ধ্যা কালে নদীর পারে ডুবিয়া যায়, নদী গান করিতে করিতে জাগিয়া উঠিয়া গান গাহিয়া গাহিয়া সন্ধ্যাকালে আবার ঘুমাইয়া পড়ে, ফুল হাসিতে হাসিতে ফুটিয়া আবার হাসিতে হাসিতে শুকাইয়া যায়, তাঁহারা তিন জনে সেই অসীম সৌন্দর্য্য হৃদয় ভরিয়া পান করেন, প্রাণ ভরিয়া জগৎ সংসারকে ভালবাসা বিতরণ করেন, বিশ্বপাতার গুণ গান করেন—তাহার পর সন্ধ্যা হইলে গৃহে চলিয়া যান। যখন ভ্রাতা ভগিনীতে দুজনে শুদ্ধ প্রাণে শুদ্ধ পবিত্র মূর্ত্তি লইয়া একটি বৃক্ষ তলে আসিয়া বসেন সমস্ত স্থানটা এক অপূর্ব্ব বিশুদ্ধ গাম্ভীর্য্যে ছাইয়া পড়ে। তাঁহাদের দেখি বার জন্য কতদূর হইতে বালক

বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা ছুটিয়া আসে, তাঁহারা এখন জাতিকুলের অতীত, মুসলমান বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাদের স্পর্শ করিতে আর ভয় করে না। তাঁহারা সমস্ত প্রাণের সহিত আগন্তুকদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, কত ব্যথিত-হৃদয় তাঁহাদের সেই পবিত্র উপদেশে শান্তি পাইয়া, কত পীড়িত-দেহ তাঁহাদের হাতের পবিত্র স্পর্শে রোগমুক্ত হইয়া গৃহে গমন করে। মুন্না এইরূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পান করিয়া পরোপকারে প্রাণ ঢালিয়া—ঈশ্বরে জীবন দিয়া যে এক অসীম সুখ পাইয়াছে—তাহার সংসারী অবস্থার তীব্রতম সুখের সহিতও এসুখের তুলনা হয় না।

তাঁহাদের ন্যায় তাঁহাদের ধন ঐশ্বর্য্যও অনাথদিগের শান্তির উপায় হইল। সেই ধনে কত অতিথিশালা, কত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই ধনে শত শত দরিদ্রের জন্য বৃত্তি স্থাপিত হইল, সেই ধনে হুগলির ইমামবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইল। (হুগলির কলেজও গভর্ণমেণ্ট পরে মহম্মদ মসীনের সম্পত্তির টাকা হইতেই স্থাপন করিয়াছেন।) তাহার পর শত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে এখনও হুগলি, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মাদ্রেসাগুলি তাঁহার দানের টাকা হইতে চলিতেছে, এখনো কত শত ছাত্র কত গরীব তাঁহার টাকায় প্রতিপালিত হইতেছে, আর এখনো কারুকার্য্য-খচিত বিচিত্র ইমামবাড়ী উর্দ্ধমস্তকে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

উপসংহার।

উপসংহারে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের ইংরাজি বক্তৃতার সার অবলম্বনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহম্মদ মহসীনের যে বাঙ্গলা জীবন চরিত লিখিয়াছেন, 'হুগলির ইমামবাড়ি' লিখিবার সময় আমরা সেই বইখানি হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তবে পাঠকগণ আমাদের আখ্যায়িকার সহিত ঐ জীবন চরিতের আখ্যায়িকার অনেক স্থলে অমিল দেখিতে পাইবেন। উক্ত জীবন চরিতে দেখা যায় যে, মুন্না বিবাহিত হইয়া যত দিন সধবা ছিলেন স্বামীর সহিত বেশ সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, পরে বিধবা হইয়া পুত্রাদি না থাকায় মহম্মদকে বিষয়সম্পত্তির অভিভাবক করেন—ও মৃত্যুকালে তাঁহাকেই সমস্ত দান করিয়া যান। কিন্তু হুগলি নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট আমরা অন্যরূপ গল্প শুনিয়াছি, তিনি বলেন—"মুন্নার স্বামী বড় বিলাসপ্রিয় ছিলেন, সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া তিনি সমস্ত বিষয় উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, মতাহার তাহাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কন্যাকে শেষ দুর্দ্দশা হইতে বাঁচাইবার জন্য অবশিষ্ট লুকান সম্পত্তি মৃত্যুকালে তাবিজের ভিতর করিয়া দানপত্ররূপে কন্যাকে দিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পরে সত্যই যখন মুন্নার এমন অবস্থা আসিল যে তাহার ভিক্ষা করিতে হইল—তখন সেই অবস্থায় একদিন হঠাৎ তাবিজের ভিতর হইতে সেই দানপত্র বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু তখন তাহার মন এতই বৈরাগ্য-পূর্ণ হইয়াছে

যে সে তাহা গ্রহণ না করিয়া ভ্রাতাকে দান করিল। মসীন তাহা লইলেন বটে, কিন্তু তাহা ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য দান করিয়া তিনিও ভগিনীর ন্যায় ফকির বেশে তাহার সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন।

এই দুইটি গল্পের মধ্যে কোনটি সত্য তাহা জানি না, তবে শেষেরটিই নাকি জনপ্রবাদ। তাই আমরা 'হুগলির ইমামবাড়ী'তে শেষের গল্পটিই বদল সদল করিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী।

আশীর্ব্বাদ।

ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণ গুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

ছোট ছোট হাসি মুখ
জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি
কৌতুকেতে দুলি দুলি
চেয়ে চেয়ে দেখে চারিধারে।
সোনার রবির আলো
কত তার লাগে ভালো,
ভাল লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি
ধূলিরে জানে না ধূলি
সবই তার আপনার ধন।
কোলে তুলে লও এরে
এ যেন কেঁদে না ফেরে
হরষেতে না ঘটে বিষাদ,
বুকের মাঝারে নিয়ে
পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

তোমার কোলের কাছে
কত সাধে আসিয়াছে,
তোমা-পরে কতনা বিশ্বাস।
ওই কোল হতে খ'সে
এ যেন গো পথে ব'সে
একদিন না ফেলে নিশ্বাস।
নতুন প্রবাসে এসে
সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারিভিতে,
এত শত লোক আছে
এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।
যেথা তুমি লয়ে যাবে
কথাটি না ক'য়ে যাবে
সাথে যাবে ছায়ার মতন,

তাই বলি—দেখো দেখো
এ বিশ্বাস রেখো রেখো
পাথারে দিওনা বিসর্জ্জন!

ক্ষুদ্র এ মাথার পর
রাখ গো করুণ-কর,
ইহারে কোরো না অবহেলা!
এ ঘোর সংসার মাঝে
এসেছে কঠিন কাজে,
আসেনি করিতে শুধু খেলা!
দেখে মুখ শতদল
চোখে মোর আসে জল,
মনে হয় বাঁচিবে না বুঝি,
পাছে সুকুমার প্রাণ
ছিঁড়ে হয় খান্ খান্,
জীবনের পারাবারে যুঝি!

এই হাসিমুখ গুলি
হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ!
উহাদের কাছে ডেকে
বুকে রেখে, কোলে রেখে
তোমরা করগো আশীর্ব্বাদ।
বল, "সুখে যাও চোলে
ভবের তরঙ্গ দ'লে
স্বর্গ হতে আসুক্ বাতাস,—
সুখ দুঃখ কোরো হেলা
সে কেবল ঢেউ-খেলা
নাচিবে তোদের চারিপাশ!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

প্রদীপ (গীতি কবিতাবলী).
কনকাঞ্জলী (গীতি কাব্য) } শ্রী অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত।

অনেক দিন পরে কবির মধুর সঙ্গীত আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, অনেক দিন পরে কবিতা পড়িয়া আমাদের প্রাণ তৃপ্ত হইল।

অনেকেই কবিতা লেখেন বটে, কিন্তু কি করিয়া কবিতার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয় তাহা তাঁহারা জানেন না—তাই তাঁহাদের শুষ্ক নির্জ্জীব কবিতা পাঠকদিগের প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারে না; অক্ষয়কুমার বড়াল কবিতার জীবনসঞ্চারী সেই কৌশলটি জানিয়াছেন তাই তিনি কবি। তাঁহার কাব্য দুই খানি সাধারণ লয় তানে বাঁধা নহে, কবির প্রাণের সুরে বাঁধা তাই পাঠকেরা ইহাতে মুগ্ধ! কিন্তু কেবল সুর ভাল হইলেই যেমন গান ভাল হয় না, গানের রচনা ভাল হওয়া চাই, মূর্ত্তি জীবন্ত হইলেই যেমন চিত্র ভাল হয় না, তাহা সুন্দর হওয়া চাই, তেমনি যেমন তেমন করিয়া অসাজন্ত অমানন্ত ভাবে কতকগুলা ভাব একত্র জড় করিলেও কবিতা হয় না, ভাবগুলি সুন্দর ছবির আকারে পরিস্ফুট করিয়া তোলা চাই। কবি

হইতে গেলে চিত্রকরও হইতে হইবে। লেখক ভাবের চিত্রকর তাই ইনি কবি, ইহার অধিকাংশ কবিতাই ভাবের এক একটি ছবি।

এই ছবি আঁকিতে লেখকের যে আকুলি ব্যাকুলি, কবির মনের ভাব ভাষায় প্রকাশের যে আকুলতা, তাহাই এই কবিতার কবিত্ব, কবি ভাষায় যাহা না ফুটাইতে পারিয়াছেন, এই আকুলতায় তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কনকাঞ্জলীতে এই আকুলতা ফুলের সৌরভের ন্যায় অতি স্নিগ্ধ, বসন্তের বাতাসের মত ইহা পাঠকদিগকে উলসিত করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু প্রদীপের 'প্রেম গীতি' 'পুনর্ম্মিলনে' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির যে আকুলতা তাহা মধুর অথচ জলন্ত, কোমল অথচ তেজোময়, পাঠকের হৃদয়ে ইহার ঝাঁজ যেন অনেকক্ষণ লাগিয়া থাকে।

স্থান থাকিলে আমরা উভয় পুস্তক হইতেই এক একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে এইখানে উপহার দিতাম, কিন্তু স্থানাভাবে কনকাঞ্জলীর একটি ক্ষুদ্র কবিতা মাত্র এই খানে উঠাইয়া দিলাম।

অবশিষ্ট।

১

ধীরে ধীরে নেমে নেমে থামিয়া গিয়াছে গান,
বুকে ঘোরে পথহারা এখনো একটু তান!
কবিতা গিয়াছি ভুলে, ছুটোছত্র মনে দুলে!
মুছিয়া ফেলেছি অশ্রু,এখনো আকুল আঁখি!
অজানা নিশ্বাস পড়ে,শূন্যে চাই থাকি থাকি!
শুকায়েছে ফুল হার, একটু সুবাস তার,
থেকেথেকে কেঁপেকেঁপে এখনোউঠিছে বায়ে।
যে যাহার গেছে চলে,আমি পড়ে তরু তলে!
নিবিয়াগিয়াছেজ্যোৎস্না,আমিআঁধারেরছায়ে!

২

ডুবিল পশ্চিমে রবি, মেঘেতে সাঁঝের বেলা,
ছুটো শেষরশ্মি রেখা খেলেত মরণ খেলা!
আকাশে চন্দ্রমা হারা,পড়ে থাকে শুকতারা!
বিজলী চলিয়া যায়, কাঁদে মেঘ ঝরিঝরি!
বসন্ত চলিয়া যায়, থাকে শুষ্ক পাতা পড়ি!
স্বপন চলিয়া যায়, তন্দ্রা করে হায় হায়!
ভালবাসা চলে গেছে পড়ে আছে সুখ স্মৃতি
দুখ-অশ্রু জলে ঢাকা কল্পনা-কবিতাকৃতি।

সতী বিলাপ। শ্রীমাধবচন্দ্র মিত্র বিদ্যারত্ন প্রণীত।

সাধারণের ন্যায় যশোলিপ্সা কিম্বা কবিতা লেখার সাধমিটান এ পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য নহে, লেখকের উদ্দেশ্য গভীর;

সাবিত্রী সীতা দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাচীনকালের সাধ্বী ভারত রমণীগণের চরিত্র দৃষ্টান্ত সত্বেও "বিজাতীয় শিক্ষা বলে বিকৃত ভাবাপন্ন নরনারীগণের সংসর্গ ও তদীয় চরিতানুকরণবশতঃ ইদানীন্তন রমণীগণের অনেককেই বিলাসপ্রিয়তা ও অযথা আমোদ প্রমোদে যত তৎপর দেখা যায়, লজ্জালুতা পতিভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, অধর্ম্মে দ্বেষ ও গুরুজনের প্রতি সম্যক সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি স্ত্রীজনোচিত সদ্‌গুণ সমূহের আচরণে তত যত্ন দেখা যায় না—" "এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া" লেখক "সতী স্ত্রী কাহাকে বলে, তিনি পতির প্রতি কি রূপ আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করেন, স্বামীর সুখ ও দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া কিরূপ ধীরভাবে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন

করেন, এবং হাজার অবস্থা বিপর্য্যয়েও তাঁহার ভক্তি ও ভালবাসা কিরূপ অটল ও অবিকৃত থাকে, এবং পতি বিয়োগে তাঁহার কিরূপ বিষম অবস্থা উপস্থিত হয়, ইদানীন্তন নারীগণকে এইগুলি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি” লিখিয়াছেন। উদ্দেশ্যটি পড়িয়া আমরা বড় আশা করিয়া পুস্তকখানি খুলিয়াছিলাম--বলিতে কষ্ট হইতেছে—তেমনি নিরাশ হইয়া বইখানি বন্ধ করিতে হইল। সতী বিলাপের সতী স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু আদর্শ ভাব দেখিলাম না—যাহার দৃষ্টান্তে অন্য মহিলাদের চরিত্র উচ্চ হইতে পারে। লেথক তাঁহাকে যেরূপ করিয়া বিলাপ করাইয়াছেন—সাধারণ সকল স্ত্রীলোকেই তাহা করিয়া থাকে—তবে অসাধারণের মধ্যে, লেখকের সতী স্ত্রী গাছ, লতা, পাখী যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই ধরিয়া ধরিয়া আপনার দুঃখ জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবার জন্য মিনতি করিতেছেন—এবং বিলাপচ্ছলে আপনার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের পরিচয়টা দিয়া লইতেও কসুর করিতেছেন না—সাধারণ পতিশোকাতুরাদের মধ্যে এই অদ্ভূতত্ব টুক দেখা যায় না বটে। এই বিলাপ মাঝে মাঝে কিরূপ হাস্যকর হইয়াছে তাহা পাঠকেরা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারিবেন। সতী স্ত্রী এক স্থানে পাখীকে মিনতি করিয়া এইরূপে তাঁহার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

“বিক্রয় করিতে যদি হয় অলঙ্কার
তথাপি সোণার বাটী পাখিরে তোমার
　　গড়াব সুন্দর কায়,
　　দুধ ভাত মাছ তায়
প্রতিদিন রেখে দিব ছাতের উপরে,
মনের আনন্দে তুমি খাবে পেটভরে।
বলরে কালাতিপাত করিও না আর
বলরে কোথায় এবে জীবন আমার।”
　　　　　　ইত্যাদি।

লেথকের আদর্শ সতীর গহনার প্রতি কিছু অতিরিক্ত ঝোঁক, আর এক স্থলে তিনি পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন,

“আর এক দিন নাথ হয় কি স্মরণ,
হয়েছিল কার্য্যবশে তব প্রয়োজন,
শতাধিক মুদ্রা, হাতে ছিল না বলিয়া—
হাসিতে হাসিতে আসি লজ্জিত হইয়া,
চেয়েছিলে একখান মম অলঙ্কার,
বন্দক রাখিয়া টাকা করিবারে ধার।
কিন্তু কি দুর্ম্মতি মম হইল তখন,
স্মিত বিকসিত মুখে করিনি অর্পণ।
শুধু তাই নয়, আরও করি উপহাস,
নামটি দিবার নাই লইতে প্রয়াস”
শুনিয়া অপ্রিয় কথা না করি উত্তর,
সেই দিনই না বলিয়া গেলে স্থানান্তর।
　　　　　　ইত্যাদি।

আদর্শ মহিলার কথা দূরে থাক্—নিতান্ত সামান্য প্রকৃতির মহিলাগণ না হইলে অলঙ্কারের জন্য স্বামীর প্রতি কেহ এরূপ ব্যবহার করেন তাহা মনেই করা যায় না।

অবশেষে বক্তব্য এই, মৃত্যুর পর পত্নী এইরূপে বিলাপ করিবে—ভাবিয়া কোন তেমন তেমন স্বামীর ইহাতে হয়ত একটু অহঙ্কার পরিতৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ আদর্শ চরিত্র শিখাইতে হইলে এরূপ বিলাপের উর্দ্ধে উঠাইতে শিখান আবশ্যক। আপনার উচ্ছ্বসিত শত কষ্টকে রুদ্ধ রাখিয়া যে রমণীগণ পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন তাঁহাদের পুন্যময় নিঃস্বার্থ চিত্রই সাধারণ রমণীগণের সম্মুখে ধরা আবশ্যক। এরূপ প্রলাপময়, স্বার্থময়, হাস্যময় বিলাপে সে উদ্দেশ্যের যে কেবল হানি হয় এমন নহে, বিলাপ কারিণীকে লোকের চক্ষে সংসাজান হয়, আর তাহাই হইয়াছে, এ পুস্তকে লেখকের উদ্দেশ্য সফল হওয়া দূরে থাকুক, এমন গম্ভীর বিষয়ও হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে।

পাঠকদিগের প্রতি নিবেদন।

ভারতীর কলেবর বৃদ্ধি হইয়াও এবার ইহাতে রাজনৈতিক আলোচনার স্থান হইল না। তাই বাধ্য হইয়া আমরা তাহা অন্য বারের জন্য রাখিয়া দিলাম।

আর একটি কথা, এবারকার নূতন বন্দোবস্তে অর্থাৎ ভারতীর সহিত বালক মিলিত হইল বলিয়া—পত্রিকা বাহির হইতে কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে—ভরষা করি ইহাতে পাঠকেরা কিছু মনে করিবেন না—ভবিষ্যতে এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতী ও বালক কার্য্যাধ্যক্ষ।

চিরদিন।

(১)

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য্য তারা,
কেবা আসে কেবা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
কেবা হাসে কেবা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা?
কোথা খ'সে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
বহে যায় কাল বায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম-পত্রে মিলে!
এত ভাঙ্গা, এত গড়া, আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব—
কোথা কেবা—কোথা সিন্ধু—কোথা উর্ম্মি—কোথা তার বেলা;—
গভীর অসীম গর্ভে নির্ব্বাসিত নির্ব্বাপিত সব!
জন পূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্ব্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশ-গম্বুজে শুধু বসে আছে দীর্ঘ "চির-দিন"।

(২)

কি লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি!
প্রলয়ের পর-পারে নেহারিছ কার আগমন!
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ!
চির-বিরহীর মত চির-রাত্রি রহিয়াছ জাগি।
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস,
আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়-বাতাস,
জগতের উর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি!
অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিক দোসর,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখীদের স্বর—
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর,

হাসি, কাঁদি, ভালবাসি, নাই তব হাসি, কান্না, মায়া,
আসি থাকি চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া !

(৩)

তাই কি ? সকলি ছায়া ? আসে, থাকে, আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই ?
যুগ যুগান্তর ধ'রে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই ?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায় ?
এ ফুল চাহে না কেহ ? লহে না এ পূজা-উপহার ?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায় !
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে ?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারি ধার ?
যুগ যুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে ?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাঁশী শুনে চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার !
বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন,
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

(৪)

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতি দিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীন হীন,
অসীমে জগতে এ কি পিরীতির আদান প্রদান !
কার পায়ে দেয় ধরা শ্যামল যৌবন উপহার,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, কোথা সেই প্রেমের পাথার !
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে,—কোথা সেই অনন্ত জীবন !
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন,
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্ম দেশের আচার ব্যবহার।

সূতিকা গৃহ। পুত্র জন্মিবার অব্যবহিত পরেই, প্রসূতি কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইবা মাত্র ধাত্রী তাহাকে হরিদ্রা মাখাইতে থাকে। হিন্দুর সুতিকা গৃহে ধাত্রী যেমন সর্ব্বময় কর্ত্রী, ব্রহ্মদেশেও ধাত্রীর সেই প্রকার সমাদর। আমাদের দেশে যদিও, দুই এক দল শিক্ষিতাভিমানী নব্য বাবুদের দ্বারা ধাত্রীদিগের অব্যাহত ক্ষমতা ক্রমশঃ বাধা পাইতেছে, ব্রহ্মে সেইরূপ হইবার যো নাই। আমাদের দেশে অজ্ঞ লোকেদের মধ্যে যেমন বিশ্বাস যে ধাত্রী বিধাতা পুরুষের গমনাগমন পর্য্যন্ত জানিতে পারে ও সময়-বিশেষে সে বালকের অদৃষ্ট লিপি-মর্ম্মজ্ঞও হয়, ব্রহ্মে ধাত্রী সম্বন্ধে এ প্রকার বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর। পুত্র বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে, বাটীর কর্ত্তা ধাত্রীর উপর সমস্ত নির্ভর করেন। দশমাস দশদিন গর্ভধারণ জনিত অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াই, জননী যে নিষ্কৃতি লাভ করেন, তাহা নহে। প্রসবের পর তাঁহার অনেক ভোগ হইয়া থাকে। হরিদ্রা মাখান আরম্ভ হইলে প্রসূতিকে তাপ দিবার জন্য, একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করা হয়। অগ্নির তাপও অনেক সময়ে প্রচুর মনে না করিয়া কম্বল বা অন্য প্রকার, তাপোৎপাদক বস্ত্র দ্বারা প্রসূতির গাত্রাচ্ছাদন করা হয়। আচ্ছাদনের এতদূর পরিপাটী, যে বোধ হয় তাহাতে শত শত কম্পজ্বর নিবারিত হইতে পারে। ইহার পর ধাত্রী প্রসূতিকে সরবৎ পান করিতে দেয়। এই সরবৎ কোন প্রকার বন্য উদ্ভিজ্জের নির্ষিক্ত সারাংশ মাত্র। এই পূতিগন্ধময়, বিকৃত স্বাদযুক্ত সরবৎ সাতদিবস অনবরত পান করিতে হয়। ইহার পর প্রসূতিকে ক্রমাগত তাপ দেওয়া হইতে থাকে। তাপ দেওয়া শেষ হইলে, ধাত্রী অন্য এক প্রকার ঔষধির বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রসূতিকে খাওয়াইতে আরম্ভ করে। হলুদটী নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া, এসময়েও ফাঁক যায় না। মধ্যে মধ্যে হলুদ-খণ্ড, বা গোলা হলুদ প্রসূতিকে পান করান হইয়া থাকে। সাতদিনের পর প্রসূতি সূতিকাগার হইতে বাহির হইতে সমর্থা হয়েন ও প্রসব গৃহ হইতে বাহির হইয়া শীতল ও উষ্ণ জলে স্নান করিয়া তিনি যথেচ্ছা কার্য্য করিতে পারেন।

জন্মিবার ১৫ দিবস পরেই সন্তানের নামকরণ আরম্ভ হয়। এই নামকরণ প্রথার অনুষ্ঠানের দিনে আত্মীয় কুটুম্ব ও প্রতিবেশীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। এই নিমন্ত্রণের এমনি ধুম যে, কখন কখন ইহা দিন রাত ব্যাপিয়া চলিয়া থাকে। উপযুক্ত দৈবজ্ঞ দ্বারা নামকরণের দিন স্থির হয়। সেই দিবস, নিমন্ত্রিতগণের সম্মুখে, ধাত্রীর প্রস্তুত এক প্রকার পাচন দ্বারা শিশুকে প্রথম স্নান করান হয়। পরে সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে, বয়োবৃদ্ধ ও বিজ্ঞলোকের একজন, শিশুর নির্দ্দিষ্ট নামটী সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া

বলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সেই নাম রাখার জন্য কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভবিষ্যতে সুখী হইয়াছে, তাহাও দেখান হয়। ইহার পর সমবেত ব্যক্তিগণ আহারে উপবিষ্ট হন। আহারান্তে সকলেই সন্তুষ্ট মনে, তাম্বুল চর্ব্বন ও চুরট টানিতে থাকেন। বালকের বয়স ৫।৬ বৎসর হইলে তাহার জন্ম কোষ্ঠি প্রস্তুত হয়। এই সময়ে দৈবজ্ঞ মহাশয় আসিয়া খড়ি পাতিয়া বালকের উপর গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রভাব গণনা করেন। কোষ্ঠী অনুসারে ইহাদের মতে মানব সচরাচর ১০৮ বৎসরের অধিক বাঁচিতে পারে না। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেক মানবের জীবনে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের ক্ষমতা সঞ্চার হইয়া থাকে। আমাদের ন্যায় ইহারাও শনিগ্রহকে বড় ভয় করে। ইহাদেরও মতে শনির প্রাদুর্ভাব হইলে, মানব হতমান, হৃত-সর্ব্বস্ব ও বিপদ গ্রস্ত হইয়া থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্রাদির সঞ্চার গণনার সহিত যে জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত হয় তাহা ইহাদের নিকট অত্যন্ত আদরের জিনিস, সাধ্যমতে ইহারা সেই জন্মকোষ্ঠীর পবিত্রতা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়, ও জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্বাবধারণ করে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার অতি নিকটস্থ আত্মীয়গণ, সেই মৃত ব্যক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাহার পরিত্যক্ত জন্মকোষ্ঠী অতিশয় সমাদরের সহিত রক্ষা করিয়া থাকে।

শিক্ষা-প্রণালী। ব্রহ্মদেশবাসীদিগের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার বিশিষ্ট উপায় আছে।* প্রত্যেক নগরে, গ্রামে, রাজধানীতে, ধর্ম্মযাজকদিগের বিদ্যালয় আছে। ধর্ম্মযাজকদিগকে ব্রহ্মদেশীয়েরা ফুঙ্গী বলিয়া থাকে। সকল ফুঙ্গীরই বিদ্যালয় ও বিদ্যাভিমান আছে। ইহারা হরিদ্রা রঙ্গের কাপড় পরিয়া থাকে। এই বিদ্যালয়েই পিতা মাতা, পাঠ-যোগ্যবয়স্ক পুত্রদিগকে প্রেরণ করেন। শুভদিন দেখিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। নূতন প্রবিষ্ট বালক একখানি শ্লেটের উপর লিখিত, ব্রহ্মভাষার সমস্ত বর্ণমালা প্রথম পাঠ্য পুস্তক স্বরূপে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রস্তর ফলকে লিখিত বর্ণমালা, সে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে থাকে। বর্ণ পরিচয় হইতে ইহাদের কখন কখন দুই বৎসরও কাটিয়া যায়। আমাদের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় নামতা পড়ার মত, ব্রহ্মদেশীয় পাঠশালায় সমস্ত বালক, এক শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বর্ণ মালা ও পুস্তকাদি পাঠ করিতে থাকে। যে বিদ্যালয়ে বালকদিগের পাঠ কোলাহল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাই উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা ব্রহ্মবাসীরা বোধ হয় আমাদের অপেক্ষা অধিক বুঝিয়াছে। ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক সমুদায় প্রায়ই ধর্ম্ম পুস্তক। বালকের অক্ষর পরিচয় হইলেই শিক্ষক তাহাকে, নানাবিধ নীতি উপদেশ-পূর্ণ পুস্তকাদি পাঠ করিতে দেন। তৎপরে, দেশপ্রচলিত কঠিন ও উচ্চ দরের ধর্ম্ম পুস্তক ও শাস্ত্র সকল, শেষ করান হয়। এই সকল শাস্ত্রে ও ভাষায় দক্ষ হইলে—সমাজে বিদ্বান বলিয়া লোকে প্রতিষ্ঠা, ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মে যতদিন

শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় ধর্ম্মালোচনার উপায় থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বৈদেশিক ধর্ম্মে ব্রহ্মদেশবাসীদিগের কিছুই অনিষ্ট বা মতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার আশ্চর্য্য গুণ! স্বাধীন ব্রহ্মে ধর্ম্ম বিষয়ের প্রকৃষ্ট আলোচনা হইলেও, ব্রিটিশাধিকৃত দক্ষিণ ব্রহ্মে, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তৃতি হওয়াতে এই বহুকাল প্রচলিত দেশীয় প্রথার প্রতি, তথাকার অধিবাসীরা ক্রমশঃ অনাস্থা দেখাইতেছে।

বিবাহ। ব্রহ্ম দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলিত বটে, কিন্তু তাহা ইউরোপীয় সভ্যতানুমোদিত স্বাধীনতার ন্যায় নহে। ব্রহ্ম দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা যে পরিমাণে প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ততদূর নহে। শতকরা ১০ জন স্ত্রীলোক যদি শিক্ষা লাভ করিল তাহা হইলেই প্রচুর বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে দুরূহ কিছুই নাই। পুরুষেরা যেমন ধর্ম্ম শাস্ত্রে আগাগোড়া শিক্ষিত হয়, স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ইহাদের মতে, স্ত্রীলোকেরা যদি, বেশ বিন্যাস, ও অঙ্গসৌষ্ঠব সাধনে সম্যক কৃতকার্য্য হইল, তাহা হইলে তাহাদের আর কিছু শিখিবার নাই। স্ত্রীলোকেরা অনেক সময়ে পুরুষদিগের অবর্ত্তমানে তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় অবাধে সম্পন্ন করিয়া থাকে, এ সকল কার্য্যে তাহাদের দক্ষতাই প্রকাশ পায়, বিদ্যা শিক্ষার-বিমল-সুখে বঞ্চিত থাকিয়া কখনও তাহারা এই প্রকার কার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এরূপ শোনা গিয়াছে, যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে থানাদারের পত্নী, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নগরের উপযুক্ত স্থানে প্রহরী সংরক্ষণ, ও স্বামীর কার্য্যের অন্যান্য আনুষঙ্গিক তত্ত্বাবধারণ করিয়াছে।

তিন প্রকার মতে, স্বাধীন ব্রহ্মে বিবাহ প্রথা সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথম মতে, পিতারই কন্যার উপর সমস্ত অধিকার, তিনি ইচ্ছা করিয়া যাহার হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিবেন, তাঁহাকেই স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা অনেকাংশে আমাদের দেশীয় প্রথার মত বটে। দ্বিতীয় মতানুসারে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক ঘটক বা ঘটকী রূপে সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ ঘটাইয়া দেয়। তৃতীয় প্রথানুসারে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক, উভয়েই স্বেচ্ছামতে স্বামী ও স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিতে পারে। শেষোক্ত দুইটী প্রথানুসারে বিবাহ হইলেও, তাহাতে কন্যার পিতা বা অন্য কোন অভিভাবকের সম্মতি থাকা চাই। পিতামাতার পূর্ব্বে এমত ক্ষমতা ছিল, যে যদি কোন পুরুষ, তাঁহাদের অমতে, পাত্রীকে ভুলাইয়া দেশান্তরে গিয়া লুকাইয়া বিবাহ করিত, এবং সেই বিবাহে কন্যার দুই তিনটী সন্তান জন্মিত, এবং ঘটনাক্রমে পিতা যদি এ সন্ধান পাইতেন, তাহা হইলে সেই কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া তিনি স্বাধীন মতে অপর কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিতেন।

পূর্ব্বে ২৪।২৫ বৎসর বয়সে ব্রহ্মে পুরুষদিগের বিবাহ হইত। কিন্তু এক্ষণে, বাল্য বিবাহের অতিশয় প্রচলন হইয়াছে। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদিগের বিবাহেচ্ছা হইলে তাঁহারা সেই ইচ্ছা, বাটীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন করেন। কর্ত্তৃপক্ষও, কন্যা কর্ত্তার

বাটীতে গিয়া এই প্রস্তাব করেন, এবং উভয় পক্ষের মত হইলে, বিবাহের আয়োজন হইতে থাকে। পাত্রও এই সময় হইতে কুমারী কন্যার বাটীতে গিয়া অহঃরহ তাহার সহিত আলাপ করিতে থাকেন। তাঁহাদের পরস্পরের মনোমিলন হইলে বিবাহের যৌতুকাদি স্থির হয়। পরে শুভ দিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া থাকে। ফলতঃ কোর্টশিপ্ প্রথা যে ব্রহ্মে প্রচলিত, ইহা উপরোক্ত ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে। বিলাতের রমণী অপেক্ষা ব্রহ্ম রমণী বিবাহের স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন। বিলাতে দম্পতির মনোমালিন্য ঘটিলে, তাঁহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিয়া, ডাইভোর্শ (বিচ্ছেদ) প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মে সাধারণতঃ তাহা হইবার যো নাই। বিবাহের সময়, কন্যা যে যৌতুক লইয়া স্বামীগৃহে আইসে, তাহা হইতে এক কপর্দ্দকও স্বামীর খরচের অধিকার নাই। দেশ প্রচলিত নিয়মানুসারে ইহা স্ত্রীর স্ত্রীধন। যখন দম্পতির মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে, তখনই সে এই অর্থ-বলে বলী হইয়া সরিয়া পড়ে। আদালতে এই কারণে নালিশ প্রায়ই হয় না। এবং এ প্রকার ব্যবহার প্রচলিত হইলে—সমাজে সাধারণতঃ যে বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার সম্ভাবনা তাহাও ঘটে না।

ব্রহ্মে কোর্টশিপের একটী বিশিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত আছে। দিবসে কোন মতেই এই প্রকার বিশ্রম্ভালাপ হইবার যো নাই। ইহাদের বিশ্বাস, যে রমণীগণ প্রাতঃকালে স্বভাবতঃই, ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে তাহাদের কোন্দল-প্রবৃত্তি বৰ্দ্ধিত হয়। কিন্তু রাত্রিকালে, তাহারা মনোহারিণী স্বভাব ধারণ করে। এই বিশ্বাসের অনুরোধে, রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ই এই প্রকার বিশ্রম্ভালাপের প্রকৃত সময়। এই সময়ে বর দুই একটী বন্ধু লইয়া, কন্যার বাটীর সন্নিকটে পদচালনা করিতে থাকে। বাটীর অন্যান্য সকলে নিদ্রিত হইলে, যুবক ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করে। কন্যার পিতামাতা অবশ্য সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারেন। বালিকা পুষ্পাভরণে সজ্জিতা হইয়া, সুন্দর রূপে বেশবিন্যাশ করিয়া, গৃহসজ্জা করিয়া পাত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। পাত্র উপস্থিত হইলে, তাহাদের মধ্যে প্রণয়ালাপ চলিতে আরম্ভ হয়। বর, কন্যাকে প্রণয় নিদর্শন স্বরূপ, এক খণ্ড কাগজে বা বস্ত্রে মুদ্রিত কবিতাবলী উপহার দিয়া থাকেন। কবিতাগুলি সমস্তই প্রণয় ঘটিত। কন্যাও প্রতিদান স্বরূপে, পাত্রকে প্রচুর তাম্বুল ও চুরুট প্রদান করেন। পরে আলাপাদি সমাপ্ত হইলে, পাত্র প্রস্থান করে।

বিবাহের দিনে পাত্র, আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে। বিবাহ হইয়া গেলে, পাত্র ও পাত্রী এক পাত্রে ভোজন করে ও সাত দিন পর্য্যন্ত এক নির্জ্জন গৃহে, পরস্পরের আলাপ পরিচয় চলিতে থাকে। বিবাহ হইলে আমাদের দেশের ন্যায় ইহাদেরও হাতে হাতে সমর্পণ প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহের কতিপয় দিবস পরে পাত্র সপত্নী আসিয়া কন্যার [illegible] গৃহে দুই তিন বৎসর বাস করেন। শ্বশুরের সংসার হইতে, এই

সময়ে আলাহিদা হইবার চেষ্টা করিলে, লোকে নিন্দা করিয়া থাকে। সুতরাং এই স্থানে থাকিয়া স্বামী, পত্নীর ভরণপোষণের জন্য উপায়াদি অন্বেষণ করিয়া থাকেন।

বহু বিবাহ প্রথাও ব্রহ্মে অপ্রচলিত নহে। স্বয়ং ব্রহ্মাধিপ দশ কুড়িটী বিবাহ করিয়া থাকেন। ভূতপূর্ব্ব ব্রহ্ম-রাজ থিব, কেবল এই প্রকার বহু বিবাহ দোষে দোষী নহেন। তিনি যদিও গোপনে অন্য দুই একটী বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রধানা রাজ্ঞী সুপায়ালাতের কৌশলে সেই নির্দ্দোষী বালিকারা শীঘ্রই নিহত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জন্ম কোষ্ঠী ইহাদের সকল কার্য্যে আবশ্যক হয়। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদের মধ্যে এক প্রকার কর্ণবেধ প্রথা প্রচলিত আছে। কর্ণবেধ প্রথার ও বিবাহের শুভ দিন নির্দ্ধারণ এই জন্মকোষ্ঠীর দ্বারা হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস ইহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে, দম্পতী কথনও সুখী হয় না ও বিবাহ ঘটিলে অচিরাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে।

বিচার বিভাগ। ব্রহ্মের মধ্যে রাজাই সর্ব্ব-প্রধান বিচারক। তিনি ইচ্ছা করিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। রাজার নিম্নে, "হুতদা" নামক বিচারক সম্প্রদায়। হুতদাই, ব্রহ্মদেশের সুপ্রীম কোর্ট। ইহাতে চারিজন উঙ্গী, বা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রত্যেক মন্ত্রীর সাহায্যের জন্য, উন্দক নামক লেথক সম্প্রদায় সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। লেখাপড়ার সমস্ত কার্য্যই ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। রাজপ্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী একটী প্রশস্ত দালানে "হুতদার" অধিবেশন হয়।

রাজকার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহের জন্য, দুই প্রকার মন্ত্রী সম্প্রদায় ব্রহ্মে নিযুক্ত থাকিতেন। হুতদার মন্ত্রীগণ বিচার কার্য্য ছাড়া, রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে শান্তিরক্ষার জন্য নানাবিধ বন্দোবস্ত করিতেন। ব্রহ্মে চৌদ্দ প্রকার মন্ত্রী সম্প্রদায় আছে, কার্য্যানুসারে ইহাদের পদবিভাগ হইয়া থাকে। রাজ প্রাসাদের সমস্ত কার্য্য করিবার জন্য ও রাজার হুকুমাদি সাধারণকে জানাইবার জন্য, একটী গুপ্ত সমিতি আছে। এই গুপ্ত সমিতি, রাজার হুকুমাদি হুতদার মন্ত্রীগণকে জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা তাহা সাধারণে প্রচার করেন। যখন কোন রাজ বংশীয় বিচারক, আদালতে বিচার কার্য্যে ব্রতী হন, তখন সেখানে সাধারণে উপস্থিত হইতে পারে না। উভয় পক্ষের উকীল ও বাদী প্রতিবাদী কেবল মাত্র উপস্থিত থাকেন। বাদী সবুজ বর্ণের ও প্রতিবাদী লালবর্ণের পোষাক পরিয়া বিচারকের সমক্ষে উপস্থিত হন। এই সমস্ত পোষাক রাজ সরকার হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল রাজ বংশীয় বিচারকদিগের সম্মুখে বাদী প্রতিবাদীকে উপস্থিত হইতে হইলে, এই প্রকার রঙ্গিনপোষাকের আবশ্যক হইয়া থাকে।

মিয়উন বা মিয়মান নামক আর এক প্রকার রাজকর্ম্মচারী ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই বিরাজমান। দেওয়ানী ও ফৌজদারি উভয়বিধ ক্ষমতাতেই ইহারা ক্ষমতাবান। রাজস্ব বন্দোবস্ত ও তাহার আদায়ের সুশৃঙ্খলা সংসাধন করাই মিয়উনদিগের প্রধান কার্য্য।

ইহারা স্বয়ং আবার সমস্ত কার্য্য না করিয়া কর্ম্মচারী নিয়োগ দ্বারা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কর্ম্মচারীরাও, যে কোন উপায়েই হউক, মিয়উনের নিকট খাজানা আদায় করিয়া পাঠাইয়া থাকে। সাধারণ গরিব প্রজা এই সমস্ত কর্ম্মচারীদিগের হস্তে কতদূর যে অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বস্তুতঃ Judicial এবং Executive ক্ষমতা, এক ব্যক্তির হস্তগত হইলে কতদূর অনিষ্ট হইতে পারে, এই কার্য্য-প্রণালীই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের ভারতবর্ষেও এ প্রকার শত শত দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মিয়উনগণ, ধরিতে গেলে ব্রহ্মদেশের এক একটী বিভক্ত অংশের সম্পূর্ণ অধীশ্বর। রাজার নিম্নে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাই ইহারা ভোগ করিয়া থাকেন। হুতদা মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক ইহারা নিযুক্ত হইয়া কার্য্যে ব্রতী হন। ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচারই অধিকাংশ ইহাদের হস্তে। ইহাদের মোকদ্দমার উপর যত আপীল হয় তাহার সমস্তই প্রধান মন্ত্রীগণ-সমক্ষে বিচারিত হয়। ব্রহ্মদেশে, নিম্ন-শ্রেণীর দেওয়ানী আদালতের বিচারকদিগকে "ভায়াখু" বা "ভায়াখুজী" বলিয়া থাকে। এই ভায়াখুজীগণ কেবল দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন ও তাহার আপিলাদি হুতদা-সভা কর্ত্তৃক বিচারিত হয়।

দৈব পরীক্ষা। ব্রহ্মের বিচারকগণ, সচরাচর মোকদ্দমাগুলি যাহাতে আপোষে মিটিয়া যায় ও উভয় পক্ষই বিচারে সন্তুষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অন্যত্র, সামান্য জরিমানা ও আদায় করা হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোন পক্ষই সহজে রফা করিতে চাহে না, তখন মোকদ্দমা অতিশয় গুরুতর হইয়া উঠে। সেই সময় বিচারক গম্ভীর ভাবে, উভয় পক্ষকে আহ্বান করিয়া তাহাদের উকীলের মুখে, উভয় পক্ষের মোকদ্দমা সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা শুনেন। পরে সাক্ষীদিগকে, পরীক্ষা করিবার জন্য এক দিন স্থির করা হয়। ব্রহ্মদেশে সাক্ষী দেওয়া বড় বিপদজনক কাজ, আমাদের সভ্যদেশ সমূহে যেমন হলপ্ প্রথা প্রচলিত আছে, ব্রহ্মেও সেইরূপ।

ব্রহ্মে মোকদ্দমার সময় হলপ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সাক্ষী হলপ করিয়া যাহা বলে, বস্তুতঃ তাহা কোন অংশেই মিথ্যা হয় না। ইহাদের ধর্ম্মভয় অতিশয় প্রবল, সুতরাং কোন ক্রমেই তিলমাত্র মিথ্যা কথা বলিতে ইহারা সাহসী হয় না। শপথের দিন স্থির হইলে, সাক্ষীগণ বুদ্ধ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বেদী স্পর্শ করিয়া শপথ করে, যে তাহারা কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলিবে না। পরকালের ভয় সকলেরই আছে, বিশেষতঃ ইহাদের এই ভয় অতিশয় অধিক, সুতরাং সমস্ত সত্য ঘটনা বলিয়া তাহারা শপথের দোষ হইতে মুক্তি লাভ করে। সকলেই ইচ্ছা করিলে সাক্ষী শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারে না। যাহারা মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সহিত কোন প্রকার আত্মীয়তায় লিপ্ত, তাহারা সেই মোকদ্দমার সাক্ষী হইতে পারে না। যাহাদের সহিত, বাদী বা প্রতিবাদীর কোন প্রকার শত্রুতা আছে তাহারাও এ মোকদ্দমার সাক্ষী

হইতে পারে না। বিশেষতঃ বাচাল, রুগ্ন, বৃদ্ধ, বালক, ভিক্ষুক, গায়ক, অভিনেত্রীগণ, কুচরিত্রা স্ত্রীলোক, নিম্নজাতীয় ও কুষ্ঠ প্রভৃতির লোক, চোর, গর্ব্ভিণী স্ত্রীলোক ও চিকিৎসক, ইহাদের কাহারও কোন পক্ষে সাক্ষ্য দিবার ক্ষমতা নাই ও ইহারা শপথ করিতেও সমর্থ নহে। মোকদ্দমার রায় প্রকাশ হইলে, বাদী ও প্রতিবাদী তৎক্ষণাৎ মিলনজ্ঞাপক কোন প্রকার সরবৎ বা চা পান করিয়া থাকে। যদি উভয় পক্ষের কোন পক্ষ এই প্রকার সরবৎ পান না করে, তবে বুঝিতে হইবে যে মোকদ্দমার বিচারে সে সন্তুষ্ট নহে। তখন দৈব পরীক্ষার আয়োজন হইয়া থাকে। প্রথম পরীক্ষা-মতে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে, এক একটী বর্ত্তিকা ও কুসুমরাশি লইয়া প্রকাশ্য রূপে দেবালয়ে গমন করে ও সেখানে পুরোহিতের সমক্ষে পুষ্পাদি দ্বারা দেবতার বেদী সজ্জিত করিয়া সেই দুইটী বাতি এক সময়ে জ্বালিয়া রাখিয়া দেয়। পুরোহিত সমস্ত রাত্রি চৌকী দিয়া বসিয়া থাকেন। পর দিবস তাঁহার সাক্ষ্য অনুসারে উভয় পক্ষের মধ্যে যাহার বাতী আগে নিভিয়া গিয়াছে প্রমাণ হয়, তাহারই মোকদ্দমায় পরাজয় হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার দৈব পরীক্ষা অতিশয় ভয়ানক। এই প্রথানুসারে, বাদী ও প্রতিবাদীর হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি, কোন প্রকার গলিত ধাতুর মধ্যে নিমজ্জিত করা হয়, এই নিমজ্জন জনিত-ক্ষতাংশ, যাহার অগ্রে আরাম হইয়া যায়, সেই ব্যক্তিই মোকদ্দমায় জয় লাভ করিয়া থাকে। তৃতীয় প্রথাটী আরো ভয়ানক, ও লোমহর্ষক। এই প্রথানুযায়ী বাদী ও প্রতিবাদী উভয়কেই জল মধ্যে যুগপৎ নিমজ্জিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি অধিকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকে, সেই বিচারে জয়ী হইয়া থাকে। স্ব স্ব নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য অনেক হতভাগ্য অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপে জলমধ্যে থাকাতে, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

জমিদারী বন্দোবস্ত। ভারতবর্ষে যে প্রকার নিয়মানুসারে, জমী সংক্রান্ত স্বত্বাদি সাব্যস্ত হইয়া থাকে, ব্রহ্মে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতে, রাজাই প্রকৃত ভূম্যধিকারী, ভূমির উপর তাঁহার সকল প্রকার স্বত্বাদি বর্ত্তমান ও তিনি স্বেচ্ছা অনুসারে যেমন সমস্ত জমী বিলি করিয়া থাকেন, ব্রহ্মে সেরূপ নহে। ব্রহ্ম রাজ্যের নিয়মাদি সঙ্কলয়িতা মনুর মতে, রাজার জমীর উপর কোন প্রকার বিশেষ স্বত্ব নাই ও থাকিবার আবশ্যকতা নাই। প্রজা সমস্ত জমি দখল করিবে, কর্ষণ করিবে, শস্যোৎপাদন করিবে ও তাহার $\frac{1}{10}$ দশমাংশ রাজাকে রাজস্ব স্বরূপে প্রদান করিবে। রাজা রাজস্ব স্বরূপে শস্যের এক দশমাংশ যেমন পাইবেন, তেমনি বাগানের ফল ও অন্য প্রকার বাণিজ্য দ্রব্যের উপরও তাঁহার ঐ প্রকার স্বত্ব থাকিবে। মনুর এই নিয়মানুসারে কি রাজনৈতিক কি সামাজিক সমস্ত কার্য্যাদি বহুকাল হইতে ব্রহ্মে চলিয়া আসিতেছে, ও রাজাও বরাবর এই নিয়মানুসারে রাজস্ব পাইয়া থাকেন। এই প্রকার নিয়ম ব্রহ্মে প্রচলিত বলিয়া যে রাজার কিছুমাত্র জমী স্বদখলে নাই, ও জমী সম্বন্ধে কেবল তিনি

রাজস্বের ভাগী এমত নহে। রাজার খাসে অনেক সম্পত্তি আছে। পতিত, ও উত্তরাধিকারীহীন বিষয়-সমস্ত রাজার নিজের সম্পত্তি। প্রয়োজন হইলে তিনি স্বেচ্ছামত রাজ্য মধ্যে যে কোন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দখল করিতে পারেন। ব্রহ্মরাজ কথনও কথনও নিজ দখলী জমী সকল দানও করিয়া থাকেন। উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী, বিশ্বাসী রাজভৃত্য, ও বিচক্ষণ সৈন্যাধ্যক্ষ কখন কখনও রাজার নিকট হইতে তাঁহাদের কার্য্যের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গীর পাইয়া থাকেন। প্রজাগণ ইচ্ছা করিয়া জমী ক্রয় বিক্রয় বা দানাদি করিতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। যদি কোন প্রজা জঙ্গল কাটাইয়া পরিষ্কার করিয়া লয়, বা অপরের পরিত্যক্ত উত্তরাধিকারীহীন জমীর উপর তাহার ৫।৭ বৎসরের দখল সাব্যস্ত করিতে পারে তাহা হইলে সেই জমী তাহার হয়।

আমাদের দেশে যে প্রকার নিয়মে জমী বিক্রয় হইয়া থাকে ব্রহ্ম দেশে ঠিক সেরূপ নহে। ধরিতে গেলে, ব্রহ্মদেশের জমী কোন কালেই প্রকৃত রূপে বিক্রয় হয় না। এই প্রকার বিক্রয়কে বন্ধকী বলা যাইতে পারে। জমীর অধিকারী, যখন কোন বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়া জমী হস্তান্তর করিতে উদ্যত হয়, তখন সে প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া নিজের জমী ক্রেতাকে ছাড়িয়া দেয়। ক্রেতা সেই জমী ভোগ দখল করিতে পারে, কিন্তু হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক দিতে পারে না। এবং বিক্রেতা যদি দুই তিন বৎসর পরে কর্জ্জের টাকা ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হয়, তবে নিজ সম্পত্তি পুনরায় ফিরাইয়া পায়। রাজাও ইচ্ছানুসারে নিজাধিকৃত জমীতে চাষ করিয়া থাকেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহার কতকগুলি দাস চিরজীবনের জন্য নিযুক্ত আছে। যখন চাষ করিবার জন্য বেশী লোকের আবশ্যক হয় তখন প্রকাশ্য রাজাজ্ঞা দ্বারা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ, মজুর সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেন। যাহারা এই প্রকারে, রাজ কার্য্যে খাটিতে অস্বীকার করে, তাহারা শাস্তি পাইয়া থাকে। অতিরিক্ত লোকদিগকে, অন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না, তবে সময়ে সময়ে কোন না কোন প্রকারে তাহারা সামান্য রূপ রাজপ্রসাদ লাভ করে। এই প্রকার সম্পত্তি ছাড়া, রাজার নিজ অধীনে অনেক বড় বড় সেগুণ কাষ্ঠের অরণ্য জমা থাকে। তিনি উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া এই সমস্ত বনপ্রদেশ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মে যে সকল Forest Law প্রচলিত আছে তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে, রাজা দোষী ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেন। রাজকীয় অরণ্যের মধ্যে, গমনাগমন, বৃক্ষচ্ছেদন বা অপহরণ করিলে কঠিন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। এই সেগুণ কাষ্ঠের বন লইয়াই বম্বে-বর্ম্মা ট্রেডিং কোম্পানির সহিত, ভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মাধীপ থিবর মনোমালিন্য যে বর্ত্তমান ব্রহ্ম যুদ্ধের প্রধান কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই।

শ্বেত হস্তী। ব্রহ্মের শ্বেত হস্তীর কথা বোধ হয় অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মরাজের শ্বেত হস্তী একটী বিশিষ্ট সমাদরের বস্তু ও রাজার শুভাশুভ অনেক পরি-

মাণে এই শ্বেত হস্তীর উপর নির্ভর করে। ব্রহ্মে সাধারণ লোকে কখনও কোন প্রকার হস্তীতে চড়িতে পায় না। শিকারীগণ কোন প্রকার হাতী ধরিলে তৎক্ষণাৎ তাহা রাজাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হয়। কেবলমাত্র রাজার অনুমতি লইয়া, রাজ বংশোদ্ভব কুমারগণ কৃষ্ণকায় হস্তীর উপর চড়িতে পারেন। শ্বেত হস্তী চড়িতে একমাত্র ব্রহ্মাধীপই সর্ব্ব প্রকারে ক্ষমতাবান। শ্বেতহস্তীর নির্ব্বাচন প্রথা অতি চমৎকার। শ্বেতহস্তী বলিলে, পাঠকগণ, দুগ্ধফেণ নিভ শ্বেতবর্ণ বুঝিবেন না। ধূসর বর্ণের হস্তীর অপেক্ষা শ্বেতহস্তীর বর্ণ অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ। শ্বেত হস্তী পরীক্ষা করা সাধারণের কার্য্য নহে, এ পরীক্ষা সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক আছে, ধর্ম্ম পুস্তকের বচনানুযায়ী অনেক শ্লোকও তাহার ভিতর নিহিত। যে শ্বেতহস্তীকে স্নান করাইলে তাহার শরীরের বর্ণ ঈষৎ রক্তাভ হয়, ও যে হস্তীর প্রত্যেক পায়ে পাঁচটী করিয়া নখ আছে, তাহাই প্রকৃত শ্বেতহস্তী। এই প্রকারে শ্বেতহস্তী নির্ব্বাচন করিবার জন্য কতকগুলি লোক রাজ সংসার হইতে নিযুক্ত আছে।

রাজার নীচে, ব্রহ্মরাজ্যে শ্বেতহস্তী ভিন্ন আর কাহারও অধিক সম্মান নাই। ইহার বাসের নিমিত্ত মনোহর প্রাসাদ, প্রসাদের চারিদিকে পাহারা দিবার জন্য শত জন প্রহরী হস্তী রাজের সেবা করিবার জন্য ত্রিশ জন চাকর, আহারের সংস্থানের জন্য, একটী বৃহৎ বিষয়ের আয় বরাদ্দ আছে।

হস্তীরাজ রজতময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকেন, ও স্বর্ণপাত্রে আহার করেন। স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্র ভিন্ন তাঁহার সংসার চলে না। চন্দন মিশ্রিত জল না হইলে তাঁহার স্নান হয় না। স্বয়ং ব্রহ্মাধীপ, তাঁহার কাছে গিয়া, দাঁড়াইয়া আদর না করিলে, সম্মান বৃদ্ধি হয় না। এমন কি, একজন মন্ত্রী হস্তীরাজের প্রাসাদের কার্য্য সমুদায় দেখিবার জন্য ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইতেন।

ইহা ছাড়া, হস্তী রাজের অন্যান্য বাসনা গুলি পরিতৃপ্ত করিবার জন্য নানাবিধ উপায় করা হইত। হস্তীরাজকে ঘুম পাড়াইবার জন্য গায়কেরা সুমধুর স্বরে মৃদু মন্দ বাদ্য যোগে গান ধরিত, নর্ত্তকীরা তালে তালে নৃত্য করিত, এই সকল রাজ-সেবায় হস্তীরাজ এত দুর অভ্যস্ত হইয়াছিলেন—যে একদিন ঘটনা ক্রমে কিছু মাত্র ত্রুটি হইলে কোন মতেই রক্ষা ছিল না। কিন্তু শ্বেত হস্তীর সুখ, ব্রহ্মরাজের রাজ্য-চ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই জন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে। আজ প্রভুরও যে দশা, হস্তীরাজেরও সেই দশা।

শ্বেত হস্তীর উপর রাজারই যে কেবল এই প্রকার যত্ন তাহা নহে। প্রজারা শ্বেত-হস্তীকে রাজ্যের মঙ্গলজনক ও জাতীয় গৌরব বলিয়া জানিত। স্বয়ং ব্রহ্মাধীপ তাহাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহার শতগুণে অন্যেরা তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিত। ব্রহ্ম-বাসীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে শ্বেতহস্তী বুদ্ধদেবের অবতার মাত্র। যখন বুদ্ধদেব মায়া-

দেবীর গর্ভে জন্ম লইবার জন্য প্রবেশ করেন, তখন তিনি এই শ্বেতহস্তী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এই বিশেষ কারণেই ব্রহ্মে শ্বেতহস্তীর এত সমাদর ও সম্মান। দেবতাজ্ঞানে, ব্রহ্মবাসীরা শ্বেতহস্তী দর্শন করিতে যায় ও হস্তীপ্রাসাদে ঢুকিবার পূর্ব্বে জুতা খুলিয়া যাইতে হয়। ব্রহ্মাধীপ রাজপথ দিয়া গমন করিবার পূর্ব্বে যেমন রাজপথ মার্জ্জিত ও জলসিক্ত হয়, শ্বেতহস্তী বাহির হইবার পূর্ব্বেও ঠিক সেইরূপই হইয়া থাকে। যখন শ্বেতহস্তী রাজ পথ দিয়া গমন করিতে থাকে, তখন দুই ধারের লোক, প্রণত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করে।*

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সিন্ধু কাহিনী।

প্রথম ভাগ।

সিন্ধুদেশের কি দুর্ভাগ্য! ভারতবর্ষের মোহাড়ায় তার অধিষ্ঠান সুতরাং আততায়ীদের প্রথম পাদক্ষেপ তাহার উপরে গিয়াই পড়ে। প্রাচীন কাল হইতে পূর্ব্বাপর তাহার উপর দিয়া কত উৎপাত কত ধাক্কাই গিয়াছে। প্রথমে সেকন্দর বাদ-

সেকন্দর বাদসা

সাহের সিন্ধু আক্রমণ দেখ। পারস্যাধিপতি দরায়ুসকে ধন প্রাণে বিনাশ করিয়া সেকন্দর সা সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া হিন্দুকুষ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ও খাইবরের দুর্গম পথ অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন, অবশেষে তাঁহার রণমত্ত সৈন্যগণ সিন্ধুতীরস্থিত আটকে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। আটকের বাধা না মানিয়া মাসিডন-বীর সিন্ধুপার হইয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিলেন। পঞ্জাবে তক্ষশালের প্ররোচনায় বীর শ্রেষ্ঠ পুরুরাজের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয় তাহা প্রসিদ্ধই আছে, এস্থলে বর্ণন করিবার আবশ্যক নাই। আশ্চর্য্য এই যে, যে রণক্ষেত্রে গ্রাক ও হিন্দু এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদলের সম্মিলন হইয়াছিল সেই স্থলেই দুই সহস্রাধিক বৎসরান্তে ইংরাজ ও শিখদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটন হয়। দুবারই পঞ্জাবীদের পরাজয় কিন্তু সে পরাজয়ে শত্রুরাও তাহার বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে নাই। বন্দীকৃত পুরুরাজের সঙ্গে রাজার মত ব্যবহার

* গত চৈত্র সংখ্যক ভারতীর ব্রহ্মে-ইংরাজ নামক প্রবন্ধ লেখকের নাম শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় না হইয়া ভুলক্রমে শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় হইয়া গিয়াছে। ভাং সং।

করিয়া সেকন্দর তাঁহার সিংহাসন প্রত্যর্পণ করেন, বিজয়ী গ্রীক্‌রাজ জয়স্থলে নগর দ্বয় পত্তন করিয়া চেনাব ও রাবী নদী পার হইলেন। এই সময়ে মগধ রাজের বিপুল কীর্ত্তি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ৬ লক্ষ পদাতিক ও সহস্র সহস্র অশ্ব গজারোহী সেনা যে রাজার সৈন্যবল তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্রে জয়স্তম্ভ নিখাত করেন এই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার লোভের অন্ত নাই, কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রাংশু লভ্য ফলে উদ্বাহু বামনের ন্যায় তাঁর দশা হইল। রেয়াস নদী পর্য্যন্ত পৌছিয়া তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্য দল কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চায় না। সম্রাট তাহাদের বশ করিতে কত চেষ্টা করিলেন, তাঁহার সকল সাধ্য সাধনা নিষ্ফল,—ভৎর্সনা গঞ্জনা কাকুতি মিনতি কিছুতেই কিছু হইল না, সুতরাং ঐখানে রণে ভঙ্গ দিয়া তাঁহাকে অগত্যা ফিরিতে হইল।

পুরুরাজের হস্তে সপ্তরাজ্য সমর্পণ করিয়া সেকন্দর তাঁর সৈন্য সামন্ত লইয়া ঝীলমে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় রণতরী সজ্জিত হইল। অনন্তর তিনি সৈন্যদের দুই দলে বিভক্ত করিলেন। সেনাপতির অধীনে একদল পৃথক্ পাঠাইলেন আর আপনি একদল সৈন্য লইয়া পঞ্জাবের নদী বাহিয়া সিন্ধু নদী দিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। এই যাত্রার কতিপয় মাস সিন্ধুদেশ সেকন্দরের বীরদর্পে কম্পিত ও রাজ্যে বিপুল বিপ্লব সমুত্থিত হয়।

সেকন্দর বাদসার সিন্ধু আক্রমণের হিন্দু লেখ্য কিছুই নাই—যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গ্রীক্ ভাষায় লিখিত। এই হেতু নাম লইয়া বড় গোল। গ্রীক্ ও চীন লেখকেরা এদেশের নামাবলির যেরূপ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে দেশের প্রকৃত নাম সকল উদ্ধার করা সহজ নহে। গ্রীক্ রাজ যেখানে যুদ্ধে জয়লাভ করেন সেখানে নগর দুর্গ প্রভৃতি কীর্ত্তি স্তম্ভ সকল স্থাপন করিয়া যান—গ্রীক্ ইতিহাসের এইরূপ বর্ণনা, কিন্তু এক্ষণে এদেশে সেই সকল কীর্ত্তিকলাপের কোন নাম গন্ধ নাই—কোথাও যদি, তাহার চিহ্ন থাকে তাহা কেবলি অনুমান ও কল্পনা।

পুরাকালে আলোর সিন্ধুদেশের রাজধানী ছিল কিন্তু গ্রীক্ গ্রন্থে এরূপ কোন নাম পাওয়া যায় না। "মুষিকানুস্" নামক এক রাজার সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের বর্ণনা আছে সম্ভবতঃ আলোর তাঁহার রাজধানী। আর একটী প্রাচীন সহরের নাম ব্রাহ্মণাবাদ।

ব্রাহ্মণাবাদ } কনিংহাম সাহেব ইহা "মুষিক" রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। এককালে ইহা সধন সজন হিন্দু নগর বলিয়া প্রখ্যাত ছিল।—ইহার অভ্যন্তরে বিরাজিত ১৪০০ বুরুজের এক প্রকাণ্ড দুর্গের চিহ্ন-সকল অদ্যাপি বিদ্যমান। এই স্থান গ্রীক্ ইতিহাসে হর্ম্মতেলিয়া (ব্রাহ্মণ-স্থল) বলিয়া অভিহিত ও কথিত আছে এখানে সেকন্দরের একজন সৈনিক বিষাক্ত তরবারাঘাতে আহত হন। আবার ইতিহাসেও ব্রাহ্মণাবাদের অনেক কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রোথিত নগর সিন্ধু হাইদ্রাবাদের কিয়ৎ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে একটী প্রোথিত নগরের ভগ্ন স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কর্ত্তা বেলাশীস সাহেব স্থির করেন তাহাই পুরাবৃত্তের চিরপরিচিত ব্রাহ্মণাবাদের ভগ্নাবশেষ, প্রবাদ এই যে এই নগর দুষ্ট রাজা দলুরায়ের পাপাচারে ভূমিকম্পে বিধ্বংস হয়। সিন্ধী ইতিহাসে তার বিবরণ এই :—

আলোর রাজধানী বিলুপ্ত হইলে পর দলুরায় ব্রাহ্মণাবাদে আসিয়া বাস করেন। ছোটা আমরাণী নামক তাঁহার এক ভ্রাতা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার বিরাগ ভাজন হইয়া পড়েন। এই ছোটা সাহেব তীর্থ যাত্রায় বাহির হইয়া মক্কা হইতে একজন মুসলমানী বিবাহ করিয়া আনেন। ফাতিমা সিন্দুদেশে পদার্পণ করিয়া অবধি দলুরায়ের হস্তে অশেষ অপমান যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ছোটা এই সকল অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্ত্রীকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পালাইলেন। এমন সময় দৈববাণী উঠিল "ব্রাহ্মণপুরী যায় যায়—সাবধান!" তাহা শুনিয়া কেহ কেহ সতর্ক হইল। প্রথম রাত্রে একজন বুড়ী চরখা কাটিতে কাটিতে জাগিয়া চৌকী দিতে লাগিল তাহাতেই নগর রক্ষা পাইল। দ্বিতীয় রাত্রে একজন কলুর সতর্কতায় নগর রক্ষিত হইল। তৃতীয় দিন সুযোগ পাইয়া পুরী একেবারে পাতালে প্রবেশ করিলেন—তাহার একটী মাত্র দুর্গ-স্তম্ভ দৃষ্টান্ত স্বরূপ অবশিষ্ট রহিল।

বেলাসিস্ সাহেব এই ভগ্ন স্তূপ খনন ও বিস্তর অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন যে নগরী ভূকম্পন প্রভৃতি প্রকৃতির কোন প্রবল উৎপাতে সহসা এইরূপ প্রলয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেলাসিস্ সাহেবের খননে ভূমিকম্পই ব্রাহ্মণের প্রলয়ের কারণ বলিয়া সপ্রমাণ হয়। তিনি যে সকল নরকঙ্কাল দেখিতে পান তাহা প্রধানতঃ দ্বারমুখে—কতকগুলি ঘরের কোণে;—যেন লোকেরা কেহ প্রাণ ভয়ে পালায়নোদ্যত—কেহ বা ভয়ে জড় সড় হইয়া এক কোণে বসিয়া মরণ প্রতীক্ষা করিতেছে। কথিত আছে এই ভগ্নস্তূপে চরখায় উপবিষ্টা একটী স্ত্রীলোকের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে যেন স্ত্রীলোকটী চরখা কাটিতে কাটিতে হঠাৎ চাপা পড়িয়া মৃত্যু মুখে পতিত। অগ্ন্যুৎপাতে এরূপ হয় নাই, কেন না কয়লা, দগ্ধকাষ্ঠ প্রভৃতি এমন কোন পদার্থ পাওয়া যায় নাই যাহাতে আগের উপদ্রব সূচিত হয়। প্রাচীরে দহনের কোন চিহ্ন নাই।

এই সকল ভগ্নরাশির মধ্যে কত ভাল ভাল খোদিত প্রস্তর, মাটির ও কাচের বাসন, গজদন্ত, পিত্তল ও কাচের আভরণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা—ধান্যের জালা—সতরঞ্চি ও পাশা খেলার সামগ্রা—অশ্ব গো উষ্ট্র কুকুর কুক্কুট মানব অস্থি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। অস্থি সকল জীর্ণ দশা প্রাপ্ত, অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই সমস্ত দৃষ্টে ব্রাহ্মণাবাদ এককালে ধনধান্য পূর্ণ জনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ নগর ছিল তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয়। বেলাসিস্ সাহেব এই স্থানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন

"এই সমস্ত ভগ্ন রাশির মধ্যে অনেকগুলি খোলা জায়গা বা বেঞ্চি দৃষ্ট হইল—সে সকল হয়ত পুরাণ নগরের হাট বাজার, ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। ইহাদের কোন কোনটা দীর্ঘায়তন—কেল্লার ভিতর দিয়া গিয়াছে। কল্পনা একটুকু ছাড়িয়া দেও, দেখিতে পাইবে এইখানে সৈন্যদের বারাক, এই খোলা ময়দানে তাহাদের প্যারেড হইত। এই পোদ্দারের টাকা কড়ি বিনিময়ের দোকান। এই নগরের প্রবেশ দ্বার, যেখানে মালের উপর কর আদায় হইত। আবার সহজে মনে করিতে পারা যায় এই প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া পুণ্যবতী সিন্দুনদী মহাস্রোতে কল কল রবে বহিয়া যাইতেছে—নানাজাতীয় তরণী তাহার বক্ষের উপর এখনকার মত শোভা পাইতেছে—ধীবরেরা পল্লামৎস্য ধরিতে কলসীর উপর ভরদিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন মনে কর এই নদী তীরে, এই প্রাচীরতলে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রকাণ্ড কারখানা—এইখানে কত মাল বোঝাই-নৌকা নোঙর করিয়া আছে—এই স্থলে নানান্ বাণিজ্য সামগ্রী বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ার্থ রাশীকৃত ও যেমন এখন দেখা যায়—শ্রীমন্ত হিন্দু সওদাগরগণ ক্রয় বিক্রয়ের হট্টগোলে ব্যাপৃত।"

হায়, এই শ্রীসমৃদ্ধি সম্পন্ন জীবন্ত নগর এক্ষণে মৃত্যুপাশে চির নিদ্রিত। ইহার প্রবল কেল্লা দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়াছে। সবে একটী মাত্র বুরুজ স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ অবশিষ্ট—ইহার প্রাসাদ অট্টালিকা গৃহাবলী ইষ্টক ধূলি ও বালুরাশিতে পরিণত, "পেচক ও বাদুড়, শৃগাল ও শার্দ্দূলের আবাস স্থান।" নদী তীরে এককালে যে সকল সুরম্য সুন্দর উদ্যান কানন নগরের শোভা সম্পাদন করিত তাহা কণ্টকাবৃত বন জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সে স্রোতস্বতী আর নাই তাহার প্রবাহ অন্যত্রে বিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দিক শুষ্ক নীরস মরুভূমি। *

দ্বিতীয় ভাগ।

এবার মুসলমানদের হিন্দু-আক্রমণ পালা। সেকন্দর বাদসা চলিয়া যাইবার পর সিন্দুদেশ অনেককাল পর্য্যন্ত হিন্দুরাজাদের অধীন ছিল, মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা বলেন রাজপুত বংশীয় পঞ্চরাহী সিন্দুদেশে ১৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। আলোর তাঁহাদের রাজধানী ও তাঁহাদের রাজত্ব কালে প্রজা সকল সুখ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে রাহী সাহসীর মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন পুত্র সন্ততি ছিল না। রাজ্ঞীর এক ব্রাহ্মণ উপপতি ছিল তাহার নাম কচ্ছ। কথিত আছে যে ন্যায্য উত্তরাধিকারীগণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া রাণী স্বীয় প্রণয়ী কচ্ছের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। অবশিষ্ট রাজপুত বলীদিগকে ছলে বলে কৌশলে পরাজয় করিয়া কচ্ছ রাজা

* Cunningham's ancient Geography of India (Western India.)
The Buried city of Brahmanabad By H. M. Birdwood (Bombay C. S.)

রাজা ডাহীর } অন্যায় লব্ধ সিংহাসনে সুস্থির হইয়া বসিলেন। এই কচ্ছ রাজা ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ডাহীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। †

ডাহীরের রাজত্বকালে সিন্দুদেশ ধর্ম্মান্ধ যবনদল কর্ত্তৃক আপ্লুত হয়। আরবেরা প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিত। তাহাদের একটী জাহাজ ‡ দেওয়াল বন্দরে ধৃত হওয়াতে রাজা ডাহিরের নিকট তাহা প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করা হয়। রাজা সে আবেদন অগ্রাহ্য করেন—এই সামান্য কারণে যুদ্ধের সূত্রপাত। ৭১১

মহম্মদ কাশিম } খৃষ্টাব্দে কালিফ ওয়ালিদের রাজত্বকালে মহম্মদ কাশিম (২০ বৎসরের বালক বৈ নয়) একদল সৈন্য লইয়া দেওয়াল বন্দরে উপনীত হন। প্রথমে একটী মন্দিরের উপর তাঁর যত আক্রোশ। ইহা বন্দরের প্রান্তবর্ত্তী প্রস্তর প্রাচার বেষ্টিত একটী বিখ্যাত হিন্দু দেবালয়—অন্তরে ব্রাহ্মণ বসতি ও রাজপুত সৈন্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। মন্দিরের একটী স্তম্ভের উপর এক নিশান উড়িতেছিল। কাশিম তাহার প্রতি বানপ্রয়োগ করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। পতাকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদিগের এমন ভয়ের সঞ্চার হইল যে তাঁহাদেরও যবন হস্তে পতনের আর বিলম্ব রহিল না। মন্দির অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণদের বলপূর্ব্বক মুসলমান করা এই কাশিমের প্রথম কাজ। তাহাদের অসম্মতি দেখিয়া কাশিম এমনি ক্রুদ্ধ হইলেন যে বয়স্ক পুরুষদের সমূলে নিপাত, বালক ও স্ত্রীলোকদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধনের আদেশ জারী হইল।

মন্দির পতনের পর বন্দর শীঘ্রই যবনদের হস্তগত হইল ও তদনন্তর কাশিম নিরণকোট (এক্ষণকার হাইদ্রাবাদ) দেওয়াল প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইলেন।

এপর্য্যন্ত কাশিমের ভাগ্য সুপ্রসন্ন—অনন্তর ডাহিরের রাজধানী আলোরের নিকট এক মহা যুদ্ধ হয়। রাজা স্বয়ং ৫০ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার রাজধানী সংরক্ষণার্থে অগ্রসর হইলেন। কাশিম পারস্য হইতে নবাগত ২০০০ অশ্বারোহী ও পূর্ব্বকার অবশিষ্ট বল লইয়া হিন্দু সেনার আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজা যে গজপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন দৈবঘটনায় এক অগ্নিগোলা তাহার উপর পড়িয়া হুলস্থুল বাধাইয়া দিল, অবাধ্য হস্তী রণভূমি হইতে রাজাকে লইয়া পলায়ন করিল। এই ঘটনায় যুদ্ধের পরিণাম সূচিত হইল। রাজা অশ্বারূঢ় হইয়া বান জর্জ্জরিত দেহে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না, রণোন্মত্ত আরব সৈন্য-মাঝে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কাল কবলে পতিত হইলেন।

† Burton's Sindh.

‡ Elphinstone বলেন দেওয়াল করাচীর নিকটবর্ত্তী কোন বন্দর ছিল।

বীরাঙ্গনা রাজমহিষী } এই শঙ্কটের সময় রাজ্ঞীর অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিক্ষিপ্ত সেনাদল একত্রিত করিয়া সেই বীরাঙ্গনা ব্রাহ্মণাবাদ রক্ষার একবার শেষ চেষ্টা দেখেন, যতক্ষণ পারিলেন শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন, পরিশেষে অন্নাভাবে সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। আর তাহারা তিষ্ঠিতে পারে না। পরে তাহারা রাজপুত বীরোচিত 'জোহর' ব্রতে ব্রতী হইয়া স্ত্রী পুত্রদিগকে জলন্ত চিতানলে আহুতি প্রদান করিল—পুরুষেরা নগর দ্বার খুলিয়া তরবার হস্তে অরিদলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইহার পর ডাহীরের রাজ্য মুসলমানদের চরণতলে ন্যস্ত হইল। মুলতানে যবন জয়পতাকা উড্ডীন হইল।

ক্রমে হিন্দু ও আরবদের মধ্যে একটা বোঝা পড়ার সূত্রপাত হইল। হিন্দু শ্রেষ্ঠীরা যবনকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু এই সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। হিন্দু দেবালয় উচ্ছন্ন—পূজার্চ্চনা বন্ধ হইয়া পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন হইয়াছে—ব্রাহ্মণদের দেবত্র ব্রহ্মত্র ভূমি সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে—করদ রাজ্যে কি এই সকল অবিচার প্রত্যাপণ করা যাইতে পারে? তাহা হইলে কি পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? কাশিমের মনে এবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি তাঁহার প্রভুর সন্নিধানে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। সেখান হইতে হিন্দুদের প্রীতিজনক উত্তর পাওয়া গেল। বলা হইল যে, যে সকল হিন্দু করদানে প্রতিশ্রুত তাহারা করদ রাজ্যের প্রজার ন্যায় সমস্ত অধিকার পাইবার যোগ্য। তাহারা দেবালয় পুনঃ স্থাপন করিয়া পূজার্চ্চনা করুক তাহাতে কোন আপত্তি নাই, অপহৃত ভূমি সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যর্পণ করা হউক—হিন্দু রাজার আমলে তাহাদের যাহা ন্যায্য পাওনা তাহা হইতে তাহারদিগকে বঞ্চিত করা না হয়।

কাশিম জয়লাভে স্ফীত হইয়া হিন্দুস্থান আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার ভাগ্য ফিরিল। ডাহিরের পরাজয় ও পতনের পর তাঁহার পরমা-সুন্দরী কন্যাদ্বয় যবনদের হস্তে পতিত হইল।

রাজকুমারী } কাশিম রাজকুমারীদিগকে দমাস্কসের কালিফের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। কালিফের সম্মুখে আনীত হইলে জ্যেষ্ঠা যিনি তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিবেদন করিলেন "আমি মহারাজের যোগ্য নাই—কাশিম আমাকে বিদায় করিবার পূর্ব্বে আমার প্রতি ব্যভিচার করিয়াছে।" কালিফ রাজকুমারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ভৃত্যের প্রতি রোষানলে প্রজ্বলিত হইলেন। রাগের মাথায় আদেশ দিয়া পাঠাইলেন "কাশিমকে কাঁচা-চর্ম্ম-থলিতে পুরিয়া সেলাই করিয়া এখনি আমার সম্মুখে হাজির কর।" কালিফের আদেশ সম্পন্ন হইলে পর রাজকুমারীকে ডাকিয়া আনিয়া কাশিমের মৃত দেহ দেখাইলেন। রাজকুমারী আহ্লাদে

উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ! কাশিম বাস্তবিক নিরপরাধী—আমার পিতার মৃত্যু ও কুল কলঙ্কের এই প্রতিশোধ! *

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সর উইলিয়ম জোন্স †।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে উইলিয়ম জোন্সের জন্ম হয়। তিন বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়াতে মাতার উপর তাঁহার শিক্ষার ভার পতিত হয়। এই রমণী অসাধারণ গুণ সম্পন্না ছিলেন। শৈশবেই উইলিয়ম অলৌকিক পরিশ্রম করিতেন; এবং তাঁহার জ্ঞান তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল ছিল। এইরূপ কথিত আছে, যখন তাঁহার বয়স তিন কি চারি বৎসর মাত্র তখন তিনি মাতার নিকট কোন বিষয়ে কিছু জানিতে চাহিলে, তাঁহার মাতা সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন "পড়, তবেই জানিতে পারিবে।" এইরূপে পুস্তকের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব অনুরাগ জন্মিয়া তাহা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর দৃঢ় হইতে লাগিল। হেরো (Harrow) বিদ্যালয়ে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া, তিনি ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের ইউনিবরসিটি কলেজে প্রবেশ করিলেন। স্কুলে থাকিতে তাঁহার অসামান্য কার্য্যপ্রিয়তা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া জনৈক শিক্ষক তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"তাহাকে সল্‌স্‌বেরির ময়দানে উলঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দিলেও সে যশস্বী ও ধনী হইতে পারিবে।"

লাটিন ও গ্রীক তিনি পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ডে আসার পর, পূর্ব্বদেশীয় অর্থাৎ আসিয়ার ভাষা শিখিতে ইচ্ছুক হইয়া, এলেপো (Aleppo) নগর হইতে আগত এক ব্যক্তিকে আরবী ভাষার উচ্চারণ শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। মাতাকে নিজের শিক্ষা ব্যয় হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি এক জন ধনী লোকের পুত্রকে পড়াইতেন। এইরূপে চারি বৎসর গেল। ১৭৭০ অব্দে তিনি "নাদির সাহের জীবনী" নামক এক পারস্য গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় তরজমা করেন এবং এই বৎসর তাঁহার আইন পড়াও আরম্ভ হয়। চারি বৎসর পরে আসিয়ার ভাষা-সকলের কবিতা সম্বন্ধে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৭৮০ অব্দে আরবী ভাষা হইতে কতকগুলি কবিতা তাঁহা কর্ত্তৃক অনুবাদিত হয়।

১৭৭৪ অব্দে তিনি উকীল হইয়া অচিরেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু তখনকার

---

* Elphinstone's History of India.

† মান্দ্রাজের মাসিক পত্রিকা Progress হইতে অনুবাদিত।

কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টে (যাহা বর্ত্তমান হাইকোর্টে পরিণত হইয়াছে) একটা জজিয়তি লাভ করা তাঁহার সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৭৮৩ অব্দে এই পদ ও সর উপাধি লাভ করিয়া এদেশে আগমন করেন। একে ত বিচারকার্য্যে কত পরিশ্রম, তাতে আবার সেসময়ে আজকালকার মত বিচারকার্য্যের বন্দবস্তের এত সুশৃঙ্খলা ও সুবিধা ছিল না, ইংরাজ শাসন ও বিচার কার্য্যের কেবল মাত্র সেই সূত্রপাত হইয়াছে। এমতাবস্থায় সার উইলিয়ম জোন্স তাঁহার আফিসের কার্য্য মনোযোগের সহিত সুসম্পন্ন করিয়া, এদেশে আসিবার অল্প দিন পরেই আবার যে "রয়েল আসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" নামক সভা সংস্থাপন করিবার সময় পাইলেন ইহা বড় কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই সভার উদ্দেশ্য তাঁহার নিজের কথায়ঃ—"আসিয়া ভূখণ্ডের ইতিহাস, পুরাতত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা"। সভার জন্ম হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ইহার সভাপতি ছিলেন। এই সভার জন্মদাতা হইয়া এবং এই সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকাতে নানাবিধ অমূল্য প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া তিনি জগতে অক্ষয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন। *

সাধারণতঃ তিনি কলিকাতা হইতে পাঁচ মাইল দূরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহার জীবনচরিত লেখক লর্ড টেইন মর্ডেথ লিখিয়াছেন—"প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের পর তিনি এস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এবং নিদ্রা হইতে এত প্রত্যুষে উঠিতেন যে উষারম্ভেই পদব্রজে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে পৌছিয়া, কাছারি খুলিবার পূর্ব্ব কয় ঘণ্টা প্রত্যহ নিয়মিত রূপে অধ্যয়নে কাটাইতেন।" কিন্তু ছুটীর সময় তাঁহার কৃষ্ণনগরে থাকা হইত। এখানে ১৭৮৫ অব্দে কিরূপে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহার একটী বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাতে একখানা চিঠি লিখিয়া বাইবুলের দশ অধ্যায় পাঠ, তারপরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও হিন্দু আইন অধ্যয়ন; দুই প্রহরের পর ভারতবর্ষের ভূগোল ও রোম নগরের ইতিহাস পাঠ, দিবসের শেষ কার্য্য কয়েক বাজি দাবা খেলা এবং এরিষ্টোর কিয়দংশ পাঠ।

১৭৮৯ এবং ১৭৯৪ অব্দে তিনি দুই খানি কঠিন ও উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তক ইংরাজীতে [illegible]বাদ করেন—শকুন্তলা ও মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র।

সর্ব্বশেষে, এদেশে বিচার কার্য্যের সুগম হওয়ার জন্য তিনি হিন্দু ও মুসলমান আইন টীকা সমেত প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাকে সাতিশয় পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ইহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে একবার মধ্যে ইউরোপে গমন করেন। ১৭৯৪ অব্দে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে কলিকাতা নগরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

---

* এই সভার বাসস্থান কলিকাতাতেই। ইহা এখনও জীবিত থাকিয়া সর উইলিয়ম জোন্স কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে পূর্ব্বের ন্যায় যত্নবতী। আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র গত বৎসর ইহার সভাপতি ছিলেন। তিনি ছাড়া এদেশীয়দিগের মধ্যে আর কেহ এপর্য্যন্ত এই সম্মান লাভ করেন নাই।

বিদেশীয় ভাষায় অধিকার লাভে তিনি যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, অতি অল্প লোকই তদ্রূপ হইয়াছেন। অন্যূন আটাইশটি ভাষাতে তাঁহার দখল ছিল। এবং ইহাদের অনেকগুলিতেই যে তাঁহার অসাধারণ নৈপুন্য ছিল, তাঁহার কৃত অনুবাদ সকলই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ইহার পর যখন ভাবিয়া দেখি, যে শ্রমসাপেক্ষ বিচারকার্য্য দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া, তবে তিনি লেখা পড়ার সময় পাইতেন তখন তাঁহার প্রতি আমাদের সম্মান শতগুণে বাড়িয়া যায়।

তিনি যে এত মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, কতকগুলি সহজ উপদেশ পালন করিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একটী এই, উন্নতি করিবার যত সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহার একটীকেও অবহেলা করিতে নাই। লর্ড টেইন মর্ডেথ বলেন—"যাহা তিনি একবার করিতে আরম্ভ করিতেন, শত বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে হইলেও তাহা সমাধা না করিয়া ছাড়িতেন না। ইহা তাঁহার জীবনের একটী ধ্রুব সত্য ছিল—ইহা হইতে কখনই তিনি ইচ্ছা করিয়া বিচ্যুত হইতেন না। কিন্তু তিনি যে নিজের ও পরের উপকারার্থ তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এতদূর নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষতর কারণ এই যে, তিনি সময়কে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য ভাগ করিয়া, কার্য্য করিবার সময় সেই ভাগের যাহাতে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না হয় তৎপ্রতি দৃঢ় দৃষ্টি রাখিতেন। এজন্য তাঁহার সকল পড়াশুনা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলিত। আমি ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, গুণ ও শিক্ষার ভেদাভেদ না করিয়া সকল প্রকার লোকের প্রতিই তিনি, সমধিক সরলতা ও প্রসন্নতার সহিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেন। তিনি যথার্থই বলিতেন, অশিক্ষিত বর্ব্বরের নিকট হইতেও অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় সকল জানা যাইতে পারে, এবং তিনি এই দিকে যে কিছু সুযোগ পাইতেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিতেন।"

ধন লালসা তাঁহার মধ্যে একেবারেই ছিলনা। একবার তাঁহার বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব হইলে তিনি এই রূপ লিখেন—"বাস্তবিক আমার যাহা সম্পত্তি আছে তাহা বৃদ্ধি করিবার কোন আবশ্যক নাই। যাহা আছে তাহাই আমার পক্ষে প্রচুর। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের সমগ্র ব্যবস্থাপক সভা যদি আমাকে আমার বর্ত্তমান পদ হইতে পৃথক একটী পদ অর্পণ করেন, আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ও বিনীত অন্তরে তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইব। তাঁহার জীবনচরিত লেখক বলেন নিজ চরিত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে তিনি এত দূর সতর্কিত ছিলেন যে তাঁহার যে সকল বন্ধুদিগকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন এবং যাহাদের উন্নতি দেখিলে সুখী হইতেন—তাহাদিগের কাজের জন্যও কখনও উপরওয়ালাদিগকে অনুরোধ করিতেন না।"

কিন্তু সর উইলিয়ম জোন্সের চরিত্রের প্রধান ভূষণ, মানব জাতির উপকার করিবার

জন্য প্রবল ইচ্ছা। এই উচ্চাভিলাষ সমুদ্রে তিনি সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন। জ্ঞান যে কেবল মাত্র উপায় কিন্তু উদ্দেশ্য নয়, জ্ঞান মনুষ্যকে প্রকৃত সুখ স্বাধীনতা, সত্য উপার্জ্জনের পথ দেখায়, ইহা মনে রাখিয়া তিনি জ্ঞানকে ভাল বাসিতেন।

ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ উভয় দেশেই তাঁহার স্মরণার্থ সম্মান সূচক নিদর্শন আছে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষেরা লণ্ডন নগরস্থ সেণ্টপলের গির্জ্জাতে একটি এবং কলিকাতায় একটী প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

হ, চ, সি।

প্রয়াগে।

আমাদের বাঙ্গালার কাছাকাছি একটি মন্দির আছে, সে দিন ভোরের বেলায় সেই মন্দিরের রসানচৌকিতে প্রভাতরাগিনী বাজিয়া উঠিয়াছিল, এখনো বাজে, কিন্তু সে দিন সেই গানে হৃদয় যেমন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন আর তেমন হয় না।

সে দিন সে রাগিনীতে ছোট তিনটি ভাই বোনের মধুর কণ্ঠতান শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাহাদের হৃদয়ের আনন্দ প্রবাহ সেদিন সঙ্গীত হইয়া ঐ গানের প্রাণে তরঙ্গ তুলিয়াছিল—তাই সেদিনকার প্রভাত রাগিণী তেমন মধুর লাগিয়াছিল,—অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া তেমন উথলিয়া উঠিয়াছিল;—তাহারা চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সঙ্গের সে হাসি, গান, আমোদ আহ্লাদ—যাহাতে এখানকার সকলি মধুর হইয়া, আলো হইয়াছিল—তাহা সঙ্গে লইয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে তাই ঐ বাঁশি আর এখন তেমন সুরে বাজে না, প্রভাতে এখন আর তেমন সৌন্দর্য্য নাই।

তাহারা আর যাহা সঙ্গে আনিয়াছিল—সব লইয়া গেল, কেবল আমাকে একাকী ফেলিয়া গেল। সময়ের আজ্ঞা বড় নিদারুণ, তাহার কাছে স্নেহ মমতা নাই। তাহাদের সময় হইয়াছিল—তাই তাহারা আমার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না; আমার সময় হয় নাই—আমি এখনো পিছনে পড়িয়া আছি; উৎসুক প্রাণে সময়ের মুখপানে চাহিয়া সেই সুখের মিলনের দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, আর সেইরূপ আর একটা দিন যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কথা মনে করিতেছি।

সেদিনকার প্রভাত কি মধুর প্রভাত, সে দিন স্নেহ প্রেম ভক্তি একত্র মিলিয়া বাগানের রাশি রাশি গোলাপ ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে দিন প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের আনন্দ কিরণ তরুণ সূর্য্যরশ্মিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া, বাগানের লতা পাতার ফুলফলের শিশির কণার উপর ঝলমল করিয়া উঠিয়াছিল, সে শিশিরকণাও যেমন আর কিছু নহে, বহুদিন পরে প্রিয়জন মিলনের বিমল প্রেমাশ্রু। সেইদিনকার সেই

সৌন্দর্য্যময়, লাবণ্যময় প্রেমময় প্রভাতে ফুলের পরিমলের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ও অনন্ত পরিমলের রাজ্যে উত্থিত হইয়াছিল তাই সে দিন এত মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সেই এক প্রভাত, আর আজ এই এক প্রভাত। আজও প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু যাদের লইয়া প্রভাতের সৌন্দর্য্য, এ প্রভাতে তাদের কিছুই নাই, প্রভাতের সে ফুল নাই, সে মধুর বাতাস নাই, সে উষার হাসি নাই। প্রভাতের আলো—প্রভাতের প্রাণ যে সূর্য্য—সে আজ মেঘের মধ্যে লুকাইয়া, অথচ প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার শুদ্ধ প্রাণ কেমন করিয়া উঠিতেছে। আজ বলিয়া নহে, ক্রমাগত আজ ৮।১০ দিন হইতে এইরূপ মেঘের মধ্যে সূর্য্য উঠিয়া মেঘের মধ্যেই অস্ত যাইতেছে। সাধারণতঃ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে মেঘ বৃষ্টি বাদল বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা একেই অনেক কম, তাহার পর শীতকালে ক্রমাগত এতদিন ধরিয়া এরূপ বৃষ্টি হওয়া এদেশের পক্ষে নিতান্তই নূতন ব্যাপার, গরীব দুঃখী গরু বাছুরের কি ভয়ানক কষ্ট! সারাদিনই প্রায় বৃষ্টি হইতেছে, দুপর বেলা বৃষ্টি একটু ধরে, আকাশটা একটু পরিষ্কার দেখায়, নিরাশ হৃদয়ের আশার মতন চারিদিকটা একটু প্রসন্ন দেখায়, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার যে কে সেই হইয়া পড়ে। এই হাসিহীন, আলোহীন অন্ধকার প্রভাতের মুখের পানে ত আর চাওয়া যায় না, এই মলিন দিন গুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমরাও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, প্রতিদিন সূর্য্যের মুখ দেখিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিতেছি, প্রতিদিনই নিরাশ হইয়া পরদিনের জন্য আবার আশায় থাকিতেছি। আশার এই অনিশ্চিততার মধ্যে পড়িয়া আশাটাও এমন কষ্টকর বোধ হইতেছে যে—'আশাতেই মানুষের সুখ' এই যে পুরাতন জ্ঞানী বচনটি ইহার প্রতিও আর আস্থা রাখিতে পারিতেছি না, বরঞ্চ বিপরীতই মনে হইতেছে, মনে হইতেছে এরূপ আশা অপেক্ষা একেবারে নিরাশাও ভাল। আমি যদি বৃষ্টির প্রথমেই জানিতে পারিতাম যে এক আধ দিন নয় এমন গোটা দশ দশ দিন—কি আরো বেশী—এই অন্ধকারের মধ্যেই বাস আমার অদৃষ্ট লিখন, তাহা হইলে আর কিছু না হউক প্রতি দিনকার এই আশার সুখ ভোগ হইতে রেহাই পাইয়া বাঁচিতাম। আমি ত বলি নিশ্চিৎ কষ্ট যাহা সহিতে হইবেই জানি—তাহা অপেক্ষা অনিশ্চিতের কষ্ট আরো ভয়ানক, মৃত্যুভয় আর কি সেই জন্যই শ্রেষ্ঠ ভয়।

তবে আমার এইরূপ মনে হইতেছে—বলিয়া সকলেরই যে এইরূপ মনে হইবে তাহা নাও হইতে পারে। এমনও লোক থাকিতে পারেন—যিনি অনবরত দশ দিন এই অন্ধকারের মধ্যে থাকিতে হইবে আগে থাকিতে জানিলে একেবারেই চারিদিক অন্ধকার দেখিতেন। তিনি বলিতে পারেন—"আশা আছে বলিয়াই নিরাশার বিরক্তি সহা যায়—অদৃষ্টের অন্ধকার জানা হইতে না জানাই ভাল। ইত্যাদি"

কিন্তু তিনি বলিলেও আমি যে কথাটি মানিয়া লইব এমন হইতেই পারে না। তাঁর

পক্ষে কথাটা সত্য হইতে পারে, লোকেও একথাটা যুক্তির আকারে দেখিতে পারে— কিন্তু যতক্ষণ আমি ইহা সত্য বলিয়া না মানি ততক্ষণ ইহা সত্যই হইতে পারে না। বরঞ্চ আমি ইহা হইতে এইরূপ স্বীকার করিব—যে, একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছার সাজে ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভিন্ন একথার অন্য কোনরূপ গুরুত্ব আছে ইহা আমি আদপেই মানিনা। লোকে আমার এই দৃঢ়তাকে একগুঁয়েমি, কুতর্ক, স্ত্রীলোকের যুক্তি, প্রভৃতি নানারূপ নামে অভিহিত করিয়া থাকে, কিন্তু আমি ইহাকে মনুষ্যত্ব বলি; আর যাহারা এই উচ্চ মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত তাহারা যে কেবল হিংসার জ্বালাতেই এইরূপ করিয়া বলে সে বিষয়েও আমার সংশয় মাত্র নাই, বুদ্ধিমান মাত্রেরই সংশয় থাকিতে পারে না। কিন্তু আমার একটি ঝগড়াটে বন্ধু আছেন তিনি বুদ্ধিমান—ঠিক হইল না—বুদ্ধিমতী হইয়াও আমার এ কথা মানিতে চেন না, (ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে— আমার কথায় যাঁহারা সংশয় করেন—তাঁহারা নির্বোধ শুধু নন্—আবার ঝগড়াটে) আমার এই কথা শুনিলেই তিনি এমন অধৈর্য্য হইয়া উঠেন, তাঁর তর্কের বস্পটা এমন উত্তেজিত হইয়া উঠে—যে তখন তাঁহার ছোট ছোট ঠোঁট দুখানির ভিতর দিয়া অনবরত খই ফুটিতে থাকে, আর বড় বড় চোখ দুটি উত্তরোত্তর লাল হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে ডরাইয়া আমি যে আমার মতের তিল-চুল তফাতে গিয়া পড়ি এমন নয়। তবে সে চোখ রাঙ্গানির একটা ফল হয় এই, তাহা দেখিলে আমার কলিকাতার রৌদ্রময় দিন গুলা মনে পড়িয়া যায়, এই বাদলার দিনেও তাহাতে আমাকে একটু গরম করিয়া তোলে, সুতরাং অবকাশ পাইলেই মাঝে মাঝে আমি তাঁহার সহিত তর্ক করিতে বসি।

আজ এখনো বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই কিন্তু আকাশে মেঘ, আর নীচে চারিদিকে কুয়াসা, এ বড় বিশ্রী অন্ধকার, অন্ধকারের ঠিক এ রকম একগুঁয়ে গুমসা মূর্ত্তি কলিকাতায় দেখিয়াছি মনে হয় না। রৌদ্রের দিনে ও দেখের বাঙ্গলার মাঠের সীমান্তে বড় বড় গাছগুলি কেমন চক্রাকারে সুন্দর সাজিয়া থাকে—আজ তাদের চিহ্নও নাই। ক্ষেতের অরহর, ভ্যারেণ্ডা, যওয়ারির বিস্তীর্ণ বন একেবারে ধূমাচ্ছন্ন, এই ধূম সমুদ্রের মধ্যে আমাদের বাঙ্গলাটা যেন একটা জাহাজ বলিয়া ম . হইতেছে। সম্মুখের পাতকুয়াটা হইতে চাকরদের কপিকলে জল তুলিবার অবিশ্রান্ত ঘড়ঘড়ানি, আর নিকট দিয়া ট্রেন যাইবার ধকধকানিতে এই জাহাজি খেয়াল যেন মনে আরো ভাল করিয়া বসাইতেছে। জানালা দিয়া বাঙ্গলার আশে পাশের যে দুই একটা আম পেয়ারার গাছ চোখে পড়িতেছে—মনে হইতেছে, উহারা যেন এক একটা দ্বীপ, আর বাগানের ধারের ঐ যে কাশ বনের মাথার সাদা সাদা শিষগুলি কুয়াসা মাখা হইয়া অস্পষ্টরূপে মাঝে মাঝে ঈষৎ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, উহা যেন অদৃশ্য নৌকার পাল, উহার ওদিকে আর কিছুতেই দৃষ্টি চলে না।

দিনটা এমনি বিশ্রী, পাখীপখালি গুলাও আজ ঘরের বাহির হইতে চায় না, পরিষ্কার দিনে রোজ এ সময় সমুখের ঐ আম গাছে একটি কেমন রংচঙ্গে পাখী লম্বা পুচ্ছ নাচাইয়া শিষ দিত, কদিন হইতে তাহাকে আর মোটেই দেখিতেছি না। আমি রোজ সকালে জানালার সম্মুখে ছোলা ছড়াইয়া দিই, রাজ্যের পাখী আসিয়া খাইতে আরম্ভ করে, আজ অনেকক্ষণ হইতে যেখানকার ছোলা সেই খানেই পড়িয়া আছে, একটি কাকও তাহা খাইতে আসে নাই, কেবল দু একটা কাঠবিড়ালি মাঝে মাঝে ঐখানে আসিয়া চকিত দৃষ্টিতে চারিদিক পানে চাহিয়া দুই একটা ছোলা মুখে লইয়া পলাইতেছে।

এই আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল, পূর্ব্বে কি পশ্চিমে বলিতে পারিনা—একটা কনকনে বাতাসের ঝাপটাও বহিতে আরম্ভ হইল, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কুয়াসাগুলা মেঘের মত কেমন উড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে, বাতাসে আমার হাত এমনি কনকন করিয়া অবশ হইয়া পড়িতেছে, যে মাঝে মাঝে লেখা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে,—হাত খানিকক্ষণ গরম না করিয়া আর লেখা যায় না,—মনে হইতেছে ঘরে আগুন থাকিলে ভাল হইত, কিম্বা মুড়ি সুড়ি দিয়া বিছানায় পড়িয়া যদি দিনটা কাটাইতে পারিতাম তাহা হইলেও মন্দ হইত না। আমি আর কখনো এরূপ শীত ভোগ করিয়াছি এমন মনে পড়ে না, রাত্রে একটা লেপ—একটা বালাপোষ, দুই জোড়া কম্বল—(আসলে চারখান হইল) গায়ে দিয়াও আমার শীত ভাঙ্গে না—আবার খানিক রাতে তার উপর আর কিছু চাপাইতে হয়। কলিকাতায় বসিয়া এশীত ঠিক বুঝা যায় না, তরল হৃদয় সুখী ব্যক্তিরা সুখের রাজ্যে বসিয়া যতটুক পরের দুঃখ অনুভব করিতে পারে—আমার মনে হয়—কলিকাতায় বসিয়া এ শীত ততটুকুর বেশী আর বুঝা যায় না। যাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়াছেন তাঁহারা বলেন, ইংলণ্ডের শীতকাল অনেকটা এই রকম। এই কথাটা শুনিয়া অবধি এত ঠাণ্ডার মধ্যেও শীতটা আরো একটু বেশী রকম ঠাণ্ডা হইয়াছে, হইলই বা বৃষ্টি বাদল কুয়াশা শীত,—ইংলণ্ডে না গিয়াও ইংলণ্ড ভোগ করিতেছি—এ কি কম সৌভাগ্যের কথা!

কিন্তু এখানকার শীতে আমার যতকষ্ট হয়—এ দেশের লোকের তা হয় না—তাহারা আমার শীত দেখিয়া অবাক হয়। এই শীতে এদেশে অনেকে একেবারে বাহিরে পড়িয়া থাকে। দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়, কিন্তু যাঁহারা অনেক দিন এদেশে আছেন তাঁহারা বলেন, এদেশের ছোট লোক বলিয়া নহে, বড় লোকেরাও ঘরের ভিতর শোয় না। মোটা মোটা লেপ মুড়ি দিয়া খোলা বারান্দায় শোওয়া এখানকার একটা দস্তুর, ছেলেবেলা হইতে এ দেশের সকলের এইরূপ অভ্যাস। তবে যাহারা গরীব তাহারা অনেক সময় গাছতলায় থাকে বড় লোকেরা বারাণ্ডায় থাকে এইমাত্র নাকি তফাৎ।

এই শীতের উপর রাতে আর এক উৎপাৎ—চোরের ভয়। এদেশের লোকের বাঁচিয়া কি সুখ আমি ত ভাবিয়া পাই না। তবে আমি ভাবিয়া পাই আর নাই পাই তাহাতে যে তাহাদের কিছু আসে যায় না, তাহাতে যে তাহাদের বাঁচিবার কোন ব্যাঘাত

জন্মে না, বা তাহাদের জীবনের মূল্য ধনীদিগের অপেক্ষা একতিলও কমিয়া যায় না, এমন প্রমাণ প্রত্যহ অজস্র পাইতেছি, আর ইহা হইতে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি—যে, সুখই জীবন অর্থাৎ সুখের জন্যই জীবন এ কথাটা ঠিক কথা নহে, জীবনের জন্যই জীবন অর্থাৎ বাঁচাতেই সুখ ইহাই খাঁটি কথা, নহিলে এত দীন দুঃখী আতুর এত দিনে মরিয়া যাইত।

আমাদের বাঙ্গলাটা আবার যেরূপ মাঠের মধ্যে তাহাতে এখানে চোরের ভয়টা আরো কিছু জবর রকম। শুনিতে পাই চারি দিক হইতে চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের বাঙ্গলার পূর্ব্বদিকের মাঠে আসিয়া চোরেরা ভাগ বাটরা করিত, এস্থানটা তাদের একটা আড্ডাস্থান। আর পুলিস ইহা জানিয়াও তাহাদের কিছু বলে না। সেই জন্য প্রথম প্রথম এই বাঙ্গালায় লোক আসিলেই চোরেরা উৎপাৎ করিয়া তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিত। তবে বন্দুকের ভয়ে ও গৃহ-স্বামীর সতর্কতায় এবারটা তাহারা কিছু জব্দে পড়িয়াছে, তবু নাকি আমরা আসিবার আগে খোদ চৌকিদারকে লাঠি মারিয়া তাহার ঘর হইতে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। যাই হোক আমরা আসিয়া অবধি এপর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গলায় চুরী হয় নাই, তবে ভয়টা যে ছাড়িতেছে তাহা নহে, কেননা চাকরদের কাছে চোর আসিয়া পলাইবার কথা আর তাহা ছাড়া আমাদের বাড়ীর কাছের অন্ধখানার বেচারী গরীবদের ঘর হইতে চুরী যাইবার কথা প্রায়ই ত শুনিতে পাই। এইরূপ চুরীর কথা শুনিলেই আমার মনে হয় যে চোরগুলা নিতান্তই বোকা চোর, যদি চুরীই করিতে হয় ত তাহারা লাট সাহেবদের ঘরে চুরি না করিয়া—বেচারা গরীবদের ঘরে চুরী করে কেন? শুনিলাম তাও নাকি চোরেরা বাকী রাখেনাই, একবার নাকি এখানকার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের ক্যাম্পে বড় আশ্চর্য্য রকম চুরী হইয়াছিল।

মফস্বলের এক বিস্তীর্ণ মাঠে ছোট লাটের ক্যাম্প পড়িয়াছে, মেলাই তাম্বু, উট, ঘোড়া, গরু, গাড়ী সিপাই শান্ত্রি—লোকজনে ক্যাম্প ভরপূর। ক্যাম্পের বাবুদের সালরুমাল সাহেবদের ঘড়ি চেন, চাঁদির বাসন, ভাল ভাল কাপড়, জিনিসপত্র, নগদ টাকা—এই সব দেখিয়া চোরেদের মহা লোভ পড়িয়া গেল। কিন্তু খোদ লাট সাহেবের ঘরে চুরি করা ত সহজ কথা নয়, অষ্টপ্রহর শস্ত্রধারী প্রহরীরা চারিদিক চৌকি দিতেছে, তাম্বুর কাছাকাছি এমন জঙ্গলটুকও নাই যাহাতে লুকাইয়া ক্ষণকালের জন্যও প্রহরীদের দৃষ্টি এড়ান যাইতে পারে—সুতরাং চোরেরা মহা মুস্কিলে পড়িল, কিন্তু তবু হতাশ হইল না। দুচার দিন ধরিয়া ক্যাম্পের বাহিরে দূরে দূরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধান ও উপায় বাহির করিতে লাগিল—তাহার পর একদিন অন্ধকার রাতে এক একটা মস্ত মস্ত গাছের ডাল কাটিয়া, তাহা হাতে লইল, এবং এক এক জনে স্বতন্ত্র হইয়া সেই বিস্তীর্ণ মাঠে এক একটা ছোট গাছের মত একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা পাহারার মধ্যে আসিয়া পড়িবার আগেই ক্যাম্পের কুকুরেরা চীৎকার করিতে

করিতে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইল, কুকুরের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আগে হইতেই চোরেরা উপায় ভাবিয়া আসিয়াছিল, যেই কোন কুকুরকে তাহাদের কাছাকাছি আসিতে দেখে তাহারা বিষমাখান মিষ্টান্ন ফেলিয়া দেয় কুকুর তাহা খাইতে আরম্ভ করিয়া চুপ করে, তাহার পর একেবারেই চুপ হইয়া পড়ে। সিপাইরা কুকুরদের প্রথম চীৎকারে একবার এদিক ওদিক দেখে, গাছছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, বিশেষ কুকুরদেরও পরে চুপ করিতে দেখিয়া তাহাদের আর সন্দেহও থাকে না। এইরূপে তাহারা কুকুরদের হাত ছাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে প্রহরীদেরও হাত ছাড়াইল। প্রহরীরা পায়চালি করিয়া পাহারা দিতে দিতে যখন চোরেদের সম্মুখান হইয়া চলে তখন চোরেরা নিস্তব্ধে গাছের মত দাঁড়াইয়া থাকে আর যেই প্রহরারা মুখ ফিরাইয়া চলিতে থাকে তাহারা অমনি অগ্রসর হয়। এইরূপে তাহারা কলে কৌশলে প্রহরীদের নিরস্ত করিয়া খোদ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের তাম্বু হইতে চুরি করিয়া স্বচ্ছন্দে নাকি পলায়ন করিল। শোনা যায় একবার এখানে মিউনিসিপালিটির আফিস হইতেও এইরূপ একটা ভয়ানক চুরি হইয়া যায়। মিউনিসিপাল আফিসের নিকটেই মেজিষ্ট্রেট কালেক্টর প্রভৃতির আফিস, পুলিস পাহারার স্থান,—তবু স্বচ্ছন্দে চোরেরা আফিসের ভিতর হইতে—আট দশ জন লোকের তুলিতে কষ্ট হয়, এমন একটা লোহার সিন্দুক তুলিয়া দূর মাঠে আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়।

এই চোরের হেঙ্গামে এখানে রীতিমত চৌকিদার চাকর না রাখিলে চলে না। পাশি বলিয়া এক রকম ছোট জাত আছে, তাহারাই নাকি বেশীর ভাগ চোর ডাকাতি করে, আর তাহারাই আবার চৌকিদার। যাদের ঘরে তাহারা চাকর থাকে তাদের ঘরে নাকি চোরের উৎপাৎ হয় না, এইরূপ ত লোকেদের একটা বিশ্বাস। আমাদের দুইটা চৌকিদারই পাসি। তাহাদের মধ্যে একজন চৌকিদারের জীবনটা নিতান্ত নভেলি রকম।

একদিন ঘরে বসিয়া আছি, জানালার কাছ দিয়া একটি যুবতী স্ত্রীলোক করুণ স্বরে কাঁদিয়া চলিয়া গেল। তাহাকে আগে কখনো দেখি নাই, তাহার কান্নার স্বরে তাহার প্রতি বড় মায়া উপস্থিত হইল, মনে হইল, সে কান্না যেন কোন একটা বিশেষ কষ্টের কান্না, আমি আমাদের সর্দার চাকরকে (জাতিতে ক্ষত্রিয়) ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ও কে? কেন কাঁদিতেছে" সে বলিল "ও মাধব চৌকিদারের ছোট স্ত্রী, দুই এক দিন হইল দেশ হইতে আসিয়াছে। স্বামী উহাকে রাখিতে চাহিতেছে না, তাই কাঁদিয়া যাইতেছে—" এই উপলক্ষে চৌকিদারের দুই স্ত্রী হইবার ঘটনা শুনিলাম। চৌকিদার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফাঁদে পড়িয়া মরিসসে কুলি হইয়া যায়। অনেকদিন ধরিয়া বাড়ীতে তাহার আর কোন খোঁজ খবর রহিল না, স্ত্রী অন্নাভাবে মহা কষ্টে পড়িল। শেষে ৫ বৎসর পরে স্বামীর আশা ছাড়িয়া স্বামীর বড় ভাইকে আবার সে বিবাহ করিল।

তাহাদের সন্তান সন্ততি হইল। এদিকে ইহার কিছুদিন পরে মাধব অনেক ধন কড়ি লইয়া দেশে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু তখন আর তাহার ধন ভোগ করিবার কোন লোক নাই, তাহার স্ত্রী আর তাহার স্ত্রী নাই। মাধব চারিদিক শূন্য দেখিল, তাহার স্ত্রীরও কষ্টের সীমা রহিল না। কিন্তু তখন আর উপায় কি, মাধব কিছু দিন পরে আবার বিবাহ করিয়া ঘর কন্না করিতে লাগিল। ইহার অল্প দিন পরে মাধবের ভাই মরিয়া গেল। তাহার স্ত্রী (মাধবের বড় স্ত্রী) নিতান্ত দুর্দ্দশায় পড়িয়া মাধবের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। তাহার কষ্ট দেখিয়া মাধব আর সমস্ত কথা ভুলিয়া তাহাকে আবার স্ত্রী রূপে গ্রহণ করিয়াছে। শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলাম। এতখানি উদারতা—এতখানি অকৃত্রিম মমতা একজন ভদ্র নামধারী ব্যক্তিতেও ত দুষ্প্রাপ্য। এই কথা শুনিয়া আমি ছোট স্ত্রীকে আমার কাছে জানালায় ডাকিতে বলিলাম, সে আসিয়া তাহার দুঃখ জানাইতে লাগিল, তাহার স্বামী দেখিল বেগতিক, সেও আসিয়া তাহার যন্ত্রণা নিবেদন করিতে আরম্ভ করিল, অবশেষে দুজনেই গৃহস্বামীকে সালিসি মানিয়া বসিল। তিনি খাঁটি বিচার করিয়া দিলেন, বলিলেন—যদি দেশে পাঠাইতে হয়—ত দু স্ত্রীকেই দেশে পাঠাও—এক জনকে এখানে রাখিবে—এক জনকে দেশে পাঠাইবে সে হইতে পারে না। আর দেশে পাঠাইলেও উহাদের ভরণপোষণের জন্য তোমার অর্দ্ধেক মাহিনা প্রতিমাসে উহাদের দু জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দাও।"

এই বিচারে সকল পক্ষই এমন সন্তুষ্ট হইল, ঝগড়াটা এমন মিটমাট হইয়া গেল,—যে দুই স্ত্রী বাড়ী যাইবে ঠিক করিয়া কেহই বাড়ী গেল না, দু জনেই স্বামীর ঘর করিতে লাগিল।

দু এক দিন তাহাদের বেশ চলিল, তাহার পর আবার সেই চুলা চুলি ঝগড়া ঝাঁটি, স্বামীর সঙ্গে গণ্ডগোল। মাধব সেবার দুই জনকে বিদায় না করিয়া আর নিষ্কৃতি পাইল না।

দুই স্ত্রী লইয়া মাধবের ত এই রূপ দুর্দ্দশা, ভাগের স্বামী হইয়া সে গঙ্গা যাত্রারও উপায় পাইতেছে না। স্ত্রীদেরও কষ্টের সীমা নাই, স্ত্রীরা ঝড়ের মত একবার করিয়া আসিতেছে—আবার তাড়া খাইয়া দুই দিকে দুজনে সরিয়া পড়িতেছে, অনবরত এই রূপই ঘটিতেছে। তাহাদের এই যাতায়াতের মধ্যে একটুখানি এই মজা আছে,—দুই স্ত্রীর বাপের বাড়ী এক জায়গায় নহে, অথচ একজন যদি স্বামীর কাছে আসে—অন্য জনও যেন ভাবে খবর পায়, দু এক দিনের মধ্যে সেও আসিয়া পড়ে। এখানে আসিবার পর প্রথম দু চার দিন দেখি সতীনে সতীনে বড় ভাব, বড় ছোটর চুল বাঁধিয়া দিতেছে, দুই জনে হাসিয়া গল্প স্বল্প করিতেছে, ছোট সারাদিনই বড়র ছেলেকে কোলে করিয়া আছে—এই রকম। কিন্তু একবার যখন ঝগড়া করিতে আরম্ভ করে তখন আর রক্ষা নাই, স্বামী মারিয়াও তাহাদের—বিশেষ বড় স্ত্রীকে থামাইতে পারে না। ছোট স্ত্রী বেচারী

ভাল মানুষ,—সে জানে যে সে তাহার স্বামীর দুয়ারাণী—কাজেই অল্পেতেই চুপ চাপ করিয়া যায়, বড় মনে জানে যে স্বামী তাহার সুতরাং মনের জোরে গলাটা তাঁহার ক জেই দ্বিগুণ হইয়া পড়ে। তাহাদের এই ঝগড়াঝাঁটি আমাদের শুদ্ধ এমন বিরক্ত করিয়া তোলে যে ইচ্ছা করে বঙ্কিম বাবুর দেবী চৌধুরাণীর আদর্শটা তাহাদের চোখের সমুখে ধরিয়া সতীনে সতীনে কিরূপ ভাব করিতে হয় শিখাই। দুঃখের মধ্যে তাহা তাহারা বুঝিবে না। চৌকিদারের এই কষ্টে সকলেরই তাহার উপর সহানুভূতি, কিন্তু ইহাতে যে তাহার কষ্ট কত দূর নিবারিত হয় তাহা বলিতে পারি না।

ছোট জাত বলিয়া নহে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও এ দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। কেবল বিধবা বিবাহ নয় বিধবারা স্বামীর ভাইকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারে। আমাদের যে ক্ষত্রিয় চাকর আছে তাহার বড় ছেলে মরিয়া গেলে তাহার সেই বিধবা পুত্রবধূকে তাহার মেঝ ছেলে বিবাহ করিতে চাহিল। কিন্তু বধূ তাহাতে কোন মতেই সম্মত হইল না, পুত্র তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে গেল। কিন্তু শ্বশুর ন্যায়ের পক্ষ হইয়া বধূকে তাড়াইতে দিল না, তখন পুত্র রাগ করিয়া নিজেই বাপের বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সেই বধূ কিছু দিন পরে অন্য এক-জনকে বিবাহ করিল, তাহার সন্তানাদি হইল, তাহার পর আবার বিধবা হইয়া কষ্টে পড়িয়া পূর্ব্ব শ্বশুরের নিকট আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধের ছেলেরা সকলেই তাহাতে নারাজ কিন্তু বৃদ্ধ নিরাশ্রয় পুত্রবধূকে আবার আশ্রয় দান করিয়াছে। ক্ষত্রিয় জাতির এত অবনতিস্বত্বেও উহাদের মধ্যে এখনো কতদূর উদারতা আছে তাহা এই ঘটনাটি হইতে দেখা যায়। ক্ষত্রিয়দের আরও দুই একটি বিশেষ গুণ দেখিলাম, তাহারা বড় বিশ্বাসী,আর তাহারা মদ আদপে স্পর্শ করে না মাছ মাংসের ত কথাই নাই। ক্ষত্রিয়দের যে মদ্য পান করিতে নাই, তাহা জানিতাম না, বামুনরা এ দেশে নাকি আবার তামাক পর্য্যন্ত খায় না। কিন্তু ইহা শুনিয়া আমার একটু গোল বাধিয়াছে। কলি-কাতায় পশ্চিম হইতে যে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া দ্বারবান হয়—তাহারা ত খুব তামাক খায়। বামুনদের ভিতর এদেশেও বিধবা বিবাহ নাই। বোধ করি ক্ষত্রিয় ছাড়া—এদেশের অন্য উচ্চ জাতির মধ্যেও বিধবা বিবাহ নাই।

এ দেশের ভদ্র লোকের পরিবারের মধ্যে জানানা নিয়ম বড় কড়াক্কড়—বঙ্গের মত নয়। এই সকল দেশই কি না মুসলমানদের প্রধান আড্ডা স্থান ছিল। এখানকার এক-জন সম্রান্ত ব্যক্তি—কুমার—সিংহের স্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, আমিও প্রতি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কুমার বিলাত প্রত্যাগত একজন ব্যারি-ষ্টার। তিনি তাঁর স্ত্রীকে শিক্ষিত করিয়া সমাজে (ইংরাজ সমাজে) মিশাইতে চাহেন, তাই একজন মেম রাখিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতেছেন। শিক্ষাটা শেষ হইলেই সমাজে আনিবেন বলেন,—কিন্তু কবে শেষ হইবে—তাহাই কিছু সমস্যা; এখনো তিনি এত দূর

পরদানিশান যে ব্যাম হইলে ডাক্তারও তাঁহার মুখ দেখিতে পায় না পরদার ভিতর হইতে তিনি ডাক্তারকে হাত বাড়াইয়া দেন, তবে ইংরাজ ডাক্তার হইলে তাহার সহিত দেখা করেন। কুমারিণীর নিকট তাঁহাদের ... আচার ব্যবহারের অনেক কথা শুনিলাম। অনেকটা আমাদের ... কিছু বিভিন্ন। তাঁহাদের বিবাহ যদিও বাল্যকালে হয়, কিন্তু আমাদের ...চারের পদ্ধতি অপেক্ষা এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিয়ম অনেক ভাল। ...না হইলে বিবাহিত হইয়াও কন্যা শ্বশুর গৃহে আসে না। এ দেশের কি ভদ্র—কি ছোটলোক সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে—স্ত্রীলোকদের নৃত্য গাতটা বিশেষ প্রচলিত, সকলের ঘরে ঘরে ঢোলক থাকিবেই, আমাদের একজন বন্ধুর বাড়ী একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্য আছে, তাহার নব বিবাহিত পুত্রবধূ নাচিতে জানে শুনিয়া শ্বশুর মহাসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ঘুঙ্গুর গড়াইয়া দিয়াছে। আমাদের দেশে একথাটা কিরূপ শোনায়? কেবল এ দেশ বলিয়া নয়—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায়—মেয়েদের গান বাজনাটা একটা দস্তুরের মধ্যে দেখিতে পাই—কেবল বঙ্গদেশেই ইহা দোষের মধ্যে পরিগণিত। কেন যে আর্য্য দেশে—এরূপ অনার্য্য অস্বাভাবিক প্রথা চলিত হইল তাহা ত বুঝিতে পারি না—কেহ কি বলিতে পারেন?

শুনিতে পাই, এ দেশে ৩৫৪শ ঘর পরিবারওয়ালা ভদ্র বাঙ্গালী বাসেন্তা আছেন। কিন্তু আমার সহিত এদেশে বেশী মেয়ের যে আলাপ হইয়াছে তাহা নহে। এখানে আমার যে একটি পুরাতন বন্ধু আছেন—তাঁদের বাড়ীতে নূতন দু একজনের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে—তাহা ছাড়া আর একটিমাত্র পরিবারের সঙ্গে আমার এবার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছে। আমি যে পুরাতন বন্ধুর কথা বলিতেছি—তাঁহার সহিত আমার অনেক দিনের বন্ধুতা, যখন প্রথম বার এদেশে আসি—তখনই তাঁহাকেপ্রথম দেখি,সেই প্রথম দেখাতেই (তাঁহার কথা জানি না) আমি ভাল বাসিতে আরম্ভ করি। প্রথম হইতেই তাঁহার সেই মিষ্টি মুখখানির মিষ্টি হাসি—আর দুষ্টুমি পোরা—আরো মিষ্টি কথাগুলি আমাকে বশ করিয়াছিল। তিনি বলিয়া নহেন আমার যত বন্ধু হইয়াছে প্রায়ই প্রথম সাক্ষাতে। এবার যাঁহার কথা বলিতেছি তাঁহার সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইঁন একজন সুশিক্ষিত মহিলা, ইহাঁর পিতা স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগী (তাই বলিয়া ইনি ব্রাহ্ম বা বিলাত ফেরত নহেন) শিক্ষায় ইহাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কিরূপ ফুটিয়াছে, ইহাঁর স্বাভাবিক বিনম্রী ভাব—অমায়িকতা প্রভৃতি গুণ কিরূপ মধুরতর রূপ ধরিয়াছে তাঁহা ইহাঁকে না দেখিলে বুঝা যায় না। আমার ইচ্ছা করে স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষ লোকদিগকে একবার ইহাকে দেখাই। ক্ষেত্র ভাল হইলে কর্ষণে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করে তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন।

এক এক বিষয়ে আমাদের দেশের লোকদিগের এক একটা অদ্ভুত রকম কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। লেখাপড়া জানেন, এমন মহিলাগণের যদি তাহারা কোনরূপ একটু

আদটু দোষ দেখিতে পান ত সে দোষটা সবই লেখা পড়ার ঘাড়ে চাপাইয়া বসেন। এরূপ যুক্তি দেখিলে হাসি আসে।

যদি লেখা পড়া শিখিলেই লোকে নির্দ্দোষ হইত তাহা হইলে আজ কালকার ইয়ু-নিভর্সিটির বিএ এমেরা সকলেইত দেবতা হইয়া যাইত। আসল কথা স্বভাব। যদি স্বভাব ভাল হয়—ত তাহার উপর শিক্ষা সুফল দিতে পারে, লেখা পড়া না শিখিয়াও যে শত সহস্র দোষ রহিয়াছে, সেটা কি কেহ দেখিতেছেন না ? বরং চ তেমন তেমন শিক্ষা হইলে স্বভাবও কিছু ভাল হইতে পারে। আমার বন্ধুর বাপের মত যদি সকলেই মেয়েদের এইরূপ শিক্ষা দিতেন কি ভাল হইত। ইহাঁদের বাড়ীতে ইহাঁর একটি সমবয়সী ভাজ আর ইহাঁর মা ও মাসী আছেন। ভাজটি যদিও ননদের মত লেখাপড়া জানেন না তবু স্বভাব ইহাঁরও বড় সুন্দর। ইহাঁরা সকলেই বড় অমায়িক। সেই জন্য ইহাঁদের পরিবার একটি সুখী পরিবার। ইহাদের মত সুখী পরিবার ত আমি বাঙ্গালী ঘরে কম দেখিয়াছি। যে দিন তাঁহারা এখানে আসেন—সে দিন বাঙ্গলাটা আনন্দে যেন ভরপুর হইয়া উঠে। গৃহিণীদের সেই সরল স্নেহ পূর্ণ ভাব, আর বৌটি ও মেয়েটির আনন্দ পূর্ণ হাসি, ভালবাসার উচ্ছ্বাস বিশেষ মেয়েটির প্রাণ ঢালা বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব আমার স্মৃতিটা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, যখন এখান হইতে চলিয়া যাইব—তখন হয়ত এখানে আর যাহা দেখিলাম কালে তাহা মন হইতে মুছিয়া যাইবে--কিন্তু আমার পুরাতন বন্ধু ও নূতন বন্ধুগুলির ভালবাসার যে স্মৃতি লইয়া যাইতেছি তাহা আর মুছিবে না।

আমি কি ?

আমি দিবারাত্র আমি এই শব্দটী ব্যবহার করিয়া থাকি—আমি বলি আমি সেখানে গিয়াছিলাম, আমি অমুক কর্ম্ম করিয়াছি আমি শীত বোধ করিতেছি, আমি অমুক বস্তু দেখিয়াছি, আমি রাগ করিয়াছি, এই সকল ও অন্যান্য স্থলে আমি শব্দের অর্থ কি ? কেহ বলেন আমার দেহই আমি, কেহ বলেন আমি যে সকল বিষয় উপলব্ধি করি সে সকলের সমষ্টিই আমি—তদ্ব্যতীত অন্য কিছু আমি নহে, আবার কেহ বলেন আমি দেহও নহি, উপলব্ধি-সমষ্টিও নহি—আমি দেহ ও উপলব্ধি সমষ্টি হইতে একটী স্বতন্ত্র বস্তু, এই স্বতন্ত্র বস্তু উপলব্ধি করে, এই স্বতন্ত্র বস্তু একবার দেহের উপর কার্য্য করে, একবার দেহ ঐ স্বতন্ত্র বস্তুর উপর কার্য্য করে। আমি এস্থলে এই গূঢ় প্রশ্নের মীমাংসায় উদ্যত হইয়াছি, কতদূর সফল হইব পাঠক বিবেচনা করিবেন—কিন্তু এই উদ্যমের একটী সুফল এই হইতে পারে যে যাঁহারা এই প্রশ্ন সম্বন্ধে সবিশেষ চিন্তা

করেন নাই, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

আমার দেহই আমি—আমি বলিতে এমন একটী বস্তু বুঝায় যাহা আমাতে বরাবর রহিয়াছে; আমার দেহের কোন্ অংশ আমাতে বরাবর রহিয়াছে? আমি সেই ক্ষুদ্র ডিম্ব হইতে জরায়ু হইয়াছি, জরায়ু হইতে শিশু হইয়াছি, শিশু হইতে বালক হইয়াছি, বালক হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্য হইয়াছি—এই সকল অবস্থায় আমার দেহের অনেক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমি জানি যে আমার দেহঃস্থিত অধিকাংশ কণাগুলির ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হইয়াছে—পুরাতন কণাগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে আর তাহাদিগের স্থলে খাদ্যদ্রব্য হইতে নূতন কণা স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন আমার দেহই আমি, তাঁহাদিগের কথার অর্থ এই যে আমার স্থূল দেহই আমি—কিন্তু আমার স্থূল দেহ বরাবর এক রহে নাই, অথচ আমি বরাবর এক রহিয়াছি। আমি অতি শৈশব কালে যে সকল কার্য্য করিয়াছি সে সকলও আমার কার্য্য করিয়াছি আবার আমি গত কল্য যে সকল কার্য্য করিয়াছি সে সকলও সেই আমারই কার্য্য। আমার আমিত্ব একই আছে, কিন্তু আমার স্থূল দেহ একরহে নাই—অতএব আমার স্থূলদেহ আমি নহে। আবার, আমি বলিতে এক অবিভাজ্য বস্তু বুঝায়, কিন্তু আমার দেহ অবিভাজ্য বস্তু নহে। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে দেহের হস্ত পদ মস্তকাদি ভিন্ন ভিন্ন অংশ আছে, তাহার পর দেখা যাইতেছে যে এই সকল অংশের প্রত্যেকের আবার অস্থি, মাংসপেশী, রক্তবাহা শিরা স্নায়ু প্রভৃতি ক্ষুদ্র অংশ আছে, পুনশ্চ দেখা যাইতেছে যে এই সকল ক্ষুদ্র অংশের আবার ক্ষুদ্রতর ও তাহা হইতে ক্ষুদ্রতর ইত্যাদি ক্রমে অগণ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আছে। সুতরাং আমার দেহ আমি হইতে পারে না। আবার অবশেষে দেখ আমার দেহ আমার নিকট একটী বহিঃস্থিত পদার্থ মাত্র—বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, অস্থি, শব যেমন আমার নিকট বহিঃস্থিত পদার্থ, আমার দেহও সেইরূপ আমার নিকট বহিঃস্থিত পদার্থ। বৃক্ষ লতা প্রভৃতি হইতে আমার যেরূপ কতকগুলি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান লাভ হয়, আমার দেহ হইতেও আমার সেইরূপ কতকগুলি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান লাভ হয়, বৃক্ষ লতা প্রভৃতির বর্ণ আছে, আকৃতি আছে, গন্ধ আছে, বৃক্ষলতা প্রভৃতি হইতে আমার দেহের যাহা কিছু বিভেদ আছে তাহা এই যে, বৃক্ষলতাদিগকে আমি দূরে রাখিয়া যাইতে পারি, কিন্তু আমার দেহের সর্ব্বাংশ বর্ত্তমান অবস্থায় আমি দূরে রাখিয়া যাইতে পারি না। যাহা হউক ভাবিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে আমার দেহ আমার নিকট একটী বহিঃস্থিত পদার্থ মাত্র, আমি নহে। কেহ কেহ আবার এইরূপ বলেন দেহ ও মন এই উভয়ই কল্পনা মাত্র—আমার দেহও নাই, আমার মনও নাই—আমার আছে কেবল রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদি কতকগুলি (ইন্দ্রিয়জাত) বোধ, সুখ দুঃখ রাগ লোভ ঈর্ষা স্নেহ দয়া ভক্তি ইত্যাদি কতকগুলি অনুভূতি, সমান অসমান পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তী ব্যাপ্তি

ইত্যাদি কতকগুলি, কতকগুলি জ্ঞান আর ইচ্ছা লালসাদি, কতকগুলি কার্য্যোদ্দীপক প্রবৃত্তি। এই সকল ক্রমাগত এখন কতকগুলি, তখন কতকগুলি, পরমুহূর্ত্তে কতকগুলি আবির্ভূত হইতেছে—এই সকলের সমষ্টিই আমি, আমার উপলব্ধি সমষ্টিই আমি। আমি যাহা কিছু জানি, সে কেবল আমার উপলব্ধি—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দেহ ও মন কল্পনা মাত্র। এইরূপ বাদের উত্তরে আমি এই বলি যে উপলব্ধি ক্রিয়া বিশেষ, সকল ক্রিয়ারই কর্ত্তা আছে, কিন্তু উপলব্ধি আছে অথচ উপলব্ধি কর্ত্তা নাই ইহা অবোধ্য। পুনশ্চ আমি যদি এইরূপ ভাসমান—উপলব্ধি—সমষ্টি হই, আমার তলায় যদি কিছু না থাকে—তবে তখনকার আমি আর এখনকার আমি এ দুই এক নহে; অথচ আমি বরাবরই এক। অতএব আমার উপলব্ধি সমষ্টি আমি নহে। উপলব্ধি ক্রিয়া বিশেষ এই কথার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন উপলব্ধি ক্রিয়া নহে, ঘটনা মাত্র। তাহা হইলেও আমি বলি ঘটনা আছে অথচ ঘটনার কোন গূঢ় কারণ নাই ইহা অবোধ্য।

পরিশেষে আমি তৃতীয় মতে উপস্থিত হইতেছি। আমি দেহ ও উপলব্ধি-সমষ্টি হইতে একটী স্বতন্ত্র বস্তু। কেহ কেহ বলেন আমার মনই আমি, আমার মন এক প্রকার বস্তু আর আমার দেহ আর একপ্রকার বস্তু। আমার মনের কার্য্য হইতেই আমার উপলব্ধির উৎপত্তি; আমার দেহ ও মনের মধ্যে এই সম্বন্ধ যে, কখনও আমার মন দেহের উপর কার্য্য করে আর কখনও আমার দেহ মনের উপর কার্য্য করে। কিন্তু এস্থলে এক অতি গভীর সমস্যা উপস্থিত হইতেছে—আমার মন ও দেহ যদি বিভিন্ন প্রকারের বস্তু হয় তবে একে অন্যের উপর কিরূপে কার্য্য করে। আমরা সাধারণতঃ দেখি যে জড় পদার্থ জড়পদার্থের উপর কার্য্য করে—এস্থলে উভয়ই এক জাতির—কিন্তু মনও দেহ যদি বিভিন্ন জাতির বস্তু হয় তবে উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কার্য্য কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইহার উত্তরে একজন পণ্ডিত এই বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের সাহায্যে ওরূপ কার্য্য ঘটে। এই মতের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে এই মত অনুসরণ করিলে অতি যৎসামান্য কার্য্যগুলিও দৈব ঘটনা বলিয়া মানিতে হয়—যেমন আমি হাত তুলিতে ইচ্ছা করিলাম, আমি হাত তুলিলাম—এই মতে ইহা একটী দৈব ঘটনা; দ্বিতীয় আপত্তি এই যে যাহা সম্ভবপর নহে তাহা ঈশ্বরের সাহায্যে ঘটে বলিলে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। মন ও দেহের মধ্যে কার্য্য ঈশ্বরের ক্ষমতায় ঘটে বলিলে মন ও দেহের উভয়েরই সহিত সমপ্রকৃতির একটী বস্তু কল্পনা করিতে হয়—কিন্তু একই বস্তু কিরূপে মন ও দেহের ন্যায় বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তু হইবে। আর একজন পণ্ডিত বলেন, মন ও দেহের মধ্যে পূর্ব্বে হইতেই এক সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইয়া রহিয়াছে—আর সেই সামঞ্জস্য গুণেই এখন মন ও দেহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কার্য্য সংঘটিত হয়। কিন্তু এই সামঞ্জস্য কিরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে তাহা না বুঝাইয়া দিলে এই মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। তৃতীয় পক্ষে একজন পণ্ডিত বলেন দেহ কল্পনা মাত্র—মনই

একমাত্র বস্তু—সুতরাং মন ও দেহ এতদুভয়ের মধ্যে কার্য্য কিরূপে সম্ভবে এই প্রশ্ন আর রহিল না। কিন্তু আমি যে কারণে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিব, সেই কারণেই দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আমি আছি ইহা স্বীকার করিলে অন্যান্য মনুষ্য আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে—কারণ তাহাদিগের কার্য্য আমার কার্য্যের সদৃশ। আবার ইতর জন্তুরা মনুষ্যের সহিত কার্য্যে সদৃশ বলিয়া ইতর জন্তুরাও আছে স্বীকার করিতে হইবে, ইতর জন্তুদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহাদিগের সদৃশ আনুবীক্ষণিক জন্তুদিগের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। আনুবীক্ষণিক জন্তুদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আনুবীক্ষণিক উদ্‌ভিদদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে—কারণ ঐ দুই পক্ষের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আবার আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আনুবীক্ষণিক 'অচেতন' পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ও আনুবীক্ষণিক 'অচেতন' পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অন্যান্য সমুদয় উদ্ভিদ ও 'অচেতন' পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আমি এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে আমার যেরূপ কার্য্য, অন্যান্য সমুদয় মনুষ্যের, সমুদয় জন্তুর, সমুদয় উদ্ভিদের ও সমুদয় 'অচেতন' পদার্থেরও কার্য্য—কোন পক্ষে অধিক, কোন পক্ষে অল্প—কতকগুলি বিষয়ে সেইরূপ। অতএব আমার অস্তিত্ব যে কারণে স্বীকার করিতে হইবে অন্যান্য পদার্থের অস্তিত্বও সেই কারণে স্বীকার করিতে হইবে—শুদ্ধ যে ইহাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে এমত নহে, আমি যেরূপ বস্তু ইহারাও সেইরূপ বস্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। আমি চিন্তাশীল কার্য্যক্ষম বস্তু, ইহারাও অধিক পরিমাণেই হউক আর অল্প পরিমাণেই হউক আমার ন্যায় চিন্তাশীল কার্য্যক্ষম বস্তু। সুতরাং যে সকল পদার্থদিগকে আমরা 'অচেতন' বলি তাহারা বাস্তবিক অচেতন নহে—আমাদিগেরও তাহাদিগের মধ্যে এই প্রভেদ যে আমরা অধিক চেতন, তাহারা অল্প চেতন। আর এখন 'আমি কি' এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না, আমি চিন্তাশীল কার্য্যক্ষম বস্তু—আমার দেহও আমার সহিত একই জাতির বস্তু তবে আমা হইতে নিকৃষ্ট। আমি, আমার দেহ, জগতের সমুদয় পদার্থই একই বস্তু সকলেই সকলের কুটুম্ব—সুতরাং কখনও বা আমি আমার দেহের উপর কার্য্য করি, কখনও বা আমার দেহ আমার উপর কার্য্য করে ইহা আশ্চর্য্য নহে। ধরিতে গেলে আমরা সকলেই একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি; জ্ঞানের নিয়ম বশতঃ আমাদিগের মধ্যে আমি, তুমি, সে, এইরূপ প্রভেদ-বোধ উদয় হয়। আমি বরাবর থাকিব, জগৎসংসারও বরাবর থাকিবে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

পাঠদ্দশায় বিবাহ।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল সেন ১২৯১ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতীতে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন; প্রবন্ধটিতে তিনি তাঁহার চিন্তাশীলতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু তিনি বাল্য বিবাহ-প্রথা রহিত করার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে পক্ষপাত-শূন্য বলিতে পারি না। রসিক বাবু যে বাল্য বিবাহ রহিত করার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি সমাজস্থ ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার বড়ই পক্ষপাতী। মালাবারী যে সময় বাল্যবিবাহ সম্বন্ধীয় দোষ সকল কীর্ত্তন করিয়া রাজকীয় কোন আইনের সাহায্যে কালেজের এবং স্কুলের ছাত্রদের বাল্যবিবাহ রহিত করিবার জন্য যত্নবান্ হন রসিক বাবুর প্রবন্ধটি সেই সময়ের লেখা। রসিক বাবু তাঁহার প্রবন্ধে বলেন যে "এখন আমাদের দেশে সমাজস্থ ব্যক্তিগণের বাল্যবিবাহ করা না করা এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ রহিত করিয়া এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকু হরণ করা উচিত কিনা তদ্বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি বলেন যে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকায় সমাজের এতই অনিষ্ট হইতেছে যে এই স্বাধীনতাটুকু হরণ করা সমাজের উপকারের জন্যই আবশ্যক কিন্তু বাস্তবিক কি বাল্যবিবাহ জনিত অনিষ্টের গুরুত্ব এতই অধিক?" রসিক বাবু বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বাল্যবিবাহ জনিত অনিষ্ট বড় গুরুতর নহে, বাল্যবিবাহের যা কিছু দোষ আছে সে জন্য "পিতা হইতে পুত্রের বিবাহের স্বাধীনতা হরণ করা" যুক্তি সঙ্গত নহে। কিন্তু আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, রসিক বাবু যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্যই বাল্যবিবাহ রহিত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কথাটির অর্থ এইখানে পরিষ্কার করা যাক্। আমার ভাল কিসে হয় এবং আমার মন্দ কিসে হয় ইহা যখন আমি ভাবিতে শিখিয়া সেইরূপ বুদ্ধি-অনুযায়ী জীবনের কর্ম্ম করিতে চাই, তখন তাহাতে যদি কেহ প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন তবেই তিনি আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিতে প্রস্তুত। সমাজের লোকে সকলেই আপনার আপনার বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি চালনা করিয়া আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন ইহা বড়ই প্রার্থনীয়, আর তাহা না হইয়া যদি লোকে তাহার নিজের সম্বন্ধে নিজের বিবেচনানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধা পায় তাহা হইলে সমাজের উন্নতির দিকে যে বাধা দেওয়া হয় ইহা বড় ঠিক কথা। কিন্তু তাই বলিয়া যাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি সম্যক্ স্ফুরিত হয় নাই সে যদি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে যায় আর তাহাকে সেই কর্ম্মে যদি বাধা দেওয়া হয় তবে যে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ

করা হয় একথা বলা যায় না। কেননা যাহার বুদ্ধি ও বিচার শক্তি স্ফুরিত হয় নাই তাহার স্বাধীন ইচ্ছা তখনও জন্মে নাই। স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করা আর যথেচ্ছাচারী হইয়া কাজ করা এই দুইটি কথার মধ্যে যে বিশেষ প্রভেদ আছে তাহা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। যে ইচ্ছা আমার বুদ্ধির অধীন তাহাই স্বাধীন ইচ্ছা। এবং যে ইচ্ছা বুদ্ধির অধীন নয় তাহার নাম কাম। স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্রয় দেওয়ায় সমাজের উপকার হয় আর কামাচার বা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়ায় সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে।

যাহাকে যথার্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিতে পারি সমাজে তাহা যত বজায় থাকে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য এবং সেই জন্যই বাল্য বিবাহ রহিত করিবার জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। যে পিতা পুত্রকে বাল্যকালে বিবাহ দেন তিনি পুত্রের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ধন একেবারে হরণ করেন। বিবাহরূপ একটি কর্ম্মের উপর মনুষ্য জীবনের প্রধান প্রধান কর্ম্মগুলি নির্ভর করে সুতরাং পুত্রের বিবাহ পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী হওয়াই কর্ত্তব্য। পুত্রের যখন স্বাধীন ইচ্ছা জন্মিবে তখন তাহার অভিমতানুযায়ী কর্ম্ম সকল সে যাহাতে করিতে পারে তাহারই অনুকূল কার্য্য করাই পিতার কর্ত্তব্য। কিন্তু পিতা যদি বাল্যকালে পুত্রের বিবাহ দেন আর পুত্র ভবিষ্যতে যে সকল কার্য্য করিবে তাহার সমস্তই সেই বিবাহরূপ কর্ম্মের উপর নির্ভর করে, তবে পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করা হইল কই ? পিতা যদি ছেলেবেলায় পুত্রকে এমন বাঁধনে বাঁধিয়া দেন যে পরে যখন পুত্র ভাল মন্দ বিচার করিতে শিখিবে তখন তাহাকে সেই বাঁধনের জ্বালায় অস্থির হইতে হইবে তবে পিতা কি পুত্রের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিলেন না ? যতদিন বালকের হিতাহিত বিবেচনা না জন্মে—ততদিন যাহাতে বালক আপনার ভাল মন্দ ভালরূপ বিচার করিতে সক্ষম হয় সেইরূপ শিক্ষা দেওয়াই অভিভাবকের কর্ত্তব্য। যখন বালকের স্বাধীন ইচ্ছা চালনার সময় হয় নাই—তখন তাহাকে কোন বিষয়সুখপ্রদ কর্ম্মে—যাহার উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা গুরুতর অন্যায় বরং সে সময় যদি বালক বিষয়-সুখাভিলাষক-কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে যায় তবে তাহা হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করাই অভিভাবকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি এইরূপ করেন তিনিই যথার্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষপাতী।

হিন্দুশাস্ত্র মতে পুত্রের অন্নপ্রাসন উপনয়ন প্রভৃতি কর্ম্মগুলি পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আর পুত্রের বিবাহ পুত্রের নিজের কর্ম্ম ; ইহার অর্থ এই যে শাস্ত্রকারগণের মতে পুত্রের বিবাহ করা না করা পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী হওয়াই কর্ত্তব্য এবং যাহাতে ভবিষ্যতে পুত্র হিতাহিত বিবেচনা করিতে সম্যক্ সক্ষম হইয়া আপনার কর্ম্মমার্গ আপনি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহার ভরণ পোষণ এবং শিক্ষাদানাদি কর্ম্মই পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই সকল কথা একটু বুঝিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়

যে যখন পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছা জন্মে নাই—অর্থাৎ হিতাহিত বিবেচনার ক্ষমতা জন্মে নাই তখন পিতা যে পুত্রকে বিবাহ বাঁধনে বাঁধিয়া দিবেন সে বিষয়ে পিতার ধর্ম্মতঃ কোন অধিকার নাই। বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে কোন বিশেষ আইনজারী করা হইলে অভিভাবকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় একথা আদৌ স্বীকার করা যায় না। কেননা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটি সীমা আছে; যে কর্ম্মে আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খাটাইতে গেলে আর এক জনের স্বাধীনতা নষ্ট হয় সে কর্ম্ম আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমার বাহিরে; অভিভাবকের যে কর্ম্ম দ্বারা বালকের ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয় সে কর্ম্ম অভিভাবকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমার বাহিরে।

যদি বলেন যে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোন আইন জারী করিলে বালক তাহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পাইবে না সুতরাং এরূপ আইন দ্বারা তাহার স্বাধীনতাটুকু হরণ করা হয়; তাহার উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে যাহাকে বালক বলিতেছি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা তখনও জন্মায় নাই, কাম আর স্বাধীন ইচ্ছা এই দুইটি কথার যে প্রভেদ বলিয়াছি তাহা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। একটু বয়স হইলে বালকের ইন্দ্রিয় সুখভোগাভিলাষ জন্মিতে পারে কিন্তু যত দিন তাহার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই ততদিন তাহার স্বাধীন ইচ্ছা জন্মিয়াছে বলা যায় না। আমাদের দেশে লোকের গড়ে ২৪ বৎসর বয়সের পর তবে [illegible]সয়িক ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে। যে [illegible]সে মতলব ক্রমাগত বদল হইতে থাকে—আজ এক রকম কাল এক রকম হয়—সেই বয়সের পর বালকের বালকত্ব ঘুচে; ইহার পূর্ব্বে বালককে যা ইচ্ছা তাই করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোন আইন জারি করিলে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না; কিন্তু এখন কথা এই যে বাল্যবিবাহের জন্য আমাদের সমাজে এতই কি অনিষ্ট ঘটিতেছে যে তাহার প্রতিবিধান না করিলে নয়? রসিক বাবু দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বাল্যবিবাহে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা বড় গুরুতর নহে। বাল্যবিব[illegible] যে অনেক স্থলে শুভফলপ্রদ ইহাও তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যেমন বালিকা বউ শ্বশুরবাড়ী থাকিয়া স্বামীর আত্মীয়গণের সহিত বেশ মিশিয়া যাইতে পারে; বালক স্বামী ও বালিকা স্ত্রী ছেলেবেলা হইতে একত্রে থাকিতে থাকিতে তাহাদের মনের ভাব এক রকম হইয়া যায়, সেই জন্য আত্ম কলহ ঘটে না ইত্যাদি। এই সব কথা গুলি শুনিতে বেশ এবং বলিতে বেশ কিন্তু কথাগুলি প্রকৃত ঘটনার সহিত ঠিক মিলে কি না সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ আছে। "বউ ভাল" একথা ত আজকালকার শাশুড়ীর মুখ হইতে প্রায়ই শুনা যায় না, তবে যে খানে বউ ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে সেখানে বউএর স্বাভাবিক প্রকৃতি হয় বড়

নম্র কিম্বা শাশুড়ী ভাল গিন্নি; এমন স্থলে বউ যদি বড় বয়সে পরিবার মধ্যে ঢুকিতেন তাহা হইলে যে পরিবারের মধ্যে মিশিতে পারিতেন না একথা কেমন করিয়া বলিতে পারি। যাই হউক মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত কি না সে সম্বন্ধে আমি বড় বেশী কিছু বলিতে চাই না—কেন না যে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর হিন্দু-সমাজ গঠিত হইয়াছে যদি কেহ সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর সমস্ত বিষয়ে একান্ত নির্ভর করিয়া রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য স্থির করেন তাঁহার বিরুদ্ধে আমার কোন কথা বলিবার নাই। তবে তাঁহাকে এই কথা বলিতে চাই যে অল্প বয়সে বিবাহিতা কন্যা অপরিপক্কাবস্থায় গর্ভবতী হইয়া চির জীবনের জন্য স্বাস্থ্য ও সুখ হারাইতেছে। এ বিষয়ের প্রতি তাঁহারা যেনসতত নজর রাখেন এবং শাস্ত্র সঙ্গত যদি কোন উপায়ে ইহার নিবারণ হইতে পারে তাহার জন্য মাঝে মাঝে যেন একটু আদটু ভাবেন।

কন্যার ছেলেবেলায় বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত হইলেও পুরুষের বাল্যবিবাহ দিতে হইবে এ কথা শাস্ত্রে ত কোথাও নাই বরং শাস্ত্রের আসল মর্ম্ম গ্রহণ করিতে গেলে ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

ত্রিংশৎবর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ মনু।

ত্রিশ বৎসর বয়সের যুবা দ্বাদশবর্ষীয়া এবং ২৪ বৎসরের যু[বা] অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে পুরুষের বাল্যবিবাহ [বে]শ বড় প্রচলিত ছিল না [শা]স্ত্র সকল হইতে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে পুরুষের বাল্যবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যদিও একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না কিন্তু পঠদ্দশায় বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু আচার অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলে তবে শিষ্য গুরুগৃহে স্থান পাইতেন। আজ কাল ঐ প্রথার ভেঙান অর্থাৎ হালের উপনয়ন প্রথা এখন আমাদের সমাজের একটি প্রধান ধর্ম্মকর্ম্ম। আমি এই প্রস্তাবে ইহাই বিশেষ বলিতে চাই যে যদিও কোন কোন স্থলে বাল্যবিবাহের নিতান্ত কুফল দেখা যায় না কিন্তু পঠদ্দশায় বিবাহ যে বাল্যবিবাহ—তাহার ফল সকল স্থলেই বড় ভয়ানক বিষময়। যাঁহাদের পঠদ্দশায় বিবাহ হয় যৌবনে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা একেবারে থাকে না, নির্বীর্য্য এবং উৎসাহহীন হইয়া পড়েন কর্ম্মে উৎসাহ না থাকায় তাঁহাদের একটি ভারময় জীবন বহন করিতে হয়। রসিক বাবু বাল্যবিবাহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলেন যে "আমাদের দেশের বিবাহিত ছাত্রেরা কি ইংলণ্ডের অবিবাহিত ছাত্রদের অপেক্ষা শিক্ষা বিষয়ে কম পটুতা ও যত্ন দেখাইয়া থাকে?" শিক্ষা বিষয়ে কম পটুতা দেখাক আর নাই দেখাক আমাদের দেশের ছাত্রেরা যখন সুশিক্ষিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করেন আর ইংলণ্ডের ছাত্রেরা যখন সংসারে প্রবেশ করেন, তখন এই উভয় দলের কর্ম্মক্ষমতা আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে

পাই যে বাবুরা আমাদের একটি নিরীহ ভেকের ন্যায় আপন আপন গর্ত্তে প্রবেশ করেন, কাজের মধ্যে গর্ত্তের ভিতর হইতে কখন কখন গলাবাজী করেন আর একটি ইংরাজ বালক তেজস্বী সিংহের ন্যায় সংসারারণ্যে বিচরণ করিতে থাকে।

সাংসারিক সুখ কামনা হইতে মনুষ্যের সাংসারিক কর্ম্মে উৎসাহ জন্মে। কিন্তু বাল্যকালে বিবাহিত মনুষ্য যখন যৌবনে সংসারে প্রবেশ করেন তখন তিনি সকল সুখেই এক রকম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে তাঁহার সন্তান হইয়াছে যদি স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণের সংস্থান থাকে তবে তাঁহার আর কিছুরই অভাব থাকে না, তিনি দেখেন যে তাঁহার জীবনের সকল কর্ম্মই একরকম শেষ হইয়াছে কেবল মরিতে বাকি আছে আর যদি ভরণপোষণের সংস্থান না থাকে তবে স্ত্রী পুত্র লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন, এক রকম আধ খেপা হইয়া জীবনটা গোছে গাছে কাটাইয়া দেন। যদি বা কখনও সমাজে মান্য গণ্য হইব এইরূপ একটা কামনায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন তবে নিজের রুগ্ন শরীর স্ত্রী পুত্রের রুগ্ন শরীরের জ্বালায় অস্থির হইয়া শীঘ্রই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন।

আমার সহিত একটি বাঙ্গালী বাবুর আলাপ হইয়াছিল; তাঁহার বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ, বুদ্ধি খাটাইয়া একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তিনি কলিকাতায় একজিবিসনে পাঠান; সেইরূপ অন্যান্য যন্ত্র বিলাত হইতে উক্ত প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল কিন্তু পরীক্ষায় বাঙ্গালীর যন্ত্রটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল। সেই নির্ম্মাণ-কৌশলটি কিনিয়া লইবার জন্য অনেক ফারম হইতে তাঁহার নিকট চিঠি আসে, ফারমওয়ালারা অনেক টাকা দিয়া উহা কিনিয়া লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু উক্ত বাঙ্গালী বাবু উহা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করেন। তখন তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে নিজে ঐ যন্ত্রের ব্যবসা করিবেন। কিন্তু আজ ৩ বৎসর হইল সেই একটি যন্ত্র ব্যতীত আর একটী নির্ম্মাণ করা তাঁহার ঘটিয়া উঠিল না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে ছেলে মেয়ের জন্য সদাই ব্যস্ত আজ এর অসুখ কাল তার অসুখ আজ নিজের অসুখ এই সকল নানা কারণে ঐ যন্ত্রের ব্যবসা করা তাঁহার ঘটিয়া উঠিতেছে না। আসল কথা, বাল্যবিবাহে তাঁহার কর্ম্মোৎসাহ হরণ করিয়াছে, সেই জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হইয়াও সেই বুদ্ধি কার্য্যে পরিণত করা তাঁহার পক্ষে দায় হইয়া উঠিয়াছে।

পঠদ্দশায় বিবাহে অর্থাৎ মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রেমের বীজ রোপন করায় বালকের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠে। বালকের যে শক্তিটুকু আছে তাহা দুই দিগে ভাগ হইয়া যায়, শরীরের স্নায়বীয় স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস হইয়া যায়, শরীর সামান্য কারণেই রুগ্ন হইয়া পড়ে, ক্রমে জ্ঞান চর্চ্চা আর প্রেমচর্চ্চা উভয় বিষয়েই একটা ঔদাস্য ভাব আসিয়া পড়ে। যখন বয়সের পরিপক্কতা জন্মে নাই তখন বালকের শক্তি এই দুই ভাগে ভাগ করিতে গিয়া যে তেজঃক্ষয় হয় বালকের স্নায়ু মণ্ডলী তাহা

বাহির হইতে পূরণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। স্নায়ুমণ্ডলী একবার আল্গা হইয়া বেসুরা হইয়া পড়িলে তাহাকে আর ফিরিয়া সুরে গাঁথা যায় না। মস্তিষ্ক হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে এই জন্য কোন কর্ম্মেই আর উৎসাহ থাকে না। অনেক সময় বাল্যবিবাহে দম্পতীর শরীর ও মন রুগ্ন দৃষ্ট হয় ইহা রসিক বাবু স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি বলেন যে "এ বিষয়ে দোষটা বাল্য বিবাহের না দম্পতীর অভিভাবকগণের তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক" তিনি আরও বলেন যে "শাস্ত্র সম্মত বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দিলে সম্ভবতঃ নৈমিত্তিক বাল্য বিবাহের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। কিম্বা আরো নানারূপ মন্দফল জন্মাইবে এবং তজ্জন্য বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকা অবস্থায় বালক বালিকার মন ও শরীর রুগ্ন হওয়ার যেরূপ কথা ছিল তখনও প্রায় সেইরূপ হইতে থাকিবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান বোর্ডিং স্কুল ও কালেজের ছেলেদের যেরূপ চরিত্রের কথা শুনিতে পাই তাহা হইতে আমাদের দেশের বাল্য কালে বিবাহিত ছেলেদের স্বভাব সহস্র গুণে ভাল। যদি বল অভিভাবকগণ যত্ন লইলেই এ সকল নিবারিত হইতে পারে, আমি বলি অভিভাবকগণ যত্ন লইলে বাল্যবিবাহেও কোন হানি হইতে পারে না"।

রসিক বাবুর কথাগুলির উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত না থাকিলে ছেলেরা যে সকল দোষে দূষিত হইতে পারে অভিভাবকগণ একটু মনোযোগী হইলেই ত সে সকল দোষ নিবারিত হইতে পারে; একটু সৎশিক্ষা এবং ধর্ম্মভয় বালকের মনে সঞ্চারিত করিতে পারিলে ঐ সকল দোষ সহজে নিবারিত হইতে পারে, কেননা যাহা সকলে দূষ্য বলিয়া জানে তাহার উপর বিদ্বেষ জন্মান অভিভাবকের অল্প চেষ্টায় সাধিত হইতে পারে কিন্তু বিবাহ দিয়া ছেলেকে স্ত্রীর সম্পর্কে আসিতে না দেওয়া অভিভাবকের পক্ষে বড় দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। স্ত্রীর সহিত একত্র বাসে ধর্ম্মতঃ কোন দোষ নাই তখন বালকের প্রেমবৃত্তি উদ্দীপিত করিয়া অভিভাবক কি বলিয়া বালককে তাহার স্ত্রীর সহিত সম্পর্কে থাকিতে নিষেধ করিতে পারেন। অভিভাবক যদি ঐরূপ করিতে চান তবে বালক লজ্জার খাতিরে দিন কতক চুপ করিয়া থাকিবে, তাহার ফল অনবরত স্ত্রী সম্বন্ধীয় চিন্তা উপস্থিত হইবে, জ্ঞান চর্চ্চা দূরে চলিয়া যাইবে, শেষে বালক আপনিই লজ্জায় শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিবে তখন অভিভাবক কি বলিয়া ছেলেকে উপদেশ দিবেন বুঝিতে পারি না; তখন যদি অভিভাবক ছেলেকে বুঝাইতে যান যে পঠদ্দশায় স্ত্রীর সম্পর্কে থাকিতে নাই তাহাহইলে ছেলেও বলিতে পারে যে সেইটী বুঝিয়া বিবাহ না দিলেই ছিল ভাল।*

---

* আরো একটি কথা এই, বাল্যে বিবাহিত হইয়াও স্বামী স্ত্রী যত দিন না যৌবনপ্রাপ্ত হয়—তত দিন সেই যদি তাহাদের তফাৎ থাকিতেই হইল—তাহা হইলে বাল্য বিবাহের যে সকল সুবিধা রসিক বাবু দেখাইয়াছেন—প্রকৃত পক্ষে তাহা আর রহিল কই? "বালক স্বামী, বালিকা স্ত্রী ছেলেবেলা হইতে একত্রে থাকিতে থাকিতে তাহা-

পঠদ্দশায় ছেলেরা যাহাতে প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে এ বিষয়ে সকল অভিভাবকেরই সম্যক্ যত্নকরা কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে হিন্দুদের কি সুন্দর নিয়ম ছিল কিন্তু কালে সেই নিয়মগুলির নাম মাত্র আছে, নিয়ম পালন করে এমন লোক নাই। পুত্রের উপনয়ন সংস্কার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির লোকের একটি প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্ম। এই উপনয়নের উদ্দেশ্য পুত্রকে জ্ঞান চর্চ্চার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত করা। কিন্তু আজকালকার হিন্দু নামধারী কাপুরুষগণ এই প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্মেই উপেক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। গলায় একটা সুতা ঝুলাইয়া দিয়া যাঁহারা মনে করেন যে তাঁহারা পুত্রের উপনয়ন কর্ম্ম সমাধা করিলেন, যাঁহারা উপনয়ন সংস্কারের সময় পুত্রকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া না দেন তাঁহারা কি ধর্ম্মে পতিত নহেন? হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে উপনয়নের পর, ব্রহ্মচারীছাত্রের পঠদ্দশা শেষ হইলে পর, জ্ঞানোদয় হইয়া হিতাহিত বুঝিতে সক্ষম হইলে পর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করা কিম্বা সংসারাশ্রম অবলম্বন করা তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ছিল; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে আজকালকার হিন্দুরা সেই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে পরাঙ্মুখ এক্ষণে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, যে বিধির উপর হিন্দু সমাজ গঠিত হিন্দুগণ যাহাতে সেই বিধি অনুসারে কার্য্য করেন সে বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। পঠদ্দশায় বিবাহ করা হিন্দু-সমাজে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না ইহা উপনয়ন সংস্কারের প্রথা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, তবে যে এখন সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে ইহা সমাজের অধঃপতনের অবস্থার ফল। যে সময় সমাজে জ্ঞান চর্চ্চা একেবারে লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল সেই সময় হইতেই বাল্যবিবাহের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যখন দেশে জ্ঞানচর্চ্চার পুনরভ্যুদয় হইতেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে পঠদ্দশায় বিবাহ প্রথাটিও উঠাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। পঠদ্দশায় বিবাহ আর কিছুকাল প্রচলিত থাকিলে সন্তানগণ মাথার ব্যারাম লইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে আর সমাজে পাগলের সংখ্যাটা কিছুবেশী হইয়া উঠিবে।

বাল্যবিবাহের একটি মহৎদোষ আছে কিন্তু সে বিষয়টি যে কতদূর গুরুতর তাহা এখনও অনেকে বুঝেন না। সে বিষয়ে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব। দোষটি এই, যেদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত সে দেশের পুরুষেরা স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা রাখিতে জানে না। যে দেশে স্ত্রীলোকেরা পুরুষগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ আদৃত হন না সে দেশের শ্রীবৃদ্ধির আশা নাই; বাল্যবিবাহের দোষে ভারতবাসীরা তাহাদের গৃহলক্ষ্মীর প্রকৃত আদর ভুলিয়া গিয়াছে এবং সেই পাপেই তাহারা লক্ষ্মী-ছাড়া হইয়াছে।

দের মনের ভাব এক হইয়া যায়”—ইত্যাদি কথার তাহা হইলে আর সার্থকতাই থাকে না। সুতরাং—বাল্যকালে ছেলে মেয়ের বিবাহ দিয়া বয়স প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের তফাৎ রাখ এই কথা বলিয়া রসিক বাবু নিজের কথাই নিজে কাটিয়াছেন। ভাং সং।

যাহা সুলভ তাহার বড় আদর থাকে না; অভাব সম্যক্ বুঝিবার পূর্ব্বেই যদি কেহ সেই অভাব দূর করিয়া দেয়, তবে সেই অভাব পূরণকারী পদার্থের মাহাত্ম্য বড় বুঝা যায় না। স্ত্রী সম্মিলনের জন্য সম্যক আগ্রহ জন্মাইবার পূর্ব্বে বিবাহিত হওয়ায় বাল্যবিবাহিত-পুরুষগণ বিবাহের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম হন; আগুন জ্বলিবার পূর্ব্বে ঘৃত অর্পিত হওয়ায় আগুন তেমন জ্বলে না কেবল ধূঁয়া হইতে থাকে; এই ধূঁয়ার জ্বালায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই চোখজ্বালায় সারা হইতে থাকেন। একবার বাঙ্গলার ঘর ঘর অনুসন্ধান করিয়া দেখুন তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে বাল্যবিবাহের দোষে স্ত্রী আর আজ কাল পুরুষের সহধর্ম্মিণী নহে, বিবাহের সহিত পবিত্র ধর্ম্মভাব সংশ্লিষ্ট নাই—স্ত্রীলোক অনাদৃত হইয়াছে; সমাজের লক্ষ্মী স্বরূপিণী রমণীগণ হতাদৃত হওয়াতেই সমাজ লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছে; আমার এই কথাটি যে কত দূর সত্য সে বিষয়ে যদি কেহ সন্দিহান হন তবে আমি তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অবস্থা সকল একবার পর্য্যালোচনা করিতে পরামর্শ দিই, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে যেখানে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা আছে সেই খানেই সমাজ ক্ষমতাপন্ন। প্রাচীন ভারত যখন সৌভাগ্যশালী ছিল তখন পুরুষগণ রমণীগণকে দেবী স্বরূপা দেখিত, সহধর্ম্মিণী দেবী সম্ভাষণে সম্ভাষিতা হইতেন কিন্তু আজ কাল আর সে কাল নাই আজ কালকার ভারতবাসীগণ ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করা ভিন্ন স্ত্রীর সহিত অন্য যে কোন সম্বন্ধ আছে ইহা হয়ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। আমার এই কথা গুলি শুনিয়া অনেকে হয়ত বলিবেন যে আমি এই যে কথা গুলি বলিলাম ইহা প্রকৃত ঘটনার সহিত ঠিক মিলে না, স্ত্রীগণ হতাদৃত হওয়া দূরে থাক স্ত্রী আজকাল পুরুষের মাথার মণি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; পুরুষগণ স্ত্রীর বশতাপন্ন হইয়া পুরুষত্ব হারাইতে বসিয়াছে; এমন অবস্থায় পুরুষে স্ত্রীর মর্য্যাদা বুঝে না একথা বলা সঙ্গত হয় না। যাঁহারা এইরূপ কথা বলেন তাঁহারা স্ত্রীলোকের প্রকৃত মর্য্যাদা কিসে রক্ষা করা হয় সেটি ঠিক বুঝেন না। স্ত্রীকে দাসীর স্বরূপ জ্ঞান করায় যেরূপ স্ত্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় না, স্ত্রীর দাস স্বরূপ জীবন কাটাইলেও সেইরূপ স্ত্রীর প্রকৃত মর্য্যাদার হানি করা হয়। প্রবৃত্তির বশে স্ত্রীর অনুগত হইলে স্ত্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় না। স্ত্রীকে উন্নত করিবার চেষ্টা করাই পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি এই কর্ত্তব্য পালনে সতত যত্নবান তিনিই স্ত্রীর মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন; স্ত্রীকে উন্নত করিবার চেষ্টা দ্বারা পুরুষ নিজে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন, একের উন্নতির উপর আর একজনের উন্নতি নির্ভর করে; স্ত্রীর মানসিক বৃত্তি সমূহের উন্নতি সাধনের চেষ্টা দ্বারা নিজের উন্নতি সাধন করাই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এবং এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য যিনি স্ত্রীকে ভাল বাসেন তিনিই যথার্থ স্ত্রীর মর্য্যাদা জানেন; কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার জন্য যিনি স্ত্রীর সম্পর্কে থাকিতে চান তিনি পশুর স্বরূপ, তিনি স্ত্রীর মর্য্যাদা কেমন করিয়া বুঝিবেন। স্ত্রীলোকের প্রকৃত মর্য্যাদা, বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য পুরুষ যতদিন না বুঝিতে

পারেন তত দিন তিনি যেন কোন রমণীকে চির জীবনের তরে বিবাহ বন্ধনে বাঁধিয়া চিরকালের জন্য তাহাকে অসুখী না করেন। সমাজ যতদিন না স্ত্রীলোকের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিবে ততদিন সমাজের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য বলি বাল্যবিবাহের পক্ষে যাঁহারা তর্ক করিয়া থাকেন তাঁহাদের এই একটি কথা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে তাঁহাদিগের অভিভাবক গণ যদি তাঁহাদিগের ছেলেবেলায় ব্রহ্মচর্য্যে আস্থা জন্মাইয়া দিয়া পূর্ণ যৌবনে বিবাহের ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সুখী হইতেন কি অধিকতর কষ্ট পাইতেন?

জনৈক মীমাংসা-প্রার্থী ভারতীতে বাল্যবিবাহের সপক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছেন সে সকল কথায় কোন জোর নাই সুতরাং সে বিষয় লইয়া বেশী তর্ক করিতে চাই না। বাল্যবিবাহে স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষার ব্যাঘাত হয় ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে মেয়েদের আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষা না হওয়াই ভাল; আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাল্যবিবাহ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চার পক্ষে একান্ত বিরোধী, পুরাণ প্রণালীতে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা করিতে গেলে বাল্যবিবাহ দ্বারা যে কি উপকার পাওয়া যায় সেটাত কিছুই বুঝিতে পারি না; তবে বাল্যবিবাহে যে কিছুই শিক্ষা হয় না একথা বলিতে পারি না; মানুষ কত রকম যন্ত্রণা ভোগ করিতে সক্ষম হয় বাল্যবিবাহ হইতে সেই শিক্ষাটি বেশ ভালরকম পাওয়া যায়। মীমাংসাপ্রার্থী-মহাশয় ইহা স্বীকার করেন যে বাল্যবিবাহের সন্তান সকল রুগ্ন ও ক্ষীণকায় হয় কিন্তু তথাপি তিনি বাল্যবিবাহের সপক্ষে কথা কহিতে হইবে বলিয়াই নানা উদ্ভট কথা আনিয়া ফেলিয়াছেন; * ম্যালেরিয়ায় লোকে ভুগিতেছে অন্নাভাবে লোকে কষ্ট পাইতেছে তাই আমাদের দেশের লোকেরা এত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে তিনি এইরূপ নানা কথার অবতারণা করিয়াছেন। বেশ, আমাদের দেশে যদি হীন বল হইবার এতই কারণ আছে তবে তার উপর আবার বাল্যবিবাহ দিয়া সেই সব কারণের সঙ্গে আর একটা গুরুতর কারণ যোগ করিবার আবশ্যক কি? বাল্যবিবাহে যখন সন্তান সকল রুগ্ন ও ক্ষীণকায় হওয়াই সম্ভব তখন বাল্যবিবাহ দিবার জন্য এত মাথা ব্যথা কেন? শাস্ত্রে বলে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" সেই পুত্রই যদি রুগ্ন ও ক্ষীণকায় হইল তবে বাল্যবিবাহের দোষের আর বাকি কি রহিল বুঝিতে পারি না। আর মীমাংসাপ্রার্থী মহাশয় যে অন্নাভাবের কথা বলিয়াছেন বাল্যবিবাহে সেই অন্নাভাবটি বাড়িবে কি কমিবে সেটিও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

বেশী কতকগুলা কথা বলিয়া কোন ফল নাই; পাঠকগণ একবার আপনার আপনার অবস্থা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখুন, যে জন্য আপনারা ভুগিতেছেন

* ১৫৭ পৃষ্ঠা ভারতী শ্রাবণ ১২৯২

ছেলেদের যেন সেজন্য ভুগিতে না হয় ইহার জন্য আপনারা সতত সচেষ্ট থাকেন আমার একান্ত এই প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

—:০:—

রাজ নৈতিক আলোচনা।

আর একটি বৎসর অতীত হইল, কিন্তু গত বৎসরে আমরা কি করিলাম তাঁহার সমালোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই যে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা একটু বেশি কাজ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু আশানুযায়িক কিছুই করা হয় নাই। আমরা কেবল মাত্র এক এক জন এক এক খানি বাক্যের জাহাজ মাত্র, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি সকলই বাহির হইয়া পড়ে। যদি প্রকৃত পক্ষে আমরা কেবল জাতীয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমাদের সমালোচনার কার্য্য অতিশয় লঘু। দুইটি বিষয় দেখিতে পাই যাহা দ্বারা কতকটা জাতীয় উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

১ লালমোহন ঘোষের পার্লিয়ামেণ্টে নির্ব্বাচন সময়ে বাঙ্গলা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের অনেকগুলি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঐক্যবন্ধন, ও ইহাঁদের উদ্যোগে বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ।

২। জাতীয় সমিতির (National congress) সংস্থাপন।

বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে একটু সামান্য জলাশয় দর্শনে যেরূপ তৃষ্ণাতুর পথিকের আনন্দ হয়, আমাদেরও সেইরূপ এই সামান্য কার্য্য দুইটি দেখিয়াই বিস্তর আশার উদয় হইয়াছে। এবং ইহার মধ্যেই এই আশার ফল কিঞ্চিৎ পরিমাণে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশে ন্যাসন্যাল লিগ স্থাপিত হইয়া একটি ভয়ানক অভাব দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে।

আমরা জাতীয় উন্নতি উন্নতি করিয়া পাগল হই, কিন্তু কিরূপে তাহা সাধিত হইতে পারে, সে চেষ্টা কখনো বিশেষ রূপে করা হয় না। জমিদারবর্গ সভা স্থাপন করিলেন—অমনি তাঁহাদের বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য আর একটি সভা কৃতবিদ্যগণ-দ্বারা স্থাপিত হইল। নূতন সভায় মতভেদ হইল অমনি সেই জন্য আর একটি সভা স্থাপিত হইল। এইরূপে যখনই সভ্যদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয় তখনই মিলনের চেষ্টা না হইয়া নূতন সভা সংগঠন চেষ্টা হইয়া থাকে। একতাই যে বল—একতার দ্বারাই যে জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় সেটা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখেই কেবল মাত্র শুনা যায়—প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে কদাচ দেখা যায়। National league স্থাপন হওয়াতে আমাদের জাতীয় মিলনের কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় একতাবদ্ধ হওয়াতে যে আমাদের কত উপকার হইবে তাহা বোধ করি সকলেরই সহজে উপলব্ধি হইবে। যদি বাস্তবিকই স্বায়ত্ত শাসন চাও ত আইরিস্‌-দের অনুকরণ কর। স্বজাতির সহানুভূতি পাইয়া একক পার্ণেল কি না করিতে পারিল? স্ব স্ব প্রধান হইলে কখনই জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে না। যত কেন মনের অমিল থাকুক না, যখন এক মন্ত্র সাধনে ব্রতী তখন সেই মন্ত্র সাধন ব্রত যাহাতে উদ্‌যাপন হয় তাহা কায়মনোবাক্যে করা উচিত। স্বদেশের উন্নতি সাধন শুদ্ধ কেবল বক্তৃতায় সাধিত হইবে না। স্বকীয় মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য কার্য্য করিলেও চলিবে না। পরস্পরের সহানুভূতি বাক্যে ও কার্য্যে দেখান কর্ত্তব্য। সুযোগ্যদিগকে নেতা স্বরূপ বরণ করা নিতান্ত বিধেয়। আয়র্লণ্ডে যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। কতক দিবস হইল সেক্সটন ও ডেভিটের সহিত পার্ণেলের কতকটা মনোবিবাদ হওয়াতে অনেকে ভাবিয়াছিল যে এবারে ঘরওয়া বিবাদ হইয়া আয়র্লণ্ডবাসীগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু স্বদেশ হিতৈষী সেক্সটন ও ডেভিট যখন দেখিলেন যে, যে পার্ণেল আয়র্লণ্ডের জন্য কারাগার বাস স্বীকার করিয়াছেন, যিনি জন্ম ভূমির জন্য আজীবন কষ্টভোগ ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহার সহিত বিবাদ করিলে স্বদেশের অমঙ্গল ঘটিবে, তখন তাঁহারা মনোমালিন্য সত্বেও তাঁহাদের বরিত নেতা পার্ণেলের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন। হে ভারত-বাসীগণ যদি ভারতের উন্নতি-চেষ্টাই তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পরস্পর ঈর্ষা পরবশ না হইয়া অযথা বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া একতা ডোরে আবদ্ধ হইয়া কায়-মনোবাক্যে স্বদেশের উন্নতি সাধনে ব্রতী হও।

আর একটি সুখের বিষয় এই যে ভারতবাসীগণ—বিশেষতঃ শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণ এত দিন পরে হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা দেখাইতেছেন, তাঁহারা অন্ততঃ মুখে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

গত বৎসরে ভারত লইয়া বিলাতে যেরূপ আন্দোলন হইয়াছিল তাহাতে আমরা কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়াছিলাম কিন্তু ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞেরা ভারত সম্বন্ধে এতদূর জ্ঞান-শূন্য যে এ সম্বন্ধে পরের মুখে আহারই তাঁহাদের সম্বল,—সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের আশা ভরষা সকলি লোপ পাইতেছে। আমরা যতই কেন বিচার প্রার্থনা জন্য চীৎকার করি না তাহা মহাসভায় কখনই গ্রাহ্য হইবে না। ভারত সেক্রেটরির সভা (ইণ্ডিয়া কাউন্সিল) থাকিতে আমাদের কখনই মঙ্গল হইবে না, কেন না এই সভার সকল সভ্যগণই ভারতদ্বেষী সিভিল ও মিলিটারি বিভাগ হইতে গৃহীত হয়। ইঁহারা যেরূপ পরামর্শ দিবেন পার্লিয়ামেণ্ট বা ভারতসেক্রেটরি প্রায়ই তদনুযায়িক কার্য্য করিয়া থাকেন তাই বলিতেছি যে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল থাকিতে ভারতের মঙ্গল হইবে না।

ভারতশাসন অনুসন্ধান কমিটি—লর্ডর‍্যাণ্ডল্ফ চর্চ্চিল প্রথমে এই কমিটি

নিয়োগের কথা উত্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহার শাসন কালে একথার কার্য্যতঃ কোন ফল হয় নাই। গ্লাডষ্টোনশাসনের অভ্যুদয়কালে এই কমিটি নিয়োজিত হইয়াছে—ইহার সভ্যের সংখ্যা ৩০ জনের অধিক। লর্ড র‍্যাণ্ডলফ্ চর্চ্চহিলের মতে ইহার অতগুলি সভ্য নিযুক্ত হওয়া উচিত নহে, এবং ১৪ জনের অধিক লোক উহার সভ্য হইলে তিনি উঁহার সভ্য হইবেন না বলিয়া তিনি এবং রক্ষণশীল দলের আর কয়েকজন সভ্য এই কমিটিতে যোগ দানে অস্বীকৃত হইয়াছেন। লর্ড র‍্যাণ্ডলফ্ আরো বলেন যে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ ভিন্ন অন্য কেহ ঐ কমিটির সভ্য হওয়া উচিত নয়, অথচ তিনি যখন ভারত সেক্রেটরি ছিলেন তখন বিলাতে প্রেরিত ভারত প্রতিনিধিগণের নিকট ইহার ঠিক বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। লর্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফের যথার্থ মত ও ভাব বুঝিতে পারা সহজ নয়! এই অনুসন্ধান কমিটিটি কেবল নামে মাত্র নিয়োজিত হইয়াছে, ইহাদ্বারা কোন কার্য্যের আশা কেবল নিরাশা মাত্র।

লালমোহন ঘোষ—তিনি যেরূপ যোগ্যতা অধ্যবসায় ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন—তাহাতে আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছি। তিনি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য হইলে আমাদের অনেকটা উপকার হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের কোন কোন ক্ষুদ্রমনা ও লঘুচেতা ব্যক্তি লালমোহনের পরাজয়ে বিদ্রূপ কটাক্ষ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইংলণ্ড বাসীরা যাঁহাকে সাদরে তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ বরণ করিতে শ্লাঘা বিবেচনা করিল, তিনি কিনা স্বদেশীয় কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইলেন। হিংসাই বঙ্গবাসীদের অধঃপতনের মূল!

ফাইনেন্স কমিটি, লর্ড ডফেরিন্ ইনকমটাক্স ধার্য্য করিয়া, আমাদের চীৎকার বন্ধ করিবার জন্য এই কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে একজনও বে-সরকারি সভ্য না থাকাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে ইহা দ্বারা কোন উপকার দর্শিবে না। লাভের মধ্যে কতকগুলি গরিব ছাপোষা কেরাণির অন্ন যাইবে।

রাওলপিণ্ডির দরবার—বিশ লক্ষ টাকার অধিক এই অভিনয়ে ব্যয় হইয়া গেল। আমীর আবদুল রহমন খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া ডফেরিন খুব জাঁকজমক দেখাইয়া আমিরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। আমির ভুলিবার ছেলে নহেন। লক্ষ টাকার স্থলের স্থলে দুই লক্ষ টাকা, আর বন্দুক, কামান ইত্যাদি লইয়া আপাতত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ডফেরিন্ বাহাদুরকে খুব আপ্যায়িত করিয়া গেছেন।

দিল্লীর কাল্পনিক যুদ্ধ—বর্ম্মা ও মিসরে প্রকৃত যুদ্ধ করিয়াও আমাদের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ মিটিল না। কাল্পনিক যুদ্ধে প্রায় ২৫ লক্ষাধিক টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া অর্থের অনাটন জন্য ইনকম্ টাক্স ধার্য্য হইল।

মধ্য আসিয়ায় রুষ ও ইংরাজ—যুদ্ধ বাধিতে বাধিতে থামিয়া গেল, অথচ এই যুদ্ধ সজ্জার্থে যে কোটি কোটি টাকা অপব্যয়ে গেল তাহা আমাদের স্কন্ধে পড়িল। এই যুদ্ধ সম্ভাবনা কেবল কতিপয় সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী ঘটাইতেছিল।

সীমা নির্ণয় কমিসন। কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। শুনা যাইতেছে অকসস্ নদী হইতে ২০ মাইল পর্য্যন্ত সীমা নির্ণয় হইয়া গিয়াছে। এই কমিসন্‌টির ব্যয় এত অধিক হইয়াছে যে তাহা শুনিলে কেহই বিশ্বাস করিবেন না।

ভারতে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি। রুষদিগের ভয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া ১০ হাজার ইংরাজ সৈন্য ও ২০ হাজার দেশীয় সৈন্য বৃদ্ধি করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন।

বর্ম্মা যুদ্ধ। এই অন্যায় যুদ্ধ করিয়া এখন আমাদের গবর্ণমেণ্ট মহা ফাঁপরে পড়িয়াছেন। অতি সহজে বিনা যুদ্ধে বর্ম্মা অধিকৃত হইল, কিন্তু ডাকাইত এবং বিদ্রোহের জ্বালায় এখন ইংরাজগণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ হাজার সৈন্য থিব-রাজ্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

উপরি উক্ত এই কয়েকটি কারণে ভারতের আয় অপেক্ষা ব্যয় এত অধিক হইয়া গিয়াছে যে ব্যয় সঙ্কুলনার্থ ইন্‌কম্ ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত থিবরাজ্য রক্ষার্থ ক্রমাগত জলের ন্যায় অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। আগত বৎসরে এই ট্যাক্স উঠিয়া যাওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

মিসর—দুর্ব্বল হইলেই অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আজ যদি মিসর পুরাকালের ন্যায় বল-সমৃদ্ধিশালী হইত তাহা হইলে কখনই আধুনিক ইয়োরোপীয় জাতিগণ মিসরের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিতে সাহসী হইত না। মিসরীদিগের সকলই আছে অথচ কিছুই নাই। আমরা পরাধীন হইয়াও বোধ করি মিসরদিগের অপেক্ষা কতক পরিমাণে সুখী। তাহাদের গাছের ফল তাহারা খাইতে পায় না—নিজের অর্থ নিজে ভোগ করিতে পায় না—মিশরে মিশরী রাজা আছেন বটে, অথচ তাঁর নিজের রাজ্য তিনি নিজে শাসন করিতে পান না—নিজের প্রজাকে নিজে সুখী করিতে পান না—তাই বলিতেছি যে মিসরদিগের সকল থাকিয়াও নাই। অর্থ লোলুপ বণ্ড-হোলডারগণ (যাহারা মিসরের খেদিব অর্থাৎ রাজাকে টাকা ধার দিয়া সরখৎ লিখিয়া লইয়াছে) হয়ত দশ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়া বিশ হাজার টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে কিন্তু মূল দশ হাজারের এক কর্দ্দপকও এখনও শোধ যায় নাই!! কখনও যাইবে এরূপ আশা অল্প। টাকা ধার ঠিক্ নয়, অন্যায় পূর্ব্বক খেদিবকে দিয়া শরখৎ লিখাইয়া লওয়া হইয়াছে। উপরন্ত এই মহাজনেরা মিসরে অনেকেই মোটা বেতনের কর্ম্মচারী। এই মহাজনগণ অধিকাংশই ইউরোপীয়। ইহাঁরা মিসরের স্কন্ধে চাপিয়া বিলক্ষণ উপায় করিতেছেন। খেদিব নামে মাত্র রাজা, রাজ কার্য্য সমস্তই ইহাঁদের হাতে—প্রজারা দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। ইহাঁরা অনেক কল দ্বারা কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিয়া গরিব প্রজাদিগকে উচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। দ্রব্যের মূল্য কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং কৃষকেরা তাহাদিগের দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য না পাইয়া একরকম অর্দ্ধানশনে কালাতিপাত

করিতেছে। ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের বেতন এত অধিক যে তাহাতেই অর্থের শ্রাদ্ধ হওয়াতে খরচ কমিতেছে না, কোন প্রজাহিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে না, উপযুক্ত ও শিক্ষিত মিসরবাসীগণ স্বদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন না ও প্রজারা দিন দিন করভারে আক্রান্ত হইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। এখন কি উপায়ে মিসরবাসীগণ পরিত্রাণ পাইতে পারে তজ্জন্য ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট বাহ্যিক কতকটা ব্যস্ততা দেখাইতেছেন।

সর ড্রমন্ড উল্‌ফ্ ও আহম্মদ মুক্তার পাসা এক্ষণে সুদানের গোলযোগ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আট হাজার মিসর সেনা সুদান শাসন জন্য নিযুক্ত হইবে। মুক্তার-পাসা বলিতেছেন এই সেনাগণ দেশীয় সেনাপতি দ্বারা চালিত হউক, উল্‌ফ বলিতেছেন না, তাহা কথনই হইতে পারে না। ইংরাজ সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা শিক্ষিত না হইলে মিসর সেনাগণ ঐ সকল কার্য্যের অনুপযোগী হইবে। ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণ ড্রমণ্ড উলফের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

মেহেদির মৃত্যুর পর কিছুদিনের জন্য মিসর যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছিল। ওসমানদিগমার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা এইরূপ প্রচার হইয়া পুনরায় অল্প অল্প করিয়া যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সর্ব্বিয়া ও বলগেরিয়া—যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে। যাহা হউক রাজা আলেকজণ্ডর বিলক্ষণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ইংরাজি ও চীন—মেকলে সাহেব ও বাবু শরচ্চন্দ্র দাস চীনে গিয়া কি করিলেন তাহা বিশেষ প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু ইংরেজদিগকে তিব্বত রাজ্যে বাণিজ্য করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

তিব্বৎ—মেকলে সাহেব এবারে মহাসমারোহে তিব্বৎ প্রবেশ করিতেছেন দেখা যাউক ইঁহারা কি অভিসন্ধিতে তিব্বৎ প্রবেশে এত উৎসুক হইয়াছেন। রহস্য অবশ্য কখন না কখন প্রকাশ পাইবে।

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমায় গোলযোগ—বনওয়ার ওয়ালা জাতি অতি দুর্দ্দান্ত। পূর্ব্বে কয়েকবার তাহারা গবর্ণমেণ্টকে ত্যক্ত করিয়া কয়েক বৎসর ক্ষান্ত ছিল। এ বৎসর তাহারা ইংরাজ বিরুদ্ধে পুনরায় অস্ত্র ধারণ করায় একটী ভয়ানক যুদ্ধ হইবার আশা ছিল। সর চার্লস ম্যাকগ্রেগরি নিজ-প্রতিপত্তি লাভার্থ গবর্ণরজেনেরেলের নিকট হইতে ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য পনের হাজার সৈন্য চাহিয়াছিলেন। বোধ করি কেবল অর্থের অনাটন জন্য এই যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

ভূপালের বেগম—বেগমের স্বামী নবাব সাদিক হোসেনকে অবমানিত করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বেগমকে অতিশয় অবমানিত করিয়াছেন। নবাব আবদুললতিফকে মন্ত্রিপদ হইতে অবসৃত করিয়া একজন ইংরাজকে ঐপদ দেওয়াতে ভারতবাসী মাত্রেই দুঃখিত হইয়াছে।

নেপাল রাজ্য—নেপালে গত বৎসর যেরূপ ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা এখনও মনে হইলে হৃৎকম্প হয়। যাহা হউক এখন রাজকার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

মহানির্ব্বাচন—পার্লিয়ামেণ্ট-মহানির্ব্বাচনের সময়ে গত বৎসর মহা গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। রক্ষণশীলদল পার্নেলের সাহায্যে জয়ী হইয়া অল্পকাল মাত্র মন্ত্রিত্ব করিয়া পরাজিত হয়েন। উদার নৈতিকদল এখনও মন্ত্রিত্ব করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এত আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে যে বোধ করি ইঁহারাও শীঘ্র কর্ম্মত্যাগে বাধিত হইবেন। গত নির্ব্বাচনে অনেক ভারতহিতৈষী-ইংরাজ সভ্য হইতে না পারায় আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে।

আয়র্লণ্ড—আয়র্লণ্ড লইয়া এখন মহাগোলযোগ। আইরিস্‌গণ স্বায়ত্ব শাসন চায় কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট তাহা প্রদানে অসম্মত। ইহারা একত্রিভূত হইয়া মহা ব্রত অবলম্বন করিয়া কটিবদ্ধ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। যে অবধি ব্রত উদযাপন না হইবে সেই পর্য্যন্ত তাহারা কার্য্যক্ষেত্র হইতে কখনই অবসৃত হইবে না। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। আমাদিগের মত নিশ্চেষ্ট জাতির কখনই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশহিতৈষী হইতে চাও ত আইরিষদিগের অনুকরণ কর।

গ্রীস ও তুর্কি। গ্রীস্‌ ও তুরস্কে লড়াই বাধিতে দেরী নাই। ইংরাজ, জর্ম্মণ, ইটালি ও অষ্ট্রিয়া গ্রাকদিগের বিপক্ষে। কিন্তু ভাবগতিকে বোধ হয় ফরাসী ও রুষ গ্রীসের পক্ষ। এই যুদ্ধ ঘটিলে ইউরোপে মহা প্রমাদ ঘটিবে।

বিলাতে শ্রমজীবীদিগের হাঙ্গামা—সকল স্থানেই ব্যবসায়ের বাজার মন্দা। আমেরিকাতেও সে দিবস ভয়ানক হাঙ্গামা হইয়াছিল। বিলাতে লক্ষাধিক শ্রমজীবী কর্ম্মাভাবে অর্দ্ধানশনে কালযাপন করিতেছে। ইহারা লণ্ডন সহর একরকম লুটপাট করিয়াছিল। লণ্ডনে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল।

মহারাজা দলিপ্‌ সিং—মহারাজা দলিপ্‌ সিংহের নাম বোধ করি সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। ইনি বীরবর রণজিৎ সিংহের একমাত্র পুত্র। এত দিন আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া, সাহেব সাজিয়া বিবি বিবাহ করিয়া, নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, জন্মভূমিকে ভুলিয়াছিলেন।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে ইহাতেও দলিপ সিংহের তেমন দোষ নাই। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে যখন দ্বিতীয় পঞ্জাব যুদ্ধের অবশেষ হইল, তখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিয়া বালক দলিপের অভিভাবক হইয়া রাজ্য কার্য্য নিজ হস্তে লইলেন। ১৮৪৯ খৃঃঅব্দে একটা যেমন তেমন কারণ দেখাইয়া, বালক দলিপ ও তাহার মাতাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইল। দলিপের নিজস্ব সম্পত্তি (হীরা, মুক্তা, বাড়ি) ইত্যাদি নিলামে বিক্রিত হইল। ধূর্ত্ত ও বিশ্বাস ঘাতক গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডেলহাউসি পঞ্জাব অন্যায়

পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিলেন। দলিপ ইংরাজের মধ্যে থাকিয়া, ইংরেজের ধর্ম্ম, চাল চলন ও দোষ গুলিন বিলক্ষণ রূপে শিক্ষা করিয়া বিবি বিবাহ করিয়া জন্মভূমি ভুলিয়া গেলেন। অতি অল্প দিবস হইল—তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া তিনি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কিছু দিবস হইল তিনি ভারত সেক্রেটরির নিকট নিজ সম্পত্তির মূল্য ও লবণখনি যাহা তিনি যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছিলেন, ফিরাইয়া চাহিয়াছেন। অর্থের অনাটন হওয়ায় কষ্টে পড়িয়া ইহাঁর দেশানুরাগ ফিরিয়া আসিয়াছে; খৃষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, পঞ্জাবে বাস করিতে লালায়িত হইয়া ইনি দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। স্বদেশী স্বধর্ম্মী বলিয়া যাহাতে শিখগণ তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করে এই ইচ্ছায় তিনি জাহাজে উঠিবার কিছু পূর্ব্বে লণ্ডন হইতে তাহাদের একখানি পত্র লেখেন। এই অপরাধে এডেনে ইংরাজেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। কি অবিচার! আর অবোধ দলিপ তুমি এখনও তোমার অপহারকদিগের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছ! তোমার সকল আশা ভরসা জলাঞ্জলি দিয়া এডেনের গহ্বরে বসিয়া থাক। ভারতে আসিলেও তোমাকে পঞ্জাবে থাকিতে ও যাইতে দিবেনা—তুমি ইংরেজের খেলেনার পুতুল—ভারতে আসিলেই স্বাধীনতা হারাইয়া বন্দী হইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ থিবর ন্যায় কোন নির্জ্জন স্থানে অতিবাহিত করিতে হইবে।

গত বৎসর ভারতবর্ষে ভূমিকম্প, জলকম্প, দুর্ভিক্ষ বিসূচিকা রোগ ইত্যাদিতে দেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—:০:—

বাদল, বা চাষার ভাষা।

'আঁধার করে এসেছেরে মেঘ,
ইঃ—ইঃ—বড় হান্‌তেছে চিক্কুর!
ও-ক্ষেন্তর চট্ করে আয় আয়,
গোলেতে নে তোল্ গোরু বাছুর।
উঠোনেতে ভিজে গেল ধান্,
ঝট্‌করে মা, গামছাখেনা আন্,
ঘাটকুলেতে ভিজ্‌তেছে বাসন
হাঁসগুলোকে কুতায় কেবা তোলে—
ঝে বিষ্টি! মরবেক, এখন,
—অ্যাতখনে, বা, নিয়ে গেল শয়ালে।
তড়্ তড়্ তড়্ খই ফুটুচ্ছে শিলে,
উঠোনেতে বাদলো হাঁটু জল।
বৈকেলেতে 'রুমশে' গেছে ক্ষেতে
কি-যে-হোল, পেলেক্ নাকি থল?
বড় বড় দোমক আস্‌তেছে,
—সকলেতে মাজের ঘরে চল্,
নিত্তি, নিত্তি, এমন দুয্যুগ,
পির্থীবী বুঝি যাবেক রোসাতল?
পুকুর পাড়ের দখিন দিকের গাছে
আঁব ডালটা, ভেঙ্গে পড়েছে দিদি,
এই বারকে, থেমে এল জল,
'চুবড়ি' নিয়ে ঝট্‌করে আয় 'সদি'?

শ্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ক্ষত্রিয়-রমণী।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

১

"ঐ বরাহ" "ছুটাও ছুটাও" "আরো ছুটাও" "ঐ দিকে চল" এই দিকে এস"—মৃগয়াকারীদের শত কণ্ঠের চীৎকারধ্বনি আরাবলী প্রান্তস্থ অন্ধয়া-নামক বনের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিল, অশ্বারোহীগণের দ্রুত পদ নিক্ষেপে অন্ধয়ার পার্ব্বত্য-ভূমি বিদারিত হইয়া উঠিল, বরাহ প্রাণ ভয়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, পর্ব্বতের এ ধার হইতে ওধারে—বনের এদিক হইতে ওদিকে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে বন ছাড়াইয়া প্রান্তর পথ দিয়া এক সুবিস্তীর্ণ ভুট্টাক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মিবারের যুবরাজ অর্শি সদলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেই ক্ষেত্র সম্মুখে উপনীত হইয়া রুদ্ধগতি হইয়া দাঁড়াইলেন,—অশ্ব চালাইবার আর স্থান দেখিলেন না। রণোন্মত্ত হস্তী হঠাৎ আহত হইলে মুহূর্ত্তের জন্য যেমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়, শীকারোত্তেজিত যুবরাজ শীকারের অনুসরণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধগ্রীব, সফেন মুখ অশ্বের রাশ শিথিল করিতে ভুলিয়া মুহূর্ত্ত কাল সেইরূপ স্তম্ভিত চিত্রার্পিতের মত অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। এই সময় একজন গ্রাম্য কন্যা আসিয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইল।' যুবতী সেই ক্ষেত্রেরি অধিপতির কন্যা, ক্ষেত্রের নিকটস্থ উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া ক্ষেত্র পাহারা দিতে দিতে সে শূকরকে ক্ষেত্র মধ্যে লুকাইতে দেখিয়া এবং মৃগয়াকারীগণের দুর্দ্দশা অনুভব করিয়া তাঁহাদের সাহায্যের মানসে দ্রুতপদে যুবরাজের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ তখন আস্তে আস্তে অশ্বের রাশ শিথিল করিতে করিতে যুবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, কি সুন্দর, বলিষ্ঠ সুগঠন উন্নত দেহ! কি সরল সুন্দর মুখশ্রী! তাহার আঁট সাট সাদাসিদে গ্রাম্যবেশে সেই সুগঠন দেহের সৌন্দর্য্য যেন অধিকতর ফুটিয়াছে, তাহার অযত্ন রক্ষিত এলোথেলোচুলে সাজসজ্জাহীন-মুখখানি যেন আরো সুন্দর দেখাইতেছে, সেই বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যপূর্ণ, অসজ্জিত-স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কাছে মণিমাণিক্য বিভূষিত, যত্ন-সজ্জিত, যত্ন-রক্ষিত সৌন্দর্য্যও যেন মলিন হইয়া পড়ে। যুবরাজ দেখিলেন তাহার মাথায় সিন্দুর নাই, হাতে কঙ্গন আছে অথচ লৌহ নাই, যুবতী অবিবাহিত। তিনি বলিলেন "সুন্দরি—এই ভুট্টাবনের মধ্যে অশ্ব যাইবার কোন পথ আছে কি!" যুবতী বলিল—"না, একটু অপেক্ষা করুন, আমি শূকর তাড়াইয়া আনিতেছি"। বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, একটি দীর্ঘ ভুট্টাগাছ বিনা আয়াসে—সমূলে উৎপাটিত করিয়া হস্তে তুলিয়া লইয়া দ্রুত গতিতে ভুট্টাবনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। মৃগয়াকারীগণ উৎসুক নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবতী শূকর তাড়াইয়া

পার্শ্বের উচ্চ ভূমিতে আনিয়া ফেলিল—মৃগয়াকারীগণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অমনি সেইদিকে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন। বরাহ প্রাণভয়ে কাতর হইয়া আবার ভুট্টাবনের মধ্যে পলায়ন চেষ্টা করিল,—অন্য যে দিকে চাহে সেইদিকেই দ্রুতধাবিত অস্ত্রধারী মনুষ্য, কেবল ভুট্টাবনের দিকে এক সেই যুবতী মাত্র; শূকর দেখিল যদি ইহার হাত ছাড়াইয়া পলাইতে পারে—তবেই তাহার প্রাণ বাঁচে। সে মৃত্যুবলে বলী হইয়া রমণীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল—তাহার পর ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল,দূর হইতে সকলেই রমণীর এই বিপদ দেখিতে পাইলেন—সকলেই ত্রাস্ত ভীত হইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন, কিন্তু বরাহ তীর বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, এই যুবতীর গাত্রের উপর আসিয়া পড়ে পড়ে, এই রমণী গেল গেল—বুঝি আর কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না! যুবরাজের অশ্ব উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল,—কিন্তু তিনি আসিয়া পৌছিবার আগেই শূকর রমণীকে তাড়া করিয়া ঠিক তাহার হাতের কাছে আসিয়া পড়িল—যুবতী নির্ভয় চিত্তে অমনি আক্রমণোদ্যত শূকরের মস্তকে সেই ভুট্টাদণ্ড দ্বারা সবলে আঘাত করিলেন, সে আঘাতে শূকর যেন বজ্রাহত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল,—সেই সময় যুবরাজের অশ্বও নিকটে আসিয়া পড়িল, কিন্তু তখন আর কোন ভয় নাই। তখন রমণী হাসিতে হাসিতে শূকরের কান ধরিয়া তাঁহার নিকট টানিয়া আনিল, যুবরাজ তাহাকে অস্ত্রবিদ্ধ করিলেন; আর সকলে অবাক হইয়া রমণীর পানে চাহিয়া রহিল। রাজপুতানায় রমণীগণের সাহসের অভাব নাই—তথাপি এই গ্রাম্য নারীর সাহস দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল।

২

প্রথম কুমার। "ছিছি এ বড়ই লজ্জার কথা!

দ্বিতীয়। "তাইত আমরা থাকিতে একজন স্ত্রীলোক—"

যুবরাজ। "কেন লজ্জার কথা কি? আমাদের দেশে অমন স্ত্রীলোক আছে সে ত গৌরবেরই কথা"

প্রথম কুমার। দেশের গৌরব হইতে পারে, কিন্তু আমাদের গৌরব আর রহিল কই? স্ত্রীলোকের কাছে শেষে হারিলাম।" যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন "যদি হারিতেই হয়—ত রমণীর নিকট—বিশেষতঃ অমন রমণীর নিকট হারিতে ত আমার দুঃখ নাই—"

তৃতীয় কুমার হাসিয়া বলিলেন—"যুবরাজ, শীকার করিতে আসিয়া আপনি নিজেই শেষে শীকার বনিয়া গেছেন দেখিতেছি!" অদূরে একটা বাঁশের ছালের উপর বিশম্ভর ভুঁড়িদারজি (শেষের নামটি কুমারদের দেওয়া) শুইয়া দিব্য নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছিলেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সম্পর্কে রাজবাড়ীর সকলেরি সাধারণ শ্যালক। কুমার অজয়সিংহের গুরুপুত্র-পত্নীর মামাত ভাইএর পিসতত বোনের ননদের ইনি কেমনতর খুড়তত ভাই, সুতরাং গুরুপুত্রের ইঁহার সহিত যে ঘনিষ্ট ও গুরুতর সম্বন্ধ সেটি রাজ-

বাড়ীর সকলেই নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন। ইঁহারও তাহাতে বড় একটা আপত্তি নাই, কেননা এই সম্পর্কের দোহাই দিয়া সারাসময়টা ইনি দিব্য পায়ের উপর পা রাখিয়া, গদির উপর অঙ্গ ঢালিয়া, আলসেমি করিয়া, ঘুমাইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিন যাপন করেন,—আর মাঝে মাঝে সুযোগ পাইলেই রাজ কুমারদিগের উপরেও বিলক্ষণ করিয়া এক এক হাত ঝাড়িয়া লইতে ক্রটি করেন না। তৃতীয় কুমারের কথা বিশ্বম্ভরের কাণ এড়াইল না, তিনি ঠিক সময়টিতে উঠিয়া বসিলেন—তিনি বোধ করি ঘুমটাকে অনেকটা নেপোলিয়ানি ধরণে তৈয়ার করিয়া লইয়াছিলেন, দরকারের সময়টিতে ঠিক তাহার ঘুমটি ভাঙ্গিয়া যাইত, নহিলে অন্য সময় সহস্র ডাকাডাকিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গায় কার সাধ্য। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়াই বলিলেন—"সেকি কথা কুমার জি? আমিত জানি যেটা শীকার বনিয়াছে—সেটা নিঃঝক শূয়ার—" সকলেই হাহা করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল, তিনি আবার হাই তুলিতে তুলিতে শুইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন,—এমন সময়ে হঠাৎ হাসির সে উচ্ছ্বাসটা থামিয়া গেল। নিকটের একটি বৃক্ষে যুবরাজের অশ্ব বাঁধা ছিল, হঠাৎ পশ্চিম হইতে একটি ঢিল সবলে তাহার দিকে পড়িতে দেখা গেল,—আর অমনি অশ্ব লাফাইয়া উঠিয়া করুণ স্বরে ডাকিয়া উঠিল, কুমারগণ বুঝিলেন অশ্ব আঘাত পাইয়াছে। তাঁহারা আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি অশ্বের নিকটে আসিয়া দেখিলেন—যে একটা সামান্য ঢিলের আঘাতে অশ্বের উরুদেশের হাঁড় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এত জোরে কে ঢিল ছুড়িল! এত সামান্য জোরের কাজ নহে? তাঁহাদের ক্রোধ কৌতূহলে পরিণত হইল। এই সময় ইঁহারা সেই যুবতীকে তাঁহাদের দিকে আসিতে দেখিলেন, সে নিকটে আসিয়া বলিল। "আমাকে মার্জ্জনা করুন—আমি পাখার দৌরাত্ম্য হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য ঢিল ছুঁড়িতেছিলাম—দৈব ক্রমে অশ্বের পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, সে জন্য আমি বড়ই দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছি," ভুঁড়িদারজি বাঘের ছালের উপর হইতেই তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"সুন্দরি দুঃখ করিবেন না, ঢিলটা ঘোঁড়ার উপর দিয়া গেছে সেটা আহ্লাদেরই কথা।" যুবতা একটু সরল হাসি হাসিয়া, সঙ্গের আনীত ঔষধ বাহিরকরিয়া অশ্বের উরুদেশে লেপন করিতে লাগিল, লেপন শেষ হইলে বস্ত্রদিয়া সেইস্থান বন্ধন করিল, বন্ধনান্তে কুমারদের হস্তে ঔষধ-কৌটা প্রদান করিয়া—তাহা লেপন করিবার নিয়মাদি বলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাজপুত্রদিগের ক্রোধের ভাব প্রশংসার ভাবে পূর্ণ হইল। রমণী অশ্বকে আহত করিয়া অশ্বপ্রভুদের ধন্যবাদ লইয়া চলিয়া গেল। যুবতী চলিয়া গেলে—কুমারদিগের যেন মুগ্ধভাব দুর হইল, তাঁহাদের কথা ফুটিল, একজন বলিলেন "সর্ব্বনাশ? ঐ কোমল বাহুতে যে শতঘ্নির বল!" শ্যালকজি বলিলেন—শতঘ্নি হইলে ত রক্ষা ছিল, একেবারেই কাজ নিকাশ হইয়া যাইত, ও হাতের গোলাগুলি যাহার উপর আসিয়া

পড়ে সে যে একেবারে মরে না—আধমরা হইয়া থাকে।" কথাটা সকলের লাগিল ভাল, যুবরাজের দিকে চাহিয়া সকলেই হাসিতে আরম্ভ করিল, যুবরাজও হাসিয়া বলিলেন—"মরিতে বাকী ছিল বটে, কিন্তু তোমাদের কথার অস্ত্রে আর বুঝি কিছু বাকী থাকে না। যদি বাঁচাইতে চাও কথাটা একটু বন্ধ করিতে হয়।" একজন পারিষদ বলিলেন—"যুবরাজ কোন কাজই হইল না, শীকার করিতে আসিয়া কষ্টমাত্র সার, এখন যদি কথাটাও বন্ধ করিতে হয় ত বাঁচি কি করিয়া"?

কথাটা নিতান্ত সত্য, যেখানে কর্ম্মের যত অভাব সেইখানেই কথার তত ছড়াছড়ি! যুবরাজ বলিলেন—"কর্ম্মের জন্য এত কাতর হইয়া থাক, আমি কর্ম্মের বন্দবস্ত করিতেছি। চল সকলে মিলিয়া একবার গ্রামটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসি, যুবতীর পরিচয়টাও অমনি জানিয়া আসা যাইবে, একটা অসাধারণ রমণী!—বাড়ি গিয়া ত তার সম্বন্ধে গল্প করিতে চাই।" প্রস্তাবটা সকলেরই মনের মত হইল, প্রথম কুমার বলিলেন—"এই মাত্র আমি আপনার নিকট ঠিক এই প্রস্তাব করিতে যাইতেছিলাম," দ্বিতায় কুমার বলিলেন—তুমি ত এইমাত্র বলিতে যাইতেছিলে—আমি যে সকাল হইতে এইরূপ প্রস্তাব করিব ভাবিতেছি"—তৃতীয় বলিল—"তুমিত ভাবিয়াছ—আমি ত মহারাজকে এই কথাই তখন বলিতেছিলাম" চতুর্থ বলিল—"ইঃ তুমি বলিয়াছিলে! যুবরাজকে জিজ্ঞাসা কর দেখি আমি আগে বলিয়াছিলাম কি না"। পারিষদগণ টেপাটেপি করিয়া বলিল—"উঁহারা বড় লোক, কিন্তু ছোটর ধন লইয়া বড় লোক,—অথচ সেই কথাটা প্রকাশ করিলেই মহাকাণ্ড! তা মুখেই যেন নাই বলিলাম, মনে মনে ত চুপ করিতে পারি না।" শ্যালকজি দেখিল বড় গোলযোগ, বলিল—"আমি মীমাংসা করিয়া দিতেছি,—যুবরাজ ছাড়া আর সকলেই এ প্রস্তাব আগে করিয়াছেন।" মুখে সকলেই হাসিল, কিন্তু সকলেই মনে মনে কথাটা নিজের পক্ষে ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিল, আর কে জানে ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিয়াছিল কি না—যে 'দিন মৃগয়াকারীদের সকলেই এই প্রস্তাবকারী বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থলে নাম পাইয়াছিল—কেবল যুবরাজের নাম ইহার সম্পর্ক হইতে একবারেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। এ স্থলে এরূপ না হউক—অন্তত: জগতের এইরূপ ধারা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়।

৩

রাজপুত্রগণ অশ্বারোহণে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য পথ, পথের একপার্শ্বে পাহাড়ের গায় বড় বড় গাছ জঙ্গল বাঁধিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, আর এক পার্শ্বে দুরে অতি দুরে আকাশের গায় পাহাড় শ্রেণী সুনীল মেঘের মত মাথা তুলিয়া আছে, বিকাল বেলা, সূর্য্য অশ্বারোহীগণের পশ্চাৎদিকের একটা পাহাড়-শৃঙ্গের আড়ালে লুকাইয়া আলোক দিতেছে আর তাহাদের সম্মুখে অনন্ত নীল আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে, সূর্য্যের আলোকে চাঁদের আলো মিশিয়া চারিদিক ঈষৎ-স্বর্ণময় স্নিগ্ধ-

রজতাভায় রঙাইয়া নিকটের রজত কণায় উচ্ছ্বসিত ঝরনার বুকে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। আকাশের পূর্ব্বকোণে দুই একটি তারকা মৃদু মৃদু জ্বলিয়া সেই ঝরনার উজ্জ্বল বারি কণার প্রতি ঈর্ষা দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! ধীরে ধীরে বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়া পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া, গাছে গাছে বাঁশির তান তুলিয়া জোরে জোরে ফিরিয়া যাইতেছে। অশ্বারোহীগণ—প্রকৃতির সেই স্নিগ্ধ শোভা উপভোগ করিতে করিতে পথের একটি বাঁক ছাড়াইয়া গ্রামের রাস্তায় পদার্পণ করিলেন, অমনি সে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল—যে শৃঙ্গের আড়ালে সূর্য্য লুকাইয়া পড়িয়াছিল—সে শৃঙ্গ অমনি তফাতে পড়িয়া গেল—মুক্ত সূর্য্যের রশ্মিতে চারিদিক হঠাৎ লালে লাল হইল। চন্দ্র তারা দৃশ্যের অপরপার্শ্বে লুকাইয়া পড়িল।

একই সময়ে ঘূর্ণমান পথের একপার্শ্বে সূর্য্যালোক, একপার্শ্বে চন্দ্রালোক, একপার্শ্বে দিবা, একপার্শ্বে দিবাময়-সন্ধ্যা—চন্দ্র সূর্য্যবিকাশের এই রহস্যময় বৈকালিক শোভা কেবল পার্ব্বত্য প্রদেশেরই কোন কোন স্থানে দেখা যায়। অশ্বারোহীগণের নিকট যদিও এ দৃশ্য নূতন নহে, তথাপি এই স্বর্ণ খচিত লাল দৃশ্যের মধ্যে পড়িয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এই লাল সমুদ্রে অবগাহিত হইয়া তাঁহাদের মুগ্ধ নেত্রের সম্মুখে একটি উন্নতবপু যুবতী মূর্ত্তি আসিয়া পড়িল। যুবতীর মস্তকে দুগ্ধ কলস, দুই পার্শ্বে দুইটি মহিষ, সেই মহিষ দুইটির পৃষ্ঠে দুই হাত রাখিয়া যুবতী তাহাদের চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। কুমারগণ যুবতীকে চিনিতে পারিলেন, তাঁহারা আপনাদের মধ্যে আস্তে আস্তে কি বলাবলি করিলেন, কি একটা পরামর্শ হইল, সকলেই হাসিয়া কুটি কুটি হইতে লাগিলেন, যুবরাজ হাসিটা চাপিয়া যুবতীর দিকে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন—সকলে দাঁড়াইয়া কি একটা যেন রহস্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যুবরাজ ঘোড়া ছুটাইয়া হঠাৎ যেন অসতর্ক অবস্থায় একেবারে যুবতীর উপর আসিয়া পড় পড় হইলেন, আর যেন তাঁহার অশ্ব সম্বরণের ক্ষমতা নাই,—তিনি ভয়ার্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি সর সর—পথ দাও—" অভিপ্রায়—যুবতী ভয় বিহ্বল হইয়া পলায়নোদ্যত হইবে অমনি তাহার দুগ্ধকলস মাথা হইতে পড়িয়া যাইবে, আর তাঁহারা সকলে হাসিয়া উঠিবেন, যুবতী অপ্রতিভ হইবে।

"সর সর" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে যুবরাজ—যুবতী-পার্শ্বস্থ মহিষ ও যুবতীর মধ্যে আসিয়া পড়িবার মানসে অশ্ব একটু বাঁকাইয়া লইলেন, অদূরে অশ্বারোহীগণের হাসি মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ হইল, তাহাদের মনে হইতে লাগিল—রহস্য বুঝি সত্যই প্রাণঘাতক হইয়া পড়ে! নিস্তব্ধে তাহারা শেষ দেখিবার অপেক্ষা করিয়া রহিল। যুবতী যুবরাজের অভিপ্রায় বুঝিল—বুঝিল তিনি তাহার গাত্রের ঠিক পাশ দিয়া তাহাকে নড়াইয়া যাইতে চাহেন, কিন্তু সে তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া—একটু সরিতে চেষ্টা না করিয়া, পার্শ্বের মহিষের শৃঙ্গটা হাতে ধরিয়া যুবরাজের দ্রুতশীল অশ্বের গাত্রে

লাগাইয়া দিল—অশ্ব হঠাৎ চমকি য়া লাফাইয়া উঠিয়া গেল, যুবরাজ অসতর্ক অবস্থায় হঠাৎ অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। তিনি যে রহস্য জমাইতে চাহিয়াছিলেন—তাহা জমিল বটে—তবে সম্পূর্ণ উল্টা রকমে জমিল। যুবরাজ পড়িবামাত্র যুবতী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে গেল, অশ্বারোহিগণও নিকটে আসিয়া পড়িল। কিন্তু কাহারো সাহায্য আবশ্যক হইল না, তিনি অপ্রস্তুত হইয়া আপনিই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবতী বলিল "মাপ করুন, আমার ইচ্ছায় হয় নাই।" যুবরাজ লজ্জায় উত্তর দিতে পারিলেন না; সে তখন আস্তে আস্তে এমন প্রশান্ত ভাবে চলিয়া গেল—যেন কিছুই হয় নাই। রমণী চলিয়া গেলে যুবরাজ প্রথমে দেখিলেন তাঁহার কোনস্থলে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে কি না, দেখিলেন সৌভাগ্য ক্রমে কোথায় লাগে নাই। তখন আপনারা সকলে মিলিয়া ভাল করিয়া আর একবার হাসিতে আরম্ভ করিলেন, হাসিটা ফুরাইলে একজন বলিল "যুবরাজ এ কি হইতেছে কি? সমস্ত দিনের মধ্যে একটা সুসার হইল না।"

যুবরাজ বলিলেন—"একেই আর কি বলে গ্রহ"। আর একজন বলিল—"গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া এখন গ্রহের শেষটা কি একবার দেখা যাউক।" যুবরাজ বলিলেন—"কোন লজ্জায় আর গ্রামে যাই, একটা ঘোড়াকে সামলাইতে পারিলাম না,—মুখ দেখাই কি করিয়া?" আর একজন বলিল—"ঘোড়াটা ত সামলাইতে পারিলেন না এখন, প্রাণটা সামলাইয়া ঘরে ফিরিতে পারিলেই হয়।"

সত্য সত্যই আর তখন গ্রামে যাওয়া হইল না। তাঁহারা একটি নির্ঝরিণী-ধারে গাছের তলায় বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতে লাগিলেন। কিছু পরে একজন গ্রামবাসীকে নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া বিশ্বম্ভর উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "দাঁড়াও সন্ধানটা জানিয়া আসি" বলিয়া গমনশীল গ্রামবাসীর কাছে আসিয়া পশ্চাৎদিক হইতেই বলিল—"বাপুহে তোমার নাম কি?" গ্রামবাসী সেই দিকে মুখ ফিরাইবামাত্র নিতান্ত অপরিচিত মূর্ত্তি তাহার চোখে পড়িল—সে একটু উদ্ধত ভাবে বলিল—"সে খবরে তোমার কাজ কিহে বাপু?" ব্রাহ্মণের মহা রাগ হইল—বলিল—"নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি কত সৌভাগ্য—তানা বেটার রকম দেখ।" গ্রামবাসী হস্তস্থিত লাঠির উপর দুই হাত সবলে রাখিয়া ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—শ্যালকজি বলিল—"ইঃ তবেত মরিয়া গেলাম—আমি কি আর রাগ করিতে জানি না নাকি?" গ্রামবাসী বলিল—"কে তুই উন্মাদ, চলিয়া যা, ফের যদি কথা কহিবি মুখ ভাঙ্গিয়া দিব?" বিশ্বম্ভর কুমারদের প্রিয়পাত্র, তাহার বুকের পাটা একজন সামান্য গ্রাম্যের কথায় দমিবার নহে, সে বলিল—"চলিয়া যাইব! ওঁর কথায় চলিয়া যাইব! জানিস বেটা আমি ব্রাহ্মণ? মুখ সামলাইয়া কথা কহিস"—গ্রামবাসী ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিল—"তুমি যার সঙ্গে কথা কহিতেছ সে কে জান—একজন ক্ষত্রিয়।"

বিশ্বম্ভর। "ক্ষত্রিয়! তোর মত কত ক্ষত্রিয় দেখেছি, কি বলিব কলিকাল, নইলে আজ

ব্রহ্মণ্যতেজে তোকে এইখানে ছাই করিয়া রাখিয়া যাইতাম।” ক্ষত্রিয় আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ দাঁত দেখাইয়া বলিল—“আবার হাসি হচ্ছে? চল বেটা যুবরাজের—” এই সময় দুইজন পারিষদ এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বৃক্ষতল হইতে উভয়ের উচ্চ স্বর শুনিয়া বুঝিল ঠাকুর গোলযোগ বাধাইয়াছেন, নিকটে আসিয়া বলিল—“মহাশয় ও ব্রাহ্মণের কথা ধরিবেন না উহাকে পাগল বলিয়া জানিবেন—” ক্ষত্রিয় বলিল— “হ্যাঁ পাগলই দেখিতেছি—” বিশ্বম্ভর রাগ করিয়া চলিয়া গেল, পারিষদ বলিলেন—” মহাশয় একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি—অনুগ্রহ করিয়া বলিলে বড়ই বাধিত করেন, আজ সকালে একটি কন্যা অন্ধয়া বনের নিকটের একটি ভূট্টাক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিলেন—তাঁর নিবাস কোথা? তিনি কে বলিতে পারেন”?

ক্ষত্রিয়। “তিনি আমার কন্যা। এই গ্রামেই আমরা থাকি।” বিশ্বম্ভর যাইবার সময় এই কথা শুনিয়া উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া যুবরাজকে এই সংবাদ প্রদান করিল, যুবরাজ তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষত্রিয়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া একজন কুমারকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কুমার নিকটে আসিয়া বলিলেন—“মহাশয় মিবারের যুবরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন—যদি অনুগ্রহ করিয়া—” কথা শেষ না হইতেই ক্ষত্রিয় গর্ব্বিত স্বরে বলিল “মহাশয় মাপ করিবেন। তিনি মিবারের যুবরাজ আমি এই গ্রামের অধিপতি। এখানে কেহ আসিলে প্রথমে তিনিই আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন—নহিলে আমরা গ্রামবাসীরা আগন্তুকের ব্যবহারকে অভদ্রতা জ্ঞান করি,—মিবারের যুবরাজ তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। কিন্তু মিবারের যুবরাজ বলিয়া তাঁহার অনুরোধে আমি আমার কর্ত্তব্য ভঙ্গ করিতে পারি না,—আমি অন্যস্থলে যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি—তিনি যুবরাজ বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে বিপরীতাচরণ করিয়া আপনাকে অবনত করিতে পারি না,—নিয়মের কাছে ছোট বড় নাই—” কুমারগণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, একজন সামান্য ক্ষত্রিয়ের এত বড় কথা! কিন্তু এ আশ্চর্য্য ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে আরো একটা মহা আশ্চর্য্যের মধ্যে তাঁহারা পড়িয়া গেলেন, ক্ষত্রিয়ের কথার উত্তরে যুবরাজ স্বয়ং পশ্চাৎদিক হইতে আসিয়া এই কথাগুলি বলিলেন—“মিবারের যুবরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আপনার সম্মান প্রদর্শনে যে ত্রুটি দেখাইয়াছেন আপনার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিয়া এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত”—

সকলে যেন কি শুনিল বিশ্বাস করিতে পারিল না। সত্যই যুবরাজ এক জন সামান্য ক্ষেত্র-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাহেন! কিন্তু এখনো তাহারা বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে নাই। যুবরাজের কথা ক্ষত্রিয়ের ভাল লাগিল না, বলিল “যুবরাজ এ প্রস্তাব করিয়া আপনি আমাকে যতদূর সম্মানিত করিলেন—দুঃখের বিষয় আমি ইহাতে ততদূর সম্মানিত হইলাম না।”

ক্ষত্রিয় উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই স্পর্দ্ধিত পদক্ষেপে চলিয়া গেল—সকলে বিস্ময়ে ক্রোধে অপমানে অভিভূত হইয়া পড়িল।

*　　*　　*　　*

যেমন দর্প ভরে ক্ষত্রিয় কুমারদিগের সহিত কথা কহিয়া আসিলেন গৃহে আসিয়া তেমনি তাঁহার দর্প চূর্ণ হইল। মিবারের যুবরাজকে কন্যাদানে অস্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া গৃহিনী তাঁহাকে এমন ধুড়ধুড়ি নাড়িয়া দিলেন—যে সেই তিরস্কার খাইয়া নিজের অন্যায়টা স্পষ্টরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু ইহাতেও গৃহিনী ক্ষান্ত না হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীর দোষের ক্ষমা চাহিয়া ও কন্যার বিবাহে সম্মতি জানাইয়া যুবরাজের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। পরদিনই যুবতীর সহিত যুবরাজের বিবাহ হইয়া গেল। যুবরাজ শীকার করিতে আসিয়া বধূ সঙ্গে গৃহে গমন করিলেন। এই মহিষীর গর্ব্ভেই পরে বীরশ্রেষ্ঠ হাম্বীর—যিনি ১২ বৎসর বয়সে শত্রু জয় করিয়া মিবার রাজপুত কুল উজ্জ্বল করেন—তাঁহার জন্ম হয়।

সমাপ্ত।

হেঁয়ালি নাট্য। *

দৃশ্য।

পৌর সভা-গৃহ।

(মহামান্য গোকুল সিংহ, অজামৃত ভক্ত, কৃষ্ণজীব গোস্বামী প্রভৃতি সভ্যগণ ও গৌরাঙ্গ সভাপতি আসীন)

সভাপতি। যে জন্য আজ সভা আহূত হয়েছে বোধ করি, সকলেই আপনারা জানেন। এই মহানগরীতে হত্যা-শালার (Slaughter house) একটা বড় অভাব আছে, উহা স্থাপন না করলে হিন্দুদের সর্ব্বনাশ হবে। এই সভার দ্বারা অনেক প্রকার কাজ হয়েছে কিন্তু এমন শুভ অনুষ্ঠানের ভার আমার হস্তে আর কখন এসেছে কিনা সন্দেহ। এই হত্যা-শালা স্থাপন হলে নগরের যে শুধু শোভা বৃদ্ধি হবে তা নয়—ইহাতে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি—সভ্যতারও উন্নতি—এমন কি ধর্ম্মেরও উন্নতি সাধিত হবে।

গোকুল সিংহ অজামৃত ভক্ত প্রভৃতি দুই চারি জন সভ্য }—শ্রবণ কর! শ্রবণ কর! (সজোরে করতালি)

---

* গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "কেবল"। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল, নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, অনন্তলাল ঘোষ, বিনোদবিহারী সোম—ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

কৃষ্ণজীব গোস্বামী প্রভৃতি সভ্যগণ }—সে কি মহাশয়? সে কি মহাশয়?

সভাপতি। এই সব মূর্খ বর্বরদের বুঝান দায়—হত্যাশালা স্থাপন করে কিপ্রকারে ধর্ম্মের উন্নতি হবে তাও আবার এদের বোঝাতে হবে। ভরসা করি আমার প্রিয় বন্ধু গোকুল বাবু এ বিষয় এঁদের ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।

গোকুল। (আহ্লাদের সহিত উত্থান করত) (অন্নামৃত ভক্ত প্রভৃতি সভ্যের করতালি) সভ্যগণ! আপনারা "হত্যা" এই কথাটি শুনিয়া ভয় পাইবেন না। এ নর-হত্যা নয়—এ পশু-হত্যা। ইহাতে কোন দোষ দেখা যায় না। শুধু দোষ দেখা যায় না তাহা নহে, এইটি না হলে বাঙ্গালীর উন্নতির আদৌ সম্ভাবনাই নাই। বাঙ্গালী মাত্রেরই মাংস খাওয়া উচিত। তা না হলে বাঙ্গালী "বলণ্টীয়র" হবে কি ক'রে?—যুদ্ধ ক'রবে কি ক'রে?

একজন সভ্য।—কি রূপ যুদ্ধ মহাশয়?—বাক্-যুদ্ধ?

গোকুল। সভাপতি মহাশয়! এই বক্তৃতার তোড়ের মুখে Interruption আমার ভাল লাগে না।

সভাপতি। অর্ডর!—অর্ডর!

গোকুল। ভাল, বাক্-যুদ্ধটাই কি কম কথা? আচ্ছা, আমি তো একজন গোখাদক—আমার সঙ্গে এস দেখি কে পারে—আমি ঝাড়া চার ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা কর্‌ব—আর কথায় কথায় তোমাদের তর্ক খণ্ডন ক'রে যাব।

একজন সভ্য।—হ্যাঁ—এ বেশ কথা। বাঙ্গালীর পক্ষে এই ভাল। কাটাকাটি করতে গেলে কথা কাটাকাটি করাই ভাল।—কিন্তু এ রকম বাক্-যুদ্ধের পক্ষে কি ডাল ভাত যথেষ্ট নয়?

গোকুল। সে পরে বুঝিয়ে দেব। এখন এক এক ক'রে তোমাদের আপত্তি খণ্ডন করি। কার কি আপত্তি আছে বল।

একজন। মহাশয়, হত্যাশালা স্থাপন করে নগরের শোভা-বৃদ্ধি কি রূপে হবে?

আর একজন। স্বাস্থ্যের উন্নতিই বা কি ক'রে হবে?

আর একজন।—ধর্ম্মের উন্নতিই বা কি রূপে হবে।

গোকুল। এই দেখ তোমাদের কথাগুল কচ্‌ কচ্‌ করে কেটে দি। এতেই গোখাদকে আর নিরামিষাশীতে তফাৎ বুঝ্‌তে পারবে।

প্রথমতঃ নগরের শোভা সম্পাদন। যখন হত্যাশালায় মুণ্ডকাটা রক্ত-মাখা পাঁটার শরীর দোদুল্যমান হবে আহা তখন সে কি শোভা! সে দৃশ্য দেখে কার মুখ থেকে লাল না পড়বে? এ শোভা যে না দেখ্‌তে পায় সে অতি কৃপা-পাত্র, তার AEsthetic

facultyর আদপে চাষ হয় নি বল্‌তে হবে। লাল রঙ্গের যে কি শোভা তা সকল দেশেরই কবি মুক্ত কণ্ঠে গান করে থাকেন। অতএব এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্য সম্পাদন—

একজন। মহাশয় হত পশুর পূতি গন্ধে বরং তো স্বাস্থ্য ভঙ্গ হবারই কথা।

সভাপতি। অর্ডর!—অর্ডর!—

গোকুল। নির্ব্বোধকে বল্‌তে দিন। আমি বুঝিয়ে দিচ্চি। দেখ, একটু দুর্গন্ধ যারা সইতে পারে না তারা অত্যন্ত Delicate, তারা বলন্টীয়ার কি ক'রে হবে, শরীর যাদের সবল তাদের একটু আধটু দুর্গন্ধে কিছু হয় না—আর, এই দুর্ব্বলতা যাতে যায় এই জন্যই—For this very reason—বাঙ্গালীদের গোখাদক হওয়া আবশ্যক। গোখাদক নয় বলেই আমাদের দেশের লোকের এত Diabetes হচ্চে। অতএব এটাও বোধ হয় প্রমাণ হল যে গোখাদক না হলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না।

তৃতীয়তঃ ধর্ম্মের উন্নতি। এ কথা সহজ পড়ে আছে। শরীরের সঙ্গে মনের—ও মনের সঙ্গে শরীরের অকাট্য যোগ আছে, সকল দেশের শাস্ত্রেই এ কথা স্বীকার ক'রে থাকে। স্নুতরাং স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেই শরীরের উন্নতি, শরীরের উন্নতি হলেই ধর্ম্মের উন্নতি যে হবে এ কথা বোঝাতে হচ্চে এই আশ্চর্য্য! তা ছাড়া যেমন কালী স্থানে কালী স্থাপন করা হয়--তেমনি আমাদের এই হত্যাশালাতেও বৃহৎ এক কালী স্থাপন করা যাবে। তাহলে হিন্দু ধর্ম্মের মর্য্যাদাও রক্ষা হবে। বরং বিলাত থেকে ৫০০ টাকা বেতনে একজন গোরা পূজারি আনা যাবে—মায়ের পূজা তাতে আরও Energetically চল্‌বে, বলিদানটাও Scientifically হবে।

অন্য সভ্যগণ। ছি! ছি! ছি!—আরে মোলো বলে কি! হিন্দুয়ানি সব গেল দেখ্‌ছি! (মহা কলরব ও গণ্ডগোল)

সভাপতি। অর্ডর!—অর্ডর!—

অন্য সভ্যগণ। রেখে দাও মশায় তোমার অর্ডর!—আমাদের কি না গোখাদক করতে চায়।

গোকুল (সক্রোধে) গোখাদক করতে হবে কেন--হিন্দুদের মধ্যে বার আনাই তো গোখাদক। তা কেন, তুমি যে একজন কথা কচ্চ, তুমিই যে গোখাদক।

কৃষ্ণজীব। আরে মূর্খ! এই যে বল্লি যে বাঙ্গালীরা গোখাদক নয় বোলেই তাদের Diabetes হয় আবার ব'লচিস কি না বাঙ্গালীরা প্রায় সকলেই গোখাদক।

গোকুল। আমার জিহ্বার উপর তোমার কোন legal attachment, charge বা encumberance নাই যে তোমার মতে আমার জিহ্বা চালনা কোরতে হবে! আমার জিহ্বা যখন যা বোলবে তখন তাই তোমাদের শুন্‌তে হবে। আমি ব'লচি—আবার ব'লচি—Over and over again ব'লচি যে বাঙ্গালীরা সকলেই প্রায় গোখাদক।

উক্ত সভ্য। কি! আমি গোখাদক?—তুই গোখাদক—আর সহ্য হয় না, দেও তো হে ঘা কতক বসিয়ে। (সকলে মিলিয়া প্রহার)

গোকুল। মলুম! মলুম! চেয়ার ম্যান সাহেব রক্ষা কর—রক্ষা কর।

সভাপতি। (বিব্রত হইয়া) পুলিস ম্যান্—পুলিস ম্যান্—

(পুলিস ম্যানের প্রবেশ।)

সভাপতি। ও লোককো পাকড়ো!

পুলিস। আচ্ছা হুয়া—লাগাও, লাগাও—হিন্দু লোককো গোখাদক বোল্‌তা। নেই সাব তোমারা বাৎ নেই শুনে গা। ও লোক হামলোক্‌কা জাত মারনে আয়া।

কৃষ্ণজীব। (বুকের উপর বসিয়া) কেমন আর গোখাদক বল্‌বি? অধিকাংশ হিন্দু-দের তুই গরু খেতে দেখিচিস্?

গোকুল! না মশায়—আমাকে ছেড়েদিন—আমার বলবার অভিপ্রায় তা ছিল না। আমি গোখাদক বলিছিলুম যেতো নয়। হিন্দুরা গরু খায় এ কথা তো আমি বলি নি।

কৃষ্ণজীব। তবে আর বল্‌তে বাকি রাখ্‌লে কি? গোখাদক আর কাকে বলে? গো শব্দের তবে অর্থ কি?

গোকুল। কেন? বিদ্যাসুন্দরে ত পষ্টই আছে

গো-শব্দ নানার্থ অভিধানে লেখা।
এখানে "গো" শব্দ অর্থে—পাঁটা-খাসী-বোকা।

সকলে। (উচ্চ হাস্য) হো—হো—হো—পাঁটা বটে?—ঠিক—ঠিক—ঠিক—বিদ্যের ভুর্‌ভুরি আর কি! যে কুল উনি উজ্জ্বল করেছেন গো শব্দের যোগেই তা বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে। (ছাড়িয়া দিয়া) যাও ঘাস্ খাও গে—তোমাকে মারাও যা গো-হত্যা করাও তা। তোমার বাপ্ ক-অক্ষর গোমাংস!

অজামৃত। গোকুল বাবু চলহে এখানে আর না—এই ব্যালা সট্‌কানো যাক্।

(গোপাল বাবু ও অজামৃত বাবুর চোঁচা দৌড়।)

যবনিকা পতন।

সহজে গান অভ্যাস।

রাগিণী পরজ—ঝাঁপতাল।

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
সা—নী—নী—সা৹নী৹সা—। নী—ধ—ধ—পা৹মা৹পা—। পা৹মা৹পা—ধ৹ম৹গা—
কে র চে এ ম ন সু ন্দ র বি

০ ১ ২ ৩ ০ ১
ম—। গা—রি—সা৹নী৹সা——। সা৹নী৹সা—ম—গা—গা—। ম—ধ—ধ—সা৹নী৹
শ্ব ছ বি র ত ন ম ণি খ চি ত অ

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
সা—। সা৹নী৹রি—রি—সা৹নী৹সা—। রি—নী—ধ—ম—ধ—। সা—নী—নী—
ম্ব র কি শো ভে কে র

০ ১ ২ ৩ ০
সা৹নী৹সা—। নী—ধ—ধ—পা৹মা৹পা—। পা৹মা৹পা—ধ৹ম৹গা—ম—। গা—রি—
চে এ ম ন সু ন্দ র বি শ্ব ছ

১ ২ ৩ ০ ১ ২
সা৹নী৹সা—— ॥ ॥ঃ ধ—ধ—ধ—ধ—সা৹নী৹। সা—সা—সা—সা৹নী৹স—। রি৹সা৹
বি ত রু ণ বি ভা স্ক র তা রা

৩ ০ ১ ২ ৩
রি—রি—রি—সা—। সা৹নী৹সা৹সা৹রি৹নী৹ধ৹ম৹ধ— ॥ ঃ॥ ধ—ধ—ধ—পা—ম—।
বি শ দ চ ন্দ্র মা জ গ ত র

০ ১ ২ ৩ ০ ১
পা—ধ—সা৹নী৹সা—সা—। সা৹নী৹রি—রি—(রি সা নী সা)—সা—। রি—নী—ধ—
ঞ্জি ছে ক ন ক র জ ত র ঞ্জ নে

২ ৩ ০ ১ ২
ম—ধ—৹। সা—নী—নী—সা৹নী৹সা—। নী—ধ—ধ—পা৹মা৹পা—। পা৹মা৹পা—
কে র চে এ ম ন সু ন্দ র

৩ ০ ১ ২ ৩ ০
ধ৹ম৹গা—ম—। গা—রি—সা৹নী৹সা—— ॥ ॥ঃ ধ—ধ—ধ—ধ৹পা৹ধ—। পা৹মা৹
বি শ্ব ছ বি সু র ভি পু ষ্পা

১ ২ ৩ ০ ১ ২
পা—নি—ধ—পা—। ম—ম—গা—পা—ম—। গা——রি—সা—সা—। নী—সা—
ভ র ণ বি পি ন গি রি সি ন্ধু ন দ স ক

৩ ০ ১ ২ ৩ ০
সা—গা—ম—। গা৹ম৹পা—পা—পা——। ধ—ধ—পা৹ধ৹নী—ধ—। ধ৹পা৹ধ—
লি প রি পূ রি ত অ তু ল প্র ভা

১ ২ ৩ . ১
ধ৹ধ৹পা৹ম৹গা৹ম৹ ॥ ঃ॥ ধ—ধ—ধ—নী—নী—। সা—সা—সা—নী৹সা৹রি৹রি৹।
বে কে ম ন স্থ নি পু ন তো মা র
২ ৩ ৹ ১ ২ ৩
(রি সা নী সা)— —সা—রি৹নী৹ধ৹ম৹। ধ— — — — — —। ধ—ধ—ধ—ধ৹ধ৹ধ—।
লে খ নী তো মা র জ গ ত
৹ ১ ২ ৩ ১
পা৹ম৹পা৹ধ৹সা৹নী৹সা—সা—। সা৹নী৹রি—রি—সা৹নী৹সা—। রি—নী—ধ—
শো ভা নি র খি ন য় ন ভু লে।
ম—ধ—।

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আশা-কানন—শ্রীগোবিন্দমোহন বাকচি প্রণীত।

পুস্তকখানিতে ছোট ছোট কয়েকটি কবিতা আছে, তন্মধ্যে "হিমালয় 'বিধবা রমণী' রিপণের যাত্রা এই কয়েকটি আমাদের ভাল লাগিল।

প্রেমশিক্ষা। শ্রীদীননাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত। মায়ের প্রেম, মায়ের স্নেহ বর্ণনা করিয়া এই পুস্তক খানি লিখিত। পুস্তকখানির প্রতি লাইনে লেখকের অসীম মাতৃভক্তি প্রকাশ পাইতেছে। ইহাঁর কাছে সকলে মাতৃভক্তি শিক্ষা করিতে পারেন।

ভারত কুসুম। বই খানি একজন হিন্দু মহিলা প্রণীত। হৃদয়ের উচ্ছাসে পূর্ণ ছোট ছোট কয়েকটী কবিতায় এই বই খানি শেষ হইয়াছে। ইহাতে যে দোষ নাই তাহা নহে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এত সুন্দর জিনিষ আছে যাহা পড়িলে দোষেরদিকে আর তত লক্ষ্য থাকে না। কেবল তাহা নয়, যখন দেখা যায় যে কবিতাগুলি লেখিকার কত অল্প বয়সের লেখা তখন অনেকটা আশ্চর্য্য হইতে হয়, এবং ভবিষ্যতে কবির প্রতিভা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না। নিম্নে একটি কবিতা উঠাইয়া দিতেছি।

নিশীথে বংশী-ধ্বনি।

কেন প্রাণ কাঁদে বাঁশী! ও তোর মধুর তানে?
উদাস হইল প্রাণ তোর স্বর পশি' কানে।
ডাকে না মুরলী ধারী, নাহি রাধা ব্রজেশ্বরী
তবে কেন চিত্তহারা মন নাহি গৃহ পানে,
মাতিল মোহিল প্রাণ কাঁদিল কেন কে জানে?
ইচ্ছা হয় পাখী হ'য়ে গৃহ ত্যজে' যাই
কৌমুদী হসিতাকাশে উড়িয়া বেড়াই
কিম্বা ওই স্বরে মিশি' বিচরি নীল গগনে।

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু রাজকুমার সেন শিবপুর ১।৴৹
,, নরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র কলিকাতা ১৲
পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী ভবানীপুর ৩৲
বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যো লক্ষ্ণৌ ১॥৶৹
,, ভুবনমোহন সেন আমিনপুর ৩৲
,, অম্বিকাচরণ দাস কলিকাতা ৩৲
,, দীনদয়াল বসু টাকী ৩।৶৹
,, কালীদাস বাগচী কুচবিহার ৩॥৹
,, নেপালচন্দ্র চট্টোঃ উলিপুর ১।৶৹
,, হরিহর চট্টোপাধ্যায় কানপুর ৩।৶৹
,, শরৎচন্দ্র মুখোঃ শিমলাপাহাড় ৩।৶৹
রেঃ সী, বমউইচ্ কলিকাতা ৩৲
বাবু গুরুচরণ সেন তিল্লি ৪৲
,, দ্বারকানাথ মল্লিক কলুটোলা ৩৲
,, নরেন্দ্রচন্দ্র মুখোঃ খুলনা ১॥৶৹
,, মহেশচন্দ্র চৌধুরী ভবানীপুর ৩৲
,, হরনাথ ভঞ্জ বাহিরশিমলা ২৲
,, কেশবচন্দ্র আচার্য্য হুগলকুড়ে ১॥৹
,, প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিলী ৩।৶৹
,, সুরেশচন্দ্র ঘোষ ভবানীপুর ১৲
,, অম্বিকাচরণ মল্লিক কুঁড়িয়া ৩৲
,, কাশীচরণ রায় ঢাকা ৫৲
,, কালীকুমার চৌধুরী কলিকাতা ৩৲
,, রাধামাধব বসু কাটোয়া ৩।৶৹
,, রামানন্দ পাল দরজিপাড়া ৩৲
,, গোপালচন্দ্র সিংহ ভবানীপুর ৩৲
,, হেরম্বনাথ দে ইটালি ১৲
,, শরৎচন্দ্র দত্ত রাধাবাজার ২॥৹
,, ক্ষেত্রনাথ মুখোঃ চাঁপাতলা ১৲
,, গিরীশচন্দ্র রায় ধোপাডাঙ্গা ৩।৶৹
,, প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাকুড়া ১২॥৶৹
,, অক্ষয়কুমার দাস মহিষাদল ৭॥৶৹
,, হীরালাল কুণ্ডু কুমারখালি ৩।৶৹

বাবু কুমুদচন্দ্র মুখোঃ সিমলাপাহাড় ৩।৶৹
,, কালীমোহন সেন দিনাজপুর ৯॥৹
ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা ১৲
বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় কুচবিহার ৩।৶৹
,, সুরেশচন্দ্র মিত্র ভবানীপুর ১৲
,, যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কুচবিহার ৩।৶৹
,, কুঞ্জবিহারী চট্টোঃ কলিকাতা ১৲
সাবিত্রী লাইব্রেরীর সম্পাঃ বউবাজার ১॥৹
বাবু নগেন্দ্রনারায়ণ আঃ চৌঃ বিডনষ্ট্রীট ৩৲
,, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲
,, প্রমথনাথ রায় কলিকাতা ৩৲
,, কুলদাকিঙ্কর রায় ভবানীপুর ৩৲
,, ক্ষেত্রমোহন মুখোঃ ভবানীপুর ১॥৹
,, গিরীশচন্দ্র রায় গোপালনগর ২।৶৹
,, শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মাণিকতলাষ্ট্রীট ১॥৹
,, মহেন্দ্রনাথ বসু মাণিকতলাষ্ট্রীট ১৲
,, গোপালচন্দ্র ভায়া গাইবান্ধা ১৸৶৹
,, রাধিকামোহন লাহিড়ী বেনারস ১৲
,, হরেন্দ্রনাথ মজুমদার সিরাজগঞ্জ ৩৲
,, চক্রধর আচার্য্য কটক ২।৶৹
,, বেণীপদ পাপ্পসি বেনারস ৩।৶৹
,, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌঃ ময়মনঃ ৩৶৹
,, গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাঃ ৩৲
,, উপেন্দ্রনাথ সেন গৌহাটী ৩৲
,, নবকুমার দাস মুচিকান্দী ৩।৶৹
,, দেবেন্দ্রকুমার বসু রূপগঞ্জ ৩।৶৹
ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মানিকতলা ৩৲
শ্রীমতী ক্ষীরোদকামিনী ঘোষ বাণিয়াঃ ১৸৶৹
বাবু গগনচন্দ্র রায় গাজিপুর ৩৸৹
,, অন্নদাপ্রসাদ রায় কলিকাতা ১৲
,, শ্রীনাথ মিত্র নন্দনবাগান ১৲
,, রাধিকামোহন সাহা হাথারিপাড়া ৩।৶৹
,, যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌঃ কালীঃ ৩৲
,, মহেন্দ্রকুমার চৌধুরী বালিয়াবাটী ৩৲

স্থানাভাব——ক্রমশঃ।

সিন্ধু কাহিনী।

তৃতীয় ভাগ।

কাশিমের সিন্ধু আক্রমণ হইতে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপন পর্য্যন্ত সিন্ধু দেশে অনেক রাষ্ট্র বিপ্লব অনেকানেক রাজ বংশের উত্থান পতন সংসাধিত হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দী

ইতিহাস { হইতে এ পর্য্যন্ত যত শতাব্দী গত হইয়াছে প্রায় ততগুলি রাজ বংশ সিন্ধু রাজ্যে অবতীর্ণ। ৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর ঐ দেশ মুলতান ও মনসুরা এই দুই মুসলমান রাজ্যে বিভক্ত হয়। মুলতান উত্তর হইতে আলোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মনসুরা সিন্ধু বিজয়ের অনতিকাল পরে ব্রাহ্মণাবাদের নাম ধাম অধিকার করিয়া সমুত্থিত হয়, আলোর হইতে দক্ষিণ সাগর পর্য্যন্ত তাহার সীমা। কালিক-প্রতিনিধিগণ প্রায় ৩০০ বৎসর সিন্ধুদেশ শাসন করেন তদনন্তর যবনাধিপত্য ক্ষণকালের জন্য অস্তমিত হইয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে সুমরা ও সম্মা রাজপুতগণ কয়েক শত বৎসর উত্তরোত্তর রাজ্য করেন তন্মধ্যে সম্মা বংশীয় রাজগণ অনেকে মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত। সম্রাট আকবরের সময় সিন্ধুদেশ মোগল রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৪০ অব্দে পারস্যরাজ নাদর সা হিন্দুস্থান আক্রমানন্তর সিন্ধু নদীর পশ্চিমের কতক প্রদেশ দিল্লী সম্রাটের প্রসাদে আত্মসাৎ করেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে মহারাষ্ট্র বিজেতা আহমদ খাঁ দুরাণী সিন্ধুদেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতে কতক কাল আফগান আমীরদের নাম সিন্ধু ইতিহাসে মিশ্রিত দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের অধিকার নাম মাত্র। যিনি যখন পারিতেন কর আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। সেও অধিক কালের জন্য নয়—ব্রিটিস ধূমকেতু অকস্মাৎ উদয় হইয়া সকলি উলট পালট করিয়া দিল।

কাল্‌হোরা। { ইংরাজ শাসন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে দুই রাজবংশ সিংহাসন অধিকার করেন তাহা কাল্‌হোরা ও তালপুর। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাল্‌হোরা রাজবংশের পত্তন ও প্রায় অশীতি বৎসর ঐ বংশের রাজত্ব কাল। ঐ বংশীয় রাজা গোলাম সা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও সুশাসনে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে (১৭৬৫) হাইদ্রাবাদ দুর্গ প্রতিষ্ঠা হয়। তার ছয় বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু। লোকের বিশ্বাস এই যে গোলাম সা তাঁহার প্রাসাদ নির্ম্মাণ কালে এক ফকীরের কুটীর ভূমিসাৎ করিতে আদেশ করেন সেই ফকীরের অভিশাপে তাঁহার অকাল মৃত্যু হয়। আবদুল নবী কাল্‌হোরা বংশের শেষ রাজা—বলোচ বিদ্রোহে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হয়।

তালপুর { ১৭৮০ কিম্বা তার দুই তিন বৎসর পরে তালপুর বংশীয় বলোচ আমীরগণ কাল্‌হোরাদিগকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইংরাজদের দেশাধিকার কালে এই আমীরদের আধিপত্য ছিল। তালপুর বংশের মূলগুরু ফতেআলি খাঁ, তিনি বংশের গৌরব বর্দ্ধন ও কলহ বিদ্রোহ নিবারণ-মানসে স্বীয় ভ্রাতৃগণ সাথে একত্রে রাজ্য শাসনের সূত্রপাত করেন। তাঁহারা চার ভাইয়ে মিলিয়া একমতে একচিত্তে এমনি সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক কার্য্য করিতেন যে 'চার ইয়ার' বলিয়া তাঁহাদের নাম রাষ্ট্র। ক্রমে তালপুর বংশের স্বতন্ত্র তিন শাখার সৃষ্টি হইল—হাইদ্রাবাদ- মীরপুর, খয়েরপুর তিন আমীরের তিন রাজ্য বিভাগ। নিয়ম এই যে আমীরেরা মিলিয়া গুলিয়া রাজকার্য্য করিবেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে যিনি বড়, তিনি কর্ত্তা—তাঁহার পদবী 'রাইস্‌'—রাইসের মান মর্য্যাদাও বিশিষ্ট রূপ।

আসিয়ার শান্তি { আফগান যুদ্ধাবসানের পর লর্ড এলেনবরো (Lord Ellenborough) সিমলা হইতে আজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন যে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট রাজ্য সীমায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এইক্ষণ অবধি শান্তি স্থাপন ও রাজ-রক্ষণে একান্ত যত্নবান্‌ হইবেন। এই অভিপ্রায়ে "আসিয়ার শান্তি" চিহ্নিত এক মেডাল বাহির হইল। কিন্তু ফলে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিল। ইহার ছয় মাসের মধ্যেই সিন্ধুদেশ ব্রিটিষ রাজ্য ভুক্ত বলিয়া দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র জারী হইল। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে সিন্ধুদেশ তখন তিন রাজ্যে বিভক্ত—উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য সিন্ধু—প্রত্যেক রাজ্যের এক এক জন আমীর অধিস্বামী। ১৮৩৯ অব্দে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ও আমীরদের মধ্যে এক

১৮৩৯ সন্ধি { সন্ধি বন্ধন হয় তাহা হইতেই দেশের ভাবি দুর্গতির সূত্রপাত। এই সন্ধি সূত্রে ইংরাজেরা সিন্ধুদেশে প্রবেশ লাভ করেন। এই সন্ধি যদিও আমীরদের মনঃপূত হয় নাই কিন্তু কি করেন দায়ে পড়িয়া ব্রিটিস যুগে গ্রীবা অবনত করিতে হইল। আফগান যুদ্ধের তিন বৎসর আমীরদের আচরণে দোষ ধরিবার কিছুই ছিল না। দেশের মধ্যে হইতে বিটিস সৈন্য চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখা—জাহাজে খোরাক যোগান' কিছুতেই তাঁহাদের কোন ত্রুটি হয় নাই। কাবুল সৈন্য ছার-খার হইবার পরেও তাঁহারা বাহন খোরাক প্রভৃতি যোগাইতে সাধ্যমত ত্রুটি করেন নাই। General Nott—জেনেরেল নট কাবুল প্রয়ান কালে সিন্ধু হইতে তিন সহস্র উটের সাহায্য লাভ করেন। ইহা সত্বেও কোন কোন আমীর ইংরাজদের পরাজয় দেখিয়া দাঁত দেখা-ইতে সাহস করিয়াছিলেন এই এক ছুতা ধরিয়া তখনকার এজেণ্ট Major Outram আমীরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সন্ধিপত্রের পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করেন। লর্ড এলেনবরো আদেশ করিলেন ব্রিটিসরাজের বিপত্তির চিহ্ন দৃষ্টে যদি কোন আমীর তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে তাহার যথোচিত শাস্তি দেওয়া হয়।

Sir charles Napier } ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৪২ এ সর্ চার্লস্ নেপিয়র সিন্ধুদেশে প্রেরিত হন। রাজদ্রোহ অভিযোগ বিচারের ভার তাঁহার হস্তে ও তাঁহার প্রতি আদেশ এই যে দোষের স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত আমীরদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা হয়। সে যাহা হউক তিনি বিচারে তাহারদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন ও বলিলেন ১৮৩৯ এর সন্ধি অনুসারে কার্য্য করা হয় নাই। আমীরগণ সন্ধিভঙ্গ অপরাধে অপরাধী।

Major Outram } পূর্ব্বকার সন্ধিপত্রের পরিবর্ত্তে এক নূতন সন্ধিলেখ্য প্রস্তুত হইবার কথা। মেজর আউট্রাম তাহার এক নমুনা তৈয়ার করিয়া লর্ড এলেনবরোর কাছে পাঠান। তাহা গবর্ণর জেনেরেলের নিকট হইতে ১২ই নবম্বরে নেপিয়রের হস্তে আসে। তখন আউট্রাম দেখিতে পাইলেন তাহা ঠিক হয় নাই—তাহার কতকগুলি কঠোর অনুশাসন সংশোধন করা আবশ্যক নতুবা বেচারা আমীরদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করা হয়। তিনি এই বিষয়ে নেপিয়র সাহেবের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গবর্ণর জেনেরেলের অনুমতি প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করিলেন। সেনাপতি এই নমুনা পত্র প্রায় দেড়মাস কাল আপনার কাছে রাখিয়া দেন ও পরিশেষে যখন ভ্রম সংশোধনের অনুজ্ঞা আইসে তখন যতদূর অনিষ্ট হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার আর কোন ফল হইল না। সন্ধিপত্রে আমীরদের নিকট হইতে যে সকল ভূমি সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার কথা ছিল, সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বে সে সকল কবলীকৃত হইল— আর বিলম্ব সহিল না। ওদিকে যে বলোচ সরদারগণ ঐ ভূমি সম্পত্তির অধিকারী তাহাদের মধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার পড়িয়া গেল।

ঘরাও বিবাদ। } এই সকল দুর্ঘটনারমূল আমীরদের মধ্যে ঘরাও বিবাদ। আমীরদের রাইস তখন ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ মীর রোস্তম। রাজা প্রজা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত, তাঁহার কনিষ্ঠ আলিমোরাদ ইংরাজদের আগমনে নিজ কাজ গোছাইবার অবসর পাইলেন ও স্বার্থ সাধন মানসে ব্রিটিস সেনাপতির তোষামোদ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে মীর রোস্তমের বিরুদ্ধে চটাইবার মতলব, আর চেষ্টা এই যে রোস্তম কোন বিদ্রোহের কাজে ধরা পড়েন। আলিমোরাদের প্ররোচনায় সেনাপতি মীররোস্তমকে কটুকাটব্য পূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন ও যখন মীর নেপিয়রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন তাহা অগ্রাহ্য হইল, ইত্যবসরে আলিমোরাদ তাঁহার ভ্রাতার স্বাক্ষরিত একপত্র সেনাপতির নিকট প্রেরণ করেন তাহাতে জানান হয় যেন রোস্তম ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার পাগড়ী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সৈন্যসামন্ত দেশ দুর্গ সকলি সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত। নেপিয়র বলিয়া পাঠাইলেন মীর রোস্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবশেষে যথা কর্ত্তব্য বিধান করিবেন। এরূপ

হইলে আলিমোরাদের সব জুয়াচ্চুরি ধরা পড়ে,—এই সাক্ষাৎ নিবারণ অভিপ্রায়ে তিনি মধ্যরাত্রে তাঁহার ভ্রাতাকে উঠাইয়া বলিলেন "এই বেলা পালাও নহিলে জেনেরল সাহেব সকালে তোমাকে গ্রেফতার করিতে আসিবেন।" বৃদ্ধমীর শশব্যস্ত হইয়া

মীররোস্তমের পলায়ন। অরণ্যে পলায়ন করেন অমনি নেপিয়র ঘোষণা করিয়া দিলেন যে মীররোস্তম ব্রিটিসরাজের অপমান করিয়াছেন। আলীমোরাদকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। মীররোস্তমের ঘোর বিপদ উপস্থিত। তিনি নেপিয়রের নিকট তাড়াতাড়ি আপন মন্ত্রীকে এই বলিয়া পাঠান যে আলিমোরাদ তাঁহাকে কয়েদ ও জোর জবরদস্তী করিয়া পত্র স্বাক্ষর করিয়া লন—তাঁহারি প্ররোচনায় তিনি পলায়ন করিয়াছেন। নেপিয়র ইহার এক তীব্র ভৎসনাপূর্ণ উত্তর প্রেরণ করেন, ও অরণ্যে গিয়াও ব্রিটিস হস্ত এড়াইবার উপায় নাই ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এক-দল সৈন্য পলাতক মীরের পশ্চাৎ ইমামগড়ের কেল্লার উপর হল্লা করিতে পাঠান।

ইমামগড় আক্রমণ ইমামগড়ের কেল্লা নেপিয়রের মতে সিন্ধুর Gibralter। তাহা দখল করিতে পারিলে ব্রিটিস গৌরবের সীমা থাকিবে না এই ভাবিয়া তিনি দুর্গ আক্রমণ করিয়া বারুদে উড়াইয়া দিয়া ফিরিয়া আসেন। এই সাহসের কার্য্যের জন্য Duke of Wellington পর্য্যন্ত নেপিয়রের যুদ্ধ কৌশল প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু মীর মহম্মদ যিনি দুর্গের অধিপতি তিনি যখন ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের কোন অপরাধ করেন নাই তখন তাঁহার উপর এ অত্যাচার আমাদের সহজ বুদ্ধিতে প্রশংসার যোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

মীর রোস্তমকে রাজ্যচ্যুত ও আমীরদের ভূমি-সম্পত্তি হস্তগত করিয়া সন্ধি স্বাক্ষর উদ্দেশে ব্রিটিস সেনাপতি আমীরদিগকে খয়েরপুরে মিলিত হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ আদেশ মতে উপস্থিত না হওয়াতে হাইদ্রাবাদ সমিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহার দুদিন পরেই দক্ষিণ সিন্ধুর আমীরদের উকীলেরা সৈনাপতি-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সন্ধিস্বীকার করিবার ইচ্ছা জানাইল। তাহাদের আদেশ গ্রাহ্য করিলে সবগোল মিটিয়া যায় কিন্তু নেপিয়র বলিলেন তা হইবে না—হাইদ্রাবাদে ফিরিয়া যাও। পরস্পর বিরোধী দুই দলের একত্র সম্মিলনে যে গোলযোগ বাধিবার আশঙ্কা তাহাই ফলে দাঁড়াইল।

হাইদ্রাবাদ সমিতি হাইদ্রাবাদ সমিতিতে আমীরগণ সম্মিলিত! তাঁহারা আপনাদিগকে নিরপরাধী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—যে সকল পত্রে তাঁহাদের দোষ সপ্রমাণ বলিয়া ধার্য্য হয় তাহা দেখিতে চাহিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি তাঁহারা নব সন্ধিপত্র সাক্ষর করিলেন কিন্তু মেজর আউট্রাম

কে স্পষ্ট বলিলেন যে ব্রিটিসদের আচরণে বিশেষত মীর রোস্তমের প্রতি তাহাদের অত্যাচারে বলোচ সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; তাহারা যদি হঠাৎ কোন বিদ্রোহাচরণ করে তজ্জন্য তাঁহারা দায়ী নন। এই অবসরে সেনাপতি নেপিয়র স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আরো গোল বাধিবার উপক্রম হইল। সন্ধি স্বাক্ষরের পর আউট্রাম যখন কেল্লা হইতে বাহির হয়েন তখন লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্রিটিসদের উপর ধিক্কার ও গালি বর্ষণ আরম্ভ করিল। আমীরেরা অনেক কষ্টে মেজরকে বাটী পৌছিয়া না দিলে তাঁহার প্রাণ শঙ্কট উপস্থিত হইত। ইহার তিন দিন পরে এক দল বলোচ সৈন্য রেসিডেন্সি আক্রমণ করে—মেজর অসামান্য সাহস ও পরাক্রমের সহিত প্রবল শত্রু বিরুদ্ধে আত্ম রক্ষা করিয়া নদীতে সেনা রক্ষিত ষ্টীমারে উঠিয়া নিস্তার পান।

সিয়ানির যুদ্ধ — এখন যুদ্ধের সমূহ কারণ উপস্থিত—এস্পার কি ওস্পার যুদ্ধে যাহা হয় স্থির হইবে। নেপিয়র রাজধানীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া বলোচ সৈন্য দলে বলে আসিতে আরম্ভ করিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাহারা সেয়ানি ক্ষেত্র অধিকার করিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের সংখ্যা ২০০০০। নেপিয়র ২৭০০ সেনা লইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। বলোচেরা বীরোচিত বিক্রম ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষিত বল ও মারাত্মক শস্ত্রের বিরুদ্ধে তাহাদের বল বিক্রম কতক্ষণ চলিবে! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হইল—বলোচেরা তাহাদের তাঁবু অস্ত্র শস্ত্র ব্রিটিসদের হস্তে ফেলিয়া সরিয়া পড়িল। চার্লস্ নেপিয়র সৈন্যদের জয় ধ্বনির মধ্যে দিয়া হাইদ্রাবাদ দুর্গ প্রবেশ পূর্ব্বক আমীরদের রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া সৈন্যদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। ইহার পর ডব্বায় আর এক যুদ্ধ হয়—স্বাধীনতা রক্ষার সেই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। আমীরেরা বন্দীকৃত ও নির্ব্বাসিত হইয়া কষ্ট শ্রেষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন—সিন্ধু দেশ ব্রিটিস রাজ্যে মিলিত হইল।

ইংরাজ রাজনীতি — এই ত ইংরাজদের সিন্ধু বিজয় কাহিনী। ইহাতে কি দেখা যায়? ইংরাজ রাজ্যলাভের মূলে যে ঘোর অন্যায অত্যাচার তাহা কি ইহাতে প্রকাশ পায় না? সর্ নেপিয়র পূর্ব্ব হইতেই দেশ দখল করিবার আশয়ে কার্য্যারম্ভ করেন—আমীরদের সঙ্গে তাঁর যে বিবাদ তাহা মেষদলের সহিত ব্যাঘ্রের বিবাদের অনুরূপ। তাঁহার নিজ হস্তাক্ষর হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমীরদের দমন করিবার জন্য আমরা কেবল একটা ছুতো চাই। যে রাজ্য দুর্ব্বল সে শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক বলবানের গ্রাসে পতিত হইবেই হইবে। আমা-

দের সিন্ধু দেশ অধিকার যদিও অন্যায় কিন্তু এ অন্যায়েও বিস্তর লাভ ও উপকার—এ যে পেজমি এ ভদ্র পেজমি (a humane piece of rascality)"।

তাঁহার নীতি শাস্ত্রে সৎকার্য্য * সিদ্ধির নিমিত্তে অসৎ উপায় যোজনা দোষের নহে। †

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার লজ্জাশীলা তারকাগুলি যখন লজ্জাবনতমুখে আকাশের কোলে বাহির হয় তখন ছাতের উপর দাঁড়াইয়া অনন্তের বিমল সৌন্দর্য্যের মুখচ্ছবি ভাবিতে কি আনন্দ! —তখন জগতের বিশালতা অনুভব করিতে কেমন ভাল লাগে! এই বিশাল সৌন্দর্য্যের কবিত্বের ছায়ায় আমাদের প্রাণ মন ঢাকিয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে এ জগতের সৌন্দর্য্য বসিয়া যায়। সন্ধ্যার আধো আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়া আমাদের প্রাণে ভাবের শত সহস্র হিল্লোল আসিয়া আঘাত করে এবং সংসারের সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া লইয়া গিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। সন্ধ্যার সুকোমল ছায়ায় আমাদের প্রাণ শীতল হইয়া যায়। এই জন্য সন্ধ্যার ছায়া আমাদিগের অত ভাল লাগে—তাই আমরা সন্ধ্যার সময় জগতের সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব বেশ অনুভব করিতে পারি।

এই বিশ্ব জগতের প্রতি স্তরে স্তরে কবিত্ব মাখান। চরাচর শত সহস্র কবিতার সংগ্রহ। চন্দ্র সূর্য্য তারকারা একেকটী কবিতা। এই বিশ্বজগৎ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার মালা। শত সহস্র উজ্জ্বল তারকাবলী এই মালায় গ্রথিত হইয়া শোভা পাইতেছে—কত শত চন্দ্র সূর্য্য এই মালার মধ্যে ফুলাকারে বিরাজ করিতেছে। সৌন্দর্য্যের সূত্রেই চন্দ্র তারকাবলী গাঁথা রহিয়াছে। সমস্ত দিবস মালাটীর তেমন সুগন্ধ থাকে না। সন্ধ্যায় তাহার সুগন্ধ বিকশিত হয়—তাহার হাসি ফুটিয়া উঠে। সন্ধ্যার রক্তিমাচ্ছটায় মালাটী হাসিতে থাকে। মনুষ্য হাসি ভাল বাসে, সুগন্ধও সে চায়। তাই সে সন্ধ্যার কোলে বসিতে চায়—তাই সে সন্ধ্যার মুখে চুম্বন করিতে ভাল বাসে। সন্ধ্যা তাহার হৃদয়ের ধন। সন্ধ্যায় সে ভাবুক।

---

* সৎকার্য্য ত কিছুই দেখিলাম না,—দেখিলাম কেবল স্বার্থসিদ্ধি। ভাং সং।

† Marshman's History of India chapter 13. Burton's sindh

মেঘ শূন্য নির্ম্মল আকাশের তলে সন্ধ্যায় বসিয়া থাকিতে কি আরাম! আমাদের হৃদয়ের সমস্ত মালিন্য দূর হইয়া গিয়া সেও যেন আকাশের মত নির্ম্মল হয়। আমাদের প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠে—মনে হয় সাঁঝের তারার সহিত মিলাইয়া এক হইয়া যাই। সন্ধ্যা আমাদিগের মনের সঙ্গে খেলা করিতে বড় ভাল বাসে। সে মানব হৃদয়ে নানারকম খেলার ভাব তুলিয়া দেয়, কিন্তু তাহার সকল খেলাগুলিই গাম্ভীর্য্যমাখা—তাহার খেলায় গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়া যেন ফুট্‌কুটে হাসি দেখা দিতেছে। হাসি সুন্দর, কিন্তু নিতান্ত ফেক্‌ফেকে হাসির সৌন্দর্য্য নাই। যে হাসি গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে ফুটিয়া বাহির হয় তাহাই যথার্থ সুন্দর। এই কারণে সন্ধ্যার খেলা বড় সুন্দর, কেননা তাহার হাসি গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে বিকাশিত হইতেছে। এই রূপ সুন্দর হাসির আধার বলিয়াই সন্ধ্যা মানুষের প্রিয়।

সমস্ত গগন নীল। কেবল দূরে দূরে এক একটী শুভ্র মেঘের টুকরা ধীরে ধীরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যার এই দৃশ্যে কি গম্ভীর ভাব! কি মধুর হাসি! মেঘগুলি যেন নীলিমার চাপা ঠোঁটের এক একটী হাসির টুকরা। তাহারা যেন চাপা থাকিতে না পারিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা এই হাসিগুলিকে সাজাইয়া দেয়—তাহাদের সৌন্দর্য্যকে আরও সুন্দর করিয়া তুলে। সন্ধ্যার আশ্রয়ে এই হাসিগুলি ফুটিয়া উঠে। তাই সন্ধ্যার এত গৌরব—তাই সন্ধ্যার সময় জগতের সৌন্দর্য্য দেখিবার উপযুক্ত সময়—তাই সন্ধ্যার প্রাণ কবিত্ব মাখা।

আবার সন্ধ্যার আধো আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়া যখন সূর্য্যের সিন্দূর বর্ণ পদচিহ্ন-সকল আকাশের অবারিত নীলিমার এক প্রান্তে চন্দ্রের শুভ্র হাসিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া হাসিতে থাকে তখন আকাশের কি চমৎকার শোভা! সন্ধ্যা না হইলে এ শোভা কেহ ফুটাইতে পারে না তাই সন্ধ্যা কবি।

সন্ধ্যায় আমাদের হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠে—হাসির আলোকে প্রাণ ভরিয়া যায়। চারিদিকের কবিত্বের মধ্যে থাকিতে থাকিতে আমরাও যেন কতকটা কবি হইয়া পড়ি—আমাদের নিতান্ত অসাড় প্রাণেও যেন সন্ধ্যায় কবিত্বের হিল্লোল উথলিয়া উঠে। আমরা সমস্ত দিবস সংসারের কীট হইয়া শত সহস্র কোলাহলের বোঝা বহন করিয়া সন্ধ্যায় বিশ্রাম করিতে থাকি—আমাদের ক্লান্ত অবসন্ন পরাণকে শান্তির পথে অগ্রসর করিতে থাকি। সংসারের বাহ্য চাকচিক্যে আমাদের ঝলসিত চক্ষু সন্ধ্যার সময়ে যেন আবার তাহার পূর্ব্বদৃষ্টি লাভ করে। সমস্ত দিন আমরা কৃত্রিমতার মধ্যে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় প্রকৃতির পানে ফিরিয়া চাই। সন্ধ্যায় আমরা প্রকৃতির সন্তান—সমস্ত দিন আমরা কৃত্রিমতার দাস।

আমরা প্রকৃতির সন্তান হইয়াও সংসারের কুটিলতার মধ্যে থাকিতে থাকিতে প্রকৃতিকে ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া যাই। চব্বিশ ঘণ্টা কৃত্রিমতার সঙ্গে বাস করিতে

করিতে আমাদের আচার ব্যবহার প্রকৃতির অনুযায়ী না হইয়া প্রায় কৃত্রিমতার অনুযায়ী হয়। সন্ধ্যার ছায়ায় যেন আমাদের কৃত্রিম ভাব ঢাকা পড়িয়া যায়—কৃত্রিমতা দূরে চলিয়া যায়। সন্ধ্যা আমাদিগকে প্রকৃতির নিকটে লইয়া আসে—আমাদের হৃদয়কে কতকটা প্রাকৃতিক ভাবে গঠিত করিয়া তুলে। প্রকৃতি সত্য। সুতরাং সন্ধ্যা আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যায়—আমাদের প্রাণের মধ্যে সত্য ঢালিতে থাকে। সন্ধ্যা আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সরল করিয়া তুলে—নিতান্ত কুটিলতা হইতে একটু দূরে লইয়া যায়।

সন্ধ্যা প্রেমের মিলন স্থান। সন্ধ্যায় জগতের প্রেম বেশ ফুটিয়া উঠে—সাঁঝের আলোকে তাহার পরিস্ফুট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যা প্রেমের হাসি। সন্ধ্যা না হইলে প্রেমের হাসি ভাল দেখা যায় না—জগতের সৌন্দর্য্যের তেমন বিকাশ হয় না। সন্ধ্যার হাসিতে কত ফুল ফুটে—তাহারা আবার কত প্রেম ছড়ায়। এইরূপ সন্ধ্যাকালে চারিদিকে প্রেম ফুটিয়া উঠে—চারিদিকে সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়। সন্ধ্যা প্রেম বিলায়—আমাদের হৃদয়ে প্রেম ফুটাইয়া দেয়। তাই সন্ধ্যা প্রেমিক।

গাছেদের মাথায় সন্ধ্যার সময় যখন সূর্য্যের সোনালী রশ্মিগুলি খেলা করিতে থাকে—গাছেদের কোমল পত্রে বসিয়া দুলিতে থাকে তখন প্রেমের কি চমৎকার হাসি দেখিতে পাওয়া যায়! তখন মনে হয় যেন চরাচর চরাচরের প্রেমে ঢল ঢল—প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুর প্রেমে টলমল। তখন মনে হয় বিশ্বসংসারে প্রেমের তরঙ্গ উঠিয়াছে—জগৎ প্রেমে গলিয়াছে—প্রেমের হিল্লোলে জগতের প্রাণের হিল্লোলে মিলিয়াছে। তখন সন্ধ্যাকে প্রকৃত প্রেমিক—প্রেমের প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী বলিয়া মনে হয়।

সন্ধ্যা আমাদিগকে সসীম হইতে অসীমের পানে লইয়া যাইতে চায়—অসীমের পানে যাইবার জন্য আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দেয়। সসীম সৌন্দর্য্যে নিতান্ত মুগ্ধ না হইয়া সন্ধ্যা আমাদিগকে অসীম সৌন্দর্য্যের পানে ফিরিয়া চাহিতে বলে। সন্ধ্যা অসীমের ভাব কতকটা প্রকাশ করে। সসীমের সামান্যতা সন্ধ্যা আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়। সন্ধ্যা আমাদিগের হৃদয় দ্বার খুলিয়া রাখিতে পরামর্শ দেয়। সে বলে যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিও না। সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভাবের মধ্যে আমাদিগের মন প্রাণ আবদ্ধ করিতে সন্ধ্যা সহজে দিতে চাহে না। আমাদের সম্মুখে অসীম ভাব আনিয়া দিয়া সে আমাদের প্রাণের দ্বার খুলিয়া দেয়। আমাদের প্রাণের বদ্ধ হাওয়া বাহির হইয়া যায়।

সন্ধ্যা প্রেমিক—সন্ধ্যা কবি। জগতে সন্ধ্যা প্রেম বিলায়—জগতে সে সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া দেয়। কবি না হইলে কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারে না। সন্ধ্যা কবি; তাই সে জগতের কবিত্ব বুঝাইতে কতকটা সক্ষম হয়। কবিত্ব সীমাবদ্ধ হইতে পারে না—

তাহাতে তাহার শ্রী নষ্ট হইয়া যায়। সন্ধ্যায় আমরা জগতের যে কবিত্ব দেখি তাহার মধ্যে কোথাও বদ্ধভাব দেখি না। সন্ধ্যার কবিত্ব এই জন্য বড়ই সুন্দর—সন্ধ্যার প্রাণ এই জন্য প্রেম পূর্ণ। সন্ধ্যায় আমরা দেখি ও বেশ বুঝিতে পারি যে,

"ছন্দে উঠিছে তারকা
ছন্দে কনক রবি উদিছে।"

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাব্য জগৎ।

তুমি আমি কি একটি জিনিষ একই ভাবে দেখি? দুই জনে এক পথ দিয়া যাই—প্রতিদিনই সেই এক পথ দুজনার—তবু আমরা ভিন্ন পথাবলম্বী; তুমি যাহা দেখ, তুমি দেখিয়া যাহা ভাব তাহা আমি না দেখিতে পারি, না ভাবিতে পারি। তোমার চিন্তা তোমার পথ ধরিয়া চলে না—তোমার হাঁটিতে হাঁটিতে কত কথা মনে পড়ে আমার পড়ে না। তোমার জগৎ আমার জগৎ ভিন্ন, এমন কি তুমি আমি এক ভাষার কথা কই না। আমার কথা গুলির মধ্যে প্রণয়ের ইতিহাস নিহিত থাকিতে পারে, তাহার প্রত্যেক বর্ণে কত চিন্তা, কতভাব কত কি থাকিতে পারে তাহাতে আলোক আঁধার, হাসি কান্না মিশিয়া থাকিতে পারে—তোমার কথা বোধ হয় কথার পঞ্জর মাত্র, তাহাতে জীবনের অভাব, শূন্যে শব্দ চেষ্টা মাত্র। তোমার আমার জীবনের সম্পর্ক থাকিয়াও তুমি আমি ভিন্ন জগৎ হইতে আসিয়াছি।

"দুহিতা" কথাটি তোমার নিকট বোধ হয় ছোট একটি বালিকা মাত্র। সে আমার সরলা বালিকা, দেবী, গৃহের স্নেহের অবলম্বন, সকলের সোহাগলতা, আদরময়ী আনন্দময়ী; আমি তাহাতেই উমার বালেন্দুমুখ খানি দেখিতে পাই—গঙ্গা সৈকতে তাহাকেই মরালকে গমন অভ্যাস করাইতে দেখি। আবার আমার "দুহিতা" কথাটিতে আর্য্যস্থানের শৈশবের ইতিহাস মনে পড়ে—পর্ণকুটিরে ঋষিকন্যাকে উষার শুভ্রালোকে গোদোহন-রতা দেখিতে পাই, সেই সঙ্গে তপোবন, ঋষিকুমার, হরিত পত্রাবলি মধ্যস্থ নীল-হোম-ধূম, গায়ত্রীচ্ছন্দ মিশ্রিত পাখির কূজন কত কি মনে পড়ে—অথচ তুমি আমি "দুহিতা" কথাটি ব্যবহার করি বলিয়াই দুই জনে কি এক হইলাম।

তুমি Palace কথাটি কথায় কথায় ব্যবহার কর। তোমার পক্ষে সেটি রাজধানী বাচক শব্দ মাত্র। আমি তাহাতে দূর চক্ষে গুটিকতক মেষপালককে Tiber নদী তীরে

দেখিতে পাই। তাহাদিগের সপ্ত পর্ব্বত বেষ্টিত কুটিরগুলি মনে পড়ে। রোমের জন্মদিন উপলক্ষে "Pales" পেলিশ বনদেবতার পূজা দেখিতে পাই। সরল কৃষক সরলা. কৃষকবালার শান্তিময় জীবনের কথা ভাবি। ভাবিতে ভাবিতে সম্রাট নিরোর কথা মনে পড়ে। রোমের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ, গৃহবিবাদ, রাজা প্রজা, সাধারণ-তন্ত্রের উন্নতি অবনতি, দ্বেষ হিংসা কত কি এক মুহূর্ত্তে চোখের সামনে দিয়া চলিয়া যায়। Neroর রাজগৃহ নির্ম্মাণের আজ্ঞা শুনিতে পাই। শত শত ধূলিশায়িত গৃহ, সৈনিক হস্তে কত গৃহ তাড়িত স্ত্রী কন্যা শিশুর লাঞ্ছনা দেখিতে পাই। আমার Palace Neroর palatium তবুও তুমি বলিবে আমাদের এক ভাষা, আমরা একজাতির লোক।

আবার তুমি আমি যাহা দেখি তাহা একরকম দেখা, আর যাহারা কবি, যাহারা পৃথিবীকে অপার্থিব করিয়া তুলে, অপার্থিবকে প্রত্যক্ষ করে, সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত যাহাদিগের দৃষ্টি, আকাশময়ী চিন্তা যাহাদিগের—তাহারা অন্য ভাবে সবই দেখে।

আমাদিগের কাছে বাতাস বাতাসে মিশাইয়া যায়। তাহাতে একটি পাতা, একটি তৃণ, একটি জলকণা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে কি না তাহা আমরা দেখিতে পাই না—দেখিলেও মনে রাখিতে পারি না—তোমার আমার হৃদয়ে আসিয়া তাহা পহুঁছে না।

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিয়া মোর প্রাণ।"

একজন প্রণয়ী কবির কথা।

"সোই মধুর বোল শ্রবনহি শুনিনু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল।"

আর একজন প্রণয়ী কবির কথা।

তুমি আমি যখন একথা হৃদয়ের অন্ত হইতে বলিতে পারিব তখন তুমি আমি কবির ভাষা বুঝিব—তখন তোমার আমার কথা লোকে স্তব্ধ হইয়া শুনিবে, তখন Skylarkকে (চাতককে) Shelley (সেলি) যাহা বলিয়াছেন তোমাকে আমাকে লোকে তাহাই বলিবে—

"Teach me half the gladness
That thy brain must know;
The world would listen then
As I am listening now."

"তোমার কল্পনায় যত আনন্দ তাহার অর্দ্ধেক আমাকে শিখাও আমি যেমন তোমার গান শুনিতেছি জগৎ তখন আমার কথা তেমনই ভাবে শুনিবে"।

দেখা যাক দুইজন কবি আবার কি ভাবে এক বিষয় ধরিয়া—এক skylark সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন।

Wordsworthকে (ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ) আমরা তত আদর করি না। আমাদিগের মেজাজ খানিকটা আমীরি। চেষ্টা করিয়া আমরা সৌন্দর্য্য খুজিয়া লইতে পারি না; চট্‌পট্ যাহা ভাল লাগে তাহা ছাড়া আমাদিগের আর কিছুই ভাল লাগে না। মজলিসে সুর বাঁধিয়া না আনিলে আমরা কোনরূপ যন্ত্র শুনিতে প্রস্তুত নহি। বাঁধা রাগ রাগিণী ভিন্ন নূতন কিছুরই অবতারণার চেষ্টা আমাদিগের সহ্য হয় না। কবির পথ ধরিয়া নীরবে শিষ্য যেমন গুরুকে অনুসরণ করে সেইরূপ আমরা নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া নূতন সত্য, নূতন সৌন্দর্য্য, নূতন ভাব কবির মুখের দিকে চাহিয়া শিখিতে দেখিতে ভাবিতে পারি না। প্রেম ভক্তিময় ধর্ম্ম যখন বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল তখন বাঙ্গালী কবি ছিল, কবিতা লিখিতে পড়িতে গাহিতে জানিত। আলস্য কিংবা হেলায় কবিতা বোঝা যায় না।

সুপ্রভাতে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে কণ্বের শিষ্য যেমন সূর্য্য চন্দ্রের যুগপৎ উদয় অবসান দেখিয়া আত্ম দশান্তরের কথা ভাবিয়াছিলেন? পবিত্র আশ্রম পদে থাকিয়াও সহজ ভাবে সরল ঋষিকুমার যে কথা কয়টি বলিয়াছিলেন, স্বতই সকলেরই মনে সেই কথা কয়টি উদয় হয়—কিন্তু তাহার জন্য সুপ্রভাত আবশ্যক, কুমুদ্বতীর সংস্মরণীয় শোভার সহিত আকাশের পাণ্ডুর কেমন মিশিয়াছে তাহা দেখা আবশ্যক। তেমনি Shelley এবং Wordsworth এর Skylark দেখিতে হইলে তোমার বাহিরে আইসা আবশ্যক, তোমাকে অন্তঃপুর ছাড়িতে হইবে। তুমি ত তাহা চাহ না, তুমি চাহ যে স্বভাব তোমার জন্য কাগজের মলাটে বদ্ধ হইয়া দপ্তরি মুটের হাতে নাজেহাল হইয়া শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তোমার সেবা করিবে।

Wordsworth এর কবিতা বুঝিতে হইলে নীলাকাশের নীচে, পাহাড়ের গায়ে, ছায়ায় লীন হইয়া বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে প্রত্যেক শস্যকণা কখন বায়ুর ক্রীড়ার সামগ্রী, কখন বায়ু তাড়িত, কখন রৌদ্রতাপে মৃতপ্রায়, কখন শিশিরসিক্ত অশ্রুময় এই সব দেখিয়া কবি কি ভাবিতেছেন তাহাই আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। Shelleyর কবিতা বুঝিতে হইলে ঐ সব দেখিতে দেখিতে যখন প্রত্যক্ষ শস্যক্ষেত্র সূর্য্য চন্দ্র পাহাড় পর্ব্বত জলস্থল সবই যেন মুছিয়া যাইবে, আবার সেই সব একটি কাল্পনিক জগতে পরিণত হইবে—যেখানে প্রত্যেক তৃণ কণার আশা আকাশব্যাপী, যেখানে শিশিরের হৃদয় কাঁপে, যেখানে পাথরের প্রত্যেক কণার মধ্যে বিশ্বের শক্তি নিহিত আছে, যখন তুমি নিজে এ জীবন হারাইয়া সেই অপূর্ব্ব জগতের জীবন লাভ করিবে তখন Shelley অনেকটা বোঝা সম্ভব। তাঁহার সহিত ধ্যান ও যোগাভ্যাস করিতে হইবে। কিন্তু Wordsworth তাঁহার হৃদয়ের সহিত তোমার হৃদয় গাঁথিয়া দিতে বলিবেন; তাঁহার চক্ষে তোমাকে জগৎ দেখাইবেন, তোমার হৃদয়ের বাঁধন গুলি টানিয়া বাঁধিয়া দিবেন আর কেমন শিষ্যভাবে তোমাকে পাশে লইয়া (১) শিশু-গুরুটির

(১) "The child is father of the Man"

কাছে কত কথা শুনিবেন আর তাহার পরমুহূর্ত্তেই তোমাকে একটি ফুল তুলিয়া দিয়া বলিবেন—(২) এই দীন ফুলটিতে কত চিন্তা নিহিত আছে—সে চিন্তা এত গভীর যে হৃদয়ের অশ্রু দিয়াও তাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না।

এই দেখ Skylark কবিতার নাম করণেও কতকটা দুই জনার বিভিন্নতা প্রকাশ পাইতেছে। Shelley বলিলেন "To *a* Skylark"—একটি বিশেষ কোন skylark এর গান শুনিতে শুনিতে তাহার অস্তিত্ব যেন ভুলিয়া গেলেন—যে কোন skylark হউক না কেন সে একরূপই গাইবে—তাহার কোন অস্তিত্ব বিশেষ নাই। "Wordsworth" কিন্তু বলিলেন To *the* skylark যেন সেই **skylark** ছাড়া তাহার আর কিছুই মনে হইল না—একটি বিশেষ পাখীর বিশেষ গান ভিন্ন তিনি আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না—শুনিতে যেন চাহিলেন না। Shelley কল্পনাকে আবদ্ধ করিলেন না—তাহাকে আকাশে ছাড়িয়া দিলেন। Wordsworth তাহা পারিলেন না—কল্পনাকে Skylark এর সহিত বাঁধিয়া দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথা "*a*" এবং "*the*" লইয়া এত মারপেচ কখনও বোধ হয় কবির মনে হয় নাই। তাহাই ত তাহার কবিত্ব। দুই জন কবি একটি পাখী দেখিয়া কেমন না ভাবিয়া না চিন্তিয়া স্বতঃ কেমন একটু স্বতন্ত্র করিয়া লইলেন।

A এবং the লইয়া যাহা বলিলাম এই দুইটি কবিতায় প্রত্যেক ছত্রে তাহার প্রমাণ আছে। Shelley বলিলেন তুমি অদৃশ্য অস্পর্শ শক্তি (spirit) তুমি কোন কালেই পাখী ছিলেনা—"Bird thou never wert"—তুমি কি আমরা তাহা জানিনা—"what thou art we know not"—জ্বলন্ত মেঘের মত নীলাকাশে তুমি উড়িতেছ—Like a cloud of fire—অশরীরী আনন্দের আকাশময়ী মূর্ত্তি তুমি—Unbodied joy&c—পূর্ণালোক গগনের তারার মত অদৃশ্য তুমি—Like a star &c :—Wordsworth এর এসব কিছুই মনে হইল না—তিনি বলিলেন তুমি মূর্ত্তিমান জ্ঞান—Type of the wise—তুমি শুধু জ্ঞান নহ, তুমি এমন জ্ঞান যে আমরা তাহা ধরিয়া ছুইয়া পাই হৃদয়ে পুষিতে পারি, তুমি আমাদিগের জগতেরই, এ জীবনে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তুমি সেই জ্ঞানের মূর্ত্তি। Wordsworth প্রথম ছত্রেই বলিলেন তুমি "pilgrim of the sky" তুমি যাত্রী, আকাশ তোমার তীর্থ স্থান, তোমার আশা যে সেই তীর্থে তুমি পঁহুছাও—কিন্তু Shelley ভুলিয়া গেলেন জগতের সহিত তাহার কোন সংস্রব আছে কি না। তুমি স্বর্গের? না তুমি স্বর্গ বলিয়া কোন বিশেষ স্থানেরও নহ, তুমি স্বর্গের নিকট কোন স্থান হইতে হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছ।

"From heaven or near it
Pourest thy full heart"

---

(২) "To me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears."

আকাশ তোমার তীর্থ স্থান নহে, তোমার পক্ষে তীর্থ স্থানই নাই।

Wordsworth তীর্থের কথা বলিয়া পাখীটিকে অমনি পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিলেন, বলিলেন তোমার নীড় পৃথিবীতেই, কিন্তু অমনি তাঁহার মনে হইল তুমি যে আকাশে যাইতে চাও, আকাশে গিয়া গান গাও, তুমি কি আমাদিগের পৃথিবীকে, এই শোক তাপ পূর্ণ সংসারকে ঘৃণা কর—

Dost thou despise the earth
Where cares abound"—

না নিশ্চয়ই না, তুমি জ্ঞানের মূর্ত্তি স্বরূপ। পাখা মেলিয়া আকাশে যাইতে তুমি প্রয়াসী কিন্তু তোমার প্রাণ, তোমার চক্ষু তোমার পৃথিবীস্থ শিশিরসিক্ত, অশ্রুময় নীড়টির দিকে নাই কি ?

"Or while the wings aspire are heart and eye
Both with thy nest upon the dewy ground ?"

Shelley তাঁহার Skylarkকে এরূপ কোন প্রশ্নই করিলেন না—একেবারে বলিলেন, যাহাতে পৃথিবীর ধূলা আছে, পৃথিবীর কলঙ্ক আছে তাহা তুমি ঘৃণা কর—

Thou scorner of the ground

"প্রয়াস" "আকাঙ্খা" কথা দিয়া Wordsworth এর aspire কথাটির ভাব বোঝান শক্ত। "Aspire" কথাটিতে নিশ্বাসের ভাব আছে বুক খালি করিয়া নিশ্বাস ফেলার ভাব আছে ; যেন হৃদয়ের আবেগ শরীরকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, যেমন সমুদ্রের ঢেউ বাতাসে ঠেলিয়া যায়,—তেমনি ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এতদূর বলবতী যে নিজকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না—যাইতেই হইবে কিন্তু যাওয়া যায় কি করিয়া—আমরা যে আকর্ষণ আবদ্ধ—ঘর বাড়ির মায়া ছাড়িব কি করিয়া। কিন্তু Shelleyর যদি ঐ ধরনের একটি কথা বলিতে হইত তিনি "Inspire" কথাটি ব্যবহার করিতেন। আপনারই যে শক্তি আছে সেই শক্তি ভর করিয়া আকাশে সে বিচরণ করিতেছে—সে আকৃষ্ট, মোটেই আবদ্ধ নহে—সে শুধু ভাসিয়া বেড়ায়—

কেহ তোমাকে গান গাইতে বলে নাই তুমি আপন মনে গাহিতেছ—সে ত গান নহে বন্দনা Singing hymns unbidden—সে বন্দনা আবার স্বতই ছন্দময়ী "Streams of unpremeditated art"

তোমার স্বভাবই এই, তোমার কিছু শিখিতে হয় না, তোমাকে তুমি ভিন্ন আর কিছু লইয়া বেড়ায় না—তুমি নিজেই ইচ্ছা, নিজেই আকাঙ্ক্ষা। দুই জনের কিছু কি ভিন্নতা দেখিতে পাইতেছ ?

Wordsworth বলিলেন তুমি গান থামাইয়া, পাখা গুটাইয়া আবার সেই নীড়টি তেই ফিরিয়া আইস। এ কথা কটিতে ক্লান্তির ভাব আছে কি ?—কিন্তু Shelleyর

skylark ক্লান্তি কাহাকে বলে জানে না—তাহার জীবনের খেলা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

Whose race is just begun—অনন্তকালের সে, তাহার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তই নূতন—যাহার অন্ত নাই তাহার প্রত্যেক পলকেই আদি বলিতে পার। সে তৃপ্তি কাহাকে বলে তাহা জানে না—"Never know Satiety"—সে গান গাহিতে গাহিতে থামিয়া চায় না। সে যেখানে সেই খানেই সঙ্গীত ধারা বর্ষার জলের মত—রামধনুর আলোক মাখা জলবিন্দু দিয়া আকাশ পৃথিবী ভাসাইয়া দেয় "From rainbow clouds"—সে অদৃশ্যভাবে আলোক চারিদিকে ছড়ায় "Scattering unbeholden its aerial hue"—

Wordsworth তাহাকে আকাশে দেখিয়া বলিলেন—তুমি দৃষ্টির সীমা পর্য্যন্ত ওঠ,—(যদি পার) সে সীমা ছাড়াইয়াও ওঠ—দুঃসাহসী গায়ক তুমি—.

"To the last point of vision and beyond
Mount, daring warbler!"—

কিন্তু Shelley বলিলেন তুমি পৃথিবী ছাড়িয়া উচ্চ হইতে আরও উচ্চে ওঠ—"higher still and higher"—সে যে দুঃসাহসী এ ভাব কবির মনে হইল না—Shelleyইর চক্ষে, আকাশ, আলোক, স্বর লহরী একই পদার্থের ভিন্ন মূর্ত্তি—তুমি ত তোমাতেই লীন হইয়া যাইবে—আমরা তোমাকে দেখিতে পাইব না—Thou art unseen—

শুদ্ধ কাণে শুনিব মাত্র—এবং মনে বুঝিব তুমি ঐ কোথায় মাথার উপর আছ—রজত তারার রশ্মি উষার পাণ্ডুরে যেমন মিশিয়া যায়—সেই তীব্র আলোক যেমন অমল শ্বেত প্রভাতে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া শেষে মিশিয়া যায়—আমরা আর সেই তারা দেখিতে পাই না, তবুও জানি তারাটি সেই খানেই আছ—তেমনই ভাবে তুমি মিশিয়া যাও।

"—That silver sphere
... ...
... ... we feel it is there."

Wordsworth তাহার গান শুনিয়া বলিলেন—তোমার এ গান প্রণয় স্নেহ প্রণোদিত (Love prompted strain) তুমি এবং তোমার যে কেহ আছে এ গানে চিরকালের জন্য তোমরা সেই প্রেমে বাঁধা—

"Twixt thee and thine a never failing bond"—

এ কথাটি জনান্তিকে যেন বলিলেন তবু বলিতে হইল যে বিস্তৃত ক্ষেত্র হৃদয়ও তাহার নিজের হৃদয়ের মত সমভাবেই কাঁপিয়া ওঠে। কিন্তু Shelley বলিলেন—

কি দেখিয়াছ তুমি, এমন কোথা কি আছে যাহা তোমার এ আনন্দময়ী লহরীর উৎস—সে কিরূপ শস্য ক্ষেত্র, কিরূপ সমুদ্র তরঙ্গ, কিরূপ পর্ব্বত, সে আকাশ কেমন—

তোমার যে এ প্রণয়, সে কি জাতীয় প্রণয়—তুমি ক্লেশ কি তাহা জান না বটে, কিন্তু কিরূপ ভাবে জান না ?

"What objects are the fountains
... ...
What love of thine own kind,
What ignorance of pain ?"

একজন বলিলেন তোমার ঐ গান প্রেম হইতে শিক্ষা—তোমার যে কেহ আছে তাহারই প্রণয়ে তুমি মজিয়া আছ—সে গানে পৃথিবীর হৃদয় কাঁপিয়া ওঠে মাত্র—যেমন পূর্ব্বস্মৃতি কিছু মনে উদয় হইলে হৃদয় কাঁপিয়া ওঠে—যাহা একবার শুনিয়াছি তাহা আবার শুনিলে বুক যেমন কাঁপিয়া ওঠে, সেইরূপ। আর একজন বলিলেন—"জগৎ পূর্ব্বে যে আশার কথা, যে ভয়ের কথা কখন শুনে নাই, শুনিলেও বুঝিতে পারে নাই—সেই আশা সেই ভয় ময় হইয়া উঠিল—

"Till the world is wrought
With hopes and fears it heeded not—

একজনের দুঃসাহসের কথা বলিতে বলিতে মনে হইতেছে—তুমি যে পল্লবিত বসন্তের অধীন নহ—all independent of the leafy spring—স্বাধীনভাবে যখন তখন গাইতে পার—এ সব যে তোমার আছে তাহা অহঙ্কারের কথা—Proud privilege:—আর একজনের মনে সে ভাবের সম্পূর্ণ অভাব—তোমার এই স্বভাব, তুমি আবার কাহার নিকট হইতে অধিকার পাইবে ? অনন্ত আকাশের গায়ে তুমি কত ভাবে থাক—সূর্য্য যেখানে ডুবিয়া গেছে সেখানকার সোনার বিদ্যুৎলহরী-মধ্যে লীন থাক তুমি—আকাশের তারা তুমি, কল্পনার আলোকে পরিবৃত লুকান কবির মত, সায়াহ্নে প্রণয়ীর আত্মার মত, শিশির সিক্ত কুঞ্জের মধ্যে খদ্যোতের মত তুমি। Wordsworth ও বলিয়াছেন জ্যোতির্ম্ময়ী বিজনতার মধ্যে-a privacy of glorious light is thine-লুকাইয়া এ বিশ্বকে harmony (সাম্যসৌন্দর্য্য)দিয়া প্লাবিত করিয়া দেও—সে harmonyতে অধিকতর স্বর্গীয়তা আছে, তাহা পুণ্যতর ভাবে পূর্ণ। কিন্তু Shelleyতে harmony ইর কথা নাই—সে আপন মনে একা গাহিতেছে, অন্য কাহারও তানের সহিত তাহার তান মিশায় না, কবি একামাত্র সেই তীব্র আনন্দ লহরী শ্রবণ করিতেছেন

"—but yet I hear thy shrill delight"—

সে ত স্বর্গীয় আনন্দ প্লাবন

"—a flood of rapture divine"

বিবাহের আনন্দ গীতিতে, জয় সংগীতে কি যেন কিসের অভাব থাকিয়া যায়—তোমার গানের তুলনায় সবই মিথ্যা শব্দ মাত্র।

. শেষে কবি বলিলেন—যে আনন্দ তোমার তাহার অর্দ্ধেক আমাকে শেখাও, আমার কণ্ঠ হইতে এমন মাদকতাময় harmony বাহির হইবে যে আজ আমি যেমন তোমায় শুনিতেছি জগৎ তেমনি ভাবে আমাকে শুনিবে।

"Wordsworth এর skylark জ্ঞানের মূর্ত্তি"—সে কখনও পথ হারায় না, পথ ছাড়িয়া অন্য কোথাও সে যায় না, আকাশের দিকে মাত্র উঠিতে থাকে—

"Type of the wise, who soar but never roam."

Shelley ইর skylark সন্ধ্যাকাশের কোন খানে কোন ভাবে থাকে তাহা কবি পর্য্যন্ত জানেন না ও জানিতেও চাহেন না। তাহার জ্ঞান সম্বন্ধে কবি এই বলিতেছেনঃ—কি জাগ্রতে কি নিদ্রায় তুমি মৃত্যু বিষয়ে, আমরা স্বপ্নে যাহা ভাবি, তাহা অপেক্ষা গভীর-তর এবং পূর্ণতর সত্যময় কথা ভাব—তাহা না হইলে কেমন করিয়া তোমার কণ্ঠ হইতে এমন স্বচ্ছ সঙ্গীত ধারা বহে।

"Waking or asleep"

... ...

তুমি পৃথিবীর হইয়াও অপার্থিব ও তুমি শরীরী হইয়াও অশরীরী আনন্দ স্বরূপ, তুমি পঞ্চভূতের মূর্ত্তিভেদ মাত্র, আকাশেই তোমাকে দেখি—তুমি শ্রুতি বিষয় গুণ সম্পন্ন আকাশ ব্যাপিয়া আছ। পুরাতন ঋষিদিগের আহ্নিক তত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই যেন Shelley বিবিধ মূর্ত্তিতে একই তেজের উদ্বোধন করিতেছেন—ক্ষুদ্র পাখী, গগনব্যাপী আলোক, বিশ্বব্যাপী শব্দপূর্ণ আকাশ সবই এক হইয়া গেল তাহাতে পূর্ব্ব পশ্চিম নাই, উত্তর দক্ষিণ নাই, অনন্ত তেজ রূপান্তরে অনন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। কিন্তু Wordsworth এর মনে আমরা পৃথিবীর জীবমাত্র, তবে আমাদিগের কপালেও স্বর্গ আছে; তিনি বলিলেন যে আবাস ভূমি এবং স্বর্গ ও উর্দ্ধ অধঃ মাত্র দুইটি ভিন্ন গুণ সম্পন্ন হইয়াও সংলগ্ন, Skylark তুমি জ্ঞানের আদর্শ স্বরূপ এই বিস্তৃত আকাশে থাকিয়াও এই দুই বিন্দুর মধ্যে প্রসারিত যে রেখা সে রেখাচ্যুত কখন হওনা—

—"true to the kinderd point of heaven and home"

ইহা একটি গভীর উপদেশ, জীবনের বিজ্ঞান ইহার প্রত্যেক অক্ষরে। যে যেখান-কার জীব সেখানেই তাহার জীবন, তাহার ভালবাসা, সেখানের জন্যই তাহার হৃদয়ের গান, তাহার চক্ষের জল;—মন উচ্চ আকাশের দিকে চাহিতে পারে কিন্তু প্রাণ পৃথিবীতেই মিশিয়া থাকিতে চাহে, ঘুরিয়া ফিরিয়া পৃথিবীতেই আসিয়া পড়ে। যে উপরের দিকে মন রাখিয়া সরল রেখা অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে সেইত জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ তাহারই জ্ঞানের কথা প্রাতঃরশ্মি বিভাষিত আকাশে শুনিতে পাই, শুনিয়া কত শিখি।

Shelleyর কাছে আমরা নশ্বর বলিয়া যাহা অমর, যাহা চিরকাল ছিল এবং চিরকালই থাকিবে তাহা না জানিতে পারিলেও অধিকতর সত্য,

"Forms more real than living man
Nurslings of immortality."

যাহা আজ আছে কাল নাই তাহা আবার সত্য কোথা? কিন্তু যাহা চিরদিন খুজিয়া পাইব, আলোকে, আকাশে, তেজে, শব্দে যাহা চিরদিনই থাকিবে তাহাই পূর্ণ সত্যময়। এ ভাব যে Wordsworth এর কখন মনে হয় নাই তাহা নহে, তবে তাহা কষ্টে খুজিয়া পাওয়া যায়। তিনিও যেন কষ্টে খুজিয়া পান—

জীবনবৎ তুমি, বাতাসের মত তুমি অদৃশ্যভাবে সব ব্যাপিয়া আছ—আনন্দ অকাতরে চারিদিকে ছড়াইতেছ। এতই সুখী তুমি, দেবতা তোমার উপর এতই প্রসন্ন,—যে অন্যের সহিত সে সুখ মিশাইয়া তাহা বাড়াইবার আবশ্যক বোধ কর না—নিজেই নিজের আনন্দ স্বরূপ

"A life a presence in the air

...　　...　　...　　...

The Linnet Wordsworth

কিন্তু কবি Linnet কে শুধু তাহা বলিয়াই ছাড়িয়া দিলেন না। তাহাকে গাছের পাতার ভিতর পাকাড়াও করিয়া বলিয়াদিলেন তুমি জগৎকে ফাকি দিবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবে কোথা

"The voiceless form you chose to feign
While fluttering in the bushes"

কোকিলের স্বর শুনিয়া তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন—তুমি অদৃশ্য বটে কিন্তু তোমার কুজরব যুগপৎ দূরে নিকটে যেন—At once far off and near

Skylark কে true to the kinderd points of heaven and home যাহা বলিয়াছেন তাহা ঐ এক কথা নহে কি?

Wordsworth এর skylark প্রভাতের পাখী Shelley ইর সন্ধ্যার—কেন বল দেখি? জ্ঞান আলোক ভালবাসে, নূতন দেখিব নূতন শিখিব, আঁধার ছাড়াইয়া আসিব, সদাই তাহার এই চেষ্টা। কিন্তু যাহা দেখিয়াছি, যাহা জানি, যাহা দেখি নাই জানি নাই, যাহা বোধ হয় দেখিব না, যাহা জানিব না এই উভয়ে কেমন ভাবে মিশাইয়া যায়, আলোক আঁধারে কেমন সুন্দর ভাবে মিশিয়া একটি নূতন জগৎ করিয়া তুলে, পৃথিবীকে ছায়াময় করিয়া দেয় এই ভৌতিক চিন্তা আত্মার। Shelley আত্মাময়, Wordsworth হৃদয়ময়।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

খুকুরাণী।

না ডাকিতে আসে ছুটে, হেসে এসে বসে কোলে,
সোহাগে জড়ায়ে গলা, মনের হরষে দোলে ॥
মুখ পরে মুখ রেখে, আধো আধো কথা ক'য়ে,
মাথার কাপড় খোলে, খেলা করে চুল লয়ে।
সজল দেখিলে আঁখি, মুখানি শুকায়ে যায়,
বুকেতে রাখিয়ে মাথা, নিশ্বাস ফেলিয়ে চায়।
আঁখিতে মিলায়ে আঁখি চেয়ে যেন মন বোঝে,
কি জানি কি ভেবে শেষে কেঁদে কোলে মুখ গোঁজে ॥
ফুলে ফুলে কেঁদে কেঁদে—নাম ধরে ডেকে ডেকে—
চকিতে ঘুমিয়ে পড়ে কচি মুখে মায়া মেখে।
খেলাতে খেলাতে ছুটে ছুটে এসে দেখে যায়,
চুমি দিয়ে চুমি নিয়ে আবার খেলিতে ধায়।
এই হাসে এই কাঁদে রোদ বৃষ্টি বারে বার
পরাণ জুড়াতে আছে খুকু বিনে কেবা আর।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ॥

মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীমকোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গত বৎসরে আমরা ভারতীর পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায়—বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় হিন্দুকুল-তিলক, মহারাজা নন্দকুমারের শোচনীয় পরিণামের চিত্র, ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য পাঠকদিগের সমক্ষে ধরিয়াছি। বর্ত্তমান প্রস্তাবে—নন্দকুমারের জীবনের সাধারণ বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিংসের চক্রান্তে ও হেষ্টিংসের প্রিয় সুহৃৎ (তৎকালীন ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি) স্যর ইলাইজা ইম্পির সহায়তায় জটিল ব্রিটিশ-আইনের ঘোরতর আবর্ত্তে পড়িয়া তিনি যে অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন, সে বিষয়ে তাঁহার নির্দ্দোষীতা যথাসাধ্য পরিস্ফুট করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

যদি কখনও, ভারতের ইংরেজাধিকারের ইতিহাস হইতে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নাম উঠাইয়া দিয়া ইতিহাস লেখা সম্ভব ও প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হয়—তবে সেই ইতিহাসে মহারাজা নন্দকুমারের নাম না থাকিলেও ততটা আপত্তি হইবেক না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে হেষ্টিংসকে বাদ দিয়া ভারতের ইংরেজাধিকারের ইতিহাস কখনই লিখিত হইতে পারে না—সুতরাং তাহা হইতে নন্দকুমারের নাম বিচ্ছিন্ন করা সাতিশয় অসম্ভব। বিভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া বাঙ্গালার প্রশস্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নন্দকুমার ও হেষ্টিংসের বহুবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—আরও হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু নন্দকুমারের জীবনদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হওয়াতে ইহজন্মের মত তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ ঘুচিয়া গেল! উভয়েরই উদ্দেশ্য বিভিন্নমুখী ও উভয়েই প্রায় সমক্ষমতাপন্ন ছিলেন; রাজস্ব বন্দোবস্তে, প্রজার হিত জন্য বিধি সংগঠনার্থে, রাজ্য মধ্যে আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যের শান্তি ও সুশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিতে ও রাজনৈতিক কূটতর্কের ভিতর প্রবেশ করিতে উভয়েই উভয়ের সমকক্ষ ছিলেন;—বরঞ্চ কয়েকটী বিষয়ে মহারাজা নন্দকুমারের হেষ্টিংসের অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতা ছিল—একজনের উদ্দেশ্য প্রজার দুঃখ নিবারণ ও রাজ্য মধ্যে উচ্চপদ লাভ করিয়া স্বজাতির—দরিদ্র বাঙ্গালীর প্রতি তৎকালীন দানব ইংরাজের অবিশ্রান্ত অত্যাচারের নিরাকরণ—ও অপর ব্যক্তির ইচ্ছা ভারতীয় প্রজাশোষণ করিয়া স্বজাতির ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধন ও স্বদেশস্থ নিয়োগ কর্ত্তাদিগের (Directors) প্রবল অর্থ তৃষ্ণা নিবারণ। এই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে—এই বিভিন্ন স্বার্থে—পরিচালিত হইয়া উভয়েরই অনেকবার রাজনৈতিক সমরক্ষেত্রে দেখা হইয়াছিল। ন্যায় যুদ্ধ হইলে মহারাজা নন্দকুমার নিশ্চয়ই জয়শ্রী লাভ করিতেন কিন্তু দশচক্রে জড়িত হইয়া দৈববিপাকে তিনি অকালে নিহত হইলেন। বস্তুত হেষ্টিংসের ও নন্দকুমারের রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলী এত দৃঢ় সংবদ্ধ ও দৃঢ়-সংশ্লিষ্ট যে তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা অতিশয় অসম্ভব। কোন সুবৃহৎ যজ্ঞ ব্যাপারের নাটকাভিনয়ে নায়কাংশ পরিত্যাগ করিয়া কোন কথা বলিলে তাহা যেমন দুর্ব্বোধ্য ও অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ নন্দকুমারের বিষয় বলিতে গিয়া হেষ্টিংসের বিষয় না বলিলে তাহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া উঠে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ইংরাজ রাজত্বের প্রথম বিকাশ সময়ে সুপ্রীম কোর্ট-রূপ-মহাযজ্ঞস্থলে-যে মহাযজ্ঞ স্বয়ং হেষ্টিংসের নামে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তৎকালীন ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি স্যারইলাইজা ইম্পি যাহাতে হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন, বৈরনির্য্যাতন যে যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য, বন্ধুত্ব স্নেহই যাহাতে হোতার প্রধান দক্ষিণা, মোহনপ্রসাদ, জগৎচাঁদ বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণকান্ত নন্দী, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে মহাযজ্ঞের প্রধান আয়োজনকারী—এ প্রকার স্থলে—যজ্ঞের মূলকারণ হেষ্টিংসের সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া প্রবন্ধ লিখিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা

মাত্র। সুতরাং এই প্রবন্ধে হেষ্টিংসের সহিত নন্দকুমারের প্রথম সংস্রব হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণিত হইবে।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৫০ খৃঃঅব্দে কোম্পানীর অধীনে চাকরী স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষে আইসেন। ও ১৭৬৪ খৃঃঅব্দে চৌদ্দ বৎসর কোম্পানীর অধীনে চাকরি করিয়া বিলাতে প্রত্যাগমন করেন। চারি বৎসর ইংলণ্ডবাসের পর তিনি পুনরায় ১৭৭১ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজের মন্ত্রী সভার দ্বিতীয় সভ্যরূপে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বার ভারতে প্রত্যাগমনকালীন, লর্ড ক্লাইব হেষ্টিংসের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই সময়ে ক্লাইবের সহায়তা না পাইলে দ্বিতীয়বার কোম্পানীর চাকরী করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিত না। হেষ্টিংসের মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে তিনি একেবারেই বিলাত হইতে কলিকাতার প্রেসিডেণ্ট বা গবর্ণর রূপে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। নানা কারণে ও নানা প্রতিবন্ধকে সে আশা সুসিদ্ধ হয় নাই—মান্দ্রাজ কাউন্সিলে সভ্যপদনিবিষ্ট হইয়া হেষ্টিংস বড় একটা নাম কিনিতে পারেন নাই। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে শেষভাগে তিনি বঙ্গদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হন পরে ১৭৭২ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে কলিকাতায় আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে ১৭৭৩ খৃ অব্দে বিলাত হইতে লর্ড নর্থ-প্রমুখ মন্ত্রীসম্প্রদায়ের যত্নে "নিয়ামক বিধি" (Regulating act) গুলি বিধিবদ্ধ হইলে হেষ্টিংস উক্ত আইনের সত্বানুসারে ভারতীয় ব্রিটিশ-অধিকার সমূহের প্রধান শাসনকর্ত্তা বা গবর্ণর জেনারেল বলিয়া অভিহিত হন। Regulating Act বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আসিয়া হেষ্টিংস দুইটী প্রধান কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রথমটী—নায়েব-সুবাদার মহম্মদরেজাখাঁর ও রাজা সেতাব রায়ের বিচার। দ্বিতীয়টী রোহিল্লাদিগের সহিত অকারণ যুদ্ধ। দ্বিতীয়টীর সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক থাকিলেও তাহা এ প্রবন্ধের অন্তর্ভূত নহে। প্রথমটীর বিষয়ে আমাদের দুই চারিটী কথা বলিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

বাঙ্গালার "ডবল গবর্ণমেণ্ট" লইয়া তখন ভারতে ও বিলাতে ডাইরেক্টরদের মধ্যে বড় তুমুলকাণ্ড চলিতেছিল। হেষ্টিংস এই ডবল গবর্ণমেণ্টের উপর ভারি চটা ছিলেন,সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া তিনি Double Government লোপ করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন—এই সময়ে এক নূতন ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যের পথ সরল করিয়া দিল।

বাঙ্গালার প্রজাবৃন্দ এই সময়ে অতিশয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল "ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে"র ক্লেশ এখনও তাহারা ভোগ করিতেছিল। * তাহার উপর আবার কোম্পানীর

* যাঁহারা ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠ করিতে চান তাঁহারা একবার Dr Hunterএর Annals of Rural Bengal বা বঙ্কিম বাবুর 'আনন্দমঠ' পাঠ করিবেন। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আমরা এ বিষয়ে কোনকথা বলিলাম না।

কর্ম্মচারীদের অযথা অত্যাচারে, নিরীহ-কষ্ট-সহিষ্ণু প্রজাকুল আরও ক্লেশজর্জ্জরিত হইতেছিল। রেজা খাঁ সাহেবই তখন প্রকৃত শাসন কর্ত্তা, নবাব ক্রীড়া পুত্তলি মাত্র;—সুতরাং প্রতিদিনই নূতন প্রকারের অত্যাচারের সূচনা হইতে লাগিল। বস্তুতঃ এই সময়ে আর্ত্ত প্রজাকুলের চীৎকারে হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেরই মনে গভীরতর যাতনা উপস্থিত হইত—কিন্তু কে তাহার প্রতীকার করে?

প্রজাবৎসল, উন্নতমনা, মহারাজা নন্দকুমার প্রজাকুলের এই শোচনীয় অবস্থা ও কোম্পানীর রাজ্যের এই অরাজকতার কাহিনী ডাইরেক্টরদিগের কর্ণগোচর করিবার জন্য নিজ ব্যয়ে বিলাতে একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। ডাইরেক্টর-সভা প্রভৃত প্রমাণ পাইয়া ও প্রজাবৃন্দের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া মহম্মদ রেজাখাঁকে পদচ্যুত করিতে ও প্রমাণানুসন্ধান দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের বিচার করিতে হেষ্টিংসকে আদেশ প্রদান করেন। ডাইরেকটরদিগের আদেশ হেষ্টিংসের হস্তগত হইবামাত্রই মহম্মদ রেজাখাঁ ও রাজা সেতাবরায় বন্দী স্বরূপে কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। সেই দিন হইতেই ডবল গবর্ণমেণ্টের মূলে কুঠারাঘাত হইল।

মহম্মদ রেজাখাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ লইয়া কলিকাতায় খুব হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কাল যিনি প্রকারান্তরে বাঙ্গলার নবাব ছিলেন কাল যাঁহার নাম শুনিয়া সকলে থর-হরি কাঁপিয়াছিল, আজ তাঁহাকে ইংরেজের ক্ষমতাভুক্ত দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। হেষ্টিংস রেজাখাঁকে, প্রহরীবেষ্টিত করিয়া সুরক্ষিত করিলেন। এতদিন মহম্মদ রেজাখাঁর ভয়ে ও তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে, কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই—কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অত্যাচারের ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া সম্ভব বিবেচনা করিয়া চারিদিক হইতেই রাশি রাশি অভিযোগ আসিতে লাগিল—হেষ্টিংস রেজাখাঁর অপরাধের বিচার করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন।

মহম্মদ রেজাখাঁর কুটীল কৌশল জালের ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে হেষ্টিংসের একক চেষ্টা যে কোনও কার্য্যকারী হইবে না—তাহা ডাই-রেকটরেরা সম্পূর্ণই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং যে পত্রে তাঁহারা রেজাখাঁকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন—সেই পত্রে হেষ্টিংসকে এই প্রকার উপদেশও দিয়াছিলেন—যে মহম্মদ রেজাখাঁর দোষোদ্ঘাটন ও তাঁহার অপরাধের সম্যক বিচার করণার্থে যদি দেওয়ান নন্দকুমারের সাহায্য আবশ্যক হয় তাহা হইলে তাহাও তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। বস্তুতঃ হেষ্টিংস পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে নন্দকুমারের সাহায্য এই বিষয়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবে। সুতরাং তিনি নন্দকুমারের অভিজ্ঞতার সহায়তা লাভের জন্য তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন।

মহম্মদ রেজাখাঁর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইটাই সর্ব্ব প্রধান—ও বহুল প্রমাণ সাপেক্ষ। প্রথমটী এই—যে মহা দুর্ভিক্ষের সময়

(ছিয়াত্তরে মন্বন্তর) মহম্মদ রেজাখাঁ বাজারের সমস্ত চাউল খরিদ করিয়া একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন ও সেই ভীষণ সময়ে তাহা উচ্চদরে বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন—দ্বিতীয়টী এই যে তিনি সাধারণ তহবিলের অনেক টাকা অকারণে অপচয় ও আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই দুইটী অপরাধের মধ্যে প্রথমটীরই গুরুত্ব আমাদের নিকট অধিক বলিয়া বোধ হয়। এই দুইটী দোষের প্রমাণের জন্য নন্দকুমারের অভিজ্ঞতার সহায়তা নিতান্ত আবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছিল—সুতরাং হেষ্টিংস মহারাজা নন্দকুমারকে তাঁহার সহায়তার জন্য সাদরে আহ্বান করিলেন।*

এইবার লইয়া দ্বিতীয়বার প্রশস্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হেংষ্টিংস ও নন্দকুমারের সাক্ষাৎ হইল। এবারে দুজনে মিত্রভাবে এক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের প্রথমবারের সাক্ষাৎ ততদূর আবশ্যকীয় নহে—সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন কথা বলিয়া প্রস্তাব বাড়াইবার আবশ্যকতা নাই। মহম্মদ রেজাখাঁর বিচারের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে নন্দকুমারের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক।

নন্দকুমারের জীবনের প্রথমাবস্থার বিবরণ সংগ্রহ করা অতিশয় দুর্ঘট। সেই অন্ধকারময় সময়ের কোন ঘটনাই অপক্ষপাতিতার সহিত বিধিবদ্ধ হয় নাই—সুতরাং তাহার অধিকাংশই আমাদের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সুতরাং বাদ সাদ্ দিয়া যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে; তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

মহারাজা নন্দকুমার আমিন পদ্মনাভ রায়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নিবাস বীরভূম জেলায় ছিল। বীরভূমই মহারাজা নন্দকুমারের জন্মভূমি। পদ্মনাভ রায় তিনটী প্রধান প্রধান পরগণার আমিন ছিলেন—সেই তিনটী পরগণা হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা আদায় হইত। বাল্যকালে মহারাজা নন্দকুমার পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বাভাবিক প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন—পদ্মনাভ রায় অনেক কার্য্যে নন্দকুমারের সাহায্য পাইতেন—সুতরাং তিনি নন্দকুমারকে কার্য্যক্ষম বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিজ অধীনে একটী নায়েবের কার্য্য প্রদান করিলেন। এই সময় হইতেই বহির্জগতে নন্দকুমারের প্রতিভা বিকশিত হইতে লাগিল। সকলেই তাঁহার তীক্ষ বুদ্ধির ও কার্য্যকুশলতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কার্য্যপটুতা লাভ করিয়া মহারাজা নন্দকুমার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর আমলে "হিজলী" ও "মহিষাদল" পরগণার আমিন রূপে নিযুক্ত

* Hastings to the Court of Directors Dated 1st Sep. 1779.

"There is no doubt that Nund Kumar is capable of affording me great service by information and advice, and it is on his abilities, and on the activity of his ambition and hatred to Reza Khan I depend for investigating his conduct."

হন। আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পরে স্বনামখ্যাত দুর্দ্দান্ত প্রতাপ নবাব সেরাজউদ্দৌলার সময়ে মহারাজা নন্দকুমার তৎকালীন হুগলীর ফৌজদার অমরখাঁর পদে নিযুক্ত হন। যখন নবাব সেরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরাজদিগকে দূরীভূত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেন—সেই সময়ে মহারাজা নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার ছিলেন।

পরে যখন পলাশীর প্রশস্ত ক্ষেত্রে বাঙ্গালার শেষ মুসলমান ভূপতি, ইংরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন—যখন বঙ্গাধীপের হস্ত হইতে স্খলিত রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া ইংরাজ—মীরজাফর আলিখাঁকে বাঙ্গলার মস্‌নদে বসাইলেন—তখন মহারাজা নন্দকুমার দেশের মধ্যে একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত লোক। এই সময়ে ক্লাইবের সহিত তাঁহার আলাপ হয়—নানা কারণে ও নানা ঘটনায় ক্লাইবের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা সম্যক পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। কিয়ৎকাল পরে ক্লাইব পাটনায় উপস্থিত হইলে—মহারাজা দুর্লভরাম নন্দকুমারকে নিজের প্রতিনিধি রূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইয়া দেন। ক্লাইবের সহিত সখ্যতাবন্ধন করিয়া স্বীয় অভীষ্টলাভই মহারাজা দুর্লভরামের উদ্দেশ্য—সুতরাং তিনি সেই কার্য্যে নন্দকুমারকে প্রেরণ করেন—বলা বাহুল্য নন্দকুমার স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চতুরতায়—ক্লাইবের সহিত পূর্ব্বের আলাপ অতিশয় সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার সকলেই জানিল যে ক্লাইব নন্দকুমারের প্রধান সুহৃদ। কাজের সময়ে মীরজাফরকে মহারাজা নন্দকুমার অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতেন বলিয়া বাঙ্গালার নবাব তাঁহার উপর বড়ই স্নেহবান ছিলেন। তিনি নন্দকুমারকে বিপদে বন্ধু—সম্পদে সুহৃৎ—রাজনৈতিক পরামর্শে, সুবুদ্ধিদাতা বলিয়া সর্ব্বদাই বিবেচনা করিয়াছেন—প্রভুভক্ত ও কর্ত্তব্য পরায়ণ নন্দকুমারও সাধ্যমতে, বাঙ্গালার নবাবকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য অনেক সময়ে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। এই প্রভুর কার্য্যে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া—ইংরাজ গবর্ণরগণ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ তাঁহার উপর মনে মনে বড়ই অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। ইংরাজের কূট কৌশল মধ্যে প্রবেশ করিয়া নবাবের সম্মান ও প্রজার ধন প্রাণ রক্ষার্থ অশেষ চেষ্টা করিতেন বলিয়া তিনি "চক্রান্তকারী" "দুষ্টবুদ্ধি" ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

মীরজাফরের আমলে উচ্চপদস্থ হিন্দুর যতদূর মানসম্ভ্রম লাভ করা সম্ভব, নন্দকুমারের অদৃষ্টে তাহার সমস্তই হইয়াছিল। মীরজাফর যখন দ্বিতীয়বার মস্‌নদে বসেন তখন, দেওয়ান নন্দকুমার দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে "মহারাজা" উপাধি ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য সম্মানও প্রাপ্ত হন। ইহার পর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নন্দকুমারের উপর এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—যে তাঁহারা হেষ্টিংসের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে "নদীয়া" ও "কৃষ্ণনগর" জেলার কর সংগ্রহের ভার দেন।

উপরে আমরা নন্দকুমারের যে অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ জীবনী প্রদান করিলাম, তাহা হইতেই বিশেষ প্রতিপন্ন হইবে—যে তিনি ধনে, মানে, বংশগৌরবে সেই সময়ে,

বঙ্গদেশে একজন সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারিরা যেখানে নন্দকুমার হইতে তাঁহার ইষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে কোন না কোন বাধা পাইয়াছেন—সেই স্থানেই তাঁহারা অযথা দোষকীর্ত্তন করিয়া নন্দকুমারের চরিত্রে কালিমা ক্ষেপণ করিয়াছেন। *

সমাবস্থা সম্পন্ন ও উচ্চপদস্থ লোকদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সাধারণ লোক নন্দকুমারকে কিরূপ ভাল বাসিত তাহা প্রমাণ করাও আয়াস সাধ্য নহে। জাল অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া যখন তিনি লালবাজারের সাধারণ কারাগারে আবদ্ধ হন, তখন যে জনস্রোত অবিশ্রান্ত ভাবে, প্রভাত না হইতে হইতেই কারাগারাভিমুখে তাঁহার দর্শনার্থে ব্যগ্র হইয়া ছুটিত ও তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই—তাহারা যে তাঁহাকে ভাল বাসিত না—একথা বাতুল ভিন্ন আর কে বিশ্বাস করিবে।

সেরিফ আলেকজান্দার ম্যাক্রেবীর পুস্তক হইতে আমরা যতটুকু উদ্ধৃত করিয়া নন্দকুমারের জীবনের শেষ চিত্র পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি; তাহা অপেক্ষা সেই অন্ধকারময় সময়ের সম্যক পরিস্ফুট ও বিশ্বাস্য অন্য কোন বিবরণ পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। ম্যাক্রেবী একজন, তৎকালীন উচ্চপদস্থ ও উন্নতমনা ইংরাজ, নন্দকুমারের কারাগার অবস্থান কালে তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়, সেই সময় তিনি যে প্রকার প্রাঞ্জল ও অলঙ্কার রহিত-ভাষায়, নন্দকুমারের শেষ মুহূর্ত্তের বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে নিতান্ত পাষাণের চক্ষেও জল আইসে। এ প্রকার সরল ও হৃদয়ভাবব্যঞ্জক কাহিনীর উপর অবিশ্বাস করিলে আমাদের প্রত্যবায় আছে। পার্লামেণ্টে ও ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে ইম্পি ও হেষ্টিংসের নামে অভিযোগের সময় যাঁহারা বার্ক, সেরিডান ও সার গিলবার্ট ইলিয়টের (ইনিই পরে লর্ড মিণ্টো বলিয়া খ্যাত হন) নন্দকুমারের সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলির জ্বলন্ত ও জীবন্ত ভাব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অনুমান করিতে সমর্থ হইবেন—যে নন্দকুমারের প্রেত-আত্মার প্রতি তাঁহারা কতদূর সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। †

বর্ত্তমানে নন্দকুমারের প্রকৃত চরিত্র স্ফুটিত করিবার জন্য যাহা বলা হইল—তাহাই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে। পরে আমরা ক্রমশঃ দেখাইব—যে হেষ্টিংসই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই—নন্দকুমারের নামে সুপ্রীমকোর্টে যে দুই

---

* এই সমস্ত ইংরাজ ছাড়া এক জন মুসলমান নন্দকুমারের চরিত্রে কলঙ্কার্পণ করিয়া গিয়াছেন। ইনি "সৈয়রউল মতাক্ষরীণ" প্রণেতা গোলাম হোসেন। নন্দকুমারের সহিত গোলামহোসেনের খুব শত্রুতা ছিল—সুতরাং বৈরনির্য্যাতনই যে এইরূপ অযশকীর্ত্তনের প্রধান কারণ ইহাই আমাদের বিশ্বাস হয়।

† জনশ্রুতি যে ওয়েষ্টমিনিষ্টার-হলে বক্তৃতা সময়ে প্রসিদ্ধ বাগ্মী এড্‌মণ্ড বার্কের জ্বলন্ত ভাষায় হেষ্টিংসের নানাবিধ অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া দুই একটী সম্ভ্রান্ত ইংরেজ রমণী সেই স্থলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন।

মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল তিনিই তাহার মূল-পরিচালক। যে হেষ্টিংসের চক্ষে, তিনি নরকের কীটের ন্যায় ঘৃণার্হ বলিয়া পরে বিবেচিত হইয়াছিলেন—সেই হেষ্টিংসই গভীর যুক্তি ও নানাবিধ প্রশংসাবাক্য-দ্বারা তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষতা বর্ণনা করিয়াছেন।

নবাবের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার নিম্নে নন্দকুমার ছাড়া আর একটী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তৎকালে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান ছিলেন। মহারাজা নন্দকুমার যেমন—ধর্ম্ম ও রাজনীতি উভয় বিষয়েই হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন—এই উচ্চপদস্থ মুসলমানও তদ্রূপ সর্ব্ব বিষয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ইহার নাম নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজা খাঁ। ইনি কার্য্যক্ষেত্রে নন্দকুমারের প্রতিদ্বন্দী—ও ক্ষমতায় নন্দকুমারের সমকক্ষ ছিলেন। উভয়েই রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদ (নায়েব সুবাদার) লাভ, ও স্ব স্ব জাতির নেতৃত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি—যে ডাইরেক্টারদিগের আদেশক্রমে হেষ্টিংস মহম্মদ রেজা খাঁকে কলিকাতায় বন্দী করিয়া আনেন। পাটনার শাসনকর্ত্তা সেতাব রায়কে বন্দী করিবার কোন আদেশ ছিল না তথাপি হেষ্টিংস কার্য্যসৌকার্য্যার্থে তাঁহাকেও নজর বন্দী করেন।

এই দুইটী শাসন কর্ত্তার বিচারের জন্য তিনি যে প্রকার গোড়া বাঁধাবাঁধি আরম্ভ করিলেন, তাহাতে ছোট বড় সকলেই ভাবিল—না জানি মহম্মদ রেজা খাঁর ও সেতাব-রায়ের কি না শাস্তি হইবে। রেজা খাঁর নিযুক্ত সমস্ত কর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া পথের ভিখারি করিয়া হেষ্টিংস অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ বস্তুতঃ যথার্থ দোষী, তাঁহার নিষ্ঠুরতায় ও অদমনীয় অত্যাচারে বঙ্গীয় প্রজাকুল সাতিশয় জর্জ্জরিত হইয়াছিল; ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রমাণ লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। তাহাতে আবার মহারাজা নন্দকুমার যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। এতদূর সুবিধা ও সুযোগ সত্বেও দুঃখের বিষয় এই যে প্রায় দুই বৎসর ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর খাঁ সাহেব হেষ্টিং-সের বিচারে নির্দ্দোষী বলিয়া বিবেচিত হইলেন। যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াও হেষ্টিংস রেজা খাঁকে নির্দ্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়াতে সকলেই তাঁহার কার্য্য কলাপের উপর সন্দেহ করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসের উপর বিরক্ত হই-লেন। রেজা খাঁ তাঁহার স্বপক্ষে প্রায় দুই শত সাক্ষী জোগাড় করিয়াছিলেন নন্দকুমারও ছাড়িবার পাত্র নহেন—তাঁহারও সাক্ষী-সংখ্যা বড় কম ছিল না। সকল বিষয়েই তিনি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—কিন্তু এই প্রকারে বিফল মনোরথ হওয়াতে সকলের সমক্ষে তিনি অপ্রতিভ হইলেন। এই সময়ে হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত মনোমালিন্য আরও বাড়িয়া উঠিল। ভিতরে ভিতরে কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল—তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন—প্রচুর উৎকোচ-প্রদানে মহম্মদ রেজা খাঁ যে অব্যাহতি

পাইলেন—তদ্বিষয়ে তাঁহার আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। রাজা সেতাব রায় রেজা খাঁর পূর্ব্বেই স্বসম্মানে খালাস পাইয়াছিলেন—তিনি পুনরায় পূর্ব্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন—হেষ্টিংস ও কলিকাতা কৌন্সিল, তাঁহার নিকট, তাঁহাদের অন্যায় সন্দেহের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন—তাঁহাকে শিরোপা ও অন্যান্য রাজ সম্মান দেওয়া হইল। তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ও এই প্রকারে ন্যায়-পরায়ণ হেষ্টিংস মহম্মদ রেজা খাঁর ও সেতাব রায়ের অত্যাচার সমূহের বিচার করিয়া ১১৭৪ খৃঃ অব্দের ২৪ মার্চ্চ তারিখে ডাইরেক্টারদের এক রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলেন।

যে সময়ে মহম্মদ রেজা খাঁর বিচার চলিতেছিল তখন হেষ্টিংস হঠাৎ কুমার গুরুদাসকে নবাব সরকারে দেওয়ান রূপে নিযুক্ত করেন। হেষ্টিংস মনে মনে জানিতেন—যে নন্দকুমার তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দী—তিনি গোপনে গোপনে যাহাই কিছু করুন না কেন—নন্দকুমারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে কিছুই লুকায়িত রাখিবার যো নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল—যে রেজা খাঁর নিকট তিনি যে উৎকোচ লইয়া তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন—একথাও নন্দকুমার জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং মধ্য হইতে, কুমার গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া তিনি নন্দকুমারের সহিত সখ্যতা বন্ধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গুরুদাসকে দেওয়ান করিবার সময় কলিকাতার মন্ত্রী সভার সভ্যগণ,নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া এ নিয়োগ কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন কিন্তু স্থির-প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়মতি হেষ্টিংস কোন কথাই শুনিলেন না। গ্রেহাম, ডেক্রে, মরেল প্রভৃতি নন্দকুমারের প্রবল শত্রুগণ গুরুদাসের নিয়োগ-বিরুদ্ধে কত শত আপত্তি করিলেন—তাঁহারা আরও বলিলেন—যে গুরুদাসের নিয়োগে নন্দকুমারেরই প্রকৃত প্রভুত্ব বজায় থাকিবে। যে নন্দকুমার কোম্পানীর বিরুদ্ধে, পণ্ডিচারীর গবর্ণর ও সাহাজাদার সহিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন * সেই নন্দকুমারের পুত্র এতাদৃশ উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে—তাহারই হস্তে সমস্ত ক্ষমতাইথাকিবে—অতএব গুরুদাসকে এ কর্ম্মে কখনও নিযুক্ত করা যাইতে পারে না—” কিন্তু হেষ্টিংস এ সমস্ত অভিযোগে, এ সমস্ত বিরুদ্ধ কথায় কোন মনোযোগই প্রদান করিলেন না। তিনি নিজের মত বজায় রাখিয়া তাহার সপক্ষে নানাবিধ অকাট্য-প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই প্রকার আপত্তির অমূলকতা অবৈধতা দেখাইয়া এক মন্তব্য (Minute) লিখিলেন। এই মন্তব্যে যেরূপ দক্ষতার সহিত তিনি নন্দকুমারকে তাঁহার শত্রুগণের অন্যায় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাব বজায় রাখিয়া চিরকাল চলিতে পারিলে তাঁহার নাম ভারতেতিহাসে নিষ্কলঙ্কিত রূপে বিরাজ করিত। এই মন্তব্যে তিনি নিজে নন্দকুমারের সম্বন্ধে যে সমস্ত উচ্চদরের প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা কোন অংশেই তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে

* এ বিষয়ে নন্দকুমার যথার্থ দোষী কি না—তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আমরা পাই নাই। ইহা কেবল শত্রুর আরোপিত ও কল্পিত বলিয়াই বোধ হয়।

অপ্রযুজ্য নহে। হেষ্টিংসের এই মন্তব্য অপেক্ষা নন্দকুমারের চরিত্রের উৎকর্ষতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কোন স্থলেই পাওয়া যায় না; যে সময়ে মহম্মদ রেজাখাঁর বিচার চলিতেছিল, সেই সময়ে এই মন্তব্য লিখিত হয়। ইহার পরই গুরুদাস ও মনিবেগম রাজ সরকারে নিযুক্ত হন। আমরা নিতান্ত আবশ্যকীয় বোধে সেই মন্তব্যের কতিপয় অংশ এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম।* হেষ্টিংস লিখিতেছেন— "নন্দকুমারের নৈতিক চরিত্রের দোষগুণ বর্ণনাকরা আমি এখানে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না। নন্দকুমারের সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি তাহা ডাইরেক্টার সভার অবিদিত নহে। ... ... বাঙ্গলার নবাব মীরজাফর তাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন ও তিনিও তাঁহার জীবনে সে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন নাই। নন্দকুমার যে সমস্ত রাজনৈতিক গূঢ় মন্ত্রণায় (চক্রান্ত?) লিপ্ত ছিলেন—তাহা কেবল তাঁহার প্রভুর মঙ্গল, ও ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে—; ইহাছাড়া তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল না মীরজাফরের উন্নতির সহিত, তাঁহার নিজের স্বার্থও বিজড়িত ছিল। ... ... নন্দকুমারের উপর মীরজাফরের কি প্রকার বিশ্বাস ছিল তাহা তাঁহার কার্য্যকলাপেই বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রাজত্বের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাকে যে সমস্ত রাজ সম্মান প্রদান করিয়াছেন—তাহাতেই তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। ... ... নন্দকুমার এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন তাহা যদিও অনেকাংশে আমাদের উদ্দেশ্যের ও স্বার্থের বিরুদ্ধাচারী তথাপি সত্য কথা বলিতে গেলে—ইহা তাঁহার পক্ষে কোন মতেই দূষণীয় নহে। ইহাতে তাহার চরিত্র ও ব্যবহার যে কেবল দোষশূন্য ইহাই প্রকাশ হইয়াছে তাহা নহে—ইহাতে বরঞ্চ তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে"। ... ...

এক্ষণে এই মন্তব্য সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করিব না। উপযুক্ত স্থলে এ বিষয়ে বলা হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই মন্তব্য গুরুদাসকে নবাব সরকারে দেওয়ান নিযুক্ত করিবার সময় লেখা হয়; (১৭৭২—২৮ জুলাই) এই সময়ে সবে মাত্র রেজাখাঁর বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ প্রায় দুই বৎসর পরে এই দীর্ঘকাল ব্যাপী পরীক্ষার পর হেষ্টিংস রেজাখাঁকে বেকসুর খালাস দেন একথাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মহম্মদ রেজাখাঁর বিচার শেষ হইবার পর ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস ডাইরেকটারদের যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে নন্দকুমারের প্রতি সেই সময়ে তাঁহার কতদূর বিদ্বেষ ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৭৪ খৃঃঅব্দের মার্চ মাসে এই পত্র বিলাতে পাঠান হয়। এই পত্রে হেষ্টিংস নন্দকুমারের

* Vide the Minute of the Committee of Circuit at Kasimbazer 28th July 1772.

অনেক নিন্দা করিয়া ছিলেন—নন্দকুমারের দোষের বিশিষ্ট প্রমাণাভাব হওয়াতেই যে মহম্মদ রেজা খাঁ বেকসুর খালাস পাইলেন ইহাও তিনি প্রকাশ করিয়া বলেন। এই পত্র ও হেষ্টিংসের অন্যান্য গোপনীয় পত্র অবলম্বন করিয়া আমরা পরে দেখাইব যে এই সময়ে হেষ্টিংসের সহিত নন্দকুমারের আন্তরিক শত্রুতা কতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে বিলাতে লর্ড নর্থ-প্রমুখ মন্ত্রী সম্প্রদায়ের যত্নে Regulating Act বা "নিয়ামক বিধি" ভারতীয় শাসন কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সাধন জন্য বিধিবদ্ধ হয়। ইহার সত্বানুসারে হেষ্টিংস বাঙ্গলায় গবর্ণর জেনারেল ও জেনারেল ক্লেবারিং, কর্ণেল মন্সন, ও ফিলিপ ফ্রান্সিস্ সাহেব কৌন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। এই সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রজাদিগকে ব্রিটিশ বিচারের সর্ব্বোচ্চ সুখ দিবার নিমিত্ত স্যর ইলাইজা ইম্পি তৎকালীন সুপ্রাম কোর্টের প্রধান বিচারক; হাইড, লিমেষ্টর ও চেম্বার্শ সাহেবগণ পিউনি-জজ্ নিযুক্ত হইয়া ভারতোদ্দেশে যাত্রা করেন। নিয়ামক-বিধির ধারা গুলির এস্থলে আর পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই ইতিহাস পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

১৭৭৪ খৃঃ অকটোবার মাসে সুপ্রীম কোর্টের জজ ও কৌন্সিলের মেম্বরগণ কলিকাতার চাঁদপাল ঘাটে উপস্থিত হন। তাঁহারা কলিকাতায় উপস্থিত হইলে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে সপ্তবিংশতিবার তোপধ্বনি হইল। হেষ্টিংস কয়েকজন সামান্য অধীনস্থ কর্ম্মচারি পাঠাইয়া মেম্বর গণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। হেষ্টিংসের এই গর্ব্বিত ও কর্কশ ব্যবহারে কৌন্সিলের মেম্বরগণ ভাবিলেন হেষ্টিংস নিজ প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য তাঁহাদের সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহারা হেষ্টিংসের যথেচ্ছাচারে বাধা দিতে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এতদিন বাঙ্গলায় হেষ্টিংসেরই একছত্র ক্ষমতা ছিল। কলিকাতা কৌন্সিল তাঁহার নিজের দলের লোক লইয়াই সংগঠিত হইয়াছিল—সুতরাং তিনি যাহা করিতেন তাহাই সর্ব্ববাদী সম্মত হইয়া বিবেচিত হইত। এই জন্য হেষ্টিংসের কার্য্যের বিরুদ্ধে কি ইউরোপীয় কি দেশীয় কোন প্রকার লোকই সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিত না। কিন্তু নূতন কৌন্সিল উপস্থিত হওয়াতে তাহারা হেষ্টিংস কৃত অত্যাচারের প্রতিবিধানের আশা করিতে লাগিল। এই সময়ে রোহিল্লাযুদ্ধের ন্যায়-অন্যায় লইয়া কৌন্সিলের নূতন মেম্বরগণ হেষ্টিংসকে বড় পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন—ইহা দেখিয়া সকলেই বুঝিল—গবর্ণরের দোষগুণ বিচার করিবার জন্য—তাহাদের অত্যাচার ও অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য—গবর্ণরের সমক্ষমতাপন্ন কয়েক জন লোক ইংলণ্ডেশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন।

মহারাজা নন্দকুমার ও বর্দ্ধমানের মৃত মহারাজা তিলকচাঁদের পত্নী—হেষ্টিংস কৃত অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কৌন্সিলে মেম্বরগণের নিকট প্রথমে অভিযোগ উপস্থিত করেন। এ পর্য্যন্ত সাহস করিয়া কেহই গবর্ণরের বিরুদ্ধে কোন

কথা বলিতে সাহস করে নাই—কিন্তু ইহারাই সেই বিষয়ের প্রথম পথ দেখাইয়া সাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। নন্দকুমারের অভিযোগের কারণ কি, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত পত্রখানিতে বিশেষ প্রতিপন্ন হইবে; তাহা আমাদের আর পৃথক করিয়া দেখাইবার আবশ্যকতা নাই।

১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখে মহারাজা নন্দকুমার প্রকাশ্যরূপে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে তৎকৃত অত্যাচারের প্রতিবিধান বাসনায় কৌন্সিলের সদস্যগণের নিকট অভিযোগ করিলেন। এই অভিযোগ হইতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। তিনি হেষ্টিংসের প্রজ্জলিত ক্রোধ মুখে পতিত হইয়া অশেষ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইলেন—অত্যাচারের নিরাকরণ জন্য বিচার প্রার্থনা করিতে গিয়া তিনি আরও অধিক পরিমাণে অত্যাচারগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যও সফল হইল না—এবং হেষ্টিংসের কুটিল চক্রে পড়িয়া—তৎকালীন সমস্ত বঙ্গবাসীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন। হায়! কি কুক্ষণেই মহারাজা নন্দকুমার এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পত্রখানি কৌন্সিলের সম্মুখে দাখিল করেন—তাহা অতিশয় দীর্ঘ ও নানাবিধ রহস্য জড়িত। এই পত্রখানি—"গবর্ণর জেনারেল ও কৌন্সিল"কে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। ইহা পারসীতে লিখিত হইয়াছিল—ও তাহার সঙ্গে একখানি ইংরাজি অনুবাদও ছিল। মহারাজা নন্দকুমার স্বয়ং অভিযোগ পত্রখানি ফ্রান্সিসের হস্তে দিয়া আইসেন। ফ্রান্সিস্ যথাসময়ে কৌন্সিলের অধিবেশনে পত্রখানি উপস্থিত করিলেন। পত্রখানি ৮ই মার্চ্চ তারিখে লিখিত। ইহার প্রথমেই মহারাজা নন্দকুমার মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধকালে ইংরাজদিগকে কি প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার বিষয় লিখিত আছে। তৎপরে ইহার মধ্যে মহম্মদ রেজাখাঁর কাহিনী জ্বলন্তভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর যাহা ছিল পাঠক নিম্নে তাহা অবিকল দেখিতে পাইবেন। মহারাজা নন্দকুমার তার পর লিখিতেছেন—"যখন হেষ্টিংস মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার গবর্ণর স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া বাঙ্গলায় শাসনকার্য্যে প্রবিষ্ট হইলেন—সেই সময়ে তিনি আমাকে তাঁহার কার্য্য বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুতাসুত্রে বদ্ধ হইতে বলেন। এই সময়ে আমি কি কার্য্য করিয়াছিলাম তাহা পরে দৃষ্ট হইবে। যখন জেনারেল ক্লেভারিং কর্ণেল মন্সন ও ফিলিপ ফ্রান্সিস্ সাহেব কলিকাতা কৌন্সিলের সদস্যরূপে বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন—তখন প্রেসিডেণ্ট হেষ্টিংস সাহেব অনেক দেশীয়লোককে তাঁহাদের নিকট পরিচিত করিয়া দেন—তাঁহারা কলিকাতায় উপস্থিত হইবার এক সপ্তাহ পরে আমি গবর্ণর সাহেবকে ঐ সমস্ত কৌন্সিলের সাহেবদিগের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করি—গবর্ণর তাহার উত্তরে

বলেন—"আমার একজন শত্রু আছে তাহার সহিত আপনার বড়ই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আপনারা তাহাকে এই সকল মন্ত্রীসভার সভ্যগণের নিকট পত্রাদি পাঠাইবার জন্য সংবাদ-বাহক স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন" ইহার পর গবর্ণর বলেন—"আমার শত্রুর সহিত আপনাদের বড়ই মিত্রতা দেখিতেছি—আপনি তাহার সহায়তায় মেম্বরগণের সহিত পরিচিত হউন না কেন?" তৎপরে তিনি ভয়প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—"আমার নিজের সুবিধার জন্য ও মান বাঁচাইবার জন্য আমি সমস্ত চেষ্টাই করিব—কিন্তু তাহাতে আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।" আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আপনি আমার পরম শত্রু গ্রেহাম সাহেবের * কথায় আস্থা প্রদান করিবেন না। এ সম্বন্ধে তখন আব কোন কথাই হইল না। পরে গবর্ণর, ইলিয়াট সাহেবকে, † মেম্বরগণের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। এই সময় হইতে আমি মধ্যে মধ্যে কখনও বা কৌন্সিলের সদস্যগণের সহিত, কখনও বা গবর্ণর সাহেবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতাম। ২৯ এ পৌষ মঙ্গলবার আমি গবর্ণরের বাটীতে গিয়াছিলাম। উক্ত দিবসে দেখিলাম যে আমার পরমশত্রু গ্রেহাম সাহেব ও গবর্ণর একত্রে বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছেন। গ্রেহাম সাহেব চলিয়া গেলে গবর্ণর সাহেব আমায় ডাকিয়া বলিলেন—"আমি নিশ্চয় জানিয়াছি যে আপনি আমার প্রকৃত শত্রুর ন্যায় কাজ করিতেছেন—আমি এই সময় হইতে এখানে আপনার একজন প্রধান শত্রু হইব—এবং বিলাতে গিয়াও আপনার অনিষ্ট করিতে ছাড়িব না। আপনি আজ হইতে আর আমার কাছে আসিবেন না—আপনি আপনার ক্ষমতায় আমার যতদূর অনিষ্ট করিতে পারেন তাহাই করিবেন"।

ক্রমশঃ।

অশ্রুবিন্দু উপহার।

দয়াময়, কোথা তুমি, কোথা তুমি এসনা হে,
পরিশ্রান্ত বড় আজি দাঁড়াতে পারিনে আর,
তোমারি আদেশে নাথ, সংসার ভ্রমিতে গিয়ে,
এনেছি তোমার তরে অশ্রুবিন্দু উপহার।

---

* ইনি বর্দ্ধমানে হেষ্টিংস কর্ত্তৃক Resident নিযুক্ত হইয়াছিলেন।
† ইনি নন্দকুমারের নামে জাল মোকদ্দমায় দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

নানা খেলা পেয়ে সেথা, তোমারে ভুলিয়ে গিয়ে,
কত যে পেয়েছি জ্বালা, কি কব হে—কি কব হে,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় মম, যাতনা অনন্তোপম,
বল নাথ—বল নাথ, কত সহে—কত সহে !

দিশাহারা হ'য়ে আমি কত দিকে চেয়েছি যে,
কাতরে, আকুল প্রাণে কেঁদেছি যে কত বার,
দেখিতে কি পেয়েছি হে— দেখা কি দিয়েছ, নাথ,
দশদিকে দেখেছি যে অন্ধকার—অন্ধকার।
কত মরু মরীচিকা পেয়েছি জীবন-পথে,
কব কি তোমারে পুন, না জান কি তুমি তার—
তোমার রাজত্বে ঘুরে, নিরবধি পেয়েছি যা,
এনেছি তোমার তরে অশ্রুবিন্দু উপহার !

পাপী যে তাপী যে আমি, বড় জ্বালা সয়েছি যে,
তাপিত ব্যথিত হৃদে দিওনাক ব্যথা আর,
দয়ার ভিখারী আজি দুয়ারে দাঁড়ায়ে তব,
দয়াময়, দাও এসে নামাইয়ে দুখ-ভার।
দিয়েছিলে যত কিছু, সব ফেলে এসেছি হে,
পারিনে আনিতে হেথা বিন্দুমাত্র আমি তার,
তোমারি আদেশে, নাথ, সংসার ভ্রমিতে গিয়ে,
এনেছি তোমার তরে অশ্রুবিন্দু উপহার !

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

প্রয়াগ দর্শন।

মুসলমানদের এলাহাবাদ অর্থাৎ আল্লার স্থান আর আমাদের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগ,—এখানে আসিয়া পবিত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে স্নান করিয়া কত পাপী তাপী তরিয়া গেল, অধম আমার কিছুই হইল না, আমি যে পাপের বোঝা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম—তাহা যেমন তেমনি রহিয়া গেল, এখানে আসিয়া অবধি আমার একদিন গঙ্গাস্নান হয় নাই। এই শীতের দেশ, ভোরে উঠিয়া গঙ্গা-স্নানের কথা মনে করিতে গেলেও গায়ে কাঁটা দিয়া

উঠে,—তবু না হয় এক দিন কষ্টে শ্রষ্ঠে তাহাও করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম পাণ্ডাদের কিছু কিছু দিয়া মাথা না মুড়াইতে পারিলে শুধু গঙ্গাস্নানের ফল হয় না। তা প্রথমটিতে আমার আপত্তি ছিল না, দ্বিতীয় কথাটি শুনিয়া অবধি এমনি আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে যে সেই দিন হইতে এই সহজ পুণ্য লাভের আশাটা একেবারেই ছাড়িয়া বিজ্ঞ দার্শনিক হইয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি—এত সহজে পাপমুক্ত হইয়া তৃপ্তি নাই। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মকে জয় করা উচিত। যাহউক তাই বলিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের অন্য কোন সহজ উপায় পাইলে আমি যে ছাড়িয়া কথা কই তা নয়,—মাথা না মুড়াইয়া আর এই শীতের সময় গঙ্গাস্নান না করিয়া শুধু স্থানদর্শন দ্বারা যতদূর পুণ্য লাভ করা যাইতে পারে তাহার বড় বাকী রাখি নাই, এখানে দেখিবার মত যাহা আছে সকলি প্রায় দেখিয়া লইয়াছি।

প্রয়াগের প্রধান মাহাত্ম্য ত্রিবেণী-সঙ্গমে, গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর পুণ্য মিলন-স্থলে। এখান হইতে সরস্বতী যদিও অনেক দিন অন্তর্ধান করিয়াছেন (পাণ্ডারা বলে অন্তঃশীলা বহিতেছেন) কিন্তু গঙ্গা যমুনার যুগলরূপ এখানে আসিয়া যিনি না দেখেন তাঁর আসাই মিথ্যা। আমরা নৌকা করিয়া একদিন এই সঙ্গম দেখিতে গিয়াছিলাম। যমুনার কালজলে নৌকা ভাসিল,—যমুনাপুলের জল-প্রোথিত প্রকাণ্ড স্তম্ভের মধ্য দিয়া তরতর বেগে নৌকা দুর্গ প্রাকারের নিকটে আসিয়া পড়িল। এই দুর্গ আকবর সাহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজেরা এখন ভোগ দখল করিতেছেন। একদিন দুর্গের সিংহাসন-আকারে-গঠিত বারাণ্ডার উপর বসিয়া মোগল সম্রাট যখন গর্ব্বভরে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন—তখন তিনি জানিতেন না পেণ্টলুনের মধ্যে কামিজ কাঁ, রাঙ্গামুখওয়ালা, সমুদ্র পারের সামান্য সৈনিক বাচ্ছারা এক দিন সেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমান দর্পভরে দূরবীনের ভিতর দিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিবে। এ জ্ঞানটা সে দিন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

কি প্রকাণ্ড দুর্গ! ইহার গঠনই বা কি মজবুত! দুর্গের পশ্চিম দিকের প্রাকার ভিত্তি ঠিক জলের উপর হইতে উঠিয়াছে, কত শতাব্দীর বর্ষার ভীম তোড় ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তবু দুর্গ এখনো অটল-পাষাণের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, ভবিষ্যতের শত সহস্র বৎসরের অত্যাচারকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য ভীমদর্পে অপেক্ষা করিতেছে। কি মসলায় গঠিত হইয়া দুর্গের গাঁথনি এত কঠিন হইয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও ইংরাজেরা তাহা এখনো আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। নদীর ধারে দুর্গ প্রাকারের এক স্থানে ইহাঁদের আমলে একটু ফাটিয়া যায়, ইহাঁরা তাহা যতবার মেরামত করিতেছেন, ততবারই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিছুতেই ঠিক দুর্গের অন্য স্থানের মত ইহা মজবুদ করিতে পারিতেছেন না। যমুনার তীরে দুর্গের ঠিক নীচে একটি ধ্বজা পোঁতা দেখিলাম, এই ধ্বজা-নিম্নস্থ কূপেই নাকি এখন সরস্বতী বিরাজিত—তাই ইহার

নাম সরস্বতী কূপ। মাঝিরা বলিল উপর হইতে দাঁড়াইয়া দেখিলে কূপের জল দুধের মত শাদা দেখায়। এই কূপে পাণ্ডাদের বিলক্ষণ উপায় হয়। দেখিতে দেখিতে গঙ্গায় আসিয়া পড়িলাম। পূর্ব্বে যমুনার মত গঙ্গাও দুর্গের গা ঘেঁসিয়া বহিত। এদেশের একটি প্রবাদই আছে,

দরিয়াবাদ দরিয়া কিনারে, ফরিয়াবাদ নিশানী,
আকবর যো কিল্লা বানায়া, ত্রিবেণীকা পাণ

এখন গঙ্গা একটু সরিয়া পড়িয়াছে, তবে বর্ষাকালে অবশ্য এখনো গঙ্গা দুর্গের ভিত্তিতে আসিয়া লাগে। গঙ্গা যমুনার মিলনস্থানে জলের কি তোড়, দুইটা প্রকাণ্ড জলরাশি একটার উপরে একটা ঝাঁপাই ঝুড়িতে ঝুড়িতে অবশেষে এক হইয়া প্রশান্ত ভাবে সরিয়া পড়িয়া সমুদ্র পানে চলিয়াছে, দুই সতীনে কে স্বামীর কাছে আগে পৌঁছিবে—এই বিবাদে উন্মত্ত হইয়া যেন একজনকে একজন ভীমবেগে ছাড়াইয়া চলিতে চাহিতেছে। ঠিক সঙ্গমস্থানটি দেখিলে কৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি মনে পড়ে। আধো কাল আধো শাদা, আধো জটা আধো চিকুর, এই আধ আধ রূপে যেন দিক ভরিয়া গিয়াছে। আধো আধো মিশিয়া এক হইয়া গিয়াও দাম্পত্য প্রেমের মিলনের মত গঙ্গা যমুনার স্বাতন্ত্র্য লোপ হয় নাই।

এখানে নৌকার উপর হইতে গঙ্গার দুই পারের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। আমাদের ডানদিকে (এলাহাবাদের পরপারে) গঙ্গার উপরে খানিকটা লইয়া এবড়ো খেবড়ো উচু নীচু পাহাড়ময় স্থান, ইহার নাম ঝুসি—ইহার কোন অংশে কোন কেল্লার ভগ্নাংশ, (শোনা যায় এপারে ৪টা কেল্লা ছিল) কোন স্থানে বা কয়েকটি কুঁড়েঘর—কোথায় বা গাছ পালার মধ্যে একটা সামান্য মন্দির, আর পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চশিখরে তীরোত্থিত সিঁড়ি সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র ইটের দোতালা বাড়ী অতি দূর হইতে লোকের নজরে পড়িতেছে। (এখানে একজন পরমহংস বাস করেন—এখানকার লোকেদের তাঁহার প্রতি পরম ভক্তি, আমরা তাঁহার কাছে দুই তিনবার গিয়াছিলাম।) এই পাহাড়ময় স্থান খানিকদূর গিয়া সমতল হরিৎক্ষেত্রে শেষ হইয়াছে, শ্যামশষ্যপূর্ণ এই সমক্ষেত্রতীর আবার আমাদের পশ্চাতে যমুনার তীরের সহিত গিয়া মিশিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পূর্ণ গঙ্গার এই তীর দেশ দেখিলে সুখ দুঃখে উদাসীন নিষ্কাম সন্ন্যাসীর গম্ভীর মূর্ত্তি মনে পড়ে, আর আমাদের বামদিকের বেণী ঘাটের প্রতি চাহিলে তাহাতে লোভ কলহময় একটি সংসার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃহৎ ঘাটতীর লোকে লোকে নিশানে নিশানে একাকার। (ভিন্ন ভিন্ন নিশান দেখিয়া লোকে নিজের নিজের পাণ্ডা ঠিক করিয়া লয়) সেই নিশানের মাঝে মাঝে ও গঙ্গার জলময় কূলে কূলে,—সারি সারি তক্তাপাতা। গঙ্গা স্নান করিয়া কেহবা তক্তার উপর বসিয়া ফোঁটা কাটিতেছে, কেহ কাপড় ছাড়িতেছে, কেহ পূজা আহ্নিক করিতেছে,

কেহবা তক্তাতে বসিয়া নীচের জল তুলিয়া তুলিয়া স্নান করিতেছে, আর গঙ্গার জলেত সারবন্দী লোকের কথাই নাই। গঙ্গার ঠিক ধারে—এমন কি ঠিক বা জলের উপরও মাঝে মাঝে এক একখানা অস্থায়ী বন্দবস্তের সামান্য রকম আটচালা দেখা যাইতেছে, শোনা গেল তাহার একখানিতে সেরাজপুরের রাণী মকদ্দমা করিতে আসিয়া কল্পবাস করি-তেছেন। তীরে নানা রকমের দোকান। নিশানের মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় তাল পাতার ছাতির নীচে পাণ্ডারা এক একটা মাটীর ঢিবি, পাথরের ঢিবিকে রং চঙ্গে কাপড় পরাইয়া ঠাকুর সাজাইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছে। যাত্রীদের এই সকল মূর্ত্তিকেই দক্ষিণা দিয়া যাইতে হয়। ইহা ছাড়া সত্যকার দোকানঘর দেবদেবীর মূর্ত্তিরও এখানে অভাব নাই। যখন বর্ষাকালে এই তীর ডুবিয়া যায় তখন পাণ্ডারা উপরে ফোর্টে যাইবার উঁচু রাস্তার ধারে সমস্ত দোকান তুলিয়া আনে। বর্ষাকালে ঠিক এই রাস্তার নীচে পর্য্যন্ত জল আসে। এখন গঙ্গা এই রাস্তা হইতে কত দূরে পড়িয়াছে। এখন এই রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দেখ তোমার সম্মুখে নীচে সুদূর প্রসারিত বালির চড়া ধূ ধূ করিতেছে, সেই বিশাল চড়ার এক পাশে অতি দূরে একটা সূক্ষ্ম রেখার মত গঙ্গা আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়া যমুনার সহিত মিশিয়াছে। এই সরু গঙ্গা দেখিলে তাহাকে গঙ্গা মনে হয় না, সে যেন গঙ্গার একখানি ছায়া, আর তাহার চারিদিকের সমস্ত দৃশ্যটা যেন একটা স্বপ্ন দৃশ্য। কে জানে নৌকার উপর অপেক্ষা এই উঁচু রাস্তার উপর হইতে গঙ্গার এই দৃশ্যটা যেন আমার বেশী ভাল লাগে।

এই রাস্তার ধারে একটি গাছের তলায় একজন বৃদ্ধ জৈন বসিয়া আছেন এইখানে বেড়াইতে আসিয়া আমরা দুই দিন তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি অন্ধ, গাত্রে কোন বস্ত্র নাই, পরণে নেংটিমাত্র, তাঁহার দাড়ী বুকে আসিয়া পড়িয়াছে। দুই দিনই দেখিলাম—তিনি বিজির বিজির করিয়া মালা জপিতেছেন। আমরা কথা কহিলাম—তিনি বুঝিতে পারিলেন না, চেলাদের জিজ্ঞাসা করিলেন কেহ আসিয়াছে কি?" তাহারা বলিল "হাঁ" আমরা চেলাদের দিয়া তাঁহাকে দুএক কথা কি প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু বৃদ্ধের তাহা ইন্দ্রিয়গম্য হইল না তিনি অন্যরূপ উত্তর দিতে লাগিলেন, চেলারা হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধের নাম সুরদাস—শুনিলাম অনেক দিন হইতে দিন রাত্র নাই, শীত রৌদ্র নাই সমান এই স্থানে বসিয়া আছেন। গবর্ণমেণ্টের রেকর্ডেই পাওয়া যায়—তিনি ৫৫ বৎসর কাল এইরূপে বসিয়া আছেন, অনেকে বলেন—আরো বেশী দিন হইতে তিনি এইখানে বসিয়া আছেন। কি অসীম ধৈর্য্য! আগে আগে নাকি রাত্র দুইটার সময় একবার করিয়া তিনি হাঁটিয়া গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেন—এখন এমন শক্তিহীন—যে চেলারা তুলিয়া না লইয়া গেলে তিনি আর নড়িতে পারেন না। ইনি কাহারো নিকট ভিক্ষা করেন না, ইচ্ছা করিয়া যে যাহা দেয়। শুনিলাম এখন

ইহার এত টাকা জমিয়াছে—যে ইহার নামে এলাহাবাদে একটী ব্যাঙ্ক চলিতেছে, পরে তাঁহার চেলারাই তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে।

বেণীসঙ্গম দেখিয়া আমরা অক্ষয়বট দেখিতে এই রাস্তা দিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুর্গ-সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া যখন শস্ত্রধারী প্রহরীদের নিকট দিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিতে লাগিলাম—গাটা যেন ঝম ঝম করিয়া উঠিতে লাগিল।

এই দুর্গ নির্ম্মাণ কৌশল—আর কলিকাতার দুর্গ নির্ম্মাণ কৌশল শুনিলাম এক, এই দুর্গ দেখিয়াই নাকি ইংরাজেরা সেই ধরণে কলিকাতার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুর্গের একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে একে একে চারিটি প্রকাণ্ড দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। প্রতি দ্বারেই শস্ত্রধারী প্রহরী, এক দ্বার অতিক্রম করিয়া আর একটি দ্বার পর্য্যন্ত স্থান যেন সৈনিকপূর্ণ গোলা-কামানপূর্ণ এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। দুর্গের পয়ঃপ্রণালীর এমনি বন্দবস্ত যে ইচ্ছামাত্র দুর্গ দ্বারের নিম্নের দুই পার্শ্বের স্থান একেবারে জলময় করিয়া তোলা যায়,—শত্রু আসিতে হইলে প্রথমতঃ সেই জল পার হইয়া দুর্গবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তবে দ্বারে প্রবেশ করিতে পাইবে। সচরাচর সকলে দুর্গের তৃতীয় দ্বারের ভিতর পর্য্যন্ত যাইতে পারে—আমরাও তিনটি দ্বার পার হইলাম, দেখিলাম—প্রথম দ্বিতীয় দ্বারে দেশী সৈন্য তৃতীয় দ্বারে ইংরাজ সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত। যদি মরিতে হয় আগে আমাদের দেশের লোকগুলা—যা শত্রু পরে পরে। পাশ না থাকিলে চতুর্থ দ্বার অতিক্রম করিয়া কেহ আসল দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে আর কি অস্ত্রাগার প্রভৃতি আছে। আমাদের পাশ ছিল না—আমাদেরও ইহার মধ্যে যাওয়া হইল না। কিন্তু এবার না হউক—আর একবার আমরা পাশ লইয়া অস্ত্রাগার দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি কাণ্ড! ঘরের চারিদিকে কত রকম করিয়া বন্দুক সাজান, দেয়ালে দেয়ালে বর্শা তরবারি সঙ্গীন ঝক ঝক করিতেছে—যে দিকে চাই—চোক যেন ঝলসিয়া যায়। যাক—আমরা তৃতীয় দ্বার পার হইয়াই সম্মুখের বাগানে অশোক স্তম্ভ দেখিলাম। স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সময় প্রভৃতি পালিভাষায় স্তম্ভের গায়ে লেখা আছে। এদেশে ছোট লোকেরা ইহাকে ভীমের গদা বলে। এ গদা দেখিয়া ভীমকে কল্পনা করা সহজ কথা নহে। এই স্তম্ভ ছাড়াইয়া কিছু দূরেই অক্ষয়বটের সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের কাছে আমাদের গাড়ী আসিয়া থামিল—আমরা কয়জনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলাম। নামিবা মাত্র অন্ধকারে চ'খে যেন ধাঁদাঁ লাগিয়া গেল—একজন পাণ্ডা আলো হাতে লইয়া আমাদের পথ দেখাইয়া চলিল। সিঁড়ি হইতে নামিয়াই সুড়ঙ্গের এক পাশে—আমাদের সম্মুখে একটি প্রস্তর মূর্ত্তি, তাহা দেখাইয়া পাণ্ডা বলিল—"ইহা প্রয়াগের ত্রিবেণীমাধবের মূর্ত্তি। যেখানে এখন এই দুর্গ দেখিতেছ এই দুর্গ নির্ম্মাণের আগে এ স্থান গঙ্গার জলে পূর্ণ ছিল, আকবর তাহা দেখিয়া ত্রিবেণীমাধবের কাছে আসিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন—যে ৫০০ বৎসরের জন্য গঙ্গা কিছু সরিয়া যাউন" বেণীমাধবজি

তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন '৫০০ বৎসর কেন আমি গঙ্গা লইয়া হাজার হাজার বৎসরের জন্য এখান হইতে হটিয়া যাইতেছি—তুমি এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ কর'।

গল্প শুনিতে শুনিতে সুড়ঙ্গটা দেখিয়া লইলাম, সুড়ঙ্গটা উচ্চে দেড় মানুষ আন্দাজ, প্রস্থে পাশাপাশি বোধ হয়—২।৩ জন লোক এক সঙ্গে চলিতে পারে—আর দৈর্ঘ্যে আন্দাজ ২৫।৩০ হাত মনে হইল। সুড়ঙ্গের দুই পাশের দুই দেয়ালে অনেক কোলঙ্গা, এক এক কোলঙ্গায় এক এক দেবতামূর্ত্তি; মূর্ত্তিগুলি সবই প্রায় পাথরের—তাহার কোনটারই না আছে ছাঁদ না আছে শ্রী, সবই নিতান্ত অদ্ভুত রকমের। কোলঙ্গা-স্থিত দেবতাগুলির নাম বলিতে বলিতে পাণ্ডা আমাদের পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে একটি কোলঙ্গায় রাম লক্ষ্মণের মূর্ত্তির কাছে প্রস্তর খোদিত আলাদা একখানি পা দেখিলাম। শুনিলাম, উহা ভগবানের শ্রীচরণ—বিনা আয়াসে আশার অতীত ফল লাভ করিলাম—ভগবানের চরণ দর্শন ঘটিল—দুঃখের মধ্যে তাহাতে সশরীরে স্বর্গ লাভ ঘটিল না। পাণ্ডা বলিল রামচন্দ্র বনে যাইবার সময় যখন প্রয়াগ হইয়া যান তখন এই পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডার সে কথা শুনিয়া আমাদের সঙ্গের একজন এ দেশী হিন্দু চাকরের মনে এতটা ভাবোদয় হইল—যে সে ওহো ওহো করিয়া উঠিল—চোখে জল আসিয়াছিল কি না সেটা ঠিক দেখিতে পাই নাই। অক্ষয়বটের কাছাকাছি আসিয়া সুড়ঙ্গের মেজেতে কয়েকটি শিব স্থাপনা দেখিলাম—একটা শিবের পাথর খানিকটা ভাঙ্গিয়া গেছে। পাণ্ডা বলিল আরঞ্জীব ইহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন—ভাঙ্গিবামাত্র রক্তে সুড়ঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছিল। আরঞ্জীব কি রূপ অত্যাচারী ছিলেন, কত হিন্দু দেব দেবী নষ্ট করিয়াছিলেন তাহাও সে গল্প করিতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে আমরা সুড়ঙ্গের প্রায় শেষ ভাগে আসিয়া বটবৃক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। যাহা দেখিলাম আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সেই রৌদ্রহীন বায়ুহীন নিরালোক বদ্ধ প্রদেশে দু একটি নবীন পাতা মুঞ্জরিত একটি ছিন্নমস্তা জীবন্ত বৃক্ষ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

গাছের প্রধান যে গুঁড়ি তাহা মাটি হইতে আন্দাজ আধ হাত উর্দ্ধে উঠিয়া সেখান হইতে অপেক্ষাকৃত দুইটা ছোটগুঁড়িতে ভাগ হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। অর্থাৎ প্রধান গুড়ির দুইদিক হইতে দুইটা মোটা মোটা গুড়ির মত ডাল উঠিয়া গুহার ছাতের কাছাকাছি পৌছিয়াছে। গাছ সুড়ঙ্গের মাথা স্পর্শ করিবে ভয়ে—গুঁড়ির ছাদমুখী আগা দুইটি একেবারে কাটা। সুতরাং এই গাছের চেহারা মাটীতে পোঁতা একগাছা মাথা কাটা খোলা রান্নার বেড়ীর মত। প্রধান গুঁড়ির দুই পাশে দুই জায়গায় এক একটি নিতান্ত ছোট সরু ডাল বাহির হইয়াছে, সেই ডালে কাঁচা কাঁচা দুই চারিটি পাতা, তাহা ছাড়া সমস্ত গাছে একটি ডাল নাই, একটি পাতা নাই, বেড়ীর ডাণ্ডার মত সেই মোটা মোটা গুড়ি দুইটিই এই গাছের সর্ব্বস্ব। এই গুড়ি দুইটি গাঁটে গাঁটে ভরা—সেই গাঁট গুলি দেখিতে কাঁচা কাঁচা, মনে হয় উহা হইতে যেন কিছু দিন পরে নূতন পাতা বাহির

হইবে। কিন্তু শুনিলাম—নূতন পাতা এগাছে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দিনের পর এবার নূতন পাতা দুই একটি বাহির হইয়াছে, আবার অল্পদিনের মধ্যে শুকাইয়া যাইবে। ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বিনা বাতাসে বিনা আলোকে গাছটি বাঁচিয়া আছে ইহাই আশ্চর্য্য। এই গুহা অক্ষয়বটের জীবন্ত সমাধি। পৃথিবীতে শুনিয়াছি সাতটি আশ্চর্য্য সামগ্রী আছে আমারত মনে হইল এই অক্ষয় বটকে আর একটি আশ্চর্য্য বলিয়া গণ্য করা উচিত।

এ গাছটি কত কালের কেহ বলিতে পারিল না—আমাদের পথপ্রদর্শক পাণ্ডা বলিল— ইহা সৃষ্টির প্রথমে জন্মিয়াছে। আবার যখন প্রলয় কালে পৃথিবী জলমগ্ন হইবে তখন এই গাছ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটি পাতা উৎপন্ন হইয়া সেই জল ঢাকিয়া দিবে— আর সেই তিনটি পাতাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আবার জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনর্সৃষ্টি করিবেন"। পাণ্ডাটি দেখিলাম গল্পের ভাণ্ডার, যা জিজ্ঞাসা কর উত্তর মুখে লাগিয়া আছে, তা সে উত্তর তুমি ঠিক অঠিক যা মনে করিয়া লও তাহাতে তার কিছুই আপত্তি নাই। অক্ষয়বটের পর অল্প দূর গিয়া সুড়ঙ্গের শেষ, শেষটা একেবারে বন্ধ নহে, এক-জন মানুষ যাইতে পারে এইরূপ ফাঁক আছে। পাণ্ডা বলিল এই সুড়ঙ্গ বরাবর কাশি পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাণ্ডার কাছে আকবরের জন্মের একটি বড় মজার গল্প শুনিলাম। অক্ষয় বটের কাছাকাছি সুড়ঙ্গের মেজের এক জায়গায় একটু খোঁড়া খোঁড়া গর্ত্তের মত আছে, পাণ্ডা তাহা দেখাইয়া বলিলেন "এইখানে বালমুকুন্দ নামে একজন ব্রহ্মচারী বসিয়া ধ্যান করিতেন, একদিন তাঁর শিষ্যেরা তাঁহাকে যে দুধ পান করিতে দিয়াছিল তাহাতে একগাছি গরুর লোম ছিল, সেই লোম মুখে পড়িবা মাত্র ব্রহ্মচারী বলিলেন—হা শিষ্যগণ কি করিলে—আমাকে এমন পাপলিপ্ত করিলে! এই বলিয়াই তিনি তখনি তনুত্যাগ করিলেন, আর সেই পাপে মুসলমানের ঘরে আকবর বাদশাহ রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।" আকবরের প্রতি দেশের লোক কিরূপ সন্তুষ্ট ইহা হইতে বুঝা যায়। আকবরের এবং তাঁহার মন্ত্রী বীরবলের প্রশংসা এদেশের লোকের মুখে ধরে না। পাণ্ডা বলিল আকবরই অক্ষয় বটের এই সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, আর মন্ত্রী বীরবল এই সুড়ঙ্গ স্বর্ণনির্ম্মিত করিতে গিয়াছিলেন—শেষে তাহাতে দস্যু উপদ্রব হইবে ভাবিয়া তাহা করেন নাই। এত গল্প করিয়াও তবু সেদিন পাণ্ডার অনেক গল্প বাকী রহিয়া গেল তাই পরদিন তাহাকে আমাদের বাড়ী আসিতে বলিলাম। সেদিন আসিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হাতে পড়িয়া তাহাদের আয়-পসার কিরূপ কমিয়াছে সেই দুঃখই সে বেশী করিল; যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই,—

ইংরাজদের ইচ্ছা নয় যে পাণ্ডারা ফোর্টে থাকিতে পায়, তাহাদের উঠাইবার জন্য তাহারা কত চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু আকবরের পরোয়ানার জোরে তাহারা বাঁচিয়া গেছে, আকবর দুর্গ নির্ম্মাণের সময় পাণ্ডাদের এইরূপ পরোয়ানা দিয়াছেন যে "তাহারা বং-

শানুক্রমে এই দুর্গ মধ্যে থাকিয়া এই বৃক্ষের আয় ভোগ দখল করিবে—এখান হইতে অন্য কোন রাজা তাহাদিগকে উঠাইতে পারিবে না।” ইংরাজেরা এ মকদ্দমায় পরাজিত হইল বটে কিন্তু রবিবার দিন যাত্রীদের এখানে আসা বন্ধ করিল, পাণ্ডাদের তাহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি, তাহারা অনেক হেঙ্গাম করিয়া প্রয়াগবাসী বরদার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী দিনকর রাওকে ধরিয়া গভর্নরজেনেরেলের কাছ হইতে ২। ৩ বৎসর মাত্র সে নিয়ম রহিত করিবার হুকুম আনাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ অসুবিধা যে এখনো দূর হইয়াছে তাহা নহে, দিনের মধ্যে সকল সময় যাত্রী অক্ষয় বট দেখিতে আসিতে পায় না, সকালে বিকালে কয়েক ঘণ্টা করিয়া অক্ষয় বট দেখিবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। ইহার উপর (পাণ্ডারা প্রতিদিন যত লাভ করুক না করুক) গোরা প্রহরীদের প্রতিদিন নাকি পাঁচসিকা করিয়া ঘুষ দিতে হয়, নহিলে তাহারা যাত্রী ভাগাইয়া দেয়। আমরা যেদিন গিয়াছিলাম দেখিলাম—অনেকে ফুল দিয়া গাছ পূজা করিতেছে, তাহার মধ্যে একজন সন্তান কামনায় আসিয়াছে।

খসরুবাগ এখানকার দেখিবার আর একটি প্রধান স্থান। জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু যখন এ অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তিনি এ বাগান প্রস্তুত করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এই সাধের বাগানেই তাঁহার সমাধি হইয়াছে। এখন এ বাগান গবর্ণমেণ্টের হাতে। ৩া৪ শত টাকা বেতনে একজন নাকি এ বাগানের ইংরাজ তত্বাবধারকই আছে। বাগানের দুইটি গেট। প্রথম গেটের ভিতরকার কমপাউণ্ড এখন বাগানের সামিল নহে, সেখানকার দোকান রাস্তা এখন গবর্ণমেণ্টের। আগে এইখানে বাগানের খাস দোকান বসিত। ইহার কাছে একটি কূপ-বাটিকা আছে। দোতালা বাড়ীর মধ্যে কূপ, কূপের ভিতর পর্য্যন্ত সিঁড়ি, গরমি কালে বেগমেরা আর কি এইখানে বাস করিতেন। প্রথম গেটের কমপাউণ্ডের সীমায় দ্বিতীয় আর একটি প্রকাণ্ড গেট—ইহা উচ্চে ৫০ হাতেরও হয়ত অধিক হইবে; এই গেটের শিল্প কার্য্যও বড় চমৎকার। গেটের মধ্যে ঢুকিয়া বাগানের রাস্তার দুই পাশে চাহিয়া দেখ চিত্র বিচিত্র মখমল শয্যা বিছান রহিয়াছে, সে মখমল পশমের মখমল নহে, ঘাসের মাঝে মাঝে নানা বর্ণের বিলাতি ফুল ফুটাইয়া ঠিক মখমলের মত সাজান হইয়াছে। তারপর ফুল বাগান, হাজার হাজার নানা রংগের নানা আয়তনের গোলাপ একসঙ্গে ফুটিয়া সৌরভে চারিদিক আকুল করিয়া রাখিয়াছে, গোলাপফুলের এমন কারখানা আর কখনো দেখি নাই। অন্য ফুল যে একেবারে নাই তাহা নহে, তবে খসরুবাগ গোলাপের জন্যই প্রসিদ্ধ।

বাগানের মধ্যে এক লাইনে তিনটি সমাধি মন্দির। প্রথমটি খসরুর মাতার, দ্বিতীয়টি শূন্য। খসরুর এক স্ত্রীর জন্য ইহা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু তিনি রুগ্নাবস্থা দিল্লিতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গমন করিয়া সেইখানেই প্রাণ ত্যাগ করেন এবং সেইখানেই তাঁর দেহ প্রোথিত হয়—সুতরাং এখানকার মন্দিরটি শূন্যই রহিয়া

গেছে। তৃতীয় মন্দিরটিতে স্বয়ং খসরু ও তাঁহার দুই বালক পুত্র শয়ান আছেন। হতভাগ্য খসরু সাজাহানের প্ররোচনায় তাঁহার দুইটি বালক পুত্রের সহিত একই দিনে একজন হাবসি ক্রীতদাস কর্ত্তৃক নিহত হন। খসরু ও সাহাজাহান দুই সহোদর ভ্রাতা, ইহাদের মাতা মানসিংহের ভগিনী। পিতা জাহাঙ্গীর বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই রাজ্য লোভে দুই ভাইয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদ নিবৃত্তির জন্য দুই ভাইকে স্বতন্ত্র রাখিবার ইচ্ছায় জাহাঙ্গীর খসরুকে এলাহাবাদের শাসন ভার দিয়া এইখানে প্রেরণ করেন। সাহাজান ও খসরুর বিবাদে খসরুর মাতা সাহাজানকেই দোষী দেখিতে পান ও তাহাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তিনি তাঁহার মুখ দর্শন করিবেন না স্থির করিয়া পুত্র খসরুর সহিত এলাহাবাদে আগমন করেন। খসরু এখানে আসিয়াও নিস্তার পাইলেন না। একদিন তিনি ও তাঁহার দুইটি পুত্র আহার করিতেছেন মুহূর্ত্তের জন্য অন্য ভৃত্যবর্গ সরিয়া গিয়াছে—এই সময় খসরুর একজন ভৃত্যবেশী সাহাজানের লোক তিনজনকে একসঙ্গে হত্যাকরে। কিন্তু পরে সাহাজান নিজে দোষ মুক্ত হইবার জন্য ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দেন। পুত্রশোকে রাজ্ঞীও কিছু দিন পরে প্রাণ ত্যাগ করেন।

যে ফকীরের উপর এই তিনটি সমাধি মন্দির দেখিবার ভার—আর যে আমাদের সঙ্গে লইয়া মন্দিরগুলি দেখাইয়া বেড়াইতেছিল, তাহার কাছেই আমরা এই সব কথা শুনিলাম। ফকির পারস্য ভাষা বেশ জানে। সমাধি মন্দির খোদিত কথা পড়িয়া সে আমাদের তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে লাগিল। খসরুর সমাধি মন্দিরের ভিতর দিকের দেয়ালে অনেকগুলি এই মর্ম্মের কবিতা লেখা আছে—ধনের জন্য কিনা হয়—পুত্র পিতার অবাধ্য হইয়া পড়ে, ভাইকে ভাই নিধন করে—ইত্যাদি। একস্থলের অন্যরূপ অর্থের দুই ছত্র কবিতা বড় ভাল লাগিল—তাহার অর্থ এই, "এই যে নবাব খসরু—ইনি অতি সূক্ষ্মবস্ত্রের ভার সহ্য করিতে পারিতেন না, অঙ্গে ব্যথা লাগিত, এখন কতমন পাষাণ ভারের নীচে স্বচ্ছন্দে শুইয়া আছেন"।

খসরুর গোরের পাথরের উপর কতকগুলি ফুল ছড়ান দেখিলাম। শুনিলাম মুসলমানেরা অনেকে অনেক কামনা করিয়া খসরু ও তাঁহার পুত্রদিগকে পূজা করিয়া যায়, বিনা-অপরাধে হত হইয়া আরকি ইহাঁরা "সহিদ" অর্থাৎ দেবতা হইয়াছেন।

(এই সব দেখিয়া শুনিয়া একটা ঔদাস্যময় কষ্টের ভাব সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। (সমাধি স্থল দেখিলে মনে কি যে একটা কিছুই কিছু নয় ভাব আসিয়া পড়ে সহজে সে ভাব মন হইতে তাড়ান যায় না) অথচ এই কষ্টেরও এমন একটা আকর্ষণ আছে—সমাধি-ক্ষেত্রে আসিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না,—কে জানে মৃত্যুর মধ্যে কি মায়া নিহিত, মৃত্যুকে সকলে দূরে রাখিতে চায়, মৃত কেহ দেখিতে চায় না—তবু শব দেখিলে তাহার দিকে না চাহিয়া যেন কেহ থাকিতে পারে না। একদিন

এখানকার ইংরাজদের গোরস্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। কত সাধের স্ত্রী মরিয়াছে—স্বামী সেই মৃত দেহের উপর উচ্চ স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কত স্ত্রী মৃত স্বামীর গোরের উপর অশ্রুমাখা কাতরোক্তি লিখিয়াছেন। একজন ধনীর একটি মাত্র পুত্র একুশবৎসর বয়সে ঘোঁড়া হইতে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে, একজন একে একে চারিটি পুত্র কন্যা ও স্ত্রীকে এই খানে শুয়াইয়া রাখিয়া গেছেন, সংসারে বুঝি আর তাহার কেহ নাই। কত পুত্র কন্যা পিতামাতা ভাই ভগিনী স্বামী স্ত্রী অশ্রুজল ও হৃদয় বেদনা মাখাইয়া প্রিয় মৃতের মাটি শয্যার উপর ফুল শয্যা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে শুইয়া আছে তাহার কাছে মাটী শয্যা আর ফুলশয্যা দুইই সমান। এ যে স্থল এখানে অশ্রু বেদনা স্নেহ প্রেম কিছুই পোঁছে না। সমাধি ক্ষেত্রে আসিলে স্নেহ প্রেমের অশ্রু বেদনার এই উপেক্ষা দেখিয়া মর্ম্ম বিদ্ধ হয়, সংসারের অনিত্যতা প্রাণের ভিতরে ভিতরে প্রবেশ করে, অহঙ্কার ভুলাইয়া দেয়, ক্রমে সেই কষ্টের মধ্যে একটা পবিত্র প্রশান্ত ভাব অন্তঃশীলা বহিতে আরম্ভ হইয়া সেই কষ্টটাকে উপভোগ্য করিয়া তুলে, তখন সমাধি মন্দির হইতে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না, তাহার মধ্যে একটি সত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

রাজনৈতিক আলোচনা।

গ্লাড্ষ্টোনের পরাজয়।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি লিবারল দল মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। আয়র্লণ্ড লইয়াই আবার লিবারেল দলের পরাজয় হইয়াছে, কিন্তু দেখিতে গেলে মহামতি গ্লাড্ষ্টোনের জয়—অন্তত ধর্ম্মত জয় হইয়াছে। ইংরাজেরা আইরিস্‌দিগকে কোন মতেই স্বায়ত্ব শাসন দিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা উদারনৈতিকদলভুক্ত ও সকল বিষয়ে উদারতা উদারতা করিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন তাঁহারাও এবার তাঁহাদের দলপতি গ্লাড্ষ্টোনের বিপক্ষতাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। চেম্বারলেন—যিনি র‍্যাডিক্যাল অর্থাৎ উদারনৈতিকদিগের অপেক্ষা আরও উদার বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তিনিও গ্লাড্ষ্টোনের বিপক্ষ হইয়াছিলেন। গ্ল্যাডষ্টোনকে একে একে সমুদয় পুরাতন বন্ধু ত্যাগ করিলেন। সকলেই বলিলেন যে তাঁহারা কোন মতেই আইরিস্ বিল পাস্ করিতে দিবেন না, কিন্তু নির্ভীক উদারচেতা বৃদ্ধ কিছুতেই ভীত না হইয়া অটল রহিলেন। তিনি বলেন যে আয়র্লণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্ব শাসন না দিলে আয়র্লণ্ড সুশাসিত

হইবে না। চারিশতের অধিক পিবারলের মধ্যে নব্বই জন গ্লাড্‌ষ্টোনের বিপক্ষ হইয়া রক্ষণশীলদিগের সহিত (Conservative) একমত প্রকাশ করেন ইহাতেও গ্লাড্‌ষ্টোনের ভোট অপেক্ষা মোট্ ত্রিশ ভোট অধিক হইয়াছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই গ্লাডষ্টোন আইরিষ বিল পুনরায় বিধি বদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে আইরিষ বিল পাশ না হইলে বৃদ্ধ গ্লাড-ষ্টোন্ রাজনৈতিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বৃদ্ধ মন্ত্রী যখন মনে করেন তিনি ন্যায়-কার্য্যে ব্রতী তখন তিনি মান অপমান কিছুই গ্রাহ্য করেন না এবং বন্ধুত্বের অনুরোধও রক্ষা করেন না। এবার মহাসভার নির্ব্বাচন ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হইবে। বৃদ্ধ গ্লাডষ্টোন মিডলোথিয়ান্, এডিনবরা ও অন্যান্য স্থানে গিয়া আপন মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন সেই খানেই অতি সাদর আহ্বান পাইয়াছেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী পুনরায় মন্ত্রিত্ব করিতে প্রস্তুত আছেন। রক্ষণশীল দলের নেতারা কর্ণেল ওয়াকারকে (colonel Walker) মিডলোথিয়ানের উমেদার করিয়া বৃদ্ধ গ্লাডষ্টোনকে পরাজিত করিতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদের এরূপ আশা যে কেবল দুরাশা মাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এবারও পার্ণেলের সাহায্য ব্যতীত যে কোন দল মন্ত্রিত্ব করিতে সক্ষম হইবেন এরূপ বোধ হয় না। আইরিস্‌গণ তোমাদের অধ্যবসায়ে ধন্য! কবে আমরা তোমাদের নিকট এই মহদ্‌গুণ শিক্ষা করিতে সক্ষম হইব! আইরিসগণ আমাদের সর রিভার্স টমসনের স্বায়ত্বশাসন চাহেন না। মোট কথা তাঁহারা কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন।

দাদা ভাই নওরোজি।

বোধ করি পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই এই দেশ হিতৈষী মহাত্মার নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে বরদা রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি কয়েকবার বিলাতে গিয়া অনেক দেশহিতকর বিষয় আন্দোলন করিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ইনি বোম্বাই গবর্ণরের কাউন্সিলের ও মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বর এবং জ্ঞানসমাজের একজন প্রধান নেতা। ইনি বিলাতের ও বোম্বাইএর East India association ও National Indian association এর একজন বিশেষ উদ্যোগী ও কর্ম্মঠ সভ্য। ইনি "ভারতের দরিদ্রতা" Poverty of India সম্বন্ধে এক খানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোক আছেন যাঁহারা ভারত অভাবতত্ত্ব সম্বন্ধের জ্ঞানে ইহাঁর সমকক্ষ হইতে পারেন। ইনি দেশীয় (ইংরাজি ও দেশী ভাষায় লিখিত) সংবাদ পত্রের মতামত সঙ্কলন করিয়া Voice of India নামক

সংবাদ পত্র রাজপুরুষ ও বিলাতের লোকদিগের জ্ঞাপনার্থে মাসে মাসে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আপাততঃ ইনি মহাসভার সভ্য হইবার জন্য উমেদার হইয়া ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। লণ্ডনের হল্‌বর্ণ Holborn পল্লী ইহাঁকে উদার নৈতিক সভ্যরূপে বরণ করিয়া যাহাতে ইনি মহাসভার সভ্য হইতে পারেন তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষকেও মহাসভার সভ্য করিবার জন্য ডেপ্ট-ফোর্ড লিবারেল দল পুনরায় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি দাদা ভাই নওরোজি লালমোহন ঘোষ উভয়েই এবার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন।

দেশীয় সংবাদ পত্র ও এংলো ইণ্ডিয়া নগণ

আজকাল এদেশীয় সংবাদ পত্রগুলি আমাদের শাসনকর্ত্তাদিগের চক্ষুশূল হইয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সিভিলিয়ান ও আংলো ইণ্ডিয়ানদিগের যথেচ্ছাচার আদৌ প্রকাশ হইত না। ইহাঁরা নিরীহ-প্রজা এমন কি ক্ষমতাশান ঐশর্য্যশালী জমিদার দিগের উপরও যথেষ্ট অত্যাচার করিতে ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। এক্ষণে কতক-গুলি দেশী সংবাদ পত্র সৎসাহসের উপর নির্ভর করিয়া এই অযথা অত্যাচার প্রকাশে বিশেষ যত্নবান হওয়াতে ইহা রাজ পুরুষ ও অত্যাচারী চা-করদিগের নিকট অতি-শয় ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। যথেচ্ছাচারীরা তাঁহাদের যথেচ্ছাচারকে অত্যাচার মনে করেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে দেশীয়দিগকে উৎপীড়ন ও হত্যা করা দোষণীয় ও আইন বিরুদ্ধ নহে। কেহ মনে করেন যে তাঁহারা ইংরাজ অতএব বিজিত দেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার অন্যায় নহে। আধু-নিক সিভিলিয়ানগণের অধিকাংশ দেশীয়দিগকে ঘৃণা করেন। সুতরাং এরূপ শাসন-কর্ত্তাদিগের নিকট সুবিচার-আশা কেবল অরণ্যে বৃথা রোদন। যখনই ইংরাজে ও দেশীয়তে কোন মকদ্দমা উপস্থিত হয় তখন আমরা দেখিতে পাই যে প্রায়ই বিচারের ব্যভিচার হয়। আসামে আজ কাল যেরূপ কুলিদিগের প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে চা-করগণের নিকট বিচার ও আইন খেলার বস্তু। যখন একজন অনায়াসে অত্যাচার ও হত্যা করিয়া অব্যাহতি পাইয়া থাকে তখন কেন না এরূপ ভীষণ ব্যবহার অজস্র ঘটিবে? যখনই কোন দেশীয় ইংরাজ-প্রহারে হত হয়, প্রায়ই ডাক্তার সাহেব প্লীহা ফাটিয়া মরার সারটিফিকেট্ দিয়া স্বজা-তীয়কে বাঁচাইয়া দেন। আমাদের বক্তব্য এই যে হত ব্যক্তি কেন প্লীহা ফাটিয়া মরিল? মনে কর যদি প্রহার জনিত আঘাতে প্লীহা ফাটিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে কেন হত্যা-কারীর হত্যাদণ্ড না হয়? যখন ইংরাজ মাত্রেই অবগত আছে যে কালা নেটীভদিগের সর্ব্বদা প্লীহা ফাটিয়া যায় তখন নেটিভদিগকে প্রহার করিয়া তাহারা কেন হত্যাকাণ্ড

করিয়া অব্যাহতি পায়? প্লীহাই ফাটুক আর যাহাই হউক প্রহারে ত লোকগুলা মারা পড়িতেছে, তবে কেন হত্যাকারীরা অবলীলা ক্রমে হত্যা করিয়া বাঁচিয়া যাইতেছে? দেশীয়দিগের কি জীবনের মূল্য নাই! পূর্ব্বে দেশীয়দিগের জীবনের মূল্য ২০০ টাকা ছিল কিন্তু এক্ষণে মফঃস্বলে জুরি প্রণালীর বিচার হইয়া সে মূল্যও উঠিয়া গেল। সে দিবস কেনেডি সাহেব একজনকে চাকর-হত্যাপরাধে ১০০ টাকা জরিমাণা করিয়াছিলেন কিন্তু সেশনে জুরির বিচারে সে জরিমানাও মকুফ হইয়া গেল!!! এরূপ অত্যাচার আর কতদিন চলিবে? আমাদিগের শাসন কর্ত্তারা কি দেখিয়াও দেখিবেন না? এই সকল অত্যাচার ও অবিচারের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে কলঙ্ক হইতেছে সে কলঙ্ক সমুদ্রের জলে ধৌত করিলেও অপনয়ন হইবে না। শাসন কর্ত্তাদিগের এই মহা পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? ভবিষ্যতে সুশাসন ও পক্ষপাত শূন্য বিচার দ্বারা কেবল এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। সত্য ও ন্যায় কথা বলিয়া আমরা শাসনকর্ত্তাদিগের বিরাগ ভাজন হইয়াছি। যতদিন না এই অত্যাচার নিবারণ হয় তত দিন কর্ত্তব্যানুরোধে আমরা এ অত্যাচার ও অবিচারের বিষয় বারম্বার উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হইব না।

সিম্‌লায় হণ্টরের বক্তৃতা।

বড় লাটের কৌন্সিলের মেম্বর হণ্টার কিছুদিন হইল সিমলা শিখরে "আওরাংজিব ও তাঁহার শাসন" সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ডাক্তার হণ্টার বিশদ রূপে বুঝাইয়াছিলেন যে আওরাংজিবের অবিচার, দেশীয়দিগের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস এবং প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার জন্য তাঁহার মৃত্যুর পরেই মোগল রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও পতন আরম্ভ হয়। আকবর সাহের দেশীয়দিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ও প্রজাদিগের প্রতি ভালবাসা ও সুবিচার জন্য আকবরের রাজত্ব এত সুদৃঢ় ও বিস্তারিত হইয়াছিল। যদি ইংরাজগণ আকবরের ন্যায় নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে বাসনা করেন তাহা হইলে এখনকার লর্ড ডফেরিণের Sterner policy ছাড়িয়া তাঁহাদের আকবরের পলিসিতে কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

গ্রীক্ ও তুরস্ক।

ইউরোপীয় রাজগণের বিভীষিকায় ভীত হইয়া গ্রীক্ তুরস্কের বিপক্ষে যুদ্ধ বাসনা আপাতত পরিত্যাগ করিয়াছে।

সয়েদ্ আমীর হোসেন্।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট সয়েদ আমিন হোসেন গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। লক্ষ্ণৌর তালুকদার রাজা আমীর হোসেন অযো-

ধ্যার "Rent bill" এর বিপক্ষ থাকা প্রযুক্ত লর্ড ডফেরিণ তাঁহাকে কৌন্সিল হইতে অপসৃত করিয়া রাণা শঙ্কর বক্স নামক একজন "জো হুকুম" তালুকদারকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন নাই। যিনি এরূপ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন, এবং যিনি কেবল "জো হুকুম" মেম্বর চাহেন তিনি কেননা একজন গবর্ণমেণ্টের জো হুকুম ডেপুটিকে সর্ব্বোচ্চ সভার সভ্য করিবেন!

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেঁয়ালি নাট্য।*

(বারান্দায় দণ্ডায়মান নবীন বাবু মাষ্টার প্রাণকালী বাবুকে রাজপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া)

নবীন। "আরে এই যে মাষ্টার বাবু! এত সকালে এত চোট পাট যাওয়া হচ্ছে কোথা?"

মাষ্টার। (উপরে চাহিয়া) এই যে নবীন বাবু! আর মশায় আমাদের সকাল বিকাল কি? চারটি অন্নের জন্য আমাদের কিনা করতে হয়!

নবীন। "সে সব হবে এখন, দেখাই যদি হোল একবার এইদিক দিয়ে হোয়ে যান।"

মাষ্টার। "না মশায়, সময় বিন্দুমাত্র নেই। আপনাদের কি আপনারা পায়ের উপর পা রেখে দিব্যি আরামে বসে থাকেন,সময়ের মূল্য ত আপনারা জানেন না,—তা যাচ্ছি,—এক্ষণি কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে"—

নবীন। "একমিনিটের মধ্যেই যাবেন এখন"

(প্রাণকালীর গৃহে প্রবেশ, দুজনের উপবেশন)

মাষ্টার। "দেখবেন মশায় শীঘ্র ছেড়ে দেবেন, বোঝেনইত, পরের চাকরী এক ঘণ্টা দেরী হলে সর্ব্বনাশ, একবার একজন বন্ধুর অনুরোধে পড়ে—একহপ্তা—শুধু একটি হপ্তা মশায় কামাই হয়েছিল—তা সে যে কাণ্ড কি বলব—

---

* গতবারের হেঁয়ালির উত্তর "গোকুল"। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র সান্ন্যাল, বিনোদ বিহারী সোম, নগেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, বিপিন বিহারী নাগ, সতীশচন্দ্র মাইতি, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, করুণাভিরাম বড়ুয়া, উপেন্দ্রনাথ সেন, রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পরেশনারায়ণ বিশ্বাস, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ পুণ্ডরিক, অনন্তলাল ঘোষ ও শ্রীমতী হরিকালী দাসী ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

নবীন। "উঃ তাইত, ওরা সব পাষণ্ড মশায়, ওরা সব পারে—বুঝেছি আপনাকে গলায়"—

মাষ্টার। "(তাড়াতাড়ি) নানা তা নয়—এই"—

নবীন। "তা যেন নাই হোল—মাইনেটা যে কেটে নিয়েছিল তার ত সন্দেহ নেই, গরীবের প্রতি কি অত্যাচার—তা নিক্ গে—কিছু মনে করবেন না,—আমি"—

মাষ্টার। "আপনি ত আমাদের মা বাপ আছেনই, কিন্তু মাইনে কাটাও নয়, মানিকের মা স্পষ্ট বলে পাঠালেন যে অমন করলে এবার কর্ত্তাকে বলে দেবেন, আর মানিক বল্লে ওরূপ হলে সে স্বতন্ত্র মাষ্টারের বন্দবস্ত করবে"—

নবীন। "হাহাঃ মাষ্টার মশায় আপনি বলেই ওরকম হয়েছিল—আমি হলে"—

মাষ্টার। কি করতেন ?

নবীন। "কি করতুম ! বড় মানুষের ছেলেকে যে রকম করে পড়াতে হয় তাই করতুম"—

মাষ্টার। "সে কি কোন রকম ফন্দী আছে নাকি ? আমাকে শিখিয়ে দিন দেখি"।

নবীন। "সেত অতি সহজ ফন্দী। পড়াতে গিয়ে একবারেই পড়াতে হয়, তাহলেই সব চুকে যায়, বিনা আয়াসে মাইনেটি আদায় হয়, আর ঘাড় ভেঙ্গে ভুপাত্র টানাও যায়"—

মাষ্টার। "তবে বলব মশায়—সে উদ্যোগ টাও হয়ে এসেছে"—

নবীন। "সত্যি নাকি ?"

মাষ্টার। "সত্যি নাত কি, যে ছেলে টেরি বাঁকিয়ে চুল আঁচড়াতে শিখেছে শীঘ্রই তার গোল্লায় যাবার লক্ষণ"

নবীন। "বটে! টেরি বাঁকাতে ধরেছে! তবেই হয়েছে ? আমাদের হরি অমন ভাল ছেলে ছিল—যেদিন দেখলুম চুল ফিরিয়েছে, বলব কি মশায় তার পর দিন থেকে সে স্কুল ছেড়ে দিলে!

মাষ্টার। "আপনার দৈবশক্তি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, এরও সে উদ্যোগ হয়ে এসেছে, কিন্তু বড় মানুষের কথা বলতে ভয় করে, যদি প্রকাশ—

নবীন। "পাগল নাকি ওসব ভাবতে হবে না, বলুন দেখি ব্যাপারটা কি ?

মাষ্টার। "(চুপে চুপে আরম্ভ করিয়া প্রকাশ্যে) মানিক বলছিল তার বাপকে বলে একদিন ষ্টার থিয়েটার যাবে, চৈতন্যলীলা তার ভারী দেখতে ইচ্ছে হয়েছে"

নবীন। "ষ্টার থিয়েটার! হাহাঃ আমিত বলেইছিলুম"

মাষ্টার। "কিন্তু একটা কথা,—তার বাপ যে যেতে টাকা দেবে তা আমার মনে হয় না, তিনি তেমন পাত্রই নন"—

নবীন। "তা বাপে না টাকা দিলে কি আর অন্য উপায় নেই, আমি ছেলেবেলা

যখন টাকা চেয়ে না পেতুম তখন মা ঘুমালে আস্তে আস্তে চাবিটি নিতুম। তা তার যখন যেতে ইচ্ছা হয়েছে সে অবশ্যই চুরি করেছে”—

মাষ্টার। (আশ্চর্য্য ভাবে) “সত্যি নাকি ?) তাই বটে ! এক দিন আমি পড়াতে গেছি, দেখি সে তার বাপের ডেক্সর কাছে বসে আছে—আমাকে দেখে তার ডেস্কের কাছে এল”

নবীন। “দেখলেন সে নিশ্চয়ই ডেক্স ভাঙ্গছিল আপনাকে দেখে স’রে পড়লো সন্দেহ নাই”—

মাষ্টার। “বলেন কি—সন্দেহও নাই ?”

নবীন। “যেমন নিঃসন্দেহ আমি আছি”—

মাষ্টার। “কি ভয়ানক” ! (হাঁ করিয়া একদৃষ্টে নবীনের মুখের প্রতি নিরীক্ষণ)

নবীন। “হায় হায় ছোকরাটা একেবারেই বয়ে গেল”—

মাষ্টার। “একেবারেই বয়ে গেল !”

শ্যামাচরণ বাবুর প্রবেশ।

শ্যামা। “কি হয়েছে ? তুজনে অমন করে বসে আছ কেন ?”

নবীন। “বলব কি মশায় তাজ্জব লেগে গেছে—বরাবর ত শোনাই যেত মানিক বড় ভালছেলে, সে একেবারে পড়াশুনা ছেড়ে মায়ের বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি করে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শ্যামা। (অবাক হইয়া) আমার বিশ্বাস হয় না—তাকে আমরা বড় ভাল ছেলে বলে জানি, তার নামে এ পর্য্যন্ত একটি মন্দ কথা শুনিনি—

নবীন। “আপনার কিসে বিশ্বাস হয় ! এই মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করুন, ইনি তার নাড়ী নক্ষত্র সব জানেন, ইনি কি বলছেন শুনুন। ইনি স্বচক্ষে তাকে তার বাপের ডেক্স ভেঙ্গে চুরি করতে দেখেছেন আর——”

(মাষ্টার চোখে হাত দিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন)

শ্যামা। “কি ভয়ানক কি ভয়ানক—পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই” (প্রস্থান)

মাষ্টার। “তুপুর বেজেগেল, আজ আর পড়াতে যাওয়া হোল না এইখানেই আহারের কথাটা বলে দিন”—

নবীন। “তবে রাতটাও থেকে যান, সন্ধ্যার পর তুজনে ষ্টার থিয়েটারে যাওয়া যাবে এখন।”

সেই দিনই মানিকের নিন্দায় সহর গুলজার হইয়া পড়িল।

কেবল মানিকের এই নিন্দা বলিয়া নহে, সংসারে সচরাচর যে সকল নিন্দা শুনা

যায় তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে অধিকাংশ স্থলেই উপরোক্ত রূপ ব্যাপার দেখা যায়। *

কলঙ্ক।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

(১)

আন্দাজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রভাত না হইতে হইতে কতিপয় ধনুর্দ্ধারী ভীল শীকারী আরাবলী পর্ব্বতস্থিত আবগড় অরণ্য প্রদেশের একটি গ্রাম পথ অতিক্রম করিয়া একটি বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল, যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশে উচ্চপাহাড় শৃঙ্গের গাত্রে উষার স্বচ্ছ শুভ্র মূর্ত্তি বিভাসিত হইল, সে মূর্ত্তি দেখিয়া স্তরবিন্যস্ত পাহাড় শ্রেণীর গাত্র হইতে, জটাজুটধারী অরণ্যের মস্তক হইতে জমাট অন্ধকার রাশি বায়ুতাড়িত-কুঝ্‌ঝটিকার ন্যায় সভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল, সে মূর্ত্তি দেখিয়া অরণ্যের শত পাখী আনন্দে আগমন গীত গাহিয়া উঠিল; শীকারীরা সোৎসুক দৃষ্টিতে একবার পূর্ব্বাকাশের দিকে একবার পথের দিকে চাহিতে লাগিল। ক্রমে উষার শতবর্ণ-রঞ্জিত-আকাশে সূর্য্য উদিত হইল, তাহার কনক-কিরণ হাসিতে পাহাড়ের সর্ব্বাঙ্গ—নদী নির্ঝর গাছ পালা বন গ্রাম আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিল। কৃষকেরা বলদ লইয়া একঘেয়ে সুরে গান গাহিতে গাহিতে ক্ষেত্রের দিকে গমন করিতে লাগিল, গরু ঘোড়া মহিষ ভেড়ারা পাহাড়ে চরিতে লাগিল, দু একটা বন্য ছাগ শিশু পাহাড়ের দুরারোহ্য শৃঙ্গে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। একদল খরগোস গাছ পালার ভিতর হইতে রাঙ্গা রাঙ্গা চোখ বাহির করিয়া শীকারীদের দেখিয়া আবার বনের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল—শীকারীরা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বারবার তাহারা নিকটের একটা উঁচু টিবিতে উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল, একজন নিতান্ত অধীর হইয়া ধনুকটা কাঁধ হইতে হাতে লইয়া সজোরে তাহার প্রান্তভাগ মাটির উপর রাখিল—সেখানকার মাটিটা খুঁড়িয়া গেল—সে রাগের স্বরে

---

* গতবারের হেঁয়ালি নাট্যে গোকুল সিংহ বলিয়া যে নাম ছিল—উহা কাল্পনিক নাম—কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। গোকুলের হিংস্রক সিংহ স্বরূপ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল মাত্র। আমাদের মাননীয় কোন বন্ধু ভুল বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এই কৈফিয়ৎটি লিখিতে হইল। সং—ভা।

বলিল—"মুই আর দাঁড়াইতে পারিব না, ঝটপট চলিতে হয় ত চল, 'তানা' না এল ত বড্ডা বয়ে গেল।" দলপতি বৃদ্ধ-ভীল পুত্রের এই কথায় যেন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন—"বাপ্পুরে আর টুকুনখানি সবুর কর, 'তানা' মুদের লায়েক লাকীন শিকারী, তানারে ছাড়তে আছে"—বৃদ্ধের অনুকরণ করিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল—"আরে নানা নানা,—'তানা' মুদের লায়েক লাকীন শিকারী—তানারে ছাড়া হইবে না"—ভীলরাজপুত্র (সংক্ষেপের জন্য ভীলপুত্র বলিয়াই আমরা সম্বোধন করিব) রাগিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল—এমন সময় হঠাৎ হৈ হৈ শব্দ পড়িয়া গেল, যাহারা উঁচু ঢিবিতে উঠিয়া দেখিতেছিল—তাহারা বলিয়া উঠিল—"ঐ যে ঐ 'তানা' আসিছে রে"—সকলের আহ্লাদের চীৎকার ধ্বনির মধ্যে একজন ধনুর্দ্ধারী যুবক দ্রুতপদে আসিয়া দাঁড়াইল।

(২)

নবাগত ধনুর্দ্ধারীর বেশভূষা ভীলদিগের মত কিন্তু তাহাকে দেখিতে ভীলদিগের মত নহে। তাহার বর্ণ গৌর, দেহ সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ, প্রশস্ত বক্ষে ও জমাট মাংসপেশী যুক্ত হস্তে যেন বজ্রবল নিহিত, লৌহ গোলক তাহাতে পড়িলেও যেন চুরমার হইয়া যায়, অথচ সেই বিপুল বলশালী শরীরে ভীলদিগের মত একটা কঠোর কাঠিন্য ভাব নাই, তাহা সুঠাম সুগঠন। মাথার কাল কাল লম্বা লম্বা চুলের মধ্যে মুখখানি হাসি হাসি বালকের মত, ওষ্ঠাধরে এখনো শ্মশ্রুর রেখা পড়ে নাই, অথচ প্রশস্ত নয়নের দৃষ্টিতে এমন একটা প্রভুত্ব অঙ্কিত আছে, সমস্ত মূর্ত্তিতে এমন একটা বীরভাব ব্যাপ্ত হইয়া আছে—যে তাহাকে দেখিলে বালক মনে হয় না, তাই আমরা তাহাকে যুবক বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি—কিন্তু বয়সে সে চতুর্দ্দশ বর্ষের বালক মাত্র।

ধনুকছিলাস্কন্ধ; বাণফলক-হস্ত, কৌপিনধারী যুবক—মুক্তপদে মুক্তমস্তকে মুক্তগাত্রে স্বর্ণ-কান্তিময় দেহের বীরসৌন্দর্য্য প্রভাত-রৌদ্রে প্রকাশিত করিয়া যখন ভীলদিগের নিকট আসিয়া পৌঁছিল—তখন—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া কবির হৃদয়ে যেরূপ আনন্দ জন্মে যুবকের সেই সুবর্ণ-সুঠাম-বলিষ্ঠ মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের সেইরূপ আনন্দ হইল। তাহাদের মনে হইল তাহার কান্তি পাইয়াই যেন প্রভাতটা এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। একজন কেবল সেরূপ আনন্দের ভাব প্রকাশ করিল না। বৃদ্ধ ভীল সস্নেহে আনন্দ-পূর্ণ-হৃদয়ে যুবকের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"এতক্ষণে আইলি বাপুরে।" যুবক হাসিতে হাসিতে বলিল—"শেষ রাতে আমার দিদি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছেন তাই আসতে দেরী হয়ে গেল—" দিদি আসিয়াছেন—বলিতে যুবকের কত আনন্দ! বলিতে বলিতে সে আনন্দ যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছাইয়া পড়িল;—তাহার আনন্দ দেখিয়া ভীলেরাও মহা-আনন্দিত হইল—বলিল—"তবে চল রে চল—শীকারে চল—"

সকলে মিলিয়া আনন্দ রব করিতে করিতে শীকারে গমন করিল। অরণ্যে প্রবেশ

করিয়া গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া, পাতা ছিঁড়িয়া পাখী মারিয়া, পশু মারিয়া, ভয়বিহ্বল পলতক পশুদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অরণ্য তোল পাড় করিতে লাগিল। এই সুপ্রভাতে অরণ্যবাসী নিরীহ পশু পক্ষীদিগের আকুল ক্রন্দন আর শীকারীদিগের পৈশাচিক উন্মত্ত চীৎকার ধ্বনি যতদুর গেল—বিদীর্ণ করিয়া তুলিল, কেবল মহিত অরণ্য মহাকালের মত উদাস ভাবে এই সুখ দুঃখের প্রতি অবিচলিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—তাহার প্রাণে সে হাসি কান্না বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিল না।

(৩)

দ্বিপ্রহর, সূর্য্য আকাশের মধ্য ভাগে—পাহাড়ের একটি উচ্চ শিখরের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—সেই শিখরাকাশ খানিক দূর লইয়া এত উজ্জল যে তাহার দিকে চাওয়া যায় না, আর সূর্য্যের পরিত্যক্ত পূর্ব্বাকাশ এত নীল যে দ্বিপ্রহরে সেখানে চন্দ্র দেখা যাইতেছে। সেই নীল আকাশ-চন্দ্রাতপের গায়ে এক এক টুকরা শাদা শাদা মেঘ ভাসিতেছে, মেঘের নীচে ছোট ছোট পাখীগুলি বিন্দুর আকার ধরিয়াছে—বুঝি তাহারা চাতক পাখী—মেঘের সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া ফেলিতে যায়।—বড় বড় চীল দুই একটি পাতের মত সমান ভাবে পক্ষ বিস্তার করিয়া পলকহীন নিস্পন্দ গতিতে উড়িতেছে; আর মাঝে মাঝে কর্কশ উচ্চ কণ্ঠে চিঁহিঁহিঁ করিয়া উঠিতেছে, সে চীৎকারে নিস্তব্ধ পাহাড় ঝাঁঝাঁ করিয়া উঠিতেছে, গাছের মধ্যে হইতে কাকগুলা গম্ভীর ভাবে সাড়া দিয়া উঠিতেছে—তাহাদের কলরবে ঘুঘুর অবিশ্রান্ত ঘুঘুরব যেন চকিতের মত ঢাকিয়া পড়িতেছে!

এই সময় বৃদ্ধ ভীল ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তাহাদের গ্রামের নিকটের একটি নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ তলে আসিয়া স্কন্ধের বোঝা ভূমিতে নামাইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন তখনও সেখানে আর কেহ আসে নাই, তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিছু পরেই দু একজন করিয়া অন্য শীকারীগণও সেখানে জমিতে আরম্ভ হইল। দুই তিন জন পিঠ হইতে কতকগুলা করিয়া পাখীর রাশ নামাইল, একজন দুইটা ছাগল পিঠে লইয়া উপস্থিত,—একজন কতকগুলা ভেড়ার বাচ্ছা আনিয়া ফেলিল,—৪।৫ জনে মিলিয়া একটা মহিষ ঘাড় হইতে নামাইল, একজন একরাশ খরগোশ পাইয়াছে, একজন কিছুই আনিতে পারে নাই—শেষে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিবার সময় একটা শৃগাল মারিয়া আনিয়াছে, তাহা দেখিয়া অন্যেরা তাহাকে সাবাস দিয়া মহা হাসির ধূম লাগাইয়াছে,—দূরে পৃষ্ঠ ভারে অবনত ভীল পুত্রকে দেখা গেল, সকলে উৎসুক হইয়া তাঁহার আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিল,—ভীলপুত্র নিকটে আসিয়া বোঝাটা দুম করিয়া মাটিতে ফেলিল, সকলে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল—"আজ তুই জিতিলি রে—" বোঝাটা আর কিছু নহে, একটা বরাহ। ভীলেদের নিকট বরাহ একটা বড় শীকার, ইহা তাহাদের একটি উপাদেয় খাদ্য। এরূপ শীকার এতক্ষণ আর কেহই আনে নাই, পরে যে আর কেহ আনিবে তাহারো সম্ভাবনা নাই—কেন না প্রায়ই একটার অধিক বরাহ এক

দিনের শীকারে পাওয়া যায় না। সকলেই শীকারীর প্রতি বিশেষ প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, আজকের দিন যেন তাহার জন্যই প্রভাত হইয়াছিল, ভীলরাজ পুত্রের জয়ে আহ্লাদে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন,—আত্ম গৌরবে ভীলপুত্রের বুক ফুলিয়া উঠিল—পরিশ্রম ক্লান্তি সে সকল ভুলিয়া গেল—এই সময় আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত যুবক তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তিনি না জানি কি আনেন! আর একবার সকলে কুতূহল হইয়া উঠিল,—ভীলপুত্রের হঠাৎ বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে ভাব চলিয়া গেল, আশ্বস্ত ভাবে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যুবক নিকটে আসিয়া একটা বড় হরিণকে মাটিতে নামাইলেন। সকলে আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিল। বরাহ হইতেও হরিণ দুষ্প্রাপ্য শীকার, কদাচিৎ তাহা পাওয়া যায়। এত দ্রুতবেগে হরিণ দৌড়ে যে তাহার প্রতি লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া বাণ ছোঁড়া বড় কঠিন কাজ। ভীলরাজ বলিয়া উঠিলেন "সাবাস বেটা সাবাস—" ভীলপুত্রের মুখ মলিন হইয়া গেল—ভীলরাজ তাহাকে কি একটা প্রশংসার কথা বলিতে পারিতেন না! আর কিছু না হউক সেত একটা বরাহ শীকার করিয়াছে, বরাহ শীকার করা হরিণ শীকার হইতে এতই কি সহজ! ভীলপুত্র গুম হইয়া রহিল, ভীলরাজ তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"বাপুটা তুই ওডার মত অমন শীকারী হইলি নে—ক্যান রে!

তিনি সান্ত্বনাচ্ছলে কথাটা বলিলেন, কিন্তু কি সান্ত্বনাই দিলেন! ভীলপুত্রের মনে কষ্টের যতটুক বাকী ছিল ঐ কথায় তাহা পূরিয়া গেল।

অভিপ্রায় ভাল হইলেই সব সময় তাহার ফল ভাল হয় না। পৃথিবী ভ্রান্তিময়,—ভুল বুঝিবার অবকাশ পাইলে সে সত্য বুঝিতে চাহে না, কেননা ভুলই তাহার জীবনের অবলম্বন, ভুল লইয়াই সে বাঁচিয়া আছে—যে মুহূর্ত্তে পৃথিবী হইতে ভুল চলিয়া যাইবে,—সেই মুহূর্ত্তে পৃথিবীর মৃত্যু, পৃথিবীর স্বর্গলাভ হইবে,—তখন আর পৃথিবী পৃথিবী থাকিবে না।

ক্রমশঃ।

দ্রৌপদী।

(প্রতিবাদ)

গত বৈশাখ মাসের ভারতীতে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবুর "দ্রৌপদী" শীর্ষক প্রবন্ধটী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী দেখিয়া আমাদের "ইউরোপীয় শিক্ষকেরা এইরূপ যে সিদ্ধান্ত করেন যে "ভারতবর্ষীয়েরা বর্ব্বর জাতি, তাহা-

দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ পদ্ধতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চ পাণ্ডবের একই পত্নী”—ইহার উত্তরে বঙ্কিম বাবু বলেন যে “বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদ, গৃহ্যসূত্র, শ্রৌতসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, দর্শন, এই সকলের ভাষ্য, তার টীকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরনীয় প্রাচীন তত্ত্ব সমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুনাক্ষরেও এমন কথা নাই যে প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ ছিল।” কিন্তু মহাভারতেই দ্রৌপদীর বিবাহ-ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির রাজা দ্রুপদকে কহিতেছেন ‘সর্ব্বেষাং ধর্ম্মতঃ কৃষ্ণা মহিষী নো ভবিষ্যতি, আনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বেষাং গৃহ্লাতু জ্বলনে করান।’ কৃষ্ণা ধর্ম্মত আমাদের সকলের মহিষী হইলেন। অগ্নি-সাক্ষী করিয়া তিনি অনুক্রমে আমাদের পাণিগ্রহণ করুন। ধর্ম্মভীরু দ্রুপদ এই কথা শুনিবামাত্র কহিলেন ‘একস্য বহ্বোবিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন। নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ কচিৎ। এক পুরুষ বহুপত্নী গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু এমন কথন শুনি নাই যে এক নারীর বহু পতি। যুধিষ্ঠির কহিলেন ‘ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্মে ধীয়তে মতিঃ। বর্ত্ততে হি মনোমেঽত্র নৈবোঽধর্ম্মঃ কথঞ্চন। শ্রূয়তে হি পুরাণে পি জটিলা নাম গৌতমী। ঋষিমধ্যা-সতবতী সপ্ত ধর্ম্মভৃতাং বরা। তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ। সঙ্গতাভূদ্দশ ভ্রাতৃনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ। আমি কথন মিথ্যা বলি না, অধর্ম্মে আমার মতি নাই, যখন এ বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি হইয়াছে তখন ইহাতে কথন অধর্ম্ম নাই। শুনিয়াছি অতি পূর্ব্বে গৌতমী জটিলা সপ্তর্ষিকে বিবাহ করিয়া ছিলেন এবং মুনিকন্যা বার্ক্ষী প্রচেতা নামে দশটি সহোদর ভ্রাতাকে বিবাহ করেন। *

আমরাও স্বীকার করি যে মহাভারতের সময়ে উক্ত প্রকার বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না, কিন্তু একেবারে অভূতপূর্ব্ব, ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যে যুধিষ্ঠিরের মতি? ——একথা মহাভারত পাঠক মাত্রেই বিশ্বাস করিতে সঙ্কুচিত হইবেন।

বঙ্কিম বাবু আরও বলেন “এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদৃশ সমাজে অত্যন্ত লোক নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাণ্ডব-দিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে, কবি এমন একটা কথা, তত্ত্ববিশেষকে পরিস্ফুট করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে।

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর ঔরসে পঞ্চপুত্র ছিল। কাহারও ঔরসে দুইটি কি তিনটি হইল না। কাহারও ঔরসে কন্যা হইল না। কাহারও

* ঐ অতি পুরাকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, হিমালয়ের কোন কোন স্থলে এখনো এক স্ত্রীর অধিক স্বামী দেখা যায়।

ঔরস নিষ্ফল গেল না। সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। কেহই বাঁচিয়া রহিল না। সকলেই এক সময়ে অশ্বত্থামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্য্যকারিতা নাই। সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহন কেমন জীবন্ত!"

ইহার দ্বারা বঙ্কিম বাবু এইরূপ প্রমাণ করিতেছেন, "যিনি ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগ শূন্য, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বিজিত করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নির্লিপ্ত। তাঁহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও দুঃখের অতীত।

এইরূপ "নির্লেপ" বা "অনাসঙ্গ" পরিস্ফুট করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন—নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্ত্তী পুরাণকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যবর্ত্তী করিয়াছেন। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের সাধন প্রণালীতে এত বেশী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর আবির্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সেই নির্লিপ্ত।† দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ ধর্ম্মের মূর্ত্তি স্বরূপিনী। তৎ স্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য।

... ...

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায়, যে দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন? হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম; গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম্ম। পুত্র উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্ম্মার্থে নিষ্প্রয়োজনীয়—কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ফল মাত্র। কিন্তু দ্রৌপদী ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত; ধর্ম্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, স্বামিগণের সঙ্গে তাঁহার ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

---

† অসংখ্য ভোগ্য বেষ্টিত হইয়াও সেই ভোগের প্রতি যাঁহার বাসনা না জন্মে তিনি নির্লিপ্ত বটেন, কিন্তু ভোগ্য বেষ্টিত হইয়া যাঁহারা কেবলি ভোগ করিতে থাকেন, তাঁহাদের কি করিয়া নির্লিপ্ত বলিব বুঝিতে পারি না। অনুরাগ শূন্য ভোগও বুঝা যায় বটে, কিন্তু যেখানে সে ভোগ কদাচিৎ, এবং তাহার বিশেষ ও নিঃস্বার্থ কোন কারণ দেখা যায়। কিন্তু যেখানে অনবরত কেবলই ভোগ, সেখানে নির্লিপ্ততা থাকিতেই পারে না। এরূপ স্থলে প্রথমে অনুরাগ শূন্য ভাবে ভোগ আরম্ভ হইলেও কালে তাহা বিকৃত হইয়া যায়—সুতরাং গ্রন্থকার দ্রৌপদীকে অনাসঙ্গ মূর্ত্তি স্বরূপিণী করিয়া যে তাঁহাকে পঞ্চস্বামীর অনুরাগিণী করিয়া গড়িয়াছেন ইহা কোন মতেই মনে করা যায় না।

স্বামীর ধর্ম্মার্থ দ্রৌপদী সকল স্বামীর ঔরসে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন; তৎপরে নির্লেপবশতঃ আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য্য।”

এই জমাট যুক্তির সার সংগ্রহ এইঃ—দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী থাকা ঐতিহাসিক নহে। তবে এ কথা মহাভারতে কোথা হইতে আসিল?

না, কবির কল্পনা হইতে।

কবি এমন কল্পনা করিলেন কেন?

না, স্ত্রীজাতির নির্লেপ বা অনাসঙ্গ ধর্ম্মের একটী আদর্শ দেখাইবার জন্য।

নির্লেপ বা অনাসঙ্গ ধর্ম্মটা ব্যাপার কি?

না, যিনি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে মধ্যে থাকিয়াও, তাহাতে অনুরাগ শূন্য তিনিই নির্লিপ্ত, তিনি পাপ ও দুঃখের অতীত।

দ্রৌপদী যে এইরূপ নির্লিপ্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি?

না, পঞ্চ পাণ্ডবের ঔরসে তিনি পাঁচটী মাত্র সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।

তাহাতে নির্লেপ বা অনাসঙ্গের বিশেষ লক্ষণ কি?

না, শাস্ত্রানুসারে সন্তান উৎপাদন ত করিতেই হইবে, কিন্তু একের অধিক হইলে তাহা সংলেপ বা আসঙ্গের লক্ষণ। Ergo দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীত্ব কেবল কবি কল্পিত আদর্শ বিশেষ।” কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই, একের অধিক পুত্র উৎপাদন করা না করার ধর্ম্মাধর্ম্ম ভার্য্যার না স্বামীর? একের অধিক পুত্র উৎপাদন করিয়া ভার্য্যা কোথাও পতিত বা সংলিপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এইরূপ বোধ করি বঙ্কিম বাবু তাঁহার কথিত গ্রন্থ সমুদ্র মন্থন করিয়া দেখাইতে পারিবেন না। তাহা যদি দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে একটী পুত্র উৎপাদন করাতে দ্রৌপদী নির্লিপ্ত হইলেন কি যুক্তিতে? আর, দ্রৌপদী নির্লিপ্ত?

যে দ্রৌপদী পাণ্ডবদের সুখে দুঃখে পাণ্ডবদের অপেক্ষাও আকুলিত ও উল্লসিত, যিনি সভাস্থলে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গুরুজনদিগকে কঠোর কটুক্তি করিয়াছিলেন, যিনি পঞ্চ পুত্রের বিরহে এত অধীর হইয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারেন নাই, তিনি নির্লিপ্ত অর্থাৎ অনুরাগ বিরাগ সুখ দুঃখের অতীত? যে দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীর মধ্যে অর্জ্জুনকে বিশেষ ভালবাসার জন্য একেবারে স্বর্গে যাইতে পারিলেন না, যিনি ভদ্রাকে দেখিয়া অর্জ্জুনকে দারুণ অভিমান ভরে নানা তিরস্কার করিয়াছিলেন, যিনি হিড়ীম্বার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তাহাকে “তোমার পুত্র মরুক” বলিয়া বজ্রকঠোর অভিশম্পাত দিয়াছিলেন, সেই দ্রৌপদী নির্লিপ্ত অর্থাৎ অনুরাগ—বিরাগ—সুখ দুঃখ সকলের অতীত?

প্রকৃত কথা এই যে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল, কিন্তু সেই জন্য প্রাচীন ভারতবাসীরা

"বর্ব্বর" ছিলেন না, দ্রৌপদীও গণিকা ছিলেন না। পঞ্চস্বামীত্ব দ্রৌপদী জীবনের একটী দুর্দ্দৈব ঘটনামাত্র, তাহাতে পঞ্চপাণ্ডব বা ভারতবাসী বা দ্রৌপদীতে কোন দোষই স্পর্শে না। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইতেই পারে না, কারণ সে সময়ের আর্য্যেরা অতিশয় সুসভ্য ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন—এই কথাই প্রতিপন্ন করা যদি বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য হয়, তা হইলে পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম-বিষয়ে কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া কুন্তীদেবীকে সতী সাধ্বী দাঁড় করাইতে পারেন? তার পর, কর্ণের জন্ম? বঙ্কিম বাবু ত আপনিই বলিয়াছেন যে, "যাহা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ তাহা কখনই ঐতিহাসিক নহে" * সুতরাং স্বয়ং সূর্য্যদেব কখনই কর্ণের পিতা হইতে পারেন না।

কুন্তি-দেবী আবার সে সময়ে কুমারী, তবে কি এই বলিতে হইবে যে কর্ণ নামে কোন বীরপুরুষ কখন' জন্ম গ্রহণ করেন নাই, অথচ কর্ণ সমস্ত মহাভারতের একটী মেরুদণ্ড বলিলেও অতুক্তি হয় না—এখন কি সিদ্ধান্ত করা যায়? অথচ প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চ সতীর মধ্যে কুন্তী দেবী একজন প্রধানা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"এই অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বঙ্কিম বাবু যদি আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার "দ্রৌপদী" নামক প্রবন্ধ সম্পর্কে আমাদের আরও যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা পরে বলিব।

শ্রী অঃ—

নানা কথা।

১

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ নৌযোদ্ধা নেলসনের ছেলেবেলার একটী আশ্চর্য্যজনক গল্প আছে। তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন তিনি একবার তাঁহার দিদিমার বাড়ীতে যান। এক দিন হঠাৎ সেখানে নেলসনকে খুজিয়া পাওয়া যায় না, কোথায় গিয়াছে সকলে ভাবিয়া আকুল। বৃদ্ধ দিদিমা ভারি চিন্তিত। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে এক নদীর তীরে তাহাকে পাওয়া গেল। সেই নদী অতি গভীর ও বেগবতী। তবুও শিশু নেলসনের মুখে কিছুমাত্র ভয়ের চিহ্ন নাই। নদী পার হইতে না পারাই তাহার তথায় দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ। দিদিমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে লোক সঙ্গে না নিয়া যেখানে সেখানে ইচ্ছা যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভৎর্সনা করিলেন, এবং তাহার কত বিপদের আশঙ্কা ছিল তাহা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য, ভয়ে তুই দৌড়িয়া আসিস নাই!" বালক উত্তর করিল, "দিদি মা ভয় কি, সে কথাটাও আমি জানি না।"

---

* প্রচার দ্বিতীয় খণ্ড। অষ্টম নবম সংখ্যা। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা।

২

যখন কেহ কোন বালককে উন্নত করিতে প্রয়াস পায় তখন তাহার ফল যে কি হইয়া দাঁড়াইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সর হামফ্রে ডেবি (Devy) ও মাইকেল ফ্যারাডে (Faraday) উভয়েই ইংলণ্ডের খ্যাত নামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ের। ডেবি যখন অনেক বড় বড় বিজ্ঞানতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া নিজ দেশে ও ইয়ুরোপ খণ্ডের অন্যান্য দেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন ফেরেডে বালকমাত্র।

একদা সর হামফ্রে ডেবিকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আপনার সর্ব্বপ্রধান আবিষ্ক্রিয়া কি"? তিনি উত্তর করিলেন "মাইকেল ফ্যারাডে"। ডেবি যখন ফ্যারাডেকে প্রথম দেখিতে পান, তখন ফ্যারাডে এক গরিব ছেলে, লণ্ডনের বৈজ্ঞানিক সমিতি রয়েল ইনিষ্টিটিউসনের যন্ত্রালয়ে বোতল পরিষ্কার করিত। অন্য লোক হইলে হয়ত ফ্যারাডেকে তুচ্ছ করিত। কিন্তু ডেবি তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সে সামান্য ছেলে নয়। তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে ফ্যারাডে পৃথিবীর এক-জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। আজ তাঁহার জীবন চরিত বিস্তৃত ভাবে লিখিবার সময় নাই। কিন্তু তিনি কত বড় লোক তাহা দুই একটা কথা জানিলেই বুঝিতে পারিবে। আজ কাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র কি স্থলে কি জলে যে টেলিগ্রাফে খবর চলে, ইহা প্রধানতঃ ফ্যারাডেরই প্রসাদে। কলিকাতার এডেন গার্ডেনে যে ইলেকট্রিক লাইট (তাড়িতালোক) দেখিয়াছ যাহা এখন প্রায় সকল বড় বড় সহরে প্রচলিত হইতেছে, যে আলোক সূর্য্যালোকের সমকক্ষ হইতে চায় তাহা ফ্যারাডে কর্তৃক আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক তত্বজ্ঞানের ফল। এমন কি এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আমরা যে বরফের জল পান করিয়া শীতল হই, তজ্জন্যও অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে আমরা তাঁহার নিকট ঋণী।

এই ফ্যারাডে যদি বোতল পরিস্কার না করিয়া খেলা ধূলাতে বাল্যকাল অতিবাহিত করিতেন, তাহা হইলে ডেবি তাহাকে জানিবার সুযোগ পাইতেন কি না সন্দেহ। আবার ফ্যারাডেও এই সামান্য কাজ মনোযোগের সহিত না করিলে তদপেক্ষা উচ্চতর কাজ করিতে সক্ষম হইতেন না। তবেই দেখ, যে বালক ফ্যারাডের মত কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া ছোট কাজও যত্নপূর্ব্বক করে তাহারই বড় হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভব।

৩

পেপিন ফ্রান্সের রাজা। তিনি খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। এই জন্য তাঁহার সভাসদেরা তাঁহাকে 'বেঁটে' বলিয়া উপহাস করিতেন। এক দিন একটা ষাঁড় ও একটা সিংহের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই তামাসা স্থলে রাজা সভাসদগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধ হইতেছে, ষাঁড় সিংহকে আক্রমণ করিতেছে; সিংহ পুনরায় ষাঁড়কে ধরিতে যাইতেছে। সিংহকে ষাঁড়ের উপর লম্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া রাজা উপ-

স্থিত সভ্য মণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, আপনাদের মধ্যে এমন সাহসী কেহ আছেন কি, যিনি এখন এই দুই জন্তুকে পৃথক করিতে ও উভয়কেই মারিয়া ফেলিতে পারেন ?” কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তখন সেই ‘বেঁটে’ রাজা যুদ্ধ-ভূমিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাঁহার তরবারির এক আঘাতে সিংহের মস্তক আর এক আঘাতে ষাঁড়ের মাথা কাটিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর ধীর ভাবে আসন পরিগ্রহ করিয়া, সভাসদদিগের দিকে চাহিয়া ডেবিড নামক প্রাচীনকালের এক বিক্রম সম্পন্ন রাজার কথাচ্ছলে আত্ম গৌরব প্রকাশ করিয়া বলিলেন “ডেবিড দেখিতে যৎসামান্য ছিলেন বটে কিন্তু এক গর্ব্বস্ফীত রাক্ষস তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল বলিয়া তিনি সেই রাক্ষসকে স্বয়ং বধ করেন।”

৪

বিলাতের রয়েল ইউনাইটেড সারভিস ইনিষ্টিটিউসনের এক অধিবেশনে কাপ্তেন এলেট নামক এক ব্যক্তি “ইয়ুরোপের নানা দেশে কি রূপে পায়রা দ্বারা যুদ্ধের খবর বাহকের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়” তৎসম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তার যোগে যুদ্ধের খবরাখবর চালান সকল সময় সুবিধাজনক নয় এবং অনেক সময় শত্রু পক্ষীয়েরা তাহার পথে প্রতিবন্ধক স্থাপন করিতে পারে—এই সকল দেখাইয়া পরে তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পায়রাদিগকে যুদ্ধের বার্ত্তা বাহক স্বরূপ নিযুক্ত করিবার রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধের সময় ইহাদের দ্বারা যে মহৎ উপকার সাধিত হয় তাহা দেখিয়া অনেক ইয়ুরোপীয় গবর্ণমেণ্ট স্ব স্ব দেশের স্থানে স্থানে কবুতর-আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল আড্ডাতে তাহাদিগকে নিয়মিত. শিক্ষা দেওয়া হয়। এখন জর্ম্মণিতে প্রায় ৩৫০ তিন শত পঞ্চাশটী এইরূপ আড্ডা আছে। ফ্রান্সের পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে দশটী আড্ডা আছে। প্যারিসের প্রধান আড্ডার সহিত ইহাদের সর্ব্বদাই খবর চলিতেছে। কিন্তু ফ্রান্সের অপেক্ষা জর্ম্মণির কবুতর-আড্ডা অধিকতর সুবন্দোবস্ত পূর্ণ এবং বিস্তৃত। ঐ দেশের সম্রাট নিজে ও যুদ্ধ বিভাগের অধ্যক্ষেরা ইহাতে সমুচিত উৎসাহ দান করেন। অষ্ট্রীয়া, রুষিয়া, ইতালী, পর্ত্তুগেল এই সকল দেশেও ঐ রূপ প্রণালী আছে। কিন্তু সে গুলি তত বিস্তৃত নয়।

হ চ সি।

সৌর জগতে কত চাঁদ।

আমরা জানি যথাক্রমে নিম্নোক্ত আটটি গ্রহ সঙ্গে লইয়া সূর্য্য অনন্ত পথে প্রধাবিত হইতেছে। বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি ইয়োরেণস ও নেপচুন। বুধ

শুক্র পৃথিবী মঙ্গল এই চারিটি সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহ, আর বৃহস্পতি শনি ইয়োরেণস ও নেপচুন এই চারিটি সূর্য্যের দূরবর্ত্তী গ্রহ। এই উভয় দলের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ মালা বিরাজিত থাকিয়া ইহাদের এইরূপ ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছে। এই আটটির মধ্যে প্রথম ছয়টি বহু পুরাতন কাল হইতে সৌর জগতের গ্রহরূপে মানবদিগের নিকট পরিচিত, কিন্তু অবশিষ্ট দুইটি দুরবীণের আবিষ্কারের পর অল্পদিন মাত্র পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছে। এইত সৌরজগতে পৃথিবী লইয়া আটটি গ্রহ—কিন্তু আমাদের চাঁদের মত চাঁদ কত ?

দূরবীণ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে, পৃথিবীর এই চাঁদটি ছাড়া অন্য উপগ্রহের অস্তিত্ব কাহারো জানা ছিল না, তাহার পর একটি আধটি নয় এরূপ কত চাঁদ দূরবীণের ফাঁদে পড়িয়াছে।

বৃহস্পতির চারিটি চাঁদই দূরবীণের প্রথম আবিষ্ক্রিয়া এবং গেলিলিওই ইহাদের আবিষ্কর্ত্তা। কিন্তু তখনকার পণ্ডিতগণ এ আবিষ্কার প্রথমে গ্রাহ্যই করেন নাই, তাঁহারা জানিতেন আরিষ্টটল যাহা বলিয়া যান নাই তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। যখন গেলিলিও সূর্য্যের কলঙ্ক দর্শন করিয়া তাহা প্রকাশ করেন—তখন সে কথা শুনিয়া এক জন পণ্ডিত যেমন বলিয়াছিলেন, তাহা সূর্য্যের কলঙ্ক নহে, গ্যালিলিওর চক্ষের কলঙ্ক, সেইরূপ বৃহস্পতির চাঁদের কথা শুনিয়া বিখ্যাত জ্যোতিষী ক্লভিয়াস প্রথমে বলিলেন দূরবীণ চন্দ্রময় না হইলে ত বৃহস্পতির চাঁদ দেখা যাইবে না" কিন্তু ইহার পর স্বয়ং দূরবীণ দিয়া যখন প্রত্যক্ষ রূপে বৃহস্পতির চাঁদগুলি ক্লভিয়াস দেখিতে পাইলেন, তখন অবশ্য তাঁহার মতান্তর হইয়া গেল। আর একজন পণ্ডিত, তিনি আবার ক্লভিয়াস হইতেও অধিক সাবধানী, তিনি দূরবীণ দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান নিরীক্ষণ করিতে পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হইলেন, কি জানি যদি শেষে চাঁদগুলি দেখিয়াই ফেলেন, তখন এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে! এই ঘটনার কিছু দিন পরে এই পণ্ডিতের মৃত্যু হয়—তখন গেলিলিও ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন আশা করি তিনি স্বর্গের পথে যাইতে যাইতে এই চাঁদদের দেখিয়া গিয়াছেন—"I hope that he saw them while on his way to heaven" বৃহস্পতির এই চন্দ্রগুলির সকলেরই আয়তন প্রায় সমান—চারিটিই প্রায় ১০০০ ক্রোশ পরিমিত ব্যাসযুক্ত। কিন্তু বৃহস্পতি হইতে ইহাদের দূরত্ব সকলের পক্ষে সমান নহে, সেই জন্য ইহাদের প্রদক্ষিণ কালের পরিমাণও এক নহে। বৃহস্পতির নিকটতম প্রথমটি দুই দিনেরও কম সময়ে বৃহস্পতিকে একবার প্রদক্ষিণ করে, দ্বিতীয়টির বৃহস্পতির চারিদিকে একবার ঘুরিতে সার্দ্ধ তিন দিন লাগে, তৃতীয়টি সাত দিন তিন ঘণ্টায় এই প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করে—আর চতুর্থটি যেটি সকলের অপেক্ষা বৃহস্পতি হইতে দূরবর্ত্তী সেইটি একবার প্রদক্ষিণ করিতে ১৬ দিনেরও কিছু বেশী সময় গ্রহণ করে। পৃথিবী যেমন আপনার কক্ষের উপর

কৌণিকভাবে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে সেইরূপ বৃহস্পতির সকল চন্দ্রগুলিই কক্ষের উপর কৌণিক ভাবে থাকিয়া গ্রহ প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু ইহাদের অবস্থিতির কৌণিকত্বের পরিমাণ অতি অল্প, সেই জন্য ইহারা যখনি সূর্য্য ও বৃহস্পতির মধ্য দিয়া যায়—তখনি বৃহস্পতির কোন না কোন অংশ হইতে সূর্য্য গ্রহণ দৃষ্ট হয়। কেবল চতুর্থ চাঁদটি কিছু অধিক কৌনিক ভাবে কক্ষে অবস্থিতি করে, সেই জন্য প্রত্যেক প্রদক্ষিণের সময় এ চাঁদটি সূর্য্য ও বৃহস্পতির সম রেখায় না পড়িয়া এই রেখার নীচে কিম্বা উপর দিয়া চলিয়া যায়, কাজে কাজেই এইরূপ ঘুরিয়া যাইবার সময় সকল বারে বৃহস্পতিতে সূর্য্য গ্রহণ দেখা যায় না কিন্তু এই কারণেই প্রতিবারে সেখানে চন্দ্র গ্রহণ উৎপত্তি হয়—কেননা এইরূপে বৃহস্পতির ছায়া চন্দ্রে আসিয়া পড়ে, কিন্তু চন্দ্রের ছায়া সূর্য্যের উপর পড়ে না।

বৃহস্পতির চারিটি চন্দ্র, শনির আবার আটটি চন্দ্র। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে হাইগেন্স প্রথমে শনির একটি চাঁদ দেখিতে পান। ইহার বার বৎসর পর হইতে আরম্ভ করিয়া দুই চারি বৎসরের মধ্যে ক্যাসিনি আর চারিটি চন্দ্র আবিষ্কার করেন। ক্যাসিনি একজন ফরাসীশ জ্যোতিষী। ইহাঁ কর্তৃক একেবারে চারিটি চন্দ্র আবিষ্কৃত হওয়াতে ফ্রান্স আপনাকে মহা গৌরবান্বিত মনে করিল। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আবিষ্কর্ত্তাকে মেডল উপহার দিয়া মান প্রদান করিলেন। প্রায় এক শতাব্দীর ও অধিককাল চলিয়া গেল—এই ৫টী উপগ্রহ ছাড়া শনির অন্য চাঁদ আছে ইহা বৈজ্ঞানিকগণ জানিলেন না। পরে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে হারসেল আবার দুইটি নূতন উপগ্রহ দেখিতে পাইলেন, সর্ব্বশেষে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হাবার্ট কলেজের পর্য্যবেক্ষণ গৃহ হইতে বণ্ড শনি-চক্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে শনির অষ্টম চন্দ্র দেখিতে পাইলেন। যে দিন হার্বাট কলেজ হইতে শনির এই অষ্টম চাঁদ ধরা পড়িল তাহার দু এক দিন পরে ইংলণ্ডের লাসেল ইংলণ্ডেও ইহাকে দেখিতে পাইলেন।

শনির এই চন্দ্রগণ এত দূরে যে দূরবীন ইহাঁদের ভালরূপে আপনার আয়ত্ত মধ্যে আনিতে পারে নাই। বৃহস্পতির চাঁদের ন্যায় ইহাদের গ্রহণ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া ইহারা আপনার কক্ষে এতটা কৌণিক ভাবে থাকিয়া ঘোরে—যে সচরাচর ইহাদের গ্রহণও হইতে পারে না। সূর্য্যে ইহাদের ছায়া পড়িয়া গ্রহণ হইবার জন্য সূর্য্যের সঙ্গে ইহাদের সমরেখায় আসা চাই, কিন্তু ইহাদের কক্ষের কৌণিকত্ব এত অধিক অর্থাৎ ইহারা আপনার কক্ষের উপর এতটা বাঁকিয়া আছে, যে বৃহস্পতিকে ঘুরিয়া যাইবার সময় প্রায়ই সূর্য্যের উপর কিম্বা নীচ দিয়া চলিয়া যায় সূর্য্যের সমসূত্রপাতে পড়ে না।

ইয়ুরেনসের চন্দ্র চারিটি। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে হার্সেল দুইটি চন্দ্র দেখিতে পান, এবং সে দুইটি ছাড়া আরো চারিটি উপগ্রহ আছে এই অনুমান করিয়া শনির আশপাশে অনেক পর্য্যবেক্ষণ করেন—কিন্তু তিনি তখন আর একটিও দেখিতে পান নাই—ইহার

অর্দ্ধ শতাব্দী পরে—হারশেলের দূরবীণ হইতে একটি অধিক ক্ষমতাশালী দূরবীণ দিয়া লাসেল আর দুইটি চন্দ্র দেখিতে পান। তাহার পর বহু অনুসন্ধানেও এ পর্য্যন্ত ইয়োরেণসের আর একটি উপগ্রহ আবিষ্কার হয় নাই, সেই জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন সম্ভবতঃ এই চারিটি ছাড়া ইয়োরেণসের আর উপগ্রহ নাই। যে দুটি হার্শেল আবিষ্কার করেন তাহার প্রথমটি অর্থাৎ যেটি ইয়োরেণসের নিকটবর্ত্তী সেটি ১৩ দিনের কিছু কম সময়ে একবার গ্রহ প্রদক্ষিণ করে অপরটি সাড়ে তের দিনে একবার ঘোরে। আর লাসেলের একটি আড়াই দিনে ও অপরটি ৪ দিনে তাহাদের প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে লাসেলের চাঁদই ইয়োরেণসের নিকট-বর্ত্তী চাঁদ।

সৌর জগতের অন্য গ্রহ উপগ্রহ হইতে এই চন্দ্রগুলির একটি দারুণ বিশেষত্ব দেখা যায়; অন্য গ্রহ উপগ্রহ সকলেই আপন ভ্রমণ পথের উপর সামান্যতঃ বাঁকিয়া ভ্রমণ করে—কিন্তু ইহাদের কক্ষ এত বাঁকা অর্থাৎ ইহারা আপনাদের কক্ষের উপর এত দূর বাঁকিয়া আছে যে ইহাদের কক্ষ ইয়োরেণসের কক্ষের উপর প্রায় সোজাভাবে স্থিত Nearly perpendiculor to the ecliptic. অত্যন্ত দূরদর্শী ক্ষমতাশালী দূরবীন নহিলে ইয়োরেণসের এই চন্দ্রগুলি দেখা যায় না—ইহারা এতই দূরে অবস্থিত।

নেপচুনের একটি মাত্র উপগ্রহ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেপচুন আবিষ্কৃত হইবার কিছু পরেই লাসেল অনেকবার ইহার কাছাকাছি একটি ক্ষুদ্র আলোক বিন্দু দেখিতে পান, পর বৎসরেই তাহা একটি উপগ্রহ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ১৮১৭ হইতে ৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই উপগ্রহটিকে ক্যামব্রিজে বণ্ড—এবং পালকোয়াতে ষ্ট্রাব দেখিতে পান। ইহার কক্ষ গ্রহ কক্ষের উপর ৩০ ডিগ্রি পরিমাণে অবনত। ৫ দিন ২১ ঘণ্টায় ইহা একবার নেপচুনকে প্রদক্ষিণ করে এই উপগ্রহটি অতি দূরদর্শী দূরবীনের নিকটেও একটি বিন্দুর মত দেখায়।

এইত আমরা দেখিলাম সূর্য্যের দূরবর্ত্তী সকল গ্রহগুলিরই উপগ্রহ আছে এখন নিকটবর্ত্তী গ্রহগুলির কথায় আসা যাক।

ইহাদের মধ্যে পৃথিবীর উপগ্রহের কথা আর বলিতে হইবে না। পৃথিবীর চন্দ্র পৃথিবীর লোকের নিকট অলঙ্করূপে প্রকাশিত। পৃথিবী ছাড়া অন্য তিনটি (বুধ শুক্র মঙ্গল,) গ্রহের উপগ্রহ নাই বলিয়াই অনেকদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ জানিতেন, সবেমাত্র ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের আগষ্টমাসে অধ্যাপক অ্যাসাফ হল কর্ত্তৃক ওয়াসিংটন নগর হইতে মঙ্গলের দুইটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কারে বিজ্ঞান জগতে মহা জয় ধ্বনি পড়িয়া গিয়াছিল। হোমরের কাব্যে মঙ্গলের দুই রথাশ্বের যে নাম—সেই নামে হল এই চাঁদ দুটির নামকরণ করিয়াছেন। একটির নাম ফোবস্ একটির নাম ডিমস্। ফোবস ৭ ঘণ্টা আটত্রিশ মিনিটে একবার এবং ডিমস ৩০ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে একবার মঙ্গল প্রদক্ষিণ করে, ইহারা এত ক্ষুদ্রায়তন যে ইহাদের ব্যাস রেখা সম্ভবতঃ ৫ ক্রোশও

নহে। মঙ্গলের নিকটবর্ত্তী চন্দ্র ফোবস মঙ্গলের পৃষ্টদেশ হইতে ২০০০ ক্রোশ হইতেও কম দূরে অবস্থিত। যদি মঙ্গলে মানুষ থাকে—ত তাহারা পৃথিবীর দূরবীনের মত দূরবীন দিয়া স্বচ্ছন্দে সেই চন্দ্রের জীবদিগের গতিবিধি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতে পারে।

মঙ্গল ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে এক একবার আপনার চারিদিক প্রদক্ষিণ করে, আর ফোবস ৭ ঘণ্টা ৩৮ মিনিটে একবার মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে তাহা হইলে মঙ্গলের একটি দিন রাতের মধ্যে ফোবস তিনবার উদয় অস্ত হইয়া যায়—কিন্তু ডিমশ মঙ্গলকে ৩০ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে প্রদক্ষিণ করে কাজেই ফোবস যেমন দ্রুতগামী—ডিমশ তেমনি ধীর গামী। আর একটি কথা এই, যদি গ্রহ হইতে উপগ্রহের গতি মৃদু হয়—ত উপগ্রহকে পূর্ব্বে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখা যায়—সেই জন্যই আমরা চাঁদকে পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখি—ডিমশও সেই জন্য মঙ্গলের পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। কিন্তু যদি গৃহ হইতে উপগ্রহের গতি দ্রুত হয় তাহা হইলে উপগ্রহ পশ্চিমে উঠিয়া পূর্ব্বে অস্ত যাইবে। যেমন যদি সূর্য্য হইতে পৃথিবীকে কেহ দেখে ত তাহারা পৃথিবীকে পশ্চিমে উদয় হইতে দেখিয়া পূর্ব্বে অস্ত যাইতে দেখিবে, ফোবসও মঙ্গলের পশ্চিমে উঠিয়া পূর্ব্বে অস্ত যায়। একটি চাঁদে রক্ষা নাই, মঙ্গলে এক সময়ে দুই চাঁদ উদয় হইয়া না জানি কিরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয়! মনে কর একটি চাঁদ মঙ্গলের পূর্ব্ব একটি চাঁদ পশ্চিম হইতে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পর পশ্চিমের চাঁদটি দ্রুতগতিতে ঘণ্টায় ৪৫ ডিগ্রি উঠিয়া চার ঘণ্টার মধ্যে অন্য ধীরগতি চাঁদটির কাছে পূর্ব্ব দিকবলয়ের কিছু উপরে আসিয়া উভয়ে মিলিতেছে, দুই চাঁদের কিরণ রাশিতে চারি দিক ঝকমক করিতেছে; মঙ্গলের সে শোভা কি অপরূপ শোভা!

মঙ্গলের উপরই পৃথিবী; পৃথিবীর উপর শুক্র। শুক্রের চন্দ্র আছে কি না ইহা এখনো জানা যায় নাই। দূরবীনের আবিষ্কার অবধি এখন পর্য্যন্ত অনেকেই অনেকবার শুক্রের কাছে একটি আলোক বিন্দু দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু এ বিন্দুটি এত অল্প ক্ষণের জন্য দেখা গিয়াছে যে ইহা চন্দ্র কিনা তাহা এখনো কেহ ঠিক করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত হুজো এ সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে বলেন যদিও শুক্র ও এই আলোকবিন্দুরূপী জ্যোতিষ্কটি অনেক সময় পাশাপাশি আসিয়া পড়ে তথাপি ইহা শুক্রের প্রকৃত উপগ্রহ হইতে পারে না, কেন না ইহা মাঝে মাঝে শুক্র হইতে এত সরিয়া পড়ে যে উপগ্রহ হইলে কথনই তাহা হইত না, অথচ মাঝে মাঝে শুক্রের সহিত ইহা যেরূপ সম্বন্ধে আসিয়া পড়ে তাহাতে মনে হয়—কোন সময়ে ইহা শুক্রের উপগ্রহ ছিল তাহার আকর্ষণ ছাড়াইয়া এখন সে পলাইয়া গেছে, সম্ভবতঃ ইহা শুক্রের পলাতক উপগ্রহ,—যেমন—যদি চন্দ্রকে আমরা তাহার এখনকার কক্ষ হইতে সরাইয়া পৃথিবী হইতে আরো কিছু দূরে রাখিতে পারি—ত সে পৃথিবীর আকর্ষণ বহির্ভূত হইয়া কেবল সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবে, পৃথিবীকে আর যথা পথে—যথা নিয়মে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইবে না—সেইরূপ—।

গ্রীক দেবী নিথের নামে হুজো ইহার নাম নিথ রাখিয়াছেন; দেবী নিথের ঘোমটা কেহ খুলিতে পারে নাই—নিথ চাঁদিমার ঘোমটাও এখন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ খুলিতে অক্ষম।

আমরা দেখিয়া আসিলাম শুক্রের চাঁদ আছে বলিয়া প্রমাণ না হইলেও থাকিতেও পারে এই পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন কিন্তু বুধের কোন উপগ্রহের এরূপ সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাঁহারা এখনো ধরিতে পারেন নাই।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

সহজে গান অভ্যাস।

"গাও তাঁরে গাও সদা" এই গানটির তাল চৌতাল। চৌতালে ছয়টি করিয়া পরিচ্ছেদ। ইহার চারিটি তাল আর দুইটি ফাঁক। সময় বিভাগের হিসাবে তাল এবং ফাঁক একই। চারিটি তাল ও দুইটি ফাঁক না দিয়া যদি ছয়টি তাল দেওয়া যায় তাহা হইলেও কাল মাত্রার কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। ইহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ দুইটি করিয়া মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে।

রাগ গৌড় মল্লার—তাল চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও সদা তরুণ ভানু যবে অচেতন জগতে দাও প্রাণ।

জন হৃদয় প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগন মেদিনী মহেশের মহৎ যশ ঘোষো বারিদ, সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম বনরাজি অগ্নি তুষার, কেহই থেক না নীরব। যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে আনন্দ-রবে গাও বিশ্ব বিজয়ী ব্রহ্ম নাম; সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।

রাগ গৌড় মল্লার—তাল চৌতাল।

৩ ০ ৪ ০ ১ ২
নি॰ধা॰নি॰ধা॰ধা—সানী—না—না—। সা—নীসা—রে॰সা॰সা—নীসা॰ধা॰ (নি ধা
গা ও তাঁ রে গা ও স দা

৩ ০ ৪ ০ ১ ২
নি পা)—। পা॰ম॰পা॰ম॰পা—নি॰ধা॰সা॰নী॰সা॰ধা॰। নি॰ধা॰পা—ম—নি॰ধা॰পা—
ত রু ণ ভা নু য বে অ চে

৩ ০ ৪ ০ ১ ২
ম॰গ॰। ম॰গ॰গ॰ম॰রে—রে—সা—রে—। ম॰গ॰রেগ — ম — রে— — গৃসা—।
ত ন জ গ তে দা ও প্রা ণ

৩ ০ ৪ ০ ১ ২ ৩ ০
—ম—ম—ম—ম—ম—। ম—পা— —ধা—॰ম॰ম॰পা॰। মপা—সা—নীসা॰ধা॰নি॰
জ ন হৃ দ য় প্র ফু ল্ল ক র চ ন্দ্র তা

৪ ০ ১ ২ ৩
ধা॰নি॰পা॰পম—। নি॰ধা॰নি॰ধা॰নি॰ধা॰নি॰ধা॰নি॰পা॰পা॰ম॰। নি॰ধা॰নি॰ধা॰
রা স বে মি লে মি লে গা

০ ৪ ০ ১ ২ ৩
ধা—সানী—সা—সা—। সা—নীসা—রে॰সা॰সা—নীসা॰ধা॰ (নি ধা নি পা)—। পা—
ও তাঁ রে গা ও স দা সু

পা॰ম॰নি—ধা—সা—সা—। সা—সা—সা—সা—সা——। সা—র্সা—সা—সা—
গ ভী র গ র জ নে কাঁ পা ই য়ে

সা—সা—। সা—সা—র্সা—রে—সা—সা॰ধা॰। সা॰সা॰—র্গা—গা——গা—।
গ গ ন মে দি নী ম হে শে র

গা॰গা॰—র্রে—সা॰নী॰সা—সা—। সা॰নী॰রে—সা—নি ধা॰ (নি ধা নি)—পা—।
ম হ ৎ য শ ঘো ষ বা রি দ

সা॰নী॰সা —নি॰ধা॰নি॰ধা॰নি॰পা॰পা॰ম॰। নি॰ধা॰নি॰ধা॰ধা—র্সা নী—সা—সা—।
স বে মি লে মি লে গা ও তাঁ রে

সা—র্সা—রে॰সা॰সা—র্সা॰ধা॰ (নি ধা নি পা)—। ম—ধা—পা—ধা॰পা॰ধা—ধা—।
গা ও স দা প্র ব ল সি ন্ধু

ধা—সা—র্সা—সা নী॰সা॰ধা॰ (নি ধা নি পা)—। পা॰ম॰পা॰ম॰পা — নি॰ধা॰সা॰
স্রো ত স্ব তী প্র ফু ল্ল কু সু

নী॰সা—। নি॰ধা॰পা—ম॰গ॰ম॰গ॰র্ম—রে—। রে॰রে॰ধা—পা—ধা॰ম॰পা॰ম॰পা—।
ম ব ন রা জি অ গ্নি তু ষা র

ম॰গ॰ম॰গ॰ম॰রে॰ম॰রে॰—র্সা—। র্সা—ম—র্ম—পা—র্পা—সা—। র্সা—॰
কে হ ই থে ক না

নি॰নি॰ধা॰নি॰পা॰পা॰পা॰—। পা—পা—ম—নি॰ধা॰সা সা—। সা॰সা॰ — রে॰
নী র ব য ত বি হ ঙ্গ চি ত্র বি

সা॰সা—নি॰সা॰—। সা॰সা॰—র্সা—সা—র্সা—রে॰সা॰। — র্সা॰নী॰সা॰নী॰
চি ত্র স দা আ ন ন্দ র বে

সা॰ধা॰নি॰ধা॰—। ধা——সা—রে—ম॰গা॰ম॰গা॰। ম॰গা॰ম॰রে॰সা—সা॰সা॰সা—
গা ও বি শ্ব বি জ য়ী

নিরে—। সা॰নী॰সা॰নী॰সা॰ধা॰নি॰ধা॰নি॰পা॰পা—। সা॰নী॰সা — নি॰ধা॰নি॰
ব্র হ্ম না ম স বে মি লে

ধা॰নি॰ধা॰পা॰ম॰।
মি লে।

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রেসমতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড। বৈষয়িক তত্ব হইতে উদ্ধৃত ও পরিবর্দ্ধিত। আমাদের দেশে রেশম ব্যবসা কত সহজ, কিরূপ লাভ জনক, এবং আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর পক্ষেই ইহা কিরূপ উপযোগী—যিনি এই বইখানি পড়িবেন তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন। একস্থল হইতে আমরা নিম্নে এ সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

"সাধারণত বঙ্গসমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—১ম কৃষক শ্রেণী, ২য় মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণী ও তৃয় মহাজন বা ধনী শ্রেণী। রেসম ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্যও তিন ভাগে বিভক্ত করিলে ঠিক এই তিন শ্রেণীরই লোকেরই যে উপযোগী তাহা দেখা যাইবে। রেসমের ব্যবসায়ের কার্য্য এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

(১) রেসম পোকা প্রতিপালনের জন্য তুঁতের আবাদ করা।

(২) তুঁত ক্রয় করিয়া রেসম পোকা প্রতিপালন করা ও কোয়া প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা।

(৩) কোয়া ক্রয় করিয়া যন্ত্রে রেসম সুতা প্রস্তুত করা ও তাহা বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা। রেসম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা।

প্রথম শ্রেণীর কার্য্য বঙ্গীয় কৃষক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য অর্থহীন ও শ্রম কাতর বঙ্গীয় ভদ্র যুবকগণ (এবং স্থল বিশেষে ভদ্র মহিলারাও) ও তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্য বঙ্গের ধনশালী ব্যক্তিগণ (যাঁহারা কারখানা ও যন্ত্র ইত্যাদি স্থাপন করিবার জন্য অধিক মূলধন ব্যয় করিতে সক্ষম) অনায়াসে সুবিধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন।"

রেসমের কারখানা করা অধিক ধনসাধ্য ব্যাপার, তাহার প্রণালী অর্থাৎ কীট হইতে কলে সুতা প্রস্তুত করিবার নিয়মাদি লেখক দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কিন্তু রেসম ব্যবসায়ের পূর্ব্বোক্ত যে দুই বিভাগে সাধারণ সকলেই হাত দিতে পারেন—তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা আবশ্যক—অর্থাৎ রেসম কীটের খাদ্য—তাহার আবাদ, কীট পালন—ইত্যাদি সমস্তই এই পুস্তক হইতে বিস্তারিত রূপে জানা যায়। এক কথায় বইখানি বড় ভাল হইয়াছে, কিন্তু বইখানির আমরা অধিক প্রশংসা করিব কিম্বা লেখক কুমাব শশীশেখরেশ্বরের অধিক প্রশংসা করিব—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আজ কাল কথায়, বক্তৃতায় দেশহিতৈষিতা, উদারতা দেখাইতে অনেককে দেখা যায়—কিন্তু যথার্থ দেশের জন্য নিঃশব্দে কাজ করিতে ইঁহার মত কয় জন আছেন জানি না। ইনি শিল্প ও কৃষি পত্রিকা নামে একখানি কাগজ ছাপাইয়া কৃষি কার্য্যের উন্নতির জন্য বিনা মূল্যে কৃষকদের বিতরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কেবল বিতরণ করিলেও ত কাজ হয় না—অনেক কৃষকেরা পড়িতেই জানে না, সুতরাং পাঠাক্ষম কতকগুলি কৃষককে একত্র করিয়া যাহারা এই কাগজ পড়িয়া শুনায় তাহাদের ইনি পুরস্কার দিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া অনেক বীজ ইনি বিনা মূল্যে কৃষকদিগকে দান করেন। বৈষয়িকতত্ব বলিয়া ইঁহার আর একখানি ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় পত্রিকা আছে, ইহা হইতে অনেক প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিয়া দেশের ব্যবসায়েরা উন্নতির জন্য ইনি বিনা মূল্যে দান করেন, রেসমতত্বও আপনার ব্যয়ে ছাপাইয়া বিনা মূল্যে (যথার্থই বিনা মূল্যে, আজ কালকার ক্যাসনের বিনা মূল্য নহে) অর্দ্ধেক বিতরণ করিয়াছেন, অর্দ্ধেকের সত্ব রাজসাহীর কৃষি কার্য্যালয়ে দান করিয়াছেন।

এখন অন্য কাজ কর্ম্মহীন জীবিকান্বেষী বাঙ্গালীগণ এই পুস্তকখানি পড়িয়া রেশম কীটের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া লেখকের উদ্দেশ্য সাধন করুন এই প্রার্থনা। বই খানি পড়িলে অনেকেরই যে রেসম ব্যবসা করিতে ইচ্ছা হইবে—ইহা আমাদের বিশ্বাস।

হ্যারল্ড এণ্ড কোম্পানি

সকল প্রকার বাদ্য যন্ত্রের আমদানি কারক।

উন্নতি সাধিত
হারমনি ফ্লুটস্
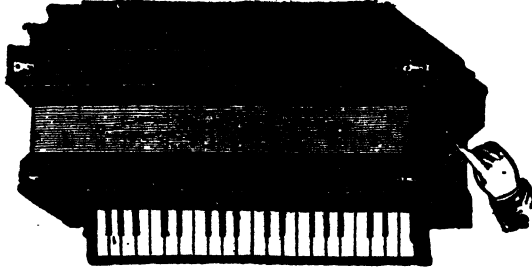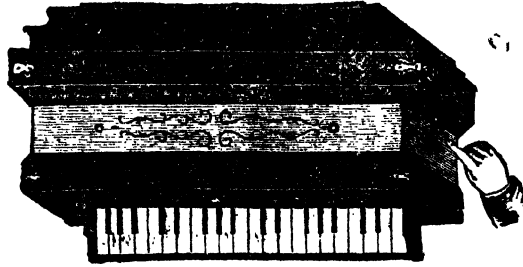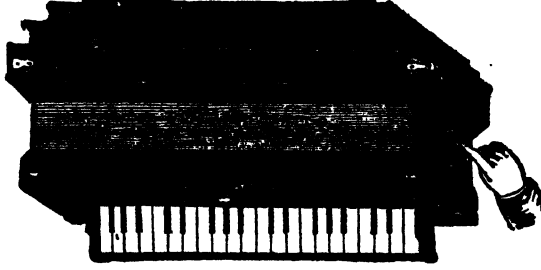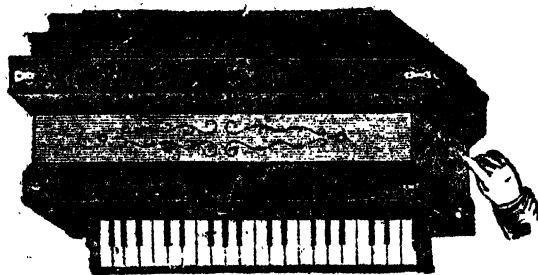
উন্নতি সাধিত
হারমনি ফ্লুটস্

নগদ মূল্য।

৩ অক্টেভ,	১ ষ্টপ যুক্ত	বাক্স মধ্যে		৪০৲ টাকা।
৩ ঐ	ঐ	ঐ	(উৎকৃষ্ট)	৫০৲ ঐ।
৩ ঐ	৩ ষ্টপ	ঐ		৭৫৲ ঐ।
৩½ ঐ	১ ষ্টপ	ঐ		৯০৲ ঐ।
৩½ ঐ	৩ ষ্টপ	ঐ		৯৫৲ ঐ।

নূতন হ্যারল্ড ফ্লুটস।

বাঙ্গলা এবং হিন্দুস্থানী গত বাজাইবার বিশেষ উপযোগী।

আমাদিগের মূল্যের তালিকা দেখিলেই ইহার দাম ও অন্যান্য সমস্ত জানা যাইবে।
মূল্যের তালিকা পত্র লিখিলেই বিনা ব্যয়ে প্রাপ্ত হইবেন।

সুলভ ভায়োলিন (বেহালা), সুলভ ভায়োলিন (বেহালা)।

নগদ মূল্য।

ভায়োলিন বেহালা	(বাক্স ও ছড়ি ব্যতীত)	প্রতিটা	৫৲ টাকা।
ঐ	(ছড়ি সহিত কিন্তু বাক্স ব্যতীত)	ঐ	১০৲ ঐ।
ঐ	(ঐ ঐ) উৎকৃষ্ট	ঐ	২৫৲ ঐ।
ঐ	(ঐ ঐ) ঐ	ঐ	৩০৲ ঐ।
ঐ	(ঐ বাক্স সহিত)	ঐ	৪০৲ ঐ।
ঐ	(ঐ ঐ)	ঐ	৫০৲ ঐ।

সুলভ কর্ণেট—সুলভ কর্ণেট।

নগদ মূল্য।

এই সুনির্ম্মিত, সর্ব্বত্র প্রশংসিত, আদর্শ স্বরূপ যন্ত্র বাক্স সহিত ... ৪৫৲ টাকা।
সোপ্রানো কর্ণেট (in E 6) বাক্স সহিত ... ... ৪০৲ টাকা।
হারমোনিয়ম ... ... ৭৫৲ টাকা হইতে।

হ্যারল্ড এণ্ড কোম্পানি।
৩নং ডেলহৌসী স্কয়ার, কলিকাতা।

১৫ই আশ্বিন পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত রূপ সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

এই সকল পুস্তক কলিকাতা—৪৭ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, আদিব্রাহ্ম সমাজ যোড়াসাঁকো, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি যোড়াসাঁকো, কেনিং লাই-ব্রেরি ৫৫নং কালেজষ্ট্রীট, কালেজ লাইব্রেরি ৬৩নং কালেজষ্ট্রীট, চাটুর্জ্জি ব্রাদার্স ৬৬ নং কালেজ ষ্ট্রীট ও মেডিকেল লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

	সুলভ মূল্য	পোষ্টেজ।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধরস্বামি কৃত টীকা, অনুবাদ, ভূমিকা, গীতামাহাত্ম্য ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির জীবনচরিত সহিত মূল্য ৫৲ টাকা স্থলে কাপড়ের সম্পূর্ণ বাঁধাই	৩॥০	।০
হাফ কাপড় বাঁধাই	৩৲	।৶০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম সংস্করণে ১৫০০ হাজার পুস্তক ছাপান হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল ৩০০ তিন শত পুস্তক মাত্র মজুদ আছে, যাঁহারা সুলভ মূল্যে পুস্তক পাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা শীঘ্র মূল্য পাঠাইবেন।

পরাশর সংহিতা। মূল, বঙ্গানুবাদ ও আতিথ্য ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, বীরধর্ম্ম, বিধবার বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ ইত্যাদি সমালোচনা মূলক সুদীর্ঘ ভূমিকা সহিত। মূল্য ১ টাকা স্থলে	॥০	/৮
সাধক সঙ্গীত। ইহাতে অবতরণিকা, মহাশক্তি, শাক্ত সম্প্রদায়, ষটচক্র ভেদ, দশমহাবিদ্যাও জীবনচরিত সহ রামপ্রসাদের সমস্ত শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত, নবদ্বীপ রাজবংশের ইতিহাস ও তাহাদের সঙ্গীত; নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, কুঁচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ, বর্দ্ধমানের ও ত্রিপুরার দেওয়ান মহাশয়দ্বয়, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিখ্যাত শক্তি উপাসকদিগের ৫০০ গান সংগৃহীত হইয়াছে ১।০ স্থলে	১৲	/১০

দারুব্রহ্ম। ইহাতে বিষ্ণুর দ্বাবিংশ অবতার, দশ অবতার, বুদ্ধ অবতারের পৌরাণিক বর্ণনা আছে। উৎকল দেশীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত জগন্নাথ বা দারুব্রহ্মের বিবরণ, বুদ্ধদেবের জীবন চরিত, বুদ্ধদন্তের ইতিহাস ও উপসংহার প্রভৃতি আছে। সংস্কৃত, উড়িয়া ও বৌদ্ধগ্রন্থে জগন্নাথ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তৎসমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে মূল্য ॥০ স্থলে ... ।০ ৵১০

মোহমুদ্গর। শঙ্করাচার্য্য প্রণীত; বঙ্গানুবাদ সহিত। মূল্য ⁄১০ স্থলে (৫ খানা পর্য্যন্ত... ... ⁄০ ৵১০ আনা পোষ্টেজে যাইয়া থাকে)।

সেনরাজগণ। বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজ বংশের প্রকৃত ইতিহাস। প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে, অল্প কয়েক খানি পুস্তক কেবল আদিব্রাহ্ম সমাজ ও কেনিংলাইব্রেরিতে আছে—মূল্য ১৲ টাকা স্থলে... ১৲ ৵১০

রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত। (প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে!) কেবল কেনিং লাইব্রেরি ও সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারিতে প্রাপ্তব্য মূল্য ॥০ স্থলে ... ।৶০ ৵১০

জোয়ানের জীবন চরিত (Joan of Arc.) স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। "ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ ও সুন্দর। গল্পটী ও মনোহর" মূল্য ॥০ স্থলে ।০ ৵১০

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

পরমহংস পরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত মিতাক্ষরা নামক টীকা, বঙ্গানুবাদ, সুদীর্ঘ ভূমিকা ও যাজ্ঞবল্ক্যের জীবনী সহিত। সুবৃহৎ গ্রন্থ।

মূল্য ৩৲ টাকা কিন্তু অগ্রিম মূল্য ১॥০ টাকা ও ডাক মাসুল ৶০ আনা। এই গ্রন্থের চারিশত গ্রাহক হইলেই মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। তন্মধ্যে ১০০ হইয়া গিয়াছে। আর তিন শত গ্রাহক হইতে কেবল ১॥০ টাকা হিসাবে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যাইবে। তৎপর ঐ মূল্যে আর কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।
৪৭ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সিন্ধু কাহিনী।

পরিশিষ্ট।

সিন্ধু ভূগোল। } সিন্ধু দেশ (গ্রীকদের সিন্দমানা) প্রাচীন কাল হইতে তিন ভাগে বিভক্ত দক্ষিণ উত্তর ও মধ্য সিন্ধু। লার, অথবা দক্ষিণ সিন্ধু হাইদ্রাবাদের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। করাচী ও ঠাট্টা এই অঞ্চলের দুই প্রধান সহর। পূর্ব্বকালে

করাচী বন্দর } করাচী মক্রান প্রদেশের অন্তর্ভূত ছিল—ঐ বন্দর খেলাত-সরদারের নিকট হইতে তালপুর আমীরেরা রাজ্যসাৎ করেন ও এক্ষণে ইহা ইংরাজ সিন্ধু রাজ্যের রাজধানী। সাগর সান্নিধ্য, উত্তম আবহাওয়া, ও বানিজ্য ব্যবসার সৌকর্য্য বশতঃ করাচীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ যেখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায় সেখানে কতকগুলি শাকসবজী ফলের বাগান দৃষ্ট হয় নতুবা এ অঞ্চল সাধারণতঃ লবণাক্ত মরুভূমি। করাচীর তিন ক্রোশ

মগর পীর } উত্তরে মগর পীর নামক এক উপত্যকা আছে তাহা দর্শনীয়। ঐস্থানে কুঞ্জবন পরিবৃত একটি মন্দির ও মন্দিরের কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমন্বিত এক উষ্ণ জলাশয়, তাহাতে বড় বড় কুম্ভীর (মগর) কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় মগ্ন দেখিতে পাইবে। খর্জ্জুর বন-নিঃসৃত গন্ধকাক্ত উষ্ণ প্রস্রবন হইতে ঐ জলাশয়ের উৎপত্তি ও উহাতে স্নান মহোপকারী বলিয়া গণিত। আমি ঐ জলে গিয়া স্নান করিলাম এমন গরম যে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। মগরপীর এখানকার তীর্থের মধ্যে গণ্য। কাহারও কোন বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে সে মগরপীরে গিয়া ছাগাদি উপহার দানে কুম্ভীররাজের পরিতোষ সাধন করে।

হিঙ্গুলাজ } এ অঞ্চলের অপর একটি তীর্থস্থান হিঙ্গুলাজ। ইহা হিন্দু তীর্থ। করাচীর পশ্চিম সোনমিয়ানী বন্দরের অনতিদূরে এই তীর্থ স্থাপিত। হিঙ্গুলা দেবী কালীর নাম বিশেষ। হালা পর্ব্বত শ্রেণীর ধার দিয়া ইহার রাস্তা গিয়াছে ও অঘোর নদ পার হইয়া যাইতে হয়। এই প্রদেশ রাম কাহিনীতে পূর্ণ। নদীর ক্রোড়ে কতকগুলি তরল কর্দ্দম কুণ্ড আছে তাহা "রামচন্দ্রের কূপ" বলিয়া বিদিত। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র হিঙ্গুলাজ তীর্থ যাত্রায় বাহির হন। প্রথমে তিনি সসৈন্যে গমনোদ্যোগ করাতে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন পরে সন্ন্যাসী বেশে তথায় প্রবেশ লাভ করেন। যে স্থান হইতে তিনি যাত্রারম্ভ করেন তাহার নাম রামবাগ। যাত্রীরা রামবাগে সম্মিলিত হয় ও যে পথ দিয়া রামচন্দ্র যাত্রা করিয়াছিলেন—যেখানে তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন—যেখানে প্রথমে তাঁহার সৈন্য পরাভব হইয়াছিল সেই সেই স্থান দর্শন করত তাহারা পুরোহিত সঙ্গে গমন করে। দ্বারিকা তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া

হিঙ্গুলাজ—হিঙ্গুলাজ হইতে লাহোরের জ্বালামুখী—জ্বালামুখীর পর কুরুক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র হইতে হরিদ্বার—হরিদ্বার হইতে গয়া, কাশী—পরে মহানদী (জগন্নাথক্ষেত্র) গোদাবরী (নাসিক পঞ্চবটী) প্রভৃতি দর্শন পূর্ব্বক সেতুবন্ধ রামেশ্বর পৌঁছিতে পারিলে ভারতের তীর্থ মণ্ডল একপ্রকার প্রদক্ষিণ করা হইল।

রামবেকিয়া } গ্রীক ইতিহাসে সেকন্দরের ভারত যাত্রা উপলক্ষে 'রামবেকিয়া' নামক স্থানের উল্লেখ আছে কনিংহাম সাহেব তাহা রামবাগের অপভ্রংশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সেই ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ও এদেশে রামনাম মাহাত্ম্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঠাট্টা } ঠাট্টা মুসলমান আমলে দক্ষিণ সিন্ধুর প্রধান সহর ছিল। এক সময়ে সিন্ধুনদী ইহার প্রাচীর দিয়া বহিয়া যাইত ও যে বানিজ্য এক্ষণে করাচীর ভোগে আসিতেছে তাহা ইহারই দ্বারে আনিয়া ঢালিয়া দিত। এইক্ষণে নদী প্রায় তিন মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। ১৫২২ অব্দে এই নগর নির্ম্মিত হয় ও ১৭৪২ এ যখন নাদির সা তথায় পদার্পণ করেন তখন সেখানে ৪০০০০ ঘর তাঁতী ২০০০০ অপর শিল্পী ও ৬০০০০ বণিক সৌদাগর বাস করে এইরূপ বর্ণনা আছে।

হাইদ্রাবাদ } হাইদ্রাবাদ ঠাট্টার উত্তরাধিকারী মধ্য সিন্ধুর রাজধানী, ইহা প্রাচীন হিন্দু নগর নীরণ কোটের স্থান অধিকার করিয়া আছে ও ১৭৫৮ অব্দে গোলাম সা কাল্‌হোরা ইহার পত্তন করেন। হাইদ্রাবাদ তালপুর আমীরদের প্রিয় নিকেতন ছিল—নদী হইতে তাঁহাদের শীকার স্থানে যাতায়াতের সুবিধা তাহার এক কারণ; দুর্গের মধ্যে তাঁহাদের যে সকল সুসজ্জিত বাসগৃহ ছিল তাহা এইক্ষণে প্রায় সকলি বিলুপ্ত হইয়াছে—মীর নসীর খাঁর প্রাসাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। নিজ সহরে কতকগুলি মাটির ঘরবাড়ী,—দেখিবার মত ইমারত অট্টালিকা কিছুই নাই। দুর্গই ইহার মধ্যে শোভন দৃশ্য, সিন্ধু শাখা ফুলেলী তাহার প্রাচীর পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সহরের প্রান্তে কাল্‌হোরা ও তালপুর আমীরদের কতকগুলি সমাধি মন্দির আছে তাহা অতীব মনোহর। নদী সহর হইতে কতক মাইল দুর। সিন্দুতীর সিন্ধু বন্দর পর্য্যন্ত দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে এক সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে তাহাই হাইদ্রাবাদের রাজপথ। এই সহর রেশম ও জরির কাপড়—সূক্ষ্ম মিনার কাজ ও অন্য প্রকার কারু কার্য্যের জন্য সুবিখ্যাত।

উত্তর সিন্ধু } উত্তর সিন্ধু দক্ষিণ ভাগ হইতে অনেক তফাৎ। হাইদ্রাবাদের উত্তরে আর সমুদ্রবায়ু সেবন করা যায় না; গ্রীষ্মকালে বায়ু বন্ধ হইয়া ঐ অঞ্চল উত্তাপকুণ্ডে পরিণত হয়। ৮।৯ মাসব্যাপী গ্রীষ্মকাল—বর্ষা নাই বলিলেই হয়—কখন একটু মেঘ কিম্বা এক পসলা বৃষ্টি এইমাত্র। শীতকাল আবার তেমনি ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে মরুদেশের প্রবল বালুময় ঝড় উঠিয়া প্রকৃতি রাজ্য তোলপাড় করিয়া

তোলে। সিন্ধু নদী যেখান দিয়া গিয়াছে তাহার আশ পাশের ভূমি ফলবতী—নদী হইতে যত দূরে যাওয়া যায় ততই বালুময় মরুভূমি স্বীয় রুদ্র মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে থাকে।

সেওয়ান } উত্তর সিন্ধুতে কতকগুলি নব্য ও প্রাচীন প্রখ্যাত সহর আছে। নদীর পশ্চিমে সেওয়ান—আরবদিগের সেউইস্তান। নগরের আশপাশে অনেকগুলি সুন্দর মসজিদ ও গোরস্থান ও নগরের মধ্যে লাল সাবাজ নামক মুসলমান পীরের এক সুচারু মসজিদ বিরাজিত। লাল সাবাজ খোরাসান হইতে সমাগত সিন্ধুর একজন লোকমান্য পীর, ১২৭৪—এ সেওয়ানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধি মন্দির মুসলমানদের এক প্রধান তীর্থক্ষেত্র, বহুদূর হইতে যাত্রীরা তথায় সমাগত হয়। প্রতিবর্ষে এক একটি তরুণী কন্যকা এই গোরের সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ হয়—এই বিবাহ নাচ বাদ্য ঘোরঘটা করিয়া অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনেক ফকীর লাল-সাবাজের শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত। এই পন্থী ফকিরের দীক্ষা-বিধি কৌতূহল জনক। শিষ্যের শিরোমুণ্ডন ও মুখের ভ্রূ শ্মশ্রু সমুদয় কেশ মোচন হইলে গুরুজি তাহার মুখে কালি মাখাইয়া গলে একখণ্ড রজ্জু সংলগ্ন করিয়া সম্মুখে এক দর্পণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করেন "কেমন রূপ দেখ্‌ছ বাবা!" সে উত্তর করে "সুন্দর দেখ্‌ছি!" অনন্তর তাহার স্কন্ধে তপ্ত লৌহের দাগ দেওয়া হয় ও অঙ্গে ভস্ম লেপন হইয়া দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়—ও সে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ফকির হইয়া বাহির হয়। সেওয়ানে একটি পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। তাহা সেকন্দর নির্ম্মিত দুর্গ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

সেওয়ান ছাড়াইয়া লাডখানা—ইহা জলময় শ্রীসমৃদ্ধি সম্পন্ন উর্ব্বরা প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত।

খয়ের পুর } সিন্ধুর পরপার খয়েরপুর অবশিষ্ট তালপুর রাজ্যের রাজধানী। মীর আলি মোরাদ তাহার অধিপতি। খয়েরপুরের উত্তরে সকর বক্কর ও রোড়ী মুসলমান আমলের তিন প্রখ্যাত সহর। বক্কর সিন্ধুর ক্রোড়ে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ—পূর্ব্বে তাহা দেশের প্রবেশ দ্বার বলিয়া গণ্য হইত। এই প্রদেশে মুসলমানদের বিদ্যালয় ও তাহাদের পীর পণ্ডিতদিগের বসতি ছিল, তাই অনেকানেক গোর মস্‌জিদ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। সকর এইক্ষণকার ইংরাজ সেনালয় এক বড় ষ্টেষণ। শকরের উত্তর পশ্চিমে শিকারপুর ইহা উত্তর সিন্ধুর জজ কালেক্টরের প্রধান মহল।

শিকার পুর } এখানকার সৌদাগরেরা বাণিজ্য কার্য্যে পরিপক্ক—সমরকন্দ প্রভৃতি দূর দূর দেশে তাহাদের কারবার ও গতিবিধি।

সিন্ধু নদী } সিন্ধু নদীই সিন্ধুদেশের সর্ব্বস্ব। ইহা স্বীয় জন্মভূমি তিব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক প্রধান প্রধান নগরের মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণ প্রায় ১৭০০ মাইল বহিয়া সহস্রধারে সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইতেছে। ইহা বসুন্ধরার ফল শস্য প্রসবিনী—চলাচলের মার্গ পরিরক্ষিণী—

বাণিজ্য সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কারিণী অশেষ গুণধারিণী সিন্ধুজননী। উত্তরের বর্ষাবারি ধারা ও হিমাচলের বরফ গলিয়া এই নদীতে যে পূর প্রসূত হয় তাহা মার্চ মাস হইতে আরম্ভ—অগষ্টে পূর্ণতা প্রাপ্ত ও সপ্তম্বর হইতে হ্রাসোন্মুখ হয়। এই কয়েক মাস নদী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাপূরে ফুলিয়া উঠে ও স্রোতের বেগে বালুচর ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই পূর কতকটা বর্ষাব অভাব পূরণ করে। সিন্ধু নদী না থাকিলে সমুদয় দেশ লবণাক্ত মরুভূমিতে পরিণত হইত।

বাসন্দা। } সিন্ধুদেশে অধিকাংশই মুসলমান—অন্যত্রে হিন্দু সম্বন্ধে যেমন মুসলমান, এখানে মুসলমান সম্বন্ধে হিন্দুদের সামাজিক অবস্থা তদ্রূপ। মুসলমানদের মধ্যে কতক আদিম নিবাসী আসল সিন্ধী—কতক বা আফগান বলোচ প্রভৃতি বিদেশী মুসলমান। আফগান বা পাঠান হাইদ্রাবাদ ও উত্তর সিন্ধুতে সচরাচর দৃষ্ট হয়। ইহাদের অনেকে বংশাদি ক্রমে সিন্ধুতে আসিয়া বাস করিতেছে ও অগাধ ভূমি সম্পত্তির অধিকারী। দেখিতে ইহারা বলিষ্ঠ সুগঠন ও সুশ্রী—আসল সিন্ধী হইতে ইহাদের পার্থক্য সহজেই প্রতীয়মান হয়।

বলোচ } কাহ্লোরা রাজ্যের পত্তন কালে সিন্ধুতে বলোচ বসতি আদবেই ছিল না। কাহ্লোরা বংশধর মীর মহম্মদ অনেক লোভ দেখাইয়া দুই জন বলোচ সর্দ্দারকে দেশে ডাকিয়া আনেন—সেই যত অনর্থের মূল। এই সময় হইতে বলোচ্‌গণ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলপতি সঙ্গে দলেবলে সমুপাগত হইয়া সিন্ধুর ভিন্ন ভিন্ন উর্ব্বরা প্রদেশ অধিকার করিয়া বসে। অনতিকালের মধ্যে প্রজা রাজা অপেক্ষাও প্রতাপশালী হইয়া উঠিল ও বলোচ সর্দ্দার মীর ফতে আলি খাঁ তালপুর কাহ্লোরাদের রাজ্যচ্যুত করিয়া বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিলেন। বলোচেরা সিন্ধীদের অপেক্ষা দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও গৌরবর্ণ। শিকার ও যুদ্ধে তাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ। মীরদের আমলে বলোচদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। পরে Sir Charles Napier যখন রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন তখন তাঁহার কঠোর শাসনে ঐজাতি অল্পকালের মধ্যে বশীকৃত হয়। বশীকরণ মন্ত্রের তিন অঙ্গ—প্রথম, তাহাদের অস্ত্রহরণ, দ্বিতীয়, তাহাদের অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান তৃতীয়, তাহাদের বড় লোকদের হাত হইতে শাসন ক্ষমতা সমস্ত কাড়িয়া লওয়া। এইরূপে তাহাদিগকে নিরস্ত্র নির্ব্বীর্য্য ও খর্ব্বাধিকার করিয়া শীঘ্রই তাহাদের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

কাফ্রি { সিন্ধুতে অনেক কাফ্রিরও বসতি আছে। আমীরদের সময় বৎসরে বৎসরে আফ্রিকা হইতে ৬০০।৭০০ কাফ্রি দাস দাসীর আমদানী হইত। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া মুটে মজুর সইস্‌ চাকর ছুতার কামার এই সকল কাজে সচরাচর নিযুক্ত করা হইত—কখন কখন নিজ কর্ম্মগুণে তাহারা বিলক্ষণ কর্ত্তৃত্বপদেও আরোহণ করিত। সিন্ধী মুসলমান ও হাবসী স্ত্রীর বিবাহে সিন্ধুদেশে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়াছে।

হিন্দু } হিন্দুরা সামান্যতঃ ব্রাহ্মণ বণিক ও শূদ্র এই তিন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদের পোকর্ণ ও সারস্বত দুই শ্রেণী। পোকর্ণ ব্রাহ্মণেরা মহারাজ-ভক্ত বৈষ্ণব পন্থী। ইহারা ভাটিয়া বণিকদের পুরোহিত।

সারস্বত পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ প্রায় ২০০ বৎসর হইতে সিন্ধুতে আসিয়া বাস করিতেছেন। আচার ব্যবহার কুলশীলে ইহাঁরা বোম্বায়ের সেনই ব্রাহ্মণদের সমতুল্য, ইহাঁদের মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে।

বণিক } বণিক জাতির মধ্যে লোহানা ও ভাটিয়া এই দুই শাখা অগ্রগণ্য। মূলতানের লোহানপুর লোহানা বণিকদিগের মূল নিবাস। ঐ স্থান হইতেই তাহারা জাতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা বলোচস্থান আফগানস্থান প্রভৃতি দূরদেশে বাণিজ্য ব্যবসা সূত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ম্লেচ্ছ দেশে গমন করিলে লোহানা জাতিভ্রষ্ট হয় না। তাহাদের জাতভাইদের এই সকল বিষয়ে অধিকতর উদার দৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়।

লোহানাগণ ব্যবসা অনুসারে আমীল ও বণিক প্রধানতঃ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বণিকেরা শ্মশ্রু মুণ্ডন শিখারক্ষণ ও হিন্দুদের মত কাপড় ও পাগড়ী পরিধান করে। আমীলদের চালচলন কতকটা ভিন্ন।

আমীল } আমীলেরা সিন্ধী হিন্দুদের অগ্রণী। মুসলমান রাজত্বকালে এই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। রাজকার্য্যে বিশেষতঃ হিসাবপত্রের কাজে মুসলমান রাজাদের হিন্দুর সাহায্য ব্যতীত চলিত না। আমীলেরা আমীরদের মন যোগাইয়া চাকরী আরম্ভ করে ও ক্রমে নিজ বিদ্যাবুদ্ধি চাতুর্য্য প্রভাবে জন সমাজে বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া লয়। অন্যান্য হিন্দুদের তুলনায় আমীলেরা দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট সুশ্রী। মুসলমানদের সংসর্গে ও প্রভুদের অনুরোধে তাহারা মুসলমানদের মত বেশ ভূষা পাগড়ী ও শ্মশ্রুধারণ করে—কপালে তিলক এইমাত্র প্রভেদ। আহার পানে তাহাদের অনেকটা শাক্ত ধরণ—মদ্য মাংসে অরুচি নাই। এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আফীস ও বিদ্যালয়ে আমীলদেরই প্রাধান্য দেখা যায়—ইংরাজ রাজ্যে কি উপায়ে উন্নতি সাধন করিতে হয় তাহা তাহারা যেমন ভাল বুঝে অন্য জাতিরা তেমন বুঝে না, সুতরাং তাহারা আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—অন্যেরা পিছিয়া পড়িয়া আছে।

শিখ } এই সকল হিন্দু ভিন্ন হাইদ্রাবাদ, সেওয়ান ও অন্যান্য স্থানে অনেক শিখের বসতি প্রত্যক্ষ হয়। খাল্‌সা ও নানকসাহী তাহাদের দুই শাখা। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই শিখ ধর্ম্ম গ্রহণের অধিকারী। দীক্ষার সময় শিষ্যকে স্নান করাইয়া শিখ ঠিকানায় (ধর্ম্মশালায়) লইয়া যাওয়া হয় তথায় তিনি গুরু নানককে উপঢৌকন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পুরঃসর শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

সৎনাম কর্ত্তা পুরুখ
নির্ভউ, নির্বৈর, অকাল মূরত
অযোনি সম্ভব, গুরুপ্রসাদ
জপ—আদ সচ্, যুগাদ সচ্
হৈ ভি সচ্—নানক হোসী ভি সচ্।

শিখ ধর্ম্মশালায় উদাসী (আচার্য্য) শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া আধিপত্য করেন।

সিন্ধুদেশে হিন্দু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনেক শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বের মত এখন জোর জবরদস্তী নাই তথাপি অনেকানেক হিন্দু এখনো স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্ম আশ্রয় করে—মুসলমান হইয়াও প্রায়শ্চিত্তের পর অনেকে হিন্দুধর্ম্মে পুনরায় ফিরিয়া আসে। বিধর্ম্মীকে স্বদলভুক্ত করা, দায়ে ঠেকিয়া হিন্দুধর্ম্মের এতটুকু অবনতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। মুসলমান ও শিখধর্ম্মের সম্মিশ্রণে ইহার বিলক্ষণ রূপান্তর ঘটিয়াছে। ওদিকে আবার হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার সকল মুসলমানদের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পৌত্তলিকতার সংশ্রবে মুসলমান ধর্ম্মের একেশ্বরবাদও কলুষিত হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় হিন্দু যেমন মুসলমানের শিষ্য তেমনি আবার মুসলমানও কখন কখন হিন্দু আচার্য্যের উপদেশে দীক্ষিত হয়। মুসলমান পীরদের মধ্যে অনেকের হিন্দুনাম ও কোন কোন পীরস্থানে লিঙ্গ প্রভৃতি হিন্দুদের দেবচিহ্ন সকল উপলক্ষিত হয়। পীরপূজা সাধারণ্যে প্রচলিত, ইহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের যোগ সূত্র। এই সকল পীর ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থ হইয়া জীবের সদ্গতি সাধনে তৎপর-এই বিশ্বাসে লোকেরা পীর বিশেষের শরণাপন্ন হয়। পীরেরা অমর—পীরেরা ঐশীশক্তি সম্পন্ন—তাঁহাদেরই অনুগ্রহে যাচকের প্রার্থনা ঈশ্বর সন্নিধানে উপনীত হয়। কত অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ঘটনা তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। লোকেদের পীরমাহাত্ম্যে অগাধ বিশ্বাস। মগরপীরের যে এত মাহাত্ম্য তাহার কারণ এই যে এক জন পীর একটি ফুলকে কুমীর বানাইয়া দেন তাহারই বংশজেরা মগরপীরের জলাশয়ে বাস করিতেছে। এমন অনেকগুলি পীর আছেন যাঁদের উপর হিন্দু মুসলমানদের সমান ভক্তি তন্মধ্যে সেওয়ানের পীর লাল সাবাজ একজন গণ্য। লালসার স্তুতিবাদ পীর-ভক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে প্রকটিত হইল।

পীর মহাপীর তুমি রাজ রাজেশ্বর,
শঙ্কট সহায় ভবে সর্ব্ব দুঃখ হর।
তব ধন্য পুণ্য নাম নিখিল প্রচার
তাপিত জনের তুমি হর তাপভার।
পাথর সুবর্ণ হয় তব কৃপাগুণে,
আশ্রয় ভেলায় তব তরে পাপী জনে।

করুণা অপার স্মরি লয়েছি শরণ
অন্নদানে বঁধু মোরে করহ পোষণ।
মহারাজ বিতর তোমার কৃপাবারি
তরাও ভকতে ওহে বিপদ কাণ্ডারী।
আমার যে দশা প্রভু জানিছ সকল,
জীবন শরণ তুমি, সহায় সম্বল।

আশালতা নবীন পল্লবে প্রভু ছাও
কৃপার দুয়ার তব দাও খুলে দাও!
ভুবন বিদিত নামে ধরেছি আশ্বাস
অভাগারে কোরে নাহে নিরাশে নিরাশ।

দুখ শোক পাপ তাপ করহ মোচন,
মের বন্দ * মীর তুমি ঈশ্বরের জন
অগতির প্রতি কর কৃপা বরিষণ!

জেণ্ডা পীর নামে অপর একটি মহাপুরুষ আছেন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই প্রস্তাব উপসংহার করি। এই পীর হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির পূজার পাত্র। হিন্দুরা ইহাঁকে সিন্ধু নদীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহাঁর নামে ভক্তেরা যে স্তুতিমালা পাঠ করেন (পঞ্জাঁরা দরিয়া সা জা) তাহার কিয়দংশ ভাষান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সরিৎ সুহৃদ সম কল্যান-নিলয়
মহারাজ মহিমা অপার,
ঢালিছ অজস্র স্রোত বল বেগময়
পুরাও হে বাসনা আমার।

অগণ্য অগণ্য পাপে তাপিত অন্তর
দূর কর প্রভু পাপভার,
তোমার দুয়ারে যাচে কত শত নর
পুরাও হে বাসনা আমার।

দীন হীন অজ্ঞান এজন
জানে না গো ভজন সাধন
স্তুতি মোর শুনহে রাজন্
পুরাও হে বাসনা আমার।

অধীনে শরণ দেয় মহৎ যে জন।
উজ্জল তুমি হে তব উজ্জল বরণ,
মর্ত্তাধামে নাহি কেহ তোমার মতন
পুরাও হে বাসনা আমার।

অন্নদাতা তুমি সদা কর অন্নদান
হৃদে দেহ সত্য পুণ্য হার।
চৌদিকে ঘিরেছে মোরে শঙ্কট মহান্
পুরাও হে বাসনা আমার।

রাজ রাজেশ্বর তুমি বলী সুলতান
দুর্ব্বলেরে কর বলবান্।
সকলি জানিছ প্রভু কি জানাব আর
পুরাও হে বাসনা আমার।

বিদ্যায় তুমি হে মহামতি
অপার প্রভুতা অপার শকতি,
মায়াজাল রচয়িতা অগতির গতি
পুরাও হে বাসনা আমার।

তব কৃপাগুণে তাপিত জুড়ায়
ক্ষুধার্ত্ত জনের অন্ন কষ্ট যায়
ধরে নব বল যবে মৃত প্রায়
পুরাও হে বাসনা আমার।

শরণ পরমগতি বহু শক্তি ধারী,
কর পার অনিবার যত ভগ্ন তরী,
বিপদ তরঙ্গ মাঝে তুমিই কাণ্ডারী
পুরাও হে বাসনা আমার।

* লাল সাবাজের জন্ম ভূমি।

থাক মোর সাথে সর্ব্বকাল,
লোক মাঝে দেহ ধৈর্য্য বল,
সম্পদে বিপদে তুমি একই সম্বল
পূরাও হে বাসনা আমার।

সতত তোমায় সখা করিছে স্মরণ
কাঙ্গালের তুমিই আধার।
এ দাসের স্তবস্তুতি করহ গ্রহণ
পূরাও হে বাসনা আমার।

জীবন মরণ।

Life is dying to live

Caird.

জীবন মরণ মরণই জীবন,
জীবন মরণ এক সাথে।
যতটুকু আছ বেঁচে তত টুকু গেছ ম'রে
মরণেই নূতন জীবন।

অনন্ত জীবন যত যায়,
অনন্ত মরণ তত বাড়ে,
জীবনের পরেতে মরণ,
মরণ জীবন সারি গায়।

এ গানের হবে নাক শেষ,
সমষ্টি যে এ গানের আমি।
অনন্ত নদীর জলস্রোত,
সদাই সাগর পানে গামী,

যদি বা কখনো হায়—
নদীটী শুকায়ে যায়—
সাগরে যায় না তার জল,
তাই সে কি ফুরাইয়া যায় ?

দেখ না আকাশ গায়
কত মেঘ চ'লে যায়—
এরা সেই নদীর মরণ,
সে মরণে মেঘের জীবন।

গরিবের নীরব কুটীর
তিমিরেতে র'য়েছে ডুবিয়া,—
এ'ল আলো সে আঁধার ঘরে,
সে আঁধার্ গেল কি মরিয়া ?

আঁধার সে আঁধারি র'য়েছে,
তুমি সুধু দেখিলে না চেয়ে,—
ঐ দেখ দীপ নিবে যায়,
যে তিমির সে তিমির ময়।

আঁধার আলোক এক সাথে,
আঁধারেতে আলোক সৃজন,
আলোক আঁধার দুয়ে এক,
লীলাময় অপূর্ব্ব মিলন।

মরণের আবরণ ত'লে
এইরূপে সঞ্চার জীবন,
মৃত্যু বিনা জীবন আসে না,
বিনা প্রাণ কে আনে মরণ !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন।

তারাদেবী।

রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী সুপ্রসিদ্ধ নাটোর নগরীতে পুণ্যহৃদয়া মহারাণী ভবানীর গর্ভে অনুমান ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তারাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৎকালে দাক্ষিণাত্যবাসী বর্গীনামধারী মহারাষ্ট্রজাতি বঙ্গদেশে প্রজার উপর চৌথ আদায়ের ধূমধাম করে যখন ন্যায়বান মুসলমান তিলক সুপ্রসিদ্ধ আলিবর্দ্দি খাঁ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা শাসন করিতেন সেই সময়ে তাঁহার কতিপয় প্রধান প্রধান সাহায্যকারী বা সামন্ত ছিল, রাণী ভবানী তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। নাটোরের জমিদারী হইতেই আধুনিক বঙ্গের সমস্ত প্রধান জমিদারদিগের মূল ভিত্তি প্রোথিত হয়। রাণীর পঞ্চদশ এবং রাজা রাম-কান্তের বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তারা দেবী নাটোর বংশে একমাত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্য লোকে তারা দেবীকে "কুড়ন মেয়ে" কহে। তারা দেবীর ন্যায় পরমারূপসী রমণী, তৎকালে বঙ্গে দ্বিতীয় ছিল না। তাঁহার অতুল্য রূপের জ্যোতিতে সমস্ত বঙ্গভূমি আলোকিত হইয়াছিল, এমন কি তাঁহার অনুপম রূপমাধুরীর ব্যাখ্যা শুনিয়া দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট একটী গ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। (যে গ্রাম এখন "তাহের পুর" নামে অভিহিত তাহা তারা দেবীর যৌতুকের স্থান। বর্ত্তমান সময়ে তাহের পুর একটী জমিদারীর মধ্যে গণ্য হইয়াছে।) তারা দেবীর রূপ সম্বন্ধে অনেকানেক জন প্রবাদ আছে। রাজসাহী জেলার কোন কোন স্থানে আমি ভ্রমণ করিবার সময় শুনিয়াছি এখনো কেহ কোন বালিকার রূপের ব্যাখ্যা করিতে হইলে কহিয়া থাকে "আহা মেয়েটী যেন দেখতে তারা দেবী"। যে সময় তারাদেবী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রাজা রাম কান্ত তাঁহার বিলাসিতার জন্য দয়ারাম কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া হীন ভাবে মুরশিদাবাদে অবস্থিতি করিতেন, এবং রাণী অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন এইজন্য রাণী ভবানী কহিতেন যে "এই কন্যা হইতে কখনই আমার সুখ হইবে না, অনেক যাতনা সহ্য করিতে হইবে।" বাস্তবিকও মহারাণী ভবানী তারাদেবীর জন্মের পর হইতে এক দিনের জন্যও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। প্রথমে দয়ারাম কর্ত্তৃক রাজ্য বিচ্যুতি, দ্বিতীয় তারা দেবীর রূপ লাবণ্য দর্শনে নর কুক্কুর সিরাজদ্দৌলার অত্যাচার, তৃতীয় সেই অত্যাচার সূত্রে পাপিষ্ঠের সিংহাসন বিচ্যুতির চিন্তা, তাহার পর তারা দেবীর স্থাপিত বিগ্রহ আরাধনায় পুত্র রামকৃষ্ণের বৈরাগ্য—ইত্যাদি প্রকার নানা চিন্তায় রাণী সর্ব্বদা চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু এইরূপ সত্বেও তারা দেবীর জন্মের অন্যূন ৩.৪ মাস পরে রাজা রামকান্ত আবার জমিদারী ফিরিয়া পাওয়াতে কন্যার সম্মান বাড়িতে থাকে। তারাদেবীর ছয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। রাণীর হাতেই সমস্ত জমিদারীর কার্য্য আসিয়া পড়ে। তারার আট বৎসর বয়সের সময় রাণী তাঁহার বিবাহের

উদ্যোগ আরম্ভ করেন কেননা এই সময় "গৌরীদানের ফল"। অনেক অনুসন্ধানের পর বর্ত্তমান নাটোরের উত্তরাংশে বাসুদেব পুরের নিকটবর্ত্তী "খাজুরা" গ্রামে বিশ্বনাথ লাহিড়ীর পুত্র রামচন্দ্র লাহিড়ীর সহিত তারার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়।

বঙ্গে তিন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ,রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক। গঙ্গা ও তত্তীরবর্ত্তী ভূমিই পূর্ব্বে রাঢ়ীয়দিগের বাসভূমি ছিল, মহানন্দা ও করতোয়া নদীর নিকটবর্ত্তী ভূমিকে "বাগড়ি" বা বারেন্দ্র কহে, রাজসাহী জেলা এই প্রদেশের অন্তর্গত, এই স্থানের ব্রাহ্মণেরাই বারেন্দ্র নামে অভিহিত—এই দুই সম্প্রদায় কান্যকুব্জের পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্ততি, বৈদিকেরা এই দেশের আদিম অধিবাসী। রাণী ভবানী রাজসাহীর ব্রাহ্মণকুল মধ্যে লাহিড়ীবংশে কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন, কেননা রাঢ়ীদিগের ন্যায় ইহাঁদিগের কৌলিন্য প্রথা যদিও তত আঁটা আঁটি নহে তথাপি বারেন্দ্রদিগের সম্মানিত কুলীন মৈত্র মহাশয়েরা রাণী "কাপ" অর্থাৎ বংশজ বলিয়া কৌলিন্যাভিমানে রাজ কন্যা বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন, এই জন্য লাহিড়ী বংশে তারাদেবীর বিবাহ হয়।

বিবাহ মানব জীবনের এক মহোৎসব; নাটোর রাজ কন্যার মহাসমারোহে বিবাহ-উদ্যোগ হইতে লাগিল। একমাস পর্য্যন্ত বিবাহের ফর্দ্দ হইল! প্রাজ্ঞচেতা দয়ারাম তখন রাণীর অভিভাবক ছিলেন। ফর্দ্দ লিখিত হইলে রাণী তাহাকে কহিলেন "পুটিয়ার রাজ দেওয়ানকে ডাকিয়া ফর্দ্দ দেখান আবশ্যক; কেননা বিবাহের ফর্দ্দ কোন প্রাচীন প্রাজ্ঞ লোককে দেখান চির প্রচলিত প্রথা"। এই কথায় দয়ারাম একটুকু অপমান বোধ করিয়া অগত্যা পুটীয়ার দেওয়ানকে ফর্দ্দ দেখাইলেন। তৎকালে পুটিয়া নগরীতে বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তঃপাতী "তাড়াসের" জমিদার বংশের আদি পুরুষ দেওয়ানী কার্য্য করিতেন। এই বংশে বাবু বেনোয়ারী লাল রায় চৌধুরী অনেক সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ছয়মাস পর্য্যন্ত বিবাহের ফর্দ্দ দেখিয়া প্রাচীন দেওয়ান মহাশয় রাণীকে কহিলেন—"মা আর সমস্ত ঠিক ধরা হইয়াছে কেবল বোধ হয় আর কিছু "আবির" এবং বাবুয়ের বাসা দরকার হইবে।" তখন রাণী ভবানী দয়ারামকে কহিয়াছিলেন "শুনুন, দেওয়ান মহাশয় কি কহিতেছেন।" অভিমানী দয়ারাম তখন কোন উত্তর না দিয়া কিছু পরে কহিলেন "আমি যাহা ফর্দ্দ করিয়াছি তাহাই ঠিক। একজনকে দেখাইলে একটী কথা কহিতে হয় তাই উনি ঐ কথা বলিলেন। আপনার চিন্তা নাই কিছুরই অপ্রতুল হইবে না।" কিন্তু বিবাহের সময় সত্যই আবির এবং বাবুয়ের বাসা কম পড়িয়া গেল। তৎকালে বিবাহ কালীন সভা সমাবেশ সময় প্রথমে আবির ছড়াইয়া তাহার উপর বসিবার আসন স্থাপিত হইত,—একবার যে আবির ছড়ান হইত তাহা আর পুনর্গৃহীত হইত না। আর তখন বিবাহ সমারোহের শান্তি রক্ষার জন্য এত সৈন্য সামন্ত পাহারা নিযুক্ত থাকিত—যে তাহাদের অশ্বগাত্র পরিষ্কার করিবার জন্য বাবুয়ের বাসার আবশ্যক হইত—তখন খররা বা ব্রুস ছিল না।

এই বিবাহে অনুমান ৫০ লক্ষ মন আবিরে পদ্মার জল রঞ্জিত হইয়াও আবিরের অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। আর অন্যূন দুই হাজার সৈন্য সহ স্বয়ং মুরশিদাবাদের নবাব দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকায় বাবুয়ের বাসারও অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। নবাব সৈনিকেরা একবার একটী বাসা ঘোড়ার গায় দিয়া ফেলিয়া দিবার পর আর সে বাসা দ্বিতীয়বার লইত না। একজন সামান্য মুসলমান কর্ম্মচারী এই সময়ে বাবুয়ের বাসা সংগ্রহ করিয়া রাণীর লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি পাবনা জেলার "উল্ল পাড়ার" তালুকদারদিগের আদি পুরুষ; ইহারা চৌধুরী নামে বিখ্যাত। এইরূপে দয়ারাম অপ্রতিভ ভাবেও মহা সমারোহের সহিত কার্য্য সম্পন্ন করেন। শুনা যায় এরূপ সমারোহের কার্য্য বঙ্গভূমে আর কখন হয় নাই। হইবে কি না তাহাও সন্দেহ।

এ সম্বন্ধে আর একটি গল্প এইরূপ শোনা যায়—বিবাহের পর দিন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে এমন সময় রাণী কহিলেন আপনাদের আর যাহা আহারে রুচি হয় বলুন। তখন কোন একজন পেটুক ব্রাহ্মণ কহিলেন "মা আমার আর কিছু আহারে ইচ্ছা নাই, কেবল ইচ্ছা হচ্চে যে "চাক চুষিয়া কিঞ্চিৎ মধু পান করি" এই কথায় রাণী ভবানী অপ্রতিভ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার একজন কর্ম্মচারী কহিলেন "মা চিন্তা কি অনুমতি করুন আমি এই দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে এক একখানি চাক-সহ মধু দিতেছি। রাজ বাটীতে স্থান হইল না জানিয়া চাক বোঝাই তিন শত নৌকা আমি পদ্মার মধ্যে রাখিয়াছি" অমনি রাণীর মুখ প্রসন্ন হইল, ডাক বসাইয়া পদ্মা হইতে মধু চক্র আনীত হইল, ব্রাহ্মণগণ পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন, আর সেই দিন হইতে সেই কর্ম্মচারীর অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। কালে এই ব্যক্তি নাটোর বাটীর দেওয়ানী করিয়া জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। ইনি যশোহরের নড়ালের জমিদারদিগের আদি পুরুষ; নাম "কালিশঙ্কর রায়" ইনি তদানীন্তন নাটোরের অধীন "চাকলা ভূষনার" নায়েব ছিলেন। সুন্দরবন হইতে প্রভূত মধু চক্র সংগ্রহ করিয়া তারা দেবীর বিবাহে আপনার সৌভাগ্য করিয়া লইলেন।

তারা দেবীর বিবাহ কার্য্য শেষ হইয়া গেল। কিছু কাল অতীত হইলে বঙ্গের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইল, তাঁহার ভাবি উত্তাধিকারী দুর্দ্দান্ত সিরাজ কতকগুলি অসচ্চরিত্র নির্ব্বোধ অনুচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া বঙ্গের রমণী কুলের শত্রু হইয়া উঠিল। তারা দেবীর রূপের কথা ইতিপূর্ব্বেই সিরাজের কর্ণগোচর হইয়াছিল এত দিন আলিবর্দ্দির শাসনে সে মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই এখন স্বয়ং নবাব হইয়া তারা দেবীকে হরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় তারা দেবী বিধবা। মাতা কন্যা সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনে রত। তাঁহারা নবাবের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিবেন না জানিয়া নৌকাযোগে গোপনে যশোহরের মধুমতী তীরে মাহাম্মদপুর নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। এ সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ এই—নবাবের

অত্যাচার হইতে তারাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় বঙ্গের প্রধান প্রধান গণ্য মান্য লোক সমূহ মন্ত্রণা করিয়া এক মাস পর্য্যন্ত তারার শরীরে মৎস্যের তৈল মাখাইয়া শেষে নবাবের নিকট তাহাকে উপস্থিত করেন, নবাব ঘৃণায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় দান করেন। যাহা হউক তারা দেবী নবাবের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ মামুদপুরে কাটাইতেই সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তারা দেবীর ভ্রাতা রাণী ভবানীর পোষ্য পুত্র "রাজা রামকৃষ্ণ" এক সন্ন্যাসীর নিকট "বৈরাগ্য ধর্ম্ম" শিক্ষা করিয়া জমিদারী-কার্য্য অবহেলা পূর্ব্বক বঙ্গের তৎকালিক প্রধান প্রধান স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (ইহাঁর জীবন বৈরাগ্যের কাহিনীতে পূর্ণ।) ভ্রাতার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তারা দেবী নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, বিষয়ে অনুরাগ সত্ত্বেও সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া জননী ভবানীর [illegible] হিন্দুর মহাতীর্থ কাশীধামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যতদিন তারাদেবী মামুদপুরে ছিলেন—তিনি নিজেই জমিদারীর তত্বাবধান করিতেন—তিনি দেওয়ান দয়ারাম প্রদত্ত, নিষ্কর জমিগুলি জমীদারীভুক্ত করিয়া লন, দেবতার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া একজন নায়েব নিযুক্ত করেন। এখনো তারাদেবীর সেই প্রথানুযায়ী মামুদপুরে দেবতার বৃত্তি আদায় হইয়া পূজা হয়। এখনো এই নগরীতে তারা দেবীর স্থাপিত কতকগুলি দেবালয় আছে। এখনো তাঁহার স্বামীর নামানুসারে "রামচন্দ্র বিগ্রহ" নিয়ম মত পূজিত হইয়া থাকেন। তারা দেবী হিন্দু রমণীর আদর্শ স্বরূপ। তাঁহার ন্যায় অল্প বয়স্কা ধর্ম্মশীলা রমণী সংসারে বিরল। তারাদেবী মামুদপুরে যে গৃহে বাস করিতেন অদ্যাপিও সেই গৃহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

প্রয়াগ দর্শন।

গঙ্গার যেমন বেণী ঘাট প্রধান, যমুনার তেমনি বড়ুয়া ঘাট প্রধান। কিন্তু বেণী ঘাট সঙ্গমঘাট বলিয়া ইহা একটি প্রধান তীর্থ স্থান, কাজেই এঘাটে যেমন লোকের ভিড়, নিশানের কারখানা বড়ুয়া ঘাটে তাহার কিছুই নাই।

আমরা দুই দিন নৌকা করিয়া যমুনায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—এখানকার নদীতে স্রোতের তেমন জোর নাই, কেননা সমুদ্র নিকটে নহে বলিয়া গঙ্গা যমুনায় এখানে জোয়ার ভাঁটা খেলেনা, সুতরাং নৌকা যেদিকে ইচ্ছা অতি সহজে চালান যায়। এখানে নৌকার চলাচল যে বেশী আছে তাহাও নয়, যমুনার পুলের কাছে—নৌকার আড্ডাস্থলেই মোট ৪।৫ খানি মাত্র নৌকা সর্ব্বদা

বাঁধা থাকে, আর নদীর বুকে মাঝে মাঝে দু-এক খানি নৌকা চলিতে দেখা যায়। ধোপারাই এখানকার নদীর শোভা। যমুনার ধারে ধারে সারা দিনই প্রায় সার গাঁথিয়া ধোপারা আহা ওহো শব্দ করিতে করিতে তালে তালে কাপড় কাচে—কোথায় যমুনা পুলিনে শ্যামের বংশীধ্বনি আর কোথায় ধোপাদের এই চীৎকার সঙ্গীত! বড়ুয়া ঘাটের কাছে যমুনার ধারেই দুইটি বড় বড় অট্টালিকা, আর ঘাট হইতে কিছু দূরে সুন্দর একখানি বাঙ্গলা। বাঙ্গলাখানি মিশনারীদের, আর অট্টালিকা দুইটির একটি কাশীর রাজার, একটি একজন ফকীরের। ফকীর সম্প্রতি মরিয়াছে। কাশীর রাজার বাড়ীটির প্রস্তর-গেট চন্দন কাঠের বাক্‌সের মত বড় সুন্দর লতাপাতা ফুলকাটা। এদেশের লোকে পাথরের উপর বড় সুন্দর কাজ করিতে পারে,—এখানকার ধনী মাত্রেরই প্রায় পাথরের বাড়ী।

প্রথম দিন আমরা নৌকা করিয়া বড়ুয়া ঘাট হইতে আন্দাজ এক ক্রোশ চলিয়া আসিয়া দেখিলাম গহনা গাঁটী ও রঙ্গিন কাপড় পরা স্ত্রীলোকেরা ঝমঝম করিয়া ও ফিটফাট পুরুষেরা সার গাঁথিয়া তীর দিয়া চলিয়াছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় মাঝিরা বলিল—নিকটে শ্যামা মাজির গাছ তলায় সকালে মেলা ছিল—সেখান হইতে লোকেরা ফিরিয়া যাইতেছে।" শুনিলাম সে বৃক্ষটি নিকটেই নদীর তীরে। আমরা সেইখানে নৌকা লাগাইতে হুকুম দিলাম। খানিক পরে একটা পাহাড়ের মত উঁচু জায়গার নীচে নৌকা থামিল—আমরা নৌকা হইতে তীরে নামিয়া সেইখানে উঠিলাম, দেখিলাম সেই উচ্চস্থানে একটা বাঁধান গাছতলায় কতকগুলা ভাঙ্গাচোরা মূর্ত্তি, তাহাই শ্যামামায়িজি। সকালে এইখানে মেলা হইয়া গিয়াছে, পুতুলগুলো সব সিঁদুর মাখান, আর নিকটে অনেক ভাঁড় কোড় পড়িয়া আছে—তাহাই মেলার অবশেষ। সেই উচ্চ পাড়ের নিম্ন দেশ দিয়া যমুনার একটা শাখানদী বর্ষাকালে কানপুর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, এখন তাহার শুষ্ক চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই উচ্চ স্থান হইতে যমুনা দেখিতে কি সুন্দর—নীল আকাশ প্রতিবিম্বিত যমুনার জল এত ঘোর নীল যে সমুদ্র ও যেন অত নীল নহে। সেই কাল জলে—তীরের বৃক্ষচ্ছায়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—সূর্য্যের কিরণ চিক চিক করিতেছে, সমস্ত আকাশটা তাহার মধ্যে ঢেউএর মত উঠিতেছে পড়িতেছে, একটা ছোট্ট হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম জগৎ সংসারের যেন লীলাখেলা চলিয়াছে।

সেদিন আর বেশীদুর যাওয়া হইল না সেইখান হইতেই বাড়ী ফিরিলাম। পরদিন খুব ভোরে নৌকায় উঠিয়া সেস্থান ছাড়াইয়া আরো অনেক দূরে যমুনার বক্ষে একটি পাহাড় দ্বীপ উঠিয়াছে, দুইটার সময় সেইখানে পৌঁছিলাম। দ্বীপটির নাম সুজান দ্বীপ। দ্বীপটি স্তরে স্তরে দীর্ণ বিদীর্ণ একটি প্রকাণ্ড পাষাণ মূর্ত্তি। তাহার পদতলে নদীর জলে বড় বড় ভাঙ্গা পাথর গড়াগড়ি যাইতেছে—তাহার গায়ে এক একটা বড় বড় চাঙ্গড়া এমনি ভাবে

ঝুঁকিয়া আছে—যেন এখনি পড়িয়া যাইবে। যমুনার জলের মধ্যে স্তরে স্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদারিত সেই উচ্চ পাহাড়ের মাথায় একটি শিব মন্দির। মন্দিরে উঠিবার জন্য নীচে হইতে মন্দির পর্য্যন্ত বরাবর পাহাড় কাটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়া আমরা মন্দিরে উঠিলাম। মন্দিরটিতে জন মানব নাই, মন্দিরের নিকটে একটি মাত্র নিম গাছ—আর আশে পাশে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দুএকটা আগাছার জঙ্গল ছাড়া তাহার চারিপাশের অসমান জমি মাজা পাথরের মত ঝরঝরে। মন্দিরের ভিতরের দেয়ালে দেয়ালে ফার্সি-লেখা, শিবমন্দিরে ফার্সি লেখা কেন বুঝিতে পারিলাম না।

এই দ্বীপের সম্মুখে যমুনার তীরে আর একটি উঁচু পাহাড়—মধ্যে একটা জলের ব্যবধান; দেখিলে মনে হয়—এই দুই পাহাড় আগে একটি মাত্র সংলগ্ন পাহাড় ছিল, পরে কোন কারণে ইহাদের মধ্যস্থিত পাহাড়-অংশ ভাঙ্গিয়া ইহারা এমন বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। সুজান দ্বীপ দেখা হইলে আমরা আবার নৌকা করিয়া তীরে নামিয়া ঐ পাহাড়ের উপর উঠিলাম। ঐ পাহাড়ের উপর সমুখা সমুখি দুইটি মন্দির—একটি কৃষ্ণ রাধার, একটি শিবের। কৃষ্ণ রাধার মন্দিরটি বেশ সুসজ্জিত। এ পাহাড় জন শূন্য নহে, এখানে মন্দিরের কাছে লোক জনের বসতি আছে, মন্দিরের উদ্যান ভূমির মধ্যেই একজন পুরোহিত বাস করেন। এই পুরোহিতের কাছে শুনিলাম নবাব সাসুজা তাঁহার একজন প্রিয় হিন্দু কর্ম্মচারীর অনুরোধে—যমুনা বক্ষস্থ ঐ দ্বীপের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, তাঁহার নিজের নামে ঐ মন্দির ও দ্বীপের নামকরণ করেন, তখন বুঝি-লাম শিবের মন্দিরে ফার্সি লেখা কেন।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া নৌকা ছাড়িতে প্রায় ৪টা হইয়া গেল। বিকালে যমুনার দৃশ্য কি চমৎকার! পশ্চিম আকাশের লাল আভায় নৌকার পশ্চিমদিকের নদীর জল লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে—সে দিকে নদীর বুকের ভিতর যেন সমস্ত সহস্র রাঙ্গা জবা ফুটিয়া উঠিয়াছে—আর তাহার কুলে উঁচু উঁচু সোজা সোজা পাড়ের উপরে ছোট ছোট কুটীর ও বড় ছোট গাছ পালার গায়ে গায়ে সে লালের স্নিগ্ধ লাবণ্য পড়িয়াছে। সেই সোজা পাড়ের ঐ কুটীরগুলি দেখিলে কেমন ভয় ভয় করে—মনে হয় তাহারা যেন নদীর শোভাময় লাল জলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এই ভাঙ্গন-ধরা তীরের উপর আর একবর্ষা পর্য্যন্ত কুটীর গুলি যে রক্ষা পাইবে এমন মনে হয় না।

পশ্চিমের এই আলো পথ দিয়া আমরা পূর্ব্বদিকে অন্ধকারের রাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, সন্ধ্যা হইল, পশ্চিম এখনো স্নিগ্ধ লাল-লাবণ্যময়, কিন্তু পূর্ব্বদিক একেবারে অন্ধকার—কুয়াসায় আচ্ছন্ন। সেই কুয়াসার প্রাণের মধ্যে এক একবার কেবল পুলের দিকের একটা আলো জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে—আর পাশের জানালা দিয়া আকাশের এক একটা তারা চোখের সমুখে আসিয়া পড়িতেছে—দুই একটা তারা নদীর জলে

মাঝে মাঝে নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। একদিকে আলোক একদিকে অন্ধকার—আমরা মধ্যখানে সন্ধিস্থলে বসিয়া আলোকের রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমাগত অন্ধকার কুয়াসার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি—সেখানে আশ্রয় ফেলিয়া আসিয়াছি, মানুষ—মানুষ আমরা।

এখানে রাস্তা ঘাটে সহরে মাঠে যেখানে সেখানে মন্দির; এত মন্দিরেও তবু এখানকার লোকেদের আশ মিটে নাই, যেস্থানটি একটু নির্জ্জন, সুদৃশ্য, সেইখানেই একটি বাঁধান গাছতলায় একটা কোন না কোন রূপ মূর্ত্তি খাড়া করিয়াছে, বলিতে কি এখানে এমন একটা বড় গাছতলা বা উঁচু ভালরকম জায়গা দেখিলাম না, যেখানে একটা সৃষ্টিছাড়া মূর্ত্তি পড়িয়া নাই। আর যেখানেই এইরূপ মূর্ত্তি সেই খানেই এক একটা নিশান পোতা,—নিশান দেখিলেই বুঝা যায় ইহা একটি দেব আড্ডা। এইরূপ মূর্ত্তি পূজার এক একটা বিশেষ দিন থাকে, অনেক দূর হইতে সেদিন সেখানে লোক জমে, দোকান পসারি বসে—একটা মেলা হয়। তাপর যে যেখানে চলিয়া যায়—মূর্ত্তি একাকী পড়িয়া থাকে।

সৌন্দর্য্য পূজার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে যে প্রথমতঃ এইরূপ স্থলে দেব কল্পনা করা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। বলিতে কি আমাদের দেশের লোকের মত প্রকৃতি পূজা করিতে, স্বভাব-সৌন্দর্য্যে জীবন্ত কবিত্ব অনুভব করিতে আর দ্বিতীয় জাতি নাই।

আমরা সর্ব্ব প্রথমে এখানে ভরদ্বাজের আশ্রম মন্দির দেখিতে যাই। রামচন্দ্র বনে যাইবার সময় আরকি এখানে তিন দিন বাস করিয়া গিয়াছিলেন। যাইবার সময় মনে করিলাম কি একটি নির্জ্জন পবিত্র স্থান দেখিতে যাইতেছি—কিন্তু লোকালয়ের ভিতর দিয়া ধূলায় হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা গণ্ডগোল, চিকরা চিকরি—অপরিষ্কার ও ধূলার কারাগার মধ্যে. প্রবেশ করিয়া শুনিলাম এই ভরদ্বাজের মন্দির। যত মন্দির দেখিয়াছি এমন অপরিষ্কার ধূলিময় কোনটি দেখি নাই। এখানে দুইটি মন্দির ঘর—এক ঘরে রাম লক্ষণ সীতার মূর্ত্তি এক ঘরে একটি শিবের মূর্ত্তি। দুইটি ঘরের মধ্যে দুইটি সিঁড়ি পথ আছে সেইখান দিয়া নীচের অন্ধকার গহ্বরে নামা যায়। ইহার একটি গহ্বর বশিষ্ঠ মুনির একটি ভরদ্বাজের তপঃস্থান বলিয়া কথিত। আমরা মন্দিরে প্রবেশ না করিতে করিতে জনকতক পুরুষমূর্ত্তি-স্ত্রী-পাণ্ডা আমাদের ঘেরিয়া ফেলিয়া ডাক হাঁক আরম্ভ করিয়া দিল; মন্দির দেখিব কি আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত; মনে হইল আজ বুঝি এইখানেই কয়েদী হইয়া পড়ি। কম্পাউণ্ডের.মধ্যে কাছাকাছি আরো অনেক মন্দির, সকল মন্দিরের লোকেরা একসঙ্গে জুটিয়া নিজের নিজের দেবতার জন্য পয়সা চাহে, নিজের নিজের মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য চীৎকার করে, ঘন ঘন হাত নাড়িতে নাড়িতে কাছে আসে, অতিকষ্টে আমাদের দরোয়ানেরা তাহাদের সরাইয়া রাখে। যাই হোক খানিকক্ষণ তাহাদের চীৎকারের বড়যিতে নাকানি চোবানি খাইয়া অবশেষে অনেক কষ্টে ছিপ কাটিয়া তাহাদের হাত এড়াইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলাম,

তাহাতেও নিস্তার নাই, গাড়ীর অর্দ্ধেক পথ আবাল বৃদ্ধ বণিতারা চীৎকার করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। এমন বিপদে আর কথনো পড়ি নাই। যদি ভরদ্বাজ মুনি জানিতেন তাঁহার শান্তির আশ্রম এমন অশান্তির আলয় হইয়া উঠিবে তাহা হইলে বোধ করি ইহার চিহ্নমাত্র তিনি রাখিয়া যাইতেন না।

সহরের মধ্যে রাজার মন্দির নামে আর একটি মন্দির আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা একট প্রস্তর নির্ম্মিত লালবর্ণের নূতন মন্দির। মন্দিরটি সবে ১৬ বৎসর মাত্র একজন রাজা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরটি বেশ দেখিতে, ইহার চূড়াগুলি সব স্বর্ণ-মণ্ডিত। যে দ্বার দিয়া মন্দিরের কমপাউণ্ডে প্রবেশ করিতে হয়—তাহা সুবৃহৎ। এই দ্বারদেশে একটি মজার ঘড়ি, একটা নল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া একটা জল পাত্রে জল পড়িতেছে, জলে বাটীটির কতখানি পুরিয়া উঠিতেছে তাহা দেখিয়াই সময় ঠিক হইতেছে। বাটীটি একেবারে জলপূর্ণ হইলে তথন তাহা ফেলিয়া আবার খালি করিয়া লইতে হয়। মন্দিরটি শিব মন্দির, মন্দিরের চারিধারের বারান্দার ভিতরে বাহিরে দেব দেবীর মূর্ত্তি খোদিত, মন্দিরের মধ্যে দেয়ালে অনেক দেব দেবীর চিত্র। শিব মন্দিরের সমুখাসমুখি কমপাউণ্ডের মধ্যে একটি একতালা গৃহে কৃষ্ণ রাধার মূর্ত্তি। সেই গৃহের ছাতে কৃষ্ণ রাধার মাথার উপর কয়েকটি বিলাতি মূর্ত্তি (Statue)। এই মূর্ত্তিগুলি বেশীর ভাগ স্ত্রীমূর্ত্তি, পুরুষও আছে, একজন নাইট একটা হরিণ পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান। দেব-মন্দিরে এইরূপ বিলাতি দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলাম—বুঝি বা বাল্মীকি, লক্ষ্মী, সরস্বতী আজ এইরূপ বেশে শিবের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। আশ্চর্য্যই বা কি! শুনা যায় আজ কাল কোন কোন গৃহ দেবতার পাউরুটি বিস্কুটের ভোগ নহিলে চলে না!

এখানে আর দুইটি যে মন্দির দেখিয়াছি তাহা দেখিতে এমন জমকাল নহে, কিন্তু তাহার সম্মুখের দৃশ্য বড় চমৎকার। দুইটিই গঙ্গার ধারের মন্দির। একটি দারাগঞ্জে অন্যটি সহরের বাহিরে শিবকোটি নামক স্থানে। দারাগঞ্জ নদীর ধারের একটি স্থান, বড় বড় বাড়ী ইমারত মন্দিরে মন্দিরে ইহা ভরা। নদীর উপর হইতে এই স্থানটি দেখিতে ঠিক যেন ছবির মতন, বড় সুন্দর! এখানে আমরা যে মন্দিরটি দেখিতে গিয়াছিলাম তাহা বাসুকীর মন্দির--ইহা একটি উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। পাথরের সুবিস্তৃত সিঁড়ি দিয়া আমরা মন্দিরের বারান্দায় উঠিয়া ঘুরিয়া সর্প রাজের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, এই বারান্দা হইতে নীচে গঙ্গা পর্য্যন্ত দুই পাশে দেয়ালওয়ালা একটি বাঁধান ঘাট, বর্ষাকালে সম্মুখের প্রসারিত মাঠ ঢাকিয়া এই ঘাটে জল আসে, কিন্তু এখন গঙ্গা শুকনো হলদে মাঠের আকাশের একপাশে একটা ক্ষীণ বিদ্যুৎ-রেখার মত শুইয়া আছে। তাহার মাথার উপর অনন্ত প্রসারিত আকাশ আর চারি পাশে অনন্ত প্রসারিত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। মাঠের সীমান্তে যে বড় বড় গাছ, মন্দিরের উচ্চ ভূমির কাছে তাহাও ঈষৎ উচ্চ সমান সবুজ জমির মত হইয়া পড়িয়াছে, বিকালের প্রশান্ত কনক

আভা—হরিদ্রাবর্ণের এই ক্ষেত্রাকাশে শয়ন করিয়া চারিদিকে একটা গম্ভীর নিরাশার ভাব, একটা বৈরাগের তান তুলিতেছে—বাসুকী সহস্র ফনা তুলিয়া তাহারদিকে চাহিয়া সেই বৈরাগ্য সঙ্গীত শুনিতে কাণ পাতিয়া আছে।

শিব কোটির মন্দির ("শিউকোট" অর্থাৎ শিব মন্দির। ইহা হইতে সমস্ত স্থানটার নামই শিউকোটি হইয়া পড়িয়াছে) আমরা রাত্রকালে দেখিতে গিয়াছিলাম। স্থানটি একেবারে সহরের বাহিরে, বড় নির্জ্জন। মন্দিরের পুরোহিতগণ ছাড়া এখানে আর কেহই বাস করে না। সে দিন পূর্ণিমা, সাদা ধবধবে গম্বুজওয়ালা ছোট্ট মন্দিরের উপর, কাল পাথরের ঘাটের উপর, মন্দিরের নীচের ধূ ধূ কারী বালির চড়ার উপর, দূরে অস্পষ্ট গঙ্গার কাল একটা রেখার উপর জ্যোৎস্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সেই ঘুমন্ত জ্যোৎস্নাকে কম্পিত করিয়া পুরোহিতদিগের স্তব গান মন্দিরের মধ্য হইতে স্তব্ধ আকাশে উথলিয়া উঠিতেছে, চারিদিক গমগম করিতেছে, চারিদিক পবিত্র হইয়া উঠিতেছে—আমার মনে হইতে লাগিল আমি ঋষি আশ্রমে সাম গান শুনিতেছি। সেই স্তব শুনিতে শুনিতে পুতঃ হইয়া আমরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বালির চড়া ভাঙ্গিয়া নদীর ধারের দিকে চলিতে লাগিলাম। পুরোহিতদের স্তুতিগান ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতে লাগিল, যখন নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম কেবল একটা গুণ গুনানি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এখানে কি গভীর নিস্তব্ধ ভাব! নিজের নিশ্বাস শব্দ পর্য্যন্ত যেন এখানে শোনা যায়। এই জ্যোৎস্নাময় স্তব্ধ রজনীতে আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়াই যেন বিস্মিত হইতে লাগিলাম, মনে হইতে লাগিল যে, আমরা এখানে কেন আসিলাম। আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধভাবে তীরে বালির উপর বসিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিলাম? গঙ্গার উপরে যেখানে পূর্ণ চাঁদ তল তল ঢল ঢল করিতেছে—তাহার কাছেই—আকাশের একখানা কালমেঘ পড়িয়া ঘন ঘোর করিয়া তুলিয়াছে—মানুষের হৃদয়ের মত গঙ্গার হৃদয়েও যেন একই সঙ্গে হাসি কান্না গাঁথা রহিয়াছে, আর গঙ্গা হৃদয়ের হাসির স্রেই ছোট ছোট তরঙ্গ গুলিই যেন কুলকুল শব্দে আমাদের পায়ের কাছের তট দেশ আঘাত করিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে ওপারের পাড় ভাঙ্গিবার শব্দ মৃদুতর হইয়া গঙ্গার শোক সঙ্গীত যেন আমাদের কাণে পশিতে লাগিল। ওপারে মেঘের মত আবছা আবছা গাছ পালার ভিতর একটি মাত্র আলো টিপ টিপ করিতেছে—এদিকে গাছ পালার ভিতর সন্ধ্যার তারা জল জল করিতেছে—আমার তীরে বসিয়া একটি কথা মনে হইতে লাগিল—একদিন এইরূপ জ্যোৎস্না রাত্রে নদীর শোভা দেখিয়া একজন যে বলিয়া উঠিয়াছিল—"যদি মরিতে হয় ত এই সময় গঙ্গার বুকে—" আমার সেই কথাটি মনে পড়িতে লাগিল। ক্রমে আমাদের স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল,—আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই জ্যোৎস্নাধৌত চড়ার উপর বসিয়া বেড়াইয়া গল্প করিয়া কাটাইলাম,—অবশেষে বাড়ী ফিরিলাম।

এই খানেই আমাদের মন্দির দেখা শেষ নহে। আমরা এই মন্দির দেখার গল্প করি-

তেছি—একজন বলিলেন—গঙ্গার ওপারে পাড়িলা গ্রামে যে একটি শিবমন্দির আছে—বড় চমৎকার। শুনিয়াত আমার বন্ধুটি ক্ষেপিয়া উঠিলেন—যাইবার সব ঠিক ঠাক হইল—এবার যাত্রী আমরা ৪ জন স্ত্রীলোক—সঙ্গে দরোয়ান চাকর বাকর। ঘরের গাড়ী গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত গেল,—তাহার পর গঙ্গার কাঁচা পুল ভাঙ্গিয়া উবড়ো খাবড়ো গ্রাম্য রাস্তা দিয়া যাইতে যাইবে, সে পথে কিছু আর ঘরের গাড়ী চলে না,—কাজেই এ দেশে খাঁচার মত ছোট ছোট যে একরূপ ঘোঁড়ার গাড়ী আছে, আমরা তাহার এক এক খানিতে দুইজন করিয়া চড়িলাম। একখানিতে আমি ও আমার তন্বাঙ্গী বন্ধুটি, আর একখানি কিছু অতিরিক্ত রকম জুড়িয়া গেল। মন্দির দেখার প্রসাদে আমাদের একা চড়া পর্য্যন্ত হইয়া গেল, একা চড়িয়া আমাদের আনন্দ দেখে কে? আমাদের দুইজনকে ঝাকাঁইতে ঝাকাঁইতে—দোল দিতে দিতে যখন পুল দিয়া একাখান আয়েষে হেলিয়া দুলিয়া চলিল—আমার ত বড় মজার লাগিতে লাগিল,—আমরা দুজনে তখন প্রাণের যত সুখের গল্প করিতে বসিলাম, মনে হইতে লাগিল—সঙ্গীর গুণেই স্বর্গ-নরক, স্থানের গুণে নহে।

এইরূপ হাসিতে খুসিতে অর্দ্ধ ক্রোশ পুলটা পার হইয়া গ্রাম্য কাঁচা রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, সকলেরই মনে হইল—এইবার গম্য স্থানের কাছাকাছি আসা গেল—অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্দিরে পৌঁছিব, ওমা—কোথায় কি? যতই যাই শুনি আরো যাইতে হইবে—পথের যেন আর শেষ নাই। চাকররা যারা সঙ্গে ছিল তারা ঠিক পথ জানে না,—মাঝে মাঝে রাস্তার লোক ধরিয়া ধরিয়া তাহারা পথ জিজ্ঞাসা করে,—কেহ বলিয়া দেয় এ রাস্তায় যাও, কেহ বলে ওরাস্তায় যাও—পথের না আছে একটা ঠিক, না আছে একটা কথার ঠিক,—গাড়োয়ানেরা একবার এরাস্তার একবার ওরাস্তায় গাড়ী দুটাকে ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত ঘুরাইতে ঘুরাইতে অবশেষে একটা মাঠের পথে আনিয়া ফেলিল—শুনিলাম এই পথে গেলে শীঘ্র যাওয়া যাইবে,—তখন বুঝিলাম—মহাদেবের মন্দিরে—কিন্তু তার পর দেখিলাম আর খানিকটা এইরূপ পথে চলিলে শীঘ্রই শেষ স্থানে যাওয়া যাইবে। মাঠের সেই পথহীন আঁকা বাঁকা ঢিবে ঢাবা উচু নীচু পথে বার বার স্বর্গ হইতে রসাতলে দুম দাম করিয়া পড়িতে পড়িতে গাড়ি চলিতে লাগিল। এক এক বার সমুখে একটা উঁচু ঢিবি দেখি কি করিয়া পার হইব প্রাণটা আঁতকিয়া উঠে, আর গাড়ীটার দুই দিকে লোকেরা ধরিয়া মজেমে মজেমে (ধীরে ধীরে) করিতে করিতে অতি সন্তর্পণে—কিন্তু অবশেষে দুম করিয়া নামাইয়া দেয়—মনে মনে বলি মজাটা যথেষ্ট হইয়াছে এখন একটু কমিলেই বাঁচি। এইরূপ এক একটা ঢিবি পার হওয়া কলিকালের আর কি অগ্নি পরীক্ষা। আমাদের গাড়ীটা তবু হালকি সওয়ারি,—দ্বিতীয় গাড়ীখানি এইরূপে পার করিতে এক একবার লোকদেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়—যাত্রীদেরও ত্রাহি মধুসূদন হইয়া পড়ে, দুই একবার ত যাত্রী দুইটি গাড়ী হইতে নামিয়া উঁচু ঢিবি

পার হইয়া লইলেন—তাঁহাদের মধ্যে একজনের ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল—তিনি আহার করিয়া শিব দর্শনে আসাতেই যত অনর্থ উৎপত্তি হইয়াছে,—আর কখনো এরূপ করিবেন না বলিয়া তিনি মাননা করিতে লাগিলেন। কোন রকমে যখন মাঠের সে ভক-নদীটা পার হইয়া মন্দিরে আসা গেল—রমণী বলিলেন—তিনি মাননা না করিলে কখনই আজ মন্দিরে আসা ঘটিত না।

যাক্, এতটা সুখে রাস্তা পার হইয়া মন্দির দেখিয়া চক্ষুস্থির—একটা গলি ঘুঁজির মধ্যে একটা এঁদো পচা জায়গায় ছোট খাট একটা শিবের মন্দির,—এইত পাড়িলা মহাদেব। যাহক দুপুরের সময় বাড়ী ছাড়িয়া ৪ টের সময় আমরা এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম,—৪॥ টের সময় আবার বাড়ী মুখো ফিরিলাম—অমন উঁচু নীচু পথে রাত হইলেই সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে মাঠেই রাত কাটাইতে হইবে। সঙ্গে আবার একটা আলো জ্বালিবার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত নাই, দুপুর রৌদ্রে বাড়ী ছাড়িয়া কার মনে অন্ধকার রাত্রের বিপদ মনে আসে? এবার সে রাস্তা না ধরিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা ধরা গেল। শীতকাল, বিকাল হইতে হইতে সন্ধ্যা আসিয়া পড়ে, সন্ধ্যা না আসিতে আসিতে অন্ধকার হয়, শীঘ্রই চারিদিক ঘোর ঘোর হইয়া আসিল—দৌড়াদৌড়ি তাড়াতাড়ি করিয়াও গাড়ী মাঠ না ছাড়াইতে ছাড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া পড়িল, বেচারা ঘোঁড়ারাই বা কত পারে, তবু তাহারা প্রাণ পণে চলিতে লাগিল, বাবলা গাছের নোয়ান ডালপালার কাঁটার আঁচড় খাইয়া, নীচে গাছগাছড়ার উপর তার প্রতিশোধ লইয়া গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল—আর খানিকটা গেলেই গাড়ী মোহনগঞ্জের গ্রাম্য রাস্তায় আসিয়া পড়ে—সকলের মনে এই মাত্র ভরসা; এই ভরষায় উপর নির্ভর করিয়া আমরা সেই মাঠের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলাম, ক্ষেত্রের মাঝে আঁধার গাছপালা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, সহরের মত এখানে হিমের ধুঁয়া নাই—তাই সন্ধ্যাতেও একটু একটু চারিদিক নজরে পড়িতেছে। শীত কন কন করিতেছে—সজোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে—যেদিকে চাই ত্রিসীমায় একটা লোক নাই লোকালয় নাই একটা পথ দেখা যায় না, মাঝে মাঝে কেবল এক একটা শেয়াল যা আমাদের দিকে তাকাইয়া চলিয়া যাইতেছে।—যত অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল—হৃৎকম্প হইতে লাগিল, রাত্র হইয়া গেলে আর কোন উপায় নাই—সমস্ত আমোদ প্রমোদ ফুরাইয়া গেল—সকলে নিঃঝুম হইয়া পড়িলাম। এই সময় আমার একবার মনে হইল নভেল লেখকগণ কেমন সহজে পথিককে দিক হারা করিয়া ফেলেন, কিন্তু দিকহারা অবস্থাটা যে কি ভয়ানক তাহা তাঁহাদের একবার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিই। যাহউক কোন জন্মের নিতান্ত পুণ্য-বলে আমরা শীঘ্রই গ্রামের রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম,—আর ভাবনা রহিল না, বুঝা গেল যত রাত্রেই হোক বাড়ী পৌঁছান ঘটিবে। তাহার পর যে বাড়ী ফিরিয়াছি তাহা আর বলার আবশ্যক নাই। এখন ঘরে বসিয়া সেদিনকার কথা মনে করিতে বড়ই লাগি-

তেছে ভাল,—মনে হইতেছে এত মন্দির দেখিয়াছি—এমন আমোদ কোথায় হয় নাই। একটা কথা, এত কষ্ট করিয়া কোথায় গঙ্গার পারে পাঁড়িলা মহাদেব তাহা পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিলাম আর আমাদের বাড়ীর কাছেই যে একটি ভাল মন্দির আছে তাহা এ পর্য্যন্ত কখনো দেখা হইল না যাহা সহজে পাওয়া যায় তাহার আর কি এমনি হতাদর। এখানে আসিয়া আমরা গভর্ণমেণ্ট হাউস, লাইব্রেরি, মেয়োহল, পার্ক প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিবার সব দেখিয়াছি কিন্তু কলিকাতায় যে এরূপ ধরণের কত ভাল ভাল বাড়ী উদ্যান আছে—তাহা দেখিবার কথা মনেও হয় না। এ বিষয়ে ঘরের ছেলের পাণ্ডিত্য আর বাসস্থান সমান। ঘরের ছেলে অন্য লোকের কাছে যখন মহা পণ্ডিত তখন ও আপনাদের কাছে সে ঘরের ছেলে বই কিছুই নয়। যাহাকে জন্মিতে দেখিয়াছি—মানুষ করিয়াছি, চিরকাল যাহাকে আবল তাবল বকিতে শুনিয়াছি আঃ কপাল তিনি আজ আবার পণ্ডিত! সে পাণ্ডিত্য আবার চোখে লাগে!

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—কলিকাতার মনুমেণ্টে চড়িয়াছ? অমুকস্থানে গিয়াছ ওমুকস্থান দেখিয়াছ? আমি ভাবি চিরকাল যাহার রক্তমাংসের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছি, তাহাকে আবার নূতন আলাদা আলাদা করিয়া কি দেখিব! কলিকাতাটা নাকি আবার একটা পদার্থ!

এখানে আর কি ইংরাজি প্রবার্বটা ঠিক খাটে Familiarity brings contempt—.

এখানকার মেয়োহলটি মেয়োর স্মরণ চিহ্ন। ইহা বেশ সুদৃশ্য জমকালো একটি বাড়ী। কিন্তু ইহার প্রধান জিনিস ইহার স্তম্ভটি। ইহা কলিকাতার মনুমেণ্টের মত অত উচ্চ না হউক—কিন্তু তবু বড় কম উচ্চ নহে—আমরা ত উঠিতে হিমঝিম খাইয়া গিয়াছিলাম, স্বর্গে উঠিতে গেলে যে কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়—এই মঞ্চে উঠিবার সময় তাহার কতকটা আমাদের ধারণা হইয়াছে,—শেষদিকের সোজা সোজা উঁচু উঁচু ধাপগুলা এক একটা করিয়া উঠি আর মনে হয়—বুঝি আর পারিলাম না, বুঝি এইবার নামিতে হয়। যাহক অতদূর উঠিয়া আবার নামিয়া পড়া নেহাত অমানুষের কর্ম্ম—তাই জীবন মরণ পণ করিয়াও শেষে উঠিয়া পড়িলাম, উঠিয়া সমস্ত পথ শ্রান্তি নিমেষে ভুলিয়া গেলাম, মনে হইল সত্যই স্বর্গে আসিয়াছি—চারিদিকে কি সুন্দর দৃশ্য! নীচের গাছ পালার মধ্যে ঘর বাড়ী সব একসা হইয়া গিয়াছে—বড় বড় স্তম্ভ ছোট ছোট ডাণ্ডার মত হইয়া পড়িয়াছে—মানুষগুলো. পোকার মত কিলকিল করিয়া চলিতেছে—চারিদিকে একটা সীমা হীন দৃশ্য; দিগন্তের সঙ্গে আকাশ মিশিয়াছে—ছোটর সহিত বড় মিলিয়াছে—এই খানে দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয় সংসার যেন একটা ছেলে খেলা, যেন একটা পুতুলের রাজ্য, আকাশ গম্বুজে আসীন এক মহান পুরুষ সেই পুতুলদিগকে খেলাইয়া বেড়াইতেছেন। উঠিতে এত কষ্ট নামিতে কিছুই না! আমরা যখন নামিয়া আসিলাম দেখিলাম পশ্চিমের লাল আলো না মিশাইতে চাঁদ উঠিয়াছে, বিকাল না ফুরাইতে

সন্ধ্যা হইয়াছে—বিকালের লাল আলো আর চন্দ্রমাশালিনী সন্ধ্যার রজত আলো একত্র মিশিয়াছে, কলিকাতায় কথনো এমন সন্ধ্যা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

এখানে একটি মস্ত নূতন কালেজ নির্ম্মাণ হইতেছে, পুরান কলেজটি ছোটখাট। পুরান কলেজবাটিটির নাম লাউথার কাস্‌ল্‌। আগে এদেশে লেপ্টেনেণ্ট গর্ভনরের স্থলে একজন করিয়া কমিসনার নিযুক্ত থাকিতেন। পুরাতন কলেজটি আগে লাউথার নামক একজন কমিসনারের বাসবাটী ছিল—তাঁহার নাম হইতে ইহার নাম লাউথার কাস্‌ল্‌ হইয়াছে। শোনা যায় লাউথার বড় মজার লোকছিলেন, তিনি নবাবী আনা-চালে নহিলে চলিতেন না, সঙ্গে তাঁর আসাসোটা ধারী লোক নহিলে হইত না, তিনি আপনাকে "সুবা" বলিয়া পরিচয় দিতেন,—বিলাত যাইবার সময় তিনি অনেক জিনিস পত্র বিক্রয় করিয়া যান, জিনিসের মধ্যে রূপার জিনিস তাঁহার অনেক ছিল, কিন্তু তাঁহার রূপার বাসন কিনিয়া যে সে লোক যে ব্যবহার করিবে—ইহা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল—তিনি তাঁহার একজন নবাব বন্ধুকে ৪০ মন ওজনের বাসন সমস্ত দান করিয়া গেলেন, তবু তাহা ঐ কারণে বিক্রয় করিলেন না।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বাড়ীও একদিন আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম, তিনি তখন পাহাড়ে, শূন্যগৃহ সে সময় যে কেহ ইচ্ছা করে দেখিতে পায়। আমরা যাইতেই দ্বার-বানেরা দরজা খুলিয়া দিল। বাড়ীটি একতালা একটি বড় বাড়ী, কোন কর্ম্মেরই নহে, আমাদের এখানে একজন বড় মানুষের বাড়ীও তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল! লাট সাহেব না থাকায় বাড়টি তেমন সাজানও নাই, জিনিস পত্র অনেকটা লণ্ড ভণ্ড অবস্থায়, দেয়ালে কতকগুলি কেবল বড় সুন্দর সুন্দর তেলের ছবি দেখিলাম।

এখানকার পার্কটি যদিও কলিকাতার পার্কের মত অত ভাল নহে—তবুও বেশ সুদৃশ্য। ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ডের চারিদিকে ঘাসের চক্রের মধ্যে বিলাতি ফুল ফুটাইয়া যে মখমল বিছানা পাতা হইয়াছে, তাহা বড় সুন্দর। শুনিলাম গরমি কালে যখন এলাহাবাদের মাটীতে কোথায় একটা সবুজ ঘাস থাকে না—চারিদিক মরুর মত ধূ ধূ করে, তখনও এই পার্কের ঘাস গুলি বহু যত্নে বাঁচাইয়া রাখা যায়,—আর চারিদিকের শুকনো মরুময় দৃশ্যের মধ্যে এখানকার সবুজ ভাবটি তখন বড়ই রমণীয় হইয়া উঠে। এখানকার এই পাকা ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ডটি—এলাহাবাদ সহরের একজন প্রধান ব্যক্তি বাবু নীলকমল মিত্র নিজের ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন—অথচ ইহাঁর নামটি ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ডের এমন স্থলে খোদিত আছে—যে তাহা সহজে নজরেই পড়ে না।

এখানে পুকুর প্রায় নাই, যেখানে সেখানে পাতকূয়া, কিন্তু এখানকার কূয়ায় আর বাঙ্গলা দেশের কূয়ায় অনেক তফাৎ। এখানকার পাতকূয়া এত গভীর, যে নীচে চাহিয়া দেখিতে কেমন গা শিহরিয়া উঠে—সেই গভীর পাতকূয়ার কোন-তলায় একটু জল পড়িয়া আছে,—জল এত নীচে যে তাহা তোলা কম জোরের কর্ম্ম নহে। বেশী জলের আব-

শ্যক হইলে প্রায়ই এথানে গরুতে কপিকলে টানিয়া জল তুলে—নহিলে ছোট ছোট লৌহ পাত্র করিয়া মানুষেই কপিকলে জল উঠায়। গরমিকালে কুয়ার জল আরো নামিয়া যায় যা অল্প স্বল্প পুকুর আছে তাহাও সবই প্রায় শুকাইয়া পড়ে—কেবল লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের বাড়ির কাছে আকবরের সময়কার যে একটা বড় পুকুর আছে, আর রাজাপুর পল্লীতে ভাগনের তালাউ নামে একটি যে ছোট খাট পুকুর আছে—এবং আরও হয়ত এইরূপ দু একটা পুকুরে গরমি কালেও জল থাকে। ভাগনের তালাও এখানকার লোকেদের একটি ছোট খাট তীর্থ। রাজাপুরে আগে দুইটি পুকুর ছিল একটি মামার—একটি ভাগনের—এখন মামার বাঁধান বড় পুকুরটি একেবারে শুকাইয়া ঘাসপূর্ণ হইয়াছে—আর ভাগনের সামান্য পুকুরটি জলপূর্ণ রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে গল্প এই—ধনী মামার সরকারে গরীব ভাগনে চাকর ছিল, মামাকে একটা পুকুর কাটাইতে দেখিয়া ভাগনেরও একটি পুকুর কাটা-ইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার ত টাকা কড়ি নাই, সে সমস্ত দিন খাটে খোটে, রাত্রে একটু করিয়া পুকুর কাটে এইরূপে সে যখন একটি পুকুর করিয়া তুলিল মামার তখন মহা রাগ হইল, মামা যশের লোভে পুকুর কাটাইতেছিলেন—সুতরাং ভাগনেকে যশের ব্যাঘাত স্বরূপ মনে করিয়া রাগিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। কিছুদিন পরে মামার পুকুরের জল শুকাইয়া গেল (লোকদের বিশ্বাস ঐ পাপে) আর ভাগনের পুকুর পুণ্য পুকুর বলিয়া খ্যাত হইল। এই পুকুরের ধারে একটা উচ্চ জমির উপর গাছের তলায় এই ভাগনের নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা দেখিলাম। এক একটা বিশেষ সময়ে এই পুকুরের ধারে মেলা হইয়া থাকে, লোকে এখানে মাননা করিতে আসে, মাননা সিদ্ধ হইলে পূজা দিয়া যায়। রাজপুরে ভাগনের পুকুরের কাছাকাছি রাস্তার ও পারে কতকগুলা ভাঙ্গা চোরা মসজিদ ও পুরাতন বাঁধান কূয়া বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের নহবদখানাটি এখনো বেশ আছে, কিন্তু তাহার লাগাও যে মস্ত বাড়ী ছিল তাহার কিছুই নাই—সেখানে এখন মাঠ, চাষ হইয়াছে। বেশী দিন এ বাড়ী ভাঙ্গা হয় নাই, মিউটিনির সময় এ সকল এক জন মোল্লার ছিল—বিদ্রোহী অপরাধে তাহাকে ফাঁসি দিয়া এ সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন, ৮।১০ বৎসর মাত্র গবর্ণমেণ্ট একটু একটু এই বাড়ী ভাঙ্গিয়াছেন, এখনো আশে পাশে দুই একটা মসজিদ আর এই নহবদখানা যা বাকী আছে, নহবদখানায় নাকি লেখা আছে ইহা কেহ ভাঙ্গিতে পারিবে না। তবে গবর্ণমেণ্টের ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইলে এইলেখার জন্য যে নহবদখানা রেহাই পাইবে তাহাত মনে হয় না। শুনিলাম এই খানে জমির নীচে অনেক টাকা ছিল—গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছেন। এইরূপ ভাঙ্গা চোরা পুরাতন জিনিসের মধ্যে কতদিনকার স্মৃতি আমরা দেখিতে পাই—কালের বিচিত্র হস্তের কারুকার্য্য ইহার মধ্যে যেমন দেখা যায়—নূতন সুদৃশ্য বাড়ী-তেও তেমন দেখা যায় না। তাই নূতন বিচিত্র অট্টালিকা হইতেও এই সব পুরাতন ভাঙ্গাচোরা জিনিস দেখিতে আমার ভাল লাগে।

এলাহাবাদে জিনিসপত্র সবই শস্তা—বিশেষতঃ মাছ মাংস। এখানে খুব ভাল পেয়ারা পাওয়া যায়—এখানকার পেয়ারা একটি প্রসিদ্ধ ফল।

এদেশের লোকেরা বেশ ভদ্র ও বিনয়ী, রাজনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে ইহারা বাঙ্গালীদের অনেক পশ্চাতে। এখানে রাজনৈতিক বিষয়ে যখন আন্দোলন হইয়া থাকে তাহা প্রধানতঃ বাঙ্গালীদেরই উদ্যোগে। ইংরাজদের ভয়ে এদেশের ধনী লোকেরা পর্য্যন্ত এরূপ আন্দোলনে স্পষ্ট ভাবে যোগ দিতে সাহস পান না। সম্প্রতি এখানে এইরূপ একটি সভা হইয়াছিল—সভা আহ্বানকারীগণ এদেশের ক্রোড়পতি প্রধান ধনীকে ইহার আসন গ্রহণ করিতে বলেন—যদিও এ সভায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার ছিল না, তথাপি কি জানি মেজিষ্ট্রেট কমিসনার যদি ইহাতেও অসন্তুষ্ট হন—এই ভয়ে তিনি যে কেবল সভাপতি হইতে অসম্মত হইলেন এমন নহে, এই সভার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চাহিলেন না। এদেশের উপকারার্থে কয়েক জন বাঙ্গালী একটা কোম্পানি করিয়া ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান নামে এখানে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিয়াছেন। সত্য কথা বলে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট আজ কাল এইরূপ সংবাদ পত্রের উপর অসন্তুষ্ট, তাই এদেশের ধনীরা প্রকাশ্য ভাবে ইহার সেয়ার না কিনিয়া বাঙ্গালীদের নামে বেনামী করিয়া সেয়ার কেনেন।

তবে এসব বিষয়ে এদেশ আগের অপেক্ষা অনেক আগুয়ান হইয়াছে। আগে এদেশে রাজাদের পর্য্যন্ত বড় ইংরাজদের নিকট জুতা খুলিয়া যাইতে হইত। যে বার কলিকাতায় গবর্ণর জেনেরল নিয়ম বাহির করেন যে বুট পায়ে থাকিলে খুলিতে হইবে না, সে বার সেই নিয়মের পর একজন রাজা সাহসে নির্ভর করিয়া বুট পায়ে দিয়া এখানকার কমিসনরের সঙ্গে দেখা করিতে যান,—কমিসনরের চাকরেরা তাঁহাকে মিনতি করিয়া জুতা খুলিতে বলে, রাজা বলেন, "যে বুট থাকিলে কমিসনর কিছু বলিবেন না—যদি বলেন—বলিও বুটত সহজে খোলা যায় না"—এই কথা চাকরগণ কমিসনরকে বলায় তিনি তখনি একখান ছুরি চাকরকে ফেলিয়া দিলেন—অর্থখানা—বুট খোলা না যায়—কাটিয়া ফেলুক"। শম্ভুনাথ পণ্ডিত একবার এখানে আসিয়া এই কমিসনরের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু জুতা খুলিতে হইবে, শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন।

সম্প্রতি দু এক বৎসর হইল—নূতন আইনের একজন দেশীয় সিভিলিয়ান এক ইংরাজ সিভিলিয়ানের কাছে জুতা খুলিয়া যাইতেছিলেন—ইংরাজ তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন—"তুমি এখন আমাদের দলের লোক তুমি জুতা খুলিবে কেন, তোমার বাপ যখন আসিবেন জুতা খুলিয়া আসিবেন"। যাহক প্রতিদিন রাজনৈতিক সম্বন্ধেও এদেশ অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে।

কাব্যজগৎ।

(২)

আমাদিগের এই জগৎ নিতান্ত ক্ষুদ্র, অসীম সৌর জগতের কণা মাত্র, চারিদিকেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কাব্যজগৎ অসীম। অনন্ত আকাশে কোটি কোটি সূর্য্য চন্দ্র তারকা লইয়া, অনন্ত আকাশের নীচে আমাদিগের এই কোটি কোটি ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া, কোটি মনের আশা দুরাশা, কোটি চক্ষুর অশ্রুজল লইয়া আকাশব্যাপী আলোকে তাহা দেখিয়া কবি তাঁহার জগৎ চিরকালই সৃজন করিতে থাকেন। সে সৃষ্টির কখনও শেষ নাই, সে অসীমে অসীম যোগ। সৃষ্টির কারণ পুরুষ এবং প্রকৃতি যে কোন অর্থেই হউক না কেন সত্য—যে স্রষ্টা সে পুরুষ, যে কারণে সৃষ্টি তাহা প্রকৃতি, এই অর্থ যদি কাব্য এবং কবি সম্বন্ধে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে কবির বিশ্বব্যাপী মমতাই তাহার প্রকৃতি, কাব্য তাহার ফল স্বরূপ, আর এই অনন্ত প্রসারী প্রকৃতির ধ্যানই উপাসনা। তোমার যে কোন ধর্ম্ম হউক না কেন, যে কোনরূপে তুমি তোমার ক্ষুদ্র জগতকে অদৃশ্য জগতের কিংবা জগতের কারণের সহিত আবদ্ধ মনে কর, সে যেরূপ বিশ্বাসই হউক না তাহাই তোমার ধর্ম্ম। সেই জন্য ধর্ম্ম কখন কখন কাব্যে পরিণত হয় এবং কাব্য ত চিরকালই ধর্ম্ম—যাহা তোমাকে জগতের সহিত ধরিয়া বাঁধিয়া রাখে। কাব্যে এবং ধর্ম্মে একটি চিরন্তন সম্বন্ধ আছে।. কেহ কেহ বলেন যে কবিতা এককালে স্তোত্র মাত্র ছিল, ধর্ম্মগীতিতেই আধুনিক কবিতার উৎপত্তি। পুরাতন ইংরাজীতে কবি কথার অর্থ গায়ক এবং ভবিষ্যদ্বক্তা উভয় বুঝাইত। আধুনিক ইংরাজী পোয়েট কথাটির মৌলিক অর্থ "স্রষ্টা।"

আমার মনে হয় যে ধ্যান যেমন কাব্যের অঙ্গ, দেবমন্দিরও তেমনি কবিতার প্রকৃতির অনুরূপ। পিণ্ডার একটি কাব্যের অবতারণা দেবালয়ের ললাটের সহিত তুলনা দিয়াছেন। নীলাকাশের নীচে যাহা উন্নত ভাবে হৃদয়কে ধ্যান করিবার জন্য আহ্বান করে, বিচিত্র সূক্ষ্মকার্য্য শোভিত প্রশস্ত ললাটে যেমন আকাশের ছায়া পড়ে, তাহাতে সূর্য্যের আলোক, বর্ষার জল যেমন সমভাবেই লাগে, তাহা যেমন স্থির গম্ভীর সৌন্দর্য্যময়; একটি মহাকাব্যের আরম্ভও কতকটা সেইরূপ, তাহাতে কেমন একটি অনন্ত বিস্তৃত, অনন্ত কালের ভাব আছে।

সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক যত মহাকাব্য আছে সব গুলিতেই প্রথমেই বন্দনা। রঘুবংশের আরম্ভ দেখ কত সুন্দর কত মহান। কোন ভাষাতেই আমি অতদূর মহৎ সৌন্দর্য্যময় অবতারণা পড়ি নাই। কালিদাস বলিলেন বাক্ এবং অর্থ যেমন ভাবে সম্পৃক্ত, বাক্ এবং অর্থের যেমন প্রতিপত্তি, সেইরূপ ভাবে একীভূত পার্ব্বতী পরমে-

শ্বরকে আমি প্রণাম করি। কাব্যের অবতারণা ইহা অপেক্ষা আর সুন্দর হইতে পারে না।

সংস্কৃত কাব্যের সহিত আধুনিক দেবমন্দিরের তুলনা দিতে লজ্জা হয়। পর্ণকুটীরে যাহারা বাস করিত, সংসার ছাড়িয়া যাহারা ধ্যান করিত তাহাদিগের কাব্যে প্রস্তর নির্ম্মিত সীমাবদ্ধ মন্দিরের ভাব দেখিতে পাই না; দেখিব কেমন করিয়া ? কিন্তু তাহাতে নীলাকাশ দেখি, তাহাতে শ্যাম পত্রাবলি দেখি, জ্যোৎস্নালতা দেখি, গাছের পাতার ভিতর মানব হৃদয় দেখি, তপোবনের ভিতর হইতে আকাশবাণী শুনিতে পাই—তপোবনই তাহাদিগের দেব মন্দির ছিল। সংস্কৃত কবিতার মজ্জায় মজ্জায় সেই তপোবনের বিশ্বব্যাপী ভাব নিহিত আছে। তাহাতে সংসারের কলঙ্ক নাই, তাহাতে সম্পত্তি এবং অধিকার, রাজা ও দাসের ভাব দেখিতে পাই না। তাহাতে সংসারীর উপর একটু কেমন ঘৃণা দেখিতে পাই; স্নাত যে চক্ষে অস্নাতকে, শুচি যেমন অশুচিকে, জাগ্রত যেমন সুপ্তকে, স্বচ্ছন্দচারী যেমন বদ্ধ ব্যক্তিকে দেখে, সেই ভাবে বিষয়ীকে কবি ব্রাহ্মণ দেখেন। জনাকীর্ণ রাজ্য-সম্মুখে অগ্নিময় গৃহের ভিতর থাকিলে যে ভাব হয় তাঁহাদিগের সেই ভাব মনে হইত। শকুন্তলাতে শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত উভয়েই ঐ কথা বলিয়াছেন। এখানে কালিদাস অবলম্বন করিয়া দুই একটি উদাহরণ দিব। আমরা সকলেই কালিদাস পড়িয়াছি।

উমা বালিকা বয়স প্রায় ছাড়াইয়াছেন, উমা প্রায় যুবতী, কালিদাস বলিলেন—দিন দিন চান্দ্রমসীর লেখা যেমন বাড়িতে থাকে, উমার সৌন্দর্য্য তেমনই ভাবে বাড়িতে লাগিল।

ইহা কি সংসারী, হীন, ক্লিষ্ট মনের কথা। যে সৌন্দর্য্য দিন দিন বাড়ে তাহার তুলনা নীলাকাশে না খুজিলে কোথায় পাইবে। কিন্তু দেখ একটি বাঙ্গালী কবি সে বিষয় কি লিখিলেন—

শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন নেল॥

বাঙ্গালী কবির মনে বালিকা ও যুবতীর মধ্যবর্ত্তী বয়সের কথায় তাহার বক্র দৃষ্টির কথাই মনে আসিয়াছে। উভয়ের মধ্যে কতটা ভাবের তফাৎ!

আবার দেখ টেনিসন ঠিক ঐ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন—বালিকার এখন এমনই বয়স যে কে জানে কেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ তাহার চোখে জল আসে। কথাটি সমুদয় খানি বুঝিতে পারিলে কি ? বালিকার এমন বয়স যে একটি নূতন অজানিত অভাব মধ্যে মধ্যে তাহার হৃদয় অধিকার করে—তাহাতেই তাহার চোখে জল আসে। ভাবটি সুন্দর নহে কি ? কিন্তু শুদ্ধ সুন্দর মাত্র, কালিদাসের মত মহান নহে, তাহাতে স্বর্গের ভাব নাই, জগতের ভালবাসার ছায়া মাত্র আছে।

আবার দেখ পার্ব্বতীকে দেখিয়া শিবের মন আকৃষ্ট হইল সে কিরূপ ভাবে—"সমুদ্র যেমন জ্যোৎস্নার দ্বারা আকৃষ্ট হয়।"

ইহা কত গভীর! গণ্ডুষমাত্র জল যাহাদিগের দেখা অভ্যাস তাহাদিগের কিরূপে একথা মনে হইবে। হাতাবেড়ী লইয়া যাহাদিগের ব্যবসা তাহাদিগের লৌহ ও চুম্বকের সম্বন্ধ ভিন্ন আর কি মনে হইবে। মিণ্টন 'ইব' এবং 'আদামের' প্রথম দর্শন সময় 'ইবের' মুখে এই কথা কয়টি দিয়াছেন। "আমি কি করিব, অদৃশ্য কি যেন আমাকে তোমার কাছে লইয়া আসিল।"

"—what could I do

But follow straight, invisibly thus led? P. L. Book. iv.

অন্ধ কবির মুখে একথা কত সুন্দর; ইহা বাহ্যিক সৌন্দর্য্য শূন্য বলিয়া গম্ভীর। আবার দেখ ধ্যানমগ্ন মহেশের কথা কালিদাস কি বলিয়াছেন। মহেশ "নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়।" উপমাটি কত গভীর একবার ভাবিয়া দেখ। প্রদীপ যদি দ্বাররুদ্ধ গৃহে নিষ্কম্প থাকে তাহাতে আর নূতন কি, তাহাতে আর দেখিবার কি আছে—তখন চক্ষু ক্ষীণ দীপশিখাটি দেখে না, তাহার সাহায্যে অন্ধকারে যদি কিছু দেখিতে পায় তাহাই দেখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিব আকাশের নীচে ধ্যান করিতেছেন—সেখানে যদি একটি পাতাও না কাঁপে, একটি লতাও যদি কাঁপিয়া কোমল বাহু তুলিয়া আর একটি লতাকে না ধরিতে চায়, সবই নিজের চিন্তা, নিজের স্বপ্নময় ভাব যদি দেখিতে পাই—সেখানে যদি নিতান্ত ক্ষীণ দীপশিখাও না কাঁপে, সে দৃশ্য কত গম্ভীর। জগৎ যেন প্রশান্ত হইয়াছে—জগৎ যেন ধ্যান পরায়ণ। কালিদাসের দীপশিখার সহিত মিণ্টনের "দৃশ্য অন্ধকার" (visible darkness) এই ভাবটির তুলনা দেওয়া যায়। আর এক স্থানে মিলটনের "অস্ফুট ধর্ম্মের আলোক' অর্থাৎ "মন্দিরের অভ্যন্তরের অস্ফুট আলোক" প্রায় এক রকম ভাব। এগুলিতে ধর্ম্ম মন্দিরের ভাব আছে, কালিদাসের কথাটি আকাশের ভাবময়।

এই জগৎ ব্যাপী ভাবের মধ্যেও ক্ষুদ্র লতা পাতা কেমন মিশাইয়া আছে। উমা হাঁটিয়া আসিতেছেন, কালিদাস বলিলেন "সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতেব"। শকুন্তলার যৌবন "লোভনীয় কুসুমের" মত তাহার "অঙ্গে সম্বদ্ধ"। শকুন্তলার ভগিনী "জ্যোৎস্না লতা," শকুন্তলার পুত্র "হরিণশিশু, শকুন্তলা নিজেই বনলতা—সে বনলতা উদ্যানলতাকে হারাইয়া দেয়। শকুন্তলা বল্কল পরিলেও সুন্দর। সরসিজ শৈবালে অনুবিদ্ধ হইলেও যেমন সুন্দর, হিমাংশু যেমন মলিন বলিয়া অধিকতর সুন্দর, তপোবনের শকুন্তলার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। সংস্কৃত কাব্য যাহাই পড় তাহাতে আমাদের সহিত প্রকৃতির সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখিতে পাইবে। এই সহানুভূতির প্রধান কারণ আমাদের আর্য্যধর্ম্ম, আমরা ঈশ্বর সব তাতেই দেখি, সবই আমাদের নিকট খানিকটা দেবগুণসম্পন্ন।

আমরা একভাবে না হয় অন্য ভাবে চিরদিনই প্রকৃতি পূজা করিয়া আসিতেছি। সেই কারণেই নীল আকাশ, স্বচ্ছ সলিল, তপোবন আমাদের দেব মন্দির। তাই, মনুষ্য নির্ম্মিত দেবমন্দিরের সহিত সংস্কৃত কাব্যের তুলনা চলে না, কিন্তু ইয়োরপের কাব্যের চলে—আমি ইংরাজী এবং ফরাশী কবিতার উদাহরণ দিয়া এইখানে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ইংরাজী দেব মন্দিরের বিশেষ একটী লক্ষণ তাহার Gothic (গথিক) গঠন। যে তাহা না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া একটু শক্ত। হাইকোর্টের চূড়া এবং বর্ষাফলকের মত খিলান যে দেখিয়াছে সে বুঝিতে পারিবে গথিক গঠন কাহাকে বলে। পুরাতন ইংরাজী কবিতা খানিকটা গথিক, উন্নত খিলানের উপরে যে দেব মন্দির দাঁড়াইয়া আছে, তাহা সেই ভাব সম্পন্ন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী কবিতা গথিক এবং ষোড়শ শতাব্দীর নবপ্রণালীর গঠনের দেব মন্দিরাদি এই উভয় ভাব সম্পন্ন। স্পেনসরের কবিতা যিনি পড়িয়াছেন তাঁহাকে এই উভয় গঠন মিলিয়া কি বিচিত্র ভাব ধারণ করে তাহা আর বলিতে হইবে না। * স্পেনসরের কবিতার সহিত ওয়েষ্টমিনিষ্টরের অ্যাবির একটী অংশের তুলনা দেওয়া যায়। তাঁহার Prothalamion একটী বিবাহের গান। সেইটী লওয়া যাক। বায়ু দেবতাকে Spenser খেলা করিতে দেখিলেন, তীব্র সূর্য্যালোক তাহারই কৃপায় যেন সহনীয় হইল। রজত সূত্রের ন্যায় টেম্‌স্ নদী, তাহার তীরে কতকগুলি বালিকাকে দেখিলেন, তাহাদিগের হস্তে বিচিত্র বেত লতার সাজি, দু জনের মাথায় বনফুলের মুকুট, তাহাদের গানের প্রতিধ্বনি অদূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে মধুর ভাবে আসিতেছে। এইসব কথা বলিতে বলিতে তাঁহার পারিবারিক গৌরবের কথা মনে পড়িল, সে গৌরব নিজের অহঙ্কারেই গৌরব শূন্য হইয়া পড়িয়াছে—Decayed through pride—যেমন উচ্চ ভিত্তি হইতে প্রস্তর-খণ্ড কালে নিজের ভারে খসিয়া পড়ে, সেইরূপ। পরক্ষণেই আবার সে সব মন হইতে চলিয়া গেল। ইংলণ্ডের গৌরব মনে পড়িল, ইংলণ্ডের কীর্ত্তি, স্তম্ভের মত সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে (Like pillar standing near) কিন্তু তাহার গায়ে লতা পাতা আছে—

(Fair branch of honour, flower of chivalry)—

নদী তুমি, যতক্ষণ আমি এই গান না শেষ করি, ততক্ষণ বহিয়া যাও—এই মনের ইচ্ছাটি একেবারেই রেশমের মত কবিতাতে জড়াইয়া আছে। এ কবিতাটিতে ওয়েষ্ট-

---

* ইউরোপে যখন লুথরের নূতন কথায় ধর্ম্মজগৎ একেবারে নূতন ভাব পাইতে লাগিল, তখন গ্রীক এবং রোমান সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর বিদ্যা এমন কি গৃহ নির্ম্মাণের নিয়মও আবার ইউরোপের নিকট নূতন হইতে লাগিল। সেই সকলেরই যেন নূতন জীবন হইল। সেই সময়ের নাম Renaissance period.

মিনিষ্টর আবির অন্তর্গত সপ্তম হেনরির মন্দির মনে পড়ে। তাহাতে বল, সৌন্দর্য্য, উন্নত ভাব, রোমান এবং গ্রীক গঠন প্রণালী গথিকের সহিত মিলিত।

Ronsard (রঁসার) ফ্রান্সের Spenser বলা যাইতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীর কবি, তিনি এবং Regnier (রেনিয়ে) Renaissanceএর সাময়িক। রঁসারের একটী কবিতা দেখ।

ভিনাস (রতিদেবী) কিউপিডকে (মদনকে) লইয়া আজ আকাশে; দেখ তাহাদের মরালগুলি কেমন উড়িয়া যাইতেছে। আজ যখন আমি উচ্চ শাখী বৃক্ষকে লতার বাহুতে জড়াইয়া আছে দেখিতে পাই, তখন মনে হয় আমার স্কন্ধে প্রণয়িনীর বাহুলতা। "আমার তখন বনদেবতা হইতে ইচ্ছা করে, গাছে যত পাতা আছে ততগুলার দেবী-তাহাকে আদর করিতে চাই।

"এস আমাকে একবার আদর কর, কার্ম্মুকী Diana যেমন তাহার ভাই সূর্য্য দেবতাকে আদর করে, উষা যেমন আকাশকে আদর করে।

"পরমুহূর্ত্তেই আবার আমার নিকট হইতে সরিয়া দূরে যাও, আমি Jove (দেব-রাজ)এর মত শ্বেত বৃষ মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার নিকট আসিব।*

"বনফুল তুমি চিরদিন বেঁচে থাক। যেখানে মেঘের গর্জ্জন নাই, বায়ু যেখানে জোরে বহে না, পৃথিবীকে সুন্দরতর করিয়া সেখানে বাঁচিয়া থাক।"

স্পেনসরের এবং রঁসারের এর কবিতাতে কিছু সাম্য দেখিলে কি? দুই জনেরই মনে গ্রীক এবং রোমান পুরাণের কথা সর্ব্বদাই মনে উদয় হয়, কিন্তু তাহাতে নিজের স্বাভাবিক ভাব বিলীন হইয়া যায় না—যেমন পুরাতন গথিক প্রণালী ও পরবর্ত্তী সময়ের মন্দিরাদি গঠনের নব প্রণালী একত্রে মিলিত থাকে।

স্পেনসরের পরই মিল্টনের কথা স্বভাবতই আমাদের মনে হইবে। Milton, Marvell মার্বেল্ ও Bunyan বুনিয়ান এক সময়ের। তিন জনের কাব্যই ধর্ম্মময়, জাতীয় উৎসাহের ফল স্বরূপ। তাহা Apolloর মত, Venusএর ছায়া মাত্র তাহাতে নাই। মন পবিত্র ভাবে সবই দেখিবে, তাহাতে কোমলতা থাকিবে না, সর্ব্বদা রুদ্র দেবতার মত উচ্চে বসিয়া জীব শাসন করিবে, প্রশস্ত উন্নত ভিত্তির ন্যায় নিজের বলেই দাঁড়াইয়া থাকিবে। তাহাতে এমন কিছুই নাই যাহা অনাবশ্যক, যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহা ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই থাকিবে না। মিসরের পিরামিডের এর মত, আমাদিগের

---

* ইওরোপা একটি অপ্সরীর অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা। একদিন সে ফুল তুলিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া দেবরাজ Jove বৃষমূর্ত্তি ধরিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বালিকা ইউরোপা তাহার গায়ে হাত দিল, আদর করিল, শেষে সাহস করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। তখন তাহাকে লইয়া 'জোব' পালাইয়া যান। ইউরোপার হরণ-ভূমিকেই ইয়োরোপ বলে।

দেবালয়ের অভ্যন্তরের মত তাহা ভূষণ হীন। ইংলণ্ডের গথিক গঠনের ভাব সম্পন্ন এই তিন জন কবির মধ্যে মিল্টনের কাব্যই বিশেষ পরুষ ভাব সম্পন্ন। তিনিই স্বর্গ হারাইয়া, আবার স্বর্গ আনিয়া দিয়াছেন। আজ কাল ওরূপ বিষয় লইয়া কবিতা লিখিতে কে সাহস করেন। বোয়াল্‌ফ, মিল্টনের প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রস্তর স্তূপ মাত্র। মিল্টনের কবিতা তাহার নিজের কথায় বর্ণনা করা যাইতে পারে।

"Woven close both matter form and style" Milton;

ছন্দ, প্রণালী এবং ভাব কেমন ঘন ভাবে সম্মিলিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সের রাজগৃহের সহিত মিল্টনের চতুর্দ্দশ পদী কবিতার তুলনা হয়। সে রাজ প্রাসাদে কারুকার্য্য নাই, তাহাতে চতুর হস্তের কৌশলের পরিচয় নাই, তাহা উচ্চ উন্নত গৌরবময়, তাহাতে বল আছে, পরুষ সৌন্দর্য্য আছে, তাহাতে কোমল লাবণ্য না থাকিতে পারে, তাহা প্রস্তর হইয়াও স্বপ্ন রাজ্যের যেন। ফ্লোরেন্সের আলবের্টি এবং ব্রুনেলেস্‌কি যে ভাবের গৃহ নির্ম্মাতা মিল্টন সেই ভাবের কবিতা লেখক। মিল্টন সেক্সপিয়ারের কথা কি বলিয়াছেন শুন—

These delphic lines with deep impression took.

কবিতার ছত্র গুলিতে গ্রীসের Delphos মন্দিরের কথা মনে পড়ে। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে সেই মন্দিরের পুরোহিত কন্যারা যাহা বলিত তাহা গ্রীসে দেববাণী বলিয়া গৃহীত হইত।

Shakspeare নিজে ক্লেশাভিভূত মুখের কথা একস্থানে বলিয়াছেন চক্ষুর জল যেন তাহাতে কষ্ট খোদিত করিয়া দিয়া গিয়াছে।

"The face, misfortune carved in it with tears"　　Shaks: Lucrece.

ড্রামণ্ড আর একটী সেই সময়ের কবি, নিজের হৃদয় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে তাহা জীবন্ত পিরামিডের স্বরূপ। ইহাতে ইংরাজি কবিতার মন্দিরের ভাব আছে সহজেই বুঝা যাইবে। মিল্টনের মত কবি ফ্রান্সে কখনও হয় নাই। ইংলণ্ডের ঘরাউ যুদ্ধে (Civilwar) এবং ফরাশী বিপ্লবে যে প্রভেদ, ভিকটর হিউগো এবং মিল্টনে, আর পারিশের নটরডাম মন্দির এবং ইংলণ্ডের ওয়েষ্টমিনিষ্টর আবিতে সেই প্রভেদ। হিউগো নিজে নটর ডাম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন বারান্তরে লিখিবার ইছা থাকিল।

নূতন বিপ্লবের পর ভাষা নূতন ভাব, নূতন কথা, নূতন বল পায়। বিজয়ী রঘুর সেনার—সহিত যেমন দেশ বিদেশের বিজিত রাজা প্রজা তাঁহার নূতন বল স্বরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ।

এখন দুই একটি ফরাশী কবিতা অনুবাদ করিয়া দিব। তাহাতেই বুঝিতে পারিবে ইংরাজীর সহিত তাহার কি প্রভেদ। যে সময় ইংলণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ছিল, ক্রমে

বিপুলতা, একতা লাভ করিতে লাগিল, তখন ফ্রান্সও তেমনি একত্রিত হইতেছিল। তখন দুই দেশেই নূতন উৎসাহ, নূতন তেজ, নূতন চিন্তা প্রত্যেক কার্য্যেই দেখা যায়। সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর মধ্যে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডকে সর্ব্বাপেক্ষা দেবালয় নির্ম্মাণ-কুশল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উৎসাহ একরূপ এবং কবিত্ব মনের অন্য-রূপ ভাব। ইংলণ্ড নূতন স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের বলে প্রতাপশালী হইয়া উঠিল কিন্তু ফ্রান্স সেই ধর্ম্ম সেই বিশ্বাসের সহিত, মাধুর্য্য, লাবণ্য, প্রেম, প্রীতি মিশাইয়া দিল। সেই কোমল ভাব প্রত্যেক দেবমন্দিরে, প্রত্যেক কবিতাতে দেখিতে পাইবে। (Amiens) আমিয়ঁ মন্দিরের মহান চূড়া রাজ প্রাসাদ ছাড়াইয়া উন্নত ভাবে আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া কে স্তম্ভিত হয় নাই? এবং সলিস্‌বারি কেথেড্রাল দেখিয়া কাহার হৃদয় পবিত্র, শান্তিময় হয় নাই? চন্দ্রালোকে মেলরোজ, কবি Scottএর চোক্ষে যে দেখিয়াছে, সমুদ্রের ধারে গাছ পালার ছায়ার ভিতর রক্তবর্ণ প্রস্তরের ফারনেস আবি ভগ্নাবশেষ গোধূলির আলোকে যে দেখিয়াছে তাহাকে ফরাসী এবং ইংরাজী গীতি কাব্যের প্রভেদ বুঝাইতে হইবে না।

একটি পুরাতন ফরাসী গ্রাম্য গাতি দেখ—

দেখিবি, কাহারে ভাল যে বাসি
(অঘুম চোখে) হৃদয় চলরে দেখিয়া আসি।
প্রভাত আলোকে কনক তরী, দ্বিরদরদের মাস্তল তারি
রেশমের পাল, কনকের হাল
কতই সুন্দর আহা মরি মরি!
তাহাতে আসিছে রাজার মেয়ে, চাহেনা তারেত আমার হিয়ে?
দেখিবি কাহারে ভাল যে বাসি
(অঘুম চোখে) হৃদয় চলরে দেখিয়া আসি।
অই আকাশের গায়, দুলে বসন্তের বায়
দেখ অই দূরে চেয়ে—কেসে যে আসিছে বেয়ে
ছোটখাট ডিঙা খানি, আমারি সেত হৃদয় রাণী!

ইহার সহিত উনবিংশ শতাব্দীর একটি ফরাসী কবিতার তুলনা দিতে ইচ্ছা হয়।

বল্‌রে যুবতী বালা কোথা যাবি তুই?
পাল উড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে, চল্ কোথা যাবি তুই।
সোনার ডিঙায় সোনার হাল, পরীর পাখায় উড়িছে পাল
হাতির দাঁতের দাঁড়টি লয়ে, দেবতার ছেলে যাইবে বেয়ে, বালা কোথা যাবি তুই?
পাল উড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে, চল্ কোথা যাবি তুই?

বাল্‌টিক সাগর ধারে, কিম্বা পাসিফিক্ পারে
ছুলাতে হিমানি দুল, পরিতে অশোক ফুল
যথা সাধ যাহা চাই, চল্ আনিবারে যাই।
পরীর পাখার উড়িছে পাল, সোনার ডিঙায় সোনার হাল্, বালা কোথা যাবি তুই ?
আগ্রহে বলিল বালা—"জুড়াতে হৃদয় জ্বালা,
"চির প্রেম যেথা পাব, চল সেই দেশে যাব"
'কোথা সেই দেশ প্রেমের রাজার, জানেনাক কেহ বালিকা আমার।" T. (গোটিয়ে)

আমার ফরাসী কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে কোন বৈষ্ণব কবির লেখা পড়িতেছি। তাহাতে যে সৌন্দর্য্য লালসা আছে, তাহা নিতান্ত কোমল ভাবে পরিস্ফুট। তাহাতে যে প্রেমের কথা আছে, প্রণয়ের যে জ্বালা আছে সবই যেন মধুর। আকাশের মেঘে, তমাল তরুতে, যমুনার জলেও যেন প্রেমের ছায়া পড়িয়াছে। যাহাকে ভালবাসি সে যে জলে স্নান করিয়াছে সেই জল আমাকে ডুবাইয়া দিক—জ্যোৎস্নার আলোকে অমাবস্যার অন্ধকারে, কুঞ্জে কি গৃহে লৌকিক বাধা অতিক্রম করিয়া প্রেম আমার কাছে আসুক, এই ভাব পরিপূর্ণ। একটি প্রাণ আর একটিতে লীন হইয়া গিয়াছে তাহাই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। হিউগোর এই একটি কবিতা দেখ ;

আমিত গোলাপ, প্রজাপতি তুই—আজ হোক্ কাল হোক, মাটিতে মিশাব দুই।
ওখানে উড়িস কেন আয় কাছে আয়, থাকিব দুজনে মিলি যেথা প্রাণ চায়।
চল যেথা প্রাণ যায়, উড়িবি মলয় বায়,—
হোক না যে কোন স্থান পেতে দিব মম প্রাণ।
হৃদয়ের শ্বাস, বর্ণের বিকাশ, প্রজাপতি হোক্ গোলাপ কোরক,
পাখা গুটাইয়া হৃদয় মেলিয়া দুজনে মিলিবে দুই।
থাকিব মিলিয়া হৃদয় ঢালিয়া—আকাশের গায়, ধূলার শয্যায়—
যথা হোক তথা, সে পরের কথা,
প্রাণীর প্রধান ধর্ম্ম, প্রাণীর প্রথম কর্ম্ম, প্রাণের মিলন।

আধুনিক ফরাসী কবিতার সহিত দেব মন্দিরের তুলনা দেওয়া যায় না। যেমন ওয়ার্ডসোয়ার্থের লিউসি গ্রে, কুটীরের কথা, শীলা খণ্ডের নীচে ছোট একটি ফুলের কথা, আকাশে একটি তারার কথা, তাহার সহিত দেব মন্দিরের উপরে যে আকাশ এবং নীচে যে ভূমিখণ্ড তাহারই তুলনা হয়—সেলির কবিতার যে আশা, ভালবাসা, যে জীবনের কথা আছে, তাহার সহিত হোম ধূমের সন্ধ্যারতির আলোক ও অন্ধকারের সহিত যেমন তুলনা হয়; ভিক্টর হিউগোর কবিতার সহিত তেমনই পারিস এমন কি সমস্ত জগতের তুলনা হয়। নটর ডামে যেমন পারিসের পাপ পুণ্য, রাজা প্রজা, সাধারণ ও নীচ,

অসাধারণ ও উন্নত যাহা কিছু সব আছে, হিউগোর কবিতায় সেইরূপ কাতর হৃদয়ের ভগ্নস্বর, আনন্দের তীব্র গান, জয়ের উচ্ছাস, দরিদ্রের ক্রন্দন, জাতীয় স্থির গাম্ভীর্য্যের সহিত ঘোর বিপ্লবের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে; সেখানে প্রণয়ের নিশ্বাস দোষিত হইলেও চক্ষুর জল কলঙ্কিত হইলেও দেবী ম্যাগডেলেনের মত অশ্রুময়ী পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—সেখানে পুরোহিতের কথা দেববাণী, সেখানে অত্যাচারের ক্রোধ কিম্বা প্রতিভার গর্ব্ব সবই দেব ভাব পরিপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক ফরাসী কবিতা দেব মন্দির হইতে পথের ভিখারীর সহিত, পথ প্রান্তে দরিদ্রের পার্শ্বে পাপীর সহিত, কলঙ্ক মাখিতে ঘৃণা না করিয়া, জগতের নীচ হইতেও নীচের হাসি কান্না লইয়া, জীর্ণ শীর্ণ মলিন যাহা কিছু আছে তাহা ধন, বল, গৌরব, সৌন্দর্য্যের পার্শ্বে রাখিয়া তোমাকে শুদ্ধ মাত্র এই বলে, "চিত্র দেখিবে, কবিতা শুনিবে, ঐ দেখ, ঐ শুন ইহাই জগৎ—ইহাই কাব্যজগৎ।

শ্রী আশুতোষ চৌধুরী।

মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীমকোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গবর্ণর সাহেব এই কথা বলিলে, আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা আপনি এই মাত্র বলিলেন, তাহার ন্যায় অন্যায় একবার বিবেচনা করিবেন ও যতদিন পর্য্যন্ত না আপনি এই প্রকার বিচার করিবেন, ততদিন আমি আপনার বাড়ী আসা বন্ধ করিব।" এই কথা বলিয়া আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম—মনে মনে ভাবিলাম—গবর্ণর যাহা বলিয়াছেন, হয় ত তাহা রাগের মুখেই হইয়া থাকিবে—তিনি যে সত্য সত্যই আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন ইহা আমার তিলমাত্র বিশ্বাস হইল না। কিন্তু যখন আমি দেখিলাম—যে জগৎচাঁদ গোপনে গোপনে গবর্ণরের বাটীতে যাতায়াত করিয়া নানাবিধ মন্ত্রণা করিতেছে, তখন আমার এ সন্দেহ বৃদ্ধি পাইল। এই জগৎচাঁদকে আমি বাল্যকাল হইতে অপত্য-নির্ব্বিশেষে লেখা পড়া শিখাইয়াছি নানা স্থলে ইহার জন্য অনুরোধ করিয়া ইহার চাকরি করিয়া দিয়াছি, এমন কি—সে এখনও আমার পুত্র গুরুদাসের অধীনে, নায়েবের কার্য্য করিতেছে। কিন্তু যখন আমি দেখিলাম যে জগৎচাঁদ আর আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে না ও গোপনে গোপনে গবর্ণরের নিকট যাতায়াত করিয়া আমার ও রাজা গুরুদাসের অনিষ্ট চেষ্টা পাইতেছে - তখন আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। যখন দেখিলাম আমার পরম শত্রু

মোহনপ্রসাদ (যে মোহনপ্রসাদ কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী সকলেরই চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র—যাহাকে সকলেই সেই সময়ে শঠ প্রবঞ্চক ও ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া জানিত এমন কি স্বয়ং গবর্ণর হেষ্টিংসই যাহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ও তাহাকে তাঁহার সম্মুখে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন) পুনরায় গবর্ণরের প্রসাদভাজন হইয়া তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে ও গবর্ণর সাহেব তাহাকে পান ও আতর প্রদান করিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করিতেছেন—তখন আমার এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেব, তাঁহার আলিপুরের বেলভেডিয়ারের বাগানে * ও কলিকাতার বাটীতে, সকল সময়েই মোহনপ্রসাদের সহিত গোপনে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; এবং মোহনপ্রসাদও সদাসর্ব্বদা জগৎচাঁদের বাটীতে গোপনে ও প্রকাশ্য ভাবে—যাতায়াত করে, ও এই সকল বিষয়ে তাহার সহিত মন্ত্রণা করে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা, মোহনপ্রসাদ কি বিশেষ কারণে গবর্ণরের বাটীতে যাতায়াত করে? সে সদ্বংশজাত বা নিতান্ত বিশ্বাসী, বা উচ্চপদস্থ কোন কর্ম্মচারী নহে—তবে সদাসর্ব্বদা গবর্ণরের সহিত, সে কি এত মন্ত্রণা করে? আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া অকারণে আমার অনিষ্ট সাধন করা ভিন্ন এ প্রকার স্থলে তাহার অন্য আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? যাহা হউক আমি এ সমস্ত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি। তিনিই আমাকে এই প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। আত্ম-মর্য্যাদাকে আমি আমার জীবনের অপেক্ষাও বহু মূল্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেবের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া আমি যে ঘোরতর বিপদাভিমুখে ধাবিত হইতেছি একথাও আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। অনেকে এই অভিযোগ উপস্থিত করার জন্য আমার উপর দোষারোপ করিবে, কিন্তু কি করিব? আমার অন্য উপায় নাই। গবর্ণরের অনুষ্ঠিত কার্য্য সমূহের বিষয় সম্যক অবগত

* আজকাল আলিপুরের বেলভেডিয়ার যেখানে বঙ্গেশ্বর টমসন বাস করিতেছেন—হেষ্টিংসের বাগান বাটী ইহারই পশ্চাৎ ভাগে ছিল। আলিপুরের আয়রা টবাগানের নিকট "Hastings House," নামক একটী প্রশস্ত বাগান বাটী, আজও বর্ত্তমান। হেষ্টিংসের নূতন জীবন চরিত লেখক, Trotter সাহেব বলেন—যে বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বরের বাটির সীমানার মধ্যে হেষ্টিংসের বাগানবাটি ছিল। কিন্তু তীক্ষ্ণদর্শী বিচক্ষণ ঐতিহাসিক জজ বেভারিজ মহোদয়, উপরোল্লিখিত Hasting's House কেই হেষ্টিংসের বাগানবাটি বলিয়া সন্দেহ করেন। আমরাও ইহাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি—কিয়ৎ কাল পরে হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়, তাহা আলিপুরের পশুশালার নিকটস্থ দুইটী অশ্বত্থ বৃক্ষতলে হইয়াছিল—জনশ্রুতি, যে সেই দুইটী বৃক্ষ আজও বর্ত্তমান। ইংরেজরা ইহাদিগকে "Trees of destruction" বলিয়া থাকেন। ফ্রান্সিস্ যুদ্ধে আঘাতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলে—হেষ্টিংসের বাটী হইতে পালকী আনিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হইতেছে—হেষ্টিংসের বাগানবাটী বর্ত্তমান Belvedere হইতে দূরে ছিল।

থাকিয়া তদ্বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেলে ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা আরও বিপদ ও লাঞ্ছনা ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আত্ম রক্ষার্থে ও ন্যায়ধর্ম্মানুরোধে আমি আপনাদের সমক্ষে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি। এক্ষণে আমি এ বিষয়ে আপনাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রার্থনা করি। *

যখন হেষ্টিংস সাহেব মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালার গবর্ণর রূপে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, পদোচিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন, সেই সময় একদিন আমাকে ডাকিয়া বলেন—যে তিনি মহম্মদ রেজা খাঁ ও সেতাব রায়ের অন্যায়রূপে কোম্পানীর তহবিল-ভাঙ্গার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, যে মহম্মদ রেজা খাঁ ও সেতাবরায় নানাবিধ অযথা উপায়ে কোম্পানীর অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বাসনা এই যে—তিনি উক্ত দুইজন রাজকর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিতে চাহেন। তাঁহার এই প্রকার উদ্দেশ্য আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিয়া হেষ্টিংস আরও বলিলেন যে আমার সহায়তা পাইলে কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার্থে এই প্রকার কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইবে না। ইহার পর গবর্ণর সাহেব আমায় বলিলেন—"আমি কলিকাতা-কৌন্সিলের সহায়তায় আপনাকে সমস্ত বঙ্গ দেশের আমিন স্বরূপে নিযুক্ত করিব—এবং রাজা সেতার রায় ও মহম্মদ রেজা খাঁ আপনার নিকট তাঁহাদের শাসিত প্রদেশ সমূহের হিসাবাদি অর্পণ করিবেন। আমি এই বিষয়ের জন্য আপনাকে আমার পদোচিত সমস্ত ক্ষমতার সহিত সাহায্য করিব।" আমি গবর্ণরের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার ক্ষমতায় যতদূর হইতে পারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার পরই হেষ্টিংস সাহেব নায়েবসুবাদার মহম্মদ রেজা খাঁ ও পাটনার গবর্ণর রাজা সেতার রায়কে কলিকাতায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। আমি তাঁহার অভিমতানুযায়ী উক্ত প্রাদেশিক-শাসন-কর্ত্তাদ্বয়ের "তহবিল ভাঙ্গার" একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলাম।

বঙ্গদেশের নবাব সরকার হইতে নানাবিধ বহুমূল্য রত্নময় জড়োয়া গহনাদি ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতি রাজব্যবহার্য্য মূল্যবান দ্রব্যাদি ছাড়া মহম্মদ রেজা খাঁ ১১৭২ সাল হইতে ১১৭৮ সাল পর্য্যন্ত, এই ছয় বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশ ও ঢাকা প্রদেশ হইতে উৎপন্ন রাজস্বের মধ্যে প্রায় কুড়িকোটী টাকা অন্যায় উপায়ে আত্মসাৎ করেন। ... ... এতদ্ভিন্ন, মহা দুর্ভিক্ষের সময়ে (ছিয়াত্তরে মন্বন্তর) মহম্মদ রেজা খাঁ অনেক টাকার ধান ও চাউল খরিদ করিয়া গোলাজাত করিয়া রাখিয়া পরে তাহা উচ্চদরে বিক্রয় করেন। এই বিষয়ের স্বপক্ষে আমি নানাবিধ অকাট্য প্রমাণ ও অনেকগুলি বিশ্বস্ত সাক্ষী সংগ্রহও

---

* Vide Parliamentary History of England From the earliest period to the year 1803. Vol. XXVII P. 334.

করিয়াছিলাম। তিনি যে সমস্ত লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই এই সাক্ষীশ্রেণী সন্নিবিষ্ট ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ এই সময়ে অন্য উপায় না দেখিয়া আমাকে বলিয়া পাঠান—"আমি আপনাকে দুই লক্ষ ও গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেবকে দশলক্ষ টাকা দিব আপনারা আমার কার্য্য সম্বন্ধে ইহার পর হইতে আর কোনও প্রকার অনুসন্ধানাদি করিবেন না। আমি এই সমস্ত কথা উপযুক্ত সময়ে গবর্ণর সাহেবকে বলিলে তিনি বলিলেন—"মহম্মদ রেজা খাঁ কোম্পানীর তহবিলের অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন—এককোটী টাকার জন্য আমি তাঁহাকে এই সমস্ত প্রমাণসাপেক্ষ গুরুতর অভিযোগ হইতে মুক্তি প্রদান করিতে পারি না। কোম্পানীর টাকা কোম্পানীর তহবিলে যাইলেই ভাল হয়—ছাড়িয়া দেওয়ার কথা দূরে থাক্—এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটী প্রধান অভিযোগ সম্বন্ধে যতদিন না তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইবে ততদিন আমি তাঁহাকে প্রহরী সুরক্ষিত করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিব।" ইহার পর গবর্ণর সাহেব আমাকে আর কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উল্লিখিত কথোপকথনের কিয়দ্দিবস পরেই তিনি মহম্মদ রেজা খাঁকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দিলেন। খাঁ সাহেবের আবাস বাটীর চতুর্দ্দিকের সিপাহী ও গোরা পাহারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কোম্পানীর রাজস্বের টাকা আত্মসাৎ করার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ ও তদন্ত হইতেছিল—তাহাও সেই দিবস হইতে থামিয়া গেল। যাহারা রেজা খাঁর বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হইয়া প্রচুর প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার দোষ সমূহ সম্পূর্ণ প্রমাণ করিয়া তুলিয়াছিল তাহারা সকলেই গবর্ণরের এই প্রকার ব্যবহার দর্শনে নিরাশ ও ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রচুর পরিমাণে ধান ও চাউল কিনিয়া গোলাবন্দী করিবার সময় খাঁ সাহেব যাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিলেন তাহাদের সেই ক্ষতিও আংশিক পূরণ হইল না। হঠাৎ কেন মহম্মদ রেজা খাঁ গবর্ণরের এতদূর অনুগ্রহ ভাজন হইলেন ও তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলির সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াও কোম্পানীর স্বার্থের হানি করিয়া হেষ্টিংস সাহেব কেন যে হঠাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন ইহার কারণ তিনি নিজেই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। *

রেজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ ও মহম্মদ আলি খাঁ নামক দুই জন উচ্চ পদস্থ মুসলমান, † তাঁহাদের কার্য্যের জন্য কোম্পানীর নিকট প্রায় এক লক্ষ টাকার দায়িক ছিলেন। তাহাদের মৃত্যুর পর মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহাদের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক্

* Vide—Appendix 1 to the 11th Report of the Select Committee on India Affairs.

† ইহারা দুই জনে ক্রমান্বয়ে হুগলী ও (Shilot) শ্রীহট্টের (?) ফৌজদার ছিলেন।

থাকিয়া তদ্বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেলে ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা আরও বিপদ ও লাঞ্ছনা ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আত্ম রক্ষার্থে ও ন্যায়ধর্ম্মানুরোধে আমি আপনাদের সমক্ষে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছি। এক্ষণে আমি এ বিষয়ে আপনাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রার্থনা করি। *

যখন হেষ্টিংস সাহেব মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালার গবর্ণর রূপে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, পদোচিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন, সেই সময় একদিন আমাকে ডাকিয়া বলেন—যে তিনি মহম্মদ রেজা খাঁ ও সেতাব রায়ের অন্যায়রূপে কোম্পানীর তহবিল-ভাঙ্গার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, যে মহম্মদ রেজা খাঁ ও সেতাবরায় নানাবিধ অযথা উপায়ে কোম্পানীর অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বাসনা এই যে—তিনি উক্ত দুইজন রাজকর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিতে চাহেন। তাঁহার এই প্রকার উদ্দেশ্য আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিয়া হেষ্টিংস আরও বলিলেন যে আমার সহায়তা পাইলে কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার্থে এই প্রকার কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইবে না। ইহার পর গবর্ণর সাহেব আমায় বলিলেন—"আমি কলিকাতা-কৌন্সিলের সহায়তায় আপনাকে সমস্ত বঙ্গ দেশের আমিন স্বরূপে নিযুক্ত করিব—এবং রাজা সেতার রায় ও মহম্মদ রেজা খাঁ আপনার নিকট তাঁহাদের শাসিত প্রদেশ সমূহের হিসাবাদি অর্পণ করিবেন। আমি এই বিষয়ের জন্য আপনাকে আমার পদোচিত সমস্ত ক্ষমতার সহিত সাহায্য করিব।" আমি গবর্ণরের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার ক্ষমতায় যতদূর হইতে পারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার পরই হেষ্টিংস সাহেব নায়েবসুবাদার মহম্মদ রেজা খাঁ ও পাটনার গবর্ণর রাজা সেতার রায়কে কলিকাতায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। আমি তাঁহার অভিমতানুযায়ী উক্ত প্রাদেশিক-শাসন-কর্ত্তাদ্বয়ের "তহবিল ভাঙ্গার" একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলাম।

বঙ্গদেশের নবাব সরকার হইতে নানাবিধ বহুমূল্য রত্নময় জড়োয়া গহনাদি ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতি রাজব্যবহার্য্য মূল্যবান দ্রব্যাদি ছাড়া মহম্মদ রেজা খাঁ ১১৭২ সাল হইতে ১১৭৮ সাল পর্য্যন্ত, এই ছয় বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশ ও ঢাকা প্রদেশ হইতে উৎপন্ন রাজস্বের মধ্যে প্রায় কুড়িকোটী টাকা অন্যায় উপায়ে আত্মসাৎ করেন। ... ... এতদ্ভিন্ন, মহা দুর্ভিক্ষের সময়ে (ছিয়াত্তরে মন্বন্তর) মহম্মদ রেজা খাঁ অনেক টাকার ধান ও চাউল খরিদ করিয়া গোলাজাত করিয়া রাখিয়া পরে তাহা উচ্চদরে বিক্রয় করেন। এই বিষয়ের স্বপক্ষে আমি নানাবিধ অকাট্য প্রমাণ ও অনেকগুলি বিশ্বস্ত সাক্ষী সংগ্রহও

* Vide Parliamentary History of England From the earliest period to the year 1803. Vol. XXVII P. 334.

করিয়াছিলাম। তিনি যে সমস্ত লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই এই সাক্ষীশ্রেণী সন্নিবিষ্ট ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ এই সময়ে অন্য উপায় না দেখিয়া আমাকে বলিয়া পাঠান—"আমি আপনাকে দুই লক্ষ ও গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেবকে দশলক্ষ টাকা দিব আপনারা আমার কার্য্য সম্বন্ধে ইহার পর হইতে আর কোনও প্রকার অনুসন্ধানাদি করিবেন না। আমি এই সমস্ত কথা উপযুক্ত সময়ে গবর্ণর সাহেবকে বলিলে তিনি বলিলেন—"মহম্মদ রেজা খাঁ কোম্পানীর তহবিলের অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন—এককোটী টাকার জন্য আমি তাঁহাকে এই সমস্ত প্রমাণসাপেক্ষ গুরুতর অভিযোগ হইতে মুক্তি প্রদান করিতে পারি না। কোম্পানীর টাকা কোম্পানীর তহবিলে যাইলেই ভাল হয়—ছাড়িয়া দেওয়ার কথা দূরে থাক্—এমন কি তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটী প্রধান অভিযোগ সম্বন্ধে যতদিন না তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইবে ততদিন আমি তাঁহাকে প্রহরী সুরক্ষিত করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিব।" ইহার পর গবর্ণর সাহেব আমাকে আর কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উল্লিখিত কথোপকথনের কিয়দ্দিবস পরেই তিনি মহম্মদ রেজা খাঁকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দিলেন। খাঁ সাহেবের আবাস বাটীর চতুর্দ্দিকের সিপাহী ও গোরা পাহারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কোম্পানীর রাজস্বের টাকা আত্মসাৎ করার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ ও তদন্ত হইতেছিল—তাহাও সেই দিবস হইতে থামিয়া গেল। যাহারা রেজা খাঁর বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হইয়া প্রচুর প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার দোষ সমূহ সম্পূর্ণ প্রমাণ করিয়া তুলিয়াছিল তাহারা সকলেই গবর্ণরের এই প্রকার ব্যবহার দর্শনে নিরাশ ও ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রচুর পরিমাণে ধান ও চাউল কিনিয়া গোলাবন্দী করিবার সময় খাঁ সাহেব যাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিলেন তাহাদের সেই ক্ষতিও আংশিক পূরণ হইল না। হঠাৎ কেন মহম্মদ রেজা খাঁ গবর্ণরের এতদূর অনুগ্রহ ভাজন হইলেন ও তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলির সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াও কোম্পানীর স্বার্থের হানি করিয়া হেষ্টিংস সাহেব কেন যে হঠাৎ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন ইহার কারণ তিনি নিজেই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। *

রেজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ ও মহম্মদ আলি খাঁ নামক দুই জন উচ্চ পদস্থ মুসলমান, † তাঁহাদের কার্য্যের জন্য কোম্পানীর নিকট প্রায় এক লক্ষ টাকার দায়িক ছিলেন। তাহাদের মৃত্যুর পর মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহাদের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক্

* Vide—Appendix 1 to the 11th Report of the Select Committee on India Affairs.

† ইহারা দুই জনে ক্রমান্বয়ে হুগলী ও (Shilot) শ্রীহট্টের (?) ফৌজদার ছিলেন।

করেন। সেই সমস্ত বিষয়ের সমস্ত অংশই তিনি নিজে আত্মসাৎ করিয়াছেন ও তাহার কপর্দ্দক মাত্রও কোম্পানীকে প্রদান করেন নাই। * * * * ইহা ভিন্ন রেজা খাঁ আর একটী গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। নবাবের প্রধান কর্ম্মচারী—নায়েব সুবাদারের পদ লাভ করিলেই সরকার হইতে, উক্ত নায়েব সুবাদারের ব্যবহারার্থে একটী মূল্যবান জায়গীর প্রদান করা হইয়া থাকে। যখন উক্ত সুবাদার কার্য্যচ্যুত হন তখন তাঁহার সহিত উক্ত জায়গীরের কোন সম্বন্ধই থাকে না। তাঁহার উত্তরাধিকারিই তাহা ভোগ দখল করিয়া থাকেন। স্বয়ং গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেবই আমায় এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই—যে মহম্মদ রেজাখাঁ প্রায় তিন বৎসর হইল পদচ্যুত হইয়াছেন—তথাপি তিনি প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে উক্ত জমীদারীর স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন।" *

"রাজা সেতাব রায়ের বিরুদ্ধে মহম্মদ রেজাখাঁর ন্যায় অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যে সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন—তাহার একটী তালিকা আমি হেষ্টিংস সাহেবকে দেখাইয়াছিলাম। ১১৭৩ সালের (ফস্‌লী) প্রথম হইতে ১১৮১ সালের শেষ পর্য্যন্ত সেতাব রায় কম বেশ, নব্বুই লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। যখন তাঁহার অবরোধ সংবাদ মুরশীদাবাদে রাজা দুর্জ্জয় নারায়ণের নিকট পৌঁছিল তখন তিনি ও গবর্ণর রিড্ সাহেব আমার নিকট এক উকীল প্রেরণ করিলেন। উকীল আসিয়া বলিল—"কোম্পানীর—সেতাবরায়ের নিকট প্রাপ্য টাকা হইতে যদি ৩০ লক্ষ টাকা কমাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বাকী ৬০ লক্ষ টাকা রাজা দুর্জ্জয়নারায়ণ কোম্পানীকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে সেতাব রায়ের পদনিবিষ্ট করিতে হইবে। পরে যখন দেশের অবস্থা তিনি (দুর্জ্জয়নারায়ণ) ক্রমশঃ উন্নত করিতে সক্ষম হইবেন—তখন কোম্পানীর ধনাগারে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত অর্থাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজস্ব জমা দিবেন।" রাজা সেতাব রায় এই ঘটনা অবগত হইয়া আমার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন—যদি তাঁহার এই অভিযোগ সম্বন্ধে আর কোন প্রকার অনুসন্ধান না করা হয় তাহা হইলে তিনি গবর্ণরকে চারিলক্ষ, আমাকে একলক্ষ, ও রিড সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা উপহার স্বরূপ প্রদান করিবেন। রাজা সেতাব রায় যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন আমি অবিকল তাহাই গবর্ণরকে বলিলাম। তিনি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে অসম্মতি প্রদান করিয়া বলিলেন—"কোম্পানির টাকা যেমন করিয়াই হউক উদ্ধার করিতেই হইবে। আমাদের এ সম্বন্ধে, অন্য কোন প্রকার বন্দো-

* মহম্মদ রেজাখাঁর বিরুদ্ধে ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি অভিযোগ আছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে ও অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক বোধে আমরা আপাততঃ তাহা পরিত্যাগ করিলাম। সময় ও সুযোগ মতে স্থান বিশেষে উক্ত অভিযোগ গুলির সম্পূর্ণ সমালোচনা করা যাইবে।

বস্ত বা এ প্রকার ব্যবহার করা উচিত নহে।” এই প্রকার মনোভাব মুখে প্রকাশ করিয়াও হেষ্টিংস সাহেব কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই। তিনি কোম্পানীর টাকা আদায় না করিয়া সেতাব রায়কে ছাড়িয়া দিয়াছেন ও তাঁহার পূর্ব্বপদেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এবিষয়ে তিনি আমার সহিত কোন প্রকার মন্ত্রণা বা আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। সেতাব রায়কে—বিচার শেষ না হইতে হইতেই সম্মানের সহিত মুক্তি দিয়া, কি কারণে গবর্ণর হেষ্টিংস রাজা দুর্জ্জয়-নারায়ণের প্রস্তাবটী (যাহা কোম্পানীর পক্ষে অশেষ-লাভকর) অগ্রাহ্য করিলেন তাহা তিনি নিজেই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

হেষ্টিংস সাহেব যখন বেনারসে গমন করেন তখন কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত বেহার অঞ্চলের জমীদারী সমূহের একটি তালিকা আমায় প্রস্তুত করিয়া দিতে বলেন। কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত অনেক স্থল কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ নিজ জমীদারী ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে বলবন্ত সিংহের উত্তরধিকারার নিকট হইতে, এই সমস্ত বিষয় পৃথক করিয়া লইবার জন্য হেষ্টিংস আমার নিকট উপোরক্ত তালিকা প্রার্থনা করেন। আমি কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তি হইতে ১১৭৯ সাল পর্য্যন্ত একটী হিসাব প্রস্তুত করিয়া দিই। সেই হিসাবে ২৪ লক্ষ টাকা বলবন্ত সিংহের নিকট পাওনা হয়। বলবন্ত সিংহ—কেরা মাগুরা ও বিজয় গড় নামক তুইটী পরগণা—স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস তালিকা পাইয়া আমায় বলেন “আপনার জামাতা রায় রাধাচরণকে বলবন্ত সিংহের পুত্র চৈৎ সিংহের নিকট এই তালিকা সমেত উকীল রূপে পাঠান যাউক। যদি চৈত্ সিংহ এই প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধে কোন আপত্তি করেন, তবে রাধাচরণ তাঁহাকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিতে ও তাঁহার সেই আপত্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন। * কিন্তু হেষ্টিংস যখন বেনারসে উপস্থিত হইলেন চৈৎ সিংহের সহিত যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হইল—সে সময়ে তিনি ইহার সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন না। রাজা চেত্ সিংহের দখলে পূর্ব্ববৎই জমীদারী রহিয়া গেল। কোম্পানীর স্বার্থের হানি করিয়া এই প্রকার ব্যবহারের কারণ গবর্ণর সাহেব নিজেই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বাহারবন্দপরগণা পূর্ব্বে রাণী ভবানী ও সত্যবতীর দখলে ছিল। হেষ্টিংস কোন বিশেষ কারণ না দেখাইয়া জবরদস্তিতে,—সামান্য অছিলায়, সেই জমীদারী তাঁহার নিজের দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে দিয়াছেন। রাণী ভবানীকে এই প্রকারে তাঁহার ন্যায্য ও বহু লাভ জনক সম্পত্তি হইতে অকারণে বঞ্চিত করিয়া হেষ্টিংস বড়ই অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন। † ইহার কারণ গবর্ণর নিজে আপনাদের বুঝাইয়া দিবেন।

---

* এই রাধাচরণের বিরুদ্ধে হেষ্টিংস শেষে চক্রান্তের (conspiracy) অভিযোগ আনিয়াছিলেন।

† রাণী ভবানীর এই জমীদারী এক্ষণে কান্ত বাবুর উত্তরাধিকারিণী স্বনামখ্যাতা

"দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলম বাহাদুর আমাকে রাজপ্রসাদ দ্বারা সম্মানিত করিবার জন্য দেশীয় প্রথানুসারে একখানি "ঝালরদার পালকী" ও অন্যান্য রাজ সম্মান চিহ্ন প্রেরণ করেন। এই উপঢৌকন যখন পাটনায় পৌছিল তখন আমার প্রভু নবাব জাফর আলি খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। আমারও তখন নায়েব সুবাদারের পদ গিয়াছে। পাটনায় এই উপহার পৌছিলে—তথাকার শাসনকর্ত্তা রাজা সেতাব রায় মহম্মদ রেজা খাঁর ভয়ে ও উত্তেজনায়, সেই রাজ সম্মান পাটনায় আটক করিয়া রাখেন। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম। হেষ্টিংস সাহেব এই ঘটনা অবগত হইয়া সেতাব রায়কে সেই পালকী তাঁহার নিকট পাঠাইতে হুকুম দেন। পালকী খানি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলে হেষ্টিংস আমাকে তাহা প্রত্যর্পণ না করিয়া নিজ অধিকার ভুক্ত করিয়া রাখেন। আজও পর্য্যন্ত আমি তাহা পাই নাই। আমি বাসনা করি যে আপনারা গবর্ণর সাহেবকে এই প্রকার অন্যায় কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন—ও যদি বাদসাহ প্রদত্ত সেই উপঢৌকন আমার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হয়—তবে তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ করাইবেন।

উপরে আমি যাহা কিছু বলিলাম—তাহা মোটের উপর বলিয়াছি এক্ষণে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবর্ণরের কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব।

কোম্পানীর কার্য্যে নিয়োগ করিবার সময় গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেব যে সমস্ত টাকা উৎকোচ-স্বরূপ লইয়াছিলেন তাহার তালিকা। *

১১৭৯ সাল ১২ আশ্বিন। রাজা গুরুদাসের ও মণিবেগমের নবাব সরকারে নিয়োগ জন্য আমি গবর্ণরের খানসামা বালকৃষ্ণ, জগন্নাথ ও আমার কর্ম্মচারী চৈতন্য নাথ, নরসিংহ ও সদানন্দ ইহাদের মারফতে কলিকাতায় হেষ্টিংস সাহেবকে তিন তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করি।

প্রথম তোড়া	১৪৭১	মোহর	
দ্বিতীয় ,,	১৪৭১	,,	
তৃতীয় ,,	৯০০	,,	
ও ১১৪০টী আধুলী	৫৭০	,,	টাকা
মোট	৪৪১২	,,	৭৫০০৪৲

মহারাণী স্বর্ণময়ী ভোগ দখল করিতেছেন। এই বাহারবন্দ পরগণা মহারাণীর একখানি অতি লাভজনক জমীদারী।

* Vide—26. Par. Hist. and 11th Report form the Select Committee.

” ” ১৫ আশ্বিন।	গবর্ণরের খানসামা জগন্নাথ ও বালকৃষ্ণ ও আমার কর্ম্মচারী পূর্ব্বোল্লিখিত সদানন্দ ও নরসিংহ দ্বারা গবর্ণরকে দেওয়া যায়।		
	১ তোড়া মোহর	১২৯১ মোহর	
	ঐ ঐ আধুলি	১৭৯ ”	
	মোট	১৪৭০ ”	২৪৯৯৮॥৹
” ” ২৬ আশ্বিন।	গবর্ণর সাহেবের ইচ্ছানুসারে উপরোক্ত সমস্ত টাকার বাটাস্বরূপ তাঁহার খানসামা বালকৃষ্ণ ইত্যাদির দ্বারা পাঠান যায়		
	১ তোড়া	১৮২॥৹ মোহর	৩১০৩॥৹
” ” ২৯ আশ্বিন।	গবর্ণরের খানসামা বালকৃষ্ণ, জগন্নাথ ও শিবরামের মাঃ তাঁহার নিকট কলিকাতায় প্রেরিত হয়		১০০০৲
” ” ৪ ভাদ্র।	নবাব মোবারেক উদ্দৌলার মাতা বাবু বেগমকে পদচ্যুত করিয়া সেই পদে মণিবেগমকে নবাব সরকারের সর্ব্বময়ীকর্ত্রী নিযুক্তকরাতে মনিবেগম তৎপরিবর্ত্তে গবর্ণরকে মুরশীদাবাদে পাঠাইয়া দেন *		১০০০০০
	ঐ তারিখে নরসিংহের মারফতে পাঠান হয়		১৫০০০০
	মোট		৩৫৪১০৫ টাকা†

* মহারাজা নন্দকুমার এইস্থলে লিখিতেছেন—“গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেব ১১৭৯ সালের, আষাঢ় মাসে কলিকাতা হইতে মুরশীদাবাদে গমন করেন তিনি এই সময়ে প্রায় তিনমাস কাশিমবাজারে ছিলেন। কাশীমবাজারে অবস্থান কালীন মধ্যে মধ্যে তিনি নবাবের বাটিতে যাইতেন। মুরশিদাবাদ হইতে হেষ্টিংস সাহেব কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলে—মনিবেগম রাজা গুরুদাসকে বলেন “মহারাজা নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠান যে বর্ত্তমানে গবর্ণর সাহেবকে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব মহারাজা নন্দকুমারকে একটু কষ্টস্বীকার করিয়া গবর্ণর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিবেন—তাঁহার নিকট টাকা নগদ পাঠান হইবে না হুণ্ডি (Bill of Exchange) দ্বারা বরাত করা যাইবে?” আমি হেষ্টিংসকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তদুত্তরে বলেন—“মুরশীদাবাদ অঞ্চলে আমার কারবারাদি আছে—অতএব ঐ টাকা আমার বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীর ভ্রাতা নরসিংহের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক। আমি ও রাজা গুরুদাস ও মনিবেগমকে ঐ কথা লিখিয়া পাঠাই যে কান্তনন্দীর ভ্রাতা নরসিংহের নিকট কাশিমবাজারে গবর্ণরের ঐ টাকা যেন পাঠান হয়। ১১৭৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মনিবেগম কর্ত্তৃক রাজা গুরুদাসের জ্ঞাতসারে, ঐ টাকা গবর্ণর হেষ্টিংসের নিকট পাঠান হয়।

† সতরটী আর্কট মুদ্রায় তখন একটি মোহর হইত। সেই হিসাবে এখানে ধরা হইয়াছে।

হেঁয়ালি নাট্য।

স্থান কবি কুটীর

সময় অন্ধকার রাত্রি

(কবি ও কল্পনার কথোপকথন)

কল্পনা। কবি কি করছ বল?
যাও যদি ত ওঠ চল!

কবি। তোমার এক বিদঘুটে বাই
এখন কোথায় যাব ভাই?
ঘুট ঘুটে আঁধার রাত
দেখা যায় না পথ ঘাট।
বাইরে গেলেই দাঁতে দাঁত!

কল্পনা। ওকি কথা! তুমি কবি
অমানিশার তুলবে ছবি,
ভয় কল্লে কি তোমার চলবে!
লোকে শুনে তা কি বলবে?

কবি। নে ভাই জ্বালাসনে হাড়
আজকের মতন গোঁ ছাড়
রাত পোহালে না হয় যাব
সরষে দিয়ে গঙ্গা নাব।

কল্পনা (রাগিয়া)
তবে থাক' আমি যাই
তোমারি ক্ষেতি আমার ছাই!

কবি। রাগ করে যাস নে বোন
মাথা খাস কথাটা শোন,
—কেউ নেইক' নির্জ্জন ঘর
ছুটো আষাঢ়ে গল্প কর,
ছেঁটে ছুটে গোঁজা দিয়ে
লিখে ফেলব নভেল গিয়ে,
জুড়ে জেড়ে এ, ও, তা,
দেখিস এখন লিখব গাথা,
কবিতা ত বড়ই ভারি
দিনে ন পোন লিখতে পারি।
সা, রে, গা, মা, নেইক' ঘটে
গানটা তাইতে কঠিন বটে,
কালোয়াতি নিমমুক্ত
সুর টানতেই প্রাণ মুক্ত
মুখে চোকে ওঠে রক্ত
বেরোয় বেরোয় প্রাণ।
কাজনেই আমার মিয়া তানসান।
রোসনা আসুক আগে
জোছনা রাত
ভাই বোনে হাতে হাত
ধরে, তখন ঘুরে ঘুরে
বেড়াব তিন জগত চুড়ে,
জানি তাতে ফুলবে পা
তবু শর্ম্মা ছাড়বে না।

কল্পনা। বড্ডা সাহস বারে বা!

কবি। তখন—তোমার দেখব দৌড় কত
গাছ গাছড়া, ঢিবি যত
লাফিয়ে ডিঙ্গিয়ে কাটলে পা
'আহা' কিন্তু বলব না।
শেষে একটা ফুলের বনে
লুকিয়ে থাকব ভাই বোনে,
বুঝেইছ ত কল্পনা
লোকটা আমি কবি কি না?
বসন্তটাও হালে গেছে
কবিতা একটা লেখার আছে।

তাতে—করবে যখন কোকিল কুহু
মরবে রাধা মুহু মুহু
কাঁদবে বসে ঘরের কোণে
শত শত 'ব্রজাঙ্গনে'—
কবির তখন কারখানাটা
দেখিয়ে দেব তোরে ভাই
এখন—আঁধার রাতে জ্বালাসনে আর
রক্ষে কর তোমার দোহাই! *

দৈবঘটনা।

'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণটী যায়'। আগে ইউরোপে যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষই বিপক্ষ দলের সামান্য সৈন্য ও প্রজাদের আহার দ্রব্য লুঠ করিয়া লইত। ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ম তাঁহার অধীনস্থ ইংরাজ ও ডচ্ সেনাদিগকে বিপক্ষ ফরাসী সৈন্যদের উপর এরূপ নিষ্ঠুরতা করিতে বিশেষ-রূপে বারণ করিয়া দেন। এদিকে রাজার নিজের সৈন্যদের মধ্যে আহারাভাব হইয়া পড়িল। অনাহারে সকলের প্রাণবায়, টম হ্যাকেট ও বিল রাম্‌স্‌ডেন নামক দুইজন ইংরাজ সৈনিক ক্ষুধার জ্বালায় রাজার হুকুম রক্ষা করিতে পারিল না। বিপক্ষ দলের নিকট হইতে খাবার কাড়িয়া লইয়া নিজেদের ও অন্যান্য সেনাদের প্রাণ রক্ষা করিল।

কথা রাজার কানে উঠিল, দুইজন সামান্য সৈনিক তাঁহার কথার অবহেলা করিয়াছে তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—দুই জনকেই সৈনিক বিভাগের আইনানুসারে সমস্ত সৈন্যদের সম্মুখে গুলি করিয়া বধ করিবার আদেশ হইল।

রাজার এ আদেশ শুনিয়া সমস্ত সৈন্যেরাই মহা অসন্তুষ্ট, সৈন্যদের মধ্যে টম হ্যাকেট ও বিল রাম্‌স্‌ডেনের মত অমন সাহসী অমন দয়ালু আর কেহ নাই, দুইজনকেই তাহারা বড় ভালবাসে, কিন্তু রাজার হুকুমের বিরুদ্ধে সামান্য সৈন্যেরা আর কি করিতে পারে, কেবল রাজার নিষ্ঠুরতা, অন্যায়, আর টম ও বিলের প্রশংসা করিয়া যে যতটা পারে মনের ভার কমাইতে লাগিল।

---

* আষাঢ় মাসের হেঁয়ালির উত্তর "মাষ্টার"। শ্রীযুক্ত, আশুতোষ রায়, উমানাথ চক্রবর্ত্তী, কিশোরীমোহন চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শশীভূষণ দত্ত, করুণাভিরাম বড়ুয়া, গোপালচন্দ্র ভায়া, হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত, গুরুদাস মৈত্র, বিপিনবিহারী নাহা, বিধুভূষণ ঘোষ, জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পরেশনারায়ণ বিশ্বাস, তারিণীচরণ রায়, মোঃ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী, প্রবোধমোহিনী দাসী, মৃণালিনী দাসী, কুমার বিপ্রনারায়ণ, ঠিক উত্তর দিয়াছেন। কেহ কেহ উত্তর দিয়াছেন মানিক, তাহাও হইতে পারে।

আজ বধের দিন, আজ আর তাহাদের মুখে অন্য কথা নাই, বিল সেদিন পিটারের অসুখের সময় কত যত্ন করিয়াছিল, তাহার গল্প করিতেই পিটার ব্যস্ত, সে দিন টমের এক টুকরা রুটী বই আর খাবার ছিল না, তবু সে নিজে না খাইয়া জোন্সের ছোট ছেলেকে তাহা দিয়াছিল, আজ জোন্স শত মুখে বলিয়াও সে গল্প ফুরাইতে পারিতেছে না, সুবিস্তৃত ময়দানে সমবেত শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যদের কাহারো হৃদয়ে আজ সুখ নাই, সকলের চক্ষুই অশ্রুময়, সকলের হাতের বন্দুক হাতে কাঁপিতেছে, টম বিলকে কে গুলি করিবে ? কেবল অপরাধী সৈন্য দ্বয় নির্ভয়হৃদয়ে স্থিরদৃষ্টিতে বীরের ন্যায় মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের মৃত্যুর সমস্ত আয়োজনই ঠিক আছে, কেবল সেনাপতি নেভিলের হুকুমের মাত্র অপেক্ষা, তিনি বলিলেই এখনি মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের জীবনের খেলা শেষ হয়, পৃথিবীর সকলি ফুরায় ! সময় যায় যায় এখনও সেনাপতি হুকুম দেন নাই, গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন,—মাঝে মাঝে উৎসুক নয়নে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছেন, যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আর একবারে সময় নাই এবার হুকুম দিতেই হইবে, হায় ! কি করিয়া তিনি এ নিষ্ঠুর হুকুম দিবেন ? টম ও বিল বৃদ্ধের পুত্রাধিক প্রিয়। হঠাৎ এই সময়ে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল, একজন অশ্বারোহী আসিয়া সেনাপতির হাতে একখানি কাগজ দিলেন। টম ও বিলের অনেক প্রশংসা করিয়া, বিশেষ খাবার একবারে না থাকায় তাহারা বাধ্য হইয়া রাজার হুকুম অমান্য করিয়াছে, ইচ্ছাক্রমে করে নাই এই বলিয়া তাহাদিগের মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া সেনাপতি. রাজার নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন, এখানি তাহারি উত্তর। এই উত্তরের জন্যই সেনাপতি এতক্ষণ উৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

উত্তরের প্রথমটা পড়িয়া সেনাপতির মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, আবার একটু পরেই সে ভাব চলিয়া গেল। রাজা লিখিয়াছেন "সেনাপতি সৈন্যদের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষমা করিতে মনস্থ করিয়াছেন, কিন্তু একজনকে মাত্র ক্ষমা করা হইবে ; এবং উভয়ে পাশা ফেলিয়া যাহার দান বেশী হইবে সেই ক্ষমার পাত্র বলিয়া নির্ব্বাচিত হইবে।" (আগে এরূপ প্রথা চলিত ছিল)। এ সংবাদ সৈন্যদের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া উঠিল, তবু একজনও রক্ষা পাইবে শুনিয়া তাহারা কতকটা সন্তুষ্ট হইল।

বধ্য ভূমিতে পাশা আনীত হইল। এইবার টম ও বিলের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, রণক্ষেত্রের অনন্ত কামানের সম্মুখে নিশ্চিন্ত মরণের সম্মুখে যে বীর হৃদয় মুহূর্ত্ত তরে তিল মাত্র বিচলিত হয় নাই—আজ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে অনিশ্চিত প্রাণের আশায় সে হৃদয়ও কম্পিত হইল—সহস্র দর্শকের উৎসুক নয়নের সম্মুখে আজ জীবন মরণের খেলা আরম্ভ হইল—প্রথম টমের পালা, কম্পিত হস্তে পাশা নিক্ষিপ্ত হইল। হায় ! হতভাগ্য

বিলের আর কোন আশা নাই, টম সকলের উপরের দান ১৮ ফেলিয়াছে তাহার উপর আর দান নাই, সৈন্যেরা সকলেই বিলের জন্য দুঃখিত, বিলও বুঝিল তাহার আর কোন আশা নাই, তবুও মরিবার আগে একবার জীবনের সহিত শেষ যুদ্ধ করিয়া মরিবে স্থির করিল, ধীর অবিকম্পিত হস্তে সে পাশা নিক্ষেপ করিল। একি? বিলের ও ১৮ পড়িয়াছে! সৈন্যেরা অবাক ভাবে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। দুই জনেই সমান দান ফেলিয়াছে কাহাকে মার্জ্জনা করা হইবে? বৃদ্ধ সেনাপতি মনে মনে মহা অসন্তুষ্ট হইলেন—অভাগাদের আর বেশীক্ষণ অনর্থক অনিশ্চিত মৃত্যু যন্ত্রণা দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা নহে, বিরক্ত ভাবে বলিলেন 'ও হইল না আবার খেলিতে হইবে'। আবার টম খেলিল তাহার এবার ১২ পড়িল। কি আশ্চর্য্য! বিলেরও এবার বারো! সৈন্যেরা আরও অবাক হইয়া গেল, সেনাপতি আরও বিরক্ত হইয়া আবার খেলিতে বলিলেন। এবার টমের ছয় পড়িল, বিলেরও যে ছয়! সৈন্যেরা জীবনে এমন কাণ্ড কখন দেখে নাই—তাহাদের মুখে আর কথা ফুটিল না, সেনাপতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি স্বচক্ষে না দেখিলে এ ঘটনা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না, ইহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কার্য্য, আমি এখনি রাজার নিকট একথা জানাইতে যাইতেছি, আপাততঃ প্রাণদণ্ড স্থগিত রহিল, ইহাদের প্রাণদণ্ড ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে'। সেই দিনই সেনাপতি নেভিল রাজার নিকট হইতে টম হ্যাকেট ও বিল রামন্ডেনের মার্জ্জনা পত্র লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সৈন্যদের আনন্দ দেখে কে?

(২)

উপরের গল্পটি আজ অনেক দিনের কথা, সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল ইংলণ্ডে আর একটী ঐ রকম আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একজন লোকের খুন অপরাধে ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগের দিন রাত্রে সে তাহার মা ও বোনকে এই মর্ম্মে একপত্র লেখে "কাল যদিও আমাকে ফাঁসি দিতে লইয়া যাওয়া হইবে কিন্তু সে জন্য তোমাদের দুঃখিত হইবার আবশ্যক নাই, আমার ফাঁসি হইবে না; আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি আমার গলায় ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে আমার মৃত্যু হইতেছে না এবং ইহা হইতে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে আমি মরিব না।"

এই চিঠি পাঠাইবার পর তাহাকে ফাঁসি দিতে লইয়া যাওয়া হইল।

কাহাকেও ফাঁসি দিতে হইলে মাটী হইতে অনেক উঁচুতে দুইখানা মুখামুখি করিয়া জোড়া দেওয়া তক্তার উপর অপরাধীকে দাঁড় করাইয়া তাহার গলায় ফাঁস দেওয়া হয়—তাহার পর দুই পাশ হইতে তক্তা দুইখানা সরাইবা মাত্র আশ্রয়াভাবে অপরাধী ঝুলিয়া পড়ে, অমনি ফাঁসির দড়ি গলায় বাধিয়া হতভাগার জীবনের শেষ হয়। অপরাধীকে আনিয়া এই প্রকারে তাহার গলায় ফাঁস দিয়া দুই দিক হইতে তক্তা

টানা হইল, কিন্তু তক্তা সরিল না, অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কেহ তক্তা নড়াইতে পারিল না, অবশেষে অপরাধীকে নামাইয়া তক্তা সরাইবার বন্দোবস্তে কোন প্রকার দোষ আছে কি না দেখা হইল। অনেক পরীক্ষা করিয়াও তক্তার কোন দোষ দেখা গেল না, তখন বেশ সহজে তক্তা সরিয়া গেল। আবার দ্বিতীয়বার মঞ্চে উঠাইয়াঅপরাধীর গলায় ফাঁস দিয়া তক্তা সরাইবার চেষ্টা হইল—কিন্তু তখন আবার যে সেই, কিছুতেই তক্তা সরে না, আবার অপরাধীকে নামাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে সমান ভারের আর একটা জিনিস ঠিক সেইরূপ ভাবে জোড়স্থানে রাখিয়া তক্তা টানিয়া দেখা হইল, তখন তক্তা বেশ সরে। তৃতীয় বার হতভাগাকে ফাঁসি দিতে চেষ্টা করা হইল, এবারও সকলি বৃথা, তক্তা নড়িল না; এদিকে যে সকল দর্শকেরা এতক্ষণ আশ্চর্য্য ভাবে এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিতেছিল, তাহারা তিন তিনবার ফাঁসি ব্যর্থ দেখিয়া ফাঁশির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল, তাহারা ভাবিল ঈশ্বর এইরূপে ইহার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিতেছেন। ইংলণ্ডের ছোটলোকে একবার ক্ষেপিলে রক্ষা নাই, তাহাদের সহস্র কণ্ঠের চীৎকার অনুরোধে সে দিনকার মত ফাঁসিবন্ধ করিতে বাধ্য হইয়া রাজপুরুষেরা বন্দীকে পুনরায় জেলালয়ে লইয়া গেল। তাহার পর একথা পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত উঠিল, অনেকে বলিলেন যে পুনরায় ফাঁসি দিতেই হইবে, নহিলে ইহা দৈব ঘটনা বলিয়া লোকদের মনে এক মহা কুসংস্কার থাকিয়া যাইবে; কিন্তু বেশীর ভাগের ইহাতে অমত হইল। তাঁহারা বলিলেন যে ব্যক্তি তিন তিনবার মৃত্যু যাতনা সহ্য করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে, তাহার আর ফাঁসি কেন? অপরাধীর মুক্তি হইল।

শ্রী হিরণ্ময়ী দেবী।

পাখীর পালক।

খেলা ধূলো সব রহিল পড়িয়া
ছুটে চলে আসে মেয়ে—
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্,
কি এনেছি দেখ চেয়ে।
আঁখির পাতায় হাসি চমকায়,
ঠোঁটে নেচে ওঠে হাসি,
হয়ে যায় ভুল বাঁধেনাকো চুল,
খুলে পড়ে কেশ রাশি।
দুটি হাত তার ঘিরিয়া ঘিরিয়া,
রাঙা চুড়ি কয়গাছি

করতালি পেয়ে বেজে ওঠে তারা
কেঁপে ওঠে তারা নাচি।
মায়ের গলায় বাহু দুটি বেঁধে
কোলে এসে বসে মেয়ে।
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্
কি এনেছি দেখ চেয়ে!"
সোনালি রঙের পাখীর পালক
ধোয়া সে সোনার স্রোতে,
খসে এল যেন তরুণ আলোক
অরুণের পাখা হতে;

নয়ন-ঢুলানো কোমল পরশ
ঘুমের পরশ যথা,
মাথা যেন তায় মেঘের কাহিনী
নীল আকাশের কথা।
ছোট খাট নীড়, শাবকের ভীড়
কত মত কলরব,
প্রভাতের সুখ, উড়িবার আশা
মনে পড়ে যেন সব।
লয়ে সে পালক, কপোলে বুলায়,
আঁখিতে বুলায় মেয়ে,
বলে হেসে হেসে "ওমা দেথ্ দেথ্
কি এনেছি দেথ্ চেয়ে।"
মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে
"কিবা জিনিষের ছিরি ?"
মাটিতে ফেলিয়া যাইল চলিয়া
আর না চাহিল ফিরি ?
মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল
মাটিতে রহিল বসি।
শূন্য হতে যেন পাখীর পালক
ভূমিতে পড়িল খসি !
খেলা ধূলো তার হলনাকো আর,
হাসি মিলাইল মুখে,
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল
দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে
গোপনের ধন তার,
আপনি খেলিত আপনি তুলিত
দেখাত না কা'রে আর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দশটি কথা।

মহাভারত হইতে উদ্ধৃত

১

"স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য, যদি স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত ও প্রীত না হয় তাহা হইলে সেই অপ্রীতি নিবন্ধন সে কখনই সুসন্তান লাভে সমর্থ হয় না। অতএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতি সম্পাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা কামিনীগণের যথার্থ সৎকার করে দেবতারা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন আর যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপদায়ক হয় না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে তৎসমুদায় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়। মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন, মানবগণ, স্ত্রীজাতি

স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও প্রিয়কারী। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত ঈর্ষাপরতন্ত্র, মানপ্রার্থী, প্রচণ্ডস্বভাব, অবিবেচক ও অপ্রিয় কার্য্যে নিরত। তোমরা প্রযত্নসহকারে উহাদিগকে রক্ষা কর। স্ত্রীজাতিকে সম্মান করা অতিশয় কর্ত্তব্য, স্ত্রীজাতিই ধর্ম্ম লাভের কারণ। ... ...

... যিনি শ্রেয়োলাভার্থী তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উহারা লক্ষ্মী স্বরূপ, অতএব উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীকে নিগ্রহ করা হয়।

আনুশাসনিক পর্ব্বাধ্যায়।

২

"মহেশ্বর কহিলেন দেবি! ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে দেবতা স্বরূপ। শাস্ত্রানুসারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা ইহাঁদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ ভিন্ন কদাচ ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হওয়া যায় না অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যত্ন পূর্ব্বক এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন। ... ... ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে সমাবর্ত্ত স্নান করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আগমন ও স্বীয় অনুরূপ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন। ... ... ভার্য্যা ও স্বামীর চরিত্র সমান হইলেই তাহাদের পরম প্রীতি লাভ হইয়া থাকে।" ঐ

৩

"ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয় তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ আমার মতে শূদ্র সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্মসংস্কার শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, সদাচারই ব্রাহ্মণত্বের প্রধান কারণ। সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান সকলের পক্ষেই সমান। যাঁহার হৃদয়ে নির্ম্মম নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব প্রকাশিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ। ঐ

৪

"যেমন উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে বৃক্ষ উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে সেইরূপ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে দাতা উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে সমর্থ হন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র ও দান গ্রহণের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যমান না থাকিতেন তাহা হইলে ধনীদের ধন নিতান্ত নিরর্থক হইত। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্নপ্রদান করিলে সেই অন্ন দ্বারা দাতার কিছুমাত্র ধর্ম্মলাভ হয় না প্রত্যুত উহা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া থাকে।" ঐ

৫

"ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই প্রকার স্ত্রী আছে। লোক মাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন।" ঐ

৬

"পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। ... ... সৎকুলজাত পুণ্যশীল পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্য করিবে; ক্রুর, কলহ প্রিয়, ঔদরিক, চৌর, দুষ্ট ও চপল স্ত্রীগণের সহিত সহবাস সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে এবং সদ্গন্ধ চর্চ্চিত কলেবর ও মাল্যাভরণ ভূষিত হইয়া সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষা পরতন্ত্র হইবে। এইরূপ সদাচরণে কাল হরণ করিলে কেহ তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে পারিবে না এবং তোমার মহতী কীর্ত্তি, পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ হইবে।"

দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদ—বনপর্ব্ব।

৭

"মার্কণ্ডেয় কহিলেন "হে মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা জপ, মন্ত্র, হোম, ও স্বাধ্যায় দ্বারা বেদময় তরণী প্রস্তুত করিয়া অন্যকেও ও আপনাকে উদ্ধার করেন। ব্রাহ্মণগণের তুষ্টি সম্পাদন করিলে দেবতারা সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ... ... হে মহারাজ, এক্ষণে কি প্রকার বিপ্রকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিবে তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যিনি স্বশক্তি প্রভাবে প্রদাতা ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ব্যক্তি তাঁহাকেই দান করিবেন। হে মহারাজ সুসম্পন্ন ব্যক্তিকে দান করিলে কোন গুণই দর্শে না।"

মার্কণ্ডেয় সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়।

৮

"শাস্ত্র কারেরা অতি পবিত্র তীর্থে স্নান, পবিত্র বস্তু কীর্ত্তন ও সাধুসহ সম্ভাষণ অতি প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ সাধুসঙ্গমপূত অতি মনোহর বাক্যরূপ সলিল দ্বারা আপনাদিগকে প্রতিনিয়ত পবিত্র জ্ঞান করেন।" ঐ

৯

"বেদের রহস্য সত্য; সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ; ত্যাগ না থাকিলে দম থাকে না, দম না থাকিলে সত্য থাকে না, সত্যজ্ঞান না হইলে বেদ নিস্ফল হয়।" ঐ

১০

অহিংসা ও সত্য বচন সকল প্রাণীরই হিতকর; অহিংসা পরমধর্ম্ম, সেই অহিংসা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবৃত্তি সকল সত্য সংযুক্ত হইলে বিচলিত হয় না; শিষ্টাচার-সম্বলিত সত্যেরই অধিক গৌরব। সদাচারই সাধুগণের ধর্ম্ম ও সদাচারই সাধুগণের লক্ষণ।"

শ্রী কঃ—

পথে কে চলেছে গায়ি।

অশ্রুজলে ভরা আঁখি তারে না দেখিতে পাই,
নীরব নিশীথ প্রাণে পথে কে চলেছে গায়ি?
কত দিন কত দিন কত দিন পরে আজ
হেরিতে মানব মুখ হৃদয়ে হতেছে সাধ,
দাঁড়াও দাঁড়াও পান্থ, ক্ষণিক দাঁড়ায়ে যাও,
কি গান গাহিতে ছিলে বারেক আবার গাও,
প্রতি নিশি গীত শুনি, পথে চলে কত লোক,
গেয়ে গেয়ে যায় তারা প্রতি ক্ষুদ্র দুঃখ শোক,
সমীরণে ভেসে আসে সমীরণে ভেসে যায়,
কথাতেই অবসান কথায় জনম-কায়।
জানিনা জানিনা কেন, আজি কে তোমার গানে
অতীতের স্মৃতি গুলি স্বপ্ন সম আসে মনে।
আগ্নেয় ভূধর ফেটে যাতনার উৎস ছুটে
(নীরবে দহিতে ছিল প্রাণের গভীর তল)
ও তব আকুল তান ছুঁয়েছে আজিকে প্রাণ
গাও গাও গাও পান্থ নয়নে এসেছে জল।
গাও গাও গাও পান্থ, নয়নে এসেছে জল,
আশায় আকুলি উঠে উছসি মরম তল,
মধুর জোছনা নিশি তব ও মধুর গান
অশরীরী সুখ ছায়া প্রাণে করে নিরমাণ।
যে ফুল ফুটিবে দূর কালের নন্দন বনে
কুঁড়িগুলি যেন তার কল্পনায় আসে মনে!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

মানুষ ঘুড়ি।

অনেক মানুষ ঘুড়ি কিছুতেই চড়াই করা যায় না। হাজার শিক্ষার বাতাস বহুক-সচ্চরিত্রবার সুসঙ্গ ধরাই দিক্ কিছুতেই আর তাহা মাটী ছাড়াইতে চাহে না। অনেক-গুলি আবার এমনি যে প্রথমতঃ তাহারা খুব চমক লাগাইয়া উড়িতে আরম্ভ করে কিন্তু শীঘ্রই ফেঁসে যায়। ঘুড়ি হাজার বুঁদ হইলেও একেবারে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হইতে পারে না। সামাজিক বন্ধনের গুলি সুতার দ্বারাই আর বন্ধুতার কাটিম সুতার দ্বারাই হউক কিম্বা প্রেমের লক্কেয়ে তারের দ্বারাই হউক ঘুড়ী নীচের লাটাইহস্ত উড়ান্দারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবেই থাকিবে। ঘুড়ি যত বড় হয় তাহার তত মোটা সুতার দরকার, অনেক ঘুড়ি কিন্তু বুঁদ হইয়া গেলে মনে করে যে সুতাটা ছিঁড়িলে তাহারা ক্রমশ আরও উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে থাকিবে। এই রকম ভাবিয়া ছোট হইতে বড় চাউস পর্য্যন্ত অনেক ঘুড়ি উফড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সুতার হাত এড়াইয়া এক দমে তাহারা কিছু উচ্চে উঠিয়াছে বটে কিন্তু পরিণামে সকলকেই ভূমি চুম্বন করিতে হইয়াছে। বায়রণ বলিয়া একখানি চাউস উফড়িয়া প্রথমে খুবই উচ্চে উঠিল কিন্তু দেখিতে দেখিতেই তাহার নিম্ন গতি হইল। সকলেই বুঝিতে পারিল আর একটু হইলেই বায়রণ্ মাটিতে পড়িয়া যাইবে এমন সময় কৌণ্টেস গুইচ্চিয়লি সেই কাটা সুতা ধরিয়া নিজের লাটাইয়ে বাঁধিয়া লইলেন তবে বায়রণ্ উড়িল। ঘুড়ি উড়ানর

আর একটা মজা এই যে ঘুড়ি বুঁদ হইলে তাহাকে দেখিবার জন্য সকলের চক্ষু টাটায় ও ঘাড়ে বেদনা হয় কিন্তু যে বেচারা কষ্ট করিয়া লাটাই ধরিয়া রহিয়াছে, ফলতঃ যাহার দরুণই ঘুড়ি উড়িতেছে তাহার উপর কাহারো লক্ষ্য নাই। তা' থাক বা নাই থাক ঘুড়ি উড়াইয়াই তাহার যথেষ্ট আমোদ। কতকগুলি মানুষ ঘুড়ি এমনি কান্নি খায় যে হাজার কান্নি দিলেও তাহাকে ঠিক সোজা রাখা যায় না। গোড়ায় কল খাটাইবার দোষে অনেকগুলি আবার চারিদিকে এমনি লাট খাইয়া বেড়ায় যে তাহাদিগকে উচ্চে উঠান এক রকম অসম্ভব। কতকগুলি আবার এমন অপ্রতিহত বেগে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে সহস্র চেষ্টাতেও তাহাদিগকে গোকতা খাওয়াইয়া মুহূর্ত্তের জন্য নীচে নামান যায় না। যে ঘুড়ি লাট খায়, গোকতা খায়, আর উপরে উঠে তাহাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর; কিন্তু সে রকম ঘুড়ি লাখের মধ্যে একটি পাওয়া যায়।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে "মহোচ্চ ভাব হইতে হাস্য-জনক ভাবে নামিয়া পড়িবার মাঝ-খানে কেবল একটি-মাত্র ধাপ।" আমরা বলি যে, বঙ্গ-ভাষার উন্নতি-সাধন হইতে তাহার বিকৃতি-সাধনে প্রবৃত্ত হইবার মাঝখানে কেবল একটি মাত্র ধাপ। কাহারো যদি এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে নিম্নের দৃষ্টান্ত-গুলি দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার চক্ষু ফুটিবে।

বিবেক-শব্দ।

কতিপয় বঙ্গীয় লেখক conscience শব্দের অনুবাদ-স্থলে বিবেক-শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিবেক শব্দটি নিতান্তই দার্শনিক শব্দ; তাহার অর্থ—আত্মাকে অনাত্মা হইতে—জ্ঞানকে অবিদ্যা হইতে—পুরুষকে প্রকৃতি হইতে—বিবিক্ত করিয়া দেখা। Conscience শব্দ ইংরাজিতে অষ্ট প্রহরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা এক-প্রকার আট-পহরে কথা। বিবেক কিন্তু সেরূপ নহে; Subject, Object, analitical, synthetical, apperception, এই শব্দ-গুলির ন্যায় বিবেক একটি তান্ত্রিক (Technical) শব্দ। Conscience শব্দের গার্হস্থ্য আসনে বিবেকের ন্যায় অতবড় একটা প্রবীণ সন্ন্যাসীকে ধরিয়া বাঁধিয়া বসাইলে, তোমার খাতিরে সে নয় একবার সেখানে বসিল; কিন্তু তাহার মর্ম্মের ভিতর যদি তলাইয়া দেখ—দেখিবে যে, সে সেখান হইতে উঠিতে পারিলে বাঁচে—সে পলাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে। অতএব যথেষ্ট হইয়াছে—আর কেন! ভূকৈলাশের যোগীটিকে ছাড়িয়া

দেও—সে বনে গিয়া তপ জপ করুক্, তাহাকে ঘরে পুরিয়া তাহার প্রাণ বধ করিও না! The man has no conscience—মানুষটির ধর্ম্ম জ্ঞান নাই; Consciencious man ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি; Conscienciousness ধর্ম্মজ্ঞতা; এই তো সোজা কথা পড়িয়া আছে, এ'র জন্য বিবেক বেচারাকে তাহার যোগাসন হইতে উঠাইয়া আনিয়া তাহার প্রতি কেন এ ভূতের উপদ্রব! সাংখ্যের বিবেক হ'চ্চে প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-জ্ঞান; বেদান্তের বিবেক হ'চ্চে জ্ঞান এবং অবিদ্যার ভেদ-জ্ঞান; স্মৃতি পুরাণের বিবেক হ'চ্চে ঐ দুয়ের সমন্বয় অর্থাৎ জ্ঞান এবং অবিদ্যা, প্রকৃতি এবং পুরুষ, ইত্যাদি সমস্তেরই ভেদ-জ্ঞান। কিন্তু অতটা জ্ঞান লাভ না করিলেও লোকে অসৎ কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারে, ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে; যে ব্যক্তির কিছু মাত্র ধর্ম্মজ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তিরই মিথ্যা কহিতে রসনায় বাধে, অন্যায়াচরণ করিতে হস্ত সংকুচিত হয়, কর্ত্তব্য-সাধনে চিত্ত প্রসন্ন হয়; যাহার ধর্ম্ম জ্ঞান নাই তাহার সেরূপ হয় না। "ও লোকটার ধর্ম্মজ্ঞান নাই" ইহা বলিবামাত্র আপামর-সাধারণ সকলেই তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে; কিন্তু "ও ব্যক্তির বিবেক নাই" এ কথার অর্থ সহজে লোকের মনে প্রবেশ পায় না। শাস্ত্রেও ধর্ম্মজ্ঞান শব্দের ভূরিভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—"ধর্ম্মজ্ঞো মতিমান্ ঋজুঃ"। লোকে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে "লোকটার বিষয়-বুদ্ধি খুব আছে কিন্তু ধর্ম্ম-বুদ্ধি নাই। অতএব, conscience-শব্দ যে-স্থলে মনোবৃত্তিরূপে ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে ধর্ম্ম-বুদ্ধিই তাহার প্রকৃত অনুবাদ; আর, যে-স্থলে তাহা সেই বৃত্তির উদ্ভাস-রূপে ব্যবহৃত হয়, সেস্থলে ধর্ম্ম-বোধ বা ধর্ম্মজ্ঞান তাহার প্রকৃত অনুবাদ।

ধর্ম্মজ্ঞ শব্দের প্রতি নূতন ধরণের একটা আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে; সে-টি এই যে, নাস্তিক ব্যক্তি কি ধর্ম্মজ্ঞ (consciencious) হইতে পারে না? আমাদের শাস্ত্রানুসারে না পারুক্—ইংরাজি শাস্ত্রানুসারে তো পারে। কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞ শব্দে আমরা এই বুঝি যে, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির মনে দেশারাধনাদি কার্য্যের কর্ত্তব্যতা বোধ আছে; সে বোধ যাহার নাই সে ধর্ম্মজ্ঞ নহে। ইহার উত্তর এই যে, সকল কর্ত্তব্য-সাধনের নামই ধর্ম্ম; ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য-সাধনও ধর্ম্ম, মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য-সাধনও ধর্ম্ম, আপনার প্রতি কর্ত্তব্য-সাধনও ধর্ম্ম। বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য-সাধনে বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের বিশেষ-বিশেষ-মাত্রায় পটুতা এবং অপটুতা দেখিতে পাওয়া যায়; এক ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় কিন্তু সত্যবাদী নহে, আর এক ব্যক্তি সত্যবাদী কিন্তু জিতেন্দ্রিয় নহে; এরূপ স্থলে, জিতেন্দ্রিয়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মজ্ঞ বলা যাইতে পারে ও সত্য-বাদিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শেষোক্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মজ্ঞ বলা যাইতে পারে, কিন্তু উভয়ের কাহাকেও সর্ব্বাংশে ধর্ম্মজ্ঞ বলা যাইতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি ঈশ্বর-পরাঙ্মুখ হইয়াও সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও আর আর নানা গুণ-সম্পন্ন হ'ন, তবে যদিও

তিনি ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গে বঞ্চিত, তথাপি যে অংশে তাঁহার মনে কর্ত্তব্য-বোধ বিদ্যমান আছে, সে অংশে তিনি ধর্ম্মজ্ঞ তাহাতে আর সংশয় নাই। মিথ্যাবাদী নাস্তিক অপেক্ষা, সত্যবাদী নাস্তিক, অবশ্যই ধর্ম্মজ্ঞ নামের অধিকতর যোগ্য। ঈশ্বর ধর্ম্মের মস্তক স্বরূপ; যিনি ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করেন, তিনি সকল কর্ত্তব্যই অনুষ্ঠান করেন; ঈশ্বরের জীব মনুষ্যকে তিনি মিথ্যা বাক্যে প্রতারণা করিতে পারেন না, ঈশ্বরের জগতের তিনি অমঙ্গল কামনা করিতে পারেন না, আপনার মঙ্গলভাব যেমন তিনি পুত্র কলত্রাদির মধ্যে বিস্তৃত দেখেন, ঈশ্বরের মঙ্গলভাব তেমনি তিনি সর্ব্বজগতে বিস্তৃত দেখেন; এইরূপে তিনি ধর্ম্মের একটা ভিত্তিমূল পা'ন। ঈশ্বর-পরায়ণতা ব্যতিরেকে ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীনতা হয় না বলিয়াই সহজ লোকেরা—এবং যাঁহারা গভীরে তলাইয়া দেখেন তাঁহারাও—নাস্তিক ব্যক্তিকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিতে কুণ্ঠিত হ'ন। তাঁহারা মনে করেন যে, ইহাঁর ধর্ম্মের বনিয়াদ আল্গা। এ কথার ভিতরে অবশ্য নিগূঢ় অর্থ আছে।

আর এক আপত্তি এই যে, ধর্ম্ম শব্দে Morality শুধু নয় কিন্তু Religion-ও বুঝায়; বুঝাইলেই বা—তাহাকে ক্ষতি কি? সকল ভাষাতেই ভূরি ভূরি এরূপ শব্দ আছে, যাহার মুখ্য অর্থ একরূপ—গৌণ অর্থ আর একরূপ, লৌকিক অর্থ একরূপ—তাত্ত্বিক অর্থ আর একরূপ। Action শব্দের লৌকিক অর্থ শুধু কেবল কর্ম্ম—আদালতী অর্থ মোকদ্দমা; তাহা বলিয়া Active শব্দের অর্থ কি মোকদ্দমা পরায়ণ? ধর্ম্ম শব্দের অনেক অর্থ আছে সত্য, কিন্তু ধার্ম্মিক বলিতে মুখ্য-রূপে Virtuous বুঝায়, ধর্ম্মজ্ঞ বলিতে মুখ্যরূপে Consciencious বুঝায়,—গৌণরূপে আর যাহা বুঝায় তাহা বুঝা'ক—তাহাতে মারাত্মক কিছুই নাই। Pious অথবা Religious শব্দের অনুবাদের পক্ষে ভক্ত শব্দই সবিশেষ উপযোগী; যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বর ভক্ত হইয়াও কুকার্য্যে রত হয়, তবে স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, লোকটা ভক্ত বটে কিন্তু উহার ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই।

বিবর্ত্তবাদ।

অনেকে Evolution শব্দের অনুবাদ করিয়া থাকেন "বিবর্ত্তবাদ"। বিবর্ত্ত বেদান্ত-দর্শনের একটি তাত্ত্বিক শব্দ। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের যে কারণ, তাহাই বিবর্ত্ত-কারণ। অজ্ঞান, যাহা দর্শকের মনের ধর্ম্ম, তাহার প্রভাবে দৃশ্য-বস্তু-সকল দর্শকের চক্ষে যেরূপ—একপ্রকার হইয়া অন্য প্রকার দেখায়, তাহারই নাম বিবর্ত্তন। একজন চোর যখন চুরি করিয়া পলাইতেছে তখন সে যে-সে লোককে পুলিসের চৌকিদার মনে করে; এইরূপ মনের ভাবের গতিকে বাহিরের বস্তু সকল যেরূপ উল্টা দেখায়, তাহাই বিবর্ত্তন। মনোগত সংস্কারের বলে যখন এক বস্তু আর এক বস্তুর আকার পরিগ্রহ করে, তাহারই নাম বিবর্ত্তন; স্বপ্নকালে একজন কৃষক যদি রাজা হইয়া সিংহাসনে বসে, তবে তাহার বিবর্ত্তন

ঘটে। কিন্তু Evolution শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র। সুতার পুঁটুলি হইতে সুতা ক্রমে ক্রমে নির্মুক্ত হওয়া Evolution; সম্বৃত সামগ্রী ক্রমে ক্রমে বিবৃত হওয়া Evolution; দর্শকের মনের গতিকে নহে কিন্তু স্বভাবের উত্তেজনায় যখন এক এক করিয়া প্রকৃতির পর্দা খুলিয়া যাইতে থাকে ও তাহার ভিতরের কথা সকল বাহির হইয়া পড়িতে থাকে, তখন তাহারই নাম Evolution। সাংখ্য দর্শনের মতে প্রকৃতি প্রথমে সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূলে—অব্যক্ত হইতে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তে—পরিণত হয়, ইহার নাম অনুলোম পরিণাম; তাহার পরে আবার স্থূল হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মে—ব্যক্ত হইতে ক্রমে ক্রমে অব্যক্তে—পরিণত হয়,—ইহার নাম প্রতিলোম পরিণাম। বিবর্ত্ত-বাদ যেমন বেদান্তের অনুমোদিত, পরিণামবাদ সেইরূপ সাংখ্যের অনুমোদিত। বিবর্ত্তবাদের স্থূল মর্ম্ম এই যে, অবিদ্যা, যাহা বাহিরের কোন বস্তু নয়—কেবল মনের একটা ভ্রমাচ্ছন্ন ভাব, তাহারই প্রভাবে সংসার-চক্র চলিতেছে; পরিণামবাদের স্থূল মর্ম্ম এই যে, প্রকৃতি, যাহা মনের ভাব মাত্র নহে কিন্তু বাস্তবিক, তাহারই ক্রিয়া-প্রভাবে জগৎ চক্র চলিতেছে; পরিণাম-বাদের সহিত Evolution মতের কিয়দংশে সাদৃশ্য আছে কিন্তু সর্ব্বাংশে নহে। পরিণাম বাদের দুইটি অবয়ব, (১) অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে পরিণতি, (২) ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে পরিণতি; প্রথমটিই Evolution; দ্বিতীয়টি Involution। এই জন্য আমরা বলি যে, Theory of Evolution ইহার ঠিক্ বাঙ্গালা অনুবাদ অভিব্যক্তি-বাদ। সম্বৃত হইতে বিবৃত হইতেছে—এই অর্থে ব্যাবৃতি-বাদ বলিলেও Evolution বুঝাইতে পারে। মনে কর যে, চক্ষুহীন জীবের ক্রমে ক্রমে চক্ষু পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, পিণ্ডবৎ জীবের ক্রমে ক্রমে হস্তপদ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল,—এইরূপ পরিস্ফুটনকে ক্রমাভিব্যক্তি কহে। অভিব্যক্তি মাত্রই কালের ক্রমকে অপেক্ষা করে, এজন্য অভিব্যক্তি মাত্রই ক্রমাভিব্যক্তি; সুতরাং অভিব্যক্তি বলিলেই ক্রমাভিব্যক্তি বুঝায়—আকস্মিক অভিব্যক্তি হইতেই পারে না। এই জন্য Theory of Evolution এই মতটিকে অভিব্যক্তিবাদ বলাই সর্ব্বাংশে যুক্তি-সঙ্গত।

শ্রীঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বাসের মূল ও জড়জগৎ।

(সমালোচনা)

"The Roots of Faith" অর্থাৎ "বিশ্বাসের মূল সমূহ" এই নাম দিয়া আমাদিগের দেশের একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইংরেজী ভাষায় এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের নাম বাবু সীতানাথ দত্ত, তাঁহার পুস্তকের একখণ্ড সমালোচনার নিমিত্ত

অনেক দিন হইল আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে, কিন্তু যথোপযুক্ত সমালোচনা করিবার অবকাশ না হওয়ায় এ পর্য্যন্ত আমরা এ পুস্তক-সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। আমাদিগের দেশের একজন ব্যক্তিও যে এই যুগে যে সে বিষয়ে নহে, কতকগুলি গভীর দার্শনিক প্রশ্ন লইয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে—শুদ্ধ চিন্তা করিতে নহে সেই চিন্তার ফল জনসমাজে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা অতি সুখের বিষয়—আমাদিগের পক্ষে ইহা অতি গৌরবের বিষয়। সীতানাথ বাবুর উদ্দেশ্য মহৎ—লোকে যে সকল কারণে নাস্তিক হয় কিম্বা ঈশ্বরের স্বরূপ অজ্ঞেয় এই বিশ্বাস করে সে সকল কারণ খণ্ডন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করানই তাঁহার অভিপ্রায়। আমরা আশা করি তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া লোকে এই গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিবে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপন আপন জীবন সার্থক করিবে। সীতানাথ বাবুর যে উদ্দেশ্য সকলেরই সেই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, লোকে যাহাতে অধর্ম্মকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের অনুসরণ করে সকল গ্রন্থকারেরই সেই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে সীতানাথ বাবু যে সকল যুক্তি দেখাইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে সকলের কতকগুলি সম্পূর্ণ ভ্রমহীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমাদিগের আশঙ্কা এই যে কেহ কেহ এই যুক্তিগুলির ভ্রম দেখিতে পাইয়া দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা করিতে পারেন। আমরা যাহা বলিলাম ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে; ফরাশি পণ্ডিত কোম্‌ট্‌ দার্শনিকদিগের তর্কবিতর্ক দেখিয়া এই মত প্রচার করিয়াছেন যে প্রকৃতবস্তু কিরূপ আমরা তাহা জানিতে পারি না, তাহা লইয়া আমাদিগের সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, আমরা চক্ষুতে যাহা দেখি কর্ণে যাহা শুনি তাহা লইয়াই আমাদিগের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এই প্রকার ব্যাপার দেখিয়া এই মনে হয় যে দার্শনিক কোন প্রশ্ন মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলে তাহা অতি সাবধানে করা উচিত, কারণ কোন প্রকার ভ্রমময় মত প্রচার করিলে পরিণামে তাহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে।

আমাদিগের মতে সীতানাথ বাবু জড়জগৎ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভ্রমময়। সীতানাথ বাবু বলেন যে জড় জগতের স্বকীয় কোন অস্তিত্ব নাই এবং প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন যে জড় জগতের ঘটনাসমূহের কারণ দর্শাইতে হইলে চেতন কারণ অনুমান করা আবশ্যক। তিনি আরও বলেন যে জড় জগতের সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহা মানসিক ঘটনা মাত্র—সুতরাং তাহার জন্য জড় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এস্থলে তাঁহার এই দুইটী মত পরীক্ষা করিব। এক-খণ্ড প্রস্তর দেখিয়া সীতানাথ বাবু বলিলেন যে উহার বর্ণ আছে, উহা দৃঢ়, উহার আকৃতি আছে, উহা ভারবিশিষ্ট ইত্যাদি, কিন্তু বর্ণ, দৃঢ়তা, আকৃতি, ভার এ সকলত আমাদিগের

মনের ভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে—সুতরাং কেন বলিব যে প্রস্তর খণ্ডে একটী জড় বস্তু আছে, এই কথা বলিলেই হয় যে ঈশ্বরের জন্যই আমাদিগের মনে ঐ সকল ভাব উদয় হয়, ঈশ্বরই আমাদিগকে ঐ সকল ভাব দেন। এরূপ কথা নূতন নহে, বার্কে অনেকদিন পূর্ব্বে ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হিউম আবার যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে বলা আবশ্যক। হিউম বলেন যে আমরা যাহা কিছু জানি তাহা চিন্তা-মাত্র; আমরা এমন বলিতে পারি না যে প্রস্তর খণ্ডের বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে, আমরা এমনও বলিতে পারি না যে আমাদিগের বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে; এক কথায়, বাস্তবিক কোন্ পদার্থ কি প্রকৃতির তাহা আমরা জানি না। হিউমের এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখিয়া সাধারণ লোকে দর্শনের প্রতি বিরক্ত হয়, কিন্তু তাঁহার এইরূপ সিদ্ধান্তের জন্য প্রথম দায়ী কে? বিশপ বার্কে। বার্কে চিন্তা ও অস্তিত্ব এই দুই বিষয় প্রকারান্তরে একই বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—জড়জগৎ সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহা আমাদিগের চিন্তা-মাত্র, অতএব জড়জগতের স্বকীয় অস্তিত্ব নাই, জড়জগৎ বস্তু নহে। শুদ্ধ বার্কে যে চিন্তা ও অস্তিত্ব একই বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছেন, এমত নহে। বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে ডেঃকার্ট এবং অধুনাতন দিকে কতকগুলি জার্ম্মাণ পণ্ডিতও (ফিশ্‌টে, হিগেল প্রভৃতি) ঐ প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। চিন্তা ও অস্তিত্ব এই দুয়ে গূঢ় সম্বন্ধ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; আমরা চিন্তা হইতে অনেক স্থলে অস্তিত্ব অনুমান করি আবার অনেক স্থলে অস্তিত্ব দেখিলে চিন্তা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না যে যাহার আমরা চিন্তা করিতে পারি না তাহার অস্তিত্ব নাই, কিম্বা যাহারই অস্তিত্ব আছে তাহারই আমাদিগের ন্যায় চিন্তা শক্তি আছে। আমরা জড় পদার্থের স্বরূপ (বাস্তবিক ভাব) চিন্তা করিতে পারি না বলিয়া জড় পদার্থ নাই কিম্বা জড় পদার্থের যদি কোন অস্তিত্ব থাকে তবে সে অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তু আমাদিগের ন্যায় চিন্তাশীল ইহা বলা ন্যায় সঙ্গত নহে। আমরা বলি, যে কারণে বলিতে হইবে আমাদিগের অস্তিত্ব আছে, সেই কারণে ইহাও বলিতে হইবে যে জড়-পদার্থের অস্তিত্ব আছে—শুদ্ধ তাহা নহে, আমাদিগের অস্তিত্বের মূলে যেরূপ সীমাবিশিষ্ট বস্তু আছে—জড়পদার্থের অস্তিত্বের মূলেও সেইরূপ সীমাবিশিষ্ট বস্তু আছে। আবার, আমাদিগের সীমাবিশিষ্ট অস্তিত্বের আদি কারণ যেরূপ ঈশ্বর, জড় পদার্থের সীমাবিশিষ্ট অস্তিত্বের আদিকারণও সেইরূপ ঈশ্বর। অর্থাৎ আমরা যেরূপ অর্থে বলিব যে ঈশ্বর হইতে আমাদিগের অস্তিত্ব পৃথক্, সেইরূপ অর্থে ইহাও বলিতে হইবে যে জড় পদার্থদিগের অস্তিত্বও ঈশ্বর হইতে পৃথক্—এমত বলিলে চলিবে না যে আমা-দিগের অস্তিত্ব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ কিন্তু জড়পদার্থের অস্তিত্ব পৃথক্ নহে। আমাদিগের এরূপ মতের প্রমাণ কি—আমরা যে সকল ঘটনা দেখিয়া থাকি, তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলির প্রকৃতি এই যে তাহারা আমাদিগের শক্তি দ্বারা সাধিত হয় না। আমা-

দিগের কার্য্য দেখিয়া আমরা বলি আমাদিগের অস্তিত্ব আছে, সুতরাং জড়পদার্থের কার্য্য দেখিয়া ইহা বলিতে হইবে যে জড়পদার্থের অস্তিত্ব আছে। সত্য বটে আমরা জড়পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না, কিন্তু আমাদিগের স্বকীয় স্বরূপ জ্ঞানই কি আমরা লাভ করিতে পারি? আমরা বাস্তবিক কি তাহা আমরা অন্ততঃ সাধারণ বুদ্ধিতে জানিতে পারি না, জড়পদার্থ বাস্তবিক কি তাহাও আমরা জানিতে পারি না। এখন সীতানাথ বাবুর আর একটী তর্কে আসা যাউক—তিনি বলেন জড়জগতের কার্য্য সমূহের কারণ দর্শাইতে হইলে চেতন কারণ অনুমান করা আবশ্যক। এরূপ মতের কোন যুক্তি দেখি না, শক্তি থাকিলেই যে সে সঙ্গে আমাদিগের ন্যায় চেতনা থাকা আবশ্যক ইহার কোন প্রমাণ নাই। কেহ কেহ (ডেঃকার্ট আদি) বটে এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে জড় বস্তু শক্তিবিহীন, কিন্তু তাহা কেবল তাঁহাদিগের কল্পনা মাত্র। নিউটন এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে জড়বস্তু শক্তিবিশিষ্ট—আমাদিগের কার্য্য দেখিয়া যেমন আমরা অনুমান করি যে আমাদিগের শক্তি আছে, জড় বস্তুর কার্য্য দেখিয়াও সেইরূপ ইহা মনে করা স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ যে জড় বস্তুরও শক্তি আছে। সীতানাথ বাবু বলেন যে চেতনা না থাকিলে (অর্থাৎ আমাদিগের ন্যায় চেতনা না থাকিলে) কার্য্য সম্ভবপর নহে, কিন্তু এরূপ কেবল আমাদিগের কার্য্য দেখিয়াই বোধ হয়—বাস্তবিকপক্ষে যে, যেখানেই কার্য্য হইবে, যেখানেই ঘটনা হইবে সেখানেই (আমাদিগের ন্যায়) চেতনাবিশিষ্ট বস্তু থাকা আবশ্যক তাহার কোন প্রমাণ নাই। সীতানাথ বাবু কি বলিতে চাহেন যে নিম্নতম জন্তুদিগের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, উচ্চ শ্রেণীর জন্তু হইতে তিনি নিম্নতম শ্রেণীর জন্তু পর্য্যন্ত দেখিয়া যাউন—তিনি কোন্ শ্রেণী হইতে বলিবেন যে ইহাদিগের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত স্বকীয় (পরমেশ্বর হইতে পৃথক) অস্তিত্ব আছে আর ইহাদিগের নিম্নতম শ্রেণী পর্য্যন্ত সেরূপ অস্তিত্ব নাই। •

আমাদিগের মতে জড়পদার্থের স্বকীয় অস্তিত্ব অস্বীকার করা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। আমরা বলি আমাদিগের যেরূপ স্বকীয় অস্তিত্ব আছে অন্যান্য পদার্থদিগের (জড়পদার্থদিগেরও) সেইরূপ স্বকীয় অস্তিত্ব আছে। বিশ্বাসের মূল অবিশ্বাস নহে, জড়জগতের স্বকীয় অস্তিত্বে অবিশ্বাস জন্মাইয়া পরমেশ্বরে বিশ্বাস জন্মাইবার প্রয়াস পাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই—আমাদিগের মতে ওরূপ প্রয়াসে বরং কোন কোন স্থলে বিপরীত ফল দাঁড়াইতে পারে (যেমন হিউমের পক্ষে।) আমরাও আছি, জড়পদার্থগণও আছে—আমাদিগের আদিকারণও যেরূপ ঈশ্বর, জড়পদার্থদিগের আদি কারণও সেইরূপ ঈশ্বর। আমাদিগের অস্তিত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে যেরূপ সম্বন্ধ—জড়পদার্থদিগের অস্তিত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্বেও অনেকাংশে সেইরূপ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ কি তাহা সীতানাথ বাবু প্রথম

পক্ষে সবিস্তারে আলোচনা করেন নাই; আমরা এস্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় কোন পক্ষেই উক্ত সম্বন্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। *

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কলঙ্ক।

(৪)

অন্য ভীলেরা যুবককে যেমন ভালবাসে, ভীলপুত্রও একদিন তাহাকে সেইরূপ ভাল বাসিত। যুবক যখন আট দশ বৎসরের বালক তখন হইতেভীলদিগের সহিত তাহার আলাপ, তখন ভীলপুত্র কত আগ্রহভরে তাহাকে গৃহে লইয়া আসিত, কুস্তি শিখাইত, বাণ খেলা শিখাইত, সঙ্গে লইয়া শীকার করিতে যাইত, তাহাকে না পাইলে ভীল পুত্রের তখন খেলাকরিয়া শীকার করিয়া আমোদই হইত না। কিন্তু তাহার পর—এখন? এখন যুবক আর তাহার বন্ধু নহে, সে তাহার প্রতিদ্বন্দী। যুবকের জন্য নিজের সমাজে ভীলপুত্রের এখন আর তেমন আদর প্রতি পত্তি নাই, প্রভুত্ব নাই। ভীল যুবারা যুবককে যত চায় তাহাকে তত চায় না, যুবককে নেতা করিয়া এখন তাহারা যত সন্তুষ্ট ভীল পুত্রকে নেতা করিয়া তত নহে। এমন কি তাহাদের যে খেলায় ভীলরাজ মন্দালিক না থাকেন—সেই খেলাতেই যুবককে তাহারা প্রধান করে, এইরূপে ভীলযুবাদের নিকট যুবকের একটি নামই রাজা হইয়া গিয়াছে। এক কথায় ভীল পুত্রের সামাজিক অধিকার যুবক একরকম পূর্ণ মাত্রায় গ্রাস করিয়া বসিয়াছে।

কত সামান্য কারণ হইতে সংসারে অসামান্য ঘটনা উপস্থিত হয়, এক বিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গেও বহুদিনের যত্ন নির্ম্মিত নগর ধ্বংশ হইয়া যায়, একটি ছোট্ট কথাতেও কতদিনকার বন্ধুতা ভাঙ্গিয়া যায়, সুতরাং ঐরূপ বিশেষ কারণে যদি ভীলপুত্র যুবকের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া থাকে—তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই, বরঞ্চ এরূপ স্থলে তাহাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক—কেন না আমাদের চোখের উপর সর্ব্বদা যাহা ঘটে তাহাই স্বাভাবিক! আমাদের সুসভ্য সমাজে এরূপ ঘটনার অভাব নাই—সেই জন্যই ইহা স্বাভাবিক! কিন্তু হইলে কি হয়—উক্ত "গুরুতর" কারণেও ভীলপুত্রের বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া যায় নাই।—(বুঝি বা সে এমনি অস্বভাবিক!) শেষাশেষি যাই হৌক—প্রথমে ভীলপুত্রই যুবককে এক-

---

* আমরা উপরে 'আমাদিগের ন্যায় চেতনাবিশিষ্ট' এই কথাটী ব্যবহার করিয়াছি ইহার অর্থ 'আমাদিগের ন্যায় পূর্ণ চেতনাবিশিষ্ট' ইহা বুঝিতে হইবে;—আমরা একথা স্বীকার করি যে জড়পদার্থের এক প্রকার অর্দ্ধ চেতনা থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করি না যে আমাদিগের অস্তিত্ব ঈশ্বর হইতে যতদূর পৃথক্ জড়জগতের অস্তিত্ব ততদূর পৃথক নহে অর্থাৎ জড় ঈশ্বরের চিন্তা মাত্র, আর আমরা তাহা নহি।

রকম বাড়াইয়া তুলিয়াছে, আগে আগে সেই সর্ব্বাগ্রে যুবকের হাতে বাণ তুলিয়া দিয়াছে, শীকারে যাইবার সময় তাহাকেই আগুয়ান করিয়া দাঁড় করাইয়াছে, এক দিন যখন তাহাদের দুই দলে কৃত্রিম যুদ্ধখেলা হইতেছিল—ভীল পুত্রই যুবকের হাতে রাজ যষ্ঠি আনিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু তাহার পর যেদিন ভীল পুত্রের অপেক্ষা না করিয়াই যুবক সেই সকল অধিকার নিজের বলিয়া গ্রহণ করিল, যে দিন ভীল যুবারা একবার ভীল-পুত্রকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না করিয়া যুবককে রাজা করিল, সেই দিন ভীলপুত্র একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল বটে কিন্তু শীঘ্রই সে ভাব তাহার মন হইতে চলিয়া গেল, সৌর্য্যে বার্য্যে বুদ্ধিকৌশলে সকল বিষয়েই যুবক এত শ্রেষ্ঠ যে ক্রমে যুবকের প্রভুত্ব আপনা হইতে তাহারো সহিয়া গেল—দুর্ব্বলের প্রতি সবলের, অক্ষমের প্রতি ক্ষমতাশালীর এমনি প্রভাব! কিন্তু ক্ষমতার প্রভাব অসীম যেখানে ন্যায় প্রেম ইহার চালক ; অন্যস্থলে ইহার প্রভাব প্রভূত হইলেও সে প্রভাবের সীমা আছে। ভীলপুত্রের এত সহিল—একটি সহিল না ; যখন তাহার মনে হইল কেবল সামাজিক অধিকার নহে—তাহার পিতার স্নেহও যুবক আত্মসাৎ করিতেছে, তখন আর তাহার সহ্য হইল না। সে সব সহিতে পারে, পিতার স্নেহের উপেক্ষা সহিতে পারে না, আর সব অধিকার হইতে সে বঞ্চিত হইতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহার এই স্বাভাবিক অধিকার আর কাহাকেও সে দিতে পারে না। ভীল অসভ্য, তাহার স্বাভাবিক, অবিকৃত হৃদয়ে প্রেমেরই একাধিপত্য, তাই সে ক্ষমতাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারে প্রেমকে পারে না। সে যে এমন করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাহার অধিকার অনধিকার বুঝিয়া সুঝিয়া এরূপ নিষ্পত্তিতে আসে তাহা নহে, সে আর কিছুই বুঝে না—পিতার স্নেহের অভাব দেখিলে তাহার যে কষ্ট হয় সে কেবল তাহাই বুঝে ; সে আর কিছু ভাবে না যুবকের প্রতি পিতার স্নেহ দেখিলে তাহার যে কষ্ট হয়—তাহাই শুধু সে ভাবে ; ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে এক রকম করিয়া সে কষ্টটা তখনকার মত তাহার মনে মিলাইয়া পড়ে, কিন্তু এইরূপে যুবকের উপর তাহার যে একটা রাগের ভাব আসিয়া পড়ে, তাহা উত্তরোত্তর ক্রমশই তাহার মনের মধ্যে জমা হইতে থাকে।

এইরূপ মনের অবস্থায় মৃগয়া দিনের সমস্ত ঘটনাই তাহার কষ্টের কারণ হইয়া উঠিল—বিশেষতঃ যখন পিতা বলিলেন—"তুই কেন ওডার মত হইলিনে" তখন আর ভীল পুত্রের দুঃখ রাখিতে স্থান হইল না,—মনুষ্যের গর্ব্বে আঘাত লাগিলে বড় আঘাত লাগে, এতদিন কত ঘটনায় যাহা না হইয়াছে আজ ঐ সামান্য কথাটিতে তাহা সাধিত হইল। এইরূপই হইয়া থাকে ; ধূঁয়াইতে অনেক সময় যায়—কিন্তু জ্বলিয়া উঠিতে মুহূর্ত্তও লাগে না!

যদি পিতার ভালবাসায় আগে হইতে তাহার সন্দেহ না জন্মিত তাহা হইলে ঐ কথা-গুলিরই সে অন্য অর্থ দেখিতে পাইত, ঐ কথাতে সে পিতার ভালবাসার ভাবই দেখিতে

পাইত, কিন্তু এখন এইগুলিতে তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ হইল, গর্ব্বে আঘাত লাগিল, ক্রমাগত ঐ কথাগুলি মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে "তাহাকে আর পিতার মনে লাগে না।" জনতার মেলা হইতে সে একাকী দূরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, তাহার পর স্থির করিল যুবক তাহার শত্রু।

(৫)

পরদিন ভীলেদের ভোজোৎসব। আজিকার শীকার মাংস রন্ধন করিয়া আহার উপলক্ষে কাল তাহাদের নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদ। শীকারীরা শীকার লইয়া গ্রামে আসিলে বিকাল হইতে গ্রামের সমস্ত ভীলেরা মহা ব্যস্ত, রাত্রেও তাহাদের নিদ্রা নাই। বৃদ্ধ ও যুবকদিগের নৃত্যগীতভোজের স্বতন্ত্র দুইটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দুইটি নির্দ্দিষ্ট চক্রের মধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠরাশির দুইটি আগুণ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার চারিপাশে লোক জমা হইয়া মেয়ে পুরুষে মিলিয়া উনুন খুড়িতেছে, শীকার কাটিতেছে, বাটনা বাটিতেছে, মাদল পিটিতেছে, গল্প করিতেছে, হাসিতেছে, চীৎকার করিতেছে, আর হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে মাঝে মাঝে অগ্নি কুণ্ডে শুষ্ক কাঠ ঠেলিয়া দিতেছে ও নূতন কাঠ কাটিয়া আনিয়া জমা করিবার জন্য তম্বি করিতেছে। যাহারা কাঠ আনিতে উঠিতেছে তাহারা দু এক পা গিয়া দু একটা মাদল টানিয়া লইয়া পিটিতে পিটিতে গান লাগাইয়া দিতেছে অবশেষে মেয়েদের চেঁচানির জ্বালায় মাদলগুলা ফেলিয়া চোঁচা দৌড় মারিতেছে।

এই সময় এই গোল মাল হইতে কিছু দূরে ভীলপুত্র একাকী বসিয়াছিল। কিছু পরে কয়েকটি ভীলযুবা নিকটে আসিয়া বলিল—"একা কি করছুস রে—আয়না ওই দিকে" বলিতে বলিতে তাহারাও ভীলপুত্রের নিকট আড্ডা গাড়িল, ক্রমে সেখানে ছোট্ট খাট্ট একটি দল জমিয়া, উৎসবেরই গল্প আরম্ভ করিয়া দিল; ভীলপুত্র চুপ করিয়া শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—"কাল রাজা হউবিরে কোন ডা?"

ভীলেদের সকল কর্ম্মেই একজন অধিনায়ক আবশ্যক—ইহা অসভ্য সমাজের একটা বিশেষ লক্ষণ, কাল ভীলরাজ মন্দালিক বৃদ্ধদিগের মধ্যেই থাকিবেন, সুতরাং কাল যুবাদের অধিনায়ক হয় কে—এই কথা? কিন্তু একথায় অন্যেরা যেন আশ্চর্য্য হইল, এক জন বলিল—"ক্যানরে যেইডা রোজ হউছে"

ভীল পুত্র কাল ভুরুর গোচ্ছা কুঁকড়িয়া বলিল—"সেইডারে রোজ মুইরা রাজা করিবু ক্যানরে? তানা কি মুদের—রাজ পুত্র! মুরা কি রাজা হইতে নারি নাকি?"

একজন ভীল বলিল" সে রাজা বেটা বড্ডাই লায়েক ভাই"—

ভীল পুত্র রাগিয়া বলিল "মোরা লায়েক নই ক্যামনে,"

ভীল বলিল "দেখ্ছুস ত কাল ক্যামন হরিণডা আনিল"—

ভীলপুত্র। "সে হরিণ আনিল মুই বরা আনিল না?"

একজন ভীল। "তাতু ব্যাটে, ত্যাবে হরিণডা"—ভীলপুত্র লালচক্ষু করিয়া বলিল— "হরিণডা হরিণডা! মুইত আর একদিন হরিণডা নিয়ে এনু, তাতে ত এত কথা কেউ কইল না বাবাত মোর পিঠটাও থাবড়ালে না—আর আজ দিন ভোর হরিণডা হরিণডা, বল না ক্যান্, মুই গোটা গোটা অমন হরিণ আনু দিউছি"

আর একজন ভীল বলিল "চট্টিশ ক্যান ভাইডা—তানা রাজা না হউবু ত কোনডা হউবু"

ভীলপুত্র। "অ্যাত দিন হউছিল কে? মুই না রাজার ছেলে—মুই হউব—সেডা হউলে মুই থাকিবুই না" ভীলপুত্রের যা মনে হইয়াছে স্পষ্টা পষ্টি বলিয়া গেল—সে অসভ্য ঘোর প্যাঁচ করিয়া ঢাকিয়া ঢুকিয়া বলা তাহার কর্ম্ম নহে। একজন ভীল বলিল—"তানা রোজ রাজা হউছে আজ সেডা ছাড়ুবে ক্যানরে?"

ভীলপুত্র। "ছাড়ুবে ক্যান! মুরা কি মানুষ নকি? মুরা তাড়াউতে নারিব!

এ কথায় ভীলেদের প্রাণে ব্যথা বাজিল—তাহারা যুবককে বড়ই ভাল বাসে, অথচ ভীলপুত্রের এতদূর অনিচ্ছার মধ্যে তাহাকে রাজা করিবার কোন উপায়ই দেখিল না। তাহারা মহা মুস্কিলে পড়িল। একজন একটু পরে বলিল—"বেস্ মুরা তানারে রাজা করিবু না; কাল চক্করে (চক্র খেলায়) যেইডা জিতুবে—সেই ডা রাজা"—

ভীলপুত্র ইহাতে আর কোন কথা কহিতে পারিল না, এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলে ভীলেরা তাহাকে ঘৃণা করিবে। তাহাই ঠিক হইল। যুবক প্রাতঃকালে আসিয়াই এই বন্দোবস্তের কথা শুনিল—তাহারও ইহাতে কোন আপত্তি হইল না—কোন উত্তেজনার কাজে, সাহসের কাজে যুবক পিছপাউ নহে, বরঞ্চ তাহাতেই তাহার আনন্দ সেইরূপ কাজই যুবক খুঁজিয়া বেড়ায়।

৬

একটি সমক্ষেত্রে শাখাপ্রশাখাচ্ছিন্ন কাছাকাছি দুইটি সমান মোটা গাছ; সেই গাছ দুইটি চক্রদ্বারা ভেদ করিতে হইবে—যাহার চক্র বৃক্ষকায়ের অধিক দূর ভেদ করিবে তাহারি জয়। গাছ দুইটি আন্দাজ আধ ক্রোশ দূরে রাখিয়া মাদলধারী ভীল যুবকগণের অগ্রভাগে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী পাশাপাশি ঠিক হইয়া দাঁড়াইল—মাদল বাজিয়া উঠিল, চীৎকার ধ্বনি উঠিল, আবার নিমেষের মধ্যে সে গোলমাল থামিয়া গেল, চারি-দিক একটা উৎসুক্যময় নিস্তব্ধতায় পরিণত করিয়া দুই জনের হস্ত নিক্ষিপ্ত চক্র বিদ্যুৎ-বেগে দুই গাছে আসিয়া লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভীলপুত্রের গাছটি মড় মড় করিয়া ভুইয়া পড়িল, যুবকের গাছ যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল। বাজনা বাজিয়া উঠিল, ভীল পুত্রের পক্ষীয়গণ আহ্লাদে লম্ফ দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া জয়ীকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল,—নাচিতে নাচিতে পাহাড়ের একটা উঁচু ঢিবির উপর যেখানে পাতার সিংহাসন রচিত হইয়াছিল সেইখানে তাহাকে লইয়া চলিল। তাহা-

দের জয় জয় কারের মধ্যে ভীলপুত্র সেইখানে আসিয়া বসিলেন, এই সময় পশ্চাতে আর একটা কলরব উঠিল, কলরব দ্রুতবেগে সিংহাসনের দিকে আসিতে লাগিল—সিংহাসনের চারিপার্শ্বস্থ জয়ধ্বনি ডুবাইয়া দিয়া ক্রমে এই কথা গুলি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"যুবক জয়ী হইয়াছে, যুবকের চক্র গাছ ভেদ করিয়াছে" পাতার সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল, জয়ধ্বনি থামিয়া গেল, জয়কারীগণ অবাক স্তব্ধ হইয়া চীৎকারকারীদের মুখের পানে ফিরিয়া চাহিল—আবার শুনিল "যুবক জয়ী হইয়াছে তাহার চক্র গাছভেদ করিয়াছে।" হঠাৎ চারিদিকে একটা ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল, ভীলপুত্রকে সিংহাসনে ফেলিয়া রাখিয়া অন্যেরা ছুটিয়া সেই গাছেরদিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল, নিকটে আসিয়া দেখিল সত্যই যুবক জয়ী হইয়াছে। ভীলপুত্রের চক্রে গাছের অর্দ্ধভাগ ছেদিত হইয়াই গাছ নত হইয়া পড়িয়াছে আর যুবকের গাছ আড়া আড়ি একেবারে দ্বিভাগ হইয়া মূল স্তম্ভের উপর ঠিক দাঁড়াইয়া আছে। আর কিছু নহে, যুবকের গাছটি ঠিক সোজা ভাবে উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল—তাই কাটিতে কাটিতে তাহা একেবারে পড়িয়া যায় নাই। স্রোত ফিরিল, সকলে জয় জয়কার শব্দে যুবককে ভীলপুত্রের সিংহাসনে আনিয়া বসাইয়া কেহ গলায় পাতার মালা পরাইতে লাগিল, কেহ মাথায় ঘাসের মুকুট বাঁধিয়া দিল, একজন একটা বংশ দণ্ড আনিয়া হাতে দিল, সকলি হইল—কেবল বাকী রহিল একটি। অভিষেকের সময় ভীলদের রাজার কপালে লাল ফোঁটা দিতে হয়, তাহার আয়োজন ত কিছুই নাই, উপায় কি? একজন উৎসাহোন্মত্ত ভীলযুবা নিজের আঙ্গুল কাটিয়া সেই রক্ত লইয়া তাহার কপালে ফোঁটা পরাইয়া দিল—অমনি সকলে আমাদের রাজা রাজা করিয়া চারি পাশে নৃত্য আরম্ভ করিল, দলে দলে কাতারে কাতারে লোক আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, সত্যকার রাজাকেও এত লোকে দেখিতে আসে না। সেই জনতা ঠেলিয়া বহু কষ্টে একজন লোক, সিংহাসনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হঠাৎ সকলে স্তব্ধ হইয়া পড়িল—তিনি তাঁহার ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে কি? সকলে উত্তর করিল "আমাদের রাজা হইয়াছে" "রাজা হইয়াছে? সে আবার কি?" যুবারা তখন খুলিয়া সব বলিল—খানিকক্ষণ মন্দালিকের মুখে কোন কথা সরিল না, তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—কিছু পরে আত্মস্থ হইয়া বলিলেন "বৎসগণ শোন, আজ খেলাচ্ছলে যাহাকে রাজার অধিকার দিলে—সে অধিকার আবার ফিরাইয়া লইলে তোমাদের কথা মিথ্যা হইয়া যায়, তোমরা আমার সন্তান, তোমাদের সত্য ভঙ্গ হইলে তাহার দায়ী আমি, সুতরাং আজ তোমরা যাহাকে রাজা বলিয়া ডাকিলে সে চিরকালই তোমাদের রাজা হউক" বলিয়া বৃদ্ধ ভীলরাজ তাঁহার লৌহ পাত মণ্ডিত বংশ দণ্ড যুবকের হাতে দিয়া বলিলেন "আজ হইতে তুমিই এই বন প্রদেশের রাজা হইলে, আমরা তোমার প্রজা," বলিয়া স্বয়ং বৃদ্ধ তাহাকে অভিবাদন করিলেন—একে একে ভীলগণ সকলেই অভিবাদন করিতে লাগিল—যুবকের কিছুই নূতন মনে হইল না, মনে

মনে সে এত দিন সকলেরই প্রভু ছিল, আজ প্রকাশ্যে হইল মাত্র। যুবক রাজারই মত গট হইয়া বসিয়া রহিল। অভিবাদন এক রকম শেষ হইয়া আসিল—কিন্তু ভীলপুত্র অভিবাদন করিল না, দেখিয়া ভীলরাজ বলিলেন—"বৎস প্রণাম কর ইনি তোমাদের রাজা" এ আজ্ঞা পিতার আজ্ঞা, রাজার আজ্ঞা, রাজবিদ্রোহ কাহাকে বলে অসভ্যেরা জানে না—এ আজ্ঞা অবহেলা করিতে ভীলপুত্রের সাধ্য নাই, ভীল পুত্র আস্তে আস্তে অনিচ্ছুক হৃদয়ে মস্তক অবনত করিল। ক্রমশঃ।

রাজনৈতিক আলোচনা।

মহাসভার নির্ব্বাচন।

এবারও পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল (Conservative) দলের জয় হইয়াছে। ৬৭০ জন সভ্যের মধ্যে ৩১৬ রক্ষণশীল, ৭৮ Unionist, (হার্টিংটন ও চেম্বার লেনের দল—যাঁহারা আয়ারল্যাণ্ডকে স্বতন্ত্র স্বায়ত্ত শাসন না দিয়া—ইংলণ্ডের সহিত এক রাখিতে চান) ১৯১ গ্লাডষ্টোন দলভুক্ত-উদারনৈতিক এবং ৮৫ পার্ণেলাইট্‌স্। গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়াতে লর্ড সলস্‌বরি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিসভা সংস্থাপন করিতেছেন। সুখের বিষয় যে লর্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফ চার্চ্চহিল এবারে ভারত সেক্রেটরি হইবেন না তিনি গতবৎসর বাঙ্গালি বাবুদিগের উপর যেরূপ তীব্রবিদ্রূপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা তাঁহার নিকট ভারতের কোন বিশেষ মঙ্গল আশা করিতে পারি না। যদি Unionist গণ অর্থাৎ লর্ড হার্টিংটন ও চেম্বারলেনের দলভুক্তগণ রক্ষণশীলদিগের সহিত সকল বিষয়ে যোগ না দেন তাহা হইলে লর্ড সলসবরির মন্ত্রিত্ব গতবারের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। হার্টিংটন ও চেম্বারলেন, রক্ষণশীলদিগকে আয়র্লণ্ডের গোলযোগ মিটাইতে সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আর কত দিন আইরিশদিগকে ন্যায্য গণ্ডা হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে আমরা বলিতে পারি না। আইরিশগণ কিছুতেই নিরুৎসাহ হইতেছে না। "মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন" মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পার্ণেল ও তাঁহার সহচরগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন; যদি ন্যাসনেলদিগের সভ্যেরা বাস্তবিকই দেশানুরাগে মাতিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত পার্ণেল ও তাঁহার সহায়বর্গের নিকট অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিক্ষা করা। এবারে Wilfred Blunt নির্ব্বাচিত হইয়া রক্ষণশীলদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গ্লাডষ্টোন দলভুক্ত হইয়াছেন। তিনি কেন যে এত দিন এই দলভুক্ত হন নাই ইহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারা যায় না। ইনি মুসলমানদিগের—বিশেষত

মিসর দেশীয় মুসলমানগণের ও আরবি পাসার একজন পরমবন্ধু। ইনি কলিকাতার গত মহা প্রদর্শনির সময় এখানে আসিয়া ভারতের যে একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছেন।

শ্রীযুত লালমোহন ঘোষ ও দাদাভাই নওরোজি সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। "যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে" এই মহা উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া নবরাগে উদ্যমশীল হইয়া এই দুই দেশহিতৈষীর পুনরায় মহাসভার মেম্বর হইতে চেষ্টা করা উচিত। জজ ফিয়ার সাহেবও এবার নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক মহারথী পরাজিত হইয়াছেন। সর চার্লস্ ডিল্‌কি, গেসেন, সর চার্লস্ ট্রেভেলিয়ন, ভারতের অন্তর-সেক্রেটরি সর্ ষ্ট্যাফোর্ড হাউয়ার্ড এবং আয়র্লণ্ডের একজন প্রধান নেতা পার্ণেলের দক্ষিণ হস্ত হিলি নির্ব্বাচিত হন নাই।

ভারতের পক্ষে কতকটা মঙ্গল যে হণ্টর, ডিগবি, গ্লাউডেন্ ও ব্লণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

তিব্বত ও ইংলণ্ড।

বর্ম্মা অধিকারের পর ইংলণ্ডের পুনরায় দেশাধিকার ইচ্ছা বলবৎ হইয়াছে। আমাদের সুযোগ্য সহযোগী "ইণ্ডিয়ান্ মিরার" প্রথম হইতে লর্ড ডফেরিন্‌কে সৎপরামর্শ দিয়া আসিতেছেন যে তিব্বৎ প্রদেশে দূত পাঠাইলে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু মেকলে সাহেবের কুপরামর্শে লর্ড ডফেরিন তিব্বতে দূত প্রেরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পরামর্শ দাতা মেকলেকে তথায় পাঠাইতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এমন কি পাঁচ শতের অধিক মিউল (Mule) সৈন্য ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ আহারাদি সঙ্গে প্রস্তুত হইয়া দার্জিলিং পাহাড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এমন সময়ে শুনা গেল যে বহুসংখ্যক তিব্বত প্রদেশীয় সৈন্য ইংরাজ দূতের গতিরোধার্থে পাহাড়ের অপরপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে। দূত মহাশয়ও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া লাট সাহেবকে ইহা জানাইলেন। ইতি মধ্যে একটা জনরব প্রচার হইল যে বর্ষার প্রাচুর্য্যপ্রযুক্ত দূত মহাশয় অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতেছেন না; একটু জল কমিলেই তিনি দার্জিলিং পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতাভিমুখে অগ্রসর হইবেন।" ইণ্ডিয়ান্‌মিরর" পরামর্শ দিলেন যে লজ্জাত্যাগ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসুন, কেন মিছামিছি তিব্বত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া একটা অন্যায় যুদ্ধ ঘটাইবেন? "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"—কেহই মিরারের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে বিলাত হইতে তারে সংবাদ আসিল যে চীনের সহিত ইংলিস্ গবর্ণমেণ্টের অতিশয় (?) সদ্ভাব আছে এবং যখন চীনমন্ত্রিগণের ইচ্ছা নহে যে এখন ইংরাজ দূত তিব্বতে প্রবেশ করে, তখন এমত অবস্থায় সেখানে দূত প্রেরণ উচিত বোধ হয় না।

ইতি পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে মেকলে মহামতি চীনে স্বয়ং গিয়া চীনের মন্ত্রিগণের নিকট তিব্বতে যাইবার অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন। কৈ? এখন যে ঢোল কড়াই কানা দেখিতেছি। ইহাকেই কি রাজনৈতিক কৌশল বলে?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নূতন লেজিস্‌লেটিভ কৌন্সিল স্থাপন।

শুনা যাইতেছে যে সর্ অ্যালফ্রেড্ লায়েল্ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও বাঙ্গালার ন্যায় আইন্ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য কৌন্সিলের প্রার্থনা করাতে লর্ড ডফেরিন তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। যদি উক্ত কৌন্সিল বাঙ্গালা বা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কৌন্সিলের অনুরূপ হয় তাহা হইলে যাহাতে কৌন্সিল স্থাপিত না হয় সে বিষয়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

ন্যাসানেল লিগ্ কি করিতেছেন? উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের "Oudh and N. W. P. Association কি করিতেছেন? এইত কার্য্যের সময়। যাহাতে স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর নির্ব্বাচন প্রথা এই কৌন্সিলের মধ্যে প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। যদি লিগ্ এই কার্য্যে বিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টা দেখাইতে পারেন তাহা হইলে জানিব যে লিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইতে পারিবে। লিগ্ স্থাপনের পর এই প্রথম নূতন কৌন্সিলের সৃষ্টি, অতএব মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ আবশ্যক হইয়াছে। অনেকে হয়ত বলিবেন যে বৃথা চীৎকার করিয়া করিয়া কি হইবে? লর্ড ডফেরিন্ যাহা মনে করিবেন, কার্য্যতঃ তাহাই হইবে। আমি বলি আমরা আমাদের কর্ত্তব্য যাহা তাহা করিব। ফলাফলের বিষয় ভাবিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনে কুণ্ঠিত হইব না। কেহ সাঙ্ঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইলে, মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও কি তাঁহার পিতা মাতা বা আত্মীয় স্বজন তাহার চিকিৎসা বা রোগ দূরীকরণের চেষ্টা করিতে বিরত হন? আমাদের একটি মহা ভুল ও দোষ যে সর্ব্বদাই হতাশ্বাস হইয়া থাকি। বৈদেশিক রাজা যদি আমাদের প্রার্থনা নাই গ্রাহ্য করেন তাহাতে আমরা অবশ্য দুঃখিত হইব, তাই বলিয়া প্রার্থনা করিতে ছাড়িব কেন। আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে, গবর্ণমেণ্ট পরে বলিবে যে, কৈ প্রজা সমূহত নির্ব্বাচন প্রণালী চাহে নাই।

আসামে কুলি রমণীদিগের প্রতি চা করদিগের অত্যাচার।

নীচমনা ইংরাজদিগের অত্যাচার এত বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে যে গরিবদিগের প্রাণ বাঁচান দায় হইয়া পড়িয়াছে। আজ কি না অমুক সাহেব পাখাকুলিকে এক চপেটাঘাতে খুন করিয়াছে—কাল কি না অমুক গোরা কানপুরের মেমোরিয়াল উদ্যান দেখিয়া সম্মুখস্থ তিন জন দেশীয়কে খুন করিয়াছে—আর এক দিন অমুক সাহেব শীকার করিতে গিয়া দুই জনকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে—এরূপ সংবাদ আজ কাল প্রায় শুনা যাইতেছে; কিন্তু নীলকর ও চা-করের অত্যাচার আরো ভয়ানক হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অত্যাচার শীঘ্র নিবারিত না হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপরই যে সমস্ত দোষ আসিয়া পড়িবে তাহার আর সন্দেহ নাই—এখনি এই সকল অত্যাচারের অবিচার দেখিয়া, বিচারকদিগের পক্ষপাতিতা দেখিয়া প্রজা মাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ অত্যাচার অনুমোদন করিয়া থাকে। আমরা নিজে যদিও ততদূর বিশ্বাস করি না বটে, কিন্তু দিন দিন বিচারকদিগের আইন বিরুদ্ধ কার্য্যকলাপ ও ইংরাজ আসামীর পক্ষ সমর্থন দেখিয়া সুবিচার ও অত্যাচার নিবারণ পক্ষে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।

আসামে চা-করেরা যেরূপ অযথা ও যথেচ্ছাচারের সহিত কুলিরমণীদিগের সতীত্ব হরণ করিয়া থাকে তাহা শুনিয়া আমাদের শোণিত জল হইয়া গিয়াছে। কি রূপ বাক্য দ্বারা আমাদিগের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশ করিব তাহার ভাষা খুঁজিয়া

পাই না। হিন্দু রমণীদিগের এক মাত্র আদরের ও বহু মূল্যধন সতীত্ব রত্ন তাহাও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। একবার নহে—দুইবার নহে—শত শত বার এইরূপ ভয়ানক অত্যাচারের কথা শুনা যাইতেছে, পুলিষে অভিযোগ করিলে সাহেবদিগের ভয়ে পুলিষ অভিযোগ শুনিতে চাহে না—মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিলে প্রায় আবেদনকারীর শাস্তি হয়। আর কত দিন এরূপ ভীষণ অত্যাচার ও অবিচার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নাম কলুষিত করিবে! যদিও কখন কখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব চা-করের উপর একটু মাত্র পীড়াপীড়ি করেন অমনি আমাদের পরম শত্রু Defence association জিহ্বা আস্ফালন পূর্ব্বক ভীষণ শব্দে চা-কর সাহেবকে সাহায্য করিতে উদ্যত হয়। নিঃসহায় কুলী রমণীগণ আর কত দিন দুরাচার চা-করদিগের অত্যাচার সহ্য করিবে? Defence association এর ন্যায় আমাদেরও একটি আত্মরক্ষা সমিতি স্থাপন করিয়া এই দরিদ্র ধর্ম্মভীত নিঃসহায় কুলী রমণীদিগের সাহায্য করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। রাজপুরুষেরা স্বজাতীয় অত্যাচারী চা-করদিগকে আজীবন সাহায্য করিয়া আসিতেছে ও করিবে। হাইকোর্ট ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় নাই। যাহাতে এই সকল অবিচার হাইকোর্টের কর্ণগোচর হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের লাইবেল মকদ্দমা।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ সম্পাদক নাইট সাহেব বর্দ্ধমান মহারাজার ষ্টেটের কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজর মিলার সাহেব ও লালা বনবিহারী কাপুরের বিরুদ্ধে কতকগুলি তীব্র অভিযোগ করায় মিলার সাহেব কলিকাতার পুলিষ আদালতে ইঁহার নামে নালিষ করেন। পুলিষ মাজিষ্ট্রেট নাইট সাহেবকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। দায়রায় মকদ্দমা উঠিবার কিছু দিন পূর্ব্বেই মিলার সাহেবের জ্বর রোগে মৃত্যু হয়। মিলারের মৃত্যুর পর মকদ্দমাটি চালান গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল না। কিন্তু নাইট সাহেব আপনার পক্ষপাতশূন্য ব্যবহারের জন্য সিভিলিয়ানগণের ও গবর্ণমেণ্টের এমনি ক্রোধের পাত্র হইয়াছেন যে এবারকার বিচারে নয় জন জুরির মধ্যে ছয় জন জুরি নাইটকে নির্দ্দোষী বলাতেও জজ ওকিনলি নাইটকে অব্যাহতি না দিয়া, পুনর্বিচারের জন্য সোপর্দ্দ করিয়াছেন। নাইট সাহেবের পক্ষের ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই মকদ্দমাতে যেরূপ নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন এর্‌স্কিন, টার্‌লস, ডিকেন্স ও টমসনের সহিত তাঁহার তুলনা করিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। ব্যারিষ্টার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় উপযুক্ত আডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্টে অতি বিরল। অনেক কাল আজ কাল ইঁহার যেরূপ দেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে ইনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র বাঙ্গালীর এক দিন নেতা হইতে পারিবেন।

"প্রাচীনের আশা।"

Bengal national league হইতে old man's hope নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত ও বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছিল এই পুস্তকখানি তাহারই অনুবাদ। আমরা অনুবাদক ও প্রকাশক উভয়কেই ইহার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি, এই পুস্তকখানি বিনা মূল্যে বিতরিত হওয়াতে ইহার উদ্দেশ্য আরো সফল হইবে। আমাদের কেবল একটি মাত্র বক্তব্য এই যে, যদি ভাষাটি আর একটু সরল ও সাধারণের পাঠোপযোগী হইত তাহা হইলে আরো ভাল হইত। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দেব ঠানঠনিয়া ২৲
,, শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর ৩।৵০
,, গোপালচন্দ্র মুখোঃ আলিপুর ৭।/১৫
,, অঘোরনাথ দত্ত শ্যামপুকুর ১৲
,, অনুকূলচন্দ্র মণ্ডল রসপুর ৩।৵০
পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন চুচুড়া ৩।৵০
বাবু অনন্তরাম ঘোষ আমতা ৩।৵০
,, হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বরাকর ৩।৵০
,, বীরেশ্বর সেন ডিব্রুগড় ৩।৵০
,, নবকুমার দাস মুচিকান্দী ১।৵০
,, দেবেন্দ্রনাথ পাল কলিকাতা ১৲
শ্রীযুক্তা ফয়জেন্নেছা চৌধুঃ লাকসাম ৩।৵০
বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত কাদওয়া ৩।৵০
,, সুরেশচন্দ্র বসু হোগলকুড়ে ২৲
,, সতীশপ্রসাদ চট্টোঃ জামালপুর ১॥০
,, আশুতোষ বসু মারবেরিটা ৩।৵০
,, রামরূপ ঘোষ সেরপুর ৩।৵০
,, চারুচন্দ্র চৌধুরী মৃজাপুর ৩।৵০
,, আদিত্যরাম ভট্টাঃ এলাহাবাদ ৩।৵০
,, চন্দ্রনাথ পালিত হালিসহর ৪৲
,, প্রকাশচন্দ্র সরকার ভবানীপুর ৩৲
,, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ নবধাই ২।৵০
,, হেমন্তকুমার দত্ত ঐ ১॥০
,, সৌরেশচন্দ্র সরকার কীর্ণহার ৩৲
,, ভূপতিনাথ বসু বিডন্‌ষ্ট্রীট ৩৲
রাজা রঘুনাথ মানসিংহ ডোমপাড়া ৩।৵০
বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা ৩৲
,, রাধাবল্লভ দাস ঢাকা ৩।৵০
,, রসরাজ মণ্ডল পাকুড়িয়া ২।৵০
,, রমণীমোহন রায় কাকিনা ৩।৵০
,, উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল টালিগঞ্জ ৩।৵০
,, লালমোহন বিশ্বাস কৃষ্ণনগর ।৵০
,, কৈলাসচন্দ্র রায় দেহুড়দা ৩।৵০
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ খিদিরপুর ৩।৵০
রাজা কালীপ্রসাদ সিংহ সুসঙ্গ ৭৲
পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ দিনাজপুর ১৸০
বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘটক দিনাজপুর ৩।৵০
,, পূর্ণানন্দ সাহা কুমারখালি ৩।৵০

বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খিদিরপুর ৩।৵০
,, বসন্তকৃষ্ণ বসু বাঁকুড়া ৩।৵০
,, প্রিয়নাথ ঘোষ কুচবিহার ৩।৵০
,, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ নাগপুর ৩।৵০
শ্রীমতী হরকালী ঘোষ ঐ ।৵০
বাবু কালীমোহন ঘোষ ডেরাডুন ৫৲
,, গোপালচন্দ্র রায় শিমলাপাহাড় ৩।৵০
,, অমরনাথ বসু গোয়াবাগান ২৲
,, উমেশচন্দ্র দত্ত রামবাগান ৩৲
শ্রীমতী মলিনপ্রভা ঘোষ এলাহাবাদ ৩।৵০
বাবু নারায়ণচন্দ্র সেন কটক ৩।৵০
,, বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্বলপুর ২।৵০
,, দুর্গাচরণ রক্ষিত কটনষ্ট্রীট ৩৲
,, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গাজিপুর ৩।৵০
,, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী কলিকাতা ৩৲
,, কালীপ্রসন্ন রায় কাশীপুর ৬৸০
,, গোপালচন্দ্র গুপ্ত যোড়াসাঁকো ৩৲
,, হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নবগ্রাম ৩।৵০
শ্রীমতী জগদীশ্বরী সেন ভাগলপুর ৩।৵০
বাবু জোয়ালাপ্রসাদ চট্টোঃ আলিগড় ৩।৵০
শ্রীমতী বিনদাসুন্দরী দাসী কলিকাতা ৩৲
বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু বেনারস ৩।৵০
,, মন্মথনাথ মিত্র ঝামাপুকুর ৩৲
,, কানাইলাল ঘোষাল শিমলা ৩৲
,, হরিমোহন ধর মনুমুখ ১৲
শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু দমদমা ২৲
বাবু মাধবচন্দ্র সেন পাবনা ২৲
,, উমেশচন্দ্র দত্ত কৃষ্ণনগর ৩।৵
,, সাধুচরণ বিশ্বাস ঢাকা ২৲
,, মতিলাল মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরা ৩।৵০
,, ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহেশপুর ৩।৵০
,, যাদবচন্দ্র মিত্র নিমতলা ৩৲
,, গণেশচন্দ্র চৌধুরী মেদিনীপুর ৩।৵০
,, গোপালচন্দ্র চট্টোঃ শ্যামবাজার ৩৲
,, যাদবচন্দ্র দেব হাতিবাগান ১॥০
কুমার অনাথকৃষ্ণ দেববাহাঃ শোভাবাজার ৩৲
দিঘাপতিয়া ওয়ার্ডস্ ষ্টেট্ লাইব্রেরীর ম্যানেজার ৩।৵০

বাবু শশীভূষণ কোঁয়ার সীতাপুর ৩৷৵৹
,, দ্বারকানাথ শেঠ খেংরাপটী ৩৲
,, তারণীচরণ পাত্র দক্ষিণ বাঁ্যাটরা ৩৷৵৹
,, প্রতাপচন্দ্র নাগ খলিসপুর ৷৷/৹
কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শ্যামবাজার ৩৲
বাবু গোবিন্দচাঁদ বসু দেবানন্দপুর ৩৷৵৹
,, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বোলপুর ২৲
,, হরিপদ বিশ্বাস সোনামুখী ২৷৷৹
,, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় যোড়াসাঁকো ৩৲
,, রাম অক্ষয় দত্ত চৌধুরী বৰ্দ্ধমান ৩৷৵৹
শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী বসু মজুঃ দাইনা ২৲
ও, সি, মল্লিক এস্কয়ার কলিকাতা ৩৲
বাবু নীলাম্বর দাস ঢাকা ১৷৷৹
,, শ্রীনাথ দত্ত ময়ূরভঞ্জ ৩৷৵৹
কে, সি, চট্টোঃ এস্কয়ার বেপারিটোলা ৩৲
বাবু কালীচরণ দাস বগুড়া ১৲
,, যোগেশচন্দ্র বসু লালবাজার ৩৲
,, নন্দলাল দে চার্টার্ড মাঃ ব্যাঙ্ক ১৷৷৹
কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাঃ শোভাঃ ৩৲
বাবু জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল নারিকেলডাঙ্গা ৩৲
,, অমৃতলাল দাস খড়দহ ২৲
,, কাশীচরণ রায় নবাবগঞ্জ ৷৷৵১৹
"বগুড়া জাতীয় সাহিত্যসমিঃ" সম্পাঃ ৷৷৵১৹
বাবু গোপালচন্দ্র বড়াল পাহাড়পুর ৩৷৵৹
,, প্রিয়নাথ পালিত ধৰ্ম্মতলাষ্ট্রীট ৷৷/১৹
,, গুরুচরণ ডাক্তার সেটের বাগান ১৲
রেভাঃ সী, বমউইচ ধৰ্ম্মতলাষ্ট্রীট ৩৲
কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাঃ শোভাঃ ৩৲
,, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাঃ ঐ ৩৲
বাবু অন্নদামোহন রায় ভবানীপুর ৩৲
,, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ৩৲
,, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ৩৲
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মল্লিক ঐ ৩৲
বাবু উপেন্দ্রনাথ মৈত্র চৌরঙ্গী ৷৷৹
,, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সোদপুর ৩৷৹
,, মহিমচন্দ্র বসু মাণিকগঞ্জ ২৲
,, কুঞ্জবিহারী দত্ত বিডনষ্ট্রীট ১৲
ডাক্তার ভগবানচন্দ্র রুদ্র যোড়াসাঁকো ৩৲
বাবু বলাইচাঁদ সিংহ ঐ ৩৲
শ্রীমতী বিপিনবালা সরকার জেলেটোলা ৩৲

বাবু সতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরেঘাটা ৩৲
,, রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুর ৩৷৵৹
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী চট্টোঃ ব্রহ্মপুর ৩৷৵৹
বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষ চুয়াডাঙ্গা ৬৲
,, কানাইলাল বন্দ্যোঃ কাশীমবাঃ ৩৷৵৹
,, দক্ষিণাপ্রসাদ রায় চৌঃ কালীঘাট ২৲
,, প্রসন্নকুমার মজুমদার সাঁখারিটোলা ৩৲
,, জীবন রাম বোয়ালিয়া ৩৷৵৹
,, হরকুমার দত্ত মুচীকান্দি ৩৷৵৹
রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাঃ মুক্তাঃ ৩৷৵৹
শ্রীমতী সুরবালা দেবী খুলনা ৩৷৵৹
বাবু ভগবতীচরণ দে বেনারস ৩৷৵৹
,, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায় সিমলাষ্ট্রীট ২৲
,, নগেন্দ্রকুমার ঘোষ ভাগলপুর ৩৷৵৹
পী, বনার্জ্জি এস্কয়ার সাজিহানপুর ৩৷৵৹
বাবু প্রসন্নচন্দ্র রায় কলিকাতা ৬৲
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী চোরবাগান ৩৲
বাবু ইন্দ্রচাঁদ নাহাটা বালুচর ৩৷৵৹
,, যোগেন্দ্রনাথ রায় কাশীপুর ৩৷৵৹
,, জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোঃ পঞ্চাননতলা ৩৲
,, ব্রজেন্দ্রকুমার ভৌমিক বামনদী ৩৷৵৹
,, গোপালচন্দ্র ভায়া ভরৎখালা ১৸৵৹
,, হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শ্রীহট্ট ১৲
,, শরৎকুমার দত্ত শ্যামপুকুর ২৲
,, মণিলাল সিংহ মেছবাজারষ্ট্রীট ৩৲
পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কলিকাতা ৩৲
মিসেস এস, বি, মুখোপাধ্যায় দার্জ্জিলিং ৩৷৵৹
এন, সি, বসু এস্কয়ার দরজিপাড়া ৩৲
মিসেস বি, বড়ুয়া বিডনষ্ট্রীট ৩৲
বাবু কুঞ্জবিহারী গোস্বামী ধোলপুর ৩৷৵৹
,, হেমচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ২৲
মাণিকদহ হিতসাধিনী সভার সম্পাদক ৩৲
বাবু রাইচরণ কাঞ্জিলাল চাঁপাতলা ১৲
,, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতা ১৲
,, কালীপদ সরকার বেনারস ৩৷৵৹
,, অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী বিবিগঞ্জ ৩৷৵৹
রায় গিরীশচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর হুগলি ৩৷/১৹
বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক সোয়ালো লেন ১৲
বারাশত অ্যাসোসিয়েসন সম্পাদক ৩৲
বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাঃ নারিকেলডাঙ্গা ৩৲

বিজাপুর।

প্রথম ভাগ।—সহর।

ষোড়শ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্ব হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসর (১৪৯০-১৬৮৬) বিজাপুর দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর ও আদিলসাহি রাজাদের রাজধানী রূপে প্রখ্যাত ছিল। এই সহর সোলাপুরের ৬০ মাইল দক্ষিণে ভীমা ও

সহর বর্ণনা। কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকায় অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বদক্ষিণ রেলওয়ের একটী নামাঙ্কিত ষ্টেশন। ইহার আশপাশে প্রকৃতির শোভাসৌন্দর্য্য বিশেষ কিছুই নাই, বৃক্ষপল্লবপরিবর্জ্জিত তরঙ্গায়মান মাঠ ময়দান—মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র—এই যা প্রকৃতির মুখচ্ছবি। রেল গাড়িতে যাইতে যাইতে দূর হইতে বিজাপুরের দূত স্বরূপ "গোল গুম্বজ" ইমারত খানি পথিকের নয়ন আকর্ষণ করে—ক্রমে তাহার বিবৃদ্ধ আকার দক্ষিণ আকাশ ব্যাপিয়া দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হয়। পরে সহরের যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই গোর, মসজিদ ও অন্যান্য ছোটবড় ইমারতের ভগ্নমূর্ত্তি সকল নেত্রপথে পতিত হয়। সহরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর প্রাচীর। ইহার পরিধি অন্যূন ৩ ক্রোশব্যাপী। এই প্রাচীর গভীর প্রশস্ত পরিখায় বেষ্টিত ও বিচিত্রাকার বিচিত্র বলের শতাধিক বুরুজে সুরক্ষিত।

বুরুজ। কথিত আছে ইহার এক একটী বুরুজ নির্ম্মাণের ভার এক একজন আমীরের হস্তে সংন্যস্ত হয়, যাহার যেমন রুচি, যাহার যেরূপ ক্ষমতা তদনুসারে সংঘটিত—ইহাদের আকার প্রকারের বৈষম্য ঘটিবার কারণ এই। এই সমস্ত বুরুজের মধ্যে সেরজী, লান্ডা কসব ফিরঙ্গী ও উপরী বুরুজ আকার, বল ও নির্ম্মাণ কৌশলে ব্যাখ্যা যোগ্য। সেরজী

মালক ময়দান। (সিংহ রাজ) বুরুজের উপর প্রকাণ্ড বিজাপুর-তোপ "মালক ময়দান" স্থাপিত। এই তোপ কার্য্যে কত দূর ফলোপধায়ী বলা যায় না, কিন্তু ইহার হুঙ্কারেই শত্রুরা কাছে ঘেঁসিতে সাহস করিত না। কামানটা এত বড় যে একজন মানুষ তাহার গোলার স্থান অধিকার করিয়া অনায়াসে তাহার খোলের মধ্যে নিদ্রা যাইতে পারে। "মালক ময়দানের" নির্ম্মাণকর্ত্তা মহম্মদ রুমি খাঁ। জনশ্রুতি এই যে তিনি আপন পুত্রের বলিদান দিয়া ঐ তোপ নরশোণিতে অভিষিক্ত করেন। এই কামান হিন্দুদের পূজার পাত্র হইয়া দাড়াইয়াছে;—(এমন কি কোন জিনিশ আছে হিন্দুরা যার পূজা করে না)? ছাগবলি, চাউল, নারিকেল, পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে "ক্ষেত্রপতির" পূজার্চ্চনা সমাহিত হয়। "উপরি" বুরুজ আলি আদিল সার বিখ্যাত সেনাপতি হাইদর খাঁ কর্তৃক নির্ম্মিত। তালিকোটের যুদ্ধের পর আলি আদিল সা সহরের প্রাচীর নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইয়া এক এক ভাগ নির্ম্মাণে এক এক জন আমীর নিযুক্ত করেন। সে সময়ে হাইদর খাঁ যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বিজাপুরে অনুপস্থিত ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে প্রাচীর নির্ম্মাণ শেষ হইয়া

গিয়াছে। তিনি এই মহৎ কার্য্যে যোগ দিতে পারিলেন না বলিয়া আক্ষেপ করাতে রাজা আদেশ করিলেন "এমন একটা বুরুজ নির্ম্মাণ কর যাহা আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবে।" এই আদেশের ফল "উপরি" বুরুজ। ইহা সহরের উন্নত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত; বাস্তবিকই আর সকল বুরুজের উপর টেক্কা দিতেছে—চারিদিক হইতে ইহা নজরে আইসে ও ইহার পৃষ্ঠ হইতে সহরের প্রাচীরসমেত সমুদয় ক্ষেত্র নেত্রগোচর হয়। ইহার উপর দুইটি তোপ স্থাপিত। তাহার একটী প্রকাণ্ড লম্বা, নাম, "লম্ব-চারী।" লাণ্ডা কসবের পৃষ্ঠেও এক বৃহৎ লৌহ কামান দৃষ্ট হয়। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে যখন ঔরঙ্গজীব বিজাপুর আক্রমণ করেন, তখন এই বুরুজের উপরেই তাঁহার সমুদায় শস্ত্রবল প্রয়োগ করা হয়—তাঁহার গুলিগোলার নিশান এখনও পর্য্যন্ত ইহার প্রাচীরে ও কামানের গায়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই বুরুজের অনতি দূরে "মঙ্গল তোরণ" নামক সহরের যে প্রবেশ দ্বার ছিল, ঔরঙ্গজীব সে নাম বদলাইয়া "ফতে ফটক" নামকরণ করেন। বিজয়ী সম্রাট এই ফতে ফটকের মধ্য দিয়া বিজাপুর সহরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বকীয় জয় ঘোষণা করেন।

পঞ্চ তোরণের মধ্য দিয়া সহরে প্রবেশ করা যায়। তাহার চারিটী অক্ষত রহিয়াছে; পঞ্চম দ্বার সরকারী আফিস প্রভৃতি ইমারত সংস্থাতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে দিক দিয়া প্রবেশ কর সেই দিকেই সহরের এক সুমহান্ অপূর্ব্ব দৃশ্য আবিষ্কৃত হয়। বিজাপুরের প্রাচীর, বুরুজ, ইমারত মালার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে ইহা এক সুবিস্তীর্ণ জনাকীর্ণ নগর বলিয়া সহসা ভ্রান্তি জন্মে। অন্তরে প্রবেশ করিলে সে ভ্রম দূর হয়। সহরের বসতি গুলি কেমন খাপছাড়া ও গুটি কত প্রাচীন ইমারত ছাড়িয়া দিলে দেখিবার জিনিশ কিছুই নাই। প্রাচীন ও নব্য সহরে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সহরের বসতির ঠিকানার বাড়ীঘর গুলি অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভের তুলনায় কি দীন হীন যৎসামান্য রূপে প্রতীয়মান হয়! আধুনিক ঘরবসতি পশ্চিম দ্বারের সন্নিহিত। পশ্চিম লোকালয় ছাড়াইয়া গেলে অন্তরের ভগ্ন-বিজনতা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়া চিত্তকে ঘনবিষাদে পূর্ণ করে। নগরের মধ্য ভাগে দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া যে রাজপথ গিয়াছে তাহা পথিককে মধ্য দুর্গে লইয়া যায়। এই দুর্গের নাম "আর্ক কেল্লা"। ইহা গোলাকৃতি ও

আর্ক কেল্লা। ইহার বেষ্টন প্রায় ১ মাইল হইবে। আর্ককেল্লায় যত বড় বড় সাহেব সুবার বাসগৃহ, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় প্রভৃতি সার্ব্বজনিক ইমারত শ্রেণী। কেল্লার মধ্যগত "সাত মজলী" প্রাসাদ, "আনন্দ মহল," "গগণ মহল," বাহিরে "আসার মহল," "মালক জাহান," মসজিদ ও আলি আদিল সাঁর অসম্পূর্ণ সমাধিমন্দির মিলিয়া যে সুন্দর সৌধমালা উন্মীলিত হয় তাহা বিজাপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি-স্মৃতিতে পূর্ণ। এই পূর্ব্ব গৌরবের কঙ্কাল সকল সহরময় বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। কোথাও বা বনজঙ্গলপরিবৃত ছাদহীন ভগ্ন গৃহ—কোথাও একটী গোর কিম্বা মসজিদ ঝোপঝাপের মধ্য হইতে উঁকি দিতেছে—কোথাও ভগ্ন

স্তূপের মধ্যে ফোয়ারা ও জলযন্ত্রসংযুক্ত মনোহর উদ্যানের চিহ্ন সকল পড়িয়া আছে। ফোয়ারা ভগ্ন, জলযন্ত্র শুষ্ক, ফলফুল বৃক্ষসকল বনজঙ্গলে আচ্ছাদিত, কোন স্থানে হয় ত অযত্নসম্ভূত একটী জুঁইলতা ভগ্ন প্রাচীর বাহিয়া উঠিয়াছে। হায়! সেই জগদ্বিখ্যাত বিজাপুরের এই দুর্দ্দশা—

যদুপতেঃ ক্ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ক গতোত্তর কোশলা
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরং
ন সদিদং জগদিতাববধারয় ॥

কোথা মথুরাপুরী গেছে
যদুপতির
রঘুপতির কোশলা ও
সেই পথে।
সবে এতেক ভাবি মন
করহ স্থির
জেনো কিছুই স্থির নহে
এ জগতে!

আর্ক কেল্লা বিজাপুরের শোভনতম স্থান—ইমারতরাজির রত্নভাণ্ডার। যুসফ আদিল সা প্রথম সুলতান এই দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। ইব্রাহিম আদিল সার আমলে ইহার কার্য্য শেষ হয়। ইহার প্রাচীরে হিন্দু মন্দিরের প্রস্তরগাঁথুনী হইতে চোরা মাল ধরা পড়ে। দুর্গের অভ্যন্তরে কতকগুলি প্রাচীনহিন্দুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় ও একটী মন্দির এখনো জীবন্তভাবে অধিষ্ঠান করিতেছে. তাহা নরসোবার মন্দির। কথিত আছে যে দ্বিতীয় ইব্রাহিম বাদসা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই মন্দিরে আসিয়া হিন্দুমতে পূজা করিতেন। এই মন্দিরে মধ্যে মধ্যে মেলা হয়। সে দিন এক জন সন্ন্যাসী আসিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে গেলাম। সে প্রথমে একটুকু দুগ্ধ পান করিয়া থাকিত, তাহাও ক্রমে ছাড়িয়া দিয়া অনাহারে দিনযাপন করিতে লাগিল—শুদ্ধ একটু ভাং মাত্র জীবনের অবলম্বন। ক্রমে তাহার শরীর শুষ্কশীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপ কতক দিন যায়, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানেই কি আপনার সমাধিস্থ হইবার ইচ্ছা?" সে বলিল, "যত দিন পর্য্যন্ত আমি এক শত সাধুর ভোজের অন্ন সংস্থান করিতে না পারি ততদিন এখান হইতে নড়িব না।" পরে শুনিলাম সে ইচ্ছামত অর্থসংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে—তাহার অনশন ব্রত উদ্‌যাপিত হইল কি না শুনিতে পাইলাম না। আর্ক কেল্লায় বিশাল, সুন্দর, নানা ধরণের ইমারত একত্রীভূত। চীন মহলের সৌধমালা জজের আদালত, কলেক্টর মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে পরিণত। চীন

সাত মজলী। মহলের এক কোনে এক সরোবর তীরে সপ্ততল প্রাসাদ (সাত মজলী) গগণ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। “ ‘গগণ মহল ” রাজাদের দরবারশালা। তাহার সম্মুখে যে গগণ মহল। বিশাল খিলান দ্বার (arch) মুখব্যাদান করিয়া আছে তাহা বিজাপুরের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উদ্যান-উৎসযুক্ত সুসজ্জিত “ আনন্দ মহল ” রাজাদের বিহার-ভবন আনন্দ মহল। ছিল। ইহা এক প্রকাণ্ড তৃতল গৃহ। রাণীদের বায়ু সেবনের জন্য উপরে প্রশস্ত ছাদ—ছাদের উপর হইতে অদৃশ্যভাবে বাহিরের তামাসা দেখিবার সুবিধা। এই গৃহে কত সিঁড়ি, কত খুপরি খুপরি ঘর তাহার অন্ত নাই। বোধ হয় যেন ইহা রাজারাণী-দের মিলিয়া লুকাচুরি খেলিবার জন্য নির্ম্মিত।

আর্ক কেল্লার প্রত্যেক গৃহ—প্রত্যেক ভূমিখণ্ড—প্রাচীন বিজাপুরের সহস্র স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। এখানেই রাজবিদ্রোহী মন্ত্রী কমাল খাঁ বালক সুলতান ইস্মারলের বিরুদ্ধে ষড়চক্র করিতে গিয়া স্বয়ং প্রাণ খোয়াইলেন—এখানেই বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানার দরবার হইত—এখান হইতেই মন্ত্রীর কুহকে পড়িয়া তিনি বন্দী হইয়া সেতারায় নির্ব্বাসিত হন—এখানেই বিলাসী মাহমুদ তাঁহার প্রিয়তমা নায়িকা রম্ভার সহিত রঙ্গরসে দিন যাপন করিতেন। এই দুর্গ আদিলসাহী রাজাদের কত লীলাখেলা যুদ্ধবিগ্রহের স্থান—ইহাই আবার সেই রাজবংশ-নিপাতের সাক্ষী! এই স্থানে বিজাপুর পতন কালে সুলতান সেকন্দর সহস্র সহস্র প্রজার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদের মধ্যে বিজয়ী ঔরঙ্গজীবের চরণে স্বীয় রাজ-মুকুট সমর্পণ করেন। যদিও ইহার সৌধাবলী ভগ্নপ্রায়, ইহার উদ্যানকানন তৃণ-কণ্টকাবৃত, ইহার উৎসজলপ্রণালী সকল শুষ্ক, তথাপি এক অনির্ব্বচনীয় মহান্ গম্ভীর ভাব ইহার সহিত সংলিপ্ত—ইহা সেই সমুন্নত রাজবংশের সুমহান্ কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে বিরাজমান!

বিজাপুরে যে সমস্ত প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান, তন্মধ্যে গোল গুম্বজই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহা সুলতান মাহমুদের সমাধিমন্দির। সহরের মধ্যে ইহা অদ্বিতীয়—“বোল” অথবা “গোল” গুম্বজ। পৃথিবীতেও দুই একটী ভিন্ন এমন বিশাল গুম্বজ আর নাই। গুম্বজরাজ বহির্ভাগ হইতে ১৯৮ ফীট উচ্চ ও যে চতুষ্কোণ প্রাকারের উপর স্থাপিত তাহার প্রত্যেক পার্শ্ব ১৩৫ ফীট দীর্ঘ। ইমারতখানি সমচৌরস ১৮,২২৫ ফীট, রোম নগরের পান্থিয়ন অপেক্ষাও বৃহত্তর। বাহিরের চারি কোণে চারিটী গবাক্ষময় মিনার। ইহার একটীর সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ছ-তালা পর্য্যন্ত আরোহণ করিলে ছাদের উপর হইতে চতুর্দ্দিকের সুবিস্তৃত শোভন দৃশ্য সন্দর্শন করা যায়। নীচের নরকীটেরা কি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে! এই গুম্বজে প্রতিধ্বনি গ্যালেরি এক চমৎকার জিনিস—ছাদের উপর একটী সুঁড়ি পথ দিয়া গ্যালেরিতে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশ করিলে এক অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করা যায়। তথায় প্রতিধ্বনির বিরাম নাই। এক সীমায় কানে কানে কথা কহিলে সীমান্তর পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনা যায়! এক কণ্ঠ বিনির্গত সুর হইতে শত শত কণ্ঠধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগ্রত হয়।

আমাদের সঙ্গে "ব্রুণো" কুকুর ছিল, তাহার এক এক ডাকে শত সহস্র শৃগাল কুকুরের রব উঠিয়া এক অদ্ভূত হাস্যরসের অভিনয় হইতেছিল; বেচারী "ব্রুণো" তাহার অদৃশ্য শত্রুদলের আস্ফালনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না। দক্ষিণদ্বার দিয়া সমাধিগৃহে প্রবেশ করিয়া এক প্রস্তর মঞ্চের উপর সুলতান মাহমুদ, তাঁহার মহিষী ও পুত্রদের গোর-প্রস্তর সকল দেখা যায়। দক্ষিণ দ্বারের নিকটস্থ প্রস্তরের উপর কতকগুলি পারস্য লেখা আছে। তাহাতে সুলতান মাহমুদের স্বর্গারোহণের তারিখ পাওয়া যায়—তাহা ১০৬৭ অর্থাৎ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ। দক্ষিণ দ্বারের উপরিভাগে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড লৌহ-শৃঙ্খলে লম্ববান। লোকের বিশ্বাস এই পাথরের গুণে গুম্বজরাজ বজ্রবিদ্যুতের উৎপাত হইতে সুরক্ষিত। একবার যদিও ইহার উপর বজ্রপাত হইয়া গিয়াছে তথাপি সে বিশ্বাস চলিয়া যায় নাই।

বোল গুম্বজের পরেই "ইব্রাহিম রোজার" উল্লেখ করিতে হয়—ইহাতে ইব্রাহিম বাদসাহের গোর ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। বোল গুম্বজ সহরের পূর্ব্ব প্রাচীর ঘেঁসিয়া ভিতরের দিকে,—ইব্রাহিমের রোজা পশ্চিম প্রাচীরের কিঞ্চিৎ বহির্ভাগে অবস্থিত। বোল গুম্বজ অলঙ্কারহীন গুরুভার প্রকাণ্ড কাণ্ড—ইব্রাহিম রোজা তাহার উল্টা, লঘু ও অলঙ্কারময়। ইহার গোর, মসজিদ, উদ্যান, মিনার মিলিয়া দূর হইতে অতি মনোহর দৃশ্য আবির্ভূত হয়। বিজাপুর আক্রমণ কালে মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক এই রোজা অধিকৃত হইয়া মালক ময়দানের গোলাঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই ক্ষণে মেরামতে তাহার পূর্ব্বাবয়ব ফিরিয়া আসিয়াছে।

ইব্রাহিম রোজা।

এই সকল বৃহৎ প্রস্তরের ইমারত, ইহাদের শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়া লোকের মনে সহজে কৌতূহল জন্মিতে পারে। কি উপায়ে, কি কলকৌশলে এই সমস্ত কারখানার সৃষ্টি হইল—না জানি কত লোকজন মজুরমিস্ত্রী ইহাতে কাজ করিত—কত না অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ইব্রাহিম রোজার এক স্থানে পারস্য ভাষায় একটী শিলালেখ আছে, তাহাতে এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ হয়। সে লেখ এই:—"মালিক সান্দাল ১৷৷০ লক্ষ ৯০০ লুণ ব্যয় করিয়া অনেক পরিশ্রমে এই গোর মন্দির নির্ম্মাণ করেন।" লুনের মূল্য সাত সিলিং করিয়া হিসাব করিলে ৫২,৮১৬ পৌণ্ড দাঁড়ায়—মোটামুটি ধর, সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা। কিন্তু এ হয়ত শুদ্ধ গুম্বজ নির্ম্মাণের ব্যয়—সমুদায় ইমারতের মূল্য নির্দ্দেশক নহে। সমুদায়টা ধরিতে গেলে এক ক্রোটি মুদ্রারও অধিক হইয়া যায়। ঐ লেখে আরো আছে যে এই কাজে ৬,৫৩৩ লোক খাটিত ও কার্য্য শেষ হইতে ৩৬ বৎসর ১১ মাস ১১ দিন লাগিয়াছিল। এই লোক সংখ্যায় মুটেমজুর প্রভৃতি সাধারণ শ্রমজীবি সামিল কি না সন্দেহ—সম্ভবতঃ উহা শিল্পী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর কারিগরের সংখ্যা নির্দর্শক। তদ্ভিন্ন নিকৃষ্ট শ্রমজীবিদের অন্নবস্ত্র দিয়া ইচ্ছামত সংগ্রহ করা যাইত তাহার আর সন্দেহ নাই, নহিলে এই সকল ইমারত নির্ম্মাণ কল্পনা করা দুঃসাধ্য।

জীবিত থাকিতে থাকিতে আপনার সমাধিমন্দির প্রস্তুত করা মুসলমানদের এক অদ্ভুত রীতি। হিন্দুরা মৃতদেহ ভস্মসাৎ করিয়া মৃত্যুর স্মরণচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে উৎসুক, মুসলমানদের বাসগৃহ অপেক্ষা প্রেতালয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ। সুলতান মাহমুদের পুত্র আলি আদিল সা গোল গুম্বজের সমস্পর্দ্ধী নিজের জন্য এক গোরমন্দির পত্তন করেন। তাহার ছায়া পিতার গোরমন্দিরের উপর গিয়া পড়ে এই তাঁহার ইচ্ছা; কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। মন্দির প্রস্তুত হইতে না হইতেই রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন ও এই ভগ্ন গৃহেই তাঁহার সমাধি হয়। এই সমাধিমন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এক্ষণে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম "আলি রোজা।" কিন্তু মৃত হস্তীও লাখ টাকার মূল, সেইরূপ ইহার ভগ্ন মূর্ত্তিও চমৎকার ব্যাপার। ইমারত সম্পূর্ণ হইলে সত্য সত্যই ইহা বোল গুম্বজকে অতিক্রম করিয়া উঠিত—আলিও মনের সাধ মিটাইয়া সুখে মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইতে পারিতেন!

আলি রোজা।

এই অসমাপ্ত সমাধিমন্দিরের এক কোণে একটি চাকচিক্যময় খোদিত হরিৎ প্রস্তরের গোর দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাহা হতভাগ্য সেকন্দরের গোর-প্রস্তর, কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে বাস্তবিক তাহা নহে। সুলতান সেকন্দরের গোর অন্যান্য সামান্য গোরশ্রেণীর মধ্যে সহরের অন্যত্রে স্থাপিত।

সুলতান সেকন্দরের গোর।

ইহার উত্তরে মক্কা ফটক হইতে কেল্লার পথ—দুটি গোরমন্দিরে অলঙ্কৃত—তাহাদের পরস্পর সান্নিধ্য বশতঃ "দুই বোন" নামকরণ হইয়াছে। দ্বিতীয় আলির সচিবপ্রধান খাওয়াস্ খান ও তাঁহার গুরু আবদুল খাদির এই দুই মন্দিরে শয়ান রহিয়াছেন। ইহাদের গোরপ্রস্তর সকল ভিত্তি প্রস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন—গুম্বজ গৃহ যেন বাসস্থানের জন্য নির্ম্মিত বোধ হয়। বস্তুতঃ ইহার একটী গুম্বজ বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে। শ্মশানভূমির উপর জীবন্ত মনুষ্য বাস করিতেছে!

"দুই বোন।"

দুই বোনের অনতিদূরে প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানের মধ্যে ঔরঙ্গজীবের মহিষীর গোরস্থান। এই গোরের শ্বেত পাষাণ দিল্লী হইতে আনীত হয়—ওরূপ প্রস্তর বিজাপুর অঞ্চলে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন ইহা সম্রাটের কন্যার গোরস্থান। এই সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। তাহা এই যে শিবাজী রাজার দিল্লীপ্রবাস কালে রাজকুমারী তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হন। শিবাজী যদি মুসলমানধর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে ঔরঙ্গজীবের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু শিবাজী তাঁহাকে সম্মত হইলেন না। রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অনেকে উৎসুক ছিল, কিন্তু তিনি সেই অবধি আর বিবাহ করেন নাই। অপরিণীত অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয় ও বিজাপুর-বিজয়ের ৩ বৎসর পরে ঐ স্থানেই তিনি সমাধিস্থ হন।

ঔরঙ্গজীবের মহিষীর গোর।

এতদ্ভিন্ন "মোতি গুম্বজ" "বার পায়ার গুম্বজ" প্রভৃতি অপরাপর গোরমন্দির সংখ্যাতীত, প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে তাহাদের বর্ণনা হইতে বিরত হইতে হইল।

প্রাসাদের মধ্যে পূর্ব্বেই দুই চারিটীর উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে "আসার মহল" অপেক্ষাকৃত অক্ষত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। ইহা সুলতান মাহমুদের রচিত। প্রথমে ইহা আদালতের জন্য নির্ম্মিত হয়. ইহার নাম "আদলত মহল" অথবা "দাদ মহল" ছিল। আচ্ছাদিত সেতুবন্ধনে ইহা রাজবাড়ীর সহিত সংযুক্ত ছিল. পরে এক নতন আদালত প্রস্তুত হইলে ইহার নাম পরিবর্ত্তন ও কার্য্যান্তরে নিয়োজন হয়। মহম্মদের শ্মশ্রুর দুইটী কেশ ইহার ভাণ্ডারজাত হওয়া ইহার পদোন্নতি ও সৌভাগ্যের মূল। অন্যান্য ইমারতের ন্যায় এই পবিত্র নিকেতনের উপর বিশেষ কোন উপদ্রব ঘটে নাই, মহম্মদের শ্মশ্রুর প্রসাদে সে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। আদালত মহল বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু আসার-মহল আজ পর্য্যন্ত প্রায় যেমন তেমনিই রহিয়াছে। আসার মহল চতুষ্কোণাকৃতি, ১৩৫ ফীট প্রস্ত দ্বিতল গৃহ। ইহার চিত্রিত কাষ্ঠছাদ ৩৫ ফীট উচ্চ চারিটী সুদৃঢ় কাষ্ঠ স্তম্ভের উপর স্থাপিত। দ্বিতীয় তলে কতকগুলি সুরঞ্জিত প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার একটি মহম্মদের শ্মশ্রুর ঘর। এই ঘর প্রায়ই বন্ধ থাকে, বার্ষিক উৎসবে ভক্তদের দর্শন জন্য কেবল সম্বৎসরে একবার মাত্র খোলা হয়। আর কতকগুলি প্রকোষ্ঠ কার্পেট, মকমলের চাদর ও বিছানা, চীনের বাসন প্রভৃতি পুরাণ সামগ্রী সকলের ভাণ্ডারঘর। এই সকল ঘরের প্রাচীর ছাদ প্রভৃতি বিচিত্র লতা পাতা মানুষের ছবিতে চিত্রিত। শেষ প্রকোষ্ঠে প্রাচীরের গায়ে মাহমুদ বাদসাহের ছবি মোগল সম্রাটের বর্ব্বর হস্তে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। আর আর চিত্রাবলি কালের দংশনে বিবর্ণ ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। আসার মহলে বিজাপুর সম্বন্ধীয় কতকগুলি হস্তাক্ষর লেখ ছিল, তাহার কতক বিনষ্ট কতক বা স্থানান্তরিত হইয়াছে।

"আসার মহল।"

আর একটী বাড়ী কারুকার্য্যের জন্য বিখ্যাত—নাম "মেহতর মহল।" এই নাম সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন এক জন মেথরের নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি। তার গল্প এই ঃ—ইব্রাহিম বাদসার কুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল। অনেক চিকিৎসার পর এক জন গণৎকার তাঁহাকে পরামর্শ দেয় যে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজ প্রথমে যার মুখ দেখিবেন তাহাকে ধনরত্ন দান করিবেন। পুণ্যকার্য্যে সেই অর্থ ব্যয় হইলে মহারাজ নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবেন। রাজার রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই, প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়াই এক জন মেথরের মুখাবলোকন করেন। তাহার যে ধনলাভ হয় সেই ধনে এই মহল নির্ম্মিত—ইহা একটী মসজিদের প্রবেশদ্বার। অন্যমতে ফকীর-দলের মেহতর অর্থাৎ প্রধান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম মেহতর মহল। নাম যাহাই হউক, ইহার কারুকার্য্য বাস্তবিক প্রশংসনীয়! দোতালার ছাদ এক অদ্ভুত ব্যাপার! উহা সমতল ও কড়িকাঠের উপর অবলম্বিত। কড়িকাঠ বলা ঠিক হইল না, কেন না উহা

"মেহতর মহল।"

প্রস্তরময়। এই সকল পাথরের কড়িকাঠ যে কিসের উপর নির্ভর করিয়া আছে, তাহা বোঝা যায় না। পৃথিবী বাসুকীর পৃষ্ঠে—বাসুকীর আশ্রয় কে? মেহতর মহলের ছাদ সম্বন্ধেও এই প্রহেলিকা—ইংরাজ এঞ্জিনিয়রদেরও ধাঁদা লাগিয়া যায়। এই গৃহের শিল্পকার্য্য যে দেখে সেই মোহিত হয়। কাঠের কাজের অনুরূপ পাথরের উপর ফল ফুল প্রভৃতি বিবিধ নক্সা। ফরগসন সাহেব বলেন যে অলঙ্কার ও শিল্পচাতুর্য্যে এই বাড়িটী মিশরের কায়রোর কোন বাড়ীর নিকট হার মানে না।

এখানকার মসজিদের মধ্যে জুম্মা মসজিদ সর্ব্বপ্রধান। দাক্ষিণাত্যে এমন সুন্দর মসজিদ প্রায় দেখা যায় না। লালিত্য, শিল্পকৌশল ও কার্য্যকারিতা ইহা সর্ব্বপ্রকারেই প্রশংসার্হ। এ মসজিদ এক জনের রচনা নহে। প্রথম আলি আদিল সা হইতে ঔরঙ্গজীব পর্য্যন্ত নৃপতিগণের হস্তচিহ্ন সকল ইহাতে বর্ত্তমান। কিন্তু যদিও রাজারা ইহার নির্ম্মাণ ও অলঙ্কার কার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তথাপি ইহা অসম্পূর্ণ—বহির্মিনারাভাবে যেন অঙ্গহীন হইয়া রহিয়াছে। প্রধান দ্বার দিয়া চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখি যে তিন দিকে মসজিদের গৃহাবলী. প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে একটি শুষ্ক ফোয়ারা। মসজিদের খিলান. স্তম্ভময় সুদীর্ঘ শালা, সুন্দর গুম্বজ, সুরাগরঞ্জিত ভজনালয় (মেহরাব) সকলি চমৎকার! চকচকে মেঝের উপর এক এক জন বসিবার আঁচড় কাটা আসন আছে, সে সকল গণনা করিলে ইহাতে প্রায় ৪,০০০ উপাসকমণ্ডলীর বসিবার স্থান সংকুলান প্রতীয়মান হয়। মেহরাবে কতকগুলি শিলালেখ আছে, তাহার চারিটী ধর্ম্মনীতি সম্পর্কীয় দিওয়ান হাফেজের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, যথা—

জুম্মা মসজিদ।

"জীবনে বিশ্বাস নাই—ইহা ক্ষণস্থায়ী"
"ক্ষণভঙ্গুর সংসারে শান্তি নাই"
"সংসার ইন্দ্রিয়সুখের আগার"
"জীবন অমূল্যদান কিন্তু অনিত্য."

অবশিষ্ট দুইটি লেখ হইতে জানা যায় যে সুলতান মাহমুদের আদেশে তাঁহার ভৃত্য মালিক য়াকুব কর্ত্তৃক ১০৪৫ (১৬৩৬) অব্দে এই মেহরাব নির্ম্মিত ও অলঙ্কৃত।

আর্ক কেল্লার মধ্যভাগে আনন্দ মহলের সন্নিকটে মক্কা মসজিদ। মক্কায় যে মসজিদ আছে তাহার আদর্শে নির্ম্মিত বলিয়া ঐ নাম। ইহা বেশ একটি সুন্দর ছোটখাট মসজিদ, ঠিক যেন একটি খেলানার জিনিস। ইহার ভজনকোষ্ঠ বিচিত্র, সুন্দররূপে খোদিত ও অলঙ্কৃত এবং মসজিদটা উন্নত প্রাকারে পরিবেষ্টিত। প্রবাদ এই যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক জন খ্যাতনামা পীর এই মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। তখন বিজাপুর হিন্দুরাজাদের অধীন ছিল। পীর দলবলে এই স্থানে আসিয়া আড্ডা করিলে পর হিন্দুরা বিরক্ত হইয়া তাহাদের তাড়াইবার পন্থা দেখিতে লাগিল। বলে না পারিয়া তাহারা ভাবিল

মক্কা মসজিদ।

ইহাদের অন্নাভাবে শুকাইয়া তাড়াইতে হইবে। যবনদের কিছুই দিব না, কিছুই বেচিব না, গ্রামস্থ লোকেদের এই প্রতিজ্ঞা হইল। মুসলমানেরা অন্নকষ্টে পড়িয়া ক্ষুধার জ্বালায় হিন্দুদের একটি গরু ধরিয়া মারে। এই সূত্রে হিন্দু-মুসলমান মধ্যে মহা দাঙ্গাহাঙ্গাম বাধিল। পীরকে রাজা বিজন রাওএর সমক্ষে ধরিয়া আনা হইলে রাজা তাঁহাদের গো-হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পীর উত্তর করিলেন, "আমরা আহারাভাবে বাধ্য হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছি. কিন্তু এই গরু পুনর্জীবিত করিয়া মহারাজকে প্রত্যর্পণ করি" এই বলিয়া প্রেতাস্থি সকল সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিলেন আর গরুও সজীব হইয়া উঠিল। রাজা পীরের ঈদৃশ প্রতাপ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ভূমিদান ও বাসের অনুমতি করেন। সেই ভূমির উপর মক্কা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়; নিকটে পীরের গোরস্থান।

এতদ্ভিন্ন মালিকা জাহান. মালিক সান্দাল, আন্দু. বোখারা প্রভৃতি আরো কত কত মসজিদ আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিজাপুর গোর মসজিদে ছয়লাপ।

বিজাপুরে বেড়াইতে আসিয়া কূপবাপী, তোপ,, বুরুজ, মসজিদ, গুম্বজ, প্রাসাদের মধ্যে দুইটী "গোরখ ইমলি" বৃক্ষ দেখিতে কেহ যেন ভুলিয়া না যান। এই দুই বৃক্ষ আর্ক কেল্লার বড় রাস্তার ধারে "দুই বোনের" নিকটবর্ত্তী ময়দানে মাথা তুলিয়া আছে। ইহাদের আকারপ্রকার যে কেবল দর্শনীয় তাহা নহে। তখনকার কালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় ব্যক্তিদের ফাঁসিবৃক্ষ বলিয়া ইহাদের বিশেষ গৌরব।

গোরখ ইমলি বৃক্ষ।

বিজাপুরের সুখসৌভাগ্যের সময় মধ্যে মধ্যে এক জন পরিব্রাজক আসিয়া বিস্ময়ানন্দ উচ্ছ্বাসে যে সহরবর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সে কালের অবস্থা কতকটা অবগত হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে আসাদ বেগের লিখিত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। আসাদ বেগ লোকটা কে তাহা জানা আবশ্যক। ১৬০০ অব্দের বৎসরেক পরে ইব্রাহিম আদিল সা ও সম্রাট আকবরের মধ্যে এক সন্ধিবন্ধন হয়। সেই উপলক্ষে সম্রাটের পুত্র রাজকুমার দানিয়েলের সহিত ইব্রাহিম স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সময়ে আসাদ বেগ মোগল সম্রাটের দূত স্বরূপ বিজাপুরে আসেন। তথায় সুলতান যথোচিত আতিথ্য সংকারের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বহুমূল্য উপহার দিয়া রাজকুমারী সমভিব্যাহারে তাঁহাকে বিদায় করেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ফেরিস্তাও কন্যাযাত্রীর দলে ছিলেন। এই সঙ্গে মোগল সম্রাটের জন্য অমূল্য মণিরত্ন ও বাছা বাছা হস্তী উপঢৌকন প্রেরিত হয়। হস্তীর মধ্যে একটীর কথা এইরূপ কথিত যে, তাহার দুই মণ পরিমান মদ্য পান করিবার অভ্যাস ছিল, তাহা অনেক হাঙ্গামা করিয়া যোগাইতে হইত। রাজকুমারীর এই বিবাহে মত ছিল না। তিনি ভীমাতীর পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। রাত্রে এক প্রবল ঝড় উঠিল—তাম্বুকানাত ছিন্নভিন্ন হইল ও রক্ষকেরা ছড়ভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই অবসরে রাজকুমারীও পলায়ন করিলেন। সকালে আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনা হয় ও আসাদ বেগ যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে রাজকুমার

আসাদ বেগের বিজাপুর বর্ণনা।

দানিয়েলের নিকট তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেন। আসাদ বেগ বিজাপুর দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহর বর্ণনা এই ঃ—" বিজাপুর সমুন্নত প্রাসাদঅট্টালিকাপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ নগর। বাজার ৬০ হস্ত প্রস্ত, দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেক দোকানের সাম্‌নে এক একটী ছায়াতরু, ও সমুদায় হাটবাজার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। এই সকল দোকানে যে সব জিনিস আছে তাহা অন্যত্রে সচরাচর দেখা যায় না। গহনা, বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, রুটী, মৎস্য, মাংস, মদ্য, মসলার সুসজ্জিত বিপনীশ্রেণী সহরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। গহনার দোকানে নানাবিধ অলঙ্কার ও খড়্গ, ছুরি, দর্পণ প্রভৃতি মণিমুক্তাখচিত সুন্দর সুন্দর সামগ্রী প্রস্তত। পরে রুটীওয়ালার দোকান, কাপড়ের দোকান, আতর গোলাবে সুবাসিত চীণ কাচের শিশিতে সুসজ্জিত আতরের দোকান, ফলমিষ্টান্নভরা ময়রার দোকান, গায়কনর্ত্তকীদের নাট্যশালা এই সকল বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—এক কথায়, সমুদায় মার্কেট সুরাসুন্দরী, আতর গোলাব, বস্ত্রালঙ্কারবিপণীহারে সুশোভিত। কোন স্থানে সহস্র সহস্র লোক নৃত্যগীত আমোদে মত্ত। বিবাদ নাই, কলহ নাই, অবিরাম আমোদ-প্রবাহ। এরূপ সুচারু দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ। তিনি যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মহম্মদের অবিকল স্বর্গবর্ণনা—মর্ত্ত্যে যদি কোথাও বেহস্ত (স্বর্গ) থাকে তবে তাহা বিজাপুর—

আগর বেহস্ত অন্দর জমীন হস্ত—	স্বর্গ যদি কোথাও থাকে মর্ত্ত্যধামে
হমীনস্ত ও হমীনস্ত ও হমীনস্ত!	সে তবে এই খানে—এই খানে—এই খানে!

পুরাতন বিজাপুরের কথায় আমরা যেন নিজ সহরটুকু কল্পনা করিয়া মনে না করি যে এই সে বিজাপুর। সহর অপেক্ষা সহরতলি ভারি—সহরের শাখাপ্রশাখা অনেক দূর বিস্তৃত ছিল, আর আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতির বিবরণ শুনিতে পাই সে সহর, সহরতলি সবটা ধরিয়া। সাহাপুর, জোরাপুর, ইব্রাহিমপুর, নৌরসপুর, আল্লাপুর, আয়নাপুর প্রভৃতি পুররাজি প্রাচীন বিজাপুরের অন্তর্গত। এই সকলের মধ্যে সাহাপুরই প্রধান। অধুনাতন পাশ্চাত্য চতুঃপুর—সাহাপুর, জোরাপুর, পীর আমীনের দরগা, আফজুলপুর—সেই পুরাণ সাহাপুরের ভগ্নাবশেষ। এই সাহাপুর-বিজাপুর মিলিয়া অনেকটা স্থান জুড়িয়া অবস্থিত এবং সাধারণ বিজাপুর সংজ্ঞায় অভিহিত। ইহাতে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। ১৬৩৫ অব্দে মাহমুদ বাদশা মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ উদ্দেশে বিজাপুরের আশপাশ অনেক স্থান বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। সেই সঙ্গে সাহাপুরও অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে যখন শত্রু ভয়ে কেল্লার বাহিরে বাস শঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন হইতে ক্রমে সাহাপুর পুরবাসী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল।

সহরতলি।

সাহাপুরের অন্তর্গত আফজুলপুর শিবাজীর শিকার নামদার আফজুল খাঁর বাসস্থান ছিল। নিজ গ্রামের বিশেষ কিছুই বর্ণনীয় নাই, কিন্তু কিয়দ্দূরে নবাব পরিবারের কতক-

আফজুলপুর। গুলি গোর আছে, তৎসম্বন্ধে এক মজার গল্প আছে। গোর গুলি সকলই স্ত্রীলোকের গোর, আমতেঁতুলবনপরিবৃত একটী সরোবর তীরে স্থাপিত। তাহার জল এখন শুকাইয়া গিয়াছে। এক লাইনে সাতটী গোর, এমন ১১ লাইন। গোর গুলির সকলেরই আকারপ্রকার প্রায় সমান। গল্পটা এই যে আফজুল খাঁ যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন গণৎকারেরা গণিয়া বলে যে এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা— আর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইবে না। তাহাদের কথায় প্রত্যয় করিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই গৃহকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে সমুৎসুক হইলেন। তাঁহার সপ্তসপ্ততি বেগম ছিল, তাহাদের গতি কি হইবে? তিনি এক উপায় স্থির করিলেন। বেগমদের পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া, পুষ্করিণীর ধারে তাহাদের সারি সারি গোর দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ যাত্রায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গল্পটা সত্য কিনা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু এক ধরণের এত গুলি সারি সারি স্ত্রীলোকের গোর দেখিয়া ইহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

সাহাপুরের পশ্চিমে নৌরসপুর। দ্বিতীয় ইব্রাহিম বিজাপুর ছাড়িয়া এই এক নূতন রাজধানী পত্তনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঐ উদ্দেশে ঐ স্থানে ১৬০০ অব্দে অনেক বড় বড় নৌরসপুর। ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। স্থানটী গিরিকাননপরিবৃত, বিজাপুর অপেক্ষা দেখিতে সুদৃশ্য বটে। ইব্রাহিমের সাধ কিন্তু অপূর্ণ রহিল। আবার সেই গণৎকারের অন্তরায়! তাহারা তাঁহাকে রাজধানী পরিবর্ত্তনে অমঙ্গল বলিয়া সতর্ক করাতে তিনি সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে আর সাহস করিলেন না। সে যাহা হউক, এই ধাক্কায় নৌরসপুরে অনেক প্রাসাদউদ্যানগৃহাবলী নির্ম্মিত হইয়া পুরবাসীদের কাজে আসিল। তাহাদের বেড়াইবার জায়গা—আরামবিরামের স্থান ঐ। উহার গৃহাবলীর ভগ্নাবশেষ এই ক্ষণে যাহা দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে "সঙ্গীত মহল" প্রাসাদটী অতীব মনোহর, বিজাপুরের কোন প্রাসাদ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। বাড়ীর সম্মুখে বেস বড় একটী উৎস ও জলাশ্রয় তোরবীর জলপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত। বাড়ীর দুই পাশ দিয়া ক্ষুদ্র নদীস্রোত বহিতেছে—দূরে পাহাড়ের শোভা—চতুর্দ্দিকের বৃক্ষলতায় ভগ্নস্তূপের মধ্যে সঙ্গীত মহলের 'অকথিত' সঙ্গীত লহরী সমুত্থিত হইতেছে!

বিজাপুরের চারিদিকে মরুভূমি সদৃশ শুষ্ক ক্ষেত্ররাজি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়— কি করিয়া এ স্থান এই বিপুল রাজ্যের রাজধানী রূপে মনোনীত হইল। তাহার এক কারণ মরুদেশে রাজধানী। বোধ করি বিজাপুরে জলের প্রাচুর্য্য। বাহিরের দিকটা যেমন শুষ্ক, ভিতরে তেমনি জলের অনেক উৎস। সেই উপপ্লব পূর্ণ বিশৃঙ্খল কালে ঈদৃশ অবস্থাই তাহার আত্মরক্ষার উপায়। উত্তর দিক হইতে আক্রমণের অধিক সম্ভাবনা— সেই দিকেই ভূমি অনুর্ব্বরা—আক্রমণকারী শত্রুদলের আহার সামগ্রীর অপ্রতুল বশতঃ সে দিকটা সুরক্ষিত। দক্ষিণ হইতে পুরবাসীদের অন্নের সংস্থান ও সহরের মধ্য হইতে জলকষ্ট নিবারণ হইত। নগরের মধ্যে তাজ, বাউড়ী প্রভৃতি যে সমস্ত জলাশয় আছে

তাহাতে অকুলান হইবার আশঙ্কায় রাজারা দূর হইতে জল আনাইবার অশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তোরবী জলপ্রণালীর ভগ্নাবশেষ ও সুলতান মাহমুদের "বেগম তলাও" এ বিষয়ে তাঁহাদের যত্ন ও উৎসাহের অব্যর্থ প্রমাণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শাক্যসিংহের কৌমার জীবনের একটী কথা।

বুদ্ধদেব শিশুকাল হইতেই ধ্যান শিক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সেই শিক্ষা বা সেই ধ্যান যৌবন-আগমে পরিপক্ক প্রাপ্ত হইল। ইতিহাস লেখকেরা ইহাঁর বাল্য জীবনের ইতিহাসেও অলৌকিক ক্ষমতা প্রবেশ করাইয়াছেন, কাযেই ইহাঁর প্রকৃত চরিত্র প্রচ্ছন্নপ্রায় হইয়া আছে। ললিত বিস্তর নামক বুদ্ধ-ইতিহাস গ্রন্থে ইহাঁর কৌমার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা আছে, তন্মধ্যে একটা মাত্র কথা আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

শাক্যসিংহ ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। সময়ে অনেক কুমার তাঁহার সহচর হইল। একদা তিনি বয়স্যাদিগের সঙ্গে এক কৃষিগ্রাম পরিদর্শনে গমন করিলেন। সেখানে তিনি কৃষকদিগের কার্য্য ও স্বভাবচরিত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথা হইতে এক উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহচরেরা এদিক্ ওদিক্ গমন করিল, ক্রীড়াসক্ত হইয়া কুমারের সঙ্গ পরিত্যাগ করিল। এই অবকাশে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব সেই উদ্যান হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া তন্নিকটস্থ কোন এক রমণীয় প্রদেশে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটী রমণীয় জম্বুবৃক্ষ ছায়া বিস্তার করতঃ বিরাজিত আছে। দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার তলদেশে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

ধ্যানোপযুক্ত রমণীয় প্রদেশ দেখিয়া তাঁহার ধ্যানেচ্ছা হইল। প্রথমে তিনি চিত্তকে একাগ্র করিলেন। চিত্তের কামনা ও অন্যান্য অকুশল বৃত্তি বিলীন করিয়া সবিতর্ক ও সবিচার ধ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রীতিসুখ নামক ধ্যানজ সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। সবিতর্ক ও সবিচার ধ্যানের দ্বারা আত্মপ্রসাদ আগত হইলে তাঁহার চিত্ত তখন এক অখণ্ডাকার ধারণ করিল। তখন তিনি নির্ব্বিতর্কনির্ব্বিচার নামক দ্বিতীয় ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতিসুখ প্রাপ্ত হইলেন। অল্পক্ষণ মাত্র প্রীতিসুখ অনুভব করিয়া তদূর্দ্ধ-বর্ত্তী তৃতীয় ধ্যান আহরণ করিলেন। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতিসুখে উপেক্ষা হয়, যাবজ্জীবনের ও যাবজ্জন্মের দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুমত পদার্থরাশির স্মরণ হয় এবং প্রতিসম্বেদন নামক প্রজ্ঞা বিশেষের উদয় হয়। লোকে যাহাকে নির্ম্মল ও অপ্রতিহত জ্ঞান বলে, যে জ্ঞান আবির্ভূত হইলে জগত্রয় বায়ামলকবৎ প্রতিভাত হয়, সেই জ্ঞানের অন্য নাম প্রতিসম্বেদন

---

* *Bombay Gazetteer*, Vol. 23, Bijapur.

ও সম্প্রজ্ঞা। অনন্তর তিনি এতদূর্দ্ধবর্ত্তী চতুর্থ ধ্যান আহরণ করিলেন। চতুর্থ ধ্যানে সুখের নাশ, দুঃখের অন্ত. সৌমনস্য, দৌর্ম্মনস্যের অভাব, সুখ, দুঃখের উপেক্ষা, স্মরণ-শক্তির পরিশুদ্ধি ও শরীরাদির অদর্শন হয়। কুমার শাক্যসিংহ এখন সেই জম্বুবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া এতাদৃশ চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

বুদ্ধদেব জম্বুমূলে চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে পাঁচজন মহানুভব ঋষি দক্ষিণ দিক হইতে আকাশপথে সেই জম্বুবৃক্ষের উপর দিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহারা যেই মাত্র জম্বুবনের উপরে আসিয়াছেন, অমনি তাঁহারা শক্তিহীন, ক্ষমতা-হীন ও প্রত্যাহত হইলেন, আর যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া ভয়ে, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া নিম্নলিখিত গাথায় বলাবলি করিতে লাগিলেন।—

"বয়মিহ মণিবজ্রকূটং গিরিং
মেরুমভ্যুদ্গতং তির্য্যগস্য বিস্তারিকম্।
গজইব সহকারশাখাকুলাং বৃক্ষবৃন্দাং
প্রদারিত্ব নির্ধারিতা নেকশঃ॥
বয়মিহ মরুনাং পুরে চাপি শক্রাগতা
যক্ষগন্ধর্ববেশ্মানিচোর্দ্ধং নভে নিশ্রিতঃ।
ইমং পুনর্ব্বনখণ্ড মাসাদ্য সীদা মভোঃ
কস্য লক্ষ্মীর্নিবর্ত্তেতি ঋদ্ধের্বলম্॥"

আমরা মহাগজের ন্যায় সুমেরুমস্তককম্পিত বনখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া গমন করিয়া থাকি, বায়ুপুরে, ইন্দ্রপুরে ও যক্ষগন্ধর্ব্বাদির নগরেও গমন করিয়াছি। কিন্তু আজ আমরা এই জম্বুবনে আসিয়া অবসন্ন হইলাম, ইহা কাহার যোগবল? কাহার প্রভাব? কাহার ঐশ্বর্য্য-বলক্রমে আমাদের ঐশ্বর্য্যবল প্রতিহত করিল? সেই বনের বনদেবতা অলক্ষ্যে প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"নৃপতি কুলোদিতঃ শাক্যরাজাত্মজোবাণ সূর্য্যপ্রকাশ প্রভঃ।
স্ফুটিত কমলগর্ভ বর্ণপ্রভশ্চারুচন্দ্রাননো লোকে জ্যেষ্ঠা বিদুঃ।
অয়মিহ বনমাশ্রিতো ধ্যানচিন্তাপরো দেবগন্ধর্ব্বনাগেন্দ্রযক্ষার্চিতঃ।
ভবশতগুণকোটীসংবর্দ্ধিতস্য লক্ষ্মী নিবর্ত্তেতি ঋদ্ধের্বলম্।"

যিনি রাজকুলে জন্মিয়াছেন, যিনি শাক্যরাজার আত্মজ, যাহার প্রভা সূর্য্য-প্রভার তুল্য, যাঁহার বর্ণ প্রফুল্ল কমলের গর্ভবর্ণের সমান, যিনি সর্ব্ব লোকের শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই বনে ধ্যান করিতেছেন, তিনিই তোমাদের যোগবল প্রতিহত করিয়াছেন। ঋষিগণ দৈববাণী শুনিয়া অধস্তলে অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, শোভায় ও তেজে জাজল্যমান

এক কুমার নিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট আছেন। দেখিয়া তাঁহারা মনে ভাবিলেন, ইনি কে? ধনাধিপতি কুবের? অথবা রুদ্র? কিম্বা সহস্ররশ্মি সূর্য্য? অথবা ইনি নিষ্পাপ বুদ্ধ?

পুনর্ব্বার দৈববাণী হইল,—"যে শ্রী কুবেরে, যে শ্রী ইন্দ্রে, যে শ্রী ব্রহ্মায়, যে শ্রী গ্রহনক্ষত্রে, সেই এই শাক্যতনয়ের কান্তি হইতে অপগত নহে।"

অনন্তর ঋষিরা ধরণীতলে অবতরণ করতঃ ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। এক ঋষি বলিলেন,—

"লোকে ক্লেশাগ্নি অন্তপ্তে প্রাদুর্ভূতোহয়ং হ্রদঃ।
অয়ং তং প্রাপ্সতে ধর্ম্মং যজ্জগন্মোচয়িষ্যতি॥"

লোক সকল ক্লেশরূপ অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়াছে। তাহাদের জন্য এই সুশীতল হ্রদ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম জগৎকে মুক্ত করিবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

অন্য ঋষি বলিলেন,—

অজ্ঞান তিমিরে লোকে প্রাদুর্ভূতঃ প্রদীপকঃ।
অয়ং তং প্রাপ্সতে ধর্ম্মং যজ্জগন্মোচয়িষ্যতি।"

লোক সকল অজ্ঞান অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সে অন্ধকার বিনাশের জন্য এই প্রদীপক আবির্ভূত। যে ধর্ম্মে জগতের মুক্তি হইবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

অপর ঋষি বলিলেন,—

শোকসাগর কাণ্ডারে যানশ্রেষ্ঠ মুপস্থিতম্।
অয়ং তং প্রাপ্সতে ধর্ম্মংযজ্জগত্তারয়িষ্যতি॥"

দুষ্পার শোকসমুদ্রের নৌকা আগত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম জগৎকে উত্তীর্ণ করিবে, শোকসমুদ্রের পরপারে লইয়া যাইবে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

অন্য ঋষি বলিলেন,—

জরাব্যাধি বিনিষ্টানাং প্রাদুর্ভূতো ভিষগ্বরঃ।
অয়ং তং প্রাপ্সতে ধর্ম্মং জাতি মৃত্যু প্রমোচকম্॥"

জরাব্যাধিক্লিষ্ট সংসারে রোগীদিগের জন্য বৈদ্যরাজ আবির্ভূত হইয়াছেন। যে ধর্ম্ম জরামৃত্যু হইতে বিমুক্ত করে, ইনি সেই ধর্ম্ম পাইবেন।

ঋষিগণ এইরূপ গাথাগান করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন; তৎপরে পুনর্ব্বার আকাশপথে গমন করিলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন; তিনি জানেন না যে, তাঁহার কুমার কৃষিগ্রামের জম্বুবনে গিয়া ধ্যান করিতেছেন। রাজা কেন, এ ঘটনা কেহই জানেন না। রাজা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অমাত্যদিগকে আহ্বান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা

করিলেন, কুমার কোথায় ? অনন্তর অমাত্য ও অনুচর সকলেই কুমারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর এক জন অমাত্য কৃষাণগ্রামের জম্বুবনে গিয়া দেখিল, কুমার এক নিবিড়শাখ জম্বুবৃক্ষের তলদেশে তৃণনির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া গভীর ধ্যাননিমগ্ন আছেন। আরও এক আশ্চর্য্য দেখিল। মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে, অপরাহ্নতা প্রযুক্ত অন্যান্য বৃক্ষের ছায়া কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কুমারের শরীর শীতল করিয়া রাখিয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে অমাত্যের মনে প্রীতি ও বিস্ময় উভয়ই উৎপন্ন হইল। অমাত্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাজসকাশে বহন করিল।

রাজা শুদ্ধোদন অমাত্যমুখে ঐ অদ্ভুত বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে সেই জম্বুতলে গমন করিলেন। কুমার তখন ধ্যানস্থ। রাজা দেখিলেন যেন এক অনির্ব্বাচ্য তেজোরাশি রমণীয়তম মূর্ত্তিতে কি অনির্ব্বাচ্য ভাব ধ্যান করিতেছেন। দেখিয়া রাজার চৈতন্য হইল, পুত্রভাব অপগত হইল। কে যেন তাঁহাকে অনুরোধ করিল, আকর্ষণ করিল, তাই তিনি পুত্রভাব ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধভাবে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিলেন।

কুমার শাক্যসিংহ প্রাতঃকালাবধি অপরাহ্ন পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ থাকিয়া সৌগত জ্ঞানের দ্বারা শাক্যগণের ঋদ্ধি পরিদর্শন পূর্ব্বক প্রতিবুদ্ধ হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। সমাধি ভঙ্গের পর তৎস্থানে পিতা সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া প্রথমে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিলেন, অনন্তর তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত প্রকারে আলাপ করিতে লাগিলেন।

"পিতঃ! আপনি হিংসাময়ী কৃষি পরিত্যাগ করুন। এই কার্য্য নিতান্ত অনুচিত। ইহাতে পদে পদে হিংসা ঘটনা হয়। সুবর্ণে প্রয়োজন থাকিলে সুবর্ণ বৃষ্টি করিব, বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে বস্ত্র বর্ষণ হইবে, অন্য কিছু চাহেন—সমস্তই দিব,—আপনি এই হিংসা রূপা কৃষি পরিত্যাগ করুন। সর্ব্ব জগতের সুখোদ্দেশে উদ্যুক্ত হউন।"

কুমার শাক্যসিংহ পিতার কৃষিগ্রাম দেখিতে গিয়া কৃষকদিগের কষ্ট, গোজাতির দুঃখ, মৃত্তিকাবাসী প্রাণীর বিনাশ, এই সকল দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল। তাই তিনি ধ্যানস্থ হইয়া, সমাহিত হইয়া, চিত্ত চাঞ্চল্যের অবরোধ, দুঃখের বিঘাত, শাক্যকুলের ভবিষ্য ঋদ্ধি, সম্যক জ্ঞানের লাভোপায়, জগতের দুঃখবিনাশ,—এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। পিতা আগমন করিলে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি যে আপনার বোধিত্ব লাভের জন্য ও জগতের হিতের জন্য চিত্তৈক-তানতা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার বেগ তখনও পর্য্যন্ত ছিল। তাই তিনি পিতাকে ও সমাগত শাক্যদিগকে দুঃখান্তকর উপদেশ সকল দিয়াছিলেন। উপদেশ দেওয়া শেষ হইলে তিনি স্বজনসমূহে পরিবৃত হইয়া প্রফুল্লমনে কপিলবস্তু নগরে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

শ্রী রামদাস সেন।

পঞ্জাব-ভ্রমণ।

১।

অমৃতসর।

পৌষমাসের রাত। গরম কাপড় কতকগুলি জড়িয়ে হাবড়া ষ্টেশনে নয় টার সময় রেলের গাড়ীতে উঠিলাম। লাহোর যাব—অতি লম্বা পথ—পথে কোথাও থামা হবে না—একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর (through) গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ী ছাড়িলে লেপ বিছাইয়া একটা বেঞ্চ দখল করিয়া রাখিলাম। চন্দননগর ছাড়াইয়া গেলে শুইলাম। এক ঘুমে রাত পোহাইল। যখন চক্ষু মেলিয়াছি তখনও সূর্য্যদেব দেখা দেন নাই, কিন্তু নীল আকাশ তাহার মৃদু কিরণে স্নাত হইয়াছে। বড় সুন্দর দৃশ্য! বাঙ্গালা ছাড়াইয়াছি—ঘুমের ঘোরে, আর রজনীর আঁধারে বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য কিছুই দেখিতে পাই নাই,—সাঁওতাল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছি। দুদিকেই ছোট ছোট পাহাড়—আকাশের গায়ে সুনীল মেঘের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর বনজঙ্গলের অন্ত নাই। সাঁওতাল ভূমি বড় রূপবতী। বাঙ্গালার অধিক রূপবতী বলিতেছি না। বাঙ্গালার নদীর শোভা, বাঙ্গালার ধানখেতের শোভা আর কোন্ দেশে আছে? এত তরুলতা, এত ফলপুষ্প আর কোথা আছে? বাঙ্গালার হৃদয় শতস্রোতস্বতীর জলে টলমল—মধুর মোহকর সৌন্দর্য্য বোধ হয় এমন আর কোন দেশে নাই। সাঁওতাল ভূমির সৌন্দর্য্য অন্য রকমের—অত বিশ্বপ্লাবী প্রেম তার নাই, অত হাসি, অত নৃত্য, অত গীত তার নাই। তথাপি সাঁওতাল ভূমি পরমা-সুন্দরী—সাঁওতাল ভূমির মুখে যে একটুকু মৃদু হাসি আছে তাহা বড় মনোহর—গভীর বনজঙ্গল, তরুলতাকীর্ণ পাহাড়পর্ব্বত, যে দিকে চাহ সে দিকেই দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয় সাঁওতাল ভূমি ও তাহার সন্তানগণের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। বেলা এগারটার কিছু আগে গাড়ী পাটনায় আসিল। পাটনা সহরকে দুই ভাগ করিয়া রেল গিয়াছে—সহরের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। আমাদের দেশী সহর দেখিতে যেমন হয়, ছোট ছোট ঘন ঘন ইট ও খোলার বাড়ী, অপ্রশস্ত অপরিষ্কার রাস্তা, পাটনাও গাড়ী হইতে তেমনি দেখাইল। পাটনার পর বাঁকীপুর—এখান হইতে রেলের একটা শাখা গয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাটনার আদালত প্রভৃতি রাজকীয় আফিস বাঁকীপুরে। বাঁকীপুরের পরে দানাপুর। দানাপুর পাটনার সেনানিবেশ। দানাপুরে গাড়ী অনেক ক্ষণ থামিল। দানাপুর সাহেবদিগের বড়হাজরি খাইবার জায়গা। সাহেব না হইলেও আমার পেট চুপ করিয়া ছিল না—আমিও গিয়া সাহেব মেম মণ্ডলীতে বসিয়া যথাবিধি উদরপূর্ত্তি করিলাম। সাহেবমেমেরা ভাবিলেন "হংস মধ্যে বকো যথা," আমি ভাবিলাম "বকমধ্যে হংসো যথা" আমি শোভা পাইতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী সুবর্ণরেখা (Soane)

নদীর পুলের উপর উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড পুল—কিন্তু নদী বালুকাময়ী। শোণ অতিক্রম করিয়া আমি এখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ করিতে চলিলাম। বেহার সাঁওতাল ভূমির মত মনোহারিণী না হইলেও সুন্দরী। তরুলতা ফলশস্যের অভাব নাই। আমের বাগান আর শত শত তালগাছের শ্রেণীর সংখ্যা নাই—তাহারা দেখিতে বড় সুন্দর। বেহারে আর একটী জিনিশ বাঙ্গালীর চক্ষে পড়ে। রেলের দুপাশে গ্রাম—গ্রামগুলিতে সর্ব্বত্রই খোলার ঘর। পাটনার পর আর চক্ষু যে দিকে চাহে সে দিকেই হরিৎ শস্যক্ষেত্র, তালের শ্রেণী, আমের বাগান দেখিতে পায় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলটা রৌদ্রেপোড়া দেশ—রুক্ষ, শুষ্ক, তৃণকাষ্ঠহীন। দুটার সময় গাড়ী মোগলসরাইতে পৌঁছিল। এখান হইতে কাশী যাইবার জন্য একটী শাখা রেল আছে। এটা টিফিন খাইবার জায়গা। আমি বিনা টিফিনেই মোগলসরাই ছাড়িলাম। মোগলসরাই হইতে এলাহাবাদের পথে দুদিগে খুব ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। সাঁওতাল ভূমির পাহাড়ের মত ইহারা উচ্চ ও জলতরুলতাশোভিতও নয়। পাথরগুলি এক একটা জায়গায় জড় হইয়া রৌদ্রে পুড়িতেছে। চুনার ষ্টেসন হইতে চুনার দুর্গ দেখা যায়। চুনার গড় একটি উচ্চ পাহাড়ের শিরে নির্ম্মিত। যখন এখনকার পাষাণভেদী কামান ছিল না তখন চুনার গড় লক্ষ সৈন্যকেও উপহাস করিতে পারিত। সন্ধ্যার পর গাড়ী এলাহাবাদে পৌঁছিল। এখানে পেট ভরিয়া ডিনার খাওয়া গেল। তার পর শীতে হা হা করিতে করিতে অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী চলিল। রাত্রির খবর বড় একটা রাখি না। বারটার সময় একটা ফিরিঙ্গী আসিয়া "টিকেট টিকেট" বলিয়া জাগাইল—সে কানপুরে। টিকেট দেখাইয়া শীত দূর করিবার জন্য এক পেয়ালা চা খাইলাম। যখন প্রাতে চক্ষু মেলিয়াছি তখন গাড়ী টুণ্ডলা ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া। টুণ্ডলা হইতে আগ্রা যাইবার জন্য রেল আছে। পাঠক হয় ত ভাবিতেছেন, "এ লোকটা কেমন অদ্ভুত, প্রাকৃতিক শোভার কথাটা তো দুএকটা বলিতেছে, কিন্তু ওর কি একটা মানুষের সঙ্গেও দেখা হয়নি বা কথা হয়নি যে তার কথা বলে ?" গাড়ীতে পথে কত রকম লোক উঠে তাহার ঠিকানা নাই। কত কথা বলে তাহারও ঠিকানা নাই। সে সব বর্ণনা করিতে গেলে কি আমি কখনো পঞ্জাবে পৌছিতে পারিব ? তবে এবার একটা মানুষী কথা বলিতেছি। আমার গাড়ীতে আমি একলা। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর আমি দেখিতে পাইলাম একটী বৈলাতিক বা ইয়ুরেশীয় বুড়ী ও একটি যুবতী গাড়ীর তল্লাশ করিয়া বেড়াইতেছেন। প্ল্যাটফর্ম্মের এক দিক হইতে আর এক দিক পর্য্যন্ত দু,তিনবার ঘুরিয়া আমার গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমি শুনিতে পাইলাম বুড়ী যুবতীকে বলিতেছেন, "ভয় কি, এই গাড়ীতেই যাও—আরতো গাড়ী নাই—এ বাঙ্গালী বাবু !" যুবতীর মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম তাঁহার কোনমতেই বাঙ্গালী বাবুর গাড়ীতে প্রবেশ করিবার ভরসা হইতেছে না। আবার দু তিনবার প্ল্যাটফর্ম্মে এদিক ওদিক করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। আর উপায় নাই—তখন যুবতী আসিয়া

আমার গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলাম যে তিনি আমায় একটা জানোয়ার স্থির জানিয়াছেন। কিছুক্ষণ এক সঙ্গে চলিয়া যখন দেখিলেন বাঙ্গালী বাবু তাঁহাকে গ্রাস করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিতেছে না, অথবা এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইতেছে না, অথবা গা খুলিয়া পেটে হাত বুলাইতেছে না, তখন বোধ হয় তাঁহার মনে হইল যে বাঙ্গালি বাবুটা একটা জানোয়ার নাও হইতে পারে। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি কোথা যাইতেছেন। তিনি বলিলেন, "রাউয়াল-পিণ্ডী।" আমি বলিলাম, "আমি লাহোর যাইতেছি—আপনাকে আমার সঙ্গে অনেক রাস্তা যাইতে হইবে।" ভদ্রতার কথা দু-চারিটা কহিলাম—তখন যুবতী নির্ভয় হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি অনেক রকম খাদ্য বাহির করিলেন—নিজে খাইতে আরম্ভ করিলেন, আমাকেও খাইতে অনুরোধ করিলেন। "লেডীর" অনুরোধ কার সাধ্য লঙ্ঘন করে? আর অনুরোধটা এমন কোন অপ্রিয় কার্য্য করিতেও নয়। অতি সুস্বাদু প্লাম্ কেক প্রভৃতি খাইয়া অনুরোধ রক্ষা করিতে বিশেষ কষ্ট হইল না। ইউরোপীয় রমণীর নিকট পুরুষ মাত্রই দাস—আমাকেও দাসত্ব করিতে হইল। যুবতী হাজরি, টিফিন, বা খানা খাইবার জন্য কোথাও নামিতেন না। যখন দরকার হইত, অতি মধুর একটী হাসি হাসিয়া আমায় বলিতেন, "Mr.——, will you please get me a cup of tea?" "Will you do me a kindness?" "Want a few biscuits." আমি কি করি, অনন্যোপায়—চা, বিসকিট, রিফ্রেশমেণ্ট রুম হইতে আনিয়া হাজির করিলাম। মানুষী কথা এখানে শেষ করি। গাড়ী বারটার পর গাজিয়াবাদে পৌঁছিল। গাজিয়াবাদ হইতে দিল্লী যাইতে হয়। মীরাটে গাড়ী তিনটার সময় পৌঁছিল। সাহারাণ-পুরে সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইল। এখানে—ডিনার খাইলাম। সাহারাণপুরে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল শেষ হইল। ইহার পরেই আম্বালা জেলা—আম্বালা জেলার সঙ্গে পঞ্জাব আরম্ভ। আম্বালায় রাত নয়টার সময় পৌঁছিলাম। তাহার পর নিদ্রা। রাত পাঁচটার সময় গাড়ী অমৃতসরে পৌঁছিল। আমার অমৃতসরে নামিতে হইবে। যদিও আমি লাহোর যাইতেছিলাম, অমৃতসরে প্রথম নামা আগেই স্থির ছিল। শীতকাল—পাঁচটার সময়ও বেশ রাত আছে। আর সে শীতের কথা কি বলিব—গাড়ীতে লেপ কাঁথা জড়াইয়াও কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়াছি—শীতে শরীর বরফের মত হইয়া গিয়াছে। অমৃতসরে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর নামিয়া অন্য কোন গতি নাই ভাবিয়া ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিলাম। ওয়েটিং রুমে ঘণ্টা দুই কাটাইলাম। রোদ উঠিলে গাড়ীর তল্লাশ করিতে গিয়া দেখি আমার জন্য সর্দ্দার —র গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীর সঙ্গে যে লোক ছিল সে বলিল, "সর্দ্দার সাহেব বিশেষ কোন কাজে লাহোর গিয়াছেন—তিনি বাড়ীতে নাই বলিয়া এ বেলাটা আপনার থাকবার বন্দোবস্ত তিনি বাবু —র বাসায় করিয়াছেন, আর আপনাকে অপরাহ্ণের গাড়ীতেই লাহোর যাইতে বলিয়াছেন।" আমাকে গাড়ী বাবু —র বাড়ীতে

লইয়া গেল। বাবুও লাহোরে। তাঁহার পুত্র, একটী যুবক, আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

এত মাছি আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখি নাই। সহস্র সহস্র মাছি চারিদিকে, মুখের কাছে, মাথার উপরে "ভ্যান্ ভ্যান্" করিতেছে। নূতন লোকের পক্ষে মাছিরা অতি দুঃসহ—দেখে ভয়ানক ঘৃণা হয়। এ দেশী মাছিগুলি কিছু বাঙ্গালার মাছির মত চতুর বা পলায়নপটু নয়। তুমি ইচ্ছা করিলে শত শত মাছি মারিতে পার। বাঙ্গালার একটা মাছি মারা সামান্য বীরত্বের কাজ নয়। গরম জলে স্নান করিয়া—এ দেশের শীতে ঠাণ্ডা জলে স্নান অতি দুঃসাহসের কাজ—দু দিন পরে চিরপ্রিয় ডালভাত্ খাইলাম। ঘণ্টাখানিক বসিয়া বাড়ীর একটিন্ কর্ত্তা যুবকটীকে লইয়া অমৃতসর দেখিতে বাহির হইলাম।

অমৃতসর আধুনিক সহর। ধর্ম্মতৃষ্ণার মত শক্তি যে আর নাই—অমৃতসর তাহার একটী নিদর্শন। শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে এখানে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাকে অমৃতসর নাম দেন। তখন এখানে ক্ষুদ্র একটি গ্রাম মাত্র ছিল। সেই অমৃত সরোবরের চতুর্দ্দিকে এখন এই প্রকাণ্ড অমৃতসর নগর। দিল্লীর পরে অমৃতসরের মত বড় নগরী আর নাই। কারবার, ব্যবসাবাণিজ্য সমস্ত উত্তর ভারতে এত কোথাও নাই। আমরা বাজারে গেলাম। দেখিলাম মধ্য-আসিয়া ও বৈলাতিক জিনিষপত্রের অন্ত নাই। গুরুবাজারে দর্শনী দ্বা᾽র হাতীর দাঁতের কাজ দেখিলাম। সে অতি সূক্ষ্ম মনোহর কাজ। সূক্ষ্ম কারু-কার্য্যের অভাব ভারতবর্ষে নাই; কিন্তু প্রকৃতির যথার্থ অনুকরণ, প্রকৃতির ফটোগ্রাফ তোলা আমাদের শিল্পীদের বড় আসে না। কিন্তু হাতীর দাঁতের এখানে যে খেলনা দেখিলাম তাহা কৃষ্ণনগরের মাটীর খেলনার মত জীবন্ত। তিব্বত, চঙ্গথরী প্রভৃতি স্থান হইতে পশম আসে—সে পশমে উৎকৃষ্ট শাল হয়। এরূপ শাল প্রস্তুত করিবার জন্য অমৃতসরে নাকি ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার তাঁত আছে। অমৃতসরে কাশ্মীরেরই তুল্য শাল নির্ম্মিত হয়। শাল ব্যবসায়ীরা দরিদ্র কাশ্মীরী কারীগরদিগকে মাহিয়ানা দিয়া শালের কাজ করায়। উৎকৃষ্ট শাল প্রস্তুত করা অতি পরিশ্রমের কার্য্য। ভাল কাজকরা এক একখানি শাল তৈয়ার করিতে ৪০।৫০ জন লোককে ১০।১২ মাস খাটিতে হয়। তাই কাশ্মীরী (অমৃতসরের শালও কাশ্মীরী) শালের দাম এত। তাঁতে তৈয়ারি কাশ্মীরী শালের দাম ৫০০৲ শত হইতে ২০০০৲ পর্য্যন্ত। শুনিয়াছি প্রিন্স্ অব ওয়েল্সের জন্য একখানি বিশ হাজার টাকার শাল প্রস্তুত হইয়াছিল। অমৃতসরের রাস্তাগুলি খাঁটি ভারতবর্ষীয় সহরের রাস্তা যেমন হয় তেমনি—অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ। বাঙ্গালার সহরগুলির রাস্তা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবে সকল সহরের রাস্তাই এইরূপ। রাস্তাগুলি ইট বা পাথরে বাঁধান, খাড়া খাড়া ইটে বা পাথরে গাঁথা। গাড়ী ঘড় ঘড় করিয়া চলে। অনেক রাস্তায় গাড়ী চলেই না। বাড়ীঘরগুলি ইট বা পাথরে

নির্ম্মিত। খুব ঘন ঘন বসতি—যেমন কলিকাতার কাল সহরে (Black Town)। বাঙ্গালার লোকে ঘরে দরজা বা জানালা রাখে, এ দেশে রাখে না, প্রবেশ করিবার দ্বার আছে অবশ্য। এ দেশে গ্রীষ্মকালে গরমি অতি ভয়ানক। হুহু করিয়া লু নামে, সত্যি সত্যি আগুনের মত গরম হাওয়া সমস্ত দিন বহে। কখন কখন সমস্ত রাত্রিও বহে। এই গরমি হইতে বাঁচিবার জন্যই বোধ হয় এ দেশে ঘরে দ্বার বা জানালা রাখে না। যাহারা অর্থবান তাহারা আপন আপন গৃহের নীচে ধরণীগর্ভে একটী কোটা নির্ম্মাণ করে। দিনের বেলায় সপরিবারে তাহাতে লুকাইয়া থাকে—কেননা সেখানে অনেকটা ঠাণ্ডা। রাত্রিতে সকলেই ছাদের উপর খোলা আকাশের নীচে শুইয়া থাকে। অমৃতসরের বাড়ীঘরে বিশেষ যে কোন একটা সৌন্দর্য্য আছে বলিতে পারি না। তবে দরজার চৌকাটগুলি অর্থবান ব্যক্তি মাত্রেরই ঘরে দেখিবার উপযুক্ত। বড় সুন্দর কাজ করা চৌকাঠগুলি। পঞ্জাবে যেখানে যাবে সেখানেই এরূপ কাজ করা চৌকাট দেখিতে পাইবে। এমন সুন্দর লতা-পাতা বানান যে দেখে তাহাকে আশ্চর্য্য মানিতে হয়। আমাদের বাঙ্গালায় কাঠের উপর এমন কারুকার্য্য একেবারে নাই।

অমৃতসর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত। তেরটা প্রবেশ দ্বার। লোক সংখ্যা এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার—শিখ, হিন্দু, মুসলমান। এ দেশের লোক দেখিতে বড় সুন্দর। শিখরা দীর্ঘকায়, সুগঠিত ও বলবান। ইহারা, কি মাথা কি দাড়ি, কোন স্থানের চুল কাটে না। অতি যত্নের সহিত মাথা ও দাড়ির কেশ বিন্যাস করে। মাথার চুলের মধ্যে এক একখানি চিরুণী সকলেরই দেখা যায়। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা পরমাসুন্দরী। আর্য্যনারীর বর্ণনা আমরা সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই—এ দেশের নারীতে সে বর্ণনা খাটে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রী ও অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কালো রং নাই বলিলেও হয়। ভদ্রবংশ মাত্রেরই স্ত্রীলোকেরা তপ্তকাঞ্চনবরণী। এমন সুন্দর রং কেবল পঞ্জাব ও কাশ্মীরেই আছে। এ দেশে খেঁদা নাক, পুরু ঠোঁট কেহ কখনো দেখে নাই। শরীরের গড়ন সুন্দর, মুখের শ্রী মনোহারিণী। তবে কেশের বাহার বঙ্গসুন্দরীর তুলনায় ইহাদের নাই বলিলেও হয়। চুল অতি ছোট। তাহা দধিসিক্ত করিয়া অতি সূক্ষ্ম শতবেণী বিনাইয়া বাঁধা হয়—সে বেণীজাল খুলিতে অর্দ্ধেক চুল উঠিয়া যায়। সপ্তাহে এক দিন বই এ দধিসিক্ত বেণীজাল খোলা হয় না—সুতরাং পঞ্জাব সুন্দরীর শির যে গোলাপের সমান সৌরভশালী নয় এ কথা আর বলিয়া দিতে হইবে না। চুলটা বোধ হয় জলডোবা দেশে আর কালো মানুষের মাথাতেই খুব লম্বা হয়। বঙ্গসুন্দরীর সমান, মান্দ্রাজসুন্দরীর সমান চুল কাহার আছে? অমৃতসরের রাস্তায় বাহির হইয়া আর একটা কথা বুঝিতে পারিলাম যে এ দেশে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা নাই। যে দিকে চাই সে দিকেই চিত্রবিচিত্র সুন্দর সুন্দর রংকরা ঘাঘরা ও জামাপরা স্ত্রীলোক দেখিতে পাই।

অমৃতসরে তিনটি দেখিবার বিখ্যাত জিনিষ আছে। একটীর খ্যাতি দেশদেশান্তর ছাইয়াছে। সেটীর নাম গুরুদরবার। আমরা গুরুদরবার দেখিতে গেলাম। গুরু

রামদাস ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর খনন করিয়া তাহার মধ্যস্থলে এই গুরুদরবার নির্ম্মাণ করেন। অমৃতসর একটী সুবিস্তীর্ণ পুষ্করিণী—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান। পুষ্করিণীটীর চারি পাশ ও তলদেশ পর্য্যন্ত পাথরে বাঁধান। বাহির হইতে প্রণালী দ্বারা জল আসিয়া অমৃত সরোবরকে পূর্ণ করে। জল সমল বা দুর্গন্ধ হইলে তাহা বাহির করিয়া দিয়া ঐ প্রণালী দ্বারা নূতন নির্ম্মল জল আনা হয়। এ শুষ্ক মরুদেশে অমৃতসরোবরের মত প্রকাণ্ড পুষ্করিণী দেখিলে সত্যি সত্যিই অমৃত পাইলাম মনে হয়। পুষ্করিণীটী অতি চমৎকার দেখিতে। কেন্দ্রস্থলে পুষ্করিণী-হৃদয়ে গুরুদরবার বা সুবর্ণমন্দির (Golden Temple)। ইংরেজরা গুরুদরবারকে সুবর্ণমন্দির সংজ্ঞা দিয়াছেন, কেননা গুরুদরবার স্বর্ণজড়িত তাম্রপত্রে আচ্ছাদিত। গুরুদরবার একটা প্রকাণ্ড মন্দির নয়। ক্ষুদ্র মন্দির মাত্র। তবে মার্ব্বেল প্রস্তরে অতি সুনির্ম্মিত। ইহা প্রথমে কেবল তাম্রপত্রেই আচ্ছাদিত ছিল। পঞ্জাবসিংহ রণজিত সিংহ গুরুদরবারকে সুবর্ণমণ্ডিত করেন। মন্দিরে যাইবার জন্য অমৃতসরোবরের বুকের উপর দিয়া একটি অতি সুন্দর মার্ব্বল নির্ম্মিত রাস্তা আছে। গুরুদরবারে গ্রন্থ সাহেব অর্থাৎ শিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পূজা পান। দিনের বেলায় গ্রন্থ সাহেব দরবারে থাকেন, আর সূর্য্যোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সেখানে ধর্ম্ম-সঙ্গীত ও বাজনা হয়। আকালী সন্ন্যাসীদের প্রাসাদে গ্রন্থ সাহেব রজনী যাপন করেন। আকালীরা শিখ সন্ন্যাসী—যোদ্ধা সন্ন্যাসী—ইহারা শিখযুদ্ধে নির্ভীকতা দেখাইয়া শিখ-সৈন্যদের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিত। এই প্রাসাদেই শিখদিগের দীক্ষাস্থান, গুরুগণের তরবারি আর অন্য অন্য যুদ্ধাস্ত্র এই প্রাসাদে রক্ষিত আছে। অমৃতসরোবরের চার তীরই মার্ব্বেলে আচ্ছাদিত। প্রবেশ দ্বারে জুতা রাখিয়া যাইতে হয়। প্রবেশ করিতেই একটী অতি সুনির্ম্মিত চত্বর, সম্মুখে উল্লিখিত আকালী-প্রাসাদ। অমৃতসরোবরের চার তীর মার্ব্বেল আচ্ছাদিত আগেই বলিয়াছি। সে মার্ব্বল আচ্ছাদিত পথের চারদিকে আবার পাকা ঘর। ইহাও দরবারের অন্তর্ভুত। শিখ সরদার প্রভৃতিরা আসিয়া এখানে থাকেন। অমৃতসরোবরের পূর্ব্বদেশে দুটী উচ্চ স্তম্ভ আছে। তাহাতে উঠিলে অমৃতসর নগর চারি-দিগে বিস্তৃত দেখিতে পাইবে। দীপান্বিতা বা দেওয়ালীর সময় গুরুদরবার বড় চমৎকার দেখিতে হয়। সুদূর নগর ও গ্রাম হইতে শত শত লোক দরবারে দেওয়ালী দেখিবার জন্য আগমন করে। লাহোর হইতে একবার দেওয়ালীর সময় আমিও অমৃতসরে গিয়া-ছিলাম। দেখিলাম অমৃতসরোবরতীরে সহস্র সহস্র নরনারী বালকবালিকা। লাহোর হইতে দেখিলাম অনেকগুলি সাহেব ও মেম তামাসা দেখিতে আসিয়াছেন। দৃশ্য সত্য সত্যই বড় সুন্দর। একে অমৃতসরোবর সুবিস্তীর্ণ—জলে ভরা, টলমল করিতেছে—হৃদয়ে মার্ব্বেল নির্ম্মিত সুবর্ণ আচ্ছাদিত গুরুমন্দির ধারণ করিয়া; তাহাতে সহস্র সহস্র প্রদীপ চতুষ্পার্শ্বে সরোবরতীরে ও সরোবরহৃদয়ে, মার্ব্বেল রাস্তায়, রেলের উপরে আলো দিতেছে।

গুরুদরবার দেখিয়া আমরা তাহারই পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত বাবা অটল নামক স্তম্ভ ও গুরুবাগ দেখিতে গেলাম। বাবা অটল দেখিবার উপযুক্ত—কেননা ইহার গড়ন ও নির্ম্মাণপ্রণালী এক রকম নূতন। গুরুবাগে কিছু দেখিবার নাই। এখানে একটী পুকুর আছে, তাহার নাম কমলসর। গুরুগোবিন্দের স্ত্রীর নাম ছিল কমল—তাহারই নামে কমলসর এ পুকুরের নাম হইয়াছে।

গোবিন্দগড় নগরের বাহিরে একটি দুর্গ। রণজিৎ সিংহ আরাম ও আনন্দ উপভোগের জন্য এই সুরক্ষিত (fortified) বাগান নির্ম্মাণ করেন। এখন আর সে উচ্চ প্রাচীর নাই—ভূমিসাৎ করা হইয়াছে। সমস্ত পঞ্জাবে নাকি এমন সুন্দর উদ্যান নাই। প্রাচীন সিংহ-দ্বার, বুরুজ, প্রাসাদগুলি দাঁড়াইয়া আছে। একটা প্রাসাদ এখন ইংরেজদের কিতাব-খানা ও পাঠগৃহে পরিণত হইয়াছে।

চারশ বৎসর পূর্ব্বে অমৃতসর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। গুরু রামদাস অমৃতসর খনন করিয়া গুরুদরবার নির্ম্মাণ করেন, এবং গ্রামের নাম রামদাসপুর রাখেন। রামদাসের পুত্র গুরু অর্জ্জুন এই স্থানকে শিখদিগের রাজধানী স্বরূপ করেন আর অমৃতসর নাম দেন। এখন অমৃতসরের লোকসংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ, ব্যবসা বাণিজ্য উত্তর ভারতে আর সকল নগর হইতে অধিক। অমৃতসর শিখদিগের ধর্ম্মক্ষেত্র—হিন্দুদের যেমন কাশী, মুসলমানদের যেমন মক্কা, ক্রিশ্চিয়ানদের যেমন জেরুসালম—শিখদের তেমনি অমৃতসর।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শিশু-হারা।

১

হা বিধি!
কেনরে করিলি তারে চুরি?
অভাব কি হ'য়েছিল স্বরগে মাধুরী?
কি-ই সেথায় ছিলনারে
চাঁদের হাঁসির ধারে?
তোর সে শোভার রেখা যেত না কি মিলে,
বিনে কচিমুখ-খানি, মাঝেতে না দিলে?
বুক-বাঁধা বাহু-দুটি,
বুকের সঙ্গেতে টুটি,
জুড়ে দিলি কার—
ছিঁড়েছিল হেন শাখা কোন্ লতিকার?

আমারে করিয়া অন্ধ,
কারে দিলি সে আনন্দ !
কোন্ হরিণীর, শিশু ছিল আঁখি-হারা ?
পেয়ে দুটি টানা চোখ, পুন হ'ল খাড়া !
কোন্ নন্দনের পাশে,
অলস জ্যোছনা-হাসে,
কোন্ মন্দাকিনী স্রোত থেমেছিল ভুলে ?
চলি-চলি চলা তার দিলি কূলে কূলে !
কোন্ অপ্সরীর বীণা
হ'তেছিল সুর-হীনা ?
আধ-আধ বুলি দিলি ফাঁকে ফাঁকে তার !
বিষণ্ণ দেবতা-কুলে ভুলাতে আবার !

২

বাছারে !
কোন্ স্বর্গ-রঙ্গভূমে
কত মুখ তোরে চুমে !
সে হাসির রাশি মাঝে খুঁজিস্ কি কারে ?
পেয়েছে কি হেন কেহ,
জানে জননীর স্নেহ ?
যেমন জানিস্ তুই জানায় তোমারে !
শত কোল ঘুরে ঘুরে,
আছ কোন্ সুরপুরে ?
আকাশের কোন্ তারা হ'ল তোর ঘর ?
—জীবন-শ্মশানকূলে
ব'সে আছি বড় ভুলে
চেয়ে আকাশের পানে ! অশ্রু দর দর !
সম্মুখে অনন্ত শূন্য, অপার সাগর !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

দুখের গান।

আমরা যাব না তুমি যাও,
সেখানে সুখ যদি পাও।

আমারি প্রাণ আজি
বিষাদে ডুবে আছে,
সেখানে কোথা যাব—
দাঁড়াব কার কাছে ?
গভীর শোক-মাখা
কাতর মুখ পানে,
চাহিতে এক জনো
নাহি ত সেই খানে।
শরীর প্রাণ নিয়ে
সেখানে আছে যারা,
সুখেরি আলাপনে
নিয়ত থাকে তারা।
দেখিতে সুখ দুখ
তাহারা পাশাপাশি,
চাহে না—চাহে শুধু
সুখেরি হাসাহাসি।
একটী দুখী প্রাণ
সেখানে গেলে ভেসে,
অমনি শত মুখে
উড়ায়ে দেয় হেসে।

মরম কথা মোর
জানাতে সেথা গেলে,
ঘৃণার হাসি দিয়ে
দেবে তা ছুড়ে ফেলে।
চাবে না এক জনো
এ মোর মুখ পানে,
বরঞ্চ শত শেলে
বিঁধিবে মোর প্রাণে।
আমি গো নিদারুণ
মনেরি ব্যথা নিয়ে,
চাহিয়ে কার মুখ
দাঁড়াব কোথা গিয়ে ?
জুড়াতে সেথা প্রাণ
যদি হে আশা পাও,
আমারে সুধায়োনা
তোমরা সেথা যাও।
হৃদয়মাঝে নিয়ে
আমি এ দুখ-জাল,
আঁধারে কেঁদে কেঁদে
কাটাব চিরকাল !

শ্রী নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীমকোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহারাজা নন্দকুমারের পত্রখানি আদ্যোপান্ত কৌন্সিলের সম্মুখে পঠিত হইলে, কৌন্সিল সেই মূল পারসীখানির পুনর্ব্বার বিশুদ্ধরূপে অনুবাদ করিবার জন্য তাঁহাদের মূল-অনুবাদককে প্রদান করিলেন।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত নন্দকুমারের অভিযোগ পত্রখানি পড়া হইতেছিল, ততক্ষণ হেষ্টিংস স্থিরকর্ণে ও দৃঢ় মনোযোগের সহিত, তাহার আদ্যোপান্ত শুনিতেছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রমানুযায়ী নানাপ্রকার ভাবের আবির্ভাব হইতেছিল। পত্রপাঠ শেষ হইয়া গেলে, তিনি সহসা মৌনভঙ্গ করিয়া ফ্রান্সিস্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ইতিপূর্ব্বেই সভার সমক্ষে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, যে নন্দকুমারের পত্রোল্লিখিত বিষয় সমূহের কিছুই আপনি জানেন না। আমি এ সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না। কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি মহারাজা নন্দকুমার কর্ত্তৃক আমার বিরুদ্ধে এই সমস্ত অভিযোগ আনিবার অভিসন্ধি সম্বন্ধে কোন কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতেন কি না? আমি নিতান্ত কৌতুহলপরবশ হইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।" ফ্রান্সিস্ সাহেব ইহার উত্তরে বলিলেন—"কোম্পানীর মন্ত্রী-সভার প্রধান সদস্য হইয়া—কাজের কথা ব্যতীত, কেবল কোন ব্যক্তিবিশেষের কৌতুহল চরিতার্থ জন্য—আমি এ প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি। তবে গবর্ণর সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, নন্দকুমার যখন অভিযোগপত্র আমার নিকট পাঠান, তাহার পূর্ব্বসূচনা ও আনুসঙ্গিক কার্য্যকলাপ দেখিয়াই আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে সম্ভবতঃ সেই পত্রখানি গবর্ণরের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগপূর্ণ। পত্রমধ্যে কি লিখিত ছিল—বা অভিযোগের বিষয়গুলি কি—তৎসম্বন্ধে আমি কোন কথা জানিতাম না।"*

ফ্রান্সিস্ সাহেব গবর্ণরের প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দিলে সেই দিনের জন্য সভার অন্যান্য কার্য্যাবলী শেষ হইলে সভাভঙ্গ করা হইল। ভবিষ্যতে যে ভয়ানক যজ্ঞের সূত্রপাত হইবে অদ্যকার সভায় তাহারই জন্য বুঝি ভূমি পরিষ্কৃত করা হইল। মহাঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ স্বরূপ বিঘতপ্রমাণ কালমেঘ অদ্যকার কৌন্সিলের কার্য্যগুণে উদিত হইল। এই বিঘতায়তন মেঘখণ্ড ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া যে মহাপ্রলয়ঙ্করী ঝটিকা সমুত্থিত করিয়াছিল—ও সেই ঝটিকার প্রবল ঝঞ্ঝায় মহারাজা নন্দকুমারের সমুজ্জল জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল—ইহাই আমরা ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিতে আরম্ভ করিব।†

১৩ই মার্চ্চ, মন্ত্রীসভার পুনরাধিবেশন হইলে সেক্রেটারি সাহেব আর একখানি পত্র কৌন্সিলের সভ্যগণের সম্মুখে রাখিলেন। এই পত্রখানি মহারাজা নন্দকুমারের নিকট

* বাঙ্গালার তদানীন্তন গুপ্তমন্ত্রণা সভায় ইহার পর হইতে নন্দকুমারের অভিযোগ লইয়া প্রতি অধিবেশনে যে সমস্ত কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহার আদ্যোপান্ত আমরা ক্রমশঃ উদ্ধৃত না করিয়া নন্দকুমারের চরিত্র পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আরও ইহা দ্বারা তৎকালে সকৌন্সিল গবর্ণরেরা কি প্রকারে কৌন্সিলের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন তাহারও যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যাইবে। পাঠক এই সমস্ত পাঠ করিতে করিতে পাছে ধৈর্য্যচ্যুত হন ইহাই আমাদের প্রধান ভয়।

† Bengal Secret Consultations March 11.

হইতে আসিয়াছিল ও পূর্ব্ব পত্রের ন্যায় ইহাও সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। নন্দকুমার তাঁহার দ্বিতীয় পত্রে লিখিতেছেন—

"আমি আপনাদের নিকট ১১ই তারিখে যে পত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহাতে মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেব গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। উক্ত পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার কোন অংশই আমি পরিবর্ত্তন করিতে চাহি না। পরিবর্ত্তন করা দূরে থাকৃ, উক্ত পত্রে যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহার যথার্থ্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আপনাদের অনুমতি পাইলে, আমি নানাবিধ অকাট্য লিখিত প্রমাণসহ মন্ত্রীসভার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, আমার অভিযোগোক্ত বিষয়গুলি যে প্রকৃত তাহা প্রমাণ করাইয়া দিব। আত্মসম্মানরক্ষা ব্যতীত এরূপ বলিবার আমার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।"

"যাহাতে বাঙ্গালায় কোম্পানীর ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ বৃদ্ধি হইয়া সেই সঙ্গে সুশাসনের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। যখন ক্লাইব, কার্টিয়ার, ভান্সিটার্ট প্রভৃতি ভুতপূর্ব্ব গবর্ণরেরা বাঙ্গালার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া হেষ্টিংসের ন্যায় রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহাদের সর্ব্বদাই এই কথা বলিতাম যে কোম্পানীর কর্ম্মচারিরা কেবল নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি ও ধনাগমের পথ-পরিষ্কার করিতে সদাসর্ব্বদা চেষ্টা করিলে দেশের ও সাধারণ প্রজাবর্গের অত্যন্ত কষ্টবৃদ্ধি হইবে। কোম্পানীর কর্ম্মচারিদিগের প্রথম কর্ত্তব্য এই, যাহাতে কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধি ও প্রজার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। হেষ্টিংস সাহেব বাঙ্গালায় আসিয়া রাজস্ব ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিবার জন্য আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমায় তজ্জন্য অনুরোধ করাতে আমি তাঁহার অভিমত কার্য্য আরম্ভ করি। যতদিন পর্য্যন্ত না কার্য্যোদ্ধার হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত হেষ্টিংস আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইয়া গেলে আমার সহিত আর তদ্রূপ ব্যবহার না করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। তিনি ইহার পর আমাকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন না। জানি না কি উদ্দেশ্য পরিচালিত হইয়া হেষ্টিংস এই সময়ে আমার সহিত মিত্রভাব ত্যাগ করিয়া শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন! সাধারণ প্রজার ও দেশের ঐশ্বর্য্য ও শান্তিবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, তিনি নিজের স্বার্থকেই এ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যশাসনের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ও তাঁহার অতীত শাসনকাল কেবল নিজ স্বার্থসাধনেই ক্ষেপণ করিয়াছেন। আপনারা আমার প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের লিখিত বিষয়গুলির আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া, যাহাতে দেশের ও প্রজাবৃন্দের ও কোম্পানীর সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয় এইরূপ ভাবে কার্য্য করেন—ইহাই আমার উদ্দেশ্য।"

১৩ই মার্চ্চ, ১৭৭৫। [মহারাজা নন্দকুমারের সহী ও মোহর]

এই অভিযোগ পত্রখানি পাঠশেষ হইলে কর্ণেল মন্সন সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে মহারাজা নন্দকুমারকে—তাঁহার ৮ই তারিখের পত্রোল্লিখিত বিষয় সমূহের যথার্থতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য—বোর্ডের সমুখে প্রমাণ-সহ উপস্থিত হইতে বলা যাউক। গবর্ণর জেনারেল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিলেন, সেই প্রত্যুত্তরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশটুকু—নিম্নে উদ্ধৃত হইল। হেষ্টিংস বলিলেন—

"নন্দকুমারকে Boardএর সম্মুখে ডাকিয়া আনিবার প্রস্তাব অন্যান্য সভ্যগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমি বলিয়া রাখিতেছি যে নন্দকুমার আমার অভিযোক্তা রূপে বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন ইহা কখনই আমি প্রাণান্তে সহ্য করিব না। কোম্পানীর অধিকারস্থ প্রধান শাসনকর্ত্তার পক্ষে কোন্ কার্য্য সম্মানজনক ও কোন্ কার্য্য দ্বারা তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষতা রক্ষা হইতে পারে তাহাও আমি জানি। আমি কখনই এই বোর্ডের সম্মুখে সামান্য অপরাধীর ন্যায় বিচারপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইব না. বা এই বোর্ডের মেম্বরগণকে আমার চরিত্রের ও কার্য্যকলাপের বিচারক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। কার্য্যগতিকে আমায় এ কথাও প্রকাশ করিতে হইতেছে যে প্রকৃতপক্ষে মহারাজা নন্দকুমারকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোক্তা জ্ঞান না করিয়া কর্ণেল মন্সন, জেনারেল ক্লেভারিং ও মিঃ ফ্রান্সিস্‌কেই আমি প্রকৃত কার্য্যকারক বলিয়া বিবেচনা করি। নন্দকুমার কেবল উপলক্ষ মাত্র। আমি আইনের প্রকৃত মর্ম্মানুসারে এই কথা প্রমাণ করাইতে পারি না বটে কিন্তু মনের বিশ্বাসানুসারে বলিতে গেলে ইহাদিগকেই আমার প্রকৃত অভিযোক্তা বলিয়া বিবেচনা করি। আমি আমার এই প্রকার বিশ্বাসের জন্য পরে কারণ নির্দ্দেশ করিব। কলিকাতায় কৌন্সিলের উল্লিখিত মেম্বরগণের উপস্থিত হইবার পর মন্ত্রীসভার প্রথম অধিবেশন হইতেই তাঁহারা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া আমার কার্য্য সমূহের প্রতি বৈরিতাচরণ করিতেছেন। গবর্ণর জেনারেল হইবার পূর্ব্বে আমি রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, ইহাঁরা তাহার সমস্তই পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের ক্ষমতার এই প্রকার অন্যায় পরিচালন সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে পত্রও লিখিয়াছিলাম। তাঁহারাও পত্র লিখিতে ক্ষান্ত ছিলেন এমত নহে। এইরূপে উভয়পক্ষ হইতেই স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক অনেক পত্রাদি বিলাতে ডাইরেকুটারদিগের নিকট পাঠান হইয়াছে। বর্ত্তমান ঘটনাসমূহ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে মন্ত্রীসভার সদস্যগণ পূর্ব্বোক্ত উপায় পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন পন্থা অবলম্বন করতঃ আমায় আক্রমণ করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন। আমাদের মধ্যে পূর্ব্বে যে অনৈক্যতা ছিল তাহা কেবল রাজস্ব ও রাজ্যমধ্যে অন্য প্রকার ব্যবস্থাদি প্রণয়ন ও প্রচলন সম্বন্ধে। কিন্তু এক্ষণে ইহাঁরা পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল আমাকেই প্রকৃত-পক্ষে আক্রমণ করিয়া সাধারণের চক্ষে আমায় হেয় ও অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের এই গভীর উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল কতকগুলি সহায়ও

জুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মহারাজা নন্দকুমার, ফাউক সাহেব, রূপনারায়ণ চৌধুরী* ও বর্দ্ধমানের মহারাণীই উল্লেখযোগ্য।

"নন্দকুমারের অভিযোগ পত্রখানি—ফ্রান্সিস্ সাহেব নিজে হাতে করিয়া আনিয়া কৌন্সিলের সমক্ষে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে মহারাজা তাঁহার বাটীতে আসিয়া স্বয়ং তাহাকে এই অভিযোগ পত্রখানি কৌন্সিলে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সিস সাহেব কৌন্সিলের একজন সভ্য, সুতরাং তাঁহার পদোচিত ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য অনুসারে এ প্রকার অভিযোগ পত্র গ্রহণ করিতে পারেন একথাও নন্দকুমার তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন, ও ফ্রান্সিস্ সাহেবও রাজমন্ত্রীর কর্ত্তব্যানুরোধে সেই অভিযোগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন ও তাহা মন্ত্রণাসভায় পেশ্ করিয়াছেন। তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে পত্রখানি যখন মহারাজা নন্দকুমারের ন্যায় দেশের একজন উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্ত, ও বিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছে তখন সে প্রকার আবেদন পত্র গ্রহণ না করিলে কর্ত্তব্য হানি ও তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ হইতে পারে। কৌন্সিলের সম্মুখে অনুন্মোচিত পত্রখানি রাখিবার সময়, তিনি পত্রমধ্যস্থ কোন বিষয় অবগত নহেন একথাও বলিয়াছেন। আমার বোধ হয় ডিরেক্টারেরা ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ফ্রান্সিসের এই সমস্ত কার্য্যকলাপ তিনি যে ভাবে দেখিয়াছেন সেইভাবে লইবেন না। তাঁহারা এই সমস্ত কার্য্য অন্যভাবে বুঝিয়া লইবেন। আরও নন্দকুমার নিজে জেদ করিয়া ফ্রান্সিসের হস্তে এই প্রকার পত্র পাঠাইতে চেষ্টা করায় নিতান্ত ঔদ্ধত্য ও প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়াছেন। ফ্রান্সিস্ সাহেবেরও বোঝা উচিত ছিল যে এ প্রকার অভিযোগ পত্র নিজ হাতে লইয়া গিয়া, কৌন্সিলে পেশ্ করা তাহার প্রকৃত কর্ত্তব্যভুক্ত নহে। একজন সামান্য হরকরা বা পিয়নের হস্তে এই পত্র প্রেরণ করিলে তাহা অনায়াসেই সেক্রেটারির দ্বারা বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিত। ফ্রান্সিস্ সাহেব ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে নন্দকুমারের পত্রখানি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগপূর্ণ; ইহা ভাবগতিকে তিনি কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার মনে এই প্রকার ধারণা হইয়াছিল তখন তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে এই পত্রোক্ত অভিযোগগুলির যথার্থতা যদ্যপি প্রমাণিত না হয় তাহা হইলে ইহা গবর্ণরের পক্ষে ভয়ানক মানহানিকর কার্য্য (libel) বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রান্সিস্ সাহেব এই প্রকার পত্র বোর্ডের সম্মুখে দিয়া একটী মানহানিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিপদাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন ইহা কখনও রাজমন্ত্রীর উপযুক্ত কার্য্য নহে।"

* রূপনারায়ণ চৌধুরী বর্দ্ধমানের রাজ সংসারে দেওয়ানি করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের নামে জাল মোকর্দ্দমায় ইনি Defence পক্ষের এক জন প্রধান সাক্ষী। বর্দ্ধমানের মহারাণীর অভিযোগের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বলিতে গেলে স্থানসংকুলান হইবে না. সুতরাং হেষ্টিংসের এই সমস্ত কার্য্য সমালোচনা করিবার সময় আমি অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিব।

"আমি Boardএর সম্মুখে আরও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে নন্দকুমার আমায় আক্রমণ করিবার জন্য এই সকল অভিযোগ আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন ইহা আমি বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়াছি। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে নন্দকুমারের চক্রান্ত করিবার কুটবুদ্ধি ও কৌশলজাল যতটা প্রবল সেই সমস্ত গোপনীয় মন্ত্রণা সাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাখিবার ক্ষমতা তদ্রূপ নহে। আমি কোন লোকের নিকট হইতে, কোন বিশেষ সূত্রে, আমার নামে অভিযোগোক্ত বিষয়পূর্ণ দুইখানি কাগজ দেখিয়াছি—আরও শুনিয়াছি স্বয়ং মহারাজা নন্দকুমার এই সমস্ত কাগজপত্র লইয়া মন্সন সাহেবের বাটীতে গিয়া বহুক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত থাকিয়া, অভিযোগোল্লিখিত বিষয়গুলির মর্ম্ম তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। আমি যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিলাম, কিন্তু আমার শ্রুত ঘটনাটীর অধিকাংশই যখন নন্দকুমারের অভিযোগ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার সহিত অনেকাংশে মিলিতেছে, তখন আমি উপরোক্ত জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতে আরও অগ্রসর হইতেছি। আমি এই সমস্ত কথা কোম্পানীর গুপ্তমন্ত্রণা সভার অন্যান্য ঘটনাবলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া যে অপরাধ করিলাম আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিরা, এইরূপ করার জন্য আমায় মার্জ্জনা করিবেন। মন্সন সাহেবের সহিত মহারাজা নন্দকুমারের কোন সময়ে উল্লিখিত প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল তাহার ঠিক সময় আমি বলিতে পারি না। আমার স্মরণ হইতেছে Bute নামক জাহাজে যে সময়ে কাগজপত্র ও রাজ্য সম্বন্ধে চিঠীপত্রাদি বিলাতে পাঠান হয় সেই সময়ে এই প্রকার ঘটিয়াছিল। সেই সময় আমি যে অভিযোগপত্র দেখিয়াছিলাম তাহার তুলনায় বর্ত্তমান অভিযোগ পত্রের মূল অংশে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মূল অভিযোগপূর্ণ যে কাগজখানি প্রথমে মন্সন সাহেবকে দেখান হয়, তাহার একখানি পারসী নকল আমি পাইয়াছি ও সময়ে আবশ্যক হইবে জানিয়া একখানি অনুবাদও প্রস্তুত করাইয়াছি। আমার ইচ্ছা যে অদ্যকার সভার কার্য্যবিবরণী মধ্যে এই অনুবাদখানিরও একটী লিখিত নকল রাখা হউক। আমার এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই, যদি কখন আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিরা বা দেশের লোকে, এই সমস্ত কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন তাহা হইলে ইহা দেখিয়া সহজেই তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে নন্দকুমারের বর্ত্তমান অভিযোগ পত্রের বিষয়গুলি, মৎকথিত অনুবাদিত পত্রের বিষয়গুলি হইতে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর কর্ণেল মন্সন ও মহারাজার সম্বন্ধে উপরোক্ত জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি কি না, ইহাও তাঁহারা বিবেচনা করিতে পারিবেন।

"নিজের মনের বিশ্বাস অনুসারে আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে যাঁহারা আমার বিচারক রূপে এই সভামণ্ডপে বসিয়াছেন তাঁহারাই আমার প্রকৃত অভিযোক্তা। আমার শাসন কালের প্রথমাংশ হইতেই এই Boardএর উপর আমার যে ন্যায্য ও আইনসঙ্গত

ক্ষমতাটুকু আছে নানা উপায়ে তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া সাধারণের নিকট আমায় ক্ষমতাহীন প্রতিপন্ন করিয়া উপহাসাস্পদ করিবার জন্য ইঁহারা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় অন্যটীকে অধিকতর আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় না। আমি কোম্পানীর অধিকার সমূহের প্রধান শাসনকর্ত্তা—ব্রিটিশ পার্লীয়ামেণ্ট দ্বারা ভারতশাসনকার্য্যে নিযুক্ত ও নির্ব্বাচিত—আপনাদিগেরও সর্ব্বোদ্ধতন কর্ম্মচারি—আমি সামান্য মনুষ্যের ন্যায়. সামান্য অপরাধীর ন্যায়. আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব ও একজন নীচপ্রকৃতি ও হতভাগ্য ব্যক্তি এই বিচারস্থলে আমার অভিযোক্তারূপে দণ্ডায়মান হইবে ইহা কি আপনাদের অভিপ্রেত? এই নীচ প্রকৃতির লোক কে তাহা কি আমায় আবার নামোল্লেখ করিয়া বলিতে হইবে? নন্দকুমারই আমার লক্ষ্য বস্তু। নীচ ও সাধারণ লোকদিগের মধ্য হইতে নন্দকুমারের উপদেশে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির বিচার জন্য যে সমস্ত সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে তাহাদের জোবান বন্দী শুনিতে ও তদুত্তরে নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে এই সভাস্থলে উপবিষ্ট হইব ইহাই কি আপনাদের ইচ্ছা? আমি কখনই এ প্রকার ভাবে বিচারপ্রার্থী হইয়া আপনাদিগের সম্মুখে বসিব না। আপনাদের ইচ্ছা হয় আপনারা একটী নূতন সমিতি সংগঠন করিয়া আমার অতীত কার্য্য সমূহের বিচার করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে পারেন—এই প্রকার সমিতিতে আপনারা যদৃচ্ছা আমার বিচার করিতে পারেন। কিন্তু আমি পুনরায় বলিতেছি বোর্ডে কখনই আমি অপরাধীবেশে নন্দকুমারের সম্মুখে উপবেশন করিব না এবং বোর্ডকেও তাহার জোবানবন্দী লইতে দিব না। এইরূপে জোবানবন্দী গ্রহণ করিবার বোর্ডের সদস্যগণের কোন ক্ষমতাই নাই ও আমার চরিত্র সম্বন্ধে দুর্বাক্য প্রয়োগ ও আমাকে অপমানিত করা ভিন্ন এ প্রকার কার্য্যের অন্য আর কোন উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে না।" * * * গবর্ণরের মন্তব্য শেষ হইয়া গেলে মন্ত্রী সভার সভ্যগণের মধ্যে মহাবাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। আমরা নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

কর্ণেল মন্সন। আমি সম্মানের সহিত গবর্ণরকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি তিনি কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে মহারাজা নন্দকুমার তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র গুলি লইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন ও অভিযোগোক্ত বিষয় গুলি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন? এ বিষয় বোর্ডের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিতে তাঁহার বোধ হয় কোন আপত্তি নাই?

গবর্ণর জেনারেল। আমি কর্ণেল সাহেবের এই প্রশ্নকে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না। কর্ণেল সাহেব বোধ হয় বেশ জানেন—যে তিনি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী সভার এক জন সভ্য। এই সভার অন্যান্য সভ্যগণের ন্যায় তাঁহারও পদোপযুক্ত একটু বিশেষ ক্ষমতা আছে। যে ব্যক্তি আমায় তাঁহার সহিত নন্দকুমারের সাক্ষাতের কথা বলিয়াছে

আমি তাহার নামোল্লেখ করিব না। হয়ত কর্ণেল মন্সন তাহার নাম জানিতে পারিলে তাহার উপর জাতক্রোধ হইতে পারেন। সুতরাং সেই ব্যক্তিকে কর্ণেল সাহেবের ক্রোধ-মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এস্থলে আমি তাহার নামোল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। আর আমার মতে কর্ণেল সাহেব তাঁহার বর্ত্তমান প্রস্তাবটী কিয়ৎক্ষণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে আমাকে এই প্রকার প্রশ্ন করা এস্থলে তাঁহার অন্যায় হইয়াছে। কর্ণেল সাহেবের নিকট মহারাজা নন্দকুমারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহা আমি এই মাত্র বলিয়াছি এ প্রকার জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করিবার সম্বন্ধে উপরোল্লিখিত কারণ কয়েকটী ছাড়া আর ও দুই একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। মন্ত্রী সভার অন্যতম সভ্য Barwell সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে এ বিষয় আরও দৃঢ়রূপে প্রতি-পন্ন হইবে। তজ্জন্য আমি বারওয়েল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তিনিও আমার ন্যায় সেই সময়ে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারিয়াছিলেন কি না?''

এই প্রশ্নের উত্তরে বারওয়েল সাহেব* উঠিয়া বলিলেন "আমিও গবর্ণর সাহেবের ন্যায় মহারাজা নন্দকুমারের সহিত কর্ণেল সাহেবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। যে অভিযোগের একখানির নকল গবর্ণর সাহেব অদ্য Barwellকে দেখাইয়াছেন সেইরূপ আর এক খানি নকল আমার নিকট আছে।"

কর্ণেল মন্সন। আমি গবর্ণরকে বোর্ডের সম্মুখে নন্দকুমারের সহিত আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই মাত্র যে প্রশ্ন করিলাম যখন গবর্ণর সাহেব তাহার কোন সদুত্তর দিলেন না তখন আমি আর ঐ প্রশ্নের পুনরুত্থাপন বাসনা করি না। আমার বিশ্বাস এই সাধারণ লোকে গবর্ণরের বাক্যে যে প্রকার বিশ্বাস করিবে, মন্ত্রীসভার একজন সাধারণ সভ্যের বাক্যেও তদ্রূপ আস্থা প্রদর্শন করিবে। এই জন্য আমি বোর্ডের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি যে গবর্ণর ও বারওয়েল সাহেব উভয়েই এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য পান নাই। আমি পারসী বা অন্য কোন দেশীয় ভাষায় লিখিত কোন পত্র নন্দকুমারের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত পাই নাই বা দেখি নাই। এমন কোন কাগজ এ পর্য্যন্ত আমার হস্তগত হয় নাই যাহাতে গবর্ণরের বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগের উল্লেখ আছে।*—[ক্রমশঃ।]

---

* ইনিই সেই ঢাকার তন্তুবায় দিগের সর্ব্বনাশকারী বারওয়েল সাহেব। হান হেষ্টিং-সের প্রিয় মিত্র ও সর্ব্ব কার্য্যে সমর্থক ও সহযোগী।

* Bengal Secret Consultations.

তত্ত্বমসি।

"তৎ-ত্বম্-অসি' বেদের এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থটী কি ইহা লইয়া অদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদীগণের মধ্যে বিবাদ আছে; সে বিবাদ যেমন আছে তেমনি থাক, সে বিবাদ ভঞ্জন করা আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নহে। আমি "তত্ত্বমসি" কথাটী ভালবাসা শিক্ষার মুলমন্ত্র স্বরূপ বুঝি।

তৎ-ত্বম্-অসি অর্থাৎ তুমিই তাই। আমি যারে খুঁজি, যে সুন্দরের সৌন্দর্য্যে আমি মিশিতে চাই, তুমিই তাই—এই জ্ঞানটী যিনি পরিস্ফুট করিতে শিখিয়াছেন তিনিই যথার্থ ভালবাসা শিখিয়াছেন; আমি বলি তিনিই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিয়াছেন।

" মনের মানুষ খুঁজতে এসে
হলেম দিশে হারা
প্রাণে মারা যাইলো শেষে।"

বাউলদের এই একটী গান আছে। এই গানটির এই কথাগুলির ভিতর বড় গভীর ভাব আছে। এই জীবনে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া অবধি সদাই যেন কাহাকে খুঁজিতেছি; কি যেন একটা বড়ই অভাব রহিয়াছে, কিন্তু কিসে যে সে অভাব পূরিবে বুঝিতে পারিতেছি না। মাহশ্বেতার বিরহে পুণ্ডরীক আচ্ছোদ সরবরের তীরে প্রাণ হারাইয়া পরজন্মে বৈশম্পায়ন নাম ধারণ করিয়া যখন ঘটনাক্রমে আবার সেই আচ্ছোদ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার মনের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, মানুষ মাত্রেরই জীবনে সেই রকম একটা ভাব—অজ্ঞাত কারণ বশে মনের একটা চাঞ্চল্য ভাব—সদাই বিরাজমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। তবে কোন চিত্তে বা সেই ভাব প্রস্ফুটিত, কোথাও বা লুক্কায়িত। মানুষের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার ইহাই মনে হয় যে এই সংসারে আসিয়া মনের মানুষ খুঁজিয়া লওয়াই মানুষের প্রধান কাজ। কিন্তু মানুষ খুঁজিতে জানে না বলিয়া খুঁজিয়া পায় না; শেষে দিশেহারা হইয়া প্রাণে মারা যায়।

আমার মনের মানুষ আমার মনের ভিতর রহিয়াছে, আমি বাহিরে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু মনের ভিতর কখনও খুঁজি নাই তাই মনের মানুষ খুঁজিয়া পাই নাই। তোমরা যদি কেহ মনের মানুষ খুঁজিবার জন্য অধীর হইয়া থাক তবে অন্তরের ভিতর অন্বেষণ করিতে থাক; ভিতরের অন্ধকার যতই দূর করিতে পারিবে ততই দেখিবে যে তোমার কল্পনাপটে একটী সুন্দর পুরুষের প্রতিবিম্ব ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। ইহাঁকে ভাল করিয়া চিনিতে শিখ। এই দেবতাই তোমার মনের মানুষ; ইহাঁকে অন্তরের আড়াল করিও না।

মন্ত্রবলে মনোময় দেবতাকে শরীরী পদার্থে আবির্ভূত করিতে সক্ষম হওয়া যায়। মনের মানুষকে যদি বাহিরে আবির্ভূত করিতে চাও তবে 'তত্ত্বমসি' এই মন্ত্র সাধনা করিতে শিখ।

কর্ম্মসূত্রে যাহার সহিত বাঁধা থাকা নিবন্ধন এ জন্মে যাহার সঙ্গী হইয়া চিরজীবন কাটাইবে মনস্থ করিয়াছ সেই মূর্ত্তি সমক্ষে রাখিয়া তোমার ইচ্ছাবলে সেই মূর্ত্তিতে তোমার দেবতা আবির্ভূত হইয়াছেন ভাবিয়া লইয়া 'তুমিই সেই' 'তুমিই সেই' 'তুমিই সেই' এই মন্ত্র জপ করিতে থাক। এই পূজাপদ্ধতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিলে তোমার দেবতা বাহিরে আবির্ভূত হইবেন।

মনের মতন সুন্দর বাহিরে মিলে না। যদি বাহিরের সুন্দরের সহিত কথা কহিতে সাধ থাকে তবে সুন্দর গড়িয়া লইতে হইবে। যাহার সঙ্গে সদা সর্ব্বদা থাকিতে হয়, কথোপকথন করিতে হয় তাহাকে ভাল ভাবিতে ভাবিতে সে মন্দ থাকিলেও ভাল হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহাকে মন্দ ভাবিতে ভাবিতে সে ভাল হইলেও মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। যদি কাহাকেও তোমার ভালর আদর্শের ন্যায় ভাল করিতে চাও তবে তাহাকে সেই রকম ভাল বলিয়া ভাবিয়া লইতে হইবে। যাহাকে ভাল বলিয়া ভাবিবে তাহার সহিত ব্যবহার, কথাবার্ত্তাও ভাল ভাবেরই হইয়া থাকে। আদর্শ সুন্দরের সঙ্গে মনে মনে তুমি যেরূপ ভালবাসা-মাখা কথা ও ব্যবহার করিতে ভালবাস, বাহিরের সঙ্গীর সহিতও যদি সেইরূপ ভালবাসা-মাখা ব্যবহার ও কথা কহিতে শিখ, তবে তোমার সেই ভালবাসা, সেই কথা ও সেই ব্যবহারের গুণে তোমার সঙ্গী বদ্ধ হইয়া পড়িবে, তখন তুমি তাহাকে আস্তে আস্তে তোমার মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে সক্ষম হইবে। শেষে দেখিবে যে তোমার মনের মানুষ বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছে। এইবারে তুমি তাহাকে "তৎ-ত্বমসি" বলিয়া তোমার জীবনের চিরসাধ পুরাইতে সক্ষম হইবে। যিনি এইরূপ 'তত্ত্বমসি' শব্দ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই যথার্থ ভালবাসা শিখিয়াছেন।

এখন একটী কথা আছে। যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছি, তাহারে ভাল ভাবিয়া লইয়া তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিব, এরূপ ব্যবহার কপটাচার কি না? এরূপ ব্যবহারের ভিতর অসত্য আছে কি না? যদি কিছু অসত্য থাকে তবে এরূপ ব্যবহার কখনও ধর্ম্ম-সঙ্গত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে এই জগতে মানুষ কখন মন্দ হইতে পারে না। আমরা মানুষকে যে মন্দ বলিয়া বুঝি সেইটিই আমাদের ভ্রম, সেইটিই মিথ্যা। মানুষ মাত্রেই সুন্দর, তবে নানাবিধ ময়লায় জড়িত থাকায় আদত মানুষকে আমরা চিনিতে পারি না। কাদামাখা ঝিনুকের ভিতর মুক্তা আছে, যিনি মুক্তার আদর বুঝেন তিনি এই ময়লা ঝিনুককেও আদর করিয়া থাকেন।

যে মলায় মানুষকে কুৎসিৎ করে সেই ময়লাকে ঘৃণা করিও, কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করিও না। মানুষকে ভাল বাসিয়া, মানুষকে আদর করিয়া, মানুষের মনের ময়লা দূর করিতে সতত সচেষ্ট থাক।

কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। তুমি যদি এক জনকে উন্নত দশায় তুলিতে সচেষ্ট থাক তবে কর্ম্মের ফলে তোমার আপনার উন্নতি ক্রমশই সাধিত হইতে থাকিবে। পরকে আদর্শ পুরুষের ন্যায় সুন্দর করিতে গিয়া আপনি সেইরূপ সুন্দর হইয়া দাঁড়াইবে। 'তত্ত্বমসি' বলিতে বলিতে 'সোহং' বলিতে শিখিবে, অর্থাৎ "আমি যারে খুঁজি তুমিই সেই" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ইহা বুঝিতে পারিবে যে আমি যারে খুঁজি আমি নিজেই সেই দেবতা।

কমলাকান্ত এক দিন কোকিলের ডাকে মুগ্ধ হইয়া কোকিলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "তবে কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল এক বার ডাক-দেখিরে! কর্ণ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখন বলিতে পারিলাম না। যদি তোর ও ভুবনভুলান সুর পাইতাম ত বলিতাম।" আমি এই কথা গুলির উপর আরও দুটি কথা বেশী বলিতে চাই। "শ্রোতা পাই নাই বলিয়া কর্ণের চর্চ্চা কখনও হইল না, গলাসাধা হইল না বলিয়া আমার শ্রোতাও জুটিল না, এখন কি করি কোকিল বল দেখিরে! পাখী তোর ডাকে ভালবাসা মিশান আছে, তাই তোর সুন্দর ডাকে লোকে আকৃষ্ট হয়, আর আমার নীরস কর্কশ কথা কেউ শোনে না, পাখী একটু ভালবাসা দে দেখিরে!"

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

দুইটী প্রাণীতত্ত্ব।

পিপীলিকাদের বর্ণজ্ঞান।

পিপীলিকাগণ আলোককে বড় ভয় করে। যখন তাহাদের বাসার কোন দিক অনাবৃত করা যায়, তখন তাহারা মনে করে বুঝি কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহারা তাড়াতাড়ি শিশুদিগকে লইয়া অন্ধকারাবৃত স্থানে গমন করে। সার জন লাবক অনেক পরীক্ষা দ্বারা ঠিক করিয়াছেন যে যদি তাহাদের বাসার অধিকাংশ স্থান অনাবৃত থাকে, এবং ছোট একটু অংশ আবৃত থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিশুগণের সহিত পিপীলিকাগুলি সেই আবৃত অংশে গমন করিবে। এই ভয়ের হেতু অবলম্বন করিয়া সার জন দেখিতে চাহিলেন পিপীলিকাগণ নানা বর্ণের প্রভেদ বুঝিতে পারে কি না। সকলেই জানেন যে শ্বেত বর্ণ সূর্য্যালোকের একটী কিরণ যদি ঝাড়ের ত্রিকোণ বিশিষ্ট একটী কাচের ভিতর দিয়া চালান যায় তাহাহইলে সেই কিরণ বিভিন্ন প্রকার বর্ণযুক্ত সাতটি কিরণে বিভক্ত হইবে। এই কিরণ মালাকে spectrum কহে। এই স্পেক্‌ট্রাম এক সীমায় লাল অপর সীমায় ভায়লেট। লাল কিনারাটা আমাদের কাছে অন্যান্য রং হইতে খুব পৃথক্ লাগে; ভায়লেট তত নয়। কিন্তু এই কিরণ মালাতে আমরা যতগুলি

কিরণ দেখিতে পাই তাহা ছাড়া আরো কিরণ আছে, যাহাদিগের কতকগুলিকে উত্তাপ কিরণ (heat rays) এবং কতকগুলিকে রাসায়ণিক কিরণ (chemical rays) বলা যায়। এই সকল কিরণ আমাদের দৃষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত গুলি লাল ও দ্বিতীয়োক্ত গুলি ভায়লেট কিনারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এমতাবস্থায় সার জন লাবক পিপীলিকাদের দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টির ন্যায় একই প্রকার সীমাবদ্ধ কি না তাহা নির্দ্ধারণ করার জন্য নিম্নোক্ত পরীক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করেন। দুই খানি গ্লাস প্লেট ১.৮ইঞ্চি তফাং রাখিয়া—যেন পিপীড়াগুলি মুক্তভাবে নড়া চড়া করিতে পারে—তন্মধ্যে কতকগুলি সদ্যজাত শিশুকে মা বাপ সহিত রাখা হইল। তৎপরে নানা বর্ণের কাচ তদুপরি রাখিয়া দেখা গেল যে যদি একখানা ঈষৎ হরিদ্বর্ণের কাচ এবং এক খানা গাঢ় ভায়লেট বর্ণের কাচ পাশাপাশি রাখা যায়, তাহা হইলে পিপীলিকারা প্রথমোক্ত কাচের নীচে চলিয়া যায়। ইহা দ্বারা এই প্রমাণিত হইল যে হরিদ্বর্ণ আমাদের নিকট যত স্বচ্ছ তাহাদের নিকট তার চেয়ে কম।

এই মীমাংসার পর লাবক সাহেব, ভাবিলেন "এখন দেখা যাক, যে রাসায়ণিক কিরণ গুলি আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত তাহা তাহাদের কিরূপ লাগে?" পিপীলিকাদের বাসার ভিতরে স্পেকট্রাম নিক্ষেপ করিলে তাহারা রাসায়ণিক কিরণ ছাড়িয়া লাল রংএর নীচে চলিয়া গেল। ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত হইল? এই ঠিক হইল যে তাহারা রাসায়ণিক কিরণ গুলি খুব ভাল করিয়া টের পায়। আমরা সেই বর্ণের কোন ভাবই মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে পারি না।

২। মৌমাছিদের আচার ব্যবহার।

গত ফাল্গুনসংখ্যক "বালকে" পিপীলিকাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সার জন লাবকের এক বক্তৃতার সারাংশ অনুবাদ করিয়া দেখানগিয়াছে যে ইহাদের মধ্যে বেশ মায়ামমতা আছে। পীড়িতদিগকে সুস্থকায়েরা প্রাণপণে যত্ন ও শুশ্রূষা করে। মৌমাছিদের প্রকৃতি তাহাদের বিপরীত। সারজন লাবক বলেন "যখন কোন মাছি মধুতে একেবারে সর্ব্ব অঙ্গ মাখিয়া ফেলে তখন অন্যান্য মক্ষিকারা তাহাকে বার বার চাটে ইহা আমি বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু আমি কখনও তাহাদিগকে একটী জলমগ্ন মক্ষিকার উপর বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখি নাই। তাহাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকা দূরে থাকুক, তাহারা পরস্পরের সুখদুঃখের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। আমার মধ্যে মধ্যে দুই একটা মাছি মারিবার দরকার হইয়াছে। আমি কখনও দেখি নাই যে অন্য মাছিগুলি এই সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেয়। একদিন একটা মাছি আর একটার পাখা সংলগ্ন হইয়া মধু খাইতেছিল, এমন সময় পরীক্ষা করিবার জন্য আমি শেষোক্তটাকে খুব টিপিয়া ধরি। অপর মাছি তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া বেশ হৃষ্টচিত্তে ও

নিশ্চিন্ত মনে মধু খাইতে লাগিল। কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া সে জানে এমত বোধই হইল না। যখন আমার হাত উঠাইয়া নিলাম তখন আরও স্পষ্টরূপে বুঝিলাম, জীবিত মক্ষিকার একটুও ভয় বা দুঃখ হয় নাই। দ্বিতীয় আর একটী ঘটনাতেও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

আমি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে যখন কোন মক্ষিকা আহার করে, তখন যদি অন্য কোন দুর্ব্বল মক্ষিকা তাহার কাছে থাকে, তাহা হইলে সে তাহাকে ডানা দিয়া ধরিয়া রাখে এবং হাজার চীৎকার করিলেও ছাড়ে না। ইহাতে বোধ হয়, ইহারা ত স্নেহশীল নয়ই বরং একে অন্যকে বিষ নজরে দেখে।

অনেকে বলিয়া থাকেন মৌমাছিরা তাহাদের রাণী মক্ষিকার খুব ভক্ত। কিন্তু এ বৃত্তিও ত [illegible]দের বেশী রকম আছে বলিয়া বোধ হয় না। একদা আমি কালরাণী বদলাইয়া তাহার স্থানে এক বৃদ্ধ রাণীকে কতকগুলি শ্রামিক অর্থাৎ পুরুষ মক্ষিকা সহ একটা মধুপূর্ণ বাক্সে রাখি। ইহার পরদিন আমি কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করি। কয়েক দিন পরে বাড়ী আসিয়া দেখি মাছি গুলি রাণীকে অত্যন্ত শীর্ণ, অসহায় এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর কিছুদিন পরে আমাদের ঘরের জানালার কাছে এক মৌচাকে কতকগুলি মাছি আসিয়াছে দেখিয়া, আমি উক্ত রাণীকে তাহাদের নিকট রাখি। চলা ফিরার সময় তাহার গায়ে অনেকেরই শরীর লাগিল; কিন্তু কেহ কোন খবর নিল না।

মধুমক্ষিকাদের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করিবার শক্তি নাই। লাবক তাহা এইরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার টেবিলের উপর এক খানা মধুচাক রাখিয়া তাহাতে একটা মৌমাছি ছাড়িয়া দেন। যদিও এই মাছি কতকক্ষণ পরে তাহার সঙ্গীদের কাছে যাইত, তথাপি ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এই এক মাছি ছাড়া আর কেহ উক্ত চাকে আসে নাই।

মৌমাছিরা, পিপীলিকাদের অপেক্ষা একবর্ণ হইতে অন্য বর্ণ প্রভেদ করিতে পারে। তাঁহারা কমলা রং অপেক্ষা নীল রংকে অধিক ভাল বাসে। একখানি কমলা বর্ণের ও এক খানি নীলবর্ণের কাগজের উপর মধু রাখিয়া ও বার বার উহাদের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া স্যারজন লাবক দেখিয়াছেন যে মৌমাছিরা ফিরিয়া ফিরিয়া নীল রংএর কাগজস্থিত মধু খায়।

হ, চ, স।

মাধবাচার্য্য।

কর্ণাট দেশের মধ্যে তুঙ্গ ভদ্রা নদীর তীরে পম্পা নামে এক পুণ্যক্ষেত্র আছে। রামায়ণের সময় এই পম্পাক্ষেত্রে এক পবিত্র সরোবর ছিল, কাল কালান্তর অতীত হওয়ায় সরোবরটী এখন ক্ষেত্রাকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং সে স্থান এক্ষণে পম্পাক্ষেত্র বলিয়া

অভিহিত হয়। পম্পাক্ষেত্রের সন্নিকট প্রদেশে বিজয় নামে নগর ছিল। অতি আদিম কালে এই স্থানকে কিষ্কিন্ধ্যা বলিত। রামায়ণ-প্রসিদ্ধ কিষ্কিন্ধ্যা কাল সহকারে বিজয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল; এক্ষণে আবার তাহা গোলকোণ্ডা নামে খ্যাত হইয়াছে। রামায়ণ-পাঠী পাঠক যদি জানিতে চাহেন, কিষ্কিন্ধ্যাপুরী কোথায় ছিল, তাহাঁদের শিক্ষার জন্য আমরা বলিয়া দিতেছি, বর্ত্তমান গোলকোণ্ডাই রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা।

গোলকোণ্ডা দেশে বিরূপাক্ষ নামক মহাদেবের বিখ্যাত মন্দির আছে। মহাত্মা মাধবাচার্য্য এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা পৃথিবী আলোকিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর পাণ্ডিত্যসৌরভ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত, তৎকারণে ইনি কোনও দেশে অপরিচিত নহেন। এই মহাত্মা মাধব, মাধবাচার্য্য, মাধবার্য্য, ও মাধবামাত্য,—এই কয়েক নামে বিখ্যাত; কখন কখন ইনি রাজ আখ্যায়ও উল্লিখিত হইতেন। ইনি কর্ণাটদেশীয় যদুবংশীয় রাজা বুক্কদেবের কুলগুরু ও মন্ত্রসচিব ছিলেন, তৎকারণে ইনি অমাত্য সম্বোধনে সম্বোধিত হইতেন, কখন বা রাজা আখ্যাও প্রাপ্ত হইতেন। এই মহাত্মার মহাজীবনের ইতিহাস অত্যন্ত অদ্ভুত সুতরাং বিস্ময়াবহ। ইনি বাল্যে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে রাজকার্য্য ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা এবং বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। ইনি বেদশাস্ত্রে ব্যাসের ন্যায়, রাজশাস্ত্রে বৃহস্পতির ন্যায়, জ্ঞানে শিবের ন্যায় এবং যোগে যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি বলা হয় না।

বৈদ্যক, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, বেদ, বেদান্ত, অধিক কি ইনি সর্ব্বশাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন এবং স্বীয় পারদর্শিতার অনুরূপ বহুবিধ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগুরু এই উপাধি দ্বয় লাভ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য মাধব যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভারতের চির উপকার করিয়া গিয়াছেন সে সকল গ্রন্থের তালিকা এই—

১। ব্রহ্ম মীমাংসা শাস্ত্রের ১৯২ অধিকরণ। এই গ্রন্থের নাম "অধিকরণ-মালা"।

২। "অধিকরণ-মালার" টীকা।

৩। কর্ম্ম-মীমাংসার অধিকরণ। ইহার অন্য নাম "জৈমিনীয় ন্যায় মালা বিস্তর"।

৪। সর্ব্বদর্শনসারসংগ্রহ।

৫। অনুভূতি-প্রকাশ। ইহা বেদান্তসম্বন্ধীয় অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ।

৬। ব্রহ্মগীতা। (ইহাতে রামানুজ প্রভৃতির মত ও অদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন আছে)।

৭। "প্রকাশিকী" নাম্নী বেদান্তটীকা।

৮। পঞ্চদশী।

৯। জীবন্মুক্তিবিবেক। ইহা অপরোক্ষানুভূতির টীকা।

১০। মাধবীয় ধাতুবৃত্তি। (ইহাতে ২২০০ মূল ধাতু ও তাহার অর্থ আছে এবং ঐ সকল ধাতুতে যে যে প্রত্যয় যোগ করিয়া যে যে পদ সিদ্ধ হয় তাহা বর্ণিত আছে। পদসিদ্ধ করিবার উপায় বর্ণিত আছে এবং প্রত্যেক পদের উদাহরণও প্রদত্ত আছে। উদাহরণগুলি এরূপভাবে সংগৃহীত হইয়াছে যে পাঠ করিলে দর্শনশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি হইতে পারে. এই গ্রন্থ ২৫০০০ শ্লোকে সমাপ্ত।

১১। নিদানমাধব।*

১২। কালমাধব।

১৩। শতপ্রশ্নকল্পলতিকা।

১৪। পরাশরমাধব। (পরাশর স্মৃতির ভাষ্য)।

১৫। কালমাধব। (জ্যোতিষ)।

১৬। আচারমাধব।

১৭। ব্যবহারমাধব। (ইহাতে রাজকার্য্যের সমুদায় ব্যবস্থাই আছে)।

১৮। বিদ্যারণ্যকালজ্ঞান। (তৈল দেশের রাজাদিগের ইতিহাস)।

১৯। শঙ্করদিগ্বিজয়।

২০। মাধবীয় বেদার্থপ্রকাশ। (চারিবেদের ভাষ্য)।†

এই সকল গ্রন্থের সংস্কৃত সুমধুর, প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। পাঠ করিলে শরীরে পুলক হয়, মনে জ্ঞানের ও আনন্দের সঞ্চার হয়।

"অধিকরণ-রত্নমালা" গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে জানা যায় যে, আচার্য্য মাধব বিজয় নগরের যদুবংশীয় রাজা বুক্কদেবের মন্ত্রী ও কুলগুরু ছিলেন এবং রাজদত্ত বিপুল ঐশ্বর্য্য ও ভূসম্পত্তি সমস্তই তিনি সদ্ব্যয়ে ব্যয়িত করিয়াছিলেন। লাবা নগরে কতিপয় পরাক্রান্ত তুরষ্ক যবন বাস করিত, মাধব তাহাদিগকে জয় করিয়া তাহাদের সমস্ত অধিকার বুক্কদেবের অধীন করিয়া দিলেন; অবশেষে তাহাদিগকে দেশতাড়িত করিয়া দিলেন। এই ব্যাপারের কিছুকাল পরে ইনি সপ্তনাথ নামক মহাদেব স্থাপন করেন; অদ্যাপি তাহা তদ্দেশে বিখ্যাত আছে। গোলকোণ্ডার মধ্যে যে মাধবপুর নামে গ্রাম বিদ্যমান আছে, ঐ

---

* বঙ্গদেশের বৈদ্যেরা নিদানগ্রন্থ অধ্যয়ণ করেন। তাঁহারা জানেন যে, মাধব-নিদান মাধব রায় নামক বৈদ্যের রচিত। পরন্তু দাক্ষিণাত্যের লোকেরা জানে যে, মাধব-নিদান অথবা নিদান-মাধব মহাত্মা মাধবাচার্য্যের রচিত।

† যদিও বেদভাষ্য সকল সায়ণাচার্য্য-রচিত বলিয়া বিখ্যাত, তথাপি উহার রচনার সহিত মাধবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সায়ণাচার্য্য মাধবাচার্য্যের কনিষ্ঠ সহোদর। মাধবের উপদেশ ক্রমেই সায়ণ বেদভাষ্য লেখেন এবং স্বীয় অগ্রজের নামে প্রকাশিত করেন। এ বৃত্তান্ত আমরা অন্য প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

গ্রাম পূর্ব্বে কচোর নামে অভিহিত হইত। আচার্য্য মাধব উহা নিজ নামে অভিহিত করিয়া তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া ছিলেন; তদবধি তাহা মাধবপুর নামে পরিচিত হইতেছে। এই বিপুল দানের পরেও তিনি তাহার জননীর নামে অনেক ভূসম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন।

মাধবের গৃহ সন্নিকটে যে নদী ছিল, অদ্যাপি তাহা মাধবতীর্থ নামে খ্যাত আছে। ইহাঁর চরিত্রের ইতিহাসের আর একটী অঙ্ক আছে; তৎপাঠে জানা যায়, ইনি নানা স্থানে বিদ্যালয়, অন্নশালা, দেবমন্দির ও ছাত্রনিবাস বা মঠ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তত্তাবতের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। নিজরচিত গ্রন্থ সকল তালপত্র প্রভৃতিতে লিখিয়া ও লেখাইয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ও মঠে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাম্র পত্রে খোদিত করিয়া গিরিগুহায় ও মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত রাখিয়াছিলেন। ৬৭।৬৮ বৎসর পূর্ব্বে সেই সকল প্রোথিত ও গুহাস্থাপিত পুস্তকের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল এবং অদ্যাপি ২।৮ খান পাওয়া যাইতেছে, ইহা তদ্দেশবাসীদিগের প্রমুখাৎ শুনা যায়। অতএব, এরূপ অদ্ভুত চরিত্রের লোক এক্ষণে অতীব দুর্লভ।

এ সকল তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের কথা; এক্ষণে তাঁহার সন্ন্যাসী-জীবনের কথা বলিব।

আচার্য্য মাধব অতি ধার্ম্মিক ও সদাত্মা ছিলেন। তাহাঁর মন সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মরত থাকিত। শাস্ত্রোক্ত জপযজ্ঞাদিতে তাহাঁর নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। কথিত আছে যে, আচার্য্য মাধব ৪০ বৎসর বয়সের পর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। এরূপ শুনা যায় যে, তিনি উপাসনার দ্বারা গায়ত্রীদেবীকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিবার মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু ৪ বৎসর যাবৎ নিজে ও প্রতিনিধির দ্বারা নিরন্তর গায়ত্রী ধ্যান ও গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়াও তাহাঁর দর্শন লাভে সমর্থ হন নাই। এই কার্য্যের পরেই তাহাঁর বৈরাগ্যোদয় হয় এবং সংসারের প্রতি তাঁহার মিথ্যাত্ববোধ নিশ্চয় হয়। তখন তিনি স্বাশ্রমবিহিত অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ করিয়া বিধিবিধান ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন এবং "বিদ্যারণ্য স্বামী" অথবা "বিদ্যারণ্য মুনি" এই নূতন নাম ধারণ করিলেন। মাধব এখন শাঙ্করী মতের দণ্ডী, এবং তাঁহার উপাধিযুক্ত নাম এক্ষণে বিদ্যারণ্য স্বামী।

পরমহংস সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, মাধবাচার্য্য যে দিবসে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই দিবসেই বেদ মাতা গায়ত্রী তাঁহার নয়নগোচরে প্রাদুর্ভূত হইয়া বরদানে উদ্যতা হইলেন; কিন্তু তিনি কোনও বর প্রার্থনা করেন নাই। তখন তাঁহার সমস্ত কাম্য-কামনা পূর্ণ হইয়াছে; তাঁহার মনও তখন তৃষ্ণাশূন্য বা স্পৃহাশূন্য হইয়াছে; সুতরাং তিনি নিস্পৃহের ন্যায় পূর্ব্ব ইষ্টদেবীকে বিসর্জ্জন দিতে বা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অন্য এক প্রবাদ আছে যে আবির্ভূতা গায়ত্রী পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহার সম্মান রক্ষার্থ স্বীয় জন্মভূমি কর্ণাটের দারিদ্র-বিনাশ কামনায় অত্যল্প

কালের জন্য স্বর্ণবৃষ্টি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহাতে উক্ত কর্ণাট দেশে সপাদ প্রহর পর্য্যন্ত স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছিল। এই ব্যাপারের বা এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কর্ণাটী হিন্দু মাত্রেই বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে। সেই সময়ে কর্ণাট রাজ সেই দেববৃষ্টি স্বর্ণের দ্বারায় মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে উক্ত ঘটনার কথা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

বিদ্যারণ্য স্বামীর উত্তরাশ্রম কালের এইরূপ অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক কথা আছে। সাধু লোক মাত্রেই বলিয়া থাকেন, বিদ্যারণ্য স্বামীর উত্তর জীবন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির ন্যায় পবিত্র ও অদ্ভুত। তিনি অনেকসময়েই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি এক অরণ্যমধ্যে দুই খানি সুবর্ণ ইষ্টক নিপতিত দেখিয়া, ঐ ইষ্টকদ্বয়ের উপরে পৃথক দুই খণ্ড প্রস্তর রাখিয়া তদুপরি মনোৎসর্গ করিতেছিলেন; বাদসাহ সম্রাট সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে অসামান্য নিস্পৃহ লোক বিবেচনা করিয়া যথেষ্ট সম্মান ও আদর প্রদর্শন করতঃ কতিপয় গ্রাম জায়গির দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অত্যল্প মাত্রও ইচ্ছুক হন নাই।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি দীর্ঘ কাল কাশীবাস করিয়া অবশেষে শঙ্করাচার্য্য-স্থাপিত শৃঙ্গারী মঠে থাকিয়া জীবনাতিপাত করেন। জীবনের শেষ ভাগে শৃঙ্গারী মঠে থাকার অবস্থায় পঞ্চদশী" নামক সুপ্রসিদ্ধ বেদান্ত গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ছয় প্রকরণ রচনা সমাপ্ত হইলেই তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন; তৎকারণে তাঁহার গুরু ভারতী তীর্থ তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে অবশিষ্ট একাদশ প্রকরণ রচনা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

"পঞ্চদশী" গ্রন্থখানি এক ব্যক্তির কৃত নহে, ইহা লিপি-পরিপাটী দেখিলেও প্রতীত হয়। প্রথম ছয় প্রকরণ বিদ্যারণ্য-কৃত; অবশিষ্ট প্রকরণ তদীয় গুরু ভারতী তীর্থ কৃত; ইহা বেদান্তী লোকেরা বলিয়া থাকেন।

বিদ্যারণ্য মুনি যখন গার্হস্থ্য আশ্রমে ছিলেন, লোকে যখন তাঁহাকে মাধবাচার্য্য ও মাধবামাত্য বলিত, তখন তিনি "সর্ব্বদর্শনসারসংগ্রহ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থই তাঁহার প্রথম উদ্যম। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে ইনি সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু নামক পণ্ডিতকে নমস্কার করিয়াছেন। অনুমান হয়, সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু পণ্ডিত তাঁহার শিক্ষাগুরু। পঞ্চদশীর প্রারম্ভে ইনি শঙ্করানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীকে গুরু বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। অনুমান হয়, শঙ্করানন্দই বিদ্যারণ্যের ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশক সন্ন্যাস-গুরু। ইনি যখন "শঙ্করদিগ্বিজয়" গ্রন্থ লেখেন, তখন বিদ্যাতীর্থ নামক গুরুকে নমস্কার করিয়াছিলেন। এই বিদ্যাতীর্থ বোধ হয় তাঁহার দীক্ষাগুরু অর্থাৎ মন্ত্রোপদেষ্টা। এতদ্ভিন্ন, পঞ্চদশী-গ্রন্থের টীকাকার বলেন, বিদ্যারণ্য মুনির গুরু ভারতীতীর্থ স্বামী। মহারাষ্ট্রী ভাষায় "গুরু-চরিত্র" নামক এক খানি উৎকৃষ্ট ও মান্য গ্রন্থ আছে। এই পুস্তক শৃঙ্গারী মঠে আছে; সন্ন্যাসীরা ইহার পূজা করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, বিদ্যারণ্য মুনির গুরু

ভারতী তীর্থ। কেহ কেহ অনুমান করেন, ভারতী তীর্থ ও বিদ্যাতীর্থ একই ব্যক্তি।

মাধবের পিতার নামক মায়ণ ; মাতার নাম শ্রীমতী ; এবং বিখ্যাত সায়ণাচার্য্য ইহাঁর কনিষ্ঠ সহোদর। এই পরিচয় তাঁহার স্বকৃত পরাশর ভাষ্যের অবতরণিকাভাগে বর্ণিত আছে।*

কবিচরিত্র" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিত আছে, মাধব শালিবাহন অব্দের ১৩০০ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক খণ্ড তাম্র ফলক পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিত ছিল, "১৩১৩ শকের প্রজাপতি নামক বৎসরে বৈশাখ মাসে কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্য গ্রহণের সময় মাধব মাধবপুর নাম দিয়া "কচোর" গ্রামকে ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দান করিলেন।" এতদ্ভিন্ন শঙ্করাচার্য্যস্থাপিত শৃঙ্গারী মঠে যে গুরুপদ্ধতি লেখা আছে, তাহাতে লিখিত আছে মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য স্বামী জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের ৪০০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর ৮৪৫ সম্বৎ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ের উপরে ৪০০ বৎসর স্থাপন করিলে ১২৪৫ বৎসর লব্ধ হয়। মাধব যদি এই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আয়ু এক্ষণে ৬৯৭ বৎসর হইয়াছে, ইহা বলিতে পারি। কিন্তু মরাটী ভাষায় "গুরুচরিত্র" গ্রন্থ দেখিলে ও অন্যান্য প্রমাণ সঙ্কলন করিলে এই সংখ্যালব্ধ হয় না ; কিছু অন্যথা হইয়া যায়।

ভট্টোজী দীক্ষিতের "সিদ্ধান্তকৌমুদী" নামক ব্যাকরণ গ্রন্থে মাধব বৃত্তির উল্লেখ থাকায় মাধবের ভট্টোজী দীক্ষিত অপেক্ষা বহু প্রাচীনতা অনুমান হইতে পারে। ভট্টোজী দীক্ষিত ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, মাধব তাঁহার কতকাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের আশ্রয় লইতে হয়, নইলে ১০০ বৎসরের অধিক পাওয়া যায় না। ফল কথা এই যে, মহাত্মা মাধব ৭০০ বৎসরের লোক হউন বা না হউন, তিনি যে ৬৫০ বৎসরের পূর্ব্বের লোক, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

---

* "শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্ত্তির্মায়ণঃ পিতা।
সায়ণঃ সোমনাথশ্চ মনোবুদ্ধি সহোদরৌ।"

দেওঘরে অদ্ভুত ঘটনা।*

বাড়ী।

উত্তর

পশ্চিম

পূর্ব্ব

দক্ষিণ

বাড়ীর চারি দিকে যে কম্পাউণ্ড আছে তাহা পনের বিঘা জমী। কম্পাউণ্ডের চারি দিক কেয়া গাছের বেড়া দিয়া ঘেরা।

এই বাড়ী এক্ষণে বাবু প্রেমচাঁদ বড়ালের। এই বাড়ীর বারাণ্ডা ব্যতীত আর সকলই পাকা ছাত ওয়ালা।

১২৮৯ সালের ১০ই বৈশাখ। সন্ধ্যাকাল। সমস্ত দিন গরম বাতাস বহিয়া এখন থামিয়াছে। উত্তর বারাণ্ডার ট চিহ্নিত স্থানে আমরা সকলে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার এক ছোট ভগিনী আসিয়া বলিল যে পশ্চিমের ঘরে (খ চিহ্নিত ঘর) একটা বিকট শব্দ হইল এবং ঝুর ঝুর করিয়া কি পড়িল—যেন কে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কতকগুলা ঢিল ছড়াইয়া ফেলিল। কি একটা শব্দ শুনিয়া সে ভূত মনে করিয়াছে ইহা ভাবিয়া আমরা বলিলাম কিছুই নহে এবং সে কথায় মনোযোগ দিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে মেঘ উঠিয়া ঝড় আরম্ভ হইল। আমরা সকলে ঘরে ঢুকিলাম। ধূলা উড়িতে লাগিল, সমস্ত দরজা

---

* এইরূপ বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা যদি বহুপরিমাণে ঘটিতে দেখা যায় তাহা হইলে বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক দিগের নিকট ইহা হাসিবার বিষয় না হইয়া অনুসন্ধানের বিষয় হইতে পারে, এই আশায় আমরা এই বিবরণ প্রকাশ করিলাম। এ সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাসযোগ্য অন্য ঘটনা পাইলে তাহাও আমরা প্রকাশ করিতে পারি।—ভাঃ-সং

জানালা বন্ধ করা হইল। কিছু কাল ঝড় হইবার পর এক জন আসিয়া বলিল যে পশ্চিমের ঘরে (খ চিহ্নিত ঘর) কে ঢিল ফেলিতেছে। আমরা সকলে সেই ঘরে গিয়া জুটিলাম। দেখিলাম ঢিল নহে, ঘ চিহ্নিত ঘরের থ চিহ্নিত স্থানে একটী মাটীর পাত্রে অনেক দিন হইতে যে কাঁচা আমলকী রাখা হইয়াছিল, তাহাই টুপ্ টুপ্ করিয়া এক একটী উপর হইতে পড়িতেছে। আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভাই তখন বড় mischievous ছিল। আমরা ভাবিলাম ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য সে ঐরূপ করিতেছে, সুতরাং তাহার হাত ও কাপড় তল্লাস করিয়া দেখা গেল, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। তথাপি আমরা তাহার উপর নজর রাখিলাম। আবার একটী আমলকী টুপ্ করিয়া পড়িল—আমার ছোট ভাইয়ের উপর নজর ছিল—তাহাকে নড়িতে চড়িতে দেখিলাম না অথচ ফল পড়িল কোথা হইতে? ঘরের পশ্চিমের জানালার দুইটা খড়্‌খড়ি খোলা ছিল। সন্দেহ হইল বাহির হইতে হয়ত কেহ ফলগুলি ফেলিতেছে। সব খড়খড়ি ও সাসি বন্ধ করা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটা আমলকী পড়িল, ফলের গতি ঠিক উপর হইতে। উপরে চাহিয়া রহিলাম। আবার একটী পড়িল—সেটী যখন ঠিক মাথার উপরে তখন দেখিতে পাইলাম। ফল যে ঠিক্ উপর হইতেই আসিতেছিল, এবং পার্শ্বস্থ কোন ব্যক্তি ছুড়িয়া ফেলিতেছিল না তাহা তাহার গতি দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছিল। ঘরের চারি দিক বন্ধ, ঘরে যে কয়জন আছেন সকলেই নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান, তথাপি ফল পড়ে কোথা হইতে ইহার কিছুই ঠিকানা করিতে না পারিয়া ক্রমে আমাদের মনে ভূতের ভয় আস্তে আস্তে জাগিয়া উঠিতেছিল। আবার সন্দেহ হইল হয়ত ছাদের উপর চোর উঠিয়াছে, ছাদের কোন স্থানে হয়ত ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া ঐ ফলগুলি ফেলিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে, ভয় পাইলে কেহ আজ রাত্রে এ ঘরে থাকিবে না, তাহা হইলে ঐ ঘরে যাহা কিছু আছে চোরেরা তাহা নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইবে। এই সন্দেহ সকলেরই সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল, কেননা এ দেশে চোরদিগের নিয়ম যে তাহারা প্রথমে গৃহস্থকে নানা-প্রকারে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে, পরে সুবিধা বুঝিয়া যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদিগের বাটীতে চুরি হয়। যে দিন চুরি হয় সে দিন চোরেরা ইট ফেলিয়া ও বিকট শব্দ করিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। ছাদে নিশ্চয়ই চোর উঠিয়াছে ভাবিয়া আমরা দুই জন চাকরকে ছাতে পাঠাইলাম। তাহারা লাগ্‌ঠান লইয়া গিয়া দেখিল কেহ কোথায়ও নাই এবং ছাতের উপর কোথায়ও ফল প্রবেশ করান যায় এরূপ ছিদ্র নাই। এইবার আমাদিগের মনে ভূত বলিয়া অনেকটা বিশ্বাস হইল। আমরা "গ" চিহ্নিত ঘরে আসিয়া বলিলাম "আচ্ছা, যদি ভূত হয়, তবে এই ঘরে একটা ফল পড়ুক, তাহা হইলে আমরা ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিব।" এই কথা বলিবার ৮।১০ সেকেণ্ড পরেই ঠিক আমাদের সম্মুখে সজোরে একটী ফল পড়িল। এ ফলটী আমলকি নহে, বাদামের ন্যায় এক প্রকার অপরিচিত ফল। এ দেশীয় লোককে ঐ ফল পরে দেখান

হইলে তাহারা বলিয়াছিল যে উহা কি ফল তাহারাও জানে না, তবে পাহাড়ে কখন কখন তাহারা ঐরূপ ফল দেখিয়াছে। পুনরায় আমরা সকলে খ চিহ্নিত ঘরে গেলাম। সকলে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপারের আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে চ চিহ্নিত ঘরের ঝ চিহ্নিত জানালার একটা খড়খড়ি সজোরে উঠিল, ৩।৪ সেকেণ্ড খোলা থাকিয়া আবার সজোরে বন্ধ হইল—যতটুকু সময় খোলা ছিল তাহার মধ্যে বাহিরে একবার বিদ্যুৎ হইয়াছিল, তাহার আলোক স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। খড়খড়ে বন্ধ হইবার পরেই আমরা লণ্ঠন লইয়া দক্ষিণের বারাণ্ডায় আসিলাম এবং চাকরদ্বয়কে লণ্ঠন লইয়া কম্পাউণ্ডের সকল স্থান অনুসন্ধান করিতে বলিলাম। হয়ত কোন লোক (চোর) জানালা খুলিয়া আবার বন্ধ করিয়া তখনই পলাইয়াছে, আমাদের এই সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু বাড়ীর বারাণ্ডা হইতে কম্পাউণ্ডের বেড়া যতদূর ততদূর খুব দৌড়িয়া যাইতে যত সময় লাগিতে পারে তাহার মধ্যেই আমরা বাহির হইয়াছিলাম ও আলো লইয়া চাকর পাঠাইয়াছিলাম। চাকরেরা তন্ন তন্ন করিয়া ঝোপ্ ঝাপ্ সকল খুঁজিয়া আসিল, কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইল না। পুনরায় আমরা খ চিহ্নিত ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। তখনও ফল পড়িতেছে—তখন আর আমলকি নহে—দুই তিন প্রকার অপরিচিত আকৃতির ফল। ইতিপূর্ব্বে যতক্ষণ অন্তর ফল পড়িতেছিল এখন হইতে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিককাল অন্তর পড়িতে লাগিল। এই সময়ে আমার মাতাঠাকুরাণী 'ক' চিহ্নিত ছোট ঘরে কোন কার্য্যানুরোধে গমন করেন, সঙ্গে আমার ছোট ভগিনী যায়। ঐ ঘরে তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ থাকিলে পর ঐ ঘরের ড চিহ্নিত স্থানে থপ্ করিয়া একটা কি পদার্থ পড়িল। তখন ঐ ঘরের স চিহ্নিত দ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল, তাহার একটীও খড়খড়ি খোলা ছিল না এবং ঐ ঘরের সম্মুখের চ চিহ্নিত ঘরে দুইটী আলোক উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছিল। চ চিহ্নিত ঘরের ঝ চিহ্নিত জানালাটীও সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। সুতরাং স চিহ্নিত দ্বার হইতে কিম্বা চ চিহ্নিত ঘরের ঝ চিহ্নিত জানালা হইতে কেহ যে ঐ পদার্থ টী ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা হইতে পারে না। যে পদার্থটা পড়িল মা তাহা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু আমার ছোট ভগিনী ঐ দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া থাকাতে তাহা দেখিতে পায় নাই। চতুর্দ্দিক বন্ধ অথচ ঐ পদার্থটা পড়িল, এবং যেরূপ শব্দ করিয়া ও যে ভাবে পড়িল, উপর হইতে পড়িলে যেরূপ শব্দ হওয়া উচিত ও যেরূপ ভাবে পড়া উচিত সেইরূপ হইল দেখিয়া মা অত্যন্ত ভয় পাইয়া আমার ছোট ভগিনীকে লইয়া সে ঘর হইতে চলিয়া আসিলেন। আমরা খ চিহ্নিত ঘরে ছিলাম। তিনি আমাদিগকে ঐ ঘটনার কথা বলিলেন। আমরা ক চিহ্নিত ঘরে গেলাম। ড চিহ্নিত স্থানের প্রতি চাহিয়া সেখানে কিছুই নাই দেখিয়া স্তম্ভিতা হইয়া মা বলিলেন, "এ কি হল! আমি এইমাত্র এখানে একটা কালবর্ণের জিনিস্ পড়তে দেখে গিয়েছি। পড়বার প্রায় এক মিনিট পরে ঘর হইতে যাই, যাবার সময়ও দেখে গিয়েছি।" আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বাহির হইতে কোন লোক স চিহ্নিত দরজা দিয়া কোন রকমে ঐ কথিত

পদার্থটা ফেলিয়া, পরে মা চলিয়া যাইবার পর তাহা তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আমি ঐ দরজা কিরূপ বন্ধ আছে পরীক্ষা করিতে গেলাম; দেখিলাম উহা ভিতর হইতে দৃঢ়রূপে বন্ধ রহিয়াছে। মা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে তাঁহার কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই—তিনি সুস্পষ্টরূপে একটা কালবর্ণের পদার্থ পড়ার শব্দ শুনিয়াছেন, এবং প্রায় এক মিনিট ধরিয়া সুস্পষ্টরূপে তাহা দেখিয়াছেন। খ চিহ্নিত ঘরের ন চিহ্নিত স্থানে আমরা প্রায় গোলাকারে (in a circle) দাঁড়াইয়া এই শেষোক্ত ব্যাপারের আলোচনা করিতেছি, পার্শ্বে একটা প্রদীপ উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছে, এমন সময়ে আমাদিগের সকলের সম্মুখে circle এর মধ্যভাগে থপ্ করিয়া একটী আন্দাজ ৪ ইঞ্চি পরিমিত জিনিস পড়িল। মা অমনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এই জিনিস্টাই ঐ ঘরে পড়েছিল—আমি প্রায় এক মিনিট এটা দেখেছিলাম, এর আকার আমার বেশ মনে রয়েছে—ওঘরে যা পড়েছিল এটা যে সেই—সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।" এই ব্যাপারের পর এই সকল যে ভৌতিক ব্যাপার আমাদের সে বিশ্বাস অনেকটা গাঢ় হইল। যাহা হউক, ঐ পদার্থটা কি দেখিবার জন্য উঠাইয়া লইলাম, দেখিলাম উহা একখানা ব্যবহৃত পুরাতন শুষ্ক সাবান। ইহা যেরূপ শব্দ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে পড়িয়াছিল কতদূর উপর হইতে পড়িলে সেরূপ শব্দ হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য উহা প্রথমে খুব উঁচু হইতে তাহার পর আর একটু উঁচু হইতে এইরূপ দুই তিনবার ফেলিয়া দেখিলাম, আন্দাজ চারি হাত উপর হইতে ফেলিলে যেরূপ শব্দ হইল, প্রথম পড়িবার সময় সেইরূপ শব্দ হইয়াছিল। এই ঘটনার পর সে দিন রাত্রে আর কিছু হয় নাই। ঐ খ চিহ্নিত ঘরে যাঁহারা শয়ন করিতেন তাঁহারা সে রাত্রে আর তথায় শয়ন করিলেন না।

১৬ই বৈশাখ আবার এই ব্যাপারের পুনরাভিনয় হয়। সে দিন সমস্ত দিন প্রচণ্ড গরম বাতাস বহিয়াছিল। এখানে গ্রীষ্মকালে যে দিন গরম বাতাস বহে দেখা যায় সে দিন ফল ফুল বা পাতা গাছ হইতে উঠাইয়া রাখিলে ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায়—ফুল ও পাতা এত শুষ্ক হয় যে অতি সহজে তাহা গুঁড়াইয়া ফেলা যায় আর ফল অত্যন্ত বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই দিন অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইলেও এবং খুব গরম বাতাস বহিলেও যে ফলগুলি পড়িয়াছিল তাহার কোনটী একটু শুষ্ক বা বিকৃত দেখা যায় নাই—দেখিলে বোধ হয় যে নিঃসন্দেহ তাহা তৎক্ষণাৎ তুলিয়া আনিয়াছে। কোন কোনটীর বোঁটায় আটার ন্যায় আর্দ্র পদার্থও দেখা গিয়াছিল। নিকটে কোন স্থানে ঐ জাতীয় ফলের গাছ ছিল না, অথচ সদ্যঃ উৎপাটিত ফলের ন্যায় আকৃতি, এই ফল নিক্ষেপ কার্য্য মানুষের কাজ হইলে এরূপ হওয়া কখন সম্ভব নহে।

তৎপর দিন সন্ধ্যার পর গ চিহ্নিত ঘরের ট চিহ্নিত স্থানে রক্ষিত একটী দেরাজের উপর অত্যন্ত শব্দ করিয়া একটী বাদাম জাতীয় ফল পড়ে। যখন এই ফল পড়ে তখন বাহিরে চাঁদের আলো, সকল ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, গ চিহ্নিত ঘরের প ও ফ চিহ্নিত দ্বারের

সম্মুখে বারাণ্ডায় খাটের উপর পিতা মহাশয় শয়ান ছিলেন,* এবং দ ও ... চিহ্নিত ঘরের দ্বয়ের সম্মুখে বারাণ্ডায় বাড়ীর কেহ কেহ বসিয়াছিলেন।

এই তিন দিন এইরূপ ঘটনা হয়। ইহার পর প্রায় দেড় বৎসর কাল আমরা ঐ বাড়ীতে বাস করি, কিন্তু আর কখনও ঐরূপ কাণ্ড হয় নাই।

সাধারণের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে ভূতে ঢিল কিম্বা অন্য কোন বস্তু ফেলিলে তাহা কাহারও গায়ে পড়ে না। আমাদের বাড়ীতে কয়েক দিন যে সকল ফল পড়ে, তাহার একটীও কাহারও গায়ে পড়ে নাই।

যাঁহারা ভৌতিক ব্যাপার অনেক দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন উহা প্রথম রাত্রেই হয়। আমাদিগের বাটীতে তিন দিন যে কাণ্ড হইয়াছিল তাহা ১০টা রাত্রির পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া যাইত।

কোন কোন spiritualists বলেন এমন অনেক ভূত আছে যাহারা পবিত্র স্থানে অর্থাৎ যেখানে ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হয় সেখানে উপদ্রব করিতে পারে না। আমাদিগের বাটীর খ চিহ্নিত ঘরে প্রত্যহ পারিবারিক উপাসনা হইত। ঐ ঘরে কিম্বা ঐ ঘরের পার্শ্বস্থ ছ ও জ চিহ্নিত ঘর দুইটীতে উপরোক্ত ব্যাপারের কিছুই হয় নাই।

যে ব্যাপার বর্ণনা করিলাম তাহা যে ভৌতিক ব্যাপার, তাহা আমরা আজও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তবে যেরূপ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করা হইয়াছিল তাহাতে উহা ভৌতিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছু হওয়ার বড়ই কম সম্ভাবনা ইহাই আমাদিগের সংস্কার।†

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

ঊষা ও সন্ধ্যা।

মিলন দৃশ্য বড় চমৎকার! বিশেষতঃ দুইটী বিপরীত বস্তুর মিলন অতি সুন্দর। দুইটী জিনিষেরই সৌন্দর্য্য টুকু ফুটিয়া উঠে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য বিরাজ করে। আলো আর অন্ধকার দুইটী বিভিন্ন বস্তু। দুইটী পরস্পরের ঠিক বিপরীত। উষায় ও সন্ধ্যায় এই দুই জিনিষের মিলন দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* এমনি শব্দ হইয়াছিল যে আমি তাড়াতাড়ি গ চিহ্নিত ঘরে কি হইল দেখিবার জন্য আসিয়াছিলাম।—শ্রীরাজ নারায়ণ বসু।

† আমি নিজে ভূতে তত বিশ্বাস করি না। আমি এই বলি যে এই প্রকার ঘটনার নিগূঢ় কারণ কি তাহা মনুষ্য নির্ণয় করিতে অক্ষম।—শ্রীরাঃ।

বেশ ভূষায়ও সন্ধ্যা ও উষার মধ্যে কেমন একটা ঐক্য আছে। উষা সিন্দুর পরে—সন্ধ্যাও সিন্দুর পরে। উষার রক্তিম অধরে হাসি উথলিয়া উঠে—সন্ধ্যারও রক্তিম অধরে হাসি মাখান। কিন্তু উভয়ের হাসি যেন এক না। দুই জনের হাসি দুই রকমের। এক জনের হাসি কতকটা যেন বালিকার মত। উষা বালিকা। উষাকে দেখিলে মনে হয় যেন আলু থালু চুলে সে লাফা-লাফি করিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যার যেন কিছু গম্ভীর হাসি। উষাপেক্ষা সন্ধ্যা যেন জগতের সুখ দুঃখ বুঝে বলিয়া মনে হয়। উষা ছোট মেয়ে। ফুল তুলিয়া লাফা লাফি করিয়া বেড়াইতে সে পটু। তাহার যেন ঐ কাজ! সন্ধ্যা যুবতী—উষার মত নিতান্ত ছোট মেয়ে নয়। সে সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া দু'দণ্ড ছাতে আসিয়া বসে। আবার খানিক পরে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যায়। সন্ধ্যার সিন্দুর রাগে সন্ধ্যাকে সধবা বলিয়া মনে হয়। উষার সিন্দুর রাগ দেখিলে মনে হয় উষা এখনও কুমারী—যেন দিদির কৌটা হইতে খানিকটা সিন্দুর লইয়া পরিয়াছে।

উষা বসন্তের গালভরা হাসির টুকরার মত ছুটা ছুটি করিয়া আসে, ছুটা ছুটি করিয়া যায়। সে জগৎকে মালা গাঁথিয়া পরাইবার জন্য আঁচল ভরিয়া কত ফুল লইয়া আসে—নিঃসঙ্কোচে টুপ্ টাপ্ করিয়া ফুল পাড়িয়া আঁচল ভরিয়া ফেলে। সন্ধ্যার সহসা ফুলগুলি তুলিতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়। শুভ্র হাসির মত প্রাণের মত স্বর্গের ফুলগুলিকে সে কেমন করিয়া তুলিবে—কেমন করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গের শান্তি হইতে মর্ত্ত্যের কোলাহলে লইয়া আসিবে! কিন্তু ফুলেরা দু'টী বোনকে বড় ভাল বাসে। দুটী বোনের কাছে থাকিতে পারিলে তাহারা আর কিছুই চাহে না। উষা তাহাদের লইয়া খেলা করে বলিয়া তাহাদের কত আনন্দ, সন্ধ্যাকেও তাহারা প্রাণের মত ভালবাসে। সন্ধ্যা পাছে মর্ত্ত্যের কোলাহলে তাহাদের স্বর্গের শান্তি ডুবিয়া যায় এই ভাবিয়া তাহাদিগকে সহজে আনিতে চাহে না। কিন্তু তাহারা সন্ধ্যার সঙ্গে না আসিয়া থাকিতে পারে না। সন্ধ্যা কাজে কাজেই অতি সন্তর্পণে তাহাদিগকে লইয়া আসে।

উষাকে আমরা স্নেহ করি। সে প্রত্যহ আমার বিছানার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়—তাহার কচি কচি হাত দু'খানি দিয়া আমাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া দেয়। আমার ঘুম ভাঙ্গিলেই উষা ক্রমে ক্রমে সরিয়া যায়। অনেক ক্ষণ ধরিয়া ডাকা ডাকি করিলেও সে দিন আর ফিরে না।

সন্ধ্যা যেন কতকটা আমাদের সুখ দুঃখের কথা বুঝে, সন্ধ্যার সঙ্গে আমরা কত কি সাংসারিক কথা-বার্ত্তা কই। জীবনটার কথা সন্ধ্যার সময় মনে পড়িয়া যায়। জীবনটা কি রকমে কাটিবে, জীবনের দশা কি হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। সন্ধ্যা আমাকে অনেক উপদেশ দেয়—জীবন, সংসারের বিষয় অনেক শিক্ষা দেয়। সন্ধ্যা সংসারের সব বেশ বুঝে। সে বলে যে, সংসারে থাক কিন্তু সংসারেই থাকিও না। সন্ধ্যার সময়টা এই রকমেই কাটিয়া যায়।

উষা সন্ধ্যার ছোট বোন। সন্ধ্যা ঘরকন্না দেখে, উষা খায় দায় হাসে খেলে। সন্ধ্যা ঘরে ফিরিয়া গিয়া উষার মুখে একটী স্নেহের চুম খায়। প্রত্যহ উষা আসিবার সময় সন্ধ্যা তাহার গায়ে মাথায় ছোট ছোট সাদা সাদা ফুল দিয়া সাজাইয়া দেয়।

সন্ধ্যা গোলাপ ফুল—তাহার হাসি খানি গোলাপের মত; উষা শিউলী ফুল—তাহার হাসিটী শিউলির মত।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ।

অদ্বৈত বাদের মূল আকর শাঙ্কর ভাষ্য প্রথমেই বিষয় এবং বিষয়ীর ভেদ নিনরূপণ করিয়াছেন ; তাহার পর ক্রমশঃ বিষয়কে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া বিষয়ীকেই সর্ব্বস্ব করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈত বাদের কলহ সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য আমরা আপাততঃ মায়াবাদ প্রভৃতি অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে (আত্মা এবং অনাত্মার মধ্যে) ভেদই বা কিরূপ, এবং অভেদই বা কিরূপ, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বিষয় এবং বিষয়ীর ভেদ নিরূপণের পূর্ব্বে বিষয় শব্দে আমরা কি বুঝি তাহা স্থির করা আবশ্যক। . বিষয় বলিবা-মাত্র সহসা জড় বস্তুই আমাদের মানস-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। কিন্তু স্বপ্নের বস্তু-সকল জড় বস্তু নহে ; তবে কি তাহারা বিষয় নহে ? অবশ্যই তাহারা আমাদের জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞান যাহা কিছু লইয়া ব্যাপৃত হয়, তাহাই জ্ঞানের বিষয়। শূন্য আকাশ এবং শূন্য কাল নিতান্তই অবস্তু, তথাপি উভয়েই জ্ঞানের বিষয়। আবার আলোকই যে কেবল জ্ঞানের বিষয় তাহা নহে, অন্ধকারও জ্ঞানের বিষয় ; উত্তাপই যে কেবল জ্ঞানের বিষয় তাহা নহে, শৈত্যও জ্ঞানের বিষয় ; শব্দই যে কেবল জ্ঞানের বিষয় তাহা নহে, নিস্তব্ধতাও জ্ঞানের বিষয় ; তা শুধু নয়, আত্মা আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয়। নিম্নের কয়েকটা পংক্তি বেদান্ত দর্শনের শাঙ্কর ভাষ্য হইতে (এক কথায়, শাঙ্কর দর্শন হইতে) উদ্ধৃত ;—

যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্চ প্রত্যগাত্মনো বিষয়ত্বং ব্রবীষি ?
ন তাবদয়ং একান্তেনাবিষয়ঃ। অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ ॥

ইহার অর্থ

প্রশ্ন। যাহা "আমি" ভিন্ন আর কোন কিছু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, সেই নিকটতম আত্মাকে তুমি বিষয় বলিতেছ ?

উত্তর। আত্মা একান্তই যে বিষয় নহে, তাহা নহে ; যেহেতু আত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের (অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের) বিষয়।

ইহাতে এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে. অনাত্ম-বিষয়ই যে কেবল, বিষয়, তাহা নহে, আত্মাও বিষয়—আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয়। পুনশ্চ পঞ্চদশীর গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন

" অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ ন তু ক্বচিৎ "

আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মা শুধু যে কেবল জ্ঞেয় বিষয় তাহা নহে, কিন্তু তাহা জ্ঞানের নিরন্তর-জ্ঞেয়—চির-জ্ঞেয়—বিষয়; আত্মা যখন যে কোন অনাত্ম-বিষয় জানে, তাহারই সঙ্গে সে আপনাকে জানে; আত্মা আপনাকে না জানিয়া কোন অনাত্ম বিষয়কেই জানিতে পারে না। পঞ্চদশীর এই কথাটী যে কত ঠিক্, তাহা নিম্নলিখিত কথোপকথনে প্রকাশ পাইবে;—

অনাত্মবাদী॥ আমি উপন্যাস-পাঠে এমনি নিমগ্ন ছিলাম যে, আমি যে পাঠ করিতেছি সে বোধ আমার ছিল না।

আত্মবাদী॥ এখন অবশ্য তোমার স্মরণ হইতেছে যে, তুমিই পাঠ করিতেছিলে?

অনাত্মবাদী॥ সে কি কথা! এখন যদি তাহা আমার স্মরণ না হইবে, তবে তোমার নিকট কিরূপে আমি সে কথার উল্লেখ করিতে সমর্থ হইব। তুমি কি সত্য সত্যই মনে কর যে, আমি পাঠ করিতেছিলাম—ইহা আমার মনে নাই অথচ মুখে বলিতেছি? এতই কি তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাহরাও!

আত্মবাদী॥ আমার দোষ কি? তুমিই তো বলিলে যে, উপন্যাস-পাঠের সময় তোমার এ জ্ঞান ছিল না যে, তুমি পাঠ করিতেছ। ভুক্ত বস্তরই রোমন্থন হয়, জ্ঞাত বস্তরই স্মরণ হয়—এইতো জানি! তুমি বলিতেছ যে, পাঠ-কালে তোমার এ জ্ঞান ছিল না যে, তুমি পাঠ করিতেছ. আর, এখন তোমার স্মরণ হইতেছে যে, তুমিই পাঠ করিতেছিলে! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কোনকালেই তোমার জানা ছিল না, অকস্মাৎ এখন তাহা তোমার স্মরণে উদ্বোধিত হইয়া উঠিল! যে ব্যক্তির সহিত তোমার কোন জন্মেই সাক্ষাৎকার নাই, সে ব্যক্তিকেও তুমি তবে স্মরণ করিতে পার! এটি তোমার কাছে আজ আমি নূতন শুনিলাম! এ যদি বলিতে যে, উপন্যাসের প্রতি তোমার পোনেরো আনা মনোযোগ ছিল, আর, তোমার আপনার প্রতি কেবল এক আনা মাত্র মনোযোগ ছিল, তাহা হইলে কোন হানি ছিল না; কিন্তু তুমি বলিতেছ যে, পাঠকালে তুমি মূলেই জান না যে, তুমি পাঠ করিতেছ; আর, তখন যাহা তুমি মূলেই জান না, এখন—তাহাই তোমার স্মরণ হইতেছে! অগ্রে সাক্ষাৎজ্ঞান—পরে স্মরণ, এইতো জানি সম্ভবে; কিন্তু সাক্ষাৎ-জ্ঞানের নাম-গন্ধও নাই—অথচ স্মরণ! এটা তো কিছুতেই আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির গলাধঃকরণ হইতেছে না!

অনাত্মবাদী॥ আমাকে মার্জ্জনা কর,—আমারই ভুল। উপন্যাস-পাঠের সময় এটি আমি অবশ্যই জানিতেছি যে, আমিই পাঠ করিতেছি; নহিলে এখন তাহা আমার স্মরণাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারিত না। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই ঠিক্;—তখন উপন্যাসের প্রতি আমার যেরূপ পোনেরো আনা মনোযোগ ছিল, তাহার তুলনায় আমার আপনার প্রতি অতীব যৎসামান্য মনোযোগ ছিল,—এই মাত্র; আপনার প্রতি মনোযোগ যে, একে-বারেই ছিল না, তাহা হইতেই পারে না। এখন বুঝিলাম যে, আত্মজ্ঞান শুধু যে কেবল

আমাদের স্মরণেরই সহচর তাহা নহে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গের সঙ্গী; সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান যেমন সাক্ষাৎজ্ঞান, আত্মজ্ঞানও সেইরূপ সাক্ষাৎজ্ঞান।

অতএব পঞ্চদশীর এ কথাটি অখণ্ডনীয় যে, "আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।" তবেই হইল যে, আত্মাও জ্ঞেয় বিষয়—আপনি আপনার জ্ঞানের বিষয়; তা শুধু নয়, আপনি আপনার জ্ঞানের নিরন্তর-জ্ঞেয় বিষয়। জ্ঞেয় বিষয় অনেক আছে; ঘটি একটী জ্ঞেয় বিষয়, বাটি একটী জ্ঞেয় বিষয়, ইত্যাদি; কিন্তু উহাদের কেহই জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সহচর নহে—জ্ঞানের নিরন্তর-জ্ঞেয় নহে। আত্মাই কেবল জ্ঞানের একমাত্র নিরন্তর-জ্ঞেয়। অতএব বিষয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—আত্মা এবং অনাত্মা। অনাত্ম-বিষয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—অবাস্তবিক (যেমন স্বপ্নের বস্তু) এবং বাস্তবিক (যেমন ঘটপটাদি)। বাস্তবিক বিষয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—উপস্থিত (যেমন দৃশ্যমান বিষয়) এবং অনুপস্থিত (যেমন স্মরণ-গম্য বিষয়)। অবাস্তবিক বিষয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—মনোময় (স্বপ্ন, মনোরাজ্য ইত্যাদি) এবং অভাবরূপী (আলোকের অভাব অন্ধকার, শব্দের অভাব নিস্তব্ধতা, স্পর্শের অভাব অসাড়তা, জড় বস্তুর অভাব শূন্য আকাশ, ক্রিয়ার অভাব শূন্যকাল ইত্যাদি); সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে;—

বিষয় যে কি, তাহা এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে। জ্ঞান যাহা কিছু লইয়া ব্যাপৃত হয় তাহাই বিষয়; তা সে—আত্মাই হউক্ আর অনাত্মাই হউক্, বাস্তবিকই হউক্ আর অবাস্তবিকই হউক্, উপস্থিতই হউক্ আর অনুপস্থিতই হউক্, মনোময়ই হউক্ আর অভাবরূপীই হউক, তাহাতে আইসে যায় না। বিষয় কি—তাহা তো এই দেখা গেল; এখন বিষয় নয় কি—তাহা দেখা যা'ক্। যাহা জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বহির্ভূত—তাহাই অবিষয়। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, জড়বস্তু যখন জ্ঞানের বিষয়-শ্রেণী-ভুক্ত, তখন জড়বস্তুর অভাব জ্ঞানের অবিষয়; কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে। জড়বস্তুর অভাব-রূপী শূন্য আকাশ, আলোকের অভাব-রূপী অন্ধকার, এইরূপ যত কিছু অভাব আছে সমস্তই জ্ঞানের বিষয়, তাহাদের কোনটিই জ্ঞানের অগোচর নহে। কিন্তু জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বহির্ভূত বস্তু যে, কি, তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইতে পারে না; শুধু যে কেবল আমাদের নিজের জ্ঞানেই তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহা নহে;—কোন-জ্ঞানেই তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না; কেননা সেরূপ বস্তু কোন একটি জ্ঞানে প্রকাশ পাইলেই প্রমাণ হইবে যে, জ্ঞানের সহিত তাহার সহিত প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ রহিয়াছে,—তবে আর কেমন

করিয়া সে বস্তু জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বহির্ভূত ? অতএব যাহা জ্ঞানের সহিত একেবারেই সম্বন্ধ বহির্ভূত—যাহা কোন জ্ঞানেই—কোন সূত্রেই প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহাই অবিষয়। মনে কর একটা কলস সমুদ্র-গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে, ও তাহা ঐশ্বরিক জ্ঞান ভিন্ন আর কোন জ্ঞানেরই গ্রাহ্য নহে ; ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন, এ বৃত্তান্তটি যদি গণনা হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সেই জ্ঞান-বহির্ভূত অবস্থায় কলসটি কি ভাব ধারণ করে ? তাহার রূপরসাদি গুণ-সকল জ্ঞান-গোচরেই প্রকাশ পাইতে পারে, সুতরাং তাহার বর্ত্তমান অবস্থায়—জ্ঞানের অগোচর অবস্থায়—তাহার রূপরসাদি নাই ; তবে কি কলসটির উজ্জ্বল বর্ণ অন্ধকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে ? আলোকের ন্যায় অন্ধকারও জ্ঞান-গোচরেই প্রকাশ পায় ; সুতরাং জ্ঞানের অগোচরে তাহার যেমন বর্ণ নাই, তেমনি অন্ধকার রূপী অবর্ণও নাই ; তাহার যেমন শব্দ নাই, তেমনি নিস্তব্ধতারূপী অশব্দও নাই ; তাহার যেমন সত্তা নাই, তেমনি শূন্য আকাশরূপী অসত্তাও নাই। সুতরাং তাহা সৎ এবং অসৎ (অর্থাৎ কোন কিছু এবং কিছুই না) দুয়ের বা'র। জ্ঞানের ঐকান্তিক অবিষয়ের এই যেরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, বেদান্তসারে অবিদ্যার ঠিক এইরূপ লক্ষণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; যথা ;—

"সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ"

যাহাকে সৎও বলিতে পারা যায় না—অসৎও বলিতে পারা যায় না, যাহা ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞান-বিরোধী, ভাবরূপী একটা কিছু।

জড়বস্তু স্বরূপাবস্থায় (অর্থাৎ কোন জ্ঞানেরই সহিত কোন সম্পর্ক নাই এরূপ অবস্থায়) অবিদ্যা শব্দের বাচ্য। কিন্তু জড়বস্তু যে অংশে জ্ঞানের গোচর সে অংশে তাহা অবিদ্যা নহে। জ্ঞান স্পর্শ-মণি তুল্য ; তাহার সংস্পর্শমাত্রে অবিদ্যা বিদ্যায় পরিণত হয়, স্ববিরোধী অবিরোধীতে পরিণত হয়—অনির্ব্বচনীয় সুনির্ব্বচনীয়ে পরিণত হয়। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বতঃস্ফুরিত জ্ঞানালোক হইতে কোন কিছুই লুকাইয়া থাকিতে পারে না, এ জন্য সর্ব্বজ্ঞের নিকট অবিদ্যা থাকিতে পারে না। অবিদ্যার অর্থ উপরে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই ;—অবিদ্যা নিতান্তই জ্ঞান-বহির্ভূত ; তাহাকে যদি "কিছু না" বলা যায় তবে তাহা অন্ধকারাদির ন্যায় অভাব পদার্থ হইয়া দাঁড়ায় ; কিন্তু অন্ধকার জ্ঞানের নিকটেই অন্ধকার, নিস্তব্ধতা জ্ঞানের নিকটেই নিস্তব্ধতা, শূন্য আকাশ জ্ঞানের নিকটেই শূন্য আকাশ ;—অভাব পদার্থও জ্ঞানের গোচর ; তবে আর তাহা জ্ঞান-বহির্ভূত হইল কই ? জ্ঞানের অবিষয় যে, অবিদ্যা, তাহা একেবারেই জ্ঞান-বহির্ভূত ; সুতরাং তাহা যেমন ঘটপটাদির ন্যায় ভাবপদার্থ নহে, তেমনি অন্ধকারাদির ন্যায় অভাব পদার্থও নহে ; তাহা যে, কিছু, তাহাও নহে, আর, তাহা যে, কিছু না, তাহাও নহে ; তাহা "কিছু-অথচ-কিছুনা" এইরূপ একটা জ্ঞান-বিরোধী অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তকে যেমন "আছে" বলিবামাত্র তাহা নাই,—আছে

যে—তাহাও নহে, নাই যে—তাহাও নহে,—অবিদ্যা ঠিক্ সেইরূপ একটা স্ববিরোধী পদার্থ। জ্ঞানে প্রকাশ পাইলেই অবিদ্যা আর অবিদ্যা থাকে না—অমনি তাহা বিদ্যা হইয়া দাঁড়ায়; জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়া-টাই অবিদ্যার মৃত্যু, এবং সেই মৃত্যুই তাহার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য; অবিদ্যার জীবন-গর্ভেই তাহার মৃত্যুর বীজ নিহিত অছে, সে বীজ-টি আর কিছু নয়—জ্ঞানের নিকট প্রকাশ-যোগ্যতা, অথবা যাহা একই কথা—আপনার মরণ-যোগ্যতা। যে অংশে অবিদ্যা মরণ-যোগ্য—অর্থাৎ জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য—সেই অংশে তাহা সত্ত্ব-গুণ। কিছু অথচ কিছুনা—এই যে এক অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান-বিরোধী পদার্থ, ইহাঁর যে অংশটী কিছুর দিক্ ঘেঁসা—সত্তার দিক্ ঘেঁসা—সেই অংশটি সত্ত্ব-গুণ; সৎ এবং সত্তা এ দুয়ের একই অর্থ। অবিদ্যার যে অংশটি কিছুনা'র দিক্ ঘেঁসা—অভাবের দিক্ ঘেঁসা—সেই অংশটি তমোগুণ; আর অবিদ্যার যে অংশটী কিছু এবং কিছুনা'র—ভাব এবং অভাবের—বিরোধ-ঘেঁসা, সেই অংশটীই রজোগুণ। রজোগুণই অবিদ্যার জীবন, সত্ত্বগুণই অবিদ্যার মৃত্যু, তমোগুণই অবিদ্যার উপজীবিকা। এই জন্য অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানের বিষয়ই বা কি এবং অবিষয়ই বা কি তাহা দেখা গেল; জ্ঞান যাহা কিছু লইয়া ব্যাপৃত হয় তাহাই জ্ঞানের বিষয়, আর, অবিদ্যা যাহা একেবারেই জ্ঞান-বিরুদ্ধ, তাহাই জ্ঞানের অবিষয়। এখন আত্মা এবং অনাত্মা এ দুয়ের মধ্যে কিরূপ ভেদাভেদ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যা'ক্।

পঞ্চদশীর গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন

অহম্বৃত্তি রিদম্বৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহম্বৃত্তিরিদম্বৃত্তির্মনোভবেৎ॥
অহম্প্রত্যয়বীজস্থ মিদম্বৃত্তেরিতি স্ফুটং।
অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ ন তু ক্বচিৎ॥

অন্তঃকরণের বৃত্তি দুই প্রকার,—অহম্বৃত্তি (অর্থাৎ আত্ম-বিষয়ক বৃত্তি) এবং ইদংবৃত্তি (অর্থাৎ অনাত্ম বিষয়ক বৃত্তি)। অহম্বৃত্তিই বিজ্ঞান এবং ইদম্বৃত্তিই মন। ইহা অতীব স্পষ্ট যে, অহম্প্রত্যয় (আত্মজ্ঞান) ইদম্বৃত্তির (বিষয় জ্ঞানের) বীজ স্বরূপ; কারণ আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।

জ্ঞান মাত্রেরই দুইটি বৃত্তি; তাহার মধ্যে একটি আপনাকে লইয়া ব্যাপৃত হয়—এইটিই অহম্বৃত্তি; আর-একটী অনাত্ম-বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হয়—এইটীই ইদম্বৃত্তি। এখানে আরো এই বলা হইয়াছে যে, অহম্বৃত্তিই বিজ্ঞান, ইদম্বৃত্তিই মন। এই শেষোক্ত বাক্যটির অর্থ কি? বিজ্ঞান এবং মন এ দুই শব্দের অর্থ অনেকে অনেক প্রকার বোঝেন, কিন্তু এখানে তাহার প্রকৃত অর্থ-টি পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অহংবৃত্তিকেই বা কেন বিজ্ঞান বলা হইল, আর, ইদম্বৃত্তিকেই বা কেন

মন বলা হইল, ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা অতীব আবশ্যক। জ্ঞানের যে-বৃত্তি সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভ তাহাই বিজ্ঞান, আর, যে বৃত্তি বিশেষ বিশেষ বিষয়-গর্ভ তাহাই মন। সাধারণ তত্ত্ব অবধারণ পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ পরীক্ষিত বিবরণ দ্বারা তাহার অঙ্গ-পুষ্টি করাই বিজ্ঞানের এক-মাত্র কার্য্য। যে-কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্র হউক না কেন (যেমন জ্যোতিষ) তাহার সমস্ত সাধারণ তত্ত্বগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে বিশেষ বিশেষ বিবরণ, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বিজ্ঞান নামের অযোগ্য। কাণ্ট, যিনি ইউরোপীয় তত্ত্ববিদ্‌গণের সর্ব্বাগ্রগণ্য, তাঁহার মতে অহম্বৃত্তি ('The I think' অর্থাৎ আমি চিন্তা করিতেছি বা আমি জানিতেছি এই ব্যাপারটি) এমনি একটি ব্যাপকতম সাধারণ তত্ত্ব যে, তাহা বিজ্ঞানের সমস্ত মূলতত্ত্বের ভিত্তিমূল। অতএব পঞ্চদশীর এই যে, একটি কথা যে, অহম্বৃত্তিই বিজ্ঞান, এ কথাটি কেহ যে "সেকেলে" বলিয়া উড়াইয়া দিবেন তাহার জো নাই। অহম্বৃত্তি বাস্তবিকই সাধারণ-তত্ত্ব-সকলের শিরোমণি। ইদম্বৃত্তির যে কোন বিষয় ধর না কেন—যেমন ঘট—তাহা আমাদের জ্ঞানাভ্যন্তরে থাকিলেও থাকিতে পারে—না-থাকিলেও না থাকিতে পারে,—ঘটের পরিবর্ত্তে পট থাকিতে পারে, পটের পরিবর্ত্তে আর একটা কিছু থাকিতে পারে; অতএব ঘটপটাদি বিষয়-সকল জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ সময়ের বিশেষ বিশেষ বিষয়—সকল সময়ের সাধারণ তত্ত্ব নহে; কিন্তু যখন আমি ঘট জানিতেছি, তখনও আমি জানিতেছি যে, আমিই জানিতেছি,—যখন আমি পট জানিতেছি তখনও আমি জানিতেছি যে, আমিই জানিতেছি; সুতরাং আমি জানিতেছি (কাণ্টের 'The I think') এই যে একটা ব্যাপার, ইহা জ্ঞানের কোন বিশেষ সময়ের বিশেষ বৃত্তান্ত নহে, কিন্তু সকল সময়েরই সাধারণ তত্ত্ব। তবেই হইতেছে যে, অহম্বৃত্তি সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভ; পূর্ব্বে বলিয়াছি (এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র মাত্রই আমাদের এই কথার যথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে) যে, জ্ঞানের যে বৃত্তি সাধারণ-তত্ত্ব-গর্ভ তাহাই বিজ্ঞান শব্দের বাচ্য; অতএব অহম্বৃত্তি যে, বিজ্ঞান, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এক দিকে সাধারণ তত্ত্ব, আর একদিকে তাহার অধীনস্থ বিশেষ বিশেষ বিষয়,—এক দিকে বিজ্ঞান এবং আর এক দিকে মন,—এক দিকে অহম্বৃত্তি এবং আর এক দিকে ইদম্বৃত্তি, এ দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ও দুয়ের মধ্যে নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধ; অহম্বৃত্তি ইদম্বৃত্তির নিয়ামক, ইদম্বৃত্তি অহম্বৃত্তির নিয়ম্য। এই জন্য পঞ্চদশী বলেন "অহম্প্রত্যয় বীজত্বমিদংবৃত্তেরিতিস্ফুটং" অহম্প্রত্যয়ই ইদম্বৃত্তির বীজ অর্থাৎ মূলস্থিত নিয়ামক, কারণ "অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ ন তু ক্কচিৎ" আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ইদম্বৃত্তির সহিত একেবারেই সম্পর্ক রহিত হইয়া অহম্বৃত্তি একাকী থাকিতে পারে কি না? যদি বল "হাঁ—পারে," তবে তুমি অদ্বৈত-বাদী; যদি বল "না—পারে না" তবে তুমি দ্বৈত-বাদী; এই একটা কথার হাঁ এবং না'য়ের উপর অদ্বৈত

বাদ এবং দ্বৈত বাদ আলম্বিত রহিয়াছে। যদি হাঁ'য়ের পক্ষ বিচারে স্থির দাঁড়ায়, তবে নিয়ম্য ইদম্বৃত্তির সহিত সম্পর্ক একেবারেই লোপ পাওয়াতে—অহম্বৃত্তির নিয়ামিকা শক্তি একেবারেই লোপ পাইয়া যায়; তাহা হইলে ঈশ্বরের ঐশী শক্তি এবং জীবের কর্তৃত্ব শক্তি উভয়ই উপেক্ষিত হওয়াতে—জীবেশ্বরের মধ্যে কোন প্রভেদই লক্ষিত হয় না,—এক মাত্র নিরুপাধিক জ্ঞান কেবল অবশিষ্ট থাকে; আর, সে জ্ঞান ঈশ্বর শব্দেরও বাচ্য নহে, জীব শব্দের ও বাচ্য নহে, শুদ্ধ কেবল ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য। এখন উপরি-উক্ত দুই পক্ষের কোনটি সত্যের পক্ষ, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

একটী অতি সহজ বৃত্তান্ত হইতে বিচারের সূত্রপাত করা যাউক্। যে কোন বৃক্ষ হউক্ না কেন, তাহার কতকগুলি লক্ষণ এরূপ যে, সেগুলি শাল তাল তমাল প্রভৃতি সকল বৃক্ষেরই সাধারণ লক্ষণ; আর সেই সাধারণ-লক্ষণ-গুলির সমষ্টিকে আমরা সংক্ষেপে "বৃক্ষত্ব" বলিয়া নির্দ্দেশ করি; বৃক্ষত্ব সকল-বৃক্ষেরই সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু এমন একটি বৃক্ষ আমাকে দেখাও দেখি—যাহার শুদ্ধ কেবল ঐ সাধারণ ধর্ম্মটি আছে, তদ্ব্যতীত তাহার আর কোন লক্ষণই নাই? কখনই তুমি তাহা দেখাইতে পারিবে না। যদি বট বৃক্ষ দেখাও, তবে তাহার যেমন বৃক্ষত্ব আছে তেমনি বটত্ব আছে; যদি দেবদারু বৃক্ষ দেখাও, তবে তাহার বৃক্ষত্বের সঙ্গে সঙ্গে দেবদারুত্ব আছে; এমন একটিও বৃক্ষ তুমি আমাকে দেখাইতে পারিবে না—যাহার শুদ্ধ কেবল বৃক্ষত্বই আছে, তদ্ভিন্ন আর কোন-কিছুত্বই নাই। বৃক্ষের যেমন দেখা গেল—জ্ঞানেরও অবিকল এইরূপ;—যে-কোন জ্ঞান হউক না কেন—সেই জ্ঞানেরই—এক দিকে যেমন এরূপ একটি লক্ষণ থাকা চাই যাহা সকল জ্ঞানেরই সাধারণ ধর্ম্ম, আর-এক-দিকে তাহার এরূপ একটি লক্ষণ থাকা চাই যাহা সেই বিশেষ জ্ঞানের বিশেষ লক্ষণ। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, 'আমি জানিতেছি' এই ব্যাপারটি সকল জ্ঞানেরই সাধারণ ধর্ম্ম; আর ঘট জানিতেছি, পট জানিতেছি, পুস্তক জানিতেছি, এই সমস্ত ব্যাপার বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ; অতএব বৃক্ষমাত্রেতেই যেমন 'বৃক্ষত্ব' এই তাহার সাধারণ ধর্ম্ম, এবং 'আর-কোন-কিছুত্ব' এই তাহার বিশেষ লক্ষণ, দুইই এক সঙ্গে বিদ্যমান থাকা চাই, তেমনি জ্ঞান-মাত্রেতেই—অহম্বৃত্তি—এই তাহার সাধারণ ধর্ম্ম, এবং ইদম্বৃত্তি—এই তাহার বিশেষ লক্ষণ, উভয়ই এক সঙ্গে বিদ্যমান থাকা চাই। একটা পত্রের শুদ্ধ কেবল একটি মাত্র পৃষ্ঠা আছে ইহা যেমন অসম্ভব,—জ্ঞানের শুদ্ধ কেবল অহম্বৃত্তিটি আছে—ইদম্বৃত্তি মূলেই নাই, ইহাও তেমনি অসম্ভব। অহম্বৃত্তি যদিও ইদম্বৃত্তির নিয়ামক—অহম্বৃত্তি যদিও ইদম্বৃত্তি অপেক্ষা উচ্চ পদবীস্থ, তথাপি তাহা ইদম্বৃত্তির সহিত একেবারেই সম্পর্ক-রহিত হইয়া—আপনার নিয়ামিকা-শক্তিকে একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়া—একাকী অবস্থিতি করিতে পারে না। অদ্বৈত বাদী এ কথা অবশ্য স্বীকার করেন যে, ইদম্বৃত্তি বিলুপ্ত হইলে সেই সঙ্গে অহম্বৃত্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়; কিন্তু অদ্বৈত বাদী বলেন যে, অহম্বৃত্তি বিলুপ্ত হইলেও জ্ঞানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না; দ্বৈত বাদী বলেন যে, যে জ্ঞান

অহম্বৃত্তি-শূন্য, যে জ্ঞান আপনাকে আপনি জানে না, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলিতেছেন

" স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃ-জ্ঞানান্তরাভাবাৎ অজ্ঞেয়ো ন ত্বসত্তয়া॥"

স্বয়ং যে, জ্ঞান, তাহার জ্ঞেয়ত্ব থাকিতে পারে না। জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞাতা নাই বলিয়াই জ্ঞান অজ্ঞেয়, জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই বলিয়া নহে।

অর্থাৎ অনাত্ম-বিষয়-সকল হইতে ভিন্ন যে, জ্ঞান, তাহাই অনাত্ম-বিষয়-সকলকে জানে; কিন্তু জ্ঞান হইতে ভিন্ন এমন কি বস্তু আছে যাহা জ্ঞানকে জানিবে? জ্ঞানের অন্য কোন জ্ঞাতা নাই বলিয়াই জ্ঞান অজ্ঞেয়, জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই বলিয়া নহে। জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে অথচ জ্ঞান অজ্ঞেয়। ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, জ্ঞেয়ত্ব ব্যতিরেকেও জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভবে। উপরের শ্লোকটিতে আত্মা অন্য কর্তৃক (অর্থাৎ আনাত্মা কর্তৃক) জ্ঞেয় না-হওয়া অপরাধে একবারেই অজ্ঞেয়ের অন্ধ কূপে বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত হইল। দ্বৈত-বাদী এ ব্যাপারটি নির্ব্বিবাদে যাইতে দিতে পারে না—তাই নিম্ন লিখিত বাদানুবাদ;—

দ্বৈতবাদী॥ যাহা অন্য কর্তৃক জ্ঞেয় নহে কিন্তু আপনা-কর্তৃক জ্ঞেয়, তাহাকে কি জ্ঞেয় বলিতে পারা যায় না?

অদ্বৈত বাদী॥ কেন পারা যাইবে না? আপনা-কর্তৃকই হউক, আর, অন্য-কর্তৃকই হউক, জ্ঞেয় যে—সে জ্ঞেয়, এতো অতি সহজ কথা স্পষ্ট পড়িয়া আছে।

দ্বৈতবাদী॥ তুমি বলিতেছ যাহা আপনা কর্তৃক জ্ঞেয় তাহাও জ্ঞেয়, যাহা অন্য কর্তৃক জ্ঞেয় তাহাও জ্ঞেয়;—অজ্ঞেয়, তবে, কি?

অদ্বৈত বাদী॥ যাহা আপনা কর্তৃকও জ্ঞেয় নহে, অন্য কর্তৃকও জ্ঞেয় নহে, তাহাই অজ্ঞেয়।

দ্বৈত বাদী॥ তুমি বলিতেছ আত্মা অজ্ঞেয়;—তবে কি আত্মা আপনা-কর্তৃক বা অন্য কর্তৃক—কাহারো কর্তৃক—জ্ঞেয় নহে?

অদ্বৈত বাদী॥ যখন বলিয়াছি 'অজ্ঞেয়' তখন বুঝিতে হইবে যে, আপনা কর্তৃকও জ্ঞেয় নহে, অন্য কর্তৃক ও জ্ঞেয় নহে।

দ্বৈত বাদী॥ কিন্তু তুমি আপনিই বলিয়াছ যে, "অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেদ ন তু কচিৎ" আপনাকে না জানিয়া কেহই অন্য কোন বিষয়কে জানিতে পারে না। তোমার আপনার কথা অনুসারেই দাঁড়াইতেছে যে, আত্মা যেমন অন্যান্য বিষয়কে জানে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও জানে; তবেই হইল যে, আত্মা আপনা-কর্তৃক জ্ঞেয়; আর এই মাত্র তুমি বলিলে যে, আপনা কর্তৃকই হউক্, আর, অন্য কর্তৃকই হউক্, জ্ঞেয় যে—সে জ্ঞেয়; অতএব তোমারই কথায় দাঁড়াইতেছে যে, আত্মা জ্ঞেয়। এখন তুমি তাহার উল্টা বলিতেছ—এখন বলিতেছ আত্মা অজ্ঞেয়! ইহার কোন্‌টা ঠিক্?

অদ্বৈত বাদী॥ ও দুই কথার মধ্যে বিরোধ তো আমি কিছুই দেখিতে পাই না। আমি কি বলিয়াছি? আমি কেবল বলিয়াছি যে, আত্মা যখন যে-কোন অনাত্ম-বিষয়কে জানে, তখন তাহারই সঙ্গে সে আপনাকে জানে। কিন্তু যখন অনাত্ম-বিষয়ের সহিত আদবেই তাহার কোন সম্পর্ক থাকে না, তখন কি হয়? তুমি আপনিই বলিয়াছ যে, পত্রের এক পৃষ্ঠাকে ছাড়িয়া যেমন অপর পৃষ্ঠা একাকী থাকিতে পারে না, সেইরূপ ইদম্বৃত্তিকে ছাড়িয়া অহম্বৃত্তি একাকী থাকিতে পারে না। নিরুপাধিক জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইদম্বৃত্তির অস্তগমন অনিবার্য্য, এবং ইদম্বৃত্তির অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে অহম্বৃত্তির অস্তগমন অনিবার্য্য। সমাধি-কালে ইদম্বৃত্তির মূলোচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই অহম্বৃত্তিও উন্মূলিত হয়; তখন কেবল-মাত্র নিরুপাধিক জ্ঞান একাকী অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানের অস্তিত্ব পূর্ব্বেও যেমন ছিল, তখনো তেমনি থাকে;—মধ্য-হইতে কেবল ইদম্বৃত্তি এবং অহম্বৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়।

দ্বৈতবাদী॥ আমি বলিয়াছি বটে এবং এখনো বলিতেছি যে, ইদম্বৃত্তিকে ছাড়িয়া অহম্বৃত্তি একাকী থাকিতে পারে না; কিন্তু তেমনি ইহাও বলিয়াছি যে, ঐ দুই বৃত্তির কোনটীকে ছাড়িয়া জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভবে না; ঐ দুই বৃত্তিই জ্ঞানের অস্তিত্বের নিদান। যে জ্ঞান একেবারেই অজ্ঞেয়—আপনার নিকটেও অজ্ঞেয়—সুতরাং আপনার অস্তিত্ব আপনি উপলব্ধি করে না, সে জ্ঞানের অস্তিত্ব অপর ব্যক্তি কিরূপে উপলব্ধি করিবে? কেহই যে জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না, সে জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে ইহা কে বলিল? জ্ঞানই জ্ঞানের থাকিবার স্থান; জ্ঞান যদি আপনার জ্ঞানে বিদ্যমান না থাকিবে তবে আর কোথায় থাকিবে? জ্ঞান আপনার জ্ঞানে নাই—শুধু তোমার মুখের কথায় আছে—এরূপ থাকিলেই বা কি, আর, না থাকিলেই বা কি! জ্ঞান নিজে আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে না, অথচ তুমি তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছ;—ধন্য তোমার জ্ঞানের দৌড়! কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয় যে, সে জ্ঞানের অস্তিত্বের বাষ্পও তুমি উপলব্ধি করিতেছ না—শুধু কেবল মুখে বলিতেছ যে, তাহার অস্তিত্ব আছে। দেখিতেছ অন্ধকার—বলিতেছ আলোক!

অদ্বৈত বাদী॥ তুমি কি তবে বলিতে চাও যে, ইদম্বৃত্তিশূন্য নিরুপাধিক জ্ঞানের অস্তিত্ব মূলেই সম্ভবে না? বেদে কি আছে শ্রবণ কর,—"ইদম্বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ সদেবসৌম্যেদ মগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং স বা এষ মহানজ আত্মা।" "এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন মহান্ আত্মা।" যখন ইদং বলিয়া কিছুই ছিল না, তখন অবশ্য ইদম্বৃত্তিও ছিল না; আর তুমি আপনিই বলিয়াছ যে, ইদম্বৃত্তির অবিদ্যমানে অহম্বৃত্তি থাকিতে পারে না; কিন্তু অহম্বৃত্তির অবিদ্যমানেও এক মাত্র অদ্বিতীয় জন্ম বিহীন মহান্ আত্মা ছিলেন। প্রথমে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ এবং তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন, এ কথা তুমি মানো কি না?

দ্বৈতবাদী॥ ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ এবং তিনি নিত্য বিদ্যমান (বিদ্যমান শব্দের অর্থ জ্ঞেয়মান বুঝিলে হানি নাই বরং আরো ভাল হয়) এ কথা একেবারেই অখণ্ডনীয়। "কথমসতঃ সজ্জায়েত" অসত্তা হইতে কেমন করিয়া সত্তা উৎপন্ন হইবে? উৎপন্ন জীব যত আছে তাহাদের উৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশ ছিল, কাল ছিল, আর, আকাশ এবং কাল কোন না কোন সত্তায় পরিপূর্ণ ছিল; এ বিষয়ে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানকে ছাড়িয়া সত্তা একাকী থাকিতে পারে না। তোমার আমার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে তোমার আমার সমক্ষে যেমন কোন অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, সেইরূপ মূলেই যদি জ্ঞান না থাকে, তবে মূলেই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না;—যাহা কেহই কোন কালে জানে নাই—জানে না—জানিবে না, তাহার অস্তিত্ব শুধু কেবল একটা মুখের কথা মাত্র, তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব ইহা যখন সুনিশ্চিত যে: উৎপন্ন জীব-সকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশ ছিল, কাল ছিল, আর আকাশ এবং কাল কোন না কোন সত্তার উৎপাদিকা শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল; আর ইহা যখন সুনিশ্চিত যে, জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে সত্তা একাকী থাকিতে পারে না; তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জীব জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও জন্মবিহীন মহান্ আত্মা বর্ত্তমান ছিলেন। অস্তিত্ব জ্ঞান-সাপেক্ষ; এজন্য মূল অস্তিত্বও যেমন নিত্য মূল জ্ঞানও তেমনি নিত্য। যে জ্ঞান কালের অস্তিত্বের নিদান, সে জ্ঞান অবশ্য কালাতীত জন্মবিহীন; আর, যে জ্ঞান আকাশের অস্তিত্বের নিদান, সে জ্ঞান অবশ্য আকাশাতীত মহান্; অতএব পরমাত্মা "মহানজ আত্মা" তিনি জন্মবিহীন মহান্ আত্মা, এ কথা নিঃসংশয় বেদবাক্য।

অদ্বৈতবাদী॥ ইহা তবে তুমি মানো যে, "স বা এষ মহানজ আত্মা" তিনি জন্মবিহীন মহান্ আত্মা। এটা তবে তোমার না মানিবার কারণ কি যে, "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ" এ জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না?

দ্বৈতবাদী॥ কে ইহা বিশ্বাস করিতে পারে যে, যিনি জন্ম বিহীন মহান্ আত্মা তাঁহার জ্ঞান ইদম্বৃত্তি-বর্জ্জিত এবং কাজেই অহম্বৃত্তি-বর্জ্জিত, এক কথায় তাঁহার জ্ঞান জ্ঞানই নহে! বেদে তাই অব্যবহিত পরেই আছে "স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" "তিনি বিশ্ব-সৃজনের আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমস্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।" ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও তাহা ঈশ্বরের আলোচনায় বিদ্যমান ছিল। বেদে যাহা ইদং বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা আমাদের এখনকার এই ইদং—এই সৃষ্ট জগৎ; কিন্তু এই সৃষ্ট জগতের মূলে ঈশ্বরের আলোচনা-জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে;—সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাহা বর্ত্তমান ছিল, এখনো তাহা বর্ত্তমান, এবং চিরকালই তাহা বর্ত্তমান থাকিবে। সেই আলোচনা-জগৎ যদিও আমাদের ইদং নহে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরের ইদং তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দুই ইদমের মধ্যে যদিও আকাশপাতাল প্রভেদ তথাপি উভয়ই ইদংশব্দের বাচ্য।

আমাদের চিন্তা-জগৎ যেমন আমাদের আত্মা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ ঈশ্বরের আলোচনা-জগৎ স্বয়ং ঈশ্বর হইতে ভিন্ন; তেমনি আবার, যেমন তোমার আমার চিন্তা-জগতের তুমি আমিই সর্ব্বস্ব, সেইরূপ ঈশ্বরের আলোচনা-জগতের ঈশ্বরই সর্ব্বস্ব। দুই ইদম্বৃত্তির মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, ঈশ্বরের ইদম্বৃত্তি মূল আদর্শ, আমাদের ইদম্বৃত্তি তাহার প্রতিলিপি মাত্র। ঈশ্বর আর কাহারো নিকট হইতে চিন্তা করিতে এবং রচনা করিতে শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের চিন্তা হইতেই চিন্তা শিক্ষা করেন, কবিরা ঈশ্বরের রচনা হইতেই রচনা শিক্ষা করেন। ঈশ্বর সংসারের পরপারে থাকিয়া যেরূপ লেখা লিখিতেছেন, আমরা এপারে থাকিয়া তাহারই দাগা বুলাইতেছি। পুনশ্চ, ইদম্বৃত্তি এবং অহম্বৃত্তির মধ্যে যেরূপ নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধ, তাহা সকল জ্ঞানেরই অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্ম;—এমন নহে যে, তাহা শুধু কেবল জীব-জ্ঞানেরই ধর্ম্ম—ঐশ্বরিক জ্ঞানের নহে। আমাদের নিয়ম্য মনোবৃত্তি না থাকিলে আমাদের আত্মার নিয়মিকা-শক্তির যেমন কোন অর্থই থাকে না, সেইরূপ ঈশ্বরের নিয়ম্য আলোচনা-জগৎ না থাকিলে ঈশ্বরের ঐশী শক্তির কোন অর্থই থাকে না। আমাদের নিয়ামিকা শক্তি ঐশী-শক্তির ন্যায় মূল শক্তি নহে; আমাদের নিয়ামিকা শক্তি ঐশী শক্তির প্রতিলিপি মাত্র; ঐশী শক্তির সহিত যে অংশে তাহার সাদৃশ্য—সেই অংশে তাহা স্বাধীন; আর, যে অংশে তাহা মূল শক্তি নহে—কেবল প্রতিলিপি মাত্র, সেই অংশে তাহা পরাধীন। আমাদের ইদম্বৃত্তি সম্যক্‌রূপে আমাদের অধীন না হওয়াতে—আমাদের নিয়ামিকা শক্তি পরিমিত হওয়াতে—আমরা সুখ দুঃখ মোহে আক্রান্ত হই। পরমাত্মার ইদম্বৃত্তি তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন—তাঁহার ঐশী শক্তি মূল শক্তি সুতরাং অপরিমিত—এইজন্য পরমাত্মা পরিপূর্ণ আনন্দময়। মনুষ্য যখন তাহার পরাধীন ইদম্বৃত্তি হইতে মনকে সংযত করিয়া ঈশ্বরের ভাবের ভাবুক হয়, তখন তাহার আত্মাতে ঈশ্বরের শক্তির কণা মাত্র সঞ্চারিত হইয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব-শক্তিকে এবং আনন্দকে দ্বিগুণিত করিয়া তোলে। মনুষ্য যতই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ এবং ভক্তিমান্ হইয়া কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার অনুগত হয়, ততই তাহার নিয়ামিকা শক্তি প্রবর্দ্ধিত হয়, ততই সে তাহার ইদম্বৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করে, ততই সে দুঃখ এবং মোহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আনন্দামৃত উপভোগ করে। কিন্তু মনুষ্য যতই উৎকর্ষ লাভ করুক্ না কেন—ঈশ্বর তাহা অপেক্ষাও পরাৎপর পরম উৎকৃষ্ট; এ জন্য মনুষ্যের নিজের উৎকর্ষ মনুষ্যের চরম লক্ষ্যের উপযুক্ত নহে, এক কথায়—চরম আদর্শ নহে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতিই মনুষ্যের মুখ্য লক্ষ, তাহার আপনার উৎকর্ষ তাহার আনুষঙ্গিক উপলক্ষ। সেই মুখ্য লক্ষ্যের সাধনই মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য; মনুষ্যের আত্মোৎকর্ষ যাহা সেই লক্ষ্য সাধনের অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা সেই লক্ষ্যেরই উচ্চতর সাধনের সহায় বলিয়া সমধিক প্রার্থনীয়। ঈশ্বর আমাদের আত্মোৎকর্ষের জন্য নহেন, কিন্তু ঈশ্বরানুরাগ-বর্দ্ধনের জন্যই আত্মোৎকর্ষ-

সাধন; এইরূপ হইলেই সাধক ঠিক্ পথে দাঁড়ায়। নিষ্কাম ঈশ্বর-প্রীতিই মনুষ্য জীবনের উচ্চতম আদর্শ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিরহীর পত্র।

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দূরে গেলে এই মনে হয়,
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ গলি,
এমন বিপুল এ সংসার,
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

তারায় তারায় সদা থাকে চোখে চোখে
অন্ধকার অসীম গগণে।
ভয়ে ভয়ে অনিমেষে কম্পিত আলোকে
চেয়ে থাকে নয়নে নয়নে।
চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি,
তরুহীন মরুময় ব্যোম,
মুখে মুখে চেয়ে তাই চলে যত যাত্রী
চলে গ্রহ রবি তারা সোম।

নিমেষের অন্তরালে কি আছে কে জানে,
নিমেষে অসীম পড়ে ঢাকা।
অন্ধ কাল-তুরঙ্গম রাশ নাহি মানে
বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।
কাছে কাছে পাছে পাছে চলিবারে চাই
জেগে জেগে দিতেছি পাহারা—
একটু এসেছে ঘুম চমকি তাকাই
গেছে চলে কোথায় কাহারা!

ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কাঁদি তাই একা—
বিরহের সমুদ্রের তীরে।
অনন্তের মাঝখানে দুদণ্ডের দেখা
তাও কেন রাহু এসে ঘিরে!
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়
পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে যাবে পড়ে রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলা ঘর!

গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবি শশি,
শূন্য ঘেরি জগতের ভীড়,
তারি মাঝে যদি ভাঙ্গে, যদি যায় খসি
আমাদের দুদণ্ডের নীড়—
কোথায় কে হারাইব, কোন্ রাত্রি বেলা
কে কোথায় হইব অতিথি,
তখন কি মনে রবে দু দিনের খেলা
নয়নের পরশের স্মৃতি!

তাই মনে করে কিরে চোখে জল আসে,
একটুকু চোখের আড়ালে,
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভাল বাসে
সেও কি রবে না এক কালে?
আশা নিয়ে একি শুধু খেলাই কেবল
সুখ দুঃখ মনের বিকার!
ভাল বাসা কাঁদে হাসে মোছে অশ্রুজল
চায় পায় হারায় আবার!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেঁয়ালি নাট্য।*

(রায় কৃষ্ণ কিশোর বাহাদুর সি, এস, আই মৃত্যু শয্যায় শয়ান। চন্দ্র কিশোর, নন্দ কিশোর, ও ইন্দ্রকিশোর পুত্র ত্রয় পরামর্শে রত। ডাক্তার উপস্থিত। মহিলাগণ ক্রন্দনোন্মুখী)

চন্দ্র। কা'কে কা'কে লিখি।

ইন্দ্র। রেনল্‌ড্‌স্‌ সায়েবকে লেখ।

কৃষ্ণ কিশোর। (অতি কষ্টে) কি লিখবে বাবা!

নন্দ। তোমার মৃত্যু সংবাদ।

কৃষ্ণ। মৃত্যু সংবাদ! এখনো ত আমি মরিনি, নন্দ!

ইন্দ্র। এখন নেইবা ম'লে বাবা; কিন্তু একটা সময় স্থির করে লিখ্‌তে হবে ত!

চন্দ্র। যত শীঘ্র পারি সায়েবদের condolence letter গুলো আদায় করে কাগজে ছাপিয়ে ফেলা দরকার—সমস্ত জুড়িয়ে গেলে তখন ছাপালে বিশেষ কোন ফল হবে না!

কৃষ্ণ। বাবা, একটু সবুর কর, আগে আমি জুড়িয়ে যাই!

নন্দ। সবুর কর্‌লে চল্‌বে না বাবা। সিম্‌লে আর দার্জিলিঙ্গে যাদের যাদের চিঠি পাঠাতে হবে তাদের একটা ফর্দ্দ করা যাক্‌—বলে যাও!

চন্দ্র। লাট্‌ সায়েব। ইল্‌বর্ট্‌ সায়েব। উইল্‌সন্‌ সাহেব, বেরেস্‌ফোর্ড। মেকলে। রেনল্‌ড্‌স্‌। পিকক্‌——

কৃষ্ণ। বাবা কানের কাছে ও কি নামগুলো করচ, তার চেয়ে ভগবানের নাম কর। এখন তিনিই সহায়। হরি হে তুমিই ভরসা। বল হরি——

ইন্দ্র। ঠিক বলেছ—ভাল মনে করিয়ে দিয়েছ—হ্যারিস্‌ন্‌ সায়েবকে ধরা হয়নি।

কৃষ্ণ। বাবা, বল রাম রাম——

নন্দ। দাদা, রামজে সায়েবকে ভুলো না যেন!

কৃষ্ণ। নারায়ণ নারায়ণ।

---

*শ্রাবণ মাসের হেঁয়ালির উত্তর কবিতা। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন দাস, অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন বিশ্বাস, জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, বিপিনবিহারী লাহা, গোপালচন্দ্র ভায়া, করুণাভিরাম বড়ুয়া, হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত, সতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিধুভূষণ ঘোষ, বিহারীলাল গোস্বামী, নীলমণি বসাক, উপেন্দ্র নাথ সেন, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, অনন্তলাল ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, জলধর দাস, উমানাথ চক্রবর্ত্তী, কুমার বিপ্রনারায়ণ, শ্রীমতী, মৃনালিনী দাসী, এলোকেশী দাসী, নৃত্যকালী দাসী ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

চন্দ্র। নন্দ, লেখতহে নোরান্ সায়েবের নামটা লেখত !

স্কন্দ কিশোরের প্রবেশ।

স্কন্দ। বা, তোমরা ত বেশ যাহোক্ ! আসল কাজটাই যে বাকি !

চন্দ্র। কি বল দেখি !

স্কন্দ। বাবাকে নিমতলার ঘাটে নিয়ে যাবার সময় procession-এ যা'রা যোগ দেবে তাদের ত আগে থাক্‌তে খবর দিতে হবে ! কোন্ সময়ে তারা আস্‌বে সেটাত আগে থাক্‌তে স্থির করে বল্‌তে হবে !

কৃষ্ণ। বাবা. কোন্‌টা আসল হল ! আগে ত মরতে হবে, তার পরে—

চন্দ্র। বাবা তুমি অস্থির হোয়ো না, কোন্‌টা আগে কোনটা পরে আমরা সমস্ত ঠিক করে দিচ্চি !

স্কন্দ। তুমি ত কেবল মরবে. তোমার কোন ভাবনা নেই, খাট্‌নি আমাদেরই। কাগজে লিখ্‌তে লিখ্‌তে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

ডাক্তার। (স্বগত) হায় হায়, তোমাদের মরণ হয় না !

চন্দ্র। ডাক্তার।

ডা। আজ্ঞে।

চন্দ্র। বাবার আর কত বাকি ! সাধারণকে কখন আস্‌তে বলব ?

ডা। বোধ হয়—(রমণীদের চীৎকার স্বরে ক্রন্দন)

স্কন্দ। (বিরক্ত হইয়া) মা একটু থাম। আগে কথাটা জিজ্ঞাসা করে নিই। কখন ডাক্তার ?

ডা। বোধ হয় রাত্রি—(পুনশ্চ ক্রন্দন)

নন্দ। বড় মুস্কিল কর্‌লে। তোমরা কাজের ভারি ব্যাঘাত কর্‌চ। তোমাদের কেঁদে কোন ফল নেই। আমরা বড় বড় সায়েবদের কাঁদুনী চিঠি কাগজে ছাপিয়ে দেব। (রমণী-দিগকে গৃহ হইতে বহিষ্করণ)।

স্কন্দ। ডাক্তার—কি বোধ হচ্চে !

ডা। যে রকম দেখ্‌চি তা'তে বোধ হয় বা আজ রাত্রি চারটের সময় মৃত্যু হয়।

চন্দ্র। তবে ত আর বেশী সময় নেই। তবে ত এই বেলা স্লিপ্. ছাপিয়ে বিলি করতে হয়। নন্দ, যাও ছুটে যাও—প্রেসে ছুটে যাও !

ডা। আজ্ঞে, ওষুধটার জন্যে অনেক ক্ষণ বসে আছি এখনো এলনা। সে ওষুধের বিশেষ দরকার। প্রেসে যাবার আগে যদি ওষুধের——

স্কন্দ। বিলক্ষণ ! ওষুধ পরে আন্‌লেই হবে—তোমার ডাক্তার খানা ত আর পালাচ্চে না। আগে প্রেসে যাওয়া দরকার—

ডাক্তার। আজ্ঞে ততক্ষণে রুগী যে——

চন্দ্র। সেই জন্যেই ত তাড়াতাড়ি! পাছে স্লিপ বিলি হবার আগেই রুগী মারা পড়ে।

নন্দ। এই আমি চল্লুম।

স্কন্দ। লিখে দিও কাল বেলা আট্‌টার সময় procession আরম্ভ হবে!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্কন্দ। কই ডাক্তার! চারটে ছেড়ে সাতটা বাজ্‌লো যে!

ডাক্তার। (অত্যন্ত অপ্রতিভ ভাবে) তাই ত, নাড়ি এখনো বেশ সবল আছে।

চন্দ্র। বা তুমি বেশ ডাক্তার যাহোক্! আচ্ছা বিপদে ফেলেছ!

নন্দ। তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়ে ওষুধটা আনতে দেরী করেই এই বিপদ ঘট্‌ল। ডাক্তারের ওষুধ খেলে এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত—ওষুধ বন্ধ হয়ে অবধি বাবা অনেকটা সবল হয়ে উঠেচেন!

কৃষ্ণ। বাবা এতক্ষণ তোমরা বেশ প্রফুল্ল ছিলে, হঠাৎ এখন এমন বিমর্শ হয়ে গেলে কেন? আমার ত ভালই বোধ হচ্চে!

স্কন্দ। কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস করে আমরা যে আটটার সময় public-এর সঙ্গে তোমার ঘাট-procession এর engagement করেছি।

কৃষ্ণ। তাইত! সেটা ভঙ্গ হলে অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের কারণ হবে! আমার মরা উচিত ছিল বটে!

ডাক্তার। (আর থাকিতে না পারিয়া) একটা কাজ করত সমস্ত গোল চুকে যায়!

ইন্দ্র। কি!

চন্দ্র। কি!

নন্দ। কি!

স্কন্দ। কি!

ডাক্তার। 'ওঁর বদলে তোমরা যদি কেউ সময়-মত মর'।

তৃতীয় দৃশ্য।

(বহির্ব্বাটিতে বিস্তর লোক সমাগম।)

কানাই বাবু। সাড়ে আটটা ত বেজে গেল, আর বিলম্ব কেন?

চন্দ্র। বসুন, একটু তামাক খান।

কানাই। তামাক ত সকাল থেকে খাচ্চি।

বলাই বাবু। কৈ হে—তোমাদের যোগাড় ত কিছু দেখিনে।

চন্দ্র। আজ্ঞে যোগাড় সমস্তই আছে তার কোন ত্রুটি নেই—এখন কেবল——

রামতারণ বাবু। কিহে চন্দ্র আর ত দেরি করা ভাল নয়!

চন্দ্র। ঠিক বলেচেন। আমাদের সকলেরই সেই মত কিন্তু——

হরিহর বাবু। দেরি কিসের জন্যে হচ্চে ?

চন্দ্র। আমরা ত তাড়াতাড়ি করেই উদ্যোগ করেছিলুম কিন্তু দেরী করচেন কেবল—

মধুসূদন। কৈ গো আপিসের বেলা হয় যে। তোমাদের কাণ্ড খানা কি !

চন্দ্র। আজ্ঞে, আমাদের কোন দোষ নেই—এখন কেবল—

ইন্দ্রকিশোরের প্রবেশ।

ইন্দ্র। আপনারা অত ব্যস্ত হবেন না, বাবার হল বলে। ততক্ষণ এই Condolence letter গুলো পড়ুন। (হাতে হাতে বিলি) এইটে ল্যাম্বার্টের চিঠি, এইটে হ্যারিসনের, এইটে সার্ জেম্‌স্—

স্কন্দকিশোরের প্রবেশ।

স্কন্দ। এই নিন্, ততক্ষণ কাগজে বাবার মৃত্যুবিবরণ পড়ুন্। এই ষ্টেট্‌সম্যান্, এই ইংলিষম্যান্, এই মিরার।

মধুসূদন। (যাদবের প্রতি) দেখেছ ভাই, বাঙ্গালীরা punctuality কাকে বলে জানে না।

পশ্চাৎ হইতে ইন্দ্রকিশোর। ঠিক বলেচেন। মরবার সময়েও তারা punctual হয় না। (খবরের কাগজ এবং condolence পত্র পড়িতে পড়িতে অভ্যাগতগণের প্রবল বেগে অশ্রুপাত)

রাধামোহন বাবু। (সজল নেত্রে) হরি হে দীনবন্ধু !

নয়ান চাঁদ। হায় হায়, এমন লোকেরও এমন বিপদ ঘটে !

নবদ্বীপচন্দ্র। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) প্রভু তোমারই ইচ্ছা !

রসিক বাবু। (কাতর স্বরে)

"হৃদয় বৃন্তে ফুটে যে কমল"

তার পরে কি ভুলে যাচ্চি !

"হৃদয় বৃন্তে ফুটে যে কমল"
তাহারে ছিঁড়িলে কাল অকালে, হৃদয়-
মৃণাল ডুবে শোক-সাগরের জলে !

এও ঠিক ভাই ! "হৃদয় মৃণাল ডোবে শোক সাগরের জলে !" আহা !

আডি্য এস্কোয়ার। *O tempora O mores !*

তত্ত্ববাগীশ। (গদ্গদ কণ্ঠে)

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং
চলাচল মিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি !

ন্যায় বাগীশ।

যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ—(কণ্ঠরোধ)

দুঃখীরাম। কি বল্লে ন্যায়ব্যাগীশ খুড়ো ? মথুরা ? আমার মথুরা কি আর আছে ? তার পিলের উপর আবার বিকার হল রাত পোহাতে না পোহাতে মারা গেল ! (মূর্চ্ছা)

শোকে অধীর হইয়া অভ্যাগতগণের হোহো শব্দে ক্রন্দন)

(ক্রন্দন কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে)

মধুসূদন। ওগো তোমাদের আর বাকী কিসের !

চন্দ্র। আর বাকী কিছুই নেই এখন কেবল বাবা মোলেই হয়।

কালাচাঁদ। (শোকাবেগে শুনিতে না পাইয়া বুক চাপড়াইয়া উর্দ্ধকণ্ঠে) হায় কৃষ্ণকিশোর বাহাদুর তুমি কোথায় গেলে !

(নেপথ্য হইতে ক্ষীণকণ্ঠে) আমি এই খেনেই আছি বাবা ! দোহাই, তোরা অত চেঁচাস্‌নে !

কত রচিব শয়ন।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে !
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে !
কত শরদ যামিনী হইবে বিফল
বসন্ত যাবে চলিয়া !
কত উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাত যাইবে চলিয়া !
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া
মরিব কাঁদিয়া রে !
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে !
আমি কার পথ চাহি এজনম বাহি
কার দরশন যাচি রে !

যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
তাই আমি বসে আছি রে!
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া।
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া।
ওগো তাই কত নিশি চাঁদ উঠে হাসি
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে,
ওগো তাই ফুল বনে মধু সমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে!
ওই বাঁশি স্বর তার আসে বার বার
সেই শুধু কেন আসেনা,
এই হৃদয় আসন শূন্য পড়ে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা,
মিছে পরশিয়ে কায় বায়ু বহে যায়
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া উঠে
যামিনী যে উঠে সিহরি।
ওগো যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কি!
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুল মালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব!
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল
দেখে তারে আমি মরিব!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাব্য জগৎ।

কবি কীট্‌স্‌।

দুই এক জন কবি আছেন যাঁহারা সংসারে অতিথি মাত্র—হঠাৎ এক দিন দেখিতে পাও দূর জনপদের সীমানায় সন্ধ্যাধূসরিত একখানি কুটীরের দুয়ারে অতিথি দাঁড়াইয়া আছেন।

একটী রাত্রির জন্য তিনি তোমার আমার নিকট আশ্রমের শান্তি, শিক্ষা, জ্ঞান লইয়া আসেন—কখনও বা তাঁহার মধ্যাহ্ন তেজোদগ্ধ কাতর মুখখানি, ও স্বপ্নময় চক্ষু দুটি লইয়া মর্ম্মান্তিক কাতর স্বরে প্রচ্ছায় দূর কোন প্রদেশের কথা আমাদিগের স্মৃতিতে আনিয়া দেন। তিনি একটী তিথিমাত্র আমাদের সহিত থাকিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার কথা আমাদের হৃদয়ে রাখিয়া যান,—আমরা সে অতিথি কবিকে কত ভাল বাসি। এই অতিথি কবিরা দেবশিশু। শিশু-দেবতার মুখের কথা কত মধুর লাগে—সে পবিত্রকাব্য-জগতের স্বপ্নময় নিশ্বাস আমাদিগের প্রাণে ফুল ফোটাইয়া যায়।

দুই জন কবির কথা আমার এই মুহূর্ত্তে মনে হইতেছে। ইংরাজ কীট্‌স এবং ফরাসী আঁদ্রেসেনিয়ে। দুই জনেই আমাদিগের জগতে এক দিনের অতিথি ছিলেন। দুই জনেই যৌবন বিকাশের পূর্ব্বে আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন—দুই জনেই নিজের কথা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা পড়িলে চক্ষে জল আসে—কেমন মায়া হয়—দেবশিশুগুলির চোখের জল মুছিয়া বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়।

কীট্‌স এক দিন এক জন বন্ধুকে মরিবার কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"আমার মনে হইতেছে যে আমার মাথাব উপর মাঠের ফুল ফুটিতেছে"। ইহা সংসারপান্থারে একটী আকুল প্রাণের কথা নহে কি? তাঁহার কবরের উপর তিনি এই কয়েকটি কথা লিখিতে বলিয়া গিয়াছিলেন "এখানে যে মরিয়াছে তাহার নাম জলের অক্ষরে লেখা হইয়াছিল:" এই কথা কয়েকটিতে যে বেদনা আছে তাহাতে উগ্রভাব আছে কি?

আঁদ্রেসেনিয়ে বলিয়াছিলেন যে "জগতের এই মহাভোজে আমি দুরদৃষ্ট একজন অতিথি উপস্থিত—যখন আমি চলিয়া যাইব তখন কাহারও চক্ষে এক ফোঁটাও জল পড়িবে না"। দুই জনেরই মরিবার ভয়—যেন চিরদিনের জন্য ভাল বাসিবার যাহা কিছু, চিরদিনের আশা, ভরসা চিরসঞ্চিত জ্ঞান, চিরসুহৃৎকল্পনা সবই যেন এক দিনে, এক নিমেষে ফুরাইয়া যাইবে। চিরদিনের অবসানের ভয় আছে বলিয়াই কবি কীট্‌সকে আমরা এত ভাল বাসি।

"মহাকবি, আকাশেও তোমাদিগের কি আত্মা আছে, তোমরা কি দ্বিজ? ভূজাত (earth-born) তোমাদের যে আত্মা আমাদিগের দুদিনের সুখ দুঃখের কথা, দ্বেষ, হিংসার কথা, গৌরব অগৌরবের কথা, বলের এবং তেজের অভাবের কথা বলিয়া কোথা চলিয়া যায়? নূতন নূতন প্রদেশে কি নূতন নূতন আত্মা তোমরা পাও"? সকাতরে কবি কীটস জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'যাহা কিছু জানি তাহা জানাইতে পারিলাম না, আমার মাথার ভিতর যে সহস্র চিন্তা আছে তাহা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমি মরিয়া যাব'—এই তাঁহার ভয়।

ধর্ম্মের নির্ম্মম অনুজ্ঞা "মৃত্যুকে ভয় করিবে না" মনে রাখিয়াও, জগৎ ছাড়িতে মায়া করে না কি? আমাদিগের এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভালবাসার সহিত যদি একজন কবির বিশ্বব্যাপী প্রাণের মমতা দেখিতে পাই তাহাকে আদর করিতে ইচ্ছা করে।

ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে যে "দেবতারা যাহাদিগকে ভাল বাসেন তাহারা শৈশবে মরিয়া যায়"। কীট্‌স নিশ্চয়ই দেবপ্রসাদিত। যখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর তখন এই জীবন-লীলা শেষ করেন। বলিতে গেলে কীট্‌সের সব মানসিক ভাবই শৈশবে শুকাইয়া যায়।

কীট্‌স ফ্যানী বলিয়া একটী মেয়েকে ভাল বাসিতেন—ফ্যানীকে যেমন করিয়া ভাল বাসিতেন সে শিশুর ভালবাসা। *একবার আসিয়া জানালায় দাঁড়াও তোমাকে দেখিব। একবার বাগানে বেড়াইও দেয়ালের গায়ে তোমার যে ছায়া পড়িবে তাহা দেখিব। কাল রাত্তিরে আমার ঘুম হয় নাই—তুমি সেই যে রোজ কাগজের টুকরায় "গুডনাইট" লিখিয়া পাঠাও তাহা ত দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলে। আমার বালিসের নীচে সে কাগজখানি না রাখিলে—আমার কেমন ঘুম হয় না। 'ফ্যানি, ফ্যানি, ফ্যানি গুডনাইট"। কেন আজ দেখা দেও নাই বল দেখি"?*

কীট্‌স যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা কোনমতেই কহন বয়স্ক লোকে লিখিতে পারে না। এমন কি বয়োভাবসম্পন্ন একটী বালক [illegible] পারে না। শিশু যেমন মার মুখ না দেখিতে পাইলে কাতর হইয়া পড়ে—কাঁদি[illegible] মাকে পর্য্যন্ত বিরক্ত করিয়া তুলে কীট্‌স তেমনি তাহার অবিশ্রান্ত কাতরতা দ্বারা ফ্যানীকে খানিকটা ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আসন্ন মৃত্যুর স[illegible]য় কীট্‌স ফ্যানির নি[illegible] হইতে [illegible]কখানি পত্র পান তিনি তাহা পড়িতে চাহিলেন না—কাহাকেও পড়িতে বলিলেন না—শু[illegible] [illegible]ত্র পত্রখানি যেমন ভাবে আসিয়াছিল সেই ভাবে তাঁহার সহিত কবরে দিতে বলিয়াছিলেন। কেন?

কীট্‌সের শিশুভাবের একটা প্রধান কারণ যে শৈশবেই পিতা মাতা উভয়কেই তিনি হারান। সাধারণতঃ ঐরূপ অবস্থায় বালক [illegible]র বালকত্ব হারাইয়া খানিকটা সংসারী হইয়া পড়ে—কিন্তু কীটসের মত শিশু যাহার [illegible]লবাসা হৃদয়-পূর্ণ তাহার পক্ষে পিতা-মাতার অভাব যেন চিরজীবনের তেজ নষ্ট করিয়া ফেলে। সে অভাবই দেখিতে পায়, অভাব হইয়াছে বলিয়া কেমন করিয়া সংসারের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা কবি কীট্‌স কখনও শেখেন নাই। এই অভাবপূর্ণ আবেগময় হৃদয় লইয়া লোকে কদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে? যৌবনের প্রাক্কালেই কীট্‌স যাহাকে ভাল বাসেন সে তাঁহাকে সেরূপ ভালবাসা ফিরাইয়া দিতে পারিল না। সে তীব্র কাতরতা সুস্থ করা একটী বয়স্কা যুবতীর কেমন করিয়া সম্ভব? অধীরতা যৌবন-সুলভধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু বিষাদ—অনেক সময় শুদ্ধ কল্পনাই যে বিষাদের কারণ মাত্র—সেই বিষাদ-ক্ষীণ, পীড়িত শিশু কবি কীটসকে সুস্থ করা কি একজন পূর্ণযৌবনা, সুস্থশরীরা সংসারী গৃহস্থ বালিকার পক্ষে সম্ভব। কীট্‌স চাহেন যে সে দিনে দশবার জানালায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখা দিবে—যদি কার্য্যগতিকে সে একবার কম আসিল তাহা হইলে কীট্‌স কাতরস্বরে ফ্যানি কেন

আসিলে না বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন—যদি একবার অধিক আসিলেন—কীট্‌সের এতই অধিক আনন্দ হইত যে তাহাতে তাঁহার রক্ত বমন হইত।

কবির ভালবাসা একটু অন্য রকম। কবি কি কোন ব্যক্তিবিশেষকে ভাল বাসে—না শুধু কল্পিত কিছুকে ব্যক্তিবিশেষ অবলম্বন করিয়া ভাল বাসে? যাহাকে ভালবাসা দেখাইতেছে সে উপলক্ষ মাত্র—যে দেহ আলিঙ্গন করিতেছে সে অশরীরী কিছুর জন্য—যে কথা কহিতেছে সে আকাশের জন্য—যে যুবতী শুনিতেছে সে অনেক সময় তাহা বুঝিতে পারে না। কীট্‌সের ভালবাসা ব্যক্তিগত হইয়াও তাহা নহে। সে ত সংসারের কোন কন্যার জন্য নহে।

প্রসিদ্ধ ফরাসী উপন্যাস লেখক বালজাক (Balzac) এক স্থানে বলিয়াছেন—কবিকে কখনও ভাল বাসিও না। সংসার তুমি যে ভাবে জান—সে যেরূপ ভাবে জানে না—সে ভাল বাসিলে হৃদয় শুকাইয়া লইতে চাহিবে—জীবনের জীবন যাহা তাহা নিঃশেষ করিতে চাহিবে। তাহাকে ভাল বাসিতে দিওনা। তুমি বালিকা, মা যেমন ছেলে সহস্র দোষ করিলে, শত সহস্র আবদার করিলে প্রসন্নভাবে চিরদিনই দেখেন, তুমি কি স্বেচ্ছাবিহারী একজন কবিকে সে ভাবে ভাল বাসিতে পারিবে? সে বাঁধা থাকিবে না। সে কখন যে তোমার হৃদয়ের ভিতর আসিতে চাহিবে, তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া হঠাৎ তোমার নিভৃত লুকান চিন্তাগুলি বাছিয়া লইতে চাহিবে—প্রত্যহ তোমার হৃদয় লইয়া খেলা করিবে, সে বালককে হৃদয় দিবে কি করিয়া? এ দুরূহ কাজ করিও না—কবিকে ভাল বাসিও না।

কবিতা সম্বন্ধেও কীটসের পুরুষ ভাব নাই; আমি তাঁহার সমস্ত লেখার মধ্যে কেবল এক স্থানে একটু বলের কথা পাইয়াছি—সে স্থানটি এই——

"বলীয়ান অসুরের ন্যায় আমি বিস্তৃত জগতের ২৮টা াবলি আয়ত্ত করিব, আমার মনকে বার বার প্রশ্ন করিব যত দিন না মন অনশ্বর জগতের সংবাদ আনিয়া দেয়।"

ইহা ভিন্ন সব স্থানেই কেমন কোমলভাব মাখা কথাগুলি, কোমল রঙের ফুলগুলি লইয়া কবি কীটস খেলা করেন—যে কবিতা হইতে উপরের কয়েকটি ছত্র তুলিয়া দিলাম সেই কবিতাতেই তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

"একবার দাঁড়াও ভাবিয়া দেখ—জীবন ত এক দিনের, গাছের আগা হইতে পতনশীল শিশিরবিন্দু মুহূর্ত্ত পরেই শুকাইবে"—"জীবন অস্ফুট গোলাপ কোরকের ফুটিবার আশা মাত্র"—

"জীবনে আর যদি দশ বৎসর পাইতাম কবিতা দিয়া আপনাকে ডুবাইয়া দিতাম"।

কীটসের যে এই বাঁচিবার ইচ্ছা ছিল, মরিবার আশঙ্কা ছিল তাহা উপভোগের জন্য—সৌন্দর্য্য লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। নীরবে পত্রাবলীর হৃদয়ের ভিতর থাকিয়া আর একটী প্রাণীর সহিত শুক্তির মধ্যে দুইটী মুক্তার মত লুকাইয়া মিলিয়া, মিশিয়া জীবন কাটাইতে তাহার বড়ই সাধ হইত।

কীটস উপন্যাস প্রিয় ছিলেন তাই যেখানে সেখানে কবিতাতে উপন্যাসের কথা বলিয়াছেন। "জীবন নূতন নূতন গল্প পড়ার মত,"—"গাছের ছায়ায় যদি একটী অপ্সরী দেখিতে পাইতাম তাহার সহিত মধুর একটী মানব জীবনের গল্প দুই জনে মুখে মুখ দিয়া, তাহার শ্বেত হস্তে হাত রাখিয়া সুখে পড়িতাম।

এই কোমল ভাবের মধ্যে যৌবনের আশা মধ্যে মধ্যে যেন ভাসিয়া ওঠে—যৌবনের যে তেজে পৃথিবী সহজে অধিকার করিতে পারিব বিগত গৌরব আবার জগতে পুনরায় আনিব—ক্ষীণ কীটসের কণ্ঠেও শোনা যায়। পূর্ব্বের গৌরব একেবারে গিয়াছে তাহা কি আর ফিরিয়া আসিবে না? সূর্য্য, চন্দ্র তারকা লইয়া লোকে আগে খেলা করিত, আজকাল কেন তাহা পারিবে না। আলোকের রশ্মি দিয়া, আগুণ চারিদিকে ছড়াইয়া সূর্য্যদেবতার অশ্ব গুলি কেন আজ কাল চালাইতে পারিব না—এ কথা কীটস্ কত স্থানে কত ভাবে বলিয়াছেন।

গ্রীসের একটী প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্র সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শোন—"প্রশান্তির কুমারী কন্যা তুমি, বনভূমির ইতিহাস তোমাতেই আছে, ছন্দেও আমরা যে উপন্যাস বলিতে পারি না, তুমি কেমন মধুর ভাবে তাহাই বলিতেছ। কোন দেশের কোন দেবতার, কোন মানবের, পল্লবিত উপকথা তোমার অঙ্গ বেড়িয়াছে। তোমার গায়ে যে গাছের পাতা আছে তাহা চিরদিন থাকিবে, তোমার গায়ে যে প্রণয়ীর মূর্ত্তি আছে তাহারা চিরদিন প্রণয়ী থাকিবে, যে হর্ষ, যে আনন্দ, যে উৎসবের কাহিনী তোমার কপোলে আছে তাহাও চিরদিন থাকিবে। তুমি আমাদিগকে যুগযুগান্তরের খেদ, ক্লান্তি, দুঃখ, আবেগের মধ্যে থাকিয়া এই মাত্র শিক্ষা দিতেছ—সৌন্দর্য্যই পূর্ণসত্য এবং যাহা সত্য তাহা পূর্ণভাবে সুন্দর, জীবনে ইহাই তোমরা জানিবে, ইহা ভিন্ন আর কিছু জানিবার নাই"।

কীটস যিনি মন দিয়া পড়িয়াছেন তাঁহার নিশ্চয়ই মনে হইবে যে অনেক ক্ষীণ, অসম্পূর্ণ, অপাঠ্য কবিতার মধ্যে কত সৌন্দর্য্য ছড়ান আছে। কেন বল দেখি? একটা কিছু শেষ করা খানিকটা বলের পরিচয়, শেষ না করা কিম্বা শেষ করিবার ইচ্ছা না হওয়া দুর্ব্বলতা বুঝায়, কিন্তু দুর্ব্বল কীটসের প্রতিভার বল ছিল, যে প্রতিভাশালী সে কখন নিতান্ত দুর্ব্বল হইতে পারে না, তাহার মজ্জাতে বল থাকিবেই থাকিবে। কীটসের কবিতাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—প্রথম গুলি সাধারণতঃ অপাঠ্য—যাহা তিনি ২২ বৎসর বয়সে প্রকাশ করেন;—দ্বিতীয়, মধ্যম রকমের কবিতা যাহা ২৩ বৎসর বয়সে লেখেন; তৃতীয়গুলি পূর্ণ প্রতিভা সম্পন্ন, সে গুলি ২৫ বৎসর বয়সে লেখেন, তাহার চারিমাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেলির মত এই অসাধারণ শিশু সহসা অসাধারণ কবি হইয়া উঠিয়াছিল। "নাইটিংগেল"—এর উপর কবিতাটি অতি আশ্চর্য্য রচনা। "লেমায়া" (Lamia) ইংরাজী কবিতার মধ্যে একটী উজ্জ্বলরত্ন। ইভ অব সেণ্ট অ্যাগ্নেসের "The Eve of St. Agnes," সঙ্গীত কেমন বিশুদ্ধ, তাহার চিত্রকার্য্য বর্ণসংযোগ কত ভাল।

Maia (মায়া) অপূর্ব্ব একটী অসম্পূর্ণ কবিতা। আমার অনুরোধ কীটস যিনি পড়িবেন তিনি আমি যেরূপ কবিতা ভাগের কথা বলিলাম সেইরূপ করিয়া পড়িবেন, তখন বুঝিবেন কীটস কিরূপ কবি।

শেষ কথা কীটস্‌কে সমালোচনায় মারে নাই। শেলি যে বিশ্বাসে Adonais লেখেন সে ভূল বিশ্বাস। এডনেয়স শেলীর ও কীটসের উভয়েরই উপযুক্ত। যাহার কবিতাতে অতদূর প্রতিভা ছিল, তাহাকে ক্ষুদ্র সমালোচনে খুন করিতে পারে না।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

নাসিক হইতে।

খুড়ার পত্র।

কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেন বাবু মেরা,
সুরেন বাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা।
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা—
মহিনা-ভর্ কুছ খবর্ মিলেনা ইয়েত নহি আচ্ছা!
টপাল্,* টপাল্, কঁহা টপালরেঁ, কপাল হমারা মন্দ,
সকাল বেলাতে নাহি মিল্‌তা টপাল্‌কো নাম গন্ধ!
ঘরকো যাকে কায়কো বাবা, তুম্‌সে হম্‌সে ফর্‌খৎ।
দো-চার কলম লীখ্ দেওঙ্গে ইস্‌মে ক্যা হয় হর্‌কৎ!
প্রবাসকো এক সীমা পর হম্ বৈঠ্‌কে আছি একলা—
সুরি বাবাকো বাস্তে আঁখ্‌সে বহুৎ পাণি নেকলা।
সর্ব্বদা মন কেমন কর্‌তা, কেঁদে উঠ্‌তা হির্দ্দয়—
ভাত খাতা, ইস্কুল যাতা, সুরেন বাবু নির্দ্দয়!
মন্‌কা দুঃখে হুহু কর্‌কে নিক্‌লে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেক্‌তা কানে বাঙ্গলাকো জবানী।
মেরা উপর জুলুম কর্‌তা তেরি বহিন বাই,
কি করেঙ্গা কোথায় যাঙ্গা ভেবে নাহি পাই!
বহুৎ জোরসে গাল টিপ্‌তা দোনো আঙ্গ্‌লি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজ্‌না বাজাতা থেকে থেকে,

---

* চিঠির ডাক।

কভী কভী নিকট আকে ঠোঁটমে চিমৃটি কাটতা,
কাঁচি লে কর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো সব ছাঁটতা,
জজ সাহেব কুছ বোল্‌তা নহি রক্ষা কর্‌বে কেটা
কঁহা গয়োরে কঁহা গয়োরে জজ্‌ সাহেবকি বেটা !
গাড়ি চড়কে লাঠিন পড়কে তুম্‌ত যাতা ইস্কিল্‌,
ঠোঁটে নাকে চিমৃটি খাকে হমারা বহুৎ মুস্কিল !
এদিকে আবার party হোতা খেল্‌নেকোবি যাতা,
জিমৃখানামে হিমৃকিম্‌ এবং থোড়া বিস্কুট খাতা।
তুম ছাড়া কোই সমজে না ত হম্‌রা দুরাবস্থা,
বহিন তেরি বহুৎ merry খিল্‌ খিল্‌ কর্কে হাস্তা !
চিঠি লিখিও মাকো দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম
আজকের মত তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।

কলঙ্ক।

১

ভীলগ্রাম হইতে কিছু দূরে, আবগড় অরণ্যের অপেক্ষাকৃত নিম্নাংশে একলিঙ্গদেবের মন্দির, এই মন্দিরের মৃত পুরোহিতের পত্নী কমলাবতী তাঁহার পুত্র কন্যা দুইটিকে লইয়া এইখানে বাস করেন। পুত্রটিই আমাদের যুবক। যুবকের নাম কি তাহা এখনো বলা হয় নাই, তাহার নাম শৈলেশ্বর; কিন্তু তাহার মাতা কোন তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় একটী পর্ব্বত গুহায় তাহার জন্ম হইয়াছিল ইহা হইতে লোকে তাহাকে গুহা বলিয়াই ডাকে। ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াও গুহার স্বভাব ছেলেবেলা হইতেই নেহাত ক্ষত্রিয়; ছেলে বেলা হইতে সে গ্রামের ভীল ও রাজপুত সন্তানদিগের সহিত মিশিয়া খেলিয়া বেড়ায়, পাহাড়ের দুরারোহ্য স্থানে ছুটিয়া উঠে, পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ ধার দিয়া, তরবারের মত লক্‌ লক্‌ করিতে করিতে শীকারের পশ্চাতে ছুটে; পুত্রের কীর্ত্তি দেখিলে কমলাবতী ভয়ে চেঁচামেচি করিয়া সারা হন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না. কিছুতেই সে অন্যান্য ব্রাহ্মণসন্তানদিগের মত প্রতিদিন পাততাড়া হাতে বহিয়া, সারাদিন পড়া আওড়াইয়া, আর ভীলদিগের দুঃসাহসিক খেলার দিকে মাঝে মাঝে বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়াই যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করে না, সে নিজে তাহাদের মধ্যে একজন হইতে চায়।

অনেক বলিয়া কহিয়া কমলাদেবী দিনকতক তাহাকে পাঠশালায় দিয়াছিলেন; কিন্তু সমস্ত প্রভাতটা সঙ্গী বালকদিগকে ছাড়িয়া, ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া মুক্ত পাহাড় প্রদেশ ছাড়িয়া

একটী সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ থাকিতে তাহার এতই কষ্টকর লাগিত যে তাহার মাতা বিশেষত দিদির অনুরোধের জন্য নহিলে গুরু মহাশয়ের সহস্র শাস্তিতেও তাহাকে সেখানে রাখিতে পারিত না। তবে এতটা কষ্ট করিয়া যে সে দিদিদের কথা রাখিত যতটা পারে পাঠশালার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাহার শোধ তুলিয়া লইত। দু একটা দৃষ্টান্ত দিই।

একদিন গুরু মহাশয় ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন কএ আকার দিলে কি হয়? সকলে বলিল 'কা'। যুবক মাটী হইতে একটা ঢিল কুড়াইয়া সম্মুখের গাছের একটা কাকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মারিল, কাকটা কাকা করিয়া ভূমিতে পড়িল—যুবক তাহার প্রতি আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল। গুরু মহাশয় রাগিয়া তাহাকে এক পায়ে দাঁড়াইতে আজ্ঞা করিলেন—কিন্তু ঐরূপ বে-আইনি কাজ করিয়া তখন তাহার এতটা আমোদ হইয়াছিল যে কিছুতেই সে দিন গুরুমহাশয় তাহাকে পাঠশালায় রাখিতে পারিলেন না, অনেক ছাত্রের হাত এড়াইয়া সেদিন সে পলাইয়া গেল।

এ ঘটনাটি গুহার হাতে-খড়ি অবস্থার ঘটনা, সুতরাং গুরুমহাশয় ভাবিলেন, ক্রমে পড়াশুনায় (সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিতেও) তৈয়ার হইয়া আসিলে তাহার এ সব দোষ শুধরাইয়া যাইবে। গুরুমহাশয় নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছিলেন—দোষে গুণে সে সমান রূপে তৈয়ার হইতে লাগিল। ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে একদিন সে উক্ত ঘটনা অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ করিয়া বসিল—একটী সূত্র মুখস্থ বলিবার সময় এক বলিতে আর বলিয়া গেল। বলিবে—

রলয়োর্ডলয়োস্তদ্বৎ জয়য়োর্ববয়োরপি"

তাহা না বলিয়া বলিল—

"রলয়োডলয়োস্তদ্বৎ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োরপি"

গুরুমহাশয় প্রায়ই তাহাকে গালাগালি দিয়া বলিতেন, "হতভাগা. ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে ক্ষত্রিয় হলি—" তাই সে সুবিধামত নজীর দেখাইয়া দিল। গুরু মহাশয় মহাক্রুদ্ধ হইয়া পাঠশালার পাশের ঘরে তাহার হাতকড়ি লাগাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। খানিকক্ষণ পরে আসিয়া দেখেন—গুহা সেখানে নাই; পশ্চিম দিকের দেয়ালে যে অল্প একটু গর্ত্ত ছিল তাহা মস্ত হইয়াছে, দেয়ালের কতকগুলি বাখারি মেজেতে পড়িয়া আছে—তাহার মধ্যে ধনুকদশা-প্রাপ্ত একখানির ধারে বাণ স্বরূপ একটা কলম ঝুলিতেছে। ঘরের টাঙ্গান কড়ির দোলনায় একটিও কড়ি নাই, কড়িগুলা ঘরময় গড়াগড়ি যাইতেছে। বাখারির ধনুকে কলমের বাণ অর্পিত হইয়া যে তাহা এই কড়িগুলার প্রতি এতক্ষণ প্রযুজ্য হইয়াছিল তাহা বুঝিতে গুরুমহাশয়ের বাকী রহিল না;—কড়ির উপর দিয়াই যে বাণের লক্ষ্যটা গিয়াছে, ইহাতে তিনি মনে মনে সৌভাগ্য জ্ঞান করিলেন। যাই হোক শাস্তি দিয়া গুহার যে কিছু হইবে না সেই দিন গুরুমহাশয়ের হৃদয়ঙ্গম হইল। পরদিন গুহা আসিবামাত্র বলিলেন—"বাবা. উত্তম বলিয়াছ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে কিছু মাত্র ভেদ নাই—তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়া ক্ষত্রিয় হও, পড়াশুনা তোমার যথেষ্ট হইয়াছে।"

যুবকের এইরূপ স্বভাবের জন্য এখন পর্য্যন্ত সে উপবীত হয় নাই। কমলাবতী ক্রমাগতই বলেন "আরো কিছুদিন থাক্, ছেলে বুদ্ধিটা ঘুচিয়া বুদ্ধিশুদ্ধি একটু পাকুক তখন উহার পৈতা দেওয়া যাইবে।" কথাটা এই, উপবীত হইবার আগে যা কর তবু সাজে, কিন্তু তাহার পর যুবকের এরূপ ব্যবহার অমার্জ্জনীয় হইবে। এমনিতেই ত আত্মীয় স্বজনের কথার জ্বালায় কমলাবতী অস্থির, তাঁহার পুত্রের জন্য তাঁহার যত না মাথা ব্যথা, তাঁহার জাতি কুটুম্ব দিগের ত তদোধিক। অধিক কথা কি, গ্রামের ব্রাহ্মণদিগের রজা সজা বেঁড়ে খুদে ব্যাং প্রভৃতি দুগ্ধপোষ্য যে শিশুগুলি আছে তাহারাও যুবককে দেখিলে আপনার লোকের মমতায় অধীর হইয়া ছিছি করিয়া উঠে, ও নানা রূপ ভঙ্গীতে সুপরামর্শের চোখা চোখা বাক্যবাণ গুলি তাহার উপর বর্ষণ করিতে ছাড়ে না;—সেই মমতার জ্বালায় শশব্যস্ত হইয়া গুহা আপনার লোক দেখিলে এক ক্রোশ দূর হইতে ছুটিয়া পলায়। আপনার লোকদিগের সহিত তঁ তাহার এইরূপ সম্পর্ক, এইরূপ প্রাণের মিল। বলিতে গেলে, মা ও বোন ছাড়া তাহার আপনার লোকই নাই। অনেকের সঙ্গে সে খেলিয়া বেড়ায় বটে; কিন্তু দিদিই তাহার একমাত্র প্রাণের দোসর, দিদির মত সে কাহাকেও তাহার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী দেখে না, ভীলবালকদিগের সহিত খেলিলে দিদি তাহাকে কখনো বকেন না, শীকারে, খেলায় জয়ী হইয়া আসিলে তাহার অপেক্ষা যেন তাহার দিদির অধিক আনন্দ হয়, মা যদি রাগ করিয়া কখনো ধনুক ফেলিয়া দিতে বলেন, দিদি মাকে অনুনয় করিয়া তাঁহার কথা ফিরাইয়া লয়; দিদি তাহার বড় ভাল, দিদির মত কাহাকেও সে ভাল বাসে না;—দিদি কোন কথা বলিলে কষ্ট করিয়াও সে তাহা পালন করে; (তবে তাহার বিশেষ ভালর জন্য নহিলে কষ্টে রাখিতে হইবে এমন অনুরোধও দিদি করেন না।) তাহার যতটুক লেখাপড়া হইয়াছে তাহা তাহার দিদির জন্যই হইয়াছে। দিদিকে সে এতই ভাল বাসে যে ছেলেবেলা যখন সে বড় দুষ্টুমি করিতেছে যদি কমলাবতী বলিলেন—"তরে সত্যবতী তোর দিদি হইবে না—কিম্বা—তাহাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দিব" অমনি গুহার খেলা ধূলা দুষ্টুমির শেষ। তাহাকে জব্দ করিবার এমন উপায় আর ছিল না। তবে কমলাবতী ছাড়া এরূপ কথা অন্যে বলিলে আর রক্ষা নাই। একবার অত শত না বুঝিয়া একজন ছেলে তাহাকে এইরূপে ক্ষেপাইতে গিয়া এমন শিক্ষা লাভ করিয়াছিল যে সেই হইতে কেহ কখনো এরূপ কথা তাহাকে বলে নাই।

এখন যে সে এত বড় হইয়াছে—এখনো এরূপ ঠাট্টা সহ্য করিতে পারে না, এত সবল হইয়াও এ সম্বন্ধে সে নেহাত দুর্ব্বল, নেহাত শিশু।

যখন তাহার দিদি প্রথম শ্বশুর বাড়ী যায় তাহার কি কষ্টই হইয়াছিল, দিদি বাড়ী আসিলে তেমনি আনন্দ।

এবার দিদি বাড়ী আসিয়া অবধি শীকারের ঝঞ্ঝাটে তাহার আনন্দ যে সে পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে পারে নাই, দিদির সহিত প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে পায় নাই ইহাতে তাহার

বড়ই কষ্ট হইতেছে, শীকারের মধ্যে, উৎসবের মধ্যে—তাহার অভিষেকের মধ্যেও সে দিদিকে ভুলে নাই, তাহার কাছে ছুটিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছে, যখনি তাহার অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ হইল, সে যেন বাঁচিয়া গেল, তখনি ভীল দিগের আদর অভ্যর্থনা হইতে কষ্টে রেহাই লইয়া অধীর চিত্তে সে গৃহাভিমুখী হইল।

৮

বিকাল বেলা, এক লিঙ্গ দেবের মন্দিরের পার্শ্বে একটা উচ্চ প্রশস্ত ভূমিতে পশ্চিমের এক খণ্ড লাল মেঘের আলোর মধ্যে দাঁড়াইয়া একটী বালিকা ভীল গ্রামের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়াছিল। হঠাৎ আকাশের সেই লাল মেঘখানার মত তাহার মুখখানি হাসি হাসি হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি পাশের কামিনী গাছের ঝোপের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু পরেই গুহা সেই উচ্চ ভূমিতে আসিয়া দিদি দিদি করিয়া ডাকিতে ডাকিতে চারিদিকে তাহাকে খুজিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবশেষে কামিনী গাছের কাছে আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিয়া বলিল—"কেমন জব্দ—ধরেছি—" দিদি খিল খিল করিয়া হাসিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার নূতন বেশ দেখিয়া বলিল—"এ কি গুহা, একি ভাই" ? গুহা হাসিয়া বলিল "রাজবেশ। দেখছিস কি আমি রাজা হয়েছি'

"আমরি কি রাজ বেশেরই শ্রী।" বালিকা হাসিয়া বাঁচিল না। হাসিটা শেষ হইলে গুহার সাজটা ভালরূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল "গুহা সত্যি যদি তুই রাজা হ'স ! এই ঘাসের মুকুটটা তাহলে সোনার মুকুট হয়ে পড়বে ? এই সুন্দর দুধের শরীর জরির পোষাকে এঁটে চারি পাশের লোকজনের মধ্যে সোনার সিংহাসনে গ্রামভারী চালে বসে থাকবি ? ওমা সে কি বিশ্রী" !

সে চেহারাটা সত্যবতীর বড়ই খারাপ লাগিল, চেহারাটাকে একেবারে ধ্যাঁচ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে আরো বার দুই তিন ধরিয়া ক্রমাগত সে ছিছি করিয়া উঠিল কিন্তু তাহাতেও মন না উঠায় শেষে গুহাকে আদর করিয়া, তাহার খালি বুকে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার বলিল "এ আমাদের কেমন গুহা, ছি সে কি বিশ্রী ' ইহার পর সে চেহারা খানির ভাল হইবার আর কোনই যেন সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু গুহা বলিল " কেন বিশ্রী কেন ! আমি রাজা হব তুই রাজার বোন হবি, মা রাজার মা হবেন সে কি বিশ্রী হোল"

দিদি বলিল "তা রাজা হয়ে যদি তুই আমাদের ভুলে যাস ? এইত স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ রাজা হয়ে যশোদাকে ভুলে গিয়েছিলেন !"

বুঝি এই আশঙ্কাতেই গুহার রাজমূর্ত্তিটা সত্যবতীর এত খারাপ লাগিয়াছিল। এ কথায় গুহার হাসিমুখ গোমসা হইয়া গেল, সে বলিল "কি এক ঠাট্টা ! ও কথা আমার একটুও ভাল লাগেনা" দিদি হাসিয়া গুহার দুই গাল ধরিয়া টিপিয়া দিল, তাহার পর মাথা নাড়িতে

নাড়িতে বলিল "যেমন ভাই তেমনি বোন? তুই রাজাও হলি, আর আমাদের ভুলেও গেলি"? গুহা গম্ভীরভাবে বলিল "সত্যিই আমি রাজা হইয়াছি। ভীলরাজ তাঁর রাজ্য আজ হইতে আমাকে দিয়াছেন।" বলিয়া সংক্ষেপে সে সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। বালিকার মুখ হঠাৎ কেমন মলিন হইয়া পড়িল, চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, তাহার চোখের জলের কুয়াশায় গুহার মাথার ঘাসের মুকুট, গলার পাতার মালা, কপালের রক্ত ফোটা, হাতের রাজদণ্ড ক্রমশ স্ফীত হইতে হইতে গুহার আকৃতি খানি তাহার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িল, ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া গেল, ঢাকিয়া যাইতে লাগিল, শেষে একেবারে মিলাইয়া গেল,—সত্যবতী চমকিয়া চোখের পাতা বন্ধ করিয়া আবার চোখ খুলিয়া গুহার দিকে চাহিল, আস্তে আস্তে বলিল "গুহা তুই রাজা হইয়াছিস, হয়ত আমাদের মত দীন হীন লোক আর তোর আপনার থাকিবে না। যদি তাই হয় হোক; কিন্তু আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক; রামের মত ন্যায়বান হইয়া প্রজা পালন কর।"

গুহা ব্যথিত করুণ দৃষ্টিতে দিদির দিকে চাহিয়া বলিল "দিদি আমি কি এত অবিশ্বাসের কাজ করেছি—যে আমার স্নেহ মমতার উপর তোমার এই সন্দেহ—"

বালিকা কষ্টের স্বরে বলিল "সন্দেহ না ভাই—কিন্তু—সত্যি যদি" কি বলিতে গিয়া বাধিয়া গেল, যুবক ব্যথিত হইয়া বলিল "সন্দেহ-না—আমি সত্যই তোমাদের পর করিব?" বালিকা বলিল "নানা তা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি তুই পর না করিলেও লোকেত পর বলিতে পারে—"

গুহা আশ্চর্য্য হইল, ক্রুদ্ধ হইল, গুহা রাজা হইয়াছে বলিয়া তাহার আপনার লোককে লোকে তাহার পর বলিবে? সে রোষ কম্পিত স্বরে আরক্তিম লোচনে বলিল—"লোকে তোমাদিগকে পর বলিবে!" কটীর বাণফলকে তাহার হাত পড়িল, বলিল যদি আমি মানুষ হই ত এতদিন এই যে বাণ পশুবক্ষ বিদ্ধ করিয়াছে ইহা সেই হতভাগ্যের শোণিত পান করিবে" সত্যবতী বলিল "কিন্তু যদি—সত্যি"—

হঠাৎ থামিয়া গেল, কামিনীগাছের ঝোপের ওপিঠ হইতে দুইটা চক্ষু তাহার চোখে পড়িল—সে বলিল "কেও আসিয়াছে?" গুহা সেই দিকে চাহিয়া বলিল—"কেও—" উত্তর হইল "মুইডা তাল গাছ" ভীলপুত্র কিছু বেশী রকম লম্বা ছিল বলিয়া উহাকে সবাই বলে তালগাছ। যুবক বলিল "তুই ডা এখন এখানে যে".

'ভীল পুত্র বলিল "কথাডা আছে এ দিকে আয়" যুবক বলিল "একটু পরে শুনিব—এখন যা" সে বলিল "উঁহু" তা হইবু না—এদিকে আয়" সত্যবতী বুঝিলেন তাঁহার সাক্ষাতে সে বলিতে চাহে না, আর তিনিও নির্জ্জনে গিয়া একবার প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন,—যে কথা গুহাকে বলিতে চান তাহা বলিবার আগে, একাকী কাঁদিয়া সবল হইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। সত্যবতী আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন, গুহা ঝোপ ঘুরিয়া তালগাছের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

৯

এত শীঘ্র যে ভীলপুত্র আবার গুহার মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইবে খানিকক্ষণ আগে তাহা সে জানিত না। খানিকক্ষণ আগে তাহার স্থিতি গতি সমস্তই একটা অন্ধকার অনিশ্চিতের মধ্যে নিহিত ছিল। পিতার আজ্ঞায় নব-অভিষিক্ত গুহাকে প্রণাম করিয়া সে যখন অলক্ষ্যে উৎসবের জনতা হইতে সরিয়া পড়িল, গভীর যন্ত্রণার একটা গুরুবলে চালিত হইয়া সে যখন দিগ্বিদিক লক্ষ্যহীন হইয়া চলিতে লাগিল, তখন সে জানিত না কোথায় গিয়া তাহার সে গতির অবসান। কেহ জানিতে পারে না; অদৃষ্টের তাড়নার কোথায় গিয়া শেষ কেহ জানিতে পারে না, যখন তারকা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চলে—উল্কাপিণ্ড কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে, তখন কোথায় গিয়া তাহাদের শেষ তাহারা জানিতে পারে না—ভস্ম হইতে হইতে তবে তাহাদের সে চেতনা জন্মে।

ভীলপুত্রের যখন চেতনা জন্মিল তখন সে মৃত্যুর সম্মুখে—তাহার সম্মুখেই পর্ব্বতের শেষ, আর একপদ অগ্রসর হইলে অনন্তের অস্তিত্বে সে তখন বিলীন হইয়া পড়িবে, ভীলপুত্র থমকিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু কেন দাঁড়াইল?

সম্মুখের ঐ যে গহ্বর—চরাচর গ্রাস করিতে মুখ ব্যাদান করিয়া আছে, উহা কি তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য স্নেহে আহ্বান করিতেছে না, তবে ও স্নেহের ডাক উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া কেন সে? জীবনে আর তাহার কি আবশ্যক? তাহার পিতার স্নেহ যখন ফুরাইয়াছে—তখন জীবনে আর তাহার কি সুখ? জীবনে এখন যাহা পাইবার আশা নাই, বরঞ্চ মৃত্যুতে এক দিন সে তাহা পাইতে পারে, তাহার মৃতদেহ কোলে লইয়া পিতার এক দিন কাঁদিবার সম্ভাবনা আছে, মৃত্যুতে পিতার স্নেহ এক দিন ফিরিতে পারে—জীবনে নহে। তবে কি জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই তাহার প্রার্থনীয় নয়?

তাহার দুই চক্ষু ভাসিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে পাশের গাছের একটা ডাল নুয়াইয়া ধরিয়া ঘূর্ণ্যমান মস্তক তাহার উপর রাখিল; কতক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল সে তাহা জানে না,—হঠাৎ কাহার স্পর্শে চমকিয়া—ফিরিয়া দাঁড়াইল. দেখিল মন্দালিক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাহার মনে হইল সে স্বপ্ন দেখিতেছে। মন্দালিক স্নেহের স্বরে যখন বলিলেন "বাছাডা তোর কি হউছুরে?" তখন ভীলপুত্রের মনের আবেগ আর রহিল না, সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—বাবাডারে মুই তোর কি করুছি, কোন দোষেরে মোরে তুই তেয়াগ করিলি?"

সে করুণ স্বর—সে কাতর ক্রন্দন মন্দালিকের হৃদয় বিদ্ধ করিল তিনি বিচলিত, হইয়া পড়িলেন—তিনিই যে পুত্রের কষ্টের কারণ তাহা বুঝিতে পারিলেন, অথচ তাহা না হইয়াও যেন উপায় ছিল না, তাঁহার মনে হইল—তিনি যেন একটা যন্ত্রমাত্র। তিনি কম্পিত কণ্ঠে আগেকার ভাষায় বলিলেন (আমরা সাদা ভাষাতেই এখন হইতে বলিয়া যাই) "বৎস পিতা হইয়া পুত্রকে কি কেহ ত্যাগ করিতে পারে" পুত্র বলিল "তবে আমার এ দশা কেন?"

পিতা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, ছোট বেলায় যেমন আদর করিতেন সেইরূপ আদর করিয়া বলিলেন "ও আমার বাছল রে, তালগাছড়ারে, তোকে আমি ত্যাগ করিব। আপনার সন্তানকে আমি ত্যাগ করিব।" পিতার স্কন্ধে ব্যথিত মস্তক রাখিয়া ভীলপুত্র কাঁদিতে লাগিল, আগেও কাঁদিয়াছিল—এখনো কাঁদিল; এ কান্নায় আর সে কান্নার কত তফাৎ! এইরূপ পিতার কাঁধে মাথা রাখিয়া সুখের কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল,—আর আগেও এক বার মরিতে চাহিয়া ছিল, এই দুই রূপ মৃত্যুতে কত তফাৎ! ভীলরাজ তাহার অশ্রু মুখ হইতে মুছাইতে বলিলেন, "তোর কি সিধু গোয়ালিনীকে মনে পড়ে, মা হইয়া সে সন্তানকে নদীর জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিল মনে আছে কি? সন্তানের প্রতি তাহার কি স্নেহের অভাব ছিল বৎস! তাহাকে ভাসাইয়া সেই শোকে সেও কি প্রাণত্যাগ করে নাই? তবে সে এমন কাজ করিল কেন? সে জানিয়াছিল তাহা দেবতার কাজ, তাহা না করা তাহার ক্ষমতায় নাই, তাহা না করিলে তাহার সন্তানের মঙ্গল নাই। পুত্র, আমিও তোমাদের মঙ্গলের জন্যই, তোদের সত্য রক্ষার জন্যই—দেবতার কার্য্য জ্ঞানে তোমার স্থলে অন্যকে রাজ্য দিয়াছি। কিন্তু আমার হৃদয় আমার স্নেহ সে আর কাহারো নহে, তাহা তোমার জন্যই রহিয়াছে"

"সত্যই কি তবে পিতার স্নেহ তাহারি আছে, ভীলপুত্র কি এতক্ষণ তবে স্বপ্ন দেখিতেছিল—মিথ্যা একটা কুহকের মধ্যে ডুবিয়াছিল!" পিতার সে স্নেহের কথায়, সেই স্নেহের আলিঙ্গনে, দীর্ঘকালব্যাপী একটা দুঃস্বপ্ন যেন তাহার হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল, অনেক দিন পরে একটা মহাঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া প্রগাঢ় শান্তিতে তাহার হৃদয় ডুবিয়া গেল, সে শিশু কালের নির্ভর ভাবে. শিশু কালের বিশ্বাস ভরে পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিতান্ত শিশুটির মত বলিল "বাবা আমি রাজ্য চাহি না,—তোর এই বুক আমার থাকিলে আমি কিছুই চাই না আর—"

ভীলরাজ বলিলেন "ইহা ত চিরকাল তোরি আছে বৎস" ভীলপুত্র পিতার স্কন্ধ হইতে মুখ তুলিয়া তাঁহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া এমনি দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল—যেন সে তাহার পিতার নিকট কত অপরাধই করিয়াছে—একটু পরে বলিল "এতদিন আমি তা বুঝি নাই—আমি মনে করিতাম গুহা আমার শত্রু"

ভীলরাজ একটু থামিয়া বলিলেন "আপনি আপনার শত্রু না হইলে জগতে কেহ কাহারো শত্রু নাই। বৎস এখন ত বুঝিয়াছ গুহা তোমার শত্রু নয়?"

পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া. পিতার বুকে আশ্রয় পাইয়া. পিতার স্নেহে পূর্ণ হইয়া. তাহার আর তখন কাহাকেও শত্রু জ্ঞান ছিল না তাই সে বলিতে পারিয়াছিল "আমি মনে করিতাম গুহা আমার শত্রু" তাই সে আবার বলিল—'আমার কেহ আর শত্রু নাই বাবা"

মন্দালিক বলিলেন "বৎস তবে এই মুহূর্ত্তে তাহাকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া এস, সময় চলিয়া গেলে এ ভাব নাও থাকিতে পারে। এখন এ শুভ সময়ে যাহাকে মিত্র

বলিবে, পরে আর তাহাকে শত্রু মনে হইবেনা" অনেক কষ্টের পর, অনেক দিনের পর ভীলপুত্রের হৃদয় প্রেমের সুখে পূর্ণ. উথলিত, বিশ্ব সংসারকে প্লাবিত করিতে যেন ব্যগ্র, গুহা সেই বিশ্ব সংসারের একজন, গুহাকে কেন সে তাহার প্রেমের ভাগ না দিবে, সে অকুণ্ঠিত চিত্তে আবার বলিল "সে আমার শত্রু নয় বাবা—আমি তাহাকে আলিঙ্গন করিব" মন্দালিক বলিলেন "তবে এখনি যাও বৎস এ মুহূর্ত্ত অবহেলা করিও না"

যাইবার আগে ভীলপুত্র পিতাকে আর একবার আলিঙ্গন করিল।

দুই এক পদ গিয়া সে আবার থামিয়া দাঁড়াইল—ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা ডা একটা কথা মনে হইল, গুহা ত রাজা হইবার নয়" ভীলরাজ বিস্মিত হইলেন—বলিলেন এ কথা কেন পুত্র ! তোমার কি এখনো রাজ্যলোভ আছে ? আমি রাজ্য ছাড়িতে পারিলাম তোর এখনো লোভ আছে" ! সে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল "তুই রাজ্য ছাড়িলি—আমি রাজ্য চাহিব ! আমি কেবল শুধাই এই, গুহা ব্রাহ্মণ পুত্র. তবে সে রাজা হইবে কিরূপে ? তুই ত বলিয়াছিস—রাজ পুরুষ না হইলে মোদের বংশে কেহ রাজা হইতে পারে না"—

ভীলরাজ একটু নিস্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিলেন "তবে শোন। গুহা ব্রাহ্মণ পুত্র নহে, রাজপুত্র। উহাকে রাজা করিলে আমাদের নিয়ম ভাঙ্গে না। ভীলপুত্র বিস্মিত হইয়া পিতার প্রতিধ্বনির মত বলিল "গুহা ব্রাহ্মণ পুত্র নহে, রাজপুত্র" ! ভীলরাজ বলিলেন "হাঁ"

তবু যেন তার সন্দেহ ঘুচিল না—সে আবার বলিল "গুহা ব্রাহ্মণ পুত্র নহে ? গুহা তবে কমলাবতীর সন্তান নহে ?" ভীলরাজ বলিলেন "না কমলাবতী উহার কেহই নহে, প্রতিপালিকা মাত্র"। ভীলপুত্র আর কোন কথা কহিল না. এক বার চারি দিকে বিস্ময়-নেত্রে চাহিয়া দেখিল,—চারিদিকে আর সব ঠিক আগেকার মত আছে কি না. বুঝি তাহার সন্দেহ জন্মিল ; কিন্তু আর কিছুই বেঠিক না দেখিয়া আস্তে আস্তে গন্তব্য পথে পদক্ষেপ করিল। ভীলরাজ বলিলেন "গুহা ভীলগ্রামে নাই, মন্দিরের পথ ধর" ভীলপুত্র মন্দিরের পথে নামিতে নামিতে, মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া যতবার সেই উচ্চ ভূমির দিকে চাহিয়া দেখিল—ততবার তাহার পিতার স্থির মূর্ত্তি ছবির মত তাহার চোখে পড়িল।

১০

ভীলগ্রাম দূরে পড়িয়া গেল. উৎসবের কোলাহল স্তব্ধতায় মিলাইয়া পড়িল, ভীলপুত্র নিস্তব্ধ বিজন পথে আসিয়া পড়িয়া যখন আবার উপর দিকে চাহিল আর পিতাকে দেখিতে পাইল না, যে উচ্চ ভূমিতে পিতা দাঁড়াইয়াছিলেন—দেখিল তাহা অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ বড় যেন তাহার একাকী বলিয়া মনে হইল, বড় যেন একটা শূন্যতা তাহার মনের মধ্যে আসিয়া পড়িল, যে উৎসাহরাশি, যে স্নেহ রাশি সঙ্গে লইয়া সে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল চারিদিকের বিজনতার মধ্যে সে সব যেন সে হারাইয়া হারাইয়া

চলিতে লাগিল। অবসর পাইয়া নানা রূপ ভাবনা তাহাকে আক্রমণ করিল, পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহার আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া তাঁহার কথা গুলির যেরূপ স্নেহময় মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, এই দুশ্চিন্তায় পেষিত হইয়া তাহারাও বিকৃত হইয়া পড়িতে লাগিল.—ক্রমশ ভীল পুত্রের মনে হইতে লাগিল, "গুহার সঙ্গে তাহার মিত্রতার জন্য পিতা যে এত উৎসুক তাহা কি গুহার মঙ্গল জন্যই নহে, এ উপায়ে গুহার পথের কণ্টক দূর করাই কি তাঁহার অভিপ্রায় নহে?"—পিতার প্রতি কথা তলাইয়া তাঁহার সে কথাগুলিতে এখন সে গুহার প্রতিই তাঁহার স্নেহের ভাব দেখিতে লাগিল।

যে হৃদয়ে একবার সন্দেহ প্রবেশ করিয়াছে, অবিশ্বাসের আঘাতে যে হৃদয় একবার ক্ষত হইয়া পড়িয়াছে, সে হৃদয় প্রতি মুহূর্ত্তে স্নেহের শীতল স্পর্শ অনুভব করিতে না পারিলে অবিরত স্নেহের আশ্বাস বাণীরূপ ঔষধের প্রলেপ না পাইলে—একেবারে আরোগ্য লাভ করিতে চাহে না. সে ক্ষত পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া দেখা দেয়।

পিতার স্নেহের বাঁধন হইতে দূরে আসিয়া পুত্রের ভাঙ্গন-ধরা বিশ্বাস আস্তে আস্তে খসিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতেই সে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিল না. তাহার মনের মধ্যে একটা নৈরাশ্যের আগুণ হুহু করিয়া উঠিল। এই নৈরাশ্য লইয়া এই কষ্টের মন লইয়া কেমন করিয়া সে এখন গুহাকে আলিঙ্গন করে! যে প্রেমের ভাব হৃদয়ে ধরিয়া সে গুহাকে বন্ধু বলিতে আসিতেছিল—সে ভাব ত তাহার এখন নাই, তবে এখন সে কি করিবে? এই কথা বলিতে আবার কি পিতার নিকট সে ফিরিয়া যাইবে? ভীলপুত্র পীড়িত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল, তাহার চিন্তা ভার লইয়া সে যে একেবারে মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই. হঠাৎ গুহার কুপিত স্বর তাহার কানে প্রবেশ করিল—সে দাঁড়াইল,—শুনিল "লোকে তোমাদিগকে পর বলিবে?—যদি আমি মানুষ হই, ত এত দিন এই যে বাণ পশু বক্ষ বিদ্ধ করিয়াছে ইহা সেই দিন সেই হতভাগার শোণিত পান করিবে—"

ভীলপুত্র আগুণ হইয়া উঠিল, এ কথা মন্দালিককে লক্ষ্য করিয়া যে বলা হইয়াছে এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না। মন্দালিক এ কথা যখন তাহাকে বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহ আর এক জনকেও বলিয়াছেন গুহা তাহা শুনিয়া এইরূপ বলিতেছে। তিনি ছাড়া এ কথা কেহ জানে না, কেহ বলিতেও সাহস করিবে না।

ভীলপুত্র যে জন্য আসিয়াছিল একেবারে ভুলিয়া গেল, এখন তাহার শত্রু তাহার পিতারও শত্রু, স্পষ্ট করিয়া তাহাকে শত্রু বলিয়া ডাকিতে আর তাহার সঙ্কোচ রহিল না। গুহা যখন তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার ক্রূর মুখ ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিল গতিক বড় ভাল নহে, রাজ্য পাইয়া সে যে তাল গাছের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে তাহা বুঝিল—সে বলিল—"কেন ডাকিলি, কথাটা কি?" ভীলপুত্র উত্তর করিল "কথাডা—তুইটা কাল সপ্প—কেউটা গোখরা"!

যুবক ঠাট্টার ছলে কথাটা উড়াইতে গিয়া বলিল "এই কথার জন্য এতদূর কষ্ট করিয়া আসিবার ত আবশ্যক ছিল না" ভীলপুত্র বলিল 'তুইডার মুণ্ডপাতের আবশ্যক ছিল' যুবক বলিল "তালগাছটা, অত উঠিসনে, একটু খাট হ। তো হোতেই আমি রাজা, এখন রাগ করিলে চলিবে কেন রে?" ভীলপুত্র বলিল "অরে রাক্কস ডা— যানাডা তোমারে রাজা করিল মোর সেই বাবাডারে তুই মারিতে চাস! যেইডার খাও তুমি— সেইডারে ছোবল!"

এ কি কথা! মন্দালিককে যুবক মারিতে চাহে! যে তাহাকে রাজ্য দিয়াছে, পিতার স্নেহ দিয়াছে তাহাকে যুবক মারিবে! এ কি অপবাদ! যুবক বুঝিল এইরূপ অপবাদ তুলিয়া কৌশলে মন্দালিককে তাহার শত্রু করানই ভীল পুত্রের উদ্দেশ্য। মরোষে ঘৃণার স্বরে গুহা বলিল "পাষণ্ড মিথ্যাবাদী" ভীলের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল,—এমন গালাগালি তাহাদের আর নাই, সে লাল জবাফুলের মত চক্ষু বাহির করিয়া বলিল "মুই ডা মিথ্যাবাদী! তুই বাবারে মারুতে চাহিলি মুই ডা মিথ্যাবাদী! কমলাবতী তুইডার কেও না— তুই তানাডারে মিথ্যা মা কয়ে আসিলি—মুইডা মিথ্যাবাদী!

যুবক বলিল "চুপকর বর্ব্বর, কমলাবতী আমার মা" ভীল পুত্র বলিল—"চুপ করিতে হয় তুই ডা চুপ কর, মুই ডা একশ বার বলিবু কমলাদেবী তোর মা না, সত্যবতী তোর দিদি না—তুই ডা তানাদের কেউ না" তাহার কথা একটু বাধিল না, স্পষ্ট স্পষ্ট কথায় সত্যের মূর্ত্তি যেন তাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল, যুবক মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন, সেই কঠিন কথাগুলা তাহার মাথার মধ্যে ঘুর পাক দিয়া বেড়াইতে লাগিল,—সেই সঙ্গে দিদির শেষ কথাটিও মনে আসিয়া পড়িল—দিদি কি বলিতে বলিতে থামিল? 'কিন্তু—সত্যি'—কি সত্যি?—ভীলপুত্র যাহা বলিতেছে তাহাই কি? যুবক কি যেন হইয়া পড়িল। ভীলপুত্র বলিল "এই কথার লাগিন—তুইডা বাবারে মারিতে চাহিলি—মুইডা আসিছি—ধনুডা ধর—" যুবক আত্মস্থ হইয়া বলিল— তুই মন্দালিকের পুত্র না হইলে অনেক আগে ধনুক ধরিতাম—" ভীলপুত্র তীব্র বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল "বাবাডারে মারিতে পার—ছেলেডারে মারিতে নার? বড়ই ন্যাকা পাইছ! ধনু উটারে কালসপ্পডা!" যুবক তাহার প্রতি অবজ্ঞার কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "মরিতে এতই ইচ্ছা হইয়া থাকে শেষ প্রহরে জ্যোৎস্নার সময় ভীলগ্রামের দক্ষিণ মাঠের পুকুর তীরে বড় গাছের নীচে আমাকে পাইবি। এখন অন্ধকার—অন্ধকারে ন্যায়যুদ্ধ হয় না—" ভীলপুত্র বলিল "কথাডা বেশ। মুইডা সামনে মাঝারি গাছটার তলায় থাকিব—" ভীলপুত্রের কথা শুনিবার জন্য না দাঁড়াইয়া যুবক মন্দিরের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল- দিদির শেষ কথাটা শুনিবার জন্য সে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিল— তাহার উপর যেন তাহার জীবন মৃত্যু নির্ভর করিতেছে।

ক্রমশঃ

বিশ্বাসের মূল ও জড়জগৎ।

উত্তর।

"ভারতীর" বিগত সংখ্যায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় আমার প্রণীত "Roots of Faith" নামক পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষে উহার অন্তর্গত দার্শনিক অধ্যাত্মবাদ (Idealism) ও কারণবাদের ভ্রমপ্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমালোচনা দ্বিবিধ। একপ্রকার সমালোচনা আছে, তাহাতে সমালোচক সমালোচ্য গ্রন্থকারের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তৎপরে সমালোচ্য বিষয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতর যুক্তি প্রদর্শন করেন। যদি ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রসঙ্গোপলক্ষে বৃহৎ বিষয়ের উল্লেখ মার্জ্জনীয় হয়, তবে উক্তরূপ সমালোচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুখানা সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজি পুস্তকের নাম করা যায়, যথা, (১) জনষ্টুয়ার্ট মিলকৃত হ্যামিলটনের সমালোচনা, (২) টি এইচ্ গ্রীন কৃত হিউম ও তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সমালোচনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকেরা কেবল সমালোচ্য গ্রন্থকারের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াই নিরস্ত হন। ফণিভূষণ বাবুর সমালোচনা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। আমার বিবেচনায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধীয় পুস্তকের সমালোচনা প্রথমোক্ত প্রণালীতে হওয়াই উচিত। বিশেষতঃ ফণীবাবুর মতন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক কোন যুক্তির ভ্রমপ্রদর্শন করিয়াই নিরস্ত থাকা উচিত নহে। উক্ত বিষয়ে অকাট্যতর যুক্তি প্রদর্শন করাই উচিত ছিল।

আমি এই প্রস্তাবে সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, প্রথমতঃ, ফণীবাবুর আপত্তিতে আমার অধ্যাত্মবাদ ও কারণবাদ খণ্ডিত হয় নাই; দ্বিতীয়ত, ফণীবাবুর মতের উপর, অর্থাৎ জড়ের স্বকীয় অস্তিত্ব মানিতে গেলে, ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না,—এই গুরুতর বিষয়-দ্বয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিবার প্রথম কারণ অবকাশাভাব, দ্বিতীয় কারণ এই যে অধ্যাত্মবাদের আপত্তি খণ্ডন এবং জড়াত্মবাদের উপর ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠার অসম্ভাবনা—এই দুই বিষয়েই আমার উক্ত পুস্তকে অনেক বলা হইয়াছে।

ফণীবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে জড়ের জ্ঞাত-গুণসমূহ অর্থাৎ "বর্ণ, দৃঢ়তা, আকৃতি, ভার" ইত্যাদি আমাদের মনের ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে" আরো স্বীকার করিয়াছেন যে "আমরা জড়পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারি না।" তবে যে তিনি জড়ের "স্বকীয় অস্তিত্বে" বিশ্বাস করেন, তাহা কেবল এই জন্য যে "আমরা যে সকল ঘটনা দেখিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির প্রকৃতি এই যে তাহারা আমাদিগের শক্তিদ্বারা সাধিত হয় না। আমাদিগের কার্য্য দেখিয়া আমরা বলি আমাদিগের অস্তিত্ব আছে, সুতরাং জড়পদার্থের কার্য্য দেখিয়া ইহা বলিতে হইবে যে জড়পদার্থের অস্তিত্ব আছে;" "জড়পদার্থের কার্য্য"—এই কথার অর্থ কি? মাথা থাকিলে তো মাথা ধরা। মাথার

অস্তিত্ব আগে প্রমাণ করুন্। ইহা কেহই অস্বীকার করে না যে আমাদের দৃষ্ট ঘটনা-সমূহের মধ্যে কতকগুলি আমাদের শক্তি-নিরপেক্ষ ; কিন্তু আমাদের শক্তি-নিরপেক্ষ হইলেই যে সে গুলি "জড় পদার্থের কার্য্য"—তাহা কে বলিল ? বর্ণ, দৃঢ়তা, আকৃতি ভার ইত্যাদি মনের ভাব উৎপত্তিকে হয়ত ফণীবাবু জড়পদার্থের কার্য্য" নাম দিয়াছেন ; কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে উক্ত গুণগুলি "আমাদের মনের ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে" ; সুতরাং এই সমুদায় মনের ভাবের উৎপত্তি মাত্রকেই "জড়পদার্থের কার্য্য' বলা যায় না। এই ভাব সমূহের উৎপত্তি কোন না কোন একটী শক্তির কার্য্য—এই পর্য্যন্ত বলা যায়। এই শক্তি যে জড়শক্তি তাহা কে বলিল ? এই শক্তি যে পরিমিত তাহার প্রমাণ কি ? কার্য্য পরিমিত হইলেই কি শক্তি পরিমিত হইবে ? জগৎরূপ যে কার্য্য-সমষ্টি, তাহা পরিমিত, তাহা বলিয়া জগৎকর্ত্তাও কি পরিমিত ? ফলতঃ বর্ণ প্রভৃতি ভাবোৎপত্তির কারণরূপী শক্তি যে জড়,—অচেতন, জড়বাদী বা জড়ের-স্বকীয়-অস্তিত্ব-বাদী তাহার কোন যুক্তিই দিতে পারেন না। ফণীবাবুও কোন যুক্তি দিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে অধ্যাত্মবাদী যে বলেন যে এই শক্তি সচেতন শক্তি—ঐশী শক্তি তাহার যথেষ্ট যুক্তি আছে। এই সকল যুক্তি সমালোচিত পুস্তকে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ফলত পুস্তকের অধিকাংশ এই বিষয়ক যুক্তির ব্যাখ্যাতেই পরিপূর্ণ। দেখিয়া দুঃখিত হইলাম ফণীবাবু এই সকল যুক্তির মধ্যে একটীরও উল্লেখ বা সমালোচনা করেন নাই। কেবল বারকতক বলিয়াছেন—শক্তি মাত্রকেই যে সচেতন হইতে হইবে তার প্রমাণ নাই। এই প্রমাণ সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করিতেছি ; কিন্তু আশা করিতে পারি না যে পাঠক পুস্তকখানা মনোযোগ পূর্ব্বক না পড়িলে এই সমুদায় যুক্তির বল অনুভব করিতে পারিবেন।

(১) ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দ্বারা শক্তির অস্তিত্ব জানা যায় না. কেবল পরম্পরাগত ভাবনিচয় জানা যায়। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে শক্তির অস্তিত্ব জানা দূরে থাক্ শক্তির কোন অর্থই হয় না।

(২) কেবল অন্তর্জগতে—কেবল আত্মজ্ঞান দ্বারা শক্তির জ্ঞানলাভ করা যায়।

(৩) আত্মজ্ঞান যে শক্তিকে প্রকাশিত করে, সে শক্তি জ্ঞানবস্তু ; সে শক্তি ইচ্ছাশালী আত্মা।

(৪) আর কোন প্রকার শক্তির জ্ঞান—শক্তির আর কোন ভাব—আমাদের নাই ; শক্তি বলিলেই আত্মা বুঝি ; শক্তি আর আত্মা একই বস্তু।

(৫) যদি আমাদের নিজ শক্তি হইতে পৃথক কোন শক্তির অস্তিত্ব মানিতে হয়, তবে সে শক্তিকে আত্মা বলিয়াই মানিতে হইবে ; তাহা না হইলে তাহা মানা না মানা সমান—তাহা অর্থহীন।

(৬) আমাদের হইতে পৃথক শক্তি মানিতে আমরা বাধ্য ; আমাদের শক্তিনিরপেক্ষ-ভাবেও অনেক ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ অনেক ভাবের উৎপত্তি হয় ; এবং ভাব স্বয়ং নিষ্ক্রিয়,—

আত্মার অধীন,—কেবল আত্মার প্রভাবেই তাহা আবির্ভূত বা তিরোহিত হইতে পারে।

(৭) সুতরাং জগৎ নামধেয় যে ভাব সমষ্টি, তাহার কারণরূপী এক শক্তি আছে, অর্থাৎ আত্মা আছে। সেই আত্মার নামই পরমাত্মা।

উপরোক্ত যুক্তিতে কি ভুল আছে, ফণিভূষণ বাবু তাহা দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব। শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত বড়ই গোলযোগ পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। আমি বলিয়াছি শক্তি হইলেই সচেতন হওয়া চাই। তিনি এই কথা টুকু ঘুরাইয়া আমার কথার উত্তরে বলিয়াছেন—"শক্তি থাকিলেই যে সে সঙ্গে আমাদের স্তায় চেতনা থাকা আবশ্যক ইহার কোন প্রমাণ নাই"। "আমাদের স্তায়" কথাটি আমার নহে। চেতনায় চেতনায় অনেক তফাৎ থাকিতে পারে; আমাদের চেতনায় আর ঈশ্বরের চেতনায় অনেক প্রভেদ; কিন্তু তথাপি কতক সাদৃশ্য আছে; না থাকিলে উভয়কে চেতনা বলা হইত না। ফণী বাবু তাঁহার প্রস্তাবের নোটে বলিয়াছেন—"আমরা একথা স্বীকার করি যে জড় পদার্থের এক প্রকার অৰ্দ্ধচেতনা থাকিতে পারে'। বড়ই গোল; জড়ের যদি অৰ্দ্ধচেতনাই" থাকিল, তবে আর তাহাকে জড় বলেন কেন? চেতনা-যুক্ত জড় কথাটা যে সবিরোধী। আর জড়কে যদি চেতনাযুক্ত বলিয়াই স্বীকার করা হইল তবে আর অধ্যাত্মবাদের কি বাকী রহিল? যাহা হউক ফণী বাবু "থাকিতে পারে' বলিতেছেন, আছে" বলিতেছেন না সুতরাং তিনি অচেতন শক্তির সম্ভাবনা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু অচেতন শক্তির প্রমাণ কোথায়?

দ্বিতীয় বিষয়ে যাইবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে একটী অবাস্তবিক কথার উত্তর দিব। জার্ম্মানেরা তো হিউমের অকাট্য উত্তরই দিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে এখনো লোকে হিউমের দোহাই দিতে ছাড়ে না, ফণী বাবু অধ্যাত্মবাদের খণ্ডন করিতে গিয়া হিউমকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। হিউমের মূল কথাটা এই যে জড়ের বিষয় যেমন আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে জড় পরম্পরাগত ভাবনিচয় মাত্র, তেমনি আত্মার কথাও এই মাত্র জানি যে উহা ও পরম্পরাগত একটী ভাবশ্রেণী মাত্র; জড়ের যদি মৌলিক অস্তিত্ব না থাকে, আত্মারও কোন মৌলিক অস্তিত্ব নাই। এই কথার উত্তরে স্বয়ং হিউম-শিষ্য জন ষ্টুয়ার্ট মিল যাহা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিব। (তিনি বলিতেছেন—

"If, therefore, we speak of the Mind as a Series of feelings, we are obliged to complete the statement by calling it a series of feelings which is aware of itself as past and future; and we are reduced to the alternative of believing that the mind or ego is something different from any series of feelings or possibilities of them or of accepting the paradox that something which *ex hypothesis* is but a series of feelings, can be aware of itself as a series" (Examination of Hamilton, Chap XII.)

ফলতঃ স্থায়ী—কাল প্রবাহের অতীত,—আত্মার অস্তিত্ব কালবোধ ও সমুদায় জ্ঞানের ভিত্তিভূমি। "ঘটনা সমূহ পরে পরে সংঘটিত হইতেছে," "চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, এই সমুদায় কথা আসিতে পারিত না, যদি ঘটনার অতীত—স্রোতের অতীত —স্থির জ্ঞান বস্তু না থাকিত। অতীত এবং বর্ত্তমানকে কেবল সেই সংযোগ করিতে পারে; যে অতীত এবং বর্ত্তমানে সমভাবে বিদ্যমান,—যে অতীতের সঙ্গে অতীত হয় নাই এবং বর্ত্তমানের সঙ্গে নূতন জন্মে নাই,—অর্থাৎ সংক্ষেপতঃ যে কালের অতীত। তেমনি দেশে অবস্থিত বিষয় সমূহকে কেবল সেই জানিতে পারে যে বিষয়-সমূহের মধ্যে একটা নহে,—কিন্তু সমভাবে প্রত্যেক বিষয়েই বর্ত্তমান—অর্থাৎ সংক্ষেপতঃ যে দেশাতীত। এক কথায় বলিতে গেলে—আত্মার মৌলিক অস্তিত্ব সমুদায় জ্ঞানের ভিত্তি। এই বিষয়ে বিস্তৃতরূপে কিছু বলিব না; ফণী বাবু নিজেই হিউমের কথাতে বিশেষ সারবত্তা আরোপ করেন না, সুতরাং তাঁহার সহিত এই বিষয়ে বিস্তৃত তর্ক নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে চিন্তাতীত জড় শক্তির অস্তিত্বের কোন প্রমাণই নাই; এখন দেখা গেল আত্মার অস্তিত্ব উহার মতন একটা প্রমাণ হীন বিশ্বাস মাত্র নহে, ইহা সমুদায় বিশ্বাস,—সমুদায় জ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি।

এখন সংক্ষেপে দেখাইব যে জড় শক্তির অস্তিত্ব মানিতে গেলেই ঈশ্বরাস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। এই যে প্রকৃতিতে কার্য্যশালিনী মহতীশক্তি, যাহার প্রভাবে সমগ্র জড়জগৎ (জড়জগৎ বলিতে আমি কি বুঝি তাহা পাঠক জানেন) পরিচালিত হইতেছে, এই শক্তি যে এক কালে ছিল না,—এই শক্তি যে সৃষ্ট তাহার প্রমাণ কি? বিজ্ঞানের দৌড় যতদূর যায়, ততদূর ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে বিজ্ঞান যায় না, কেবল কল্পনা যায়, সেখানেও শক্তির কার্য্য ব্যতীত আমরা আর কিছু ভাবিতে পারি না। এই অচিন্ত্য কাল-ব্যাপিনী শক্তি যে এককালে ছিল না—ইহা যে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। আর ইহার সৃষ্টি সপ্রমাণ না হইলে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা কল্পনা করার কোন অর্থ নাই। সুতরাং যে শক্তি এই জড়জগতের পরিচালক যাহার প্রভাবে জড়জগতের বর্ত্তমান অবস্থা সমুপস্থিত হইয়াছে, উহার সৃষ্টির প্রমাণাভাবে উহাই জগৎ-স্রষ্টার স্থান অধিকার করিতেছে। যাহা হউক কেহ কেহ বলিতে পারেন যে "জড়জগৎ যেন জড়শক্তিই সৃষ্টি করিল, আত্মা-জগৎত আর জড় শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না; যাহাতে চেতনা নাই সে চেতনা দিবে কিরূপে?" কেনই বা দিতে পারিবে না? জড় শক্তিকে ভাবের উৎপাদক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। জড় শক্তি স্বয়ং ভাবশূন্য, অথচ ইহা আমাদের মনে বিবিধ ভাব উৎপন্ন করিতে পারে, ইহা ফণী বাবু প্রভৃতি জড়াত্মবাদীরা স্বীকার করিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই জড়-শক্তি স্বয়ং ভাবশূন্য হইয়াও যদি ভাবোৎপাদন করিতে পারে, তবে স্বয়ং অচেতন হইয়াও চেতনা উৎপাদন করিতে পারিবে না কেন? সুতরাং জড়শক্তিকে চৈতন্যের স্রষ্টা বলাতে কোন ক্ষতিই দেখিতেছি না, এবং আত্মা জগতের জন্য স্বতন্ত্র স্রষ্টা কল্পনা করার কোন

যুক্তিই নাই। এক কারণ দ্বারা যখন সমগ্র জগৎ ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তখন দুই কারণ কল্পনা করা তর্ক শক্তি-বিরুদ্ধ। সুতরাং উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর অসিদ্ধ, জড়শক্তিই চেতন অচেতন উভয়বিধ জগতের স্রষ্টা ও পরিচালক, এবং জড়বাদই শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বজ্ঞান।

জড়ের স্বকীয় অস্তিত্ব মানিলে,—জড়শক্তির অস্তিত্ব মানিলে—অবশ্যম্ভাবীরূপেই উক্ত মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে। ফণী বাবু উপরোক্ত যুক্তির ভ্রম প্রদর্শন করিলে বাধিত হইব।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

প্রত্যুত্তর।

সীতানাথ বাবুর উত্তর সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে ইহা বড় সুখের বিষয়। আমার প্রত্যুত্তরটীও ঐরূপ সংক্ষিপ্ত হইবে। সীতানাথ বাবুর পুস্তকে যে সকল বড় বড় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছিল, আমি কেবল সে গুলির মধ্যে একটী বিষয় সমালোচনা করিয়াছিলাম সমুদয় গুলি সমালোচনা করার অবকাশ আমার ছিল না। ঐ বিষয়ে যাহা বলার তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এখন যে এই প্রত্যুত্তর লিখিতেছি তাহার কারণ সীতানাথ বাবু আমাকে উল্লেখ করিয়া কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সীতানাথ বাবু বলিয়াছেন যে আমি সমালোচনায় কেবল তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করাইতে চেষ্টা করিয়াছি, নিজে কোন যুক্তি দিই নাই। এ কথা ঠিক নহে। যাহাকে লোকে জড় পদার্থ বলে আমি তাহার স্বকীয় অস্তিত্ব বিষয়ে যুক্তি দিয়াছিলাম। জড় পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে সীতানাথ বাবু যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা আমার নিকট ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হওয়ায় আমি তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা আর একটী বিষয়, ইহা আমি সমালোচনার মধ্যে মুখ্যভাবে অবতারণা করি নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমি কোন যুক্তি দিই নাই বলিয়া সীতানাথ বাবু দোষ ধরিতে পারেন না। "জড় পদার্থের কার্য্য" এই কথাটা লইয়া সীতানাথ বাবু একটু রহস্য করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নাই, আপত্তি এইটুক যে জড় পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে আমি যে যুক্তি দিয়াছি তিনি তাহা তলাইয়া দেখেন নাই। আমি বলি মানুষ হইতে নিম্নতম জন্তু পর্য্যন্ত যাও, মানুষের স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করিলে নিম্নতম জন্তুর স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে - নিম্নতম জন্তুর স্বকীয় অস্তিত্ব গ্রাহ্য হইলে নিম্নতম উদ্ভিদেরও এবং তাহার পর নিম্নতম হইতে উচ্চতম সমুদয় উদ্ভিদেরই স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। জন্তু ও উদ্ভিদ্‌দিগের স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অন্যান্য সমুদয় পদার্থেরও স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করিতে

হইবে। এই একটী ডিম্ব কিম্বা বীজ রহিয়াছে ইহা হইতে একটী জন্তু কিম্বা উদ্ভিদ জন্মিতে পারে ইহার স্বকীয় অস্তিত্ব আছে। আমি এক্ষণে ঐ ডিম্ব কিম্বা বীজ গরম জলে ফেলিলাম—উহা সাধারণ ভাষায় মরিয়া গেল—কিন্তু উহা পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল এখনও অনেকটা সেইরূপ আছে সুতরাং উহার অস্তিত্বও আছে অর্থাৎ স্বকীয় অস্তিত্ব আছে। যে কারণে আমি বলিব যে আমার বন্ধুর স্বকীয় অস্তিত্ব আছে, সেই কারণে ইহাও বলিতে হইবে যে প্রস্তর খণ্ডেরও স্বকীয় অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ আমার বন্ধুর অস্তিত্ব যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব হইতে কোন অর্থে পৃথক বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে প্রস্তর খণ্ডের অস্তিত্বও সেই অর্থে পৃথক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। লোকে যাহাকে জড়বস্তু বলে তাহা বাস্তবিক অচেতন কি সচেতন তাহা বলা কঠিন, তবে আমাদিগের মত পূর্ণ চৈতন্য জড় পদার্থে নাই একরূপ অর্দ্ধচেতনা থাকিতে পারে। জড় বস্তু অচেতন আমি ইহা বলি না ; আমি বলি আমারও যেরূপ ঈশ্বর হইতে এক অর্থে পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, জড়বস্তুরও সেইরূপ পৃথক্ অস্তিত্ব আছে—সুতরাং আমার মত আর সীতানাথ বাবুর অধ্যাত্মবাদ এক নহে—কারণ তাঁহার এই মতে জড়ের ঈশ্বর হইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই। সীতানাথ বাবু বলেন আমাদিগের নিজশক্তি হইতে পৃথক শক্তি মানিলে তাহাকে আত্মা বলিতে হইবে, কারণ এই শক্তি দ্বারা ভাবের উৎপত্তি হয়"; ইহার কোন অর্থ নাই, আমাদিগের মনে যাহা উপস্থিত থাকিলে ভাবের উৎপত্তি হয় তাহাও যে আমাদিগের ন্যায় সম্পূর্ণ-চৈতন্য-বিশিষ্ট হইবে এমন কোন কথা স্বীকার করি না। সীতানাথ বাবু বলেন জগৎ নামধেয় ভাবসমষ্টির কারণরূপী শক্তি পরমাত্মা। জগৎ ভাবসমষ্টি এ কথা স্বীকার করি না, জগৎ আমাদিগের মনে ভাবসমষ্টিরূপে প্রকাশ পায়—এই ভাবসমষ্টির আদি কারণ পরমাত্মা, কিন্তু নিকটতম কারণ জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সমূহ। আমি যখন বলি জড়পদার্থের চেতনা "আমাদিগের ন্যায়" নহে--তখন এই বুঝিতে হইবে যে আমাদিগের ন্যায় সম্পূর্ণ-চেতনা নয়। আমি হিউমের দোহাই দিই নাই—আমি এইমাত্র বলিয়াছিলাম যে হিউমের মতে জড়পদার্থের কেন চেতন পদার্থেরও অস্তিত্ব আছে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। এই সন্দেহ খণ্ডন করিয়া যখন বিশ্বাসে আসি তখন শুদ্ধ চেতন পদার্থের স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া চুপ করিয়া থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে, জড়-পদার্থেরও (অর্থাৎ লোকে যে সকল বস্তুকে জড়পদার্থ বলে সে সকলেরও) স্বকীয় অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। জড়পদার্থের অস্তিত্ব মানিলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না এ কথা ঠিক নহে। জড়পদার্থ সীমাবিশিষ্ট পদার্থ—সীমাবিশিষ্ট পদার্থের আদিকারণ সীমাবিশিষ্ট পদার্থ হইতে পারে না—যে আদিকারণ হইতে চেতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই আদিকারণ হইতে সাধারণ ভাষায় যে সকল বস্তুকে জড়পদার্থ বলে সে সকল বস্তুরও উৎপত্তি হইয়াছে। আমি জড়পদার্থ ও চেতন পদার্থ এই দুয়ে জাতিগত বিভেদ স্বীকার করি না—একই বস্তুর নিম্নতম অবস্থা জড়পদার্থ আর উচ্চতম অবস্থা সচেতন মানুষ। সেই

এক বস্তু ঈশ্বর; জগতস্থ সমুদয় জীব, সমুদয় পদার্থ সেই এক বস্তুর ছায়া মাত্র—সমুদয় ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হয়, সমুদয় আবার ঈশ্বরে লীন হয়।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

নক্সা।

আমাদের কামিনীকান্ত বাবু বড় জবর বাবু, রাত্রের বেলাতেও তাঁহার বিছানায় হাতের কাছে ঘড়ি চেনটা থাকা চাই। একদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে তাঁহার অঙ্গস্পৃষ্ট হইয়া সরিতে সরিতে ঘড়িটা আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, হঠাৎ একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া তিনি যেমন পা সরাইতেছেন অমনি ঘড়িটা তাঁহার পায়ে লাগিল, রাত্রের বেলা বিছানায় ঠাণ্ডা অমন ওটা কি—কামিনী কান্ত বাবু মহাভয়ে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রীরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইয়াছে'? কামিনী বাবু বলিলেন 'শীঘ্র ওঠ, বিছানায় একটা সাপ আছে, এখনি আমার পা জড়িয়ে ধরেছিল"। সাপের কথা শুনিয়া গৃহিনী চীৎকার করিতে করিতে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। কামিনী বাবু বলিলেন 'আঃ অত চেঁচাচেঁচি করে গোল করোনা. শীঘ্র একগাছা ঝাঁটা কি লাঠি নিয়ে এসো আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। গৃহিনী একগাছা লাঠি আনিয়া দিলেন, অন্ধকারে সোণার চেনটা একটু একটু জ্বল জ্বল করিতেছিল, কামিনী বাবু প্রাণ পণে তাহার উপর ঘা মারিতে লাগিলেন। সাপ মারাত হইল, তারপর আলো জ্বালিয়া সাপ দেখিতে আসিলেন, দেখিয়াই বাবুর চক্ষু স্থির! সম্মুখেই গৃহিনী,—ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন 'তোমাদের কথাও মানুষে শোনে, তোমার পাল্লায় পড়েই অত দামের ঘড়িটা মাটী!' গৃহিনী বলিলেন 'তুমিই ত সব গোল করলে, আমি আবার কি করলুম?'

বাবু বলিলেন "আঃ মিথ্যে বোকোনা—মেয়েরাই ত যত নষ্টের গোড়া। তুমি অত চেঁচাচেঁচি না করলেত সব ভালয় ভালয় চুকে যেত।

এক দিন প্রিয়বন্ধু হরিহর বাবুর বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া তাঁহার লাইব্রেরীর দিকে রাম বাবুর দৃষ্টি পড়িল, তিনি বলিলেন "ভায়াহে, তোমারত বেশ জমকাল লাইব্রেরী হয়েছে" হরিহর বাবু বিশেষ তৃপ্তি সহকারে প্রশংসাটা উদরস্থ করিয়া বিনয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক একটু হাসিতে হাসিতে মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন। রামবাবু বলিলেন "কিন্তু একলাই যে তুমি এমন লাইব্রেরীটা ভোগ করবে তা হবেনা আমাকেও দুএকখানা বই ধার দিতে

হচ্ছে” বন্ধু তখন তাড়াতাড়ি মাথা-চুলকানি শেষ করিয়া বলিলেন “না হে ভাই সেটি হচ্ছে না। কারণ, ঘরের থেকে বই একবার বেরুলে আর সহজে ঘরে ফিরে আসে না, ভেবে দেখনা কেন এগুলো সবই ধার করা বই।”

একটি নূতন উপন্যাস হইতে আমরা নিম্নলিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দুই হস্ত পশ্চাদ্দেশে ন্যস্ত করিয়া, নানারূপ চিন্তাসাগরে মজ্জমান সুরেন্দ্রনাথ প্রাতঃকালে উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন।

সার্ব্বভৌমিক মহাশয় নূতন কলিকাতায় আসিলে একজন নব্য সহুরে রসিকদাস তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমিক মহাশয় কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, তাই রসিক দাস বলিলেন “সা-ভৌম মহাশয়, এ শরীরটি আপনার কি খেয়ে হয়েছে?” ব্রাহ্মণ কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন “আমরাত আর আপনাদের মত নানাপ্রকার সুখাদ্য খেতে পাইনে, আমাদের শরীর এই শাক সবজি খেয়েই হয়েছে” রসিক দাস নির্দ্দয় হইয়া বেচারা ব্রাহ্মণকে একেবারে মাটী করিতে গেলেন—বলিলেন “তবে মশায়ের শরীর দেখছি একেবারে ঘেসো—” সার্ব্বভৌমিক মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন “আজ্ঞে তাত বটেই, নহিলে ইহার উপর গরুর এত দৃষ্টি”

আগমনী।

(১)

দেখিতে দেখিতে এ কি মেঘের কুহেলি হতে
হইল প্রকাশ—
নীলিমা ছটায় ভরা শিরে রাঙ্গা রবি পরা
সোণামাখা চূর্ণকেশে মধুর আকাশ!

(২)

হাসিল সংসার! হেসে বুকের দর্পণে
করিল ধারণ—
শ্যামলে নীলিমে মাখা; ছবি খানি হাসি মাখা
নদ নদী সরোবর—প্রশান্ত আনন!

(৩)

এ সৌন্দর্য্য সাগরের গহিন মরম হ'তে
কে বাজালে বাঁশী!—
হাসিতে খেলাতে ভরা,—নিমেষে বাছনি হারা
চুম্বিছেন ধেয়ে সাধ্বী সে চাঁদ বয়ান!

(৭)

শ্যামল প্রান্তরে, যেন শ্যামলসাগরে রে
প্রভাতের বায়
খেলায় তরঙ্গ ভঙ্গ; নেহারি প্রকৃতি রঙ্গ
সুবেশ কৃষক আজি গৃহ ছাড়ি ধায়!

(৮)

বাজিছে গ্রামের পারে আনন্দ বাজনা
—ললিতে বাঁশরী।
কে যেন কোথায় ডাকে, প্রাণ যেন চায় কাকে,
আনন্দে মিশিছে ক্ষীণ বিষাদ লহরী!

কাননে শেফালি ফোটে, সলিলে কুমুদ উঠে।
তারা ঘেরা শূন্য পথে শশী খেলে হাসি!

(৪)

বাজিল বাঁশরী যদি, ফুটাইয়ে প্রকৃতির
সৌন্দর্য্য কানন!
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি; নরহৃদে উঠে ধ্বনি
জাগায়ে ঘুমন্ত-স্মৃতি—সুখের স্বপন!

(৫)

বাজিয়ে উঠেছে বাঁশী;—প্রবাসী-হৃদয়
বিবশ বিহ্বল!
মনে পড়ে গেছে তার স্নেহের পুত্তলি গুলি,
স্মৃতির-সায়রে ভাসে আদর কমল!

(৬)

মুগ্ধ মনোআঁখি তার হেরিতেছে দিন রাত্রি
গৃহের প্রাঙ্গণ,

(৯)

গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে এ বঙ্গ ব্যাপিয়া
খেলে সে লহরী!
জননী জনম-ভূমি, পায়েতে সুষমা রাণী,—
দশভুজা মহামায়া পূজে নর-নারী!

(১০)

গড়ি মূর্ত্তি পূজি মোরা সবে মা তোমায়,
হেন ক্ষীণ প্রাণ!
শ্যামলা নির্ম্মলা মাতা ফুল্ল কৌমুদিতে স্নাতা
ভাবিতে পারি না মূর্ত্তি, নাহি ধ্যান জ্ঞান!

(১১)

তোমার মরম ভেদি বাজে যে বাঁশরী
—অনন্ত সে গান!
বিহ্বল বিবশ প্রাণে, ধাইতে অনন্ত পানে
কই তা জাগাতে নারে বাঙ্গালীর প্রাণ!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

আগমনী।

কুয়াশার জালে ঢাকা,
শরতের নিশি শেষ;
বড় ম্লান মুখ খানি
বড় হায় ম্লান বেশ।
এ ম্লান প্রভাত শিরে
শুকতারা তুমি বালা;
কে দেবি উদিলে আসি
আঁধার করিয়ে আলা?
কার দরশন পেয়ে
সমীরে পুলক ছুটে;
কাহার এ হাসি রাশি
ফুলে ফুলে আছে ফুটে?
ধরেছে নেহারি কারে

সকলি নূতন ছবি,
এ যেন আরেক দেশে
আরেক নূতন রবি।
যার পথ চেয়ে আছি
সারাটি বরষ ধরে—
এতদিন পরে বুঝি
সে মোর এসেছে ঘরে!
এসেছেন উমা আজ
বঙ্গের সুখের তারা,
আঁধার পরাণে তার
ঢালিতে কিরণ ধারা।
হরষ তরঙ্গ আজ
বহে চারি দিকে তাই,

তবুও অভাব কি এ
সুখেতে কি যেন নাই !
প্রাণেতে হুতাশ জাগে
কাতর নয়ন চায়,
কেঁদে কেঁদে খুঁজে খুঁজে
কি যেন রে নাহি পায়।
আকুল নিশ্বাস ছাড়া
বুঝাতে পায়না ভাষা,
কেঁদে কেঁদে ওঠে তাই
প্রাণের নিরাশ আশা।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

বীর কাহিনী।

১

রোমাণ-বীরত্ব।

খৃষ্টাব্দের ৫০৭ বৎসর পূর্ব্বে রোমের রাজা টারকুইনিস সুপারবসের* পুত্র সেক্সটস রোমের প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী স্পুরিয়স লুক্রেসিয়সের কন্যা এবং টারকুইনিস কোলেটিন-নসের পত্নী লুক্রেসিয়ার প্রতি অত্যাচার করাতে রোমবাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাপুত্র উভয়কেই রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করে। নির্ব্বাসিত রাজা ইট্রুস্কান নামক অসভ্য জাতিদিগের অধিনায়ক লাস´পোর্সীনার সাহায্যে অসংখ্য সেনা সংগ্রহ করিয়া হৃত রাজ্য পুনরাধিকার করিবার মানসে তাহা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু রোম অধিকার করা বড় সহজ নহে, রোমের উন্নত প্রাচীর বেষ্টন করিয়া টাইবর নদী বহিয়া যাইতেছে. তাহা অতিক্রম না করিয়া রোমে প্রবেশ করা যায় না, এই নদীর একটী ক্ষুদ্র সেতুই রোম-প্রবেশের একমাত্র পথ, সেতু এত সঙ্কীর্ণ যে তিন জন পাশাপাশি দাঁড়াইলেই তাহার পথ বন্ধ হইয়া যায়, এই সেতুর অপর প্রান্তে 'জানিকিউলম' নামক দুর্গ। প্রথমে এই দুর্গ জয় করিতে পারিলে সেতু দ্বারা পুরে প্রবেশ করা যায়। পোর্সীনা প্রথম এই দুর্গ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার অগণ্য সেনাবল, অবাধে দুর্গ জয় হইল !

সিনেটেরা এই ঘটনায় মহা চিন্তিত হইয়া নগর রক্ষার উপায় স্থির করিতে নদী-তীরস্থ নগরদ্বারে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের অল্প সংখ্যক সৈন্য দ্বারা নগর রক্ষা অসম্ভব দেখিয়া, সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলাই শত্রু হস্ত হইতে নগর রক্ষার একমাত্র উপায় স্থির হইল। এমন সময় একজন গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে আর মুহূর্ত্তমাত্র সময় নাই—শত্রুরা পুরের অতি নিকটে সেতুর মুখে উপস্থিত। সিনেটেরা দেখিলেন বাস্তবিকই শত্রুসেনা সেতুর অপর মুখে দাঁড়াইয়া, সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিবারও আর সময়

* ইনিই রোমের শেষ রাজা। ইহার পর হইতে সিনেটগণ রাজ্য শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন।

নাই, সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আগেই শত্রুসেনা নগর দ্বারে পৌঁছিবে। আসন্ন বিপদ দৃষ্টে সকলেই কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন! এমন সময় হোরেসিয়স নামক একজন যুবক অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমি যাইব—কে তোমরা আমার সঙ্গে যাইতে চাও এস। যখন একদিন মরিতেই হইবে তখন সেক্সটসের অত্যাচার হইতে মা বোন স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য মরিব, ইহা হইতে সুখের মৃত্যু আর কি আছে? কে তোমরা আমার সহিত যাইবে এস—আর দুই জন মাত্র লোক পাইলে আমি কিছুক্ষণ সেতু রক্ষা করিয়া রাখিতে পারি, শত্রুসেনা আমাদের হাত এড়াইয়া আসিতে আসিতে সেতু ভাঙ্গিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়"। স্পুরিয়স লারিসস এবং হারমিনিয়স নামক আর দুই জন রোমান যুবক তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। তিন জনে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চলিলেন—তিন জনে সেতু মুখে অগণ্য শত্রুসৈন্যের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। শত্রুসৈন্যেরা হাসিতে লাগিল, কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের সে হাসি ফুরাইল। ক্ষুদ্র সেতুর উপর তিন জনের বেশী পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইবার যো নাই—সম্মুখে যে সৈনিক আসিতেছে সেই যুবকত্রয়ের তরবারির সুতীক্ষ্ণ আঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইতেছে, দৈববলে বলীয়ান যুবকদের সম্মুখে আর কেহই অগ্রসর হইতে চাহে না।

এ দিকে সেতুর বাঁধন খোলা প্রায় শেষ হইল, আর মুহূর্ত্তমাত্রে সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িবে, রোমবাসীরা যুবকদিগকে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। লারিসস এবং হারমিনিয়স ফিরিয়া আসিলেন, সে মুহূর্ত্তে হোরেসিয়স আসিতে পারিলেন না, পর মুহূর্ত্তে সেতু ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া গেল। শত্রু নিক্ষিপ্ত-বাণে এক চক্ষু-হীন, ভগ্নপদ, জর্জ্জরিত-দেহ, অবসন্ন হোরেসিয়স ক্ষণকালের জন্য অগণ্য শত্রুসেনার মধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলেন, একবার রোমের পানে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর টাইবর নদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রোমাণদের পিতা, উপাস্য দেবতা টাইবর—আজ তোমার কোলে একজন রোমানের প্রাণ সমর্পণ করিতেছি, তোমার হাতেই তার রক্ষার ভার" এই বলিয়া বীর হোরেসিয়স টাইবর নদীতে ঝাঁপ দিলেন।*

---

* রোমের একজন ইতিহাস লেখক—পলিবিয়স বলেন যে নদীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ইতিহাসলেখক লিভি বলেন যে তিনি অনেক কষ্টে কূলে পৌঁছেন ও জীবনের শেষ ভাগ সকলের আদর ও সম্মানের পাত্র হইয়া সুখে যাপন করেন। শেষের কথাটিই অধিকতর সম্ভবপর বোধ হয়, কারণ কথিত আছে রোমে যখন অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয় তখনও ৩০০০০ রোমবাসী প্রত্যেকে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ, হোরেসিয়সকে তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্যের ভাগ আনিয়া দিত। এই সেতু রক্ষার পর হোরেসিয়স "ককলস" অর্থাৎ 'কাণা' এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। রোমানেরা তাঁহার যে ধাতুময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে তাহাও একচক্ষু ও ভগ্নপদ করিয়া নির্ম্মিত করা হয়।

২

আর এক দিন আর একজন রোমাণ হোরেসিয়সের কথা মনে করিয়া টাইবর নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; রোমের জন্য নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দের ৩৮৯ বৎসর পূর্ব্বে গলেরা রোম আক্রমণ করে। আক্রমণের কারণ এই :—গলেরা টুস্কান প্রদেশ আক্রমণ করিলে টুস্কানরাজ রোমের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রোমের প্রতিনিধি স্বরূপে প্রেরিত ফেবিয়স বংশীয় তিন জন ভ্রাতা গলরাজের নিকট গিয়া তাঁহাকে এই যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলেন "যে টুস্কানেরা ত গলদের নিকট কোন অপরাধ করে নাই তবে কেন তাহাদের রাজ্য আক্রমণ করা হইল?"

গলরাজ উত্তর করিলেন "কথাই আছে 'জোর যার মুলুক তার,' টুস্কানরা যে হীনবল এই তাহাদের অপরাধ—আর তাহাদের রাজ্য লইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে ইহাই রাজ্য আক্রমণের যথেষ্ট কারণ।" এই উত্তরে ফেবিয়সগণ এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে দৌত্য-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাঁহারাও টুস্কানদিগের সহিত যুদ্ধে যোগদান করিলেন এবং একজন প্রধান গলকে বধ করিলেন। গলরাজ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এই তিন জন অপরাধী যুবককে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে রোমান সিনেটকে বলিয়া পাঠাইলেন। রোমের অধিকাংশ সিনেট ও পুরোহিতগণও গলরাজের এই ন্যায্য দাবীর পক্ষ সমর্থন করিয়া যুবকদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে বলিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ ফেবিয়স পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া তাহা করিতে পারিলেন না, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে এ দণ্ড হইতে উদ্ধার করিলেন। যুবকদিগকে গলরাজের হস্তে সমর্পণ করা হইল না। গলরাজ এই অপমানে কুপিত হইয়া রোম আক্রমণ করিলেন।

তিন জনের অপরাধ সমস্ত জাতির স্কন্ধে নিপতিত হইল! রোম হইতে ১১ মাইল দূরে এলিয়া নদীর তীরে প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধে রোমাণেরা পরাজিত হইল। একে রোমাণদিগের সৈন্যেরা সুসজ্জিত ছিল না; তাহার উপর এযুদ্ধ অন্যায় যুদ্ধ জ্ঞানে তাহারা মনের সমস্ত বল হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং সহজেই গলগণ জয়ী হইল। পরাজিত রোমানগণ কতক গলদের হস্তে নিহত হইল; অবশিষ্ট নিকটবর্ত্তী ভিই নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নিজ রোমবাসীগণও নগর রক্ষার আশা ত্যাগ করিয়া সহরের সমুদয় খাদ্য দ্রব্য লইয়া নগর মধ্যস্থিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেবল ৮০ জন বৃদ্ধ সিনেট মাত্র দুর্গের বাহিরে গলদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে লোকেদের বিশ্বাস ছিল যে যদি দেশের রাজা বা শাসনকর্ত্তা প্রাণ উৎসর্গ করিয়া প্রজাদের দোষের প্রায়শ্চিত্ত করেন তবে দেবতারা সদয় হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন। সিনেটরাই রোমের শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা রোমবাসীদিগের জন্য প্রাণ দিলে তাহারা উদ্ধার পাইবে, বিশেষ তাঁহারা বৃদ্ধ. যুদ্ধে অপারগ দুর্গবাসীদিগের অল্প খাদ্য দ্রব্যের অংশ লইয়া নিজেদের অকর্ম্মণ্য জীবন রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে আরও শীঘ্র গলদের হস্তে আত্ম সমর্পণে বাধ্য করিবেন কেন?

এই মহান্ ভাব পূর্ণ হৃদয় লইয়া আত্মোৎসর্গ করিবার নিমিত্ত তাঁহারাই কেবল নগরে রহিলেন।

গলেরা রোমে আসিয়া কোথাও জনপ্রাণী দেখিতে পাইল না, অবশেষে রোমের সুবিস্তৃত-ময়দানে পৌঁছিয়া যাহা দেখিল তাহাতে আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

শুভ্রবেশ—শুভ্রকেশ—হস্তিদন্ত নির্ম্মিত আসনে উপবিষ্ট সারি সারি ৮০ জন বৃদ্ধ, সকলেরই হস্তে এক এক খানি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত যষ্টি। ইহাঁরা দেবতা কি মানুষ কি পুতুল প্রথমতঃ গলেরা কিছুই বুঝিতে পারিল না অনেকক্ষণ অবাক ভাবে দেখিয়া দেখিয়া একজন গল কৌতূহল নিবারণ করিবার নিমিত্ত একজন সিনেটের গালে একটা চড় মারিল, তৎক্ষণাৎ কঠোর যষ্টির আঘাতে তাহার কৌতূহল নিবারণ হইল। গলেরা যখন দেখিল ইহারা মানুষ তৎক্ষণাৎ নির্দ্দয়ভাবে সকলকে বধ করিল। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড শেষ করিয়া তাহারা দুর্গাভিমুখে গমন করিল। দুর্গ টাইবর নদীর তীরে দুরারোহ্য পর্ব্বতের উপর স্থাপিত। বুঝিল তাহা যুদ্ধ করিয়া অধিকার করিবার নহে। অনাহারে দুর্গবাসীদিগকে ক্রমে ক্লিষ্ট করিয়া দুর্গ অধিকার করিবার মানসে দুর্গ বেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু অতদিন শুধু শুধু বসিয়া কি করে, প্রথম রোমনগর ধ্বংশ করিয়া নিকটবর্ত্তী ভিই নগর আক্রমণ করিল। রোমের প্রধান যোদ্ধা মার্কাস কামিলস এই সময়ে ভিই নগরে বাস করিতেছিলেন। কামিলস ইহার পূর্ব্বে রোমের জন্য অনেক যুদ্ধ করিয়া সব গুলিতেই বিজয়ী হইয়াছিলেন। রোমের কয়েক জন লোক ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার নামে এক মিথ্যা দোষারোপ করে। তাহারা বলে কামিলস শেষ যুদ্ধে লুঠের অযথা ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। গর্ব্বিত কামিলস এ অপবাদ সত্য কি মিথ্যা কিছুই না বলিয়া ক্রুদ্ধ হৃদয়ে নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এবং পরে নগর ত্যাগ করার এই অপরাধে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত হইয়া এক্ষণে ভিই নগরে বাস করিতেছিলেন। ভিই আক্রমণকারী গলগণ কামিলসের বীরত্বে পরাজিত হইয়া শীঘ্রই ভিই পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোমে পলায়ন করিল। ইহা দেখিয়া ভিই নগর আশ্রিত রোমাণগণ মহা আশান্বিত হইয়া কামিলসের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিল, হে বীরবর কামিলস্ তুমি গল-দিগকে তাড়াইয়া দিয়া রোম উদ্ধার কর, তুমি ভিন্ন এ বিপদে উদ্ধার করিতে পারে এমন বীর আর কেহ নাই"। কামিলস বলিলেন,"তিনি রোমের এক জন নির্ব্বাসিত প্রজা মাত্র, রোমের হইয়া নিজের ইচ্ছায় কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, তবে যদি রোমাণ সিনেটেরা তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার অনুমতি দেন তবে তিনি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন"।

কিন্তু রোমে সিনেট কই। তাঁহারা ত সকলেই প্রায় মৃত্যুর গ্রাসে। যে দুই চারি জন অবশিষ্ট আছেন তাঁহারাও দুর্গে আবদ্ধ। সেখানে গিয়া কে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া আসিবে? দুর্গের একদিকে নগরে অসংখ্য গল, অন্য দিকে টাইবর নদীর উপর দুরারোহ্য পর্ব্বত—দুর্গে কে যাইবে?

পোণ্টিয়স কোমিলিয়স নামক এক জন যুবক এই ভয়ানক কাজ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পোণ্টিয়স চাষার বেশে কাপড়ের মধ্যে কতকগুলি সোনা লুকাইয়া লইয়া সমস্ত দিন পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যাবেলা টাইবর নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। একটু অন্ধকার হইলে প্রহরীরা দেখিতে না পায় এরূপ স্থান হইতে প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া টাইবর নদীতে ঝাঁপ দিলেন। ঝাঁপদিবার পূর্ব্বে তিনিও টাইবর নদীর নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন "হে টাইবর রোমের জন্য একদিন হোরেসিয়স তোমার গর্ভে ঝাঁপ দিয়াছিলেন আজ রোমের জন্য আমিও তোমার জলে ঝাঁপ দিতেছি. আমাকেও রক্ষা কর। উন্মত্ত টাইবর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে পোণ্টিয়স অন্ধকারে পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। টাইবর উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এখনও সম্মুখে উচ্চ পর্ব্বত, কিন্তু নির্ভীক যুবক তাহাতেও ভীত নহেন। সেই অন্ধকারে অতি সাবধানে, নিস্তব্ধে পর্ব্বতস্থ উদ্ভিদ ধরিয়া ধরিয়া প্রত্যেক পদে মৃত্যু লইয়া গভীর রজনীতে দুর্গে পৌঁছিলেন। উৎসুক হৃদয় দুর্গবাসীরা সংবাদ শুনিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পোণ্টিয়স আনুপূর্ব্বিক সংবাদ বলিয়া তৎক্ষণাৎ কামিলসকে ডিক্টেটর* নিযুক্ত করিয়া অবিলম্বে আবার সেই ভয়ানক যাত্রা আরম্ভ করিলেন। অন্ধকারের আশ্রয়ে গলদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ভোর হইবার আগেই তিনি নির্ব্বিঘ্নে ভিই নগরে পৌঁছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তীক্ষ্নদৃষ্টি গলেরা দেখিল পাহাড়ের গায়ের লতা পাতা মাঝে মাঝে ছিঁড়িয়া গিয়াছে—শৈবাল সরিয়া পড়িয়াছে, পাথর খসিয়া গিয়াছে, বুঝিল রাত্রে এই পথে কেহ দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। একজন বিলাসী রোমাণ যে পথে উঠিতে পারে, আল্পপর্ব্বতবাসী কঠোরকায়-গলগণ কি সে পথে যাইতে পারিবে না?

এতদিন তাহারা যে কাজে অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই আজ তাহাতে তাহারা দৃঢ় সংকল্প হইয়া রাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রের অন্ধকারে সহস্র সহস্র গল চুপি চুপি পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। ঘুমন্ত দুর্গবাসী তাঁহাদিগের এ বিপদের কথা কিছুই জানিতে পারিল না, আর একটু হইলেই তাহাদের এই ঘুম চির-ঘুমে পরিণত হইত, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ দুর্গস্থিত জুনো দেবতার মন্দির রক্ষিত হাঁসেরা পাথর পড়িবার শব্দে ভয় পাইয়া পাখা ছাড়া দিয়া ডাকিয়া উঠিল। রোমাণেরা একেই দেবভক্ত লোক, এ সময় আবার তাহাদের বিপদের অবস্থা, এখন দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ উৎসুক. এমন কি, দুর্গ মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের এত অনাটন তবুও মন্দিরের রক্ষিত হংস স্পর্শ করা দূরে থাকুক তাহাদের প্রতি কোন রূপ অযত্ন পর্য্যন্তও

---

*যুদ্ধ বা অন্য কোন বিশেষ বিপদ কালে এক জন নির্ব্বাচিত লোকের হস্তে যথেচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করা হইত—এমন কি তখন রাজাও তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। এইরূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিই ডিক্টেটর।

তাহারা করে নাই, আজ তাহার ফল লাভ হইল। হাঁসের ডাকে প্রথমেই ম্যানিলস নামক একজন রোমাণ জাগিয়া উঠিলেন, উঠিয়াই দেখিলেন সম্মুখে একজন গল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে ধরিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন, আর এক জন গল অমনি তাঁহাকে মারিতে তরবারি উঠাইল, ম্যানিলস তাহার হাত শুদ্ধ কাটিয়া ফেলিয়া দিলেন। ইহার মধ্যে দুর্গবাসীরাও জাগিয়া উঠিল। প্রথম-আরোহী দিগের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া অন্য গলগণও ভয় পাইয়া গেল, যাহারা উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল বা কতক দূর অগ্রসর হইয়াছিল সকলেই প্রাণ ভয়ে নামিয়া পড়িল। ম্যানিলসকে প্রত্যেক দুর্গবাসী এই দুর্ভিক্ষ-সময়ের অমূল্য ধন অল্প অল্প খাদ্যদ্রব্য আনিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ উপহার প্রদান করিল। কিন্তু ইহার পর দুর্গবাসীরা অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষন্ন হইয়া পড়িলেন। এবার যেন এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া গেল কিন্তু এরূপে আর কতদিন দুর্গ রক্ষা হয়? আহার দ্রব্য ত সকলি প্রায় ফুরাইল—অনাহারে আর কদিন চলে? সিনেটের অনুমতি পত্র লইয়া পোণ্টিয়স যে কামিলসের নিকট পৌঁছিয়াছেন তাহারই বা স্থিরতা কি—হয়ত তিনি ভিই পৌঁছিবার পথেই গলদের হাতে ধরা পড়িয়াছেন, নহিলে কি কামিলস এতদিন রোম রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেন না? গলদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করা ভিন্ন দুর্গবাসীর যেন অন্য উপায় দেখিতে পাইলেন না। এই সময় আবার একজন দুর্গবাসী বলিল যে "তাহাদের অবশিষ্ট সমস্ত ময়দার রুটী প্রস্তুত করিয়া তাহা নীচে শত্রুগণকে নিক্ষেপ করিতে জুপিটর-দেব তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন"। ভয়ানক আজ্ঞা, কিন্তু যত ভয়ানকই হউক দেবতার আদেশ পালন করিতেই হইবে। অবশিষ্ট যে ময়দা ছিল তাহার রুটী করিয়া ক্ষুধার্ত্ত রোমাণেরা নীচে শত্রুদের নিকট নিক্ষেপ করিল।

ভাগ্য ফিরিল, অত রুটী দেখিয়া গলরাজ চমকিয়া গেলেন—যাহারা এখনো এত রুটী ফেলিয়া দেয় তাহাদের কত অধিক খাদ্য সংগ্রহ আছে। কিছুক্ষণ পরেই গলরাজ একজন প্রধান রোমাণের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সলপিটিয়স নামক একজন প্রধান তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। গলরাজ বলিলেন যে যদি রোমাণেরা তাঁহাকে একহাজার মন স্বর্ণ প্রদান করেন তবে তিনি এখনি রোম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন। সলপিটিয়স তাহাতে সম্মত হইয়া দুর্গ মধ্যে যত স্বর্ণ অলঙ্কার পাইলেন তাহা লইয়া পুনরায় গলরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। ওজনের সময় স্বর্ণের ভার হাজার মনের অধিক হইল, অধিকঅংশটুকু সলপিটিয়স সরাইয়া রাখিতে গেলেন—গলরাজ স্বর্ণ-লোভ সামলাইতে না পারিয়া, তাহাতে বাধা দিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন "পরাজিতের কথা কে শোনে?"

এ অপমান নীরবে সহ্য করিবার মত দশা এখনও রোমের হয় নাই—বাদ প্রতিবাদে ঝগড়ার সূত্রপাত হইতেছে, এমন সময় কামিলস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪০০০০ হাজার সৈন্য তাহার সঙ্গে। তিনি এই চুক্তির কথা শুনিয়া বলিলেন "স্বর্ণদ্বারা নহে—রোম

লৌহ দ্বারাই নগর রক্ষা করে। গলরাজ বলিলেন "রোমানেরা এক বার স্বর্ণ দিয়া সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এখনং সে চুক্তিভঙ্গ করিলে তাহাদের অন্যায় করা হয়। কামিলস বলিলেন তিনি এখন ডিক্টেটর, তাঁহার বিনা অনুমতিতে এখন আর কাহারও সন্ধি করিবার ক্ষমতা নাই।"

কথায় কথায় ঝগড়া হইয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গলেরা পরাজিত ও অধিকাংশ নিহত হইল। পোণ্টিয়সের মহান্ সাহসে এবং কামিলসের বাহুবলে রোম উদ্ধার হইল।

যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে তাঁহাদের বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ কামিলস "রোমুলস" অর্থাৎ রোমের দ্বিতীয় "স্থাপন কর্ত্তা" এবং মানিলস "কাপিটোলিনিস" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন, আর জুনোর মন্দিরে একটী সুবর্ণ নির্ম্মিত হংস স্থাপিত হইল। কিন্তু প্রধান বীর পোণ্টিয়স যিনি সেই অন্ধকার রাত্রে নদী পাহাড় উত্তীর্ণ হইয়া জীবন মরণ পণে সিনেটদিগের নিকট হইতে কামিলসকে ডিরেক্টর নিযুক্ত করিবার অনুমতি পত্র লইয়া আসিলেন—দেশোদ্ধারের সেই মূল কর্ত্তা পোণ্টিয়স কোন পুরস্কার পাইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ নাই। নাই থাক তাঁহার আত্মবিসর্জ্জী মহান সাহস ও দেশের জন্য বৃদ্ধসিনেটদের মহান অত্মোৎসর্গ কাহিনী জগতের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। স্বদেশের উদ্ধারই তাঁহাদের অমূল্য পুরস্কার।

সহজে গান অভ্যাস।

ছায়ানট—কাওয়ালি।

আয় তবে সহচরি,
হাতে হাতে ধরাধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি,
গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা,
পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি
মন প্রাণ দিবানিশি,
আন্ তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।

ঢাল' ঢাল' শশধর,
ঢাল ঢাল জোছনা।
সমীরণ বহে যা'রে
ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি;
উলসিত তটিনী,——
উথলিত গীতরবে খুলেদেরে মন প্রাণ।

ছায়ানট—কাওয়ালি।

১　　　　২　　　　৩　　　　০
সা--পা—ম—। পা—পা—পা—পা—। ম—পা—ম—পা—। ম—গা—গা—গা০ম০।
আয় ত রে　স হ চ রি　হা তে হা তে　ধ রি ধ রি

১　　　　২　　　　৩　　　　০　　১
রে--গা—গা—। ম—ম—পা—পা০ম০। গা—ম—রে—রে—। সা----। পা--ধা-পা-।
না চি বি　ষি রি ষি রি　গা হি বি　গান্　আন্ ত রে

২　　　　৩　　　　০
ধা--ধা—নি—। পা—ধা—নী—সা০নী০। ধা—নী০ধা০পা--।
বী ণা

১　　　　২　　　　৩　　　　০　　১
রে--গা—গা—। ম—গাম—পা--। গা—ম—রে—রে—। সা----। পা—পা—ধা—সা-।
স প্ত ম　সু রে　বাঁধ্　ত বে　তান্　পা শ রি ব

২　　　　৩　　　　০　　১　　২
সা—সা—সা--। সা—নী—ধা—পা—। ধা—সা—সা--। সা—রে—রে—রে—। সা-রে-
ভা ব না　পা শ রি ব　য ত না　রা খি ব প্র মো দে

　　３　　　　০　　　　১　　２
সা—রে—। সা—রে—গা—রে—। সা—নী—ধা—পা—। পা--ধা—পা—। ধা--ধা-নি-।
ভ রি　ম ন প্রা ণ　দি বা নি শি　আন্ ত রে　বী ণা

৩　　　　০　　　　১　　　　২　　　　৩
পা—ধা—নী—সা০নী০। ধা—নী০ধা০পা--। রে--গা—গা—। ম—গাম—পা--। গা—ম-
　　　　　　　　　স প্ত ম　সু রে　বাঁধ্

০ ১ ২ ৩

রে—রে—। সা ----। পা—পা—ধা—সা—। সা—সা—সা—সা—। স্যা—নী—ধা—পা-।
ত বে তান ঢা ল ঢা ল শ শ ধ র ঢা ল ঢা ল

০ ১ ২ ৩

ধা—সা—সা --। সা—রে—র্রে—রে—। সা—রে—সা—রে—। সা—রে—গা—রে-।
জো ছ না স মী র ণ ব হে যা' রে ফু লে ফু লে

০ ১ ২ ৩

সা—নী—ধা—পা—। পা—পা—ধা—পা—। ধা—ধা—ধা—নি-। পা—ধা—নী—সা০নী০।
ঢ লি ঢ লি উ ল সি ত ত টি নী

০ ১ ২ ৩

ধা—নী০ধা০পা --। রে—রে—গা—গা—। ম—ম—ধা—পা—। ম—গা—গা—গা০ম০।
উ থ লি ত গী ত র বে খু লে দে রে

০

রে—রে—সা--।
ম ন প্রাণ

শ্রীপ্রতিভাসুন্দরী দেবী।

রত্নাবলী।

নিরিবিলি বন, নিঝুম কানন
রজনী পূর্ণিমা নিশি গো—
শির পরে চাঁদ, সুমোহন ছাঁদ
ধীরে ধীরে যায় ভাসি গো।
বকুলের তলে, দাঁড়ায়ে বালিকা
করেতে লতার ফাঁসি গো—
মু'খানি আনত, হৃদয় দলিত,
আঁখি জলে যায় ভাসি গো।

উড়িছে অলক, মৃদুল সমীরে,
দুলিতেছে কাল ফণী গো,
তনুতে জোছনা পেতেছে বিছানা
উপমার উপমা খানি গো।
অনুভবি চিতে, পারেনি বুঝিতে
মেনেছে রণেতে হারি গো,
অতি ঘোর তৃষা বালিকা বিবশা
সমুখে শীতল বারি গো।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

সমালোচনা।

কবিতাসংগ্রহ, সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এ গ্রন্থখানি কেবল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ নহে, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু উক্ত পুস্তক মধ্যে তাঁহার জীবনী ও তাঁহার কবিতাবলীর সমালোচনাও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর এই সমালোচনা এতই যথাযথ সূক্ষ্ম সমালোচনা যে ইহার উপর কাহারো আর একটী কথা কহিবার আছে এমন মনে হয় না। এরূপ স্থলে বঙ্কিম বাবুর সমালোচনা উদ্ধৃত করিলেই কবিতাসংগ্রহের প্রকৃত সমালোচনা হয়, স্বতন্ত্র সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা কবিতাসংগ্রহের তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বসম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর উক্তির সারাংশ পাঠকদিগকে নিম্নে উপহার দিলাম।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি?

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানী মাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্র-বেত্তারা সকলেই "কবি"। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষ-শাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ" এখানে অর্থটা ইংরাজি Poet শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে "কবির লড়াই" হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি"।

আবার আজ কাল কবি অর্থে poet, তাহাকে পারা যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজ কাল বড় গোল। ইংরাজিতে যাহাকে poetry বলে, এক্ষণে তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না আমরা বিচার করিতে বাধ্য। পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরাজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এইমাত্র বক্তব্য যে সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া, তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইহাঁরা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরা মালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কীর্ত্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের

মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে পারিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে, যে তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈকি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, তাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি? ঈশ্বর গুপ্ত, সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষ পার্ব্বণে পিঠাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নব বর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা কি শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও—তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন্ ভেঙ্গেছে
ভাঙ্গা মন আর গড়েনাকো।

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ীননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটী কাব্যরস বাহির করেন;—

বধূর মধুর ধনি, মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল॥

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধূঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁঠার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি অনায়াসে মধুর রস ছাড়

কাব্যরস পান, তপ্‌সে মাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বীভাব দেখেন, পাঁঠার বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এ দেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গ ভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি— তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী—প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার ;—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপীবাঁদর পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেয়ে মানুষ পোষে—উভয়কে মুখ ভেঙ্গানতেই সুখ।"

স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রী লোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতীগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান।

তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল স্বচ্ছ সলিল-ধৌত কষিত কান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, "দেখ—দেখি! কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়ী এত বাড়াবাড়ি কর।" তোমরা মহিলাগণের গৃহ কর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া, বলিবে, "ধন্য স্বামীপুত্রসেবাব্রত? ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্ব্বনেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটম্ব ভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গ কুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রী কাতরতা পরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম পেঁচার নক্সা বিদ্বেষ পরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছু মাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তাছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরী শঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে

হইবে এই জিদ, কবির লড়াই, ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত "কবির লড়াইয়ে" শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল।

অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সম্মুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বর চন্দ্র তাহার গালে একচড় নহে, একটা কানমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর, কৌন্‌সিলের মেম্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে তাহার রাগ নাই, কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,——

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল——

সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নসী জশী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুলকী॥

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitator দের কাণ ধরিয়া টানাটানি——

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি সিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙ্গে না
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচ্‌ব না॥

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন—একটা নমুনা——

যখন আস্‌বে শমন করবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট বোলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরট ফুঁকে স্বর্গে যাবে!

এক কথায় সাহেবদের নৃত্যগীত——

গুড় গুড় গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

সখের বাবু, বিনা সম্বলে,——

তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনোজলে নেয়ে॥

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গ রস, কেবল আনন্দ। তপ্‌সেমাছ লইয়া আনন্দ।———

কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥

অথবা আনারসে——

লুনমেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি॥

অথবা পাঁটা———

সাধ্য কার এক মুখে, মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে॥
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে দুটি ঠ্যাঙ্গ।
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড্যাঙ্গ ছ্যাড্যাঙ্গ॥
এমন পাঁটার নাম, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা॥

তবে এই স্বীকার করিতে হয়, যে ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালি গালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতেরা, "নস্যলোসা দধি চোসার" দল, গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরি-দের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্‌সের উপর রাগ। যথা স্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটী প্রধান দোষ। উহা বাদ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিয়া, আমরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে যথার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোনরূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারি না। ইহাও জানি যে

ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্য ভাবের অভিব্যক্তির জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সে কালের বাঙ্গালীদিগের ইহা একপ্রকার স্বভাব সিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল সজ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই "বদ্‌জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময় ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা! যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্য রত্ন—শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্দ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্য রত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্প বয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া ঈশ্বর গুপ্ত অন্নকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বরুষে জুড়ি জুতিয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্‌দেবী ধারণ করিয়াও—খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে, সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল না। জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালীর ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয় ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা-দেব দ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য—যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে তাহা ছাড়া অন্যবিধ অশ্লীলতাও তাঁহার কতিপয় আছে। কেবল রঙ্গদারির জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে বঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কবি চোর পঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে। দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজাপার্ব্বণ অশ্লীল—উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সং অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী হাফ আক্‌ড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবনপ্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জ্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরাজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরাজের কাছে, প্যানটালুন বা উরু দেশের নাম অশ্লীল—ইংরাজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দ গুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরাজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য—মাতৃ পিতৃ সম্বন্ধেই উহা নির্ব্বাহ পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিস [illegible] ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে তাঁহাদের পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ, আলতাপরা মল পরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটী কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বত শৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচি বিরুদ্ধ, স্তন বিলাতি রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্য বাবু হয়ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রী মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী, তাই তাঁকে ভক্তি ভাবে, স্নেহ করিয়া "মাতা বসুমতী" বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে, মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না।

অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপ চিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরাজিরুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মস্থর জোলার নবেলের আদর. সেই ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাহারা রামায়ণ, কুমার-সম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, যে আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তি কর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতা গুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেক গুলিকে কেবল অশ্লীলতা দোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে, এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নয়, তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র, তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝাইয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব, কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, এক জন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভাগুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই।

প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী—প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে পাত্রের রুচির অভাবের কারণ, (১) পুস্তক-দত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র-সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্ম্মিণী, অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থুল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্ত্বাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে! মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়া দুই কথায় সারিয়া যাইতে পারিতাম। অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা—পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

* * * * * * * *

* * * * * * * *

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবণ করিতেছে না—দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ দেশ কাল পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই—কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ী। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগে পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে নাই। এখানেও মার্জ্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস যমক যে সর্ব্বত্রই দূষ্য এমত কথা আমি বলি না। ইংরাজিতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময় বড মধুর। কিছুরই

বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন, দুই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন—রস উছলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্তেরও এক একটী অনুপ্রাস বড় মিঠে—

বিবিজান চলে যান লবেজান করে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহদ্দ নাই। একবার অনুপ্রাস যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি। এই দোষ গুণের উদাহরণ স্বরূপ দুইটী গীত বোধেন্দু-বিকাশ হইতে উদ্ধৃত করিলাম;——

আমরা একটিমাত্র উঠাইয়া দিলাম।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কেরে, বামা বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়। ১
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, সগর্ব্বে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥ ২
কেরে, ললিত রসনা; বিকট দশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়॥৩

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দ কৌশলী বলিয়া তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য

কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশীভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকা ফুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী—তাহার বিশেষ কারণ, তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড মিঠে লাগে—ভরসা করি পাঠ-কেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না, যে ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতাপ্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একদিগে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়্বিবাক্ মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারি-তেছে না—আর এক দিগে ইংরেজীর ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত; মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক পাঠক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে

ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা, অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল তাহার সন্দেহ নাই! তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। "বর্ষাকালের নদী"। "প্রভা-তের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। * * * * * * * *

("তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায়" না থাক্—বঙ্কিম বাবু কবিতাসংগ্রহে তাঁহার যে জীবনী লিখিয়াছেন, তাহাতে আছে। স্থানাভাব বশতঃ ইচ্ছাসত্ত্বেও সে জীবনী

হইতে এখানে কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না ; এখন পাঠক স্বয়ং কবিতাসংগ্রহে ডুবিয়া ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিলেই আমাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়।)

(বালিকার রচনা।)

প্রীতি উপহার।

(ইংলণ্ড-প্রবাসী ভ্রাতার প্রতি।)

দীর্ঘ কাল তরে, হায়! শোক পারাবারে
ভাসায়ে আত্মীয় জনে,
কাঁদাইয়া বন্ধুগণে,
ইংলণ্ডে গিয়াছ, ভাই, প্রফুল্ল অন্তরে,
জ্ঞানের অপূর্ব্ব জ্যোতি লভিবার তরে।

অতুল বিদ্যার আশ হৃদয়ে ধরিয়া
ছাড়ি প্রিয় বন্ধুগণ,
ত্যজি সুখ নিকেতন,
সুদূর বিদেশে কাল করিবে যাপন,
কেমনে রহিবে ছাড়ি আত্মীয় স্বজন?

জনকজননী তব ব্যাকুল অন্তরে
ভাসিছেন তব তরে
সদা নয়নের নীরে,
এক মাত্র পুত্র—তুমি হৃদয়ের ধন,
কত চিন্তা করিছেন তোমার কারণ।

কত দিন যাবে চলি, কত বর্ষ পরে,
বিদ্যার কিরীট শিরে
পরিয়া গৌরবভরে
ফিরিয়া আসিবে, ভাই, স্বদেশে যখন,
নিরখিয়া জুড়াবেন ব্যথিত জীবন।

শৈশবসুহৃদ তুমি স্নেহের আধার,
হাস্যময়, মনোহর,
হৃদয় বিমুগ্ধ-কর
অতুল সৌন্দর্য্যভরা আনন্দ তোমার
সদাই ভাসিছে, ভাই, নয়নে আমার!

আশীর্ব্বাদ করি—তুমি দীর্ঘজীবি হও!
পূর্ণ যেন হয় তব
হৃদয়বাসনা সব!
তোমার কীর্ত্তির ধ্বজা ভারত ভিতরে
উড়ুক—বাসনা এই—চিরদিন তরে!

শ্রীপ্রমীলা সুন্দরী

রাজনৈতিক আলোচনা।

ব্রহ্ম রাজ্যে বিষম বিড়ম্বনা।

যতই কেন ডাকাতি ডাকাতি করিয়া চীৎকার কর না ব্রহ্মে কখনই সহজে শান্তি স্থাপিত করিতে সক্ষম হইবে না। ব্রহ্মের রাজা পরাজিত হইয়াছে মাত্র, ব্রহ্মবাসীরা এখন পর্য্যন্তও পরাজয় স্বীকার করে নাই—শীঘ্র করিবে এরূপ সম্ভাবনাও নাই। আমাদের মুখবন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতেছেন যে বর্ম্মা অধিকৃত হইয়াছে ও সমগ্র জাতি অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, কেবল মাত্র কতকগুলা মন্দস্বভাব-বিশিষ্ট-লোক রাজ্যে শান্তি স্থাপনের ব্যাঘাত করিতেছে। ডাকাতেরা কোন্ কালে সুশিক্ষিত ২৫ হাজার সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিয়াছে, তাহা আমরা ইতিহাস পাঠে আজও পর্য্যন্ত অবগত হই নাই। কিজন্য পুনরায় আরো ১৫ সহস্র সৈন্য বর্ম্মায় প্রেরিত হইতেছে?

ডাক্তার হণ্টার পালির্য়ামেণ্টে প্রস্তাব করেন যে বর্ম্মায় একজন দেশীয় রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রক্ষক (Protectorate) স্বরূপ থাকিলে, রাজ্যে শান্তি বিস্তার হইবে; ভারতবাসীদিগকে বর্ম্মা রাজ্য রক্ষার্থে ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না এবং স্বার্থপর ইংরাজ বণিক্ দিগেরও স্বার্থ সাধনা উত্তম রূপে সুসিদ্ধ হইতে পারিবে। "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। এরূপ ন্যায় প্রস্তাব পালির্য়ামেণ্টে অনুমোদিত হইল না। দেশীয় সংবাদ পত্রসম্পাদকগণও ডাক্তার হণ্টারের প্রস্তাব বহু পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়া কোন ফল প্রাপ্ত হন নাই।

লর্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফ্ চর্চ্চহিলের চাতুরী।

এবারে পালির্য়ামেণ্ট মহাসভার প্রথম অধিবেশনে মহারাণীর (Speech) ঘোষণা পত্রে আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা ছিল না। মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন ঘোষণা পত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই বায়ু পরিবর্ত্তনার্থে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। এই সুযোগ পাইয়া লর্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফ্ মহারাণীর এক খানি অতিরিক্তঘোষণাপত্র দ্বারা আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে কতক মতামত প্রকাশ করিয়া বড়ই বাহাদুরি লইয়াছিলেন, এ দিকে বৃদ্ধ গ্লাড্‌ষ্টোন ইহা শুনিয়াই পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এরূপ অতিরিক্ত ঘোষণাপত্র প্রচার এক প্রকার বিলাতি জুয়াচুরি এবং ন্যায়বিরুদ্ধ। তবে লর্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফের নিকট ন্যায় প্রত্যাশা করা কেবল দুরাশা মাত্র। এইরূপ অসদ্ব্যবহারে পীড়িত হইয়া পার্ণেল-দল ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন। মহাসভার কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। কেবল মাত্র বক্তৃতার ছড়াছড়ি ও নিন্দাবাদ চলিতেছে। আইরিষদিগের ন্যায্য প্রার্থনা মঞ্জুর না হইলে তাহারা কখনই কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে

দিবে না। নিজদলভুক্তদিগকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিবার জন্য পার্ণেল নাকি রোমানক্যাথলিক মতাবলম্বী হইবেন এরূপ শুনা যাইতেছে।

বল্‌গেরিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার।

প্রিন্স্ আলেকজাণ্ডার হঠাৎ নিজ প্রজা ও মন্ত্রীবর্গ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও দেশবহিষ্কৃত হইলেন। সভ্যজগৎ এরূপ সংবাদে আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত, যে রাজা সারভিয়ার যুদ্ধে ভয়ানক বিক্রম, সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন—যে রাজা প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক পিতৃতুল্য আদরিত ও সম্মানিত হইতেন, সেই রাজা হঠাৎ কেন এরূপ অবমানিত হইয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন? শুনা গেল রুশিয়ার দূতের মন্ত্রণায় এরূপ ঘটিয়াছিল। বিদ্রোহীগণ রাজাকে দেশ বহিষ্কৃত করিয়া, জানু পাতিয়া রুষ দূতের নিকট অধীনতা স্বীকার ও রুষ বাদসাহের সাহায্য ভিক্ষায় কুণ্ঠিত হয় নাই। দুই দিন পরেই সৈন্য ও প্রজাবর্গ বিদ্রোহী মন্ত্রিবর্গকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া আলেকজাণ্ডারকে সিংহাসন অধিকার করিতে নিমন্ত্রিত করায়, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন, কিন্তু রুষ ও জর্ম্মানির আজ্ঞায় পুনরায় রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন। বলগেরিয়ানগণ রুশের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া স্বাধীনতা লোপভয়ে তুর্কির সুলতানের সাহায্য যাচিঞা করিয়াছে। বোধ হয় এই বল্‌গেরিয়া লইয়া ইউরোপে একটা গোলযোগ বাধিতে পারে, ইংলণ্ড আলেকজাণ্ডারের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু বেগতিক দেখিয়া এখন মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

মোরভি রাজ্যে ভীষণ অত্যাচার।

বোম্বে বিভাগে কাটিওয়ার অধীনে মোরভি রাজ্য স্থাপিত। এখানে লেফ্‌টেনেণ্ট সলমন (Salmon) কাটিওয়ার এজেন্সির তরফ হইতে বিচারক নিযুক্ত আছেন। কোন মোকর্দ্দামায় তিনি বিরক্ত হইয়া বারিষ্টার ওয়াডিয়াকে চুপ্ করিতে বলেন ও ক্ষান্ত না হইলে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন ভয় দেখান। ওয়াডিয়া বেগতিক দেখিয়া প্রস্থান করেন। তৎপরে জাডিজা ভাওসিংজি মোদিকে ডাকিয়া, সলমন ওয়াডিয়ার স্থলে অন্য উকীল করিতে বলেন, ভাওসিংজি ইহাতে সম্মত না হওয়ায়, সাহেব কদর্য্য গালি বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাওসিংজি বলিলেন যে তিনি রাজপুত, তাঁহাকে এরূপ গালি দেওয়া উচিত নহে। ইহাতে সাহেবের ক্রোধ সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হয়, ঘুসি ও লাথি চালাইয়া গলা টিপ দিয়া ভাওসিং ও তাহার ভ্রাতাকে কাছারি হইতে দূর করিয়া দেন। ভাওসিংজি কাটিওয়ারের পলিটিক্যাল এজেন্সির নিকট সলমনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে। বিচারালয়ে কি ভীষণ অত্যাচার!! সলমন ইংরাজ নামের কলঙ্ক। দেশীয় রাজারা এ ভয়ানক সংবাদ পাইয়া কিরূপ সুস্থির থাকিবেন বলিতে পারি না। আমরা লর্ড ডফরিন্‌কে ন্যায়বিচার করিতে অনুরোধ করি। ইংরাজ বলিয়া সলমন যেন নিষ্কৃতি না পান।

অম্বালায় ভীষণ অত্যাচার।

মুসলমানদিগের ইদ পর্ব্বের সময় এ বৎসরেও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এবং পঞ্জাবের স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমান দিগের মধ্যে ঘোর-বিবাদ হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরাই এই বিবাদের মূল কর্ত্তা। নিজের ধর্ম্মের অনুরোধেই যে তাহারা এই বিবাদ বাধাইতে বাধ্য হইয়াছে এমনও নহে, হিন্দুদের ধর্ম্মে আঘাত করার উদ্দেশে হিন্দু পল্লী মধ্যে গোহত্যা করিয়াই তাহারা এই বিবাদের সূত্রপাত করে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সুশাসনে কোথায় এরূপ গোলযোগ নিবারিত হইবে—না গবর্ণমেণ্টের কোন কোন কর্ম্মচারীর দোষে স্থানে স্থানে এরূপ গোলযোগ বৎসর বৎসর বরঞ্চ বৃদ্ধি পাইতেছে।

যে জেলায় বুদ্ধিমান বিবেচক এবং সাহসী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন, সেখানে মুসলমানেরা এরূপ করিতে পারে না, নহিলে সুযোগ পাইলেই এ সময় মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করে। এই অত্যাচার হইতে আত্ম রক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বল প্রকাশ করিলে কিম্বা ন্যায্য উপায় অবলম্বনে ইহার প্রতিকার করিতে যত্নবান হইলে অনেক সময় হিন্দুরা উক্ত রাজকর্ম্মচারীদের ক্রোধের ভাজন হইয়া বিপদগ্রস্ত হন।

এইরূপ গোল উপলক্ষে মধ্যে অম্বালায় একটী বড় অরাজক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। অম্বালার মুসলমানেরা গোহত্যা করিয়া কাঁচা গোমাংস হিন্দুদের দ্বারে দ্বারে লইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে। হিন্দুরা ত্রস্ত আকুল হইয়া উঠে; সমস্ত হিন্দু দোকানদারদের দোকান বন্ধ হইয়া যায়। শেষে এই অত্যাচার নিবারণের উপায় স্থির করিতে তাহারা এক দেব মন্দিরে একটী সভা আহ্বান করে। কথা নাই বার্ত্তা নাই হঠাৎ ঐ থানের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ডেপুটি কমিসনার (পঞ্জাবে ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডেপুটি কমিসনার বলে) এই সভায় উপস্থিত হইয়া দোহাতি বেত মারিতে আরম্ভ করেন। অনেকে পলাইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ৬০।৬৪ জনকে ডেপুটি কমিসনার বন্দী করিয়া হাতে হাতকড়ী লাগাইয়া দেন। পরে ১৪ জন ছাড়া তাহাদের আর সকলেই রেহাই পায়।

যেই ভক্ষক—সেই রক্ষক, যিনি উহাদের বন্দী করিয়াছিলেন,—তাঁহার কাছেই আবার তাহাদের বিচার; বন্দীরা তাহাতে আপত্তি করিয়া লাহোরের প্রধান আদালতে দরখাস্ত করে, সেই অনুসারে প্রধান আদালত তার-যোগে ডেপুটি কমিসনারকে মকর্দ্দামা স্থগিদ রাখিতে হুকুম দেন ও ইহার কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠান। প্রধান আদালতের একজন ইংরাজ বারিষ্টার এ সংবাদ আসামীদের উকীল মুরলীধরকে (যিনি গত বম্বে জাতীয় মহাসভায় অম্বালার প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন) টেলিগ্রাম করেন।

প্রধান আদালতের এই হুকুম পত্রে আসামীর নামের এক অংশ একটু ভুল হয়; এই অছিলায় ডেপুটি কমিসনার এই মকর্দ্দামা সম্বন্ধে কোন হুকুম পান নাই বলিয়া তৎক্ষণাৎ আসামীদিগকে এমন এক দণ্ড দিয়া দিলেন যে সে দণ্ডের আর আপীল নাই, অথচ মুরলীধর

সেই দণ্ডের হুকুমের একটি নকল প্রার্থনা করায় বলিলেন যে প্রধান আদালতের হুকুম মতে এই মকর্দ্দমার সমস্ত কাগজ সেখানে গিয়াছে, হুকুমের নকল তাঁহার আপিসে পাওয়া যাইবে না !

এইরূপে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়া ও প্রধান আদালতের হুকুম লঙ্ঘন করিয়াই যে ডেপুটি কমিসনার ক্ষান্ত হইলেন এমন নহে, ইহার পরে তিনি আরো একটি অতি সুবিচারের কার্য্য করিয়াছেন। আসামীদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার সময় বক্তৃতার মধ্যে একদিন পূর্ব্বে তাহাদের উকীল মুরলীধর বলেন যে—কোন অন্যায় আচরণ করিবার অভিপ্রায়ে আসামীরা যে সভা আহ্বান করে নাই তাহা তিনি বেশ জানেন। কারণ সভার মধ্যে তাঁহার নিজের কয়েক জন মক্কেল ছিল—তাহারা কি করিলে ভাল হয় তাঁহার নিকট পরামর্শ লইবার জন্য ঐ সভায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠায়, তিনি ঐ সভায় গিয়া—গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা উচিত—এইরূপ পরামর্শ দিয়া চলিয়া আসেন। যেদিন মুরলীধর ডেপুটি কমিসনারকে এই কথা বলিয়াছিলেন, সে দিন তিনি কোন উচ্চ বাচ্য করেন নাই, তাহার কয়েক দিন পরে আবার যখন মুরলীধর এই মোকর্দ্দমার ওকালতী করিতে আদালত উপস্থিত হইয়াছেন তখন সাহেব তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম করিয়া বলিলেন, "সেই সভায় তুমি যে উপস্থিত ছিলে ইহা তুমি নিজেই স্বীকার করিয়াছ সুতরাং তুমিও দোষী,—তুমিও বন্দী হইলে—" অবশ্য অন্য লোক তৎক্ষণাৎ জামিন দিয়া তাহাকে খালাস করিয়া লইল। যাই হউক ঠিক এতদূর অরাজকতা আর কখনো দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ ! ! ! এখন লাহোরের প্রধান আদালত ও সেখানকার লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর ইহার কি বিচার করেন দেখা যাক্।

একটি অসহায় স্ত্রীলোকের প্রতি ভীষণ পাশবিক অত্যাচার।

হিন্দু-স্ত্রীগণ সতীত্বরত্নকে যে কিপ্রকার মূল্যবান মনে করে তাহা এই ঘটনা দ্বারা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। আজ কাল যেখানে সেখানে দেশীয় দিগের প্রতি অত্যাচার হইতেছে। আসামে চা বাগানের ত কোন কথাই নাই। রেল গাড়িতেও স্ত্রীলোকদিগের নিস্তার নাই। গত ৩০ আগষ্ট ১১ নম্বরের গোয়ালন্দ ট্রেনে (No. 11, Goalund up Train) তিনটি হিন্দু মহিলা ভ্রমণ করিতেছিলেন। ট্রেন চুয়াডাঙ্গায় আসিলে গার্ড স্নিলার (Snillar) স্ত্রীলোক দিগের গাড়ি বদল করিয়া আপনার (Van) গাড়ীর নিকটের কামরায় আনিয়া পথে মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নানা প্রকার কুৎসিৎ অঙ্গ ভঙ্গি করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকগণ গাড়ির খড়খড়ি উঠাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইল। দুর্বৃত্ত গার্ড যখন দেখিল মহিলাগণ তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না, তখন আপন কামরা হইতে স্ত্রীলোকদিগের কামরায় আসিয়া রোহিনী নাম্নী ২৫ বয়স্কা বিধবার প্রতি

অত্যাচার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সতীত্বরক্ষার্থ জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া রোহিনী গাড়ির জানালা দিয়া নীচে পড়িয়া গেল। পোড়াদহ ষ্টেসনে গাড়ি পঁহুছিলে, দেশীয় গার্ড ষ্টেসনমাষ্টারকে সংবাদ দিল যে একটী স্ত্রীলোক গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। স্লিলার সে কথা কিছুই বলে নাই। রোহিনী পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল, পোড়াদহ হইতে লোক গিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করে।

দেশীয় সংবাদপত্রগণ এ বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন করায় রেল বিভাগের পুলিস স্লিলারের নামে অভিযোগ মকদ্দামা আনিয়াছে। মকদ্দমা প্রথমে কুষ্টিয়ায় উঠিয়াছিল—কিন্তু সেখানকার বিচারপতি দেশীয় লোক বলিয়া স্লিলার তাহাতে আপত্তি করায় মকর্দ্দামা কৃষ্ণনগরে গিয়াছে। গার্ডের পক্ষে ইয়োরোপীয় উকীল, ব্যারিষ্টার আছে, আর পুলিসের পক্ষে বাঙ্গালা দুই একজন উকীল আছেন। মকদ্দামায় কিরূপ বিচার হয় আমরা জানিতে উৎসুক আছি।

কুলির প্রতি অত্যাচার।

কুলি অত্যাচার কাহিনী আর কত বলিব। অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে সহস্র সহস্র ভীষণ অত্যাচার আসাম. চা বাগানে প্রত্যহই হইয়া থাকে। শিবসাগরের এক চা বাগানের কালী কুলি, আসিষ্টাণ্ট কমিসনেরর নিকট অভিযোগ করে যে উক্ত বাগানের সর্দার মেট কালীর সন্তান শিবচরণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহার নিকট হইতে জবরদস্তি করিয়া এগ্রিমেণ্ট লেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। সুবিচারক সমন মঞ্জুর না করিয়া চা-বাগানের সাহেবকে পত্র লেখেন যে ঘটনা সত্য কি না? চা-কর সাহেব সত্য ঘটনা গোপন করাতে এক তরফা মকর্দ্দমা ডিস্ মিস্ হইল!!!

কালী তৎপরে আপনার ছয় মাসের মাহিয়ানা বাবদে নালিস রুজু করিল। সাহেব কালীর বেতন দেন নাই ইহার কারণ এই যে, কালী তাহার পুত্র শিবচরণকে এগ্রিমেণ্ট দিতে দেয় নাই। কালীর এ মকর্দ্দামাও ডিস্ মিস্ হইল। হায়! এরূপ সুবিচার ইংরাজ রাজত্বে আর কত দিন চলিবে?

গরিব কুলিরা যেরূপ অত্যাচার সহ্য করিতেছে বোধ করি সভ্য জগতে ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ক্রীত-দাসদিগের প্রতিও এরূপ অত্যাচার হইত না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কি এ অবিচার কলঙ্ক ঘুচাইবার যত্ন করিবেন না?

শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ।

ঘোষজা মহাশয় শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। কেন যে তিনি দুই বার নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই এক খানি পত্রে তিনি তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইংরাজেরা স্বাধীনতাপ্রিয় এবং তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে অত্যাচার

হইতে মুক্ত করিতে বিশেষ যত্নবান। "লঙ্কায় যে আসে সেই রাক্ষস হয়।" ভারতে পদার্পণ মাত্রই কি ইংরাজ দুর্নীতি পূর্ণ ও স্বার্থপর হইয়া যায়? ইহার কি কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হইবে না! সে যাহা হউক লালমোহন ঘোষ পুনরায় নির্ব্বাচিত হইবেন এরূপ আশা করেন। তিনি পার্লিয়ামেণ্টে যাইলে আমাদের কতকটা যে উপকার হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি দাদা ভাই নওরোজি ও লালমোহন ঘোষ দুই জনেই হাউস্ অব্ কমন্সের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া সেখানকার সভ্যদিগকে ভারতে ইংরাজ অত্যাচার কাহিনী যথা বিহিত জ্ঞাপন করাইতে সচেষ্ট থাকিবেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূজার বন্ধের তাড়াতাড়িতে এই দুই-সংখ্যক "ভারতীতে" দুই চারিটা মুদ্রাঙ্কণের ভুল রহিয়া গিয়াছে। আশা এই, "ভারতীর" গ্রাহকগ্রাহিকাগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

যন্ত্রাধ্যক্ষ।

মূল্য প্রাপ্তি।

নাম	ঠিকানা	মূল্য
বাবু রাজেন্দ্রলাল শেঠ	বিডন্ ষ্ট্রীট	৩৲
" ভোলানাথ ধর	রূপচাঁদ রায়ের ষ্ট্রীট	৩৲
" ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত	কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট	১৲
" বিপিনবিহারী মিত্র	শ্যামবাজার	৩৲
" হরচন্দ্র মজুমদার	আজমীর	৩।৵০
" চণ্ডীচরণ মিত্র	বাঁশওয়াড়া	৩।৵০
" দুর্গাদাস চৌধুরী	দিনাজপুর	৩।৵০
" উমাকিশোর রায়	বরিশাল	৩।৵০
" বিশ্বেশ্বর কারফরমা	ভাগলপুর	৩।৵০
" রাজেন্দ্রকুমার বসু	আহিরিটোলা	৩৲
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	বেরিলী	৫৲
" ভগবতীচরণ দত্ত	বালাঘাট	৩।৵০
শ্রীমতী কাদম্বিনী ঘোষ	ভবানীপুর	৩৲
" ক্ষীরোদবাসিনী দাসী	মৃজাপুর	২৲
বাবু ভগবতীচরণ মিত্র	দানাপুর	২৲
" বিহারীলাল মিত্র	শ্যামবাজার	৩৲
ডি, ঘোষ এস্কয়ার	কম্বুলিটোলা	৩৲
বাবু দ্বারকানাথ চট্টোঃ	ছোট আদালত	॥০
" ঈশ্বরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	আগরা	২৲
" জানকীনাথ চট্টোঃ	ক্লাইভ ষ্ট্রীট	২৲
" ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী	জেঃ পোষ্ট আফিস	৸০
" হরিদাস শীল	চাঁপাতলা	৩৲
এম, গুপ্ত এস্কয়ার	মেছবাজার ষ্ট্রীট	২৲
বাবু লালচাঁদ মিত্র	মৃজাপুর	৩৲
" কেশবচন্দ্র দেব	সীতাপুর	৩।৵০
" নেপালচন্দ্র চট্টোঃ	উলিপুর	২৲
" হেমচন্দ্র গোস্বামী	চৌরঙ্গী	৩৲
" দেবেন্দ্রদেব দাস	জানবাজার	৩৲
" ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	চাঃ মঃ ব্যাঙ্ক	১৲
" রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	লাহোর	১৸৵০
" ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোঃ	ক্যানিং ষ্ট্রীট	৪৲
" বিষ্ণুচরণ মিত্র	মিসন্‌রো	৪৲

বিজাপুর।

দ্বিতীয় ভাগ।

ইতিহাস।

বিজাপুর রাজ্য সংস্থাপক য়ুসফ আদিল সা তুরস্ক সুলতান মুরাদের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

য়ুসফ আদিল সা। ১৪৮৯—১৫১০

১৪৪৩ অব্দে তাঁহার জন্ম। সুলতান রাজবংশে একটী মাত্র পুত্র সন্তান জীবিত রাখিয়া অবশিষ্ট গুলিকে বিনষ্ট করিবার এক নৃশংস রীতি ছিল। এই প্রথানুসারে সুলতান মহম্মদ সিংহাসনারূঢ় হইবামাত্র তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণের নিধন সাধনের আদেশ জারী করেন—য়ুসফ তাহাদের মধ্যে এক জন। য়ুসফের মাতা সন্তানের প্রাণরক্ষার অনেক চেষ্টা দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া তিনি এক কৌশল করিলেন। ইমামুদ্দীন নামক জনৈক পারস্ত বণিক কনস্তান্তিনিয়ায় বাস করিতেন; তাঁহার সাহায্যে আপন পুত্রের স্থানে অপর একটী বালককে সাজাইয়া দিয়া য়ুসফকে বণিকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বণিক তাঁহার জীবন রক্ষার্থে প্রতিশ্রুত হইয়া য়ুসফকে পারস্য দেশে লইয়া যান ও তাঁহার বিদ্যাধ্যয়নের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। সেখানেও তাঁহার জীবন-রহস্য প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ঘোর বিপদার্ণবে মগ্ন করে। অবশেষে অনেক ফাঁড়া কাটাইবার পর য়ুসফের স্বপ্ন হয় যে ভারতবর্ষ প্রয়ানেই তাঁহার কল্যাণ, সেই স্বপ্নানুসারে ১৩৬১এ তিনি পারস্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া দাভোলে (রত্নগিরি) উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর—রূপবান্ বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন। জনৈক পারস্য বণিকের আমন্ত্রণে তিনি দাভোল হইতে বাহমন-রাজধানী বিদূরে গমন করেন। তথায় রাজমন্ত্রী মহম্মদ গওয়াসের অনুগ্রহে সৈনিক পদে নিযুক্ত হয়েন, সত্বর তাঁহার পদোন্নতি হইল। বিদূর হইতে বন্দ্রাড়ে গিয়া তিনি ১৫০০ অশ্বের অশ্বপতি ও আদিল খাঁ আখ্যাপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহম্মদ গওয়াস তাঁহাকে দৌলতাবাদের গবর্ণর নিযুক্ত করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর বিজাপুরে বহমনী রাজার অধীনে তাঁহার কর্ম্ম হয়। ১৪৮৯এ তিনি অধীনতা-বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপদবী গ্রহণ ও বিজাপুরে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিলেন। ১৪৯৮এ দক্ষিণ সুলতানেরা বাহমনী রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন, তখন গোওয়া ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ য়ুসফের ভাগ্যে আইসে। যখন ভাস্কো ডি গামা ভারতবর্ষের নূতন পথ আবিষ্কার পূর্ব্বক কর্ণাটক তীরে আবির্ভূত হন, তখন য়ুসফ বিজাপুরের অধীশ্বর, পোর্ত্তুগীসদের সঙ্গে গোওয়া লইয়া তাঁহার অনেক যুদ্ধ হয়। ১৫০৯এ পোর্ত্তুগীস রাজপ্রতিনিধি আলবুকর্ক বিজাপুর বিপক্ষে বিজয়নগরের রাজার সহিত সন্ধি বন্ধন করেন। পর বৎসরে আলবুকর্কের হস্তে বিজাপুর সৈন্যের পরাভব হইয়া গোওয়ায় পোর্ত্তুগীস্ আধিপত্য সংস্থাপিত হয়।

বিজাপুরে দুই শত বৎসরের মধ্যে নয় জন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। সেকাল সুখশান্তিভোগের কালই নহে—ঘোর উপদ্রব—তুমুল বিপ্লব—গভীর অশান্তির মধ্যে তাঁহার রাজ্য কারবার। হয় বৈরনির্য্যাতনের চেষ্টা নয় শত্রু হইতে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তন। সিয়া ও সুন্নী মুসলমানের যুদ্ধ—প্রতিবাসী সুলতানের সহিত যুদ্ধ—বিজয়নগরের হিন্দু রাজাদের সহিত যুদ্ধ—মোগলদের সহিত যুদ্ধ—এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে বিজাপুর রাজারা কখন্ যে রাজ্যশাসন— রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অবকাশ পাইতেন তাহা ভাবিয়া ওঠা যায় না।

সিয়া ও সুন্নী

য়ুসফ আদিল সা পারস্যে বাস ও শিক্ষালাভ করিয়া সিয়া ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। স্বীয় রাজ্যে সিয়া মত সংস্থাপন করিতে গিয়া দেখিলেন যে ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ নয়। তাঁহার সেনাদের মধ্যে তুর্ক প্রভৃতি অনেকে সুন্নী মুসলমান ছিল, আর প্রতিবাসী সুলতানেরাও এই নূতন মতের প্রতিপোষক ছিলেন না। এই সূত্রে যে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহা দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মযুদ্ধ নামে অভিহিত। আহমদনগর, গোলকণ্ডা, বিদরের সুলতানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে পর য়ুসফ অনেক কষ্টে এই ষড়চক্র ভেদ করিয়া পার পাইলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি তেমন গোঁড়া সিয়া ছিলেন না—স্বরাজ্যে সিয়া মত সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্নীদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ নিষেধ করিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার উদার মত ছিল, তিনি বলিতেন "যেমন স্বর্গের নানা নিকেতন তেমনি ইস্‌লামের নানা সম্প্রদায়;" হিন্দুদের উপর তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল, তিনি একজন মহারাষ্ট্রী রমণী বিবাহ করিয়া হিন্দুজাতির সহিত সহানুভূতির পরিচয় দিলেন।

মহারাষ্ট্রী মহিষীর ঔরষে তাঁহার এক পুত্র জন্মে—নাম ইস্মায়ল। য়ুসফের মৃত্যুর পর

ইস্মায়ল আদিল সা। ১৫১০—১৫৩৪

ইস্মায়ল আদিল সা সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন, রাজ্যাভিষেক কালে তিনি অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন; তিনি সিয়া, তাঁহার মন্ত্রী কমাল খাঁ সুন্নী, রাজা মন্ত্রীর মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত, মন্ত্রীর মতলব স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া বিজাপুরে সুন্নীধর্ম্ম প্রত্যানয়ন করেন।

বালক সুলতান ও তাঁহার মাতা কমাল খাঁ কর্তৃক প্রাসাদে বন্দীকৃত হইলেন। মন্ত্রী স্বয়ং বল পূর্ব্বক রাজ্য লাভের অভিলাষী ছিলেন কিন্তু গণৎকারেরা গণিয়া বলিল এখনো সময় হয় নাই; তাই তিনি নিজগৃহে শুভলগ্ন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

রাজ্ঞী তাঁহার পুত্রের সমূহ শঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া একজন বিশ্বাসী তুর্ককে কমালখাঁ বধে নিযুক্ত করিলেন, তুর্ক মক্কা যাত্রার ভান করিয়া মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। মন্ত্রী তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন, মন্ত্রীবর যেমন তুর্কের হাতে পান দিতে হাত বাড়াইলেন, অমনি সে তড়িতের ন্যায় ত্বরিতে লুক্কাইত খড়্গ বাহির করিয়া মন্ত্রীর

বুকে বসাইয়া দিল, মন্ত্রীর অনুচরেরা সেই দণ্ডে তুর্ককে কাটিয়া ফেলিল, মন্ত্রী ও তাঁহার হন্তা দুজনেই এক সঙ্গে প্রাণ হারাইলেন।

মন্ত্রীর মাতা সুলতানা সদৃশী সাহসিকা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পুত্র হারাইয়া আপন পৌত্রকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার মনস্থ করিলেন। পৌত্রের নাম সফদর খাঁ। প্রচার করিয়া দিলেন যে তাঁহার পুত্র কমাল খাঁ মরেন নাই, আহত হইয়াছেন মাত্র। মৃতদেহ বসন ভূষণে সাজাইয়া বারান্দায় পালঙ্কের উপর বসাইয়া রাখিলেন যেন লোকদের অভিবাদন গ্রহণ করিতে রীতিমত বসিয়া আছেন। এদিকে সফদর খাঁ একদল সৈন্য লইয়া সুলতানের প্রাসাদ আক্রমণ করিতে চলিলেন।

রাজ্ঞীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দিলসদ নামক রমণী তাঁর সখী, এই দুই রমণী যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া গৃহপালদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ঘরে লোকজন বড় বেশী ছিল না, ভাগ্যবশতঃ বাহির হইতে একদল সিয়া পক্ষপাতী সেনা প্রবেশ লাভে তাঁহাদের বলবৃদ্ধি হইল। সফদর খাঁ যেমন তাঁহার সুন্নীদের লইয়া প্রাসাদ আক্রমণ করিবেন অমনি উপর হইতে তাহাদের উপর গোলাগুলি প্রস্তর বর্ষণ আরম্ভ হইল। সিয়া সুন্নীদের ঘোরতর সংগ্রাম অনেকে হত ও আহত হইয়া পড়িল, পরিশেষে সফদর খাঁ দ্বার ভেদ করিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন. এই সময়ে এক বাণে তাঁহার নয়ন বিদ্ধ হইল, তিনি এক প্রাচীরের আড়ালে গিয়া আত্মরক্ষণে তৎপর হইলেন। সেই প্রাচীরের উপর বালক সুলতান উপবিষ্ট। শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইস্মায়ল এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড উপর হইতে নিক্ষেপ করিলেন তাহা সফদর খাঁর উপর পড়িয়া তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিল। এই বিদ্রোহ নিবারণের পর ইস্মায়ল নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ইস্মায়লের রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। মুসলমান সুলতানদের সহিত তাঁহার যে সকল যুদ্ধ হয় তাহা এস্থলে বর্ণন করা অনাবশ্যক। তিনি সিয়া ছিলেন, পারস্যরাজা তাঁহার সম্মানার্থে বিজাপুরে দূত প্রেরণ করেন।

ইস্মায়লের পুত্র মল্লু তাঁহার উত্তরাধিকারী। মল্লু উগ্রচণ্ড দুরন্ত নরপতি ছিলেন। রাজ্য উচ্ছন্ন যায় দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করাইবার পরামর্শ দেন। ছয়মাস রাজত্বের পর মল্লু অন্ধীকৃত বন্দীকৃত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিমকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

উগ্রচণ্ড মল্লু

ইব্রাহিম সুন্নী ছিলেন। সুন্নীদের মানবর্দ্ধন, সিয়াদের নির্য্যাতন ও অপদস্থ করা তাঁহার কাজ; এমন কি, অনেক সিয়া মুসলমান তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া বিজয় নগর রাজার অধীনতা স্বীকার করে। ১৫৫৭ এ তাঁহার মৃত্যু হয়। অমিতাচারই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তাঁহার রোগ প্রতীকারে অক্ষম বলিয়া অনেক রাজচিকিৎসকের মুণ্ডচ্ছেদন ও হস্তীপদ মর্দ্দনে প্রাণদণ্ড বিধান হয়।

ইব্রাহিম
১৫৩৪—১৫৫৭

ইব্রাহিম বাদসাহের রাজত্ব কালে বিজয় নগরে ঘোরতর রাজ্যবিপ্লব সংঘটন হয়।

বিজয় নগর — চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ত্রিংশৎ বৎসর পরে হক্কা ও বুক্কা দুই ভাই শৃঙ্গিরি মঠাধিপতির সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে বিজয় নগর পত্তন করেন। ১৩৩৫ এ হক্কা হরিহর রায় নামে বিজয়নগরের রাজা হইয়া মুকুট ধারণ করেন। ঐ সময় আবার হসন গাঙ্গু নামক জনৈক পাঠান আল্লা উদ্দীন নাম ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ মুসলমান রাজ্যের সূত্রপাত করেন। হসন গাঙ্গু একজন ব্রাহ্মণ গণকঠাকুরের উপকার ঋণে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মানসে তিনি "বামন" পদবী গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বংশ "বাহমণী" নামে বিখ্যাত। বিজয় নগর ও বাহমণী সুলতানদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত। বিজাপুর স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া দাঁড়াইলে সেও বিজয়-নগরের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। ইব্রাহিম বাদসাহের সময় দেবরায় বিজয়নগরের রাজা। তিম্মা নামে তাঁহার মন্ত্রী ছিল। দেবরায়ের মৃত্যুকালে তাঁহার কোন প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র ছিল না। তিম্মা একজন বালক-রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা যৌবন প্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহাকে বধ করিয়া আর একটী বালকের মাথায় মুকুট দেওয়া হয়—এইরূপে উপর্য্যুপরি তিনজন বালক-রাজার অভিষেক ও মৃত্যু হয়। অবশেষে তিম্মা দেবরায়ের এক পৌত্রীর সহিত আপন পুত্র রাম রায়ের বিবাহ দিয়া রাম রায়কে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাজকুল সমূলে নির্ম্মূল করা তিম্মার অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে সিদ্ধ হইল। কেবল তির্ম্মল নামক একজন আধপাগলা জানোয়ার আর কন্যাকুলের একটী রাজ কুমার এই দুই বংশধর অবশিষ্ট রহিল।

রাম রায় অবাধে রাজ্যলাভ করিলেন কিন্তু নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। রাজপদ পাইয়া তিনি প্রগল্ভ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন, প্রজারা তাঁহার উপর চটিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল—তাহারা বলিতে লাগিল ইনি কোথাকার জাল রাজা, আমরা একজন খাঁটি রাজা চাই। রাম রায় বেগতিক দেখিয়া অবশিষ্ট রাজ-কুমারটীকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রী হইলেন। ক্রমে তাঁহার অরিকুল ধ্বংস করিয়া রাজাকে সরাইয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন।

ইহাতেও রাজ্যের শান্তি হইল না, এ দিকে আবার আধপাগলা তির্ম্মল গোলযোগ আরম্ভ করিল, তাহারও রাজা হইবার চেষ্টা। তির্ম্মল ও রাম রায়ের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল, অনেকে রাম রায়ের পক্ষ হইয়া তির্ম্মলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। তির্ম্মল এই শঙ্কটে বিজাপুর সুলতান ইব্রাহিমকে অনেক ধনরত্ন উপহার পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

ইব্রাহিম আহ্লাদের সহিত আমন্ত্রণ স্বীকার পূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বিজয়-নগরে উপস্থিত—তির্ম্মল তাঁহাকে স্বাগত বলিয়া বহু সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

হিন্দুদের মধ্যে হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। হিন্দুরাজ্যে এইরূপে যবন রাজের হস্তক্ষেপ সকলেরই অসহ্য হইল। রামরায় ও তৎপক্ষীয় লোকেরা তির্ম্মলকে সুলতান বিসর্জ্জনে অনুরোধ করিল—বলিল, আমাদের কথামত কাজ করিলে আমরা চিরকাল আপনার অনুগত ভৃত্য হইয়া থাকিব। তির্ম্মল আশ্বাস পাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা দক্ষিণা দিয়া অনেক কষ্টে ইব্রাহিমকে বিদায় করিলেন। মুসলমানেরা যেমন কৃষ্ণা পার হইল প্রজারাও আপনাদের বচন ভুলিয়া দাঁত দেখাইতে আরম্ভ করিল। জনরব উঠিল প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া তির্ম্মলকে ধরিতে আসিতেছে। এই সংবাদে তির্ম্মল একেবারে অধৈর্য্য ও কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িলেন। অশ্ব গজের চক্ষু উৎপাটন, রাজবাটীর গহনাপত্র জাঁতায় পিশিয়া চুরমার করণ, এইরূপ ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। পরে শত্রুরা রাজভবনে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় তিনি আত্মহত্যায় বিপদরাশি হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

রামরায় এখন নির্ভয়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন—তাঁহার শাসনে রাজ্যের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল। মুসলমানদের মধ্যে ঈর্ষা ও ভয়ের সঞ্চার হইল।

আলি আদিল সা। ১৫৫৭—১৫৮০

এ দিকে ইব্রাহিমের পশ্চাৎ আলি আদিল সা বিজাপুরের সিংহাসন আরোহণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ রামরায়ের সহিত মিত্রতা বন্ধন করেন। হিন্দু মুসলমানের এরূপ মিলন আর কখন শুনা যায় নাই। রাম রায়ের পুত্রশোক ঘটনায় আলি বিজয়নগরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিজয় নগরের রাজা রাজ্ঞী আলিকে পুত্ররূপে বরণ করেন। আহমদ নগরের সহিত আলির যখন যুদ্ধ হয় তখন রামরায় বিজাপুর সুলতানের সহায়তা করেন।

হিন্দুদের গুমর বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধাবসানের পর রামরায় অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া যবন রাজ্য তৃণবৎ দেখিতে লাগিলেন—মনে করিলেন ভারতে আমার সমান রাজা আর নাই। মুসলমানদের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। মসজিদে ঘোড়ার আস্তাবল বসাইয়া তাহাদের ধর্ম্মের অপমান—সুলতানেরা যেন তাঁহার পদানত ভৃত্য—তাঁহাদের দূতের অপমান, তখন সুলতানেরা চটিয়া উঠিয়া প্রগলভ হিন্দু রাজাকে দমন করিতে কটিবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ বিসর্জ্জন দিয়া বিদূর ও আহমদ নগর বিজাপুর ও গোলকণ্ডা এই চতুঃসুলতান বিজাপুরে আসিয়া একত্র হইলেন। তথা হইতে চারি সুলতান বিজয়নগরের উপর হল্লা করিতে কৃষ্ণানদী পার হইলেন। নদী তীরে আসিয়া দেখেন রামরায়ের সৈন্যদল পরপারে সম্মিলিত। নদীর ঘাট সুরক্ষিত পারাপার বন্ধ। সুলতানেরা এক ফন্দী করিলেন, তাঁহারা নদীর কিনারা দিয়া কতক দূর চলিয়া গেলেন যেন পার হইবার অপর স্থান অন্বেষণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে রামরায়ের সেনাপতি স্বস্থান ছাড়িয়া পরপারে শত্রুর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিতে লাগিলেন। তিন দিন এইরূপ চলিল। তৃতীয় রাত্রে সুলতানেরা সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া নির্বিঘ্নে নদী পার

হইলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময় মুসলমানেরা রামরায়ের সৈন্যের ৫ ক্রোশ দূরে আসিয়া বিশ্রাম করিল।

প্রভাতে দুই প্রতিদ্বন্দী দল পরস্পর সম্মুখীন হইল। উভয়েই বন্দুক কামান ও নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। হিন্দুরা মহারোষে আক্রমণ করিয়া মুসলমান সৈন্যের বাহুদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিল. কিন্তু মধ্যভাগ অটল। মধ্যভাগের নেতা আহমদ নগরের দিওয়ানা সুলতান হুসেন নিজাম সা শীঘ্রই রামরায়ের সৈন্য দলের উপর আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে যে. কামান ছিল তাহাতে পয়সা পুরিয়া হিন্দুদের প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিলেন—সেই মারাত্মক অর্থপাতে হিন্দু সৈন্যের মধ্যে মহা অনর্থপাত ঘটিল। ক্রমে হিন্দুগণ অবসন্ন হইয়া পড়িল। রামরায় তাঁহার পালকীতে উঠিয়া বেহারাদের দূরে যাইতে আদেশ করিলেন। বেহারাগণ খানিক দূর গিয়া পালকী রাখিয়া পলায়ন করিল। রামরায় অশ্বারোহণে পলায়নোদ্যত এমন সময় ধৃত হইয়া হুসেন সার সমক্ষে আনীত হইলেন। হুসেন সা তাঁহার "দিওয়ানা" উপাধীর উপযুক্ত রূপ মুণ্ডচ্ছেদের হুকুম দিলেন—তৎক্ষণাৎ সে আজ্ঞা পালিত হইল। সুলতানের অনুচরেরা রামরায়ের ছিন্ন মুণ্ড বর্ষাবিদ্ধ করিয়া সৈন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। রাজার এই দশা দেখিয়া হিন্দুসৈন্য হতাশ্বাসে পলায়ন পরায়ন—মুসলমানেরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। এই তালিকোটের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দুপক্ষের লোক মিলিয়া সমরক্ষেত্রে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ সেনার সম্মিলন হয়। হিন্দুসৈন্য বিস্তর মারা পড়ে এবং বিজয়ীদের লু'নজাত প্রচুর ধনরত্ন লাভ হয়। অতঃপর বিজয়ী সেনাগণ বিজয়নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক নগর মাঝে যবন-জয়পতাকা উড্ডীন করিল। সেখানকার লুটপাটের ব্যাপার বর্ণনাতীত। নগরের বাড়ীঘর চুরমার, লণ্ডভণ্ড--হিন্দুকীর্ত্তি চিহ্ন সকল চকিতের মধ্যে বিলুপ্ত হইল। রামরায়ের ছিন্ন মুণ্ড জয়স্তম্ভ স্বরূপ আহমদনগরে প্রেরিত ও তাহার এক প্রস্তর প্রতিমা বিজাপুরে স্থাপিত হয়। এই প্রস্তর মুণ্ড আর্ককেল্লায় সে দিন পর্য্যন্ত অনেকে দেখিয়াছেন। তালিকোটের যুদ্ধেই বিজয়নগরের ধ্বংস। এই যে তাহার পতন হইল আর তাহার উত্থানশক্তি রহিল না। দক্ষিণের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য চিরকালের মত প্রলয় সাগরে ডুবিয়া গেল।

তালিকোটের যুদ্ধ ১৫৮৫

১৫৮০ অব্দে আলীর মৃত্যু হয়। ইমারত নির্ম্মাণে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল—জুম্মা মসজিদ, তাজ বাউড়ী, সহরের প্রাচীর, জলপ্রণালী প্রভৃতি অনেক জিনিস তাঁহার সময়কার। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে দিল্লীশ্বর আকবর প্রেরিত কয়েক জন দূত বিজাপুরে আগমন করেন, তাহাদের কি গূঢ় মতলব প্রকাশ পায় নাই। মোগলের গুপ্তচরেরা বিজাপুরের উপর সেই যে শনির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল অচিরাৎ তাহার গরল ফল ফলিত হইল।

[ক্রমশঃ।]

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অশ্রুজল।

ডুবে আছি স্বপনের কোলে
ছায়াময় জগৎ সংসার,
একা আসি একা যাই চ'লে
কেহ নাই কথাটী কবার।

জীবনের মহান সম্বল
দু'ফোটা নীরব অশ্রুজল,
ফোটে তাহে ফুল শত শত
জগতে বিলা'তে পরিমল।

আশা শুয়ে নিরাশার ছায়ে,
হাসি লেগে শ্মশানের গায়ে,
থেকে থেকে হুহু করে মন
অনন্তে মিলায়ে যেতে চায়।

চাহেনা সে পৃথিবীর সুখ
সংসারের মোহ কোলাহল,
ডুবে আছে স্বপনের কোলে
অশ্রুজল মহান্ সম্বল।

মরমের ছিঁড়েগেছে তার
হৃদয়ের থেমে গেছে গান,
অশ্রুজলে ফুটে উঠে হাসি
তাহাতেই জুড়াই এ প্রাণ।

আয় হৃদে আয় অশ্রুজল
শ্মশানে বিলা রে পরিমল,
তুই বিনে ফুটে না যে হাসি
তুই মোর মহান্ সম্বল।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(বালিকার রচনা।)

গান।

চিন্তার তরঙ্গগুলি হৃদয় বেলার পাশে,
একটী দুইটী করি ধীরে ধীরে বয়ে আসে।
কত চিন্তা, কত আশা, কত স্নেহ ভালবাসা
তুলিয়া হিল্লোল-মৃদু হৃদয়ে ছুঁইয়া যায়।
কেহনা দেখিতে পায়, কেহনা জানিতে পায়,
বালুময় হৃদিতীরে, কত অশ্রু বারি-ধীরে
নীরবে ঝরিয়া পড়ি—আপনি শুকায়ে যায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রবাস পত্র।

আমি পূর্ব্বপত্রে পারসীদের রীতিনীতি কতক কতক বর্ণন করিয়াছি, এবার এক পারসী পরিবারকে রঙ্গ ভূমিতে অবতরণ করা যাক্। বোম্বাই গিয়াই এই পরিবারের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আমার কর্ম্মস্থলে যাইবার পূর্ব্বে আমি কয়েক মাস সস্ত্রীক ইহাদের বাটীতে বাস করি। বাড়ীটা বড়সড়, দোতালা, ইংরাজি ধরণে সাজান ও কতকগুলি মূল্যবান্ তৈল রঙ্গের চিত্র ফলকে অলঙ্কৃত। বৃদ্ধ মা—জী গৃহকর্ত্তা, তাঁর দুই কন্যা তাঁহার গৃহপ্রদীপ। একজন পারসী ভৃত্য—তাহার নাম জিলা। জিলাকে জরির কাপড় পরাইয়া সাজ সজ্জা করাইয়া দিলে চাকর মনিবে বড় তফাৎ জানা যায় না। মনিব অপেক্ষা চাকর সুশ্রী ও এক হাত উচ্চ। মা—জী যেমন আকারে খর্ব্বকায়, স্বভাবেও তাঁর কতকটা তেমনি ছেলেমানুষি জাঁকের ভাব, ঐ ক্ষুদ্র দেহটি আত্মশ্লাঘায় পূর্ণ। কোন কোন লোক আছে সে নিজের চক্ষে নিজে মস্ত লোক—সারাদিন সগর্ব্বে পুচ্ছ ফুলাইয়া বেড়ায়, সময় অসময় নাই অবাধে আপনার গুণগান করিয়া যায়, শ্রোতা তাহা গলাধঃকরণ করিতেছে, কি শুনিয়া মনে মনে হাসিতেছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; মা—জী ঐ ধরণের লোক. বড় বড় ইংরাজ ও রাজা রাজড়ার পরিচিত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে তাঁর বড় আমোদ, ইউরোপের সমুদায় মুকুটধারীর সহিত তাঁহার গলাগলি ভাব এই ভাবে অনেক সময় তিনি তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের গল্প করিতেন। আমাদের দেশে কিছুই নাই, যাহা আছে সমস্তই খারাপ—ইউরোপীয় সভ্যতাই আমাদের একমাত্র আদর্শ ও অনুকরণীয় এই তাঁর উপদেশের ধুয়া। তাঁহার কথায় যদি তোমার প্রতীতি না জন্মে তাহা হইলে কোন লর্ড তাঁহাকে কোন পত্র লিখিয়াছিল, তিনি তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন, কোন্ কালে তাঁর কোন্ প্যামফ্লেট ছাপা হইয়াছিল এই সব পাঁজিপুঁথি বা'র করিয়া তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন—অবশেষে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলিয়া তোমাকে অগত্যা তাঁহার মতে মত দিতে হইবে। মানুষে গুণদোষে জড়িত—দোষ ধরিতে গেলে কাহার না ধরা যায়, মা—জীর অনেক সদ্‌গুণও আছে—উদার সাদাসিদে সরল অন্তঃকরণ। এ দিকে যেমন ইংরাজভক্ত তেমনি আবার ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিবারও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যখন ছোট আদালতের জজ ছিলেন, তখন গবর্ণর **Sir Bartle Frere** কোন এক সংবাদ পত্রের রিপোর্ট দৃষ্টে তাঁর কাজের দোষ ধরিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করেন। মা—জী শীঘ্র ছাড়িবার পাত্র নন, এ দেশে কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা না দেখিয়া এই ব্যাপারটি তিনি পার্লামেণ্ট সভা পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া আপনি দোষ মুক্ত হইলেন—শুধু তা নয়, ক্ষতিপূরণ হুকুম পকেটে করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ কোর্টের উচ্চতর আসন অধিকার করিয়া লইলেন। মা—জী একটি পারসী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যুবরাজ-পত্নী আলেক্‌জান্দ্রার নামে তাহার নামকরণ করিয়াছেন।

এটি তাঁর বিশেষ যত্নের ধন—তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন। লোক দেখাইবার এই একটী জিনিশ পাইয়া মা—জী হাতে এক কাজ পাইয়াছেন, নতুবা পেন্সন লইয়া নিষ্কর্ম্মার ন্যায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেন। কোথায় ব্রিটিশ রাজ পরিবার—কোথায় বড় লাট সাহেব—কোথায় পোর্ত্তুগীস গবর্ণর জেনেরল কোন একজন বড় লোক বোম্বায়ে এলে হয়, অমনি মা—জী তাঁহাকে বলিয়া আপনার স্কুল পরিদর্শনার্থ লইয়া যাইতে ব্যস্ত। ঈশ্বরের কৃপায় স্কুলটী এখন ভাল চলিতেছে—ছাত্রী সংখ্যা শতাধিক, তাহার প্রায় সকলেই পারসী বালিকা—দুজন মাত্র হিন্দু কন্যা। হিন্দুরা এই বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাইতে চান না তার এক কারণ মনে হয় যে এখানে দেশীয় ভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, কেবলি ইংরাজি শিক্ষা। পারসীদের মাতৃভাষা যে গুজরাতী, তাহা শেখান হয় না কেন? এ প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। বোধ করি ইহা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠাতার অপার অনুরাগের ফল।

কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার খাতিরে বৃদ্ধ মা—জী তাঁহার জরতোস্তী প্রার্থনামালা আবৃত্তি করিতে শৈথিল্য করেন না। প্রত্যহ সকালে তিনি দুরূহ জন্দ ভাষায় বীজ বীজ করিয়া "মনস্নী গবস্নী কোনস্নী" কত কি মন্ত্র পাঠ করিতেন—সে ছবি আমার মানসপটে এখনো জ্বলন্ত দেখিতেছি।

মা—জীর দুই কন্যারত্নের গুণের কথা কি কহিব, তাঁহাদের সহাস্য সুন্দর মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে চিরমুদ্রিত থাকিবে—তাঁহাদের যত্ন শুশ্রূষা কখনই ভুলিতে পারিব না। আমার স্ত্রীর সেই প্রথম দূর প্রবাস। অন্তঃপুর-কারাগার হইতে সহসা স্বাধীন সমাজের পূর্ণ আলোকে পড়িয়া পিঞ্জরের পাখীকে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাসে ছাড়িয়া দিলে যেরূপ হয়, তিনি সেইরূপ কতকটা থতমত খাইয়া গিয়াছেন—এই দুই পারসী ভগিনীর সংসর্গে তিনি অনেক অংশে সেই পরিবর্ত্তনের ধাক্কা সামলাইতে পারিয়াছিলেন। মেয়ে দুটি বয়স্থা কিন্তু উভয়েই অবিবাহিতা। বড়টির তখন Courtship চলিতেছে। আমরা থাকিতে থাকিতে তাঁহার পিতা সাহেবী ভোজ দিয়া 'উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যরীতি' অনুসারে মহা ধূমধামে কন্যার বিবাহোৎসব সম্পন্ন করেন। এখন তিনি অনেকগুলি ছেলে মেয়ে লইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহার স্বামী কর্সদজী কামা পারসী মণ্ডলীর মধ্যে পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর বলিয়া বিখ্যাত। কনিষ্ঠা সিরিণবাই ইংরাজি ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন—লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায়—সামাজিকতায়, গৃহকার্য্যে সুদক্ষ। দুঃখের বিষয় তাঁহার শরীর নিতান্ত অপটু কিন্তু ঐ রুগ্ন শরীর লইয়া বৃদ্ধ পিতার সেবা শুশ্রূষা, ভগিনীর গৃহকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কর্ত্তব্য সাধনে যথাসাধ্য কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহাদের অশেষ আতিথ্য সৎকার লাভে তাঁহাদের বাটীতে যতটুকু সময় সুখে কাটাইয়াছি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এই পত্র শেষ করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীমকোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বারওয়েল সাহেব। আমি নন্দকুমারকে বোর্ডের সম্মুখে ডাকিয়া আনাইবার কোন বিশিষ্ট কারণ বা প্রয়োজন দেখিতে পাইতেছি না। আমার মতে গবর্ণরকে সামান্য অপরাধীর ন্যায় খাড়া করিয়া—নন্দকুমারের আনীত অভিযোগগুলির বিচার জন্য বিচারক রূপে উপবিষ্ট হইতে Board এর কোন ন্যায় সঙ্গত ক্ষমতাই থাকিতে পারে না। রাজা নন্দকুমার গবর্ণরের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহার যথার্থতা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে সভ্যগণের যদি বাস্তবিক ইচ্ছা হইয়া থাকে ও এই একতা-প্রাণ মন্ত্রীসভার শান্তি ও একতা রক্ষা করিবার বাসনা যদ্যপি তাঁহাদের সত্যসত্যই হইয়া থাকে—তাহা হইলে তাঁহারা অন্য এক সরল অথচ সুফলপ্রদ উপায় অবলম্বন করিয়া মনোভিষ্ট সাধন করিতে পারেন। মহারাজা নন্দকুমার কোম্পানির অনুকূলে ও গবর্ণরের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন, পার্লামেণ্টের সনন্দ দ্বারা নবস্থাপিত বাঙ্গলার সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ বর্ত্তমান সুপ্রীমকোর্ট তৎসমুদায়ই অবাধে শুনিতে পারেন। সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত হইলে বিচারকগণ নন্দকুমারের ও তাঁহার আনীত সাক্ষীদের সমস্ত জোবানবন্দী শুনিয়া বিচারাজ্ঞা প্রকাশ করিতেও পারেন। সুপ্রীমকোর্ট ভিন্ন আমার মতে গবর্ণরের উপর বিচার ক্ষমতা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা অন্য কাহারও নাই। Board এর হস্তে যে এ প্রকার ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্দেহ করি।"

"সৌভাগ্যের বিষয় এই যে—পার্লামেণ্টের আইনে কি গবর্ণমেণ্ট, কি প্রজা—উভয় দলেরই সকল প্রকার অপরাধের বিচার করিবার জন্য সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে—ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের ক্ষমতাগুলি ইহার দ্বারা অধিক পরিমাণে সংযত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও তাঁহারা যে স্বার্থসাধনোদ্দেশে কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিতে সহসা প্রবৃত্ত হইবেন—তাহারও পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকারের উচ্চ দরের ধর্ম্মাধিকরণের হস্তে কোনও প্রকার অবিচার হইবার আশঙ্কা নাই। এই সকল কারণে আমি বোর্ডের সম্মুখে নন্দকুমারের উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করিতেছি। আরও এই সঙ্গে আমি আমাদিগের সেক্রেটারি সাহেবকে অনুরোধ করি যে তিনি যেন নন্দকুমারকে সুপ্রীমকোর্টে গবর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি দাখিল করিতে আগ্রহ হইয়া অনুরোধ করেন। সুপ্রীমকোর্ট নন্দকুমারের অভিযোগ গুলির স্বপক্ষে যে কোন জোবানবন্দী প্রকৃত ও উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, বোর্ডের মেম্বরগণ সেই সমস্ত সাক্ষ্য প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন মতে দ্বিধা করিবেন না। ইহার অন্যথায়,

নন্দকুমারের আনীত কোন অভিযোগই Board আদতেই গ্রাহ্য করিবেন না ও তাঁহার এই প্রকার কার্য্যগুলিকে গবর্ণরের পক্ষে ভয়ানক মান-হানিকর বলিয়া বিবেচনা করিবেন।*

কর্ণেল মন্সন। আমার মতে মহারাজা নন্দকুমারকে মন্ত্রীসভার সম্মুখে আনিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বোর্ডের সম্মুখে নন্দকুমার যে সমস্ত সাক্ষ্য দিবেন, পরিশেষে সেই সমস্ত জোবানবন্দী সমেত অভিযোগগুলি সুপ্রীমকোর্টের নিকট প্রেরিত হইবে। নন্দকুমারকে বোর্ডের সম্মুখে আনিলে স্বয়ং গবর্ণরই তাহার জোবানবন্দী শুনিয়া তাহার সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিবেন। এ প্রকার স্থলে গবর্ণর সাহেবেরই সুবিধা অধিক বলিয়া বোধ হয়।

জেনারেল ক্লেভারিং—বাঙ্গালার গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস সাহেব এই মন্ত্রীসভার প্রধান সভ্য ও সভাপতি। তাঁহার বিরুদ্ধে মহারাজা নন্দকুমার এই সমস্ত অভিযোগগুলি আনাতে তাঁহার পদোচিত সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডেরও সম্মান হানি ঘটিয়াছে। আমার বিবেচনায় গবর্ণরের নিজের ও সেই সঙ্গে এই মন্ত্রীসভার সম্মান রক্ষার জন্য মহারাজা নন্দকুমারকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করান হউক। নন্দকুমার গবর্ণরের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনিয়াছেন ও তাহার সমর্থনার্থ যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন—সেই সমুদায় প্রমাণ সারগর্ভ, সত্য ও সমূলক কি না—ইহা তাঁহার সম্মুখে বিশেষরূপে বিবেচিত হইতে পারে। এই সময়ে যদি আমরা নন্দকুমারকে বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে না দিই—তাহা হইলে স্বয়ং গবর্ণরই হয়তঃ ভবিষ্যতে আমাদিগকে দোষ দিতে পারেন যে, অভিযোক্তাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রমাণ করিতে না দিয়া আমরা তাঁহাকে তাঁহার চরিত্র রক্ষণের ও নন্দকুমারের অভিযোগগুলির যথার্থতা-খণ্ডনের উপযুক্ত অবসর হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। নন্দকুমার বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ভবিষ্যতে এ প্রকার আপত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রীসভার সম্মুখে মহারাজা নন্দকুমারের উপস্থিতি গবর্ণরের পক্ষেই হিতজনক। এই অবসরে তিনি সকলেরই সমক্ষে অভিযোগগুলির অমূলকতা প্রতিপাদন করিয়া আপনার চরিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারেন। এই সকল প্রত্যক্ষ কারণের জন্য আমি নন্দকুমারের উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

---

* বারওয়েল সাহেব হেষ্টিংসের প্রাণের বন্ধু ছিলেন। বারওয়েল না থাকিলে এ প্রকার স্থলে সভায় আসিয়া উপবেশন করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইত। এই প্রকার রাজনৈতিক সময়ে বারওয়েল হেষ্টিংসের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। হেষ্টিংস নিজে যাহা কিছু বলা অসম্ভব বিবেচনা করিতেন, তাহা বারওয়েলকে দিয়া বলাইতেন। নন্দকুমারের অভিযোগ গুলির বিচার করিবার ক্ষমতা যে বোর্ডের মেম্বরগণের হস্তে ছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব। সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ গুলি উঠাইয়া লইতে পারিলে হেষ্টিংসের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে, ইহা বুঝিয়াই এ প্রকার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। হেষ্টিংসের পত্র হইতে পরে আমরা এ বিষয় প্রতিপন্ন করিব।

এই মুহূর্ত্তে আমরা নন্দকুমারের উপস্থিতি সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলে গবর্ণর হয়তঃ তাহার পর মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বেকার ন্যায় এক লম্বা চৌড়া মন্তব্য লিখিয়া বলিতে পারেন যে নন্দকুমারকে আমরা তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইতে না দিয়া তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের একমাত্র অবসর হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। বর্দ্ধমানের মহারাণী মৃত মহারাজা তিলকচাঁদের বিধবা পত্নী গবর্ণরের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনিয়াছেন, ও তাহার সমর্থনার্থ যে সকল মূল দলিল দাখিল করিয়াছেন, হেষ্টিংস সাহেব তাহা দেখিতে চাহিয়াছেন। তিনি সেই দলিল ও প্রমাণপত্রগুলি বিনা আপত্তিতে দেখিতে পারেন। তিনি যখনই তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, তখনই রাণীর উকীল তাঁহাকে সেই সমস্ত কাগজ পত্র দেখিতে দিবেন। নন্দকুমারের সম্বন্ধেও সেইরূপ। মহারাজা সে সমস্ত দলিল, ও প্রমাণাদি অভিযোগগুলির সমর্থনার্থে Boardএর সম্মুখে দাখিল করিবেন—তাহা যদি বোর্ডের বিবেচনায় অমূলক ও অসার বলিয়া বিবেচিত হয়—অথবা বর্দ্ধমানের রাণীর উকীল যে সমস্ত হিসাব পত্র ও প্রমাণার্থে দলিলাদি দাখিল করিয়াছেন, তাহা যদি তিলমাত্র সন্দেহজনক বলিয়া উপলব্ধি হয়—তাহা হইলে আমিই সর্ব্বপ্রথমে এই Boardএর সমক্ষে প্রস্তাব করিব—যে গবর্ণর সাহেবের বিরুদ্ধে মহারাজা নন্দকুমারের ও বর্দ্ধমানের রাণীর অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা—কুউদ্দেশ্য ও অসূয়া পরিপূর্ণ। এই সমস্ত কারণে আমার ইচ্ছা যে নন্দকুমারকে এই মন্ত্রীসভার সমক্ষে উপস্থিত করান হয়।

গবর্ণর জেনারেল—আমার এ সম্বন্ধে আর নূতন কিছু বলিবার নাই—আমার বক্তব্য আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বোর্ডে উপস্থিত থাকা বা না থাকা উভয়ই আমার পক্ষে সমান।

[এই সময়ে বোর্ডের সেক্রেটারি সাহেব মহারাজা নন্দকুমারকে ডাকিয়া আনিবার জন্য অন্যান্য সভ্যগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন]

কর্ণেল মন্সন—মহারাজা নন্দকুমারকে এই সভার সমক্ষে আনিবার জন্য আমি যে প্রস্তাব করি, তদুত্তরে গবর্ণর সাহেব যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাকে যথেষ্ট বিদ্রূপ ও প্রকারান্তরে তিরস্কার করা হইয়াছে। হেষ্টিংস সাহেব আমাকেই তাঁহার প্রকৃত অভিযোক্তা বলিয়া বিবেচনা করেন। কোন্ লোকের মুখে তিনি আমার সহিত নন্দকুমারের সাক্ষাৎ ঘটনা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিতেও তিনি যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইতেছেন। কিন্তু যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে আমি সেই অভিযোগপত্র দেখিয়াছি, ও সেই লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তাহা হইলেই সেই অভিযোগ-পত্রোল্লিখিত বিষয়গুলি মিথ্যা হইয়া যাইবে, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসম্ভব।

নন্দকুমারকে Boardএর সম্মুখে উপস্থিত করাইবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ কার্য্য দ্বারা গবর্ণরের পদোচিত সম্মান যতদূর অক্ষত ও অনাক্রান্ত থাকিতে পারে, এরূপ আর অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। আইনানুসারে আমরা যতদূর পারি, গবর্ণরের

সম্মুখে নন্দকুমারের সাক্ষ্যের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিব। যদি তাঁহার কথিত বিষয়গুলি কোন অংশে দোষার্হ ও মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আমরা সকলে তাঁহার এই প্রকার অন্যায় কার্য্যের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিব। গবর্ণর স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে ঘটিবার সম্ভাবনা। তিনি নিজে নন্দকুমারের কথিত বিষয়গুলির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে যতদূর ক্ষমতাবান্, বোধ হয় এই মন্ত্রী-সভামধ্যে অন্য কোন সভ্যই তদ্রূপ নহেন।

গবর্ণর জেনারেল—আমি এই মন্ত্রীসভা এক্ষণে একবারে ভঙ্গ করিলাম। আমার অবর্ত্তমানে এই অসম্পূর্ণ মন্ত্রীসভার যে সমস্ত কার্য্য হইবে, তাহা কোনমতে আইন ও ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

ফ্রান্সিস্ সাহেব—আমি গবর্ণরকে জিজ্ঞাসা করি, হঠাৎ তাঁহার এ প্রকার ঘোষণার কারণ কি ? এই ঘোষণা দ্বারা তিনি কি এই মন্ত্রীসভার সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে ও সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন ?

গবর্ণর জেনারেল—আমি আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া ইহার কোন উত্তর দিতে চাহি না। আমি সভাগৃহ ত্যাগ করিলাম।

(সবেগে গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান।)

বারওয়েল সাহেব—গবর্ণর সাহেব সভা ভঙ্গ করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়াও আসিতেছে। আমার বোধ হয় গবর্ণর এ কথা বলেন নাই—"এই সভার সভাপতির পদ আমি পরিত্যাগ করিলাম"। "এই সভাগৃহ ত্যাগ করিলাম" এই কথাই বলিয়াছেন। যাহা হউক আমিও এই সভা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি। গবর্ণর চলিয়া যাওয়াতে সভার কার্য্য অদ্য হইতে স্থগিত হইয়া গিয়াছে। এখানে এ কথাও প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি আইন-সঙ্গত উপায়ে, ও প্রচলিত নিয়মানুসারে গবর্ণরের নিকট হইতে কোন প্রকার আহ্বান-পত্র (শমন) না পাইতেছি, ততক্ষণ আমি এই সভার কোন কার্য্যে যোগ দিতে ইচ্ছা করি না।

(আসন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান।)

গবর্ণর ও তাঁহার প্রিয়মিত্র বারওয়েল সাহেব রোষভরে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেও মন্ত্রীসভা ভঙ্গ হইল না। অবশিষ্ট তিন জন সভ্য আইনানুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই দিনে সভার কার্য্য অনেক রাত্রি ধরিয়া হইয়াছিল। সেই সমস্ত ঘটনা আমরা এই স্থলে নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় লিপিবদ্ধ করিতেছি। বারওয়েল সাহেব প্রস্থান করিবার পর মন্সন সাহেব বলিলেন—"আমার মতে বোধ হয়—গবর্ণর সাহেবের এই মন্ত্রীসভা একবারে ভঙ্গ করিবার কোন ক্ষমতাই নাই। এই সভার কার্য্য কিয়দ্দিবসের জন্য স্থগিদ রাখিতে হইলে যখন অন্যান্য সভ্যগণের মত লইতে হয়,

ও তাঁহাদের মত সংখ্যা এই প্রকার প্রস্তাবের সম্বন্ধে অধিক না হইলে যখন সভার কার্য্য স্থগিদ রাখা হয় না—তখন গবর্ণর কর্ত্তৃক হঠাৎ এই প্রকার সভাভঙ্গ কি প্রকারে সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? "ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইয়া আসিতেছে' বলিয়া যে বারওয়েল সাহেব সভাভঙ্গের কারণ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাও কোন ক্রমে সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। নন্দকুমারের আনীত এই সমস্ত অভিযোগে আমাদের সভার সভাপতি হেষ্টিংস সাহেবের চরিত্রে বিষম কালিমা পড়িবার সম্ভাবনা। সন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে বলিয়া যে তিনি এই প্রকার গুরুভারপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গবর্ণর সাহেব পুনরায় আসিয়া এই সভায় স্বীয় পদোচিত আসন গ্রহণ না করিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আমাদিগের মধ্যে প্রাচীন অভিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ ক্লেভারিং সাহেবকে সভাপতির হইয়া কার্য্য করিতে অনুরোধ করি। আশাকরি আমার এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদী সম্মত হইয়া গৃহীত হইবে।"

ফ্রান্সিস্ সাহেব—ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আইনের সত্বানুসারে আমরা ন্যায়-সঙ্গতরূপে আমাদের মধ্যে অভিজ্ঞ ও পুরাতন সভ্যকে গবর্ণরের অবর্ত্তমানে আমাদের এই মন্ত্রী সভার সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করিতে বিশেষরূপে ক্ষমতাবান। যখন উক্ত আইনের পরিভাষায় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছে—যে গবর্ণরের অবর্ত্তমানে সভার কার্য্য কোন মতে স্থগিত থাকিতে পারে না ও এরূপ স্থলে কোন পুরাতন সভ্যকে সভাপতি রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া কার্য্য চলিতে পারে, তখন এ বিষয়ে আর কোন আপত্তি ও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এবং এই প্রকার সভাপতি নিয়োগে যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহার সমস্তই গবর্ণরের কার্য্য সমূহের ন্যায় বিধিসঙ্গত, ন্যায্য ও কার্য্যকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

জেনারেল-ক্লেভারিং—আমি মন্সন সাহেবের এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতে স্বীকৃত হইতাম না যদি না আমি বুঝিতাম যে গবর্ণর সাহেব মন্ত্রীসভার অন্যান্য সভ্য-গণের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছায় ও অসঙ্গত উপায়ে তাঁহার ক্ষমতার নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করিয়া এই মন্ত্রীসভা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় এ প্রকার কল্পিত ক্ষমতানুসরণে সভা ভঙ্গ করার কোন ক্ষমতাই গবর্ণর সাহেবের নাই। এই সময়ে সভায় উপবিষ্ট থাকিয়া নন্দকুমারের অভিযোগ ও তদানুকূলে প্রমাণগুলির আদ্যোপান্ত শুনিয়া অভিযোগ গুলির অযথার্থতা প্রতিপন্ন দ্বারা আত্মসম্মান রক্ষা করা তাঁহার সম্পূর্ণ উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া ও তাঁহার পদত্যাগ সম্বন্ধে সভ্যগণের ঘোরতর আপত্তির দিকে কর্ণপাত না করিয়া অনায়াসে সভা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। এপ্রকার সঙ্কটাপন্ন স্থলে সভার কার্য্য যাহাতে অসম্পূর্ণ না থাকে, তদুদ্দেশ্যে আমি সভাপতির পদ গ্রহণ করিলাম।

জেনারেল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, সর্ব্ববাদী সম্মত মতে নন্দকুমারকে বোর্ডের সমক্ষে উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করা হইল। Auriol সাহেব (আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি) বাহিরে গিয়া নন্দকুমারকে ডাকিয়া আনিলেন।

Sir John D'oyly এই সময়ে কলিকাতা কৌন্সিলের প্রধান সেক্রেটারি ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তিনি কার্য্যান্তরে প্রেরিত হওয়াতে অরিয়ল সাহেব দ্বিভাষীর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজা নন্দকুমার ভালরূপ ইংরাজি জানিতেন না। মন্সন সাহেব মন্ত্রীসভার হইয়া মহারাজা নন্দকুমারকে যে সমস্ত প্রশ্ন ইংরাজিতে করিতে লাগিলেন, অরিয়ল সাহেব তাহা হিন্দী করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। আমরা ইহার মধ্য হইতে আবশ্যকীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করিব।

মহারাজা নন্দকুমার উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়াই সর্ব্ব প্রথমে কৌন্সিলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে আমার কোন মতেই প্রবৃত্তি হয় না। বর্ত্তমান স্থলে নিতান্ত বাধ্য হইয়া আমাকে এ প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। যখন আমি দেখিলাম যে গবর্ণর সাহেব আমাকে তাঁহার বাটী প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া আমার পরম শত্রু ও কলুষিত-চরিত্র মোহন প্রসাদ ও জগৎ চাঁদকে সকল সময়েই তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন, তখন এই প্রকার কার্য্য দ্বারা আমার কোন মহতী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া, ও আমার চরিত্রের উপর কোন প্রকার অন্যায় আক্রমণ হইবে, অনুমান করিয়া আমি বর্ত্তমান পথানুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। এই সমস্ত বুঝিয়া সুঝিয়াই আত্মরক্ষা করিতে অন্য উপায় না দেখিয়া আমি এই এক মাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছি। গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেবের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু বলিবার আবশ্যকতা আছে, তাহার আদ্যোপান্তই পূর্ব্বো-লিখিত পত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আমার নিকট কয়েক খানি দলিল আছে; কৌন্সিলের সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে অভিযোগের সমর্থনার্থে সেই সমস্ত আমি তাঁহা-দিগকে দেখাইতে পারি।"

কৌন্সিলের সদস্যগণ মূল দলিলগুলি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, নন্দকুমার তাঁহা-দিগকে এক খানি দলিল প্রদান করিলেন। এই দলিল খানি মূল দলিলের ইংরাজি অনু-বাদ। কার্য্যসৌকর্য্যার্থে পূর্ব্বাহ্নেই অনুবাদ করাইয়া রাখা হইয়াছিল। মহারাজা নন্দকুমার সেই অনুবাদিত অংশ কলিকাতা মন্ত্রীসভার সেক্রেটরীর হস্তে প্রদান করিলেন।

মন্সন সাহেব দলিল খানি হাতে করিয়া লইয়া কৌন্সিলের সম্মুখে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এখানি ইংরাজি অনুবাদ মাত্র। দলিল খানি পড়া শেষ হইলে মন্সন সাহেব মহারাজা নন্দকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই দলিল খানির মূল পারসী খানি তাঁহার নিকট আছে কি না? মহারাজা নন্দকুমার মূল দলিল খানি বাহির করিয়া দিলে বোর্ড তাঁহাদের সহকারী অনুবাদক অরিয়েল সাহেবকে সেই দলিল খানি

পড়িতে দিলেন। তাহার উপর যে মোহর করা আছে, ঐ মোহরটী মণিবেগমের প্রকৃত মোহর কি না, ইহাও পরীক্ষা করিবার আদেশ হইল। অরিয়েল সাহেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শীলটী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"ইহা মণিবেগমের প্রকৃত শীলই বটে"। এই সময়ে সেক্রেটারি সাহেব সেই স্থলে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার সহযোগীর ন্যায় শীলটী পরীক্ষা করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া অরিএল সাহেবের ন্যায় মত প্রকাশ করিলেন।

মন্সন সাহেব নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলি মহারাজা নন্দকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন———

প্রশ্ন। আপনার আর কোন লিখিত প্রমাণ বা দলিলাদি আছে?

উত্তর। আমার আর কোন লিখিত প্রমাণাদি নাই।

প্রশ্ন। যে মূল দলিলখানি আপনি এক্ষণে বোর্ডের সম্মুখে দাখিল করিয়াছেন, তাহা লইবার জন্য গবর্ণর স্বয়ং বা তাঁহার হইয়া অন্য কোন ব্যক্তি এই দলিল প্রার্থনা করিয়া আপনাকে পত্রাদি লিখিয়াছিল কি না?

উত্তর। হাঁ মণিবেগম গবর্ণর সাহেবের বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী দ্বারা এই মূল দলিল খানি আমার নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

প্রশ্ন। তাহার পর সেই দলিল খানি আপনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন কি না?

উত্তর। কান্ত বাবু আমার নিকট সেই দলিল খানি চাহিলে আমি তাঁহাকে মূল দলিল খানি পাঠ করিতে দিই। পাঠ সমাপ্ত করিয়া কান্ত বাবু মূল দলিল খানি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে—আমি তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া ইহার এক খানি নকল লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই দিবস সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। একখানি নকল লইতে হইলে অনেকটা সময় লাগিবে, তাহাতে রাত্রি অধিক হইবার সম্ভাবনা বিবেচনায়, কান্ত বাবু আর এক দিন দিবাভাগে আসিয়া সেই দলিল খানির নকল লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হন।

প্রশ্ন। ইহার পর কান্ত বাবু এই দলিল খানি সম্বন্ধে আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি না?

উত্তর। আমার বোধ হয়—প্রায় চারিমাস পূর্ব্বে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে কান্ত বাবু আমাকে এই পত্র খানির সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। এই মূল দলিল খানি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কান্ত কখন কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না? তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি কখনও আপনাকে প্রচুর অর্থ বা অন্য কোন প্রকার প্রলোভন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না?

উত্তর। না—কিছুই না।

প্রশ্ন। আপনার অভিযোগপত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে গবর্ণরের খানসামা বালকৃষ্ণ ও জগন্নাথ ও আপনার ভৃত্য চৈতন্য নাথের মারফৎ গবর্ণরকে আপনি দফায় দফায় টাকা

পাঠাইয়াছেন। একথা আপনি তাহাদের মধ্যে কাহারও দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে প্রমাণ করাইতে পারেন ?

উত্তর। আমি গবর্ণরকে ঐ সকল লোকের মাঃ টাকা দিয়াছি কি না, তাহা উহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে। গবর্ণরের খানসামা বালকৃষ্ণ ও জগন্নাথ ও আমার পক্ষের লোকেদের মধ্যে নরসিংহ, সদানন্দ ও চৈতন্য নাথ, প্রভৃতিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইহার সবিশেষ তথ্য পাওয়া যাইবে। নরসিংহ এক্ষণে মুরশিদাবাদে আছে ও অপর তিনজন সাক্ষী কলিকাতায় আছে।

প্রশ্ন। শেষ কয়জন সাক্ষীর নাম কি ?

উত্তর। চৈতন্যনাথ, সদানন্দ ও নরসিংহ। চৈতন্যনাথ পূর্ব্বে আমার চাকর ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে সে স্বাধীনভাবে তেজারতির কারবার করিতেছে। নরসিংহও আমার চাকরি করিত বটে, কিন্তু আমি তাহাকে জবাব দিয়াছি। সে এক্ষণে মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতেছে। আর সদানন্দ কলিকাতায় তেজারতির কারবার করে।

প্রশ্ন। যে সময়ে আপনার লোকেরা গবর্ণরের খানসামাদিগের হস্তে টাকাগুলি গণিয়া দেয়, তখন সেই ক্ষেত্রে আপনি কি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন ?

উত্তর। তাহারা আমার সাক্ষাতেই গবর্ণরের খানসামাদিগকে টাকা গুণিয়া দিয়াছিল, ও দেয় অর্থ সমস্তই প্রায় স্বর্ণ মোহরে দেওয়া হইয়াছিল।

প্রশ্ন। আপনি কি এই টাকা দেওয়ার জন্য কোন রসিদ পাইয়াছিলেন ?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। এই প্রকার গোপনীয় ভাবে যে সমস্ত টাকা কড়ি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার কি কোন প্রকার রসিদ লইবার প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে ?

উত্তর। যখন কোন প্রকাশ্য কার্য্যে বা ব্যবসায় স্থলে টাকা কড়ি দেনা পাওনা হয়, তখন প্রচলিত নিয়মানুসারে রসিদ লওয়া হইয়া থাকে। টাকা কর্জ্জ প্রদান করিতে হইলে সেই টাকার পরিবর্ত্তে জামিনস্বরূপ একখানি সামান্য খত বা রসিদ লওয়া হইয়া থাকে।*

---

* হাইকোর্টের প্রাচীন রেকর্ডে এই প্রকার কয়েকখানি জীর্ণ শীর্ণ রসিদ দেখা গিয়াছে। রসিদ বা খতগুলি এক একটা টুকরা কাগজে (Slip) বঙ্গ ভাষায় লিখিত। মহম্মদ কমল (পরিশেষে কমলউদ্দীন আলি খাঁ) জগৎশেঠদিগের চুঁচুড়ার ও মুরশিদাবাদের গদী হইতে যে টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল, তাহারই পরিবর্ত্তে এই খতগুলি দেওয়া হইয়াছে। খতের উপরিভাগে মাতাব রায় জগৎশেঠের নাম ও কর্জ্জা টাকা ও কিস্তিবন্দীর বিষয় উল্লিখিত আছে। আজ কালকার মত আইনের কড়াকড়ির কিছুই তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই রসিদের সর্ব্বোচ্চভাগে কমলের পারসিতে সহি, ও তাহার নামের একটী ক্ষুদ্র মোহরের ছাপ রহিয়াছে। বর্ত্তমান ইংরাজি আমলে যতদূর আদব কায়দা বাড়িয়াছে, এতদূর নবাবী আমলে, বা তাহার শেষ ভাগে ছিল না। কোম্পানির আদালত হইয়াই এই সমস্ত আদব কায়দা আরম্ভ হইতে থাকে।

প্রশ্ন। শিবরাম কে?

উত্তর। শিবরাম পূর্ব্বে আমার নাপীত ছিল। এই প্রকার টাকা দিবার সময়ে সে আমার চাকরী করিত। এক্ষণে সে ছাড়িয়া গিয়াছে।

প্র। আপনি কি করিয়া জানিলেন যে সেই টাকা গবর্ণরের জন্য তাঁহার খানসামারা লইতে আসিয়াছিল? এ বিষয়ে আপনি কোন বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন?

উ। তাহারা নিশ্চয়ই আমার নিকট হইতে টাকা লইয়া গবর্ণরের নিকট দিয়াছিল। কারণ টাকা পাঠাইবার পরে আমার মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্য আমি গবর্ণর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাই যে মৎপ্রেরিত মোহরগুলি—যাহা তাঁহার খানসামাদিগের দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠান হইয়াছে, তাহা তিনি পাইয়াছেন কি না? ইহার উত্তরে গবর্ণর আমায় বলিয়া পাঠান—"হাঁ আপনার প্রেরিত অর্থগুলি আমার নিকট নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

উক্ত দিবস মহারাজা নন্দকুমারকে আর কোন প্রশ্ন করা হইল না। গবর্ণরের বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত বাবুকে, মণিবেগমের উপরোক্ত দলিল প্রার্থনা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ের প্রমাণ করাইবার জন্য আবশ্যক হওয়াতে বোর্ড একখানি শমন তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার উপস্থিতির উপর এই অভিযোগোক্ত একটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের প্রমাণ নির্ভর করিতেছে বলিয়া সভ্যগণ তাঁহার উপস্থিতির জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। কান্তবাবু নির্ব্বিবাদে ও বিনা আপত্তিতে যদি বোর্ডের আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় অভিযোগটীর এক প্রকার সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া যাইত। কিন্তু ঘটনাবশে তাহা কোনমতেই হইল না। হেষ্টিংস কান্তবাবুর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মুরুব্বি ছিলেন। কান্ত বাবু বোর্ডে উপস্থিত হইয়া জেরার মুখে সব কথা বলিলে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হইয়া পড়ে—এই জন্য তিনি কান্তবাবুকে প্রকাশ্যভাবে বোর্ডের আজ্ঞার প্রতিযোগীতা করিতে পরামর্শ ও সাহস দেন। সেই সাহসে বলীয়ান হইয়া প্রভুভক্ত ও কৃতজ্ঞ কান্ত বোর্ডের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় নামক আর এক ব্যক্তিকে এই সম্বন্ধে কোন বিষয় প্রমাণের আবশ্যক হওয়াতে আর একখানি শমন পাঠান হয়। কৃষ্ণবাবুও হেষ্টিংসের সহিত লিপ্ত ছিলেন, তাঁহার পরামর্শানুসারে তিনিও কান্তবাবুর পথ অনুসরণ করিয়া বোর্ডের আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। ইহারা উভয়ে Boardএর আজ্ঞার বিরুদ্ধে যে প্রকার ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন—তাহা দেখিলে হেষ্টিংসের যথেচ্ছাচারিতা—বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার চরিত্র সমালোচনা স্থলে এ বিষয়ের পুনরবতারণা করিব।

বোর্ড আদেশপত্র দ্বারা কান্ত বাবুকে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য আজ্ঞা করিলে তদুত্তরে তিনি নিম্ন লিখিত পত্র খানি পাঠাইয়াছিলেন। পত্র খানি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত।

"আমাকে হুজুরে উপস্থিত হইবার জন্য আজ্ঞা করা হইয়াছে। আমি এক্ষণে গবর্ণর সাহেবের নিকট অবস্থান করিতেছি। তাঁহাকে আপনাদের শমন দেখাইলে তিনি আমাকে আপনাদের নিকট হাজির হইতে নিষেধ করিলেন। এই হেতুতে আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতে অপারক হইতেছি। যখন মন্ত্রীসভা সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে—সেই সময়ে আমি হুকুম পাইলেই আপনাদের সমক্ষে হাজির হইব।"

শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস।

এই পত্র পাইয়া মন্ত্রীসভার সদস্যগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এক জন সামান্য ব্যক্তি এই প্রকারে রাজ্যের কার্য্য-নির্ব্বাহক প্রধান মন্ত্রীসভাকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিতেছে, ইহা তাঁহাদের কোন মতেই সহ্য হইল না। তাঁহাদের ক্ষমতা ও আত্ম-সম্মান এইরূপ ব্যবহারে আহত হইয়াছে—ইহাঁই বিবেচনা করিলেন। কান্ত বাবুর উপর আর এক পরোয়ানা পাঠান হইল। তদুত্তরে কান্ত বাবু নিম্নলিখিত জবাব দিলেন—"আমাকে পত্র প্রাপ্তি মাত্র উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিয়া আপনারা যে পরোয়ানা দিয়াছেন, তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে। গবর্ণর সাহেব আমায় বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, মন্ত্রীসভা প্রকৃত পক্ষে ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে—সুতরাং সে স্থলে আমার উপস্থিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। সেইজন্য আমি আপনাদের আজ্ঞা পালন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি।——"

বোর্ড এই পত্র পাইয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিলেন। সেই দিনের সভায় নিম্ন লিখিত মন্তব্যটী স্থিরীকৃত হইল—"যে গবর্ণরের বেনিয়ান কান্ত বাবু একজন সামান্য লোক হইয়াও গবর্ণরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে বোর্ডের আজ্ঞা অবহেলা করিতে সাহসী হইয়াছে। এইরূপ কার্য্য দ্বারা গবর্ণরের চরিত্রে বিলক্ষণ দোষ পড়িতে পারে। ইহাদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, গবর্ণর রাজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা ও গূঢ় মন্ত্রণা তাঁহার সামান্য ভৃত্যদিগের নিকট খুলিয়া বলিতে ও এই প্রকার মান-হানিকর কার্য্যে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে কোন মতে সঙ্কুচিত হন না।"—[ক্রমশঃ।]

কথার উপকথা।

(ঘৃণা।)

ছেলে বয়সে কে না উপকথা শুনিতে ভাল বাসে। আইমার পাশে বোসে ছোট ছোট ভাই বোন্ একত্র হোয়ে চুপ্ চাপ্ কোরে ঘরের কোণে গুড়িসুড়ি মেরে—আজ যারা খুব

ভারিক্কের মধ্যে, দেখলে ভয় লাগে, পাকা দাড়ী গোঁপ নিয়ে গম্ভীর হোয়ে তাড়া যখন দেন প্রাণ শুকিয়ে যায়—তাঁরাও এককালে বাড়ীর ছোট ছেলেটির চেয়েও ছোট ছিলেন এবং তাদেরই মত উপকথা শুনিতে ভাল বাসিতেন। উপকথা শুনতে যাদের ছেলেবেলা ভাল লেগেছে—তাঁরা বড় হোয়েও অনেক উপকথা নিয়ে থাকেন। আমার ধর আজকাল কথার উপকথা খুব ভাল লাগে। আমি চুপচাপ কোরে ঘরের কোনটিতে বসে ভাবি—আচ্ছা, রোজ রোজ যে কথাগুলি আমরা সকলেই যখন তখন বলি—কোন দেশের, কত দিনের, কত লোকের কথা সে গুলি! চিরদিনই কি সে একটি কথার একই মানে ছিল—না গাছের যেমন শাখাপ্রশাখা বাড়ে, তেমনই কথাটির ডাল পালা হোয়েছে? বড় গাছের গায়ে যেমন পরগাছা জন্মায়, ভাষাতেও তেমনি কে জানে, কোথা থেকে কত কথা এসে কেমন আপনা আপনি নিজের স্থানটি খুঁজে নিয়ে লুকিয়ে থাকে—দিন কতক পরে দেশীয় কথা বোলে ভুল হয়—একবার মনেও হয় না যে পর দেশের কথা—দূর করো ছাই—ও কেন এখানে? ডবল পয়সা—দু ডবল, তিন ডবল—কথাকটিতে 'ডবল' ইংরাজী হইয়াও তাহার অন্য মানে হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমে চাকর যেমন অনেক দিন বাঙ্গালী বাড়ী থাকলে আধখোট্টাই আধ বাঙ্গালা কথা বলে—তেমনই বিদেশের কথাগুলির ভাব ক্রমে খানিকটা বদলে যায়—আমাদের কানে আর নূতন লাগে না।

আইমার কাছে যেমন কত অদ্ভূত রাজরাজড়ার কথা—দেশ বিদেশের কথা শুনেছি—আজ তেমনি কত পুরাতন জীর্ণ পুঁথি ইত্যাদি নিয়ে কত কথা শিখি। যেমনই তোমার বয়স হোক্ না কেন যদি একবার কথার উপকথা মন দিয়ে শোন, তা হলে ছোট ছেলের উপকথা শোনার ইচ্ছাকে ঘৃণা করবে না—এই ধর "ঘৃণা" কথা। তার উপকথা শোন।

তুমি বয়স্ক লোক, ছোট ছেলেকে ঘৃণা কর—তুমি দেশ হিতৈষী, ইংরাজ ঘৃণা কর—তুমি বৃদ্ধ হিন্দু-সমাজ-সংস্কারক নব্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা কর—আর তুমি হিন্দু স্কুলে পড়, হেয়ার স্কুলের ছাত্রকে ঘৃণা কর, সে পাড়াগেঁয়ে ছেলেকে ঘৃণা করে। মেজাজ "গরম" হলেই লোকে অন্যকে ঘৃণা করে—সেত স্বাভাবিক। আর যার গায়ে চর্ব্বি অধিক—দুধ, ঘি খেয়ে একটু বুনিয়াদি রকম ভূড়ি যার, তিনি ত ক্ষীণ অভুক্তকে ঘৃণা করেন—আর তাকে দেখে খানিকটা দুঃখও করেন।

আচ্ছা বল দেখি যে "ঘৃত-পায়ী" আর মেজাজ যার "গরম" তাঁদের স্বভাব "ঘৃণা" করা কেন?

"ঘৃণা" অনেক দিনের কথা—যত দিন সূর্য্য উঠে—যত দিন ধরে রোদে "গলদ-ঘর্ম্ম" হয়, ততদিন কথাটি আছে—আর্য্যরা খুব ছিলেন, আমাদের চেয়ে খুব বড় ছিলেন, ভাল ছিলেন, জানতেন অনেক—তবু রোদে দাঁড়ালে তাঁদেরও মাথার "ঘাম" পায়ে পোড়ত—"ঘৃণা" কথাটি আর্য্য, পূর্ণ মাত্রায় আর্য্য-ঋক্‌বেদে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

"যেমন ঘৃণা হইতে ছায়ায় তেমনি তোমাতে আমরা আশ্রয় পাইয়াছি" (ঋক্-৬:১৬:১৩৮)

উপরের শ্লোকে "ঘৃণা" অর্থে "উত্তাপ"। আবার অন্য স্থানে "ঘৃণা" অর্থে "গ্রীষ্মকাল"।

"কি ঘৃণায় কি শীতে আমাদিগের উপর প্রসন্ন হইও"

(ঋক্—১০:৩৭:১০)

যে "ঘৃণার" অর্থ "গ্রীষ্ম"—তাহারই অর্থ "ঘর্ম্ম"—আবার কালে হিতোপদেশ লেখকের সময়, তাহার অর্থ "দয়া"

ঈর্ষী, ঘৃণী, ইত্যাদি"——

আচ্ছা তাহাই যদি হয় তা হ'লে এই বিভিন্ন অর্থের মিল কোথা। "ঘর্ম্ম" অর্থ "ঘাম" এবং "গ্রীষ্ম"—আর "ঘৃণা" এবং "ঘর্ম্মের" একই উৎপত্তি—"ঘৃ" ধাতু হইতে। ধাতুর অর্থ পরে ঠিক করিব। এখন দেখা যাক্ যে আগেকার আর্য্য "ঘৃণা"—যাহার অর্থ "গ্রীষ্ম" এবং ঘর্ম্ম ছিল তাহাই কালে—"দয়া" অর্থাৎ হৃদয়ের উত্তাপ হইতে নিতান্ত বাঙ্গালী "ঘেন্না" কেমন কোরে হোয়েছে। আমরা দিন দিন খারাপ হোয়ে যাচ্ছি বটে—কিন্তু তাই বোলে আমাদের শরীরে দয়া নাই আর তার পরিবর্ত্তে ঘৃণা হোয়েছে বলা নিশ্চয়ই ভুল। হৃদয়ের উত্তাপ, ক্ষেদ, হইতেই দয়ার উদ্রেক হয়—আর যাহা দয়ার বস্তু তাহা অনেক সময় নিতান্ত নীচ এবং হেয় অর্থাৎ ঘৃণেয়। এখন দেখিলে আর্য্য "ঘৃণার" আজ কাল কেমন অসাধু অনার্য্য ভাব হইয়াছে। এই উপলক্ষে ইংরাজী (ঘৃণা) Hateএর ইতিহাসটা দিয়ে আমার মনে যে পক্ষপাতীত্ব নেই প্রমাণ করা যায়। ইংরাজী Hate (হেট) কথাটি এবং Haste (হেষ্ট—তাড়াতাড়ি) একই কথা—এবং পূর্ব্বে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া—পশ্চাদনুসরণ করা বুঝাইত। ক্রমে দেখ, কাজের লোক যে—অর্থাৎ যে তাড়াতাড়ি নিজের কাজ শেষ করে—নিজের যাহা তাহা চোখে রেখে চলে, ক্রমে তার স্বার্থপর নীচাশয় হওয়াই সম্ভব, এবং শীঘ্রই সে যে ঘৃণার পাত্র হয় তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যেমন আমাদের "ঘৃণা"র অবনতি হোয়েছে পুরাতন ইংরাজী Hate (হেট) ও আধুনিক খৃষ্টীয়ান hateএ পরিণত হয়েছে।

এখন দেখা যাক্ "ঘৃ" ধাতুর অর্থ কি? যদি "ঘৃত" "ঘৃণা" "ঘর্ম্ম" এক বংশের হয় এবং তাহারা নিশ্চয়ই এক বংশের—তাহা হইলে "ঘৃ" ধাতুর কি অর্থ হওয়া সম্ভব?

"অগ্নিকে ঘৃতাহুতি দিয়া ঘৃণিত করি" (উজ্জ্বল করি)—(ঋক্ ২: ১০: ৪)

অতএব "ঘৃ" ধাতুর অর্থ "মসৃণতা উৎপাদন করা" "উজ্জ্বল করা" হওয়াই সম্ভব। যাহা মসৃণ তাহা সুন্দর এবং উজ্জ্বল, তাহা ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে, তার গায়ে হাত দিতে সাধ যায়, আমরা তাহাকে "স্নেহ" করি। "স্নেহ" কথাটির অর্থ "তৈল" এবং "ভালবাসা" উভয়ই। শুধু যে আমাদেরই—অসভ্য বাঙ্গালীর "স্নেহ" কথায় তৈল বুঝায় এমন নহে। গ্রীক হইতে ইংরাজি বাইবেল অনুবাদিত, তাহা হইতে একটি সাম (Psalm) তুলিয়া দিতেছি।

"দেখ ভাই ভাইয়ে এক সঙ্গে বাস করা কেমন ভাল এবং তৈলাক্ত (স্নেহময়—Gr : Charien)

"সে Aaronএর (এয়ারণের) দাড়ি বহিয়া যে মহামূল্য তৈল (Ointment) পড়িয়াছিল—এমন কি দাড়ি হইতে কাপড়ের মুড়ো পর্য্যন্ত গড়াইয়া পড়িয়াছিল—সেইরূপ।"

(বাইবেল, সাম, ১৩২:২)

কিন্তু আধুনিক ইংরাজীতে 'Oily tongue" (তৈলাক্ত জিহ্বা) স্নেহময় কথা যে বলে তাহাকে বোঝায় না,—অর্থটি নিতান্ত অন্য রকম। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদিগেরও তৈলে অনাদর হইয়াছে—আমাদিগের চরিত্রেও খানিকটা স্নেহের অভাব প্রতীত হয়।

এখন বুঝিয়াছ যে 'ঘৃতপায়ী' যে এবং "গরম" মেজাজ যাঁর তাহাদিগের চরিত্রে "ঘৃণা" প্রবল কেন ?

ঋগ্বেদে অগ্নির অশ্বের নাম "ঘৃতপৃষ্ঠাঃ" "ঘৃতস্নাঃ" দেখিতে পাওয়া যায়—অর্থাৎ যাহাদিগের পৃষ্ঠ ঘৃত-মার্জ্জিত মসৃণ, এবং উজ্জ্বল।

"ঘৃণা" আবার যে ঘরের মেয়ে সেই বংশের আর এক পক্ষ হইতে "হরি"ও 'হরিৎ" ঋকে সূর্য্যের অশ্বদ্বয়ের জন্ম ; নামের অর্থ উজ্জ্বল, জ্বলন্ত। তাহাদিগের আরও অনেক নাম আছে। প্রাভাতিক আকাশের রঙ্গ হইতে নামগুলি গৃহীত। যথা "অরুষ" "অরুণ" "রোহিত"। শেষ দুইটীর অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। "অরুষ" অর্থ সায়ন বলেন "হিংসক-রহিত" (ঋক্ ১:৬:১) অর্থাৎ তাহা অগ্নির অন্যতম নাম।

সূর্য্যের অশ্বকে ছাড়িয়া বনের "হরিণে"ও উজ্জ্বল রক্তপাটল বর্ণ হইতে তাহার নাম দেখিতে পাই। Shelley (সেলী)তে যখন পড়ি Queen Mabএর (কুইন ম্যাব) ঘোড়ার মুখে আলোকের রশ্মি (Reins of light) তখন ঋগ্বেদের "হরিৎ"দিগের কথা মনে পড়ে, অরুণের রক্তরশ্মিসংযত অশ্বের ছবি চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাই।

আবার নিজের দেশ ছাড়িয়া, নদী পর্ব্বত সমুদ্র পার হইয়া "হরি"বংশের কয়েকটি দেবী কন্যাকে প্রাচীন গ্রীসে দেখিতে পাই। একটি, "কেরিস" তাঁহার নাম (charis) গ্রীসে তিনি রতিদেবী। অন্য তিনটি ভগ্নী "কেরিটীস" (charites) যাহাদিগের স্বভাবের পূর্ণ অকলঙ্ক মাধুর্য্য এবং অঙ্গের পূর্ণ নির্দ্দোষ সৌন্দর্য্যের জন্য (Graces) নামে অধিকতর জানিত—তাঁহাদিগের নামের অর্থ "উজ্জ্বল"। ক্রমে উষার মধুর শোভা তাঁহাদিগের ছিল বলিয়াই তাঁহারা উষা নামে খ্যাত হন্। বেদের "উষার" মত তাঁহারা "দুহিতাদিবঃ" আকাশের কন্যা। Zeusও দ্যুঃ একই দেবতার নাম।

কালে "কেরিস" "কেরিটিস" ভগ্নীদিগের সঙ্গে মিশিয়া যান। তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়, কিন্তু বংশদোষ—তেলি বংশে জন্মের দরুণ—যাবে কোথায়! তাহাদিগকে আমরা সাইপ্রাস্ (Cyprus) দ্বীপে বৃদ্ধ পিতা Zeus (ঝেউস)এর সম্মুখে তৈলপাত্র-হস্তে দেখিতে পাই (Whom they wash at Paphos and anoint with Oil.)।

শুনিলে হাসি পায় যে গ্রীসের সৌন্দর্য্যের দেবীদিগের তেলি বংশে জন্ম। আমাদিগের সময়েও তেলি বংশে দু একজন বড় লোকের জন্ম হইতেছে। গ্রীক পুরাণের সাহায্যে তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যের কারণ বুঝিতে পারি। আজকাল তেলি মালি যে কেহ হন্ না কেন যদি আর্য্যবংশের দোহাই দেন, হঠাৎ তাঁহাকে ঠাট্টা তামাসা কোরো না। কে জানে কোন জম্বুদ্বীপে পথভ্রষ্টা কোন আর্য্যার সন্তান সন্ততি তাঁহারা! চুপ কোরে মেনে নিও, বাক্‌বিতণ্ডা কোরো না। বিশেষ এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যদি স্নিগ্ধভাবে ঘৃত দুগ্ধ খেয়ে বেঁচে থাকতে চাও, তবে কাহাকেও ঘৃণা দেখিও না। গরমের দিনে একটা কথা নিয়ে এত তর্ক কোরে গলদ্‌ঘর্ম্ম হবার দরকার নাই।

আবার যে দিন দেখা দেব সে দিন আর একটি কথার উপকথা বলিব।

আমার কথা ফুরলো
নটে গাছ্‌টি মুড়লো
যা কথা বনে
যখন বলি তখন আসিস্ মনে।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

পঞ্জাব ভ্রমণ।

(২)

লাহোর।

[আমার অমৃতসর নগরের বিবরণে ভারতীর ছাপাখানার প্রভুরা একটা জায়গায় নিতান্তই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। তাঁহারা ছাপাইয়াছেন "গোবিন্দগড় নগরের বাহিরে একটি দুর্গ। রণজিৎ সিংহ আরাম ও আনন্দ উপভোগের জন্য এই সুরক্ষিত বাগান নির্ম্মাণ করেন। এখন আর সে উচ্চ প্রাচীর নাই—ভূমিসাৎ করা হইয়াছে।" গোবিন্দগড় বেচারী এখনো বেশ দাঁড়াইয়া আছে—তাহার প্রাচীর আগেরই মত উচ্চ আছে—ইংরেজ সেনা এখন সেখানে পাদ চারণা করে। উদ্যান গোবিন্দগড়ে আগেও ছিল না, এখনও নাই। আমি উদ্যানের কথা লিখিয়াছিলাম বটে—সে উদ্যানের নাম রামবাগ। তাহার সহিত গোবিন্দ গড়ের কোন সম্বন্ধ নাই।]

অমৃতসর দেখিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলাম। পর দিন ৯ টার সময় রেলে উঠিলাম। অমৃতসর হইতে লাহোর দুর্ঘটনার পথ। মধ্য পথে আটারী নামক একটী ক্ষুদ্র প্রাচীন শিখ সহর। ষ্টেশন হইতে আটারী বেশ দেখায়। আটারীর ইতিহাস আছে। গৌর সিং নামে একজন সিধু জাট এই সহরটির সংস্থাপনা করেন। আটারীর সর্দ্দারেরা

গৌর সিংহের বংশধর। শিখদের সময় ইহাদের অনেক ক্ষমতা ও প্রতাপ ছিল। রামনগর ও চিলীয়ানওয়ালায় যে শের সিং লর্ড গফকে ঘোল খাওয়াইয়াছিলেন, সে শের সিং এই আটারীর একজন সর্দ্দার ছিলেন। সোব্রাঁয়ের যুদ্ধ যাঁহাদের মনে আছে, তাঁহাদের আটারীর বৃদ্ধ সর্দ্দার শ্যাম সিংহকেও মনে আছে। শিখকলঙ্ক লাল সিং ও তেজ সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় শিখেরা এ যুদ্ধে পরাজিত হয়—অন্যথা তাহাদের জয়ের কোন সন্দেহ ছিল না। তবে এ কথা বলা উচিত যে লাল সিং আর তেজ সিং পঞ্জাবী জাট শিখ ছিল না। ইহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ব্রাহ্মণ সন্তান—পঞ্জাবে যাইয়া শিখ ধর্ম্ম অবলম্বন করে। সোব্রাঁয়ের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যখন লাল সিং আর তেজ সিং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পলায়ন করিল, তখন বৃদ্ধ শ্যাম সিং শিখ ধর্ম্ম ও রাজ্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন বলিয়া আপাদমস্তক শ্বেত বস্ত্রপরিহিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন শিখদিগকে বার বার একত্র করিলেন, এবং অবশেষে পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্যাম সিংহের মৃত্যু সংবাদ যখন আটারী পৌঁছিল, তখনি তাঁহার পতিগতপ্রাণা স্ত্রী চিতারোহণ করিলেন।

১১ টার সময় গাড়ী লাহোরে পৌঁছিল। লাহোরের ষ্টেশনটা একটা দুর্গের মত দেখিতে। ষ্টেশনের বাড়ীটার উপরে চারি দিকে বুরুজ। সর্দ্দার —— সাহেবের গাড়ী আমার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিল। আমি ৫।৭ মিনিটের মধ্যে যাইয়া সর্দ্দার সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তিনি তাঁহার একজন পরিচিত লোকের বাটীতে ছিলেন। আমি অতিথির বাটীতে অতিথি হইলাম। বাড়ীটা প্রকাণ্ড—সম্মুখে অতি বড় চত্বর—চারদিকে উচ্চ প্রাচীর—চত্বর মধ্যে একটা মস্ত বটগাছ। বাড়ীর পশ্চাতে একটা মস্ত সরাই। তাহাতে শত শত লোক সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। পথিকেরা কেহ আসিয়া তাহাতে আশ্রয় লইতেছে, কেহ বা চলিয়া যাইতেছে। অধিকাংশ সরাইবাসীই অশ্ব-ব্যবসায়ী কাবুলী দেখিলাম। তাহারা কাবুল হইতে ঘোড়া লইয়া বেচিতে আসিয়াছে। অসংখ্য ঘোড়া সরাই প্রাঙ্গণে বাঁধা রহিয়াছে। দালাল ও খরিদদার ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে। ইহার আগে কখনো সরাই দেখি নাই। সরাইটা এদেশী জিনিস বটে। বাঙ্গলায় আমাদের চটী পর্য্যন্ত ছিল, তাও এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। পথিকেরা চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে বা রাত্রি উপস্থিত হইলে পথপ্রান্তে কোন হাটে বা বাজারে গিয়া উপস্থিত হইতেন। বাজারে এমন দু একখানি দোকান সর্ব্বত্রই থাকিত যাহাতে চাল, ডাল, নুন, তেল, হাঁড়ি, কাঠ, তেঁতুল, চিড়া সর্ব্বদাই পাওয়া যাইত। সে দোকানেই পথিক রান্না বান্না করিয়া আহার করিতেন, ও নিদ্রা যাইতেন। এ দেশে সরাই অন্য রকম। সরাই একটা প্রকাণ্ড জিনিস। যুদ্ধাদির ভয় এদেশে চিরকাল—তাই সরাই এক একটা দুর্গের মত তৈয়ারি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর—মাঝ খানে প্রকাণ্ড চত্বর—প্রাচীরের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের দিকে চত্বর-প্রমুখ হইয়া শত শত কোঠা। পথিকেরা এই সব ঘরে

আশ্রয় লয়। সম্মুখে একটী দালান বা বারান্দা থাকে, ভিতরে একটি কুঠরি থাকে। দালানে পথিকেরা বসে, আরাম করে, আহার করে, কুঠরিতে জিনিস পত্র রাখে। এক এক সরাইতে শত শত লোকের স্থান হয়। সরাই একটা প্রকৃত বাদসাহী ব্যাপার। পুষ্করিণী খনন, অন্নছত্র স্থাপন যেমন আমাদের বাঙ্গলায় পুণ্যকাজ, এদেশে সরাই নির্ম্মাণ তেমনি পুণ্য কাজ। হিন্দুরাও সরাই নির্ম্মাণ করে। সরাইতে হিন্দু মুসলমান, উচ্চ নীচ সকলেরই সমান অধিকার। একজন মেতর যদি গিয়া সরাইয়ের একটি ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে, মহা আমীর আসিলেও তাহাকে সে ঘর ছাড়িতে হয় না।

লাহোরের প্রাচীন ইতিহাস নাই। আলেক্জাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, লাহোর বোধ হয় তখন একটি ক্ষুদ্র স্থান ছিল, কেননা গ্রীক ইতিহাসলেখকগণের কিতাবে কোথাও লাহোরের নাম পাওয়া যায় না। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে যখন মুসলমানেরা পঞ্জাব আক্রমণ করে, তখন লাহোর আজমীরকুল-সম্ভূত চৌহান রাজগণের অধিকারে ছিল অনুমান করা যায়। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে গজনীর সুলতান শবক্‌তগীন লাহোরের রাজা জয়পালকে পরাজিত করেন—তিনি জহোর বা আত্মবলিদান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। অপমান হইতে বাঁচিবার জন্য চিতারোহণকে জহোর বলে। জয়পালের পুত্র অনঙ্গ পাল পেশোয়ারে গজনীর মামুদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। অনঙ্গ পালের পর দ্বিতীয় জয়পাল লাহোরের সিংহাসনে বসেন। মামুদ ১০২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পরাজিত করেন। লাহোরে এই বার হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হইল। ইহার পর শ খানিক বৎসর কাল পর্য্যন্ত গজনীর সুলতানগণের নিয়োজিত শাসন কর্ত্তারা লাহোরে রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ ঘোরী যখন ১১৬০ খৃষ্টাব্দে গজনী ছাড়িয়া দিল্লীতে আপন সিংহাসন স্থাপন করেন, লাহোর তখন দিল্লীর শাসনে আসে। মুসলমান রাজত্বকালে তাতারীরা যতবার আফগান বা পাঠান রাজত্ব উঠাইয়া আপন রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা পায়, সকল বারই লাহোরে তাহারা ষড়যন্ত্র করে—লাহোরই পাঠান রাজত্ব ধ্বংস করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের স্থান ছিল। জেঙ্গিশ খাঁ ১২৪১ খৃষ্টাব্দে লাহোর লুণ্ঠন করেন—তৈমুর ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে বেলোল খাঁ লোদী লাহোর অধিকার করেন। বেলোলের পৌত্র দৌলত খাঁ, যিনি লাহোরের শাসন কর্ত্তা ছিলেন, বিদ্রোহী হইয়া বাবরকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। বাবর ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লাহোর লুণ্ঠন করেন। দৌলত এই পুরস্কারে সন্তুষ্ট না হইয়া বাবর চলিয়া গেলে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। বাবর আবার আসিয়া দৌলতকে পরাজিত করিয়া সসৈন্য দিল্লী যাত্রা করেন, পাঠান সেনা প্যানিপথে পরাজিত করিয়া ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপন করেন।

মোগল সম্রাটদের সময়ই লাহোরের চরম উন্নতি ও গৌরবের সময়। তাঁহারা লাহোরকে এক প্রকার রাজধানী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কত মসজিদ, কত উদ্যান, কত প্রাসাদ যে তাঁহাদের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলা যায় না। লাহোরের ধনসম্পত্তি,

ব্যবসা বাণিজ্য তখন অসামান্য ছিল, লোকসংখ্যাও খুব বেশী ছিল। এখন লোকসংখ্যা একলক্ষ একত্রিশ হাজার মাত্র। তখন লাহোর শালিমার পর্য্যন্ত ও শালিমার হইতে মিয়াঁমীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ৫৬ ক্রোশ জায়গা ভগ্ন মসজিদ, স্মৃতিপ্রাসাদ, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতিতে পূর্ণ। মোগলদের সময়ে লাহোর ছত্রিশ বিভাগে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমান লাহোরে তার নয়টি মাত্র বিভাগ পাওয়া যায়—অর্থাৎ, লাহোর তখন এখনকার লাহোরের অপেক্ষা বিস্তারে চতুর্গুণ ছিল। সাজাহান বাদশাহের সময়ে লাহোরের পরিধি বোধ হয় অন্যূন ১৬।১৭ মাইল ছিল। বিস্তারে চতুর্গুণ হইলে লোক সংখ্যায়ও বোধ হয় ত্রিগুণ কি চতুর্গুণ ছিল। ত্রিগুণ হইলেও লাহোর তখন চার লক্ষ লোকের বাসস্থান ছিল। হুমায়ুনের ভাই কামরান সর্ব্বাগ্রে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া লাহোরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত একটি বারদ্বারী রাভীর অপর তীরে আজও দাঁড়াইয়া আছে, অদৃষ্টক্রমে এখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে টোল হাউসে পরিণত করিয়াছেন। সম্রাটকুলের রাজা আকবর লাহোরে অনেক সময় যাপন করিতেন। এই খানে তিনি দেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সঙ্গে ধর্ম্ম ও দর্শন লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেন। এইখানে আকবরের অনুজ্ঞাক্রমে মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হয়; মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণী পারস্যভাষায় অনুবাদিত হয়। আকবর লাহোরের কেল্লা অনেক বাড়াইয়া যান, আর নগর প্রাচীর-বেষ্টিত করেন। এই প্রাচীরের বাহিরে অনেক বড় বড় বাজার ও সহরতলি ছিল; তাহারা এখন বহুকাল অদৃশ্য হইয়াছে। সাজাহান যখন আপনার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করেন, তখন তিনি লাহোরের দুর্গ অবরোধ করেন। তিনি সহজেই জাহাঙ্গিরের সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হন। সাজিহানের অনুচরগণের মধ্যে ৭০০ লোককে লাহোরের সিংহ দ্বারে দ্বারে শূলে বসাইয়া প্রাণে বধ করা হয়। ইহাদিগের মধ্যে এক জনের নাম অর্জ্জুনমল ছিল। ইনি শিখদিগের চতুর্থ গুরু, আর ইনিই শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ আদিগ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেব সঙ্কলন করেন। অর্জ্জুনমলের নিষ্ঠুর হত্যার দিন অবধি শিখেরা মুসলমানদের উপর ভয়ানক ক্রোধ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছে। তাই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন নানাসাহেব দিল্লীতে মুসলমানের জয় পতাকা উড়াইলেন, শিখেরা ইংরাজ পক্ষ হইয়া মুসলমান ও তাহাদের পক্ষীয় পূর্ব্বীয়া সৈন্যদিগকে পরাজয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর হইতে লাহোরের শোভা সমৃদ্ধি কমিতে আরম্ভ হয়। শিখেরা তাহাদের পরম শত্রু ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুতে উৎসাহিত হইয়া লাহোরের শাসন কর্ত্তাকে একটা যুদ্ধে পরাজিত করে। তাহার পর শিখেরাই পরাজিত হয়। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নাদীর সা যখন লাহোরের দ্বারে উপস্থিত হন, লাহোরের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে কুড়ি লক্ষ টাকা ও কতকগুলি হাতী দিয়া লাহোরকে লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করেন। ইহার কিছু কাল পরে লাহোরের শাসনকর্ত্তার সহিত শিখদিগের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। একটা যুদ্ধে শিখেরা পরাজিত হইলে

কতকগুলি শিখ বন্দীকে লাহোরের উত্তর পূর্ব্ব পার্শ্বে হত্যা করা হয়। সে স্থানের নাম আজও শাহিদগঞ্জ। "শাহিদ" কথার মানে ধর্ম্ম বা দেশের জন্য যে প্রাণত্যাগ করে—ইংরেজিতে যাহাকে মার্টার কহে। তারা সিং এই শাহিদগণের নেতা ছিলেন, তাঁহার নামে এখানে একটি মন্দির আছে। এই সময়েই লাহোরের ব্যবসায়ীরা অনেকে লাহোর ছাড়িয়া অমৃতসর ও অন্যান্য সহরে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। লাহোরকে এই সময়ে অনেক বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করিতে হয়। শেষ আক্রমণের কর্ত্তা দূবানী আমেদ সাহের বংশধর শাজামাস। তিনি ফিরিয়া যাইবার সময় রণজিৎ সিংহকে লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। রণজিৎ সিংহ ক্রমে কত বড় রাজ্য সংস্থাপন করেন, শিখদিগকে কত বড় সাহসী ও যোদ্ধা জাতি করিয়া যান, কি করিয়া ইংরেজ সে রাজ্য আত্মসাৎ করেন, তাহা পাঠক ইতিহাসে দেখিবেন।

এখন লাহোর কেমন দেখিতে বলি। লাহোর একটি বৃত্তের মত প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আকবর খাঁ প্রথম নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে রণজিৎ সিংহ উহা পুনর্নির্ম্মিত করেন। ইহার উচ্চতা ৩০ ফিট ছিল। স্বাস্থ্যের উন্নতির আশায় ইংরেজ এখন ১৫ ফিট মাত্র রাখিয়াছেন। এই বৃত্তের ভিতরে লক্ষ লোক বাস করে—আর ২৫।৩০ হাজার লোক আনারকালী প্রভৃতি সহরতলিতে বাস করে। প্রবেশ দ্বার তেরটা—এক একটা দ্বার প্রকাণ্ড, দুর্গদ্বারের মত দেখিতে—দুর্গদ্বারেরই মত নির্ম্মিত। এদেশে নগরই শুধু প্রাচীর-বেষ্টিত করিবার রীতি ছিল এমন নয়, বড় রকমের গ্রামে যাও, দেখিবে তাহাও প্রাচীর বেষ্টিত। ভারতবর্ষ লুণ্ঠনের জন্যে যত দস্যু রাজ তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে, সকলেই পেশোয়ারের পথ দিয়া পঞ্জাবে সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করিয়াছে। এত যুদ্ধ, এত লুণ্ঠন কখনো আর কোন দেশে হয় নাই। তাই এদেশের লোক সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকিত, যতদূর সম্ভব সুরক্ষিত হইয়া থাকিবার চেষ্টা পাইত। তাই এ দেশের সহরাদি প্রাচীর-বেষ্টিত। লাহোরের প্রবেশ দ্বারগুলির মধ্যে দিল্লী, লোহারী ও টাক্সালী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। টাক্সালী গেট চমৎকার দেখিতে। অতি উচ্চ ও অতি প্রকাণ্ড। উপরে দুদিকে বুরুজ—তাহাতে কামান বসাইবার জায়গা। প্রাচীরের পাদদেশ ধৌত করিয়া আগে প্রশস্ত গভীর পরিখায় জল বহিয়া যাইত। যখন প্রাচীরের উপর, সিংহদ্বার বুরুজে দাঁড়াইয়া সৈন্যেরা গোলা গুলি নিক্ষেপ করিত তখন শত্রুর পক্ষে এই গভীর প্রশস্ত পরিখা পার হইয়া আসিয়া বিংশতি হস্ত উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বা পর্ব্বতের মত দৃঢ় প্রবেশদ্বার ভাঙ্গিয়া নগরের ভিতর প্রবেশ করা অতি সুকঠিন ব্যাপার ছিল, সন্দেহ নাই। এখন পরিখা মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ফলপুষ্পের উদ্যান করা হইয়াছে। তুমি এই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া প্রায় সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পার। প্রাচীর সহর বেষ্টন করিয়া আছে। পরিখাস্থানীয় এই উদ্যান প্রাচীরকে বেষ্টন করিয়া আছে—কেবল সহরের উত্তরাংশে যেখানে লাহোরের দুর্গ মহাদর্পে দাঁড়াইয়া আছে,

সেখানে অল্প কতকটা জায়গা এই উদ্যান নাই। এই জায়গাটুকু ছাড়া সমস্ত সহর তুমি এই উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া প্রদক্ষিণ করিতে পার। আর এই উদ্যান যেমন তেমন উদ্যান নয়—অতি মনোরম উদ্যান। আম, জাম, কমলালেবু, পেয়ারা, কলা, নাশপাতি লোকাট, আড়ু (পীচ) র অন্ত নাই। ফুল খুব উৎকৃষ্ট জাতীয় না হইলেও অনেক ও সুন্দর সুন্দর রকমের। বাগানটিতে এত লতা পাতা, এত ঝোপ ঝাপ, এত গাছ পালা, এত ফলফুল যে ওখানে গেলে পাড়া গাঁয়ে কোন জঙ্গলের ভিতরে আসিয়াছি মনে হয়—মানুষের কাটা কোটা, ফ্যাশন করা কোন একটা অসহ্য সভ্য বাগানে আসিয়াছি একেবারেই মনে হয় না। বারি দোয়াব ক্যানাল হইতে একটি ক্ষুদ্র প্রণালী এই উদ্যানের ভিতর দিয়া দিন রাত কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইতেছে। আড়ু খাইতে যেমনই হউক, আড়ুবন যখন মুকুলিয়া ওঠে, তখন দেখিলে প্রাণ আহ্লাদে নাচিতে থাকে। এই উদ্যানে আড়ুবনের অন্ত নাই। যখন আড়ুবনে নূতন পাতা ও নূতন ফুল হয়, তখন ইহার শোভা চমৎকার। আরো চমৎকার যখন কমলালেবু-বন মুকুলিয়া ওঠে। সে গন্ধের চমৎকারিত্ব। এ উদ্যানে অসংখ্য কমলালেবু বন। কমলালেবুর বন আর আমি কখনো দেখি নাই। যখন ফুল হয়, তখন ফুলে গাছ সত্যি সত্যি ছাইয়া ফেলে, আর শত শত কমলালেবু গাছের ফুলের গন্ধ কত মিষ্ট ও কত তীব্র ও কত ঘন, যে কখনো দেখে নাই ও ভোগ করে নাই, তাহাকে বোঝান অসম্ভব। গন্ধে সত্যি সত্যি হাওয়া ভারি হইয়া যায়—সৌরভাতিশয্যে বায়ু অলস হইয়া পড়ে—সৌরভটা যেন স্পৃশ্য শরীরী হইয়া নাকে মুখে প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে মাতোয়ারা করিয়া তোলে। কিন্তু ফুলের গন্ধ ছাড়িয়া আমাকে এখন লাহোরী গন্ধ গ্রহণ করিতে হইতেছে। একবার কোন একটা দ্বার দিয়া সহরে প্রবেশ কর—দেখিবে একটা অদ্ভুত গন্ধ আসিয়া তোমার নাসিকারন্ধ্র অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিবে। এ গন্ধটা যে কেবল লাহোরেই তৈয়ার হয়, এমন কথা বলিতে পারি না, কেননা অমৃতসরেও ইহার আভাস পাইয়াছিলাম। বোধ হয় এদেশী সহর মাত্রেই এগন্ধটা প্রস্তুত হয়। লাহোরের রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, এত অপ্রশস্ত যে অধিকাংশ রাস্তায়ই গাড়ী চলিতে পারে না। তাহার দুধারেই অতি ঘন ঘন তেতালা চৌতালা বাড়ী। রাস্তার ভিতর দিয়া প্রণালী রহিয়াছে—তাহারা অনির্ব্বচনীয় রূপ ও অনির্ব্বচনীয় নামা জিনিসসকল বহন করিতেছে। সে সকল জিনিস রাস্তায় নানা স্থান দখল করিয়া পথিকগণকে আতঙ্কিত করিতেছে। এ গন্ধটা হোমিওপাথদের ঔষধের মত সিম্পল্ বা অমিশ্র নয়—এটা এলোপাথদের কম্পাউণ্ড বা মিশ্র পদার্থ। এলোপাথরাও এমন মিক্শ্চার সৃষ্টি করিতে পারেন কি না সন্দেহ। কবিরাজী পাচন যেমন বনের সমস্ত লতা পাতা মূল হইতে প্রস্তুত, এ গন্ধও তেমনি যেন দুনিয়ার সমস্ত বদগন্ধ মিলিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। তবে কলিকাতার লাহোরের দিকে তাকাইয়া মুচকে হাসি হাসিবার কোন কারণ নাই। এ দেশে যাঁহারা কিছু দিন রহিয়াছেন,

তাঁহারা জানেন গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতার রাস্তায় পড়িলে কি অনুপম গন্ধ আসিয়া নাসিকাকে অভ্যর্থনা করে। আগে নাকি লাহোরের আরো শোচনীয় অবস্থা ছিল। এখন মিউনিসিপালিটী রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও পরিষ্কার করিবার জন্য অনেক যত্ন করিতেছেন। আমি উপরে বলিয়াছি রাস্তাগুলি অতি সঙ্কীর্ণ, আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে তাহারা শ্যামচাঁদের অধিক বাঁকাচোরা। শ্যামচাঁদতো ত্রিভঙ্গ মাত্র ছিলেন, ইহারা শতভঙ্গ। যে কারণে এ দেশের লোকেরা আপনাদিগের গ্রাম বা নগর প্রাচীর-বেষ্টিত করিত, সেই কারণেই আমার বোধ হয় ইহারা রাস্তা ঘাট সঙ্কীর্ণ ও বক্র করিত। শত্রু দলে বলে প্রবেশ না করিতে পারে, সহজে প্রবেশ না করিতে পারে, প্রবেশ করিতে করিতে পলায়নের উপায় হইতে পারে, এই সব উদ্দেশ্যে এ দেশের সহরের রাস্তা এত সঙ্কীর্ণ ও বাঁকাচোরা।

লাহোরে অনেকগুলি দেখিবার জিনিস আছে। সহরের উত্তরাংশ ছাইয়া প্রকাণ্ড-কায় দুর্গ দাঁড়াইয়া। কে এই দুর্গ প্রথমে নির্ম্মাণ করে বলিতে পারি না। এই পর্য্যন্ত জানি যে আকবর দুর্গকে অনেকটা বাড়াইয়া যান। বোধ হয় এ দুর্গ হিন্দুদের সময়ের—জয়পালাদিরও আগেকার। সাজিহান, যাঁহার দিব্য প্রাসাদাদি নির্ম্মাণের জন্যে হৃদয়ে যেন সর্ব্বদাই একটা জ্বলন্ত বাসনা জাগিত, এই দুর্গের ভিতরে অতি চমৎকার সব হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। রাজ প্রাসাদ তিনি অনেক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাড়াইয়াছেন। সামান বুরুজ তাঁহারই নির্ম্মিত। ইহার বুরুজগুলি সকলই অষ্টভুজ (Octagonal) সকলের বড় যে বুরুজটা তাহাতে একটি অপূর্ব্ব মার্ব্বেল প্যাভিলিয়ন আছে যাহার সর্ব্বাঙ্গে চুণী পান্নাদি বহুমুল্য প্রস্তর খণ্ড বসান। এই বুরুজের নাম নওলাখ, কেননা ইহাতে নয় লাখ টাকা খরচ হইয়াছিল। তখনকার নয় লাখ এখনকার ক্রোড় টাকা বলিলেও হয়। মার্ব্বেল যে বিনা পয়সায় আসিয়াছে, মার্ব্বেল-হৃদয়-ভূষণ চুণী পান্নাও যে রাজা রাজড়াদের পকেট হইতে আসিয়াছে, অসংখ্য লোক যে বিনা পয়সায় খাটিয়াছে, কে সন্দেহ করিতে পারে? তখ্ত বা সিংহাসনগৃহ ও দেওয়ানী আমও সাজিহানেরই নির্ম্মিত। ইহারাও মার্ব্বেলনির্ম্মিত ও অতি শোভাশালী। এই রাজপ্রাসাদ তখন এক দিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত পাঁচ শ গজ লম্বা ছিল—রাভী তখন ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া চলিত। এখন রাভী রাজপ্রাসাদ হইতে এক ক্রোশেরও অধিক দূরে যাইয়া পড়িয়াছে। রাজপ্রাসাদের সম্মুখদেশ যে পোরসিলেন কারুকার্য্যে শোভিত, তাহাও সাজিহানের কৃত। এই পোরসিলেন কারুকার্য্য সাজিহানের সময় অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল—এখন এ শিল্প একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। পোরসিলেন ওয়ার্ক্ কোন দেশে এমন চমৎকার হইত না, এখনও হয় না, কিন্তু আমরা সে শিল্পটি একেবারে হারাইয়া বসিয়াছি। লাহোরে উজীর খাঁর মসজিদ নামে একটি মসজিদ আছে। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে উহা নির্ম্মিত হয়। ভিতরের দিকে মসজিদের দেওয়ালে অতি চমৎকার পোরসিলেন-ওয়ার্ক্ দেখা যায়। এমন পোরসিলেন-ওয়ার্ক্ আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। এখন

আবার দুর্গের কথা বলি। এ দুর্গেও একটা শিস মহাল আছে। সেকালে সকল রাজ-প্রাসাদেই একটা শিস মহাল থাকা আবশ্যক ছিল। আর শিসমহালটা অতি বিশুদ্ধ যাঁহাদিগের পসন্দ, তাঁহাদিগের নিকট অনেকটা রঙ্গচঙ্গে মনে হইলেও জন সাধারণের নিকট অতি আশ্চর্য্য জিনিস। আমি দেখিয়াছি অনেক লোক যাহারা লাহোরের দুর্গে প্রবেশ করিয়া তুষারশ্বেত মার্ব্বেলে খোদিত ফটোগ্রাফের মত লতা পুষ্প ফল দেখিয়া কিছুই আশ্চর্য্য হয় নাই, তাহারা শিসমহাল হা করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া অর্দ্ধঘণ্টা খাড়া হইয়া দেখিয়াছে। রাত্রে যখন শত শত ঝাড়, ফানস লণ্ঠনের আলোতে শিসমহাল আলোকিত হইত, আর প্রাচীর হইতে, ছাদ হইতে সে আলো শত ভিন্ন রঙ্গে প্রতিভাত হইয়া ঝলমল করিত তখন না জানি কতই সুন্দর দেখিতে হইত। এবার শিসমহাল কথাটার মানে বলিয়া দিয়া শিসমহাল ছাড়িয়া চলি। আশ্চর্য্য নাই আমাদের দেশে এমন লোক থাকিতে পারেন যাঁহারা শিসমহাল শুনিয়া আমরা যাহাকে শিসা বলি, সেই শিসা (Lead) নির্ম্মিত মহাল মনে করিবেন। তবেই বেচারী লাহোরের রাজপ্রাসাদের শিসমহাল মারা গেল। এ দেশে আয়নাকে শিসা বলে—তাই আয়না-মহালকে শিসমহাল বলে। শিস-মহাল আয়না মহাল দেয়ালে, ছাদে সর্ব্বত্রই নানারঙ্গের নানা রকমে, নানাছন্দে সাজান আয়না। দুর্গের ভিতরে একটা ঘরে শিখদের সময়ের রাশি রাশি অস্ত্রশস্ত্র আছে। তখন-কার বর্ম্ম, তখনকার তরবারি, তখনকার শিরস্ত্রাণ, তখনকার বন্দুক, তখনকার কামান, তখন-কার বল্লম, তখনকার ঢাল ইত্যাদি শত শত রকমের অস্ত্রাদি দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিতে হয়। একটি পিতলের ছোট কামান আছে, তাহা লইয়া নাকি দলীপসিংহ বাল্যে ক্রীড়া করিতেন। আর এখন তাঁহার কি দশা!

দুর্গের বাহিরে আসিলেই হজ্‌রীবাগ। বড় সুন্দর এ ক্ষুদ্র বাগানটি—ইহাতেও অসংখ্য কমলালেবুর গাছ। ইহার কেন্দ্রস্থলে একটি মনোহর মার্ব্বেল প্যাভিলিয়ন। প্যাভিলিয়নটি একটি বারদ্বারী গৃহ। ইংরেজেরা এ দেশের বারদ্বারীকে Summer house বলিয়া থাকেন। বলিতেও পারেন, কেননা বারদ্বারী এ দেশে গ্রীষ্মের সময়ে রজনীতে আরামের স্থান। বারদ্বারীটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান। প্রত্যেক দিকে তিনটি করিয়া দ্বার—তাহাতে কবাট নাই। সুতরাং বারদ্বার দিয়া অহরহ বায়ু আসা যাওয়া করিতেছে। বারদ্বারীর উচ্চ ভিত্তিও মার্ব্বেলের। তাহার প্রাচীর ও স্তম্ভগুলির গায়ে লতা পাতা ফুল ফল অতি আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যের সহিত খোদিত—প্রকৃতির লতাপাতা ফুল ফল মনে হয়। এ শিল্পনৈপুণ্য এখন কোথা? কোথায় এত শীঘ্র লুপ্ত হইয়া গেল—কি করিয়া গেল, ভাবিলে আশ্চর্য্য মানিতে হয়। বারদ্বারীটি ক্ষুদ্র বাড়ী, কিন্তু কারুকার্য্যে, শিল্পনৈপুণ্যে ও সৌন্দর্য্যে একটি হীরক খণ্ড বিশেষ। রণজিৎ সিংহ ইহা নির্ম্মাণ করেন। তবে ইহার শিল্পনৈপুণ্যের জন্য তিনি কোন প্রশংসার দাওয়া করিতে পারেন না। এই যে সব চমৎকার কারুকার্য্যপূর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তর, ইহাদিগকে রণজিৎ সিংহ রাভীর পরপারস্থিত জিহাঙ্গীর ও আসফজার সমাধি-

মন্দির হইতে উঠাইয়া আনেন। দুর্গদ্বারের সম্মুখে যেমন হুজ্‌রীবাগ, তেমনি রণজিৎ সিংহের ও অর্জ্জুন মলের সমাধিমন্দির। শিখগুরু অর্জ্জুনমলের মৃত্যু-কথা আমরা উপরে লিখিয়াছি। তাহার সমাধিমন্দির অতি ক্ষুদ্রস্থান। রণজিৎ সিংহের সমাধিমন্দির দেখিবার উপযুক্ত। ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী মিশ্র হিন্দু ও মুসলমানী। মন্দিরের মধ্যস্থলে একটা প্রস্তরের ভিত্তির উপরে একটা বড় মার্ব্বেল-নির্ম্মিত পদ্মফুল—তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এগারটি পদ্মফুল। রণজিৎ সিংহের ভস্ম মধ্যস্থিত বৃহৎ পদ্ম আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। বাকী পদ্মগুলি রণজিৎ সিংহের চার স্ত্রী ও সাত উপস্ত্রী যাঁহারা তাঁহার সহিত চিতারোহণ করেন, তাঁহাদিগের ভস্ম আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। এই সমাধিমন্দিরের সহিত সংযুক্ত হইয়াই যে দুটি ক্ষুদ্র সমাধিমন্দির আছে, তাহারা রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজা খরক সিং ও পৌত্র নৌনেহাল সিংহের সমাধিমন্দির। হুজ্‌রীবাগের সম্মুখেই জুম্মা মসজিদ। ঔরঙ্গজীব ইহার নির্ম্মাতা। এরূপ মসজিদ দিল্লীর জুম্মা মসজিদ ছাড়া বোধ হয় আর পৃথিবীতে নাই। দিল্লীর মসজিদ বিস্তারে, গাম্ভীর্য্যে ও নির্ম্মাণ-কৌশলে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহা সামান্য মসজিদ নয়। দেখিয়া বিস্ময়ে যেন স্তম্ভিত হইতে হয়। হুজ্‌রীবাগ হইতে যে সোপানশ্রেণী দিয়া মসজিদ-চত্বরে উঠিতে হয়, তাহা কাবুল হইতে আনীত আব্রী নামক নানা রঙ্গে রঙ্গীন প্রস্তরে তৈয়ারি। এই সোপানশ্রেণীর শীর্ষদেশে চত্বর-প্রবেশ দ্বার—এ প্রবেশ দ্বার অতি উচ্চ, সুপ্রশস্ত ও গাম্ভীর্য্যশালী। রেড্‌ স্যাণ্ড্‌ ষ্টোন (Red Sand Stone) দ্বারা প্রবেশ দ্বার নির্ম্মিত। প্রবেশ দ্বার পার হইলে সম্মুখে অতি বিস্তীর্ণ ইটে বাঁধান চতুষ্কোণ চত্বর। লক্ষাধিক লোক সেখানে অনায়াসে একত্রিত হইতে পারে। এখানে ওখানে গোটাকতক বট ও অশ্বত্থ গাছ আছে। প্রবেশ দ্বার পার হইয়া চত্বর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখ, জুম্মা মসজিদ কি গম্ভীর, কি রাজর্ষিক ভাবে দণ্ডায়মান। মসজিদও লাল স্যাণ্ডষ্টোনে রচিত—ভিতরের দিকে মার্ব্বেলে আচ্ছাদিত। দেওয়ালে বড় বড় করিয়া লতা পাতা আঁকা—ঠিক যেন প্রকৃতির ছবি। প্রকাণ্ড মসজিদ—বোধ হয় ৪।৫ হাজার লোক এক সঙ্গে বসিয়া নেমাজ পড়িতে পারে। এক এক জনের নেমাজ পড়িবার জন্য এক এক খানি সাদা বা কাল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নির্ম্মল উজ্জ্বল মার্ব্বেল-খণ্ড পাতা রহিয়াছে। একখানি কাল, একখানি সাদা, এই রকমে বিছান রহিয়াছে। মসজিদ-চত্বরের চারি পাশে চারিটা উচ্চ মীনার বা স্তম্ভ আছে—তাহাদের কোন একটার উপরে উঠিলে লাহোর সহর পদতলে পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যায়। চত্বরের দুই পাশে চত্বর প্রাচীরের সঙ্গে অনেকগুলি কোঠা আছে। মুসলমানদের যখন দিন ছিল, তখন নাকি ঐ সব ঘরে কোরাণ জ্ঞান ও অন্যান্য বিদ্যার্থী যুবকেরা আসিয়া বাস করিত ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিত। এই মসজিদের যিনি রাজমিস্ত্রী তাঁহার নাম ফিদে খাঁ খোকা। আমাদের কুপাস্‌হিলের ইঞ্জিনীয়ার প্রভুরা কি কখনো এরূপ মসজিদ একটা কল্পনাও করিতে পারেন?

কেল্লা ও জুম্মা মসজিদের নীচে একটা প্রকাণ্ড বন্দ বা পোস্তার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া

যায়। আমি উপরে বলিয়াছি রাভী—ইহার সংস্কৃত নাম ইরাবতী—এক সময়ে কেল্লার পাদদেশ ধৌত করিয়া বহিত। জুম্মা মসজিদ আর কেল্লা একই লাইনে। জুম্মা মসজিদের চরণও পবিত্র ইরাবতী অনেক কাল ধৌত করিয়াছেন। ঔরঙ্গজীব লাহোরকে রাভীগর্ভ হইতে বাঁচাইবার জন্যে এক প্রকাণ্ড পোস্তা নির্ম্মাণ করেন। তাহারই চিহ্ন এখন কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। অদৃষ্টক্রমে পোস্তাও যেমন তৈয়ার হইল, ইরাবতীও তেমনি যেন অভিমানিনী হইয়া একেবারে এক লাফে ক্রোশ খানিক দূরে সরিয়া পড়িলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখিবার জিনিসের মধ্যে চৌবুজি বলিয়া একটি প্রবেশ দ্বার আছে। সাজিহানের জেবিন্দা বেগম নামে এক অতি সুপণ্ডিতা কন্যা ছিলেন। তিনি ইরাবতী তীরে এই বিশ্রাম ভবনে বাস করিয়া অনেক ধর্ম্ম-বিষয়ক কবিতা লিখিয়াছিলেন। পঞ্জাবে ও হিন্দুস্থানে আজও মৌলবীরা সসম্মানে তাঁহার কবিতাগ্রন্থ পাঠ করেন। এই প্রতিভাশালিনী জেবিন্দার বাগানের প্রবেশদ্বার এই চৌবুজি যাহা আমরা আজও দেখিতে পাই। উজীর খাঁর মসজিদের আমি উপরেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার নিকটেই সোনেরি মসজিদ। ইহার পশ্চাতেই রণজিৎ সিংহের প্রকাণ্ড কূপ। আনারকালীতে আজবখানা (museum)র সম্মুখে জমজমা নামে প্রসিদ্ধ কামান পড়িয়া রহিয়াছে। আমেদ সা আবদালী ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে এই কামান ভারতবর্ষে লইয়া আসেন। পানিপথের যুদ্ধে নাকি ইহার ব্যবহারও হইয়াছিল। ইহা অতি প্রকাণ্ডকায়। অত্যন্ত ভারি বলিয়া আমেদ সা ইহাকে লাহোরে ফেলিয়া যান। শিখ মিসিলগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ভাঙ্গী (ভাঙ্গখেকো) মিসিলের হাতে এই কামান অনেক দিন থাকে। রণজিৎ সিংহ ইহাকে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে অধিকার করেন। শিখরা ইহাকে একটা মস্ত সৌভাগ্য চিহ্ন মনে করে—মনে করে যাহার হাতে এ কামান যাইবে, তাহারই জয় হইবে। রণজিৎ সিংহের হাতে গিয়াছিল বলিয়া রণজিৎ সিংহের সৌভাগ্যে কাহারও সংশয় ছিল না। বহুকাল কামানটা ভাঙ্গীদের হাতে ছিল বলিয়া জমজমাকে "ভাঙ্গীকা তোপ"ও কহিয়া থাকে। আমরা বলিয়াছি এ কামানটা আনারকালীতে আছে। প্রকৃত কথাটা আনাড়কলি বা দাড়িম্ব মুকুল। কথিত আছে বুড়ো আকবর বাদশাহের আনাড়কলি নামে একটি পরমাসুন্দরী তরুণী দাসী পত্নী (Slave-girl) ছিল। বৃদ্ধ বাদশাহের পুত্র যুবক জাহাঙ্গীর নাকি এক দিন আনাড়কলির দিকে চাহিয়া হাসিয়াছিলেন। বেচারী আনাড়কলি যুবকের হাসির উত্তরে হাসিয়াছিলেন। আকবর জানিতে পারিয়া অভাগিনী আনাড়কলিকে জীবন্ত কবরসাৎ করেন। জিহাঙ্গীর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সেখানে এক স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই স্মৃতিমন্দিরে এখন সেণ্ট্ জেম্‌সেস্ চর্চ্চ। আনাড়কলি হইতে এ রাস্তাটা আনারকালী নাম পাইয়াছে।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

লেখক এই মাসের পঞ্জাব ভ্রমণের গোড়ায় প্রেসওয়ালাদের উপর যে দোষ চাপাইয়াছেন, দোষটা তাহাদের একলার নহে, প্রুফ সংশোধনের সময় আমাদেরও ত্রুটি হইয়া পড়িয়াছে। ভাং সং

কুড়ানো।

গ্রাম্য জমীদার মিষ্টর বি—পার্লিয়ামেণ্টের নূতন সভ্য হইয়া লণ্ডন সহরে আসিয়াছেন। সহরের সব সভ্যেরই একজন করিয়া সেক্রেটেরী আছে, মিষ্টর বিও একজন সেক্রেটরী নিযুক্ত করিলেন। এক দিন তাঁহার নূতন সেক্রেটরীকে মিষ্টর বি বলিলেন "দেখ কাল আমি পার্লিয়ামেণ্টে বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দেব।" সেক্রেটরী বলিলেন "কাল ? তা হ'লে যে দেখছি আর মোটেই সময় নেই, তা যাক্ এক রকম করে হয়ে যাবে এখন, আপনি কোন পক্ষে বলতে ইচ্ছে করেন" ? মিষ্টর বি বলিলেন 'বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক থাকা উচিত নয় এই কথাই আমি বলব"। সেক্রেটরী আর কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নোয়াইয়া চলিয়া গেলেন। সেক্রেটরীর রকম সকম মিষ্টর বির নিকট একটা রহস্য বলিয়া মনে হইল, তবু তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না, তিনি নূতন মেম্বর, কি জানি কি জিজ্ঞাসা করিতে কি জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের অজ্ঞতাটা প্রকাশ করিয়া বসিবেন ! তার পর দিন সকাল বেলা একখানি কাগজ আনিয়া সেক্রেটরী মিষ্টর বির হাতে দিলেন। মিষ্টর বি বলিলেন "এটা কি" সেক্রেটরী উত্তর করিলেন "আপনার বক্তৃতা" "আমার বক্তৃতা" ? মিষ্টর বি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

সেক্রেটরী বলিলেন "আজ্ঞে হাঁ—বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক নিবারণ করা সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টে আপনার যা বলতে হবে, তাই লিখে ঠিক করে এনেছি"। মিষ্টর বির আর ধৈর্য্য রহিল না, সরোষে বলিলেন "হতভাগা-লক্ষ্মীছাড়া—আমি কি বলিব না বলিব তুমি আগে থাকিতে তাহা হুকুম করিয়া দিবে, আর আমি সেই হুকুম শুনিয়া চলিব !"

মিষ্টর বি সেক্রেটরীর এই মহা অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তৎক্ষণাৎ তাহাকে গলহস্ত প্রদান করিয়া বন্ধুবর মিষ্টর ডির নিকট মনের কথা খুলিয়া শান্তিলাভ করিতে আগমন করিলেন। বন্ধুকে সেক্রেটরীর স্পর্দ্ধার কথা আনুপূর্ব্বিক খুলিয়া বলিয়া সেই স্পর্দ্ধার প্রমাণ স্বরূপ তাহার লিখিত বক্তৃতাটী পর্য্যন্ত বন্ধুকে দেখিতে দিলেন। মিষ্টার ডি পার্লিয়ামেণ্টের একজন পুরাতন সভ্য, তিনি বন্ধুর অপমান-দগ্ধ হৃদয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি সিঞ্চন করিয়া বক্তৃতাটী পড়িতে আরম্ভ করিলেন, পড়া হইলে বলিলেন "বড় স্পর্দ্ধাই প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে যে তাড়াইয়া দিয়াছ অতি উত্তম করিয়াছ, বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছ"। বন্ধুর কথায় মিষ্টর বি সে দিন অনেকটা শান্তি লাভ করিয়া তাহার পর দিন শুনিলেন যে তাঁহার তাড়িত সেক্রেটরী তাঁহার বন্ধুর সেক্রেটরী নিযুক্ত হইয়াছে।

প্রোফেসর জি এক বালিকা বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে লেকচর দিতেছিলেন। সাত বৎসর অন্তর আমাদের শরীরের যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে সেই

কথা বলিতে বলিতে তিনি একজন বালিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন " Miss A--তুমিও সেইরূপ সাত বৎসর পরে আর এ Miss A থাকিবে না"।

Miss A লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া বলিলেন "আমি অন্তরের সহিত তাহাই প্রার্থনা করি।"

মিষ্টর 'কে' তাঁর ঘরের জানালায় বসিয়া একখানি বই পড়িতেছেন, এমন সময় পাশের খালি বাড়ী ভাড়া লইবার জন্য একজন ভদ্রলোককে তাহার স্ত্রী ও একটি কচি ছেলে সঙ্গে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া এই সংবাদ দিলেন—স্ত্রী মহা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন "না—না—তা হবে না—ছেলেটা রাত দিন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদবে—আর আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, ওদের ও বাড়ী কখনই নিতে দেওয়া হবে না। তুমি এর যা হয় একটা উপায় কর—ওখানে গিয়ে—বাড়ী ভাল না, জল পড়ে কি ভিজে এই রকম যা হয় কিছু বল"। স্বামী বলিলেন "তা কি করে হবে—তা হলে বাড়ীওয়ালা যে আমার নামে ক্ষতি আদায়ের নালিস করবে"?

স্ত্রী বলিলেন " তবে তা না হোক্ একটা কোন রকম উপায় কর্ত্তেই হবে " স্বামী লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন "ঠিক হয়েছে, উপায় মনে পড়েছে—তুমি গিয়ে তোমার পিয়ানো বাজাও ও "মধুর কুসুম" গানটা গাও, তা হ'লে আর কিছুই করতে হবে না"।

সংসার।

এ যে শুধু সুখের সমাধি!
এ নহে গো সুখের আবাস,
হেথাকার যত ফুল
না ফুটিতে ছিন্ন মূল
কাঁদে শুধু আকুল সুবাস।
হেথাকার যত পাখী
করুণ বিলাপ ডাকি
মরে যায়—রাখি দীর্ঘশ্বাস;
পথ ভুলে যদি হায়!
আসে গো মলয় বায়
ফিরে যায় হয়ে সে উদাস।

সুখের হরষ-গান
লইয়ে সুখের প্রাণ
কখনগো যদি আসে ভেসে,
বিষাদে মিলায়ে প্রাণ
ধরে বিলাপের তান
আপনা হারায় হেথা এসে।
কেনরে হেথায় তবে
সুখেরে খুঁজিস সবে?
সুখ সে কি বেঁচে আছে আর?
হেথায় যে সমাধি তাহার।

বসন্তের শুষ্ক ফুল,
তটিনীর কুল কুল—
মৃদু মৃদু বিলাপের তান ;
নিরাশ প্রণয় কথা,
ভগ্ন হৃদয়ের ব্যথা,
পল্লব-লতার শোক গান ;
বুক ফাটা অশ্রুজল,
ছিন্ন ভিন্ন মর্ম্মস্থল,
হতাশের প্রাণের হুতাশ ;
সায়াহ্ন-রবির রেখা,
প্রভাত-চাঁদের লেখা,
প্রিয়জন অন্তিম নিশ্বাস—
রচে গেছে সুখের সমাধি !
সুখ নাই—উপছায়া তার
দুখ সদা করি হাহাকার
হেথায় ফিরিছে কাঁদি কাঁদি,
(হেথা) কেমনে বাঁচিবে ফুল
গাহিবে বিহগ কুল
এ যে শুধু সুখের সমাধি !

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী

কাব্যজগৎ।

(পোএ।)

(EDGAR POE.)

আমেরিকার একজন প্রধান কবি পোএ (Poe) বলেন যে পৃথিবীতে দীর্ঘ কবিতা নাই ; দীর্ঘ কবিতা কথা দুইটী বিবাদী। আমারও তেমনই বলিতে ইচ্ছা হয় যে দীর্ঘজীবী কবি কেহ নাই, যে দিকে ফিরিয়া তাকাই দিকে দেখি যাহা সুন্দর তাহা নিতান্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যে। উষার হাসিমাখা শিশিরবিন্দু, আপনার হাসিমাখা ফুল, আকাশের হাসিকান্নামাখা নদী-হৃদয় সবই এক পলের ছবি ; শরতের জ্যোৎস্না সরিয়া সরিয়া গাছের গায়, লতায় পাতায়, ঘাসের আগায়, কুসুমের বৃন্তে মৃদু বায়ুহিল্লোলে বহিয়া যায় বলিয়া সুন্দর। সমুদ্রের অশান্তি হইতেই, মেঘের ভাঙ্গা চোরা গড়া হইতেই তাহাদিগের গম্ভীর সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য অস্থির, অস্থায়ী, গতিশীল। শিশু সুন্দর, শৈশব কদিনের ? যৌবন উচ্ছ্বাসময় সৌন্দর্য্য, বর্ষার জলের মত শীঘ্রই শুকাইয়া যায় ; শান্তি-বিভাসিত বার্দ্ধক্যের সৌন্দর্য্যের অবসান সন্নিকট মৃত্যুতে সেলী, কীটস, চ্যাটারটন কদিন এখানে ছিলেন, পোএ নিজেই কদিন মাত্র পথ হারাইয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। পোএ নিতান্তই পথহারা কবি। দূর পশ্চিমে—আমেরিকায়—তাঁহার জন্ম, যেন শীঘ্রই তাঁহার দিন শেষ হইবার জন্যই হইয়াছিল। তাঁহার কবিতাতে গোধূলির বিষাদ আছে, অস্তের ছায়া আছে। তাহার যেখানে আলোক তাহা রক্ত সন্ধ্যার শেষরশ্মি—যেখানে রজতরেখা, হয়

যে সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে তাহারই, কিম্বা যে চন্দ্র ওঠে নাই তাহারই। শৈশবে পিতা মাতা, যৌবনে স্ত্রী, প্রৌঢ়াবস্থার আশ্রয় হারাইয়া নিতান্ত পথহারা পরিত্যক্ত ভাবে পোএ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। কবির জীবনের স্থূল ইতিহাস দেওয়া আমার বোধ হয় দেবতাকে মূর্ত্তি দিবার মত, তাহার দেবত্ব তাহাতে চলিয়া যায়। যেরূপ জীবনী জনসনের সাজে তাহা সেলী কিম্বা বাইরাণের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত। যে কবিতা পড়িয়া আনন্দ পাই তাহারই ইতিহাসে আবশ্যক. সে কবিতার উৎস কোথায় তাহাই জানিতে চাই, তাহা ভিন্ন আর কিছু নহে। পোএ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন কবির জীবন যাঁহারা বাহুল্যে লেখেন তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে——

" তোমাকে ভাল বাসিব কেমন করিয়া, তুমি জ্ঞান দিবে কি করিয়া। তুমি ত আমাকে আপন মনে হিরকখচিত আকাশে রতন খুজিয়া লইতে দাও না। যদি দুঃসাহসে ভর করিয়া নূতন পথ খুজিয়া লইতে চাই তুমি বাধা দেও। তুমি চন্দ্রের রথ কাড়িয়া লইয়াছ তুমি নদী হইতে জলবালিকাদিগকে দূর করিয়া দিয়াছ—তোমাকে ভাল বাসিব কি করিয়া।"

স্কুলে পোএ যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না তবে সেখানে শিশু-তাঁহার একটি শিশু বন্ধু এবং তাহার মাতাতে একটি দেবী লাভ হয়। তখন পোএর শৈশব যৌবনে মিল হইয়াছে মাত্র। সে বয়সে সৌন্দর্য্য ভরা পূর্ণযৌবনের গৌরব যাহার আছে সে স্ত্রীলোককে কি চক্ষে দেখে বলা কঠিন। রুসো উন্মাদের মত ভাল বাসিয়াছিলেন, বাইরানও সেই শৈশবের প্রণয় কখনও ভুলিতে পারেন নাই, কিন্তু পোএর হেলেনের প্রতি ভালবাসা যেন অন্য জগতের. তাহাতে সে বয়সসুলভ সঙ্কোচ ও হৃদয় ভরা স্নেহ ছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণই মানসিক—তাহাতে শরীরের তাপ নাই, রিপুর রাগ নাই—তাহা সূর্য্যালোকের মত শুভ্র। রুসোর শৈশবের ভালবাসায় শরীরের উত্তেজনা ছিল। এক জন ফরাসী লেখক বলেন যে "অল্প বয়সে স্ত্রী কন্যার মত, পূর্ণযৌবনে তিনি ভগিনী এবং বার্দ্ধক্যে তিনি মাতা"। প্রথমে তুমি তাহাকে লালন পালন কর, পরে তোমরা পরস্পরের হাত ধরিয়া ভাই ভগিনীর মত চল. শেষে তিনি তোমাকে লালন পালন করেন। কথা নিতান্ত সত্য। আমার মনে হয় যে হেলেনকে প্রণয়ী-মা বলিলে পোএর সহিত তাঁহার ভালবাসা বুঝাইতে পারি। ভাগ্যদোষে অল্পদিনেই প্রণয়ীমাকে হারাইয়া নিজকেও চিরদিনের মত হারাইলেন—তাঁহার "জীবনের আলোক অবসিত" হইল।

"তোমার পৌরাণিক সৌন্দর্য্য আমার মনে সমগ্র গ্রীস অর্থাৎ গৌরব এবং সমগ্র রোম অর্থাৎ গরিমা কি তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল।"

"তোমার যাহা কিছু উগ্র তাহাতে গীতেরই তীব্রতা আছে।"

"একদিন একবার মাত্র তোমাকে দেখিয়াছি—কত বর্ষ হইল। পূর্ণচন্দ্র, তোমার আত্মার মত, আকাশ হইতে তৃষ্ণাভরা চোখ তুলে যে সহস্র গোলাপ চাহিয়াছিল সে দিন সে গুলি

কে প্রণয়ালোক দিতেছিল। আমার কপাল, ভাগ্য—তাহার অন্য নাম "শোক"—সেই রাত্রি তোমাকে দেখি। ঘূর্ণিত পৃথিবী তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু তুমি আর দূরে আমি জাগৃত। তুমি আর আমি কথা দুটি একত্র করিতেই প্রাণ কেমন কাঁপিয়া উঠে।

"দাঁড়াইয়া একবার মাত্র দেখিলাম আর জগৎ কোথায় যে সরিয়া গেল। চন্দ্রের মুক্তা-ভাতি নিভিয়া গেল, হাসি মাখা ফুল, বিষাদ মাখা গাছ আর দেখিতে পেলেম না। গোলাপের সৌরভ-উপাসক-বায়ু-দেবতাদিগের বুকে লুকাইয়া গেল। সব—সবই কোথা গেল—শুধু তুমি, না সব তুমিও নহ থাকিয়া গেল। সে তোমার চোখের দেবালোক—শুধু তোমার আত্মান্নাত চোখ—আমি শুধু তাহাই দেখিলাম। কত দণ্ড ধরিয়া দেখিলাম—চন্দ্র অস্ত পর্য্যন্ত দেখিলাম, আহা সেই দেবালোক ভরা চোখে কত বিজন-হৃদয়ের ইতিহাস লেখা আছে।

"সে চোখের তারায় কত শোকের কালিমা, তাহার বিস্তারে কত উদার আশার জ্যোতি! সবই চলিয়া গেল, শুধু সেই দুইটি কিছুতেই গেল না—কিছুতেই তাহারা যায় না। সেই রাত্রি জনশূন্য পথে আলোক দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল. হৃদয়ের আশাগুলি যেমন চলিয়া গিয়াছে তাহারা ত এখনও যায় নাই।

"আমি যেখানে যাই তাঁহারও সেখানে। চিরদিনই পথ দেখাইয়া চলে। তাহারাই আমার দেবতা, আমিই তাহাদের উপাসক, তাহাদিগের আলোক মাখিয়া আমি হোমপূত হই।"

অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন "সে চোখ আমাকে যেন ব্যাপিয়া ছিল। আমি অনেক সময় বাহ্যিক জগতে সেই রকম ভাব অনুভব করিয়াছি, কিন্তু ভাষা দিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতে পারি না"

'লতা বহিয়া উঠিতেছে দেখিলে তাহা মনে [illegible], প্রজাপতিতে, নদীস্রোতে মহান সমুদ্রে, পতনশীল উল্কাতে এমন কি নিতান্ত বৃদ্ধের চোখেও তাহা দেখিয়াছি। সঙ্গীতে, অনেক সময় অনেক পুস্তকে সে ভাব মনে উদয় হইয়াছে। বিশেষ এই কয়েকটি ছত্রে—লেখার ধরণ পুরাতন বলিয়া হইতেও পারে।"

"তাহাতেই মানস—তাহা অমর। তাহার গম্ভীর রহস্য কে জানে, তাহার বীর্য্য কে বোঝে। দেবতাই বিস্তৃত মানস। তাহার প্রকৃতিই জগৎ অধিকার করা। মানুষ দেবতারও সহিত লয় পায় না, যতক্ষণ সে তাহার স্বতন্ত্র, স্বাধীন মানসিক বল রক্ষা করিতে পারে।"

গয়টে (Goëthe) ফাউষ্টে এক স্থানে বলিয়াছেন "যদিও আমরা মানুষ আমাদিগের প্রতিপত্তি দেবতার মহত্বের নিকট হ্রাস পায় না।" এই উচ্চ উন্নত দেবভাব অর্থাৎ দেবতা আর আমরা একই জাতির ইহা প্রত্যেক উদার চিন্তার সহিত মনে হওয়া কি আশ্চর্য্য? তাহা না হইলে মন আর বিস্তৃত জগৎব্যাপী হইল কেমন করিয়া। যাঁহারা আবার প্রতিভা-

শালী কবি তাঁহারা যদি হরেসের (Horace) মত বলেন যে "আমার উন্নত ললাট আকাশের নক্ষত্র ছুঁইয়াছে" তাহা অহঙ্কারের কথা নহে।

এই উদার সাধনা যাহার জন্য তিনি নিশ্চয়ই দেবী ছিলেন। তাঁহার অভাবে পোএর জীবন আঁধার হইয়া গেল—তাঁহার স্বপ্নরাজ্য, তাঁহার সৃষ্টি, তাহার বিহারভূমি সবই এক অলৌকিক ছায়ায় ও আলোকে রঞ্জিত হইল।

"আমার স্বপ্নরাজ্যে রাত্রিদেবী কৃষ্ণবর্ণ রাজাসনে যোগে বসিয়া আছেন—কত বিজন, কত বিকট প্রদেশ ছাড়িয়া—আকাশ, সময় অতিক্রম করিয়া তাহা বিস্তৃত। সেখানে উপত্যকা অতলস্পর্শ, পারাবার অসীম, তাহা গুহাগহ্বর সঙ্কুল। মানুষ সেখানে চারি দিকের ধূম্র শিশির ভেদ করিয়া কিছুই দেখিতে পায় না।

"সেখানে পাহাড় যেন ভাঙিয়া জলে পড়িবে পড়িবে। অপার সমুদ্রের তরঙ্গ আকাশ ছুঁইবার আশায় আস্ফালন করিতেছে, সে আকাশের গায়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত। হ্রদের জল সেখানে বিজনে যেন মরিয়া আছে, এমনই স্থির। তাহার বক্ষে নলিনী তুষারের বলিয়া প্রতীতি হয়। তাহার প্রত্যেক নিভৃত কোণে পূর্ব্বস্মৃতি সমাধির বেশ পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তোমাকে দেখিয়াই চমকিয়া ওঠে এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মরিয়া যায়।

"আমার স্বপ্নরাজ্যে রাত্রিদেবী যোগমগ্না। অপ্সরীরা চন্দ্রালোকের বিজনে বিহার করে, "সেখানে সকলেই গভীর নিদ্রাভিভূত"। কিন্তু কবি কখন আলোক শূন্য নহেন, তাঁহার চক্ষু আকাশের মেঘ, রৌদ্রের আবরণ ভেদ করিয়া সেই চক্ষু দুইটি দেখিতে পায়। "যদিও সে দূর রশ্মি রাত্রিতে এবং ঘোর দুর্দ্দিনে কম্পিত চক্ষে দেখেন, তবু স্বর্গের সূর্য্যালোকে আর কি অধিকতর উজ্জ্বল হইতে পারে?"

পোএ একস্থানে বলিয়াছেন 'সত্য এবং কবিতা তেল এবং জলের মত মিশে না।" শুনিলে প্রথমে আশ্চর্য্য বোধ হয়। সত্য এবং কবিতা যদি বিবাদী হয় আমাদিগের কবিতায় আবশ্যক নাই। সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসের সহিত ছন্দোময় ভাষায় যদি মিথ্যা লুকাইয়া থাকে সে গান শুনিব না—সে ভাষা জিহ্বা উচ্চারণ করিবে না—গীতশূন্য, সংসার ছাড়া, পাথারে যাইব, তবু মিথ্যা গান শুনিব না—এ ভাব কাহার না মনে উদয় হয়? কিন্তু পোএ যাহা বলিয়াছেন তাহা খানিকটা সত্য। "সত্য মানব হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা উদ্রেক করিয়া দেয়—আমি কাহারও অপেক্ষা কম সত্যানুরাগী নহি; কিন্তু সেই সত্য প্রচারের প্রণালী সঙ্কীর্ণ করা উচিত। সীমাবদ্ধ করিলে সত্য আরও প্রবল হয়। যেখানে সেখানে ছড়াইয়া তাহাকে আমি ক্ষীণ করিব না। সত্যের অনুজ্ঞা কর্কশ। সত্য ভূষা বিরাগী। যাহা কিছু কবিতার জীবন তাহাই সত্যের অনুপযোগী। সত্যের ভূষা বারবণিতার বেশ—তাহা প্রলাপ ভাষার মত। সত্যের ভাষা সরল অর্থবদ্ধ, সীমাবদ্ধ। আমরা সত্য প্রচার করিতে সক্ষম যখন আমরা স্নিগ্ধ, ধীর, রাগশূন্য। কিন্তু কবি ধীর হইতে

পারে কি ? সত্য সাধনা আর কবিতা সাধনার মৌলিক ভেদ যে দেখিতে পায় না সে অন্ধ।" বাদছাদ দিয়া ধরিলে পোএ যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক কথা। অধীর কবি, অস্থির প্রাণী, দু দিনের অতিথি, ভিখারী, চঞ্চল জগতের গতিশীল গ্রহ বিগ্রহের কথা কম্পিত স্বরে গাহিয়া যায়। না হয় দু দিনের রাজা, দেবতা। দেবভূমির আলোকের দিকে চাহিয়া থাকিবে কদিন ?

"স্বর্গ তোমারই, কিন্তু এ পৃথিবী সুখ দুঃখের। আমাদের ফুল শুধু—শুধুই ফুল। তোমার পূর্ণানন্দের ছায়াই আমাদিগের সূর্য্যালোক।

"তুমি ইস্‌রাফেল, হৃদয়ের তন্ত্রীই তোমার বীণা। আকাশে তোমার মত মধুর আর কেহই গাহিতে পারে না। "যদি আমি ইস্‌রাফেল যেখানে, আর সে আমার স্থানে হইত দেখিতাম, সে মর্ত্ত্যের গান এত সাহসে ভর করিয়া, এত উচ্ছ্বাসের সহিত আমার মত আকাশ হইতে গাহিতে পারিত কি না।"

পোএ ভার্জিনিয়া বলিয়া একটি কোমলস্বভাবা যুবতীকে পালকগৃহতাড়িত হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। সে বিবাহ সুখের হইয়াছিল। তাঁহার মা পোএকে সন্তানের মত ভাল বাসিতেন। "আকাশে দেবতারা নিজের কাণে কাণে যখন তাহাদিগের জ্বলন্ত ভাল-বাসার কথা বলে আমার মনে হয় যে তাহারা "মা" কথাটির অপেক্ষা ভক্তিভরা হৃদয়ভরা কথা পায় না—তাই তোমাকে আমি "মা" বলি। আমার মা আমারই মা ছিলেন, শৈশবে তাঁহাকে হারাই, কিন্তু তুমি আমার ভার্জিনিয়ার মা। তুমি আমার মার চেয়ে এক অনন্ত জীবন দিয়া অধিক আদরের—সে অনন্ত জীবন আমার স্ত্রীর, যাহা আমার এই জীবনাত্মাতে মিশিয়া গেছে"। ভার্জিনিয়ার মৃত্যুর পর তাহার মার নামে ঐ কবিতাটি লেখেন।

"সে অনেক দিন হইল, কত বৎসর বহিয়া গিয়াছে, সাগর পারে এক দূর রাজ্যে আনাবেল লী বাস করিত। সে আমাকে ভাল বাসিবে, আর আমি তাহাকে ভাল বাসিব, এই সে ভাবিত। শিশু আমি, নিতান্ত শিশু সে— সেই দূর রাজ্যে, সেই সমুদ্র পারে আমরা ভালবাসার অধিক ভালবাসা দিয়া ভাল বাসিতাম—সে ভালবাসা দেবতারা হিংসা করিত।

"তাই—কত দিন হোয়ে গেল—সেই সমুদ্রের পারে, সেই দূর রাজ্যে একদিন একখানি মেঘের শীতল নিশ্বাসে আমার আনাবেল লী শুকাইয়া গেল। সকলেই জানে দেবতারা হিংসা করিত, তাই আনাবেল লী মেঘের ঠাণ্ডা বাতাসে শুকায়ে মরে গেল। "আকাশের দেবতা কি সমুদ্রগর্ভের দানব কেহই আমাদিগের আত্মাত ভাগ করিতে পারিবে না যখনই চাঁদের আলোক দেখি তখনই আমার স্বপ্ন আনাবেল লী—ময় হয়। যখনই তারা ফোটে আনাবেল লীর চোখ দেখিতে পাই। তাই সারা রাত তারই পাশে—আমার জীবনের পাশে—সেই সমুদ্রের পারে, সেই দূরদেশে, তাহারই সমাধি শয্যায়, সমুদ্রের গান শুনি আর শুইয়া থাকি।"

যে আনাবেল লী পড়িয়াছে তাহার নিকট উপরের অনুবাদ অপাঠ্য মনে হইবে। তাহার ছন্দে, তাহার ছত্রে ছত্রে যে কবিতা আছে তাহার অনুবাদ অসম্ভব।

"I was a child, and she was a child, in the Kingdom by the Sea.

But we loved with a love, that was more than love—

I and my Annabel Lee."

পোএর The Bells, The Raven সকলেই পড়ে। প্রথমটির ছন্দ আর দ্বিতীয়টীর ভাব এত মধুর, এত নূতন এত অদ্ভুত যে তাহার অনুবাদ গদ্যেও আমি চেষ্টা করিব না।

"তাহার রজত নিক্কণ রাত্রির হিম বায়ুতেও মধুর। আকাশ ছাইয়া যে তারা আছে তাহারা সে নিক্কণ শুনিয়া শুভ্র আনন্দে (শ্বেত হাসিতে) কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলে।

"আবার ঘোর রজনী চমকিতকর্ণে তাহারই তীব্র চীৎকার, কথা কহিতে পারিতেছি না বলিয়া তাহার কাণ বিদার করা যে আর্ত্তনাদ তাহা শুনে, তাহা বাতাসের কম্পিত বুকে ভয় জাগাইয়া দেয়। "আবার তাহার ঘোর নির্ঘোষ মানুষের বুকের উপর দিয়া পাথর গড়াইয়া লইয়া যায়—সে গান ত পুরুষের নহে স্ত্রীলোকের নহে, জীব জন্তু কিছুরই নহে—তাহা কোন পিশাচের চীৎকার।"

তাহাতে মধুর রজত নিক্কণ আর্ত্তের চীৎকার আছ, তাহাতেই দানবের গর্জ্জন আছে, তাহা পোএর কবিতার মত—পোএর জীবনের মত। পোএর গল্পগুলি তাহার কবিতা গুলির মত, অন্য জগতের, পড়িলে আতঙ্ক হয়—পরিত্যক্ত গৃহশূন্য পোএর পথের ধারে মৃত্যুর কথা মনে করিলে যেরূপ আতঙ্ক হয় তাহার মত।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

বীরকাহিনী।

রোমান বীরত্ব।

(৩)

২৪৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সিসিলি দ্বীপের অধিপতিত্ব লাভার্থে রোম এবং কার্থেজ উভয় দেশে বিবাদ আরম্ভ হয়। ক্রমাগত ৮ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পর রোমানরা নিজ কার্থেজে একদল সৈন্য পাঠাইয়া কার্থেজবাসীগণকে বিব্রত করিয়া পরাস্ত করিতে মনস্থ করিলেন। মার্কাস্ আটিলাস্ রিগলস্ এবং লুসিয়স মানিলস নামক দুই জন সেনাপতির অধীনে কতকগুলি সসৈন্য নৌযান প্রেরিত হইল। পথে জলের উপর কার্থেজিয়ানদের সহিত যুদ্ধ বাধিল, এ যুদ্ধে রোমানরা জয়ী হইয়া অবশিষ্ট পথ নির্ব্বাধে অতিক্রম করিলেন। আফ্রিকায় পৌছিয়া তাহারা ক্লিপিয়ায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ নগর লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন।

এই সময় রোম হইতে আদেশ আসিল লুসিয়স রোমে প্রত্যাগমন করিবেন এবং রিগলস কার্থেজে থাকিয়া যুদ্ধ ও লুণ্ঠন কার্য্যের ভার লইবেন, রিগলস্ নিতান্ত দরিদ্র, অল্প একটু জমী চাষ করিয়া তিনি নিজের ও স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ চালাইতেন, যুদ্ধে আসিবার সময় যাহার হস্তে জমীর ভার দিয়া আসিয়াছিলেন দুর্ভাগ্য বশতঃ সে মরিয়া যাওয়াতে শেষে যে একজন ঠিকে মজুরের হাতে জমী চষিবার ভার দেওয়া হয়, সে বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহার লাঙ্গল, গরু চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। এখন তিনি দেশে না যাইতে পারিলে তাঁহার স্ত্রীপুত্রেরা উপবাসে প্রাণত্যাগ করিবে, অথচ রোম হইতে আদেশ আসিয়াছে তাঁহার এখন কার্থেজে থাকিতে হইবে, আদেশ শুনিয়া রিগলস্ অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু রোমান সিনেটেরা তাঁহার অবস্থা শুনিয়া তাঁহার পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। রিগলস্ ও তাহার সৈন্যগণ "সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং" সুন্দর কার্থেজ ভূমি উচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। কার্থেজিয়ানদের যদিও অনেক অশ্বারোহী সৈন্য ও হস্তী ছিল তথাপি তাহারা নগর রক্ষার চেষ্টা না করিয়া পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিল।

অবশেষে ৩০০ শত গ্রাম ধ্বংশ হইবার পরে তাহারা রিগলসের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। রিগলস্ নিতান্ত অযথাপণে সন্ধি করিতে রাজি হইলেন—দূত তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি কর্কশ উত্তর করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন হয় তোমরা জয় কর—নয় আমাদের আজ্ঞা বহন কর। কার্থেজিয়ানেরা সন্ধি বিষয়ে নিরাশ হইয়া দেবতা মোলাকের প্রসাদ লাভার্থে সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিশু গুলিকে দেবতার উদ্দেশে তাঁহার পূতঃ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল এবং বৃদ্ধেরা দেশ রক্ষার জন্য স্বইচ্ছায় দেবতার উদ্দেশে সেই কুণ্ডে ভষ্মীভূত হইলেন। ইতি মধ্যে তাহারা গ্রীস হইতে বেতন ভোগী সৈন্য আনিবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছিল তাহারা সৈন্য লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। চিরদিন কাহারও সমান যায় না—বেতন ভোগী সৈন্যদের মধ্যে জ্যান্তিফস্ নামক এক জন হস্তীযুদ্ধ-নিপুন স্পার্টান সৈনিক ছিলেন। তিনি যুদ্ধের নেতা হইয়া শত শত হস্তী লইয়া রোমানদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—রোমানরা হস্তীযুদ্ধের কৌশল জানিতেন না,—তাহাদের মধ্যে হস্তীপদ দলিত হইয়া অধিকাংশ নিহত ও আবদ্ধ হইল—রিগলস্ও বন্দী হইলেন। কার্থেজিয়ানরা জয়ী হইয়া বন্দীবৃন্দ সহ মহোল্লাসে কার্থেজে আগমন করিয়া দেবতা মোলাকের নিকট কৃতজ্ঞতা উপহার স্বরূপ রিগলস্ ভিন্ন অন্য অন্য প্রধান বন্দীগণকে তাঁহার অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করিল। রিগলস্ দৃঢ় লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। এ দিকে ক্রমাগত দুই পক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, দুই বৎসর পরে কার্থেজিয়ানরা একেবারে এরূপ পরাজিত হইল যে আর কখন তাহাদের জয়াশা রহিল না, তাহারা সন্ধির জন্য এবার নিজ রোমে লোক পাঠাইতে মনস্থ করিল।

রিগলস্ যে কথা বলিবেন রোমানেরা কৃতজ্ঞতার অনুরোধে নিশ্চয়ই তাহা পালন

করিবেন এই ভাবিয়া তাহারা রিগলসকেই তাহাদের দূত স্বরূপ সন্ধির প্রস্তাব লইয়া রোমে প্রেরণ করিল। পাঠাইবার পূর্ব্বে এই মর্ম্মে তাহার নিকট অঙ্গীকার করাইয়া লইল যে যদি সন্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য বা বন্দী বিনিময় করা না হয় তবে রিগলস্ পুনরায় কার্থেজে প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্বন্দী থাকিবেন। রুগ্নদেহ, নিরাশহৃদয়, বীর রিগলস্ এই সন্ধির প্রস্তাব লইয়া রোমের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন; নগরে প্রবেশ করিলেন না, বলিলেন "আমি আর এখন রোমবাসী নহি এখন কার্থেজিয়ানদের দাস; অপর লোককে সেনেট রোমে যাইতে দিবেন কেন"। তিনি কিছুতেই নগরে প্রবেশ করিলেন না, কাজেই সেনেটেরা নগর বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আনন্দে ছুটিয়া আসিল তিনি একবার মুখ তুলিয়া তাকাইলেন না, তিনি এখন ঘৃণিত, হেয় দাস—তাঁহার কলঙ্কিত দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অপবিত্র করিবেন কেন?

সেনেট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি উঠিয়া কার্থেজিয়ানদিগের সন্ধির প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। প্রস্তাব শেষ হইলেই বাহিরের লোকের নিকট "তাঁহারা পরামর্শ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন ভাবিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহিলেন। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে থাকিতে এবং এই বিষয়ে পরামর্শ দিতে অনেক অনুরোধ করিলেও তিনি কোনমতে তাহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তাঁহার সঙ্গী কার্থেজিয়ানদের অনুমতি পাইয়া পরামর্শ স্বরূপ বলিলেন—"কার্থেজের এখন যেরূপ বিপদ তাহাতে রোম এখন সহজেই কার্থেজ অধিকার করিতে পারিবে। সন্ধি করা কেবল তাহাদেরই উপকারের জন্য, রোমের তাহাতে কোন লাভ নাই সুতরাং সন্ধি না করাই উচিত, বন্দী বিনিময় করিবার আবশ্যকও নাই। কারণ কার্থেজের যাহারা এখন রোমে বন্দী আছে তাহারা সকলেই সুস্থকায়, তাহারা মুক্তি পাইলে পুনরায় যুদ্ধ করিয়া রোমকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। কিন্তু দুই বৎসরের ভয়ানক কারাক্লেশে তিনি একেবারে রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন, এখন আর যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, তাঁহার অকর্ম্মণ্য শরীরের জন্য সুস্থকায় ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দিবার আবশ্যক নাই; তাহাতে রোম বিপদে পড়িবে"।

স্বদেশপ্রিয় আত্মত্যাগী রোমানরা পর্য্যন্ত তাঁহার এই কথা শুনিয়া, দেশের জন্য তাঁহার এতদূর আত্ম বিসর্জ্জন দেখিয়া অবাক হইল। সকলে তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ আরম্ভ করিল। প্রধান পুরোহিত আসিয়া বলিলেন—তাঁহার নিকট কার্থেজিয়ানরা জোর করিয়া ফিরিয়া যাইবার অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছে, তাহা না রাখিলে দোষ নাই। রিগলস্ বলিলেন "আমি জানি আমি নিশ্চয় কোন রূপ নিষ্ঠুর মৃত্যুর হস্তে যাইতেছি কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ন্যায় পাপের অপেক্ষা তাহা কখনই অধিক ভয়ানক নহে। আমি যদিও কার্থেজের দাস আমার মন এখনও রোমের—আমি যাইবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছি, যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য, অবশিষ্ট দেবতার হাতে"।

দেশের মঙ্গলের জন্য রিগলস্ বন্দী বিনিময় করিতে না দিয়া পুনরায় কার্থেজে প্রত্যাগমন করিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল। কার্থেজে ফিরিয়া গেলে ক্রুদ্ধ কার্থেজিয়ানরা তাঁহাকে নিতান্ত যাতনা দিয়া বধ করিল।

৪

দেশের জন্য রোমানেরা তখন কিরূপ অকাতরে প্রাণ দিতেন তাহার আর দু একটি গল্প করি। ৩৩৯ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে নূতন রোমরাজ্য ও পুরাতন লাটিন রাজ্যে যুদ্ধ হয়। টিটস মানিলস ও পুব্লিয়স ডিসিয়স নামক দুই ব্যক্তি রোমানদের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। আপন আপন অধীনস্থ সৈন্য লইয়া মানিলস ও ডিসিয়স বিসুবিয়স পর্ব্বতের পাদদেশে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখনও ‘ বিসুবিয়স ’ জ্বালামুখী নাম পায় নাই, তখন পর্ব্বতশিখরে একটা গহ্বর ও কখন কখন গহ্বরের কাছে অল্প ভষ্ম ও অন্যান্য আগ্নেয় পদার্থ মাত্র দেখা যাইত, কিন্তু তাহা আগ্নেয় পদার্থ বলিয়া লোকে জানিত না, তাহাদের সাধারণতঃ বিশ্বাস ছিল এই গহ্বর মৃত ব্যক্তিদিগের আবাস। গহ্বরের নিম্নে পর্ব্বত গাত্রে বড় বড় গাছ নানা রকম লতা শৈবাল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরে পূর্ণ; বিসুবিয়সের তখন নয়নহারী হরিতরূপ ছিল। একদিন রাত্রে উভয় সৈন্যাধ্যক্ষই স্বপ্ন দেখিলেন যে লাটিন ও রোম দুই পক্ষের মধ্যে যে পক্ষের সেনাপতি মৃত্যুদেবতার নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিবেন সেই পক্ষই আগত যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। তাহার পরদিন প্রত্যুষে উভয়ে উভয়কে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন এবং একত্রে কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়া এইরূপ কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিলেন যে, যুদ্ধ দিনে দুই দল সৈন্য একত্র করিয়া ডিসিয়স দক্ষিণ ভাগের ও মানিলস বাম ভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন ও যে ভাগের সৈন্য প্রথম হঠিয়া পড়িবে তাহার নেতা অপর ভাগের নেতাকে সংবাদ পাঠাইয়া নিজেকে মৃত্যুদেবতার নিকট উৎসর্গ করিবেন, আর অপর নেতা যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিবেন।

লাটিন ও রোমানরা আকৃতি ও পরিচ্ছদে দেখিতে একই প্রকার, পাছে সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয় সেইজন্য অধীনস্থ সৈন্যদিগকে বিশেষ করিয়া তাঁহারা আজ্ঞা দিলেন যে যুদ্ধ করিবার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বে তাহারা কেহ কোন ক্রমে লাটিনদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে পাইবে না, করিলে তাহাদের মৃত্যুদণ্ড হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মানিলসের পুত্রকে একজন লাটিন এই সময় দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পূর্ব্বে মানিলস একবার একজন ভীষণকায় দৈত্য বিশেষ গলকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বধ করিয়া বহু সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, পুত্রেরও পিতার ন্যায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা হইল, সেই উচ্ছ্বাসে পিতা যে আপাততঃ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন, যুদ্ধে জিতিয়া জয়ী-বীর মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্ত্র লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মানিলস পুত্রের বীরত্ব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ রোমান কর্ত্তব্য ভুলিলেন না, দুঃখিত হৃদয়ে পুত্রকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন "বৎস তুমি নেতার আজ্ঞা অবহেলাস্বরূপ যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছ মৃত্যুই তাহার একমাত্র দণ্ড। আমি কর্ত্তব্য ও ন্যায়কে বিসর্জ্জন দিয়া মাত্র তোমাকে রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু তুমি যদি আমার পুত্র হও এরূপ জীবন কখনই তোমার প্রার্থনীয় হইবে না" বীর পিতার বীরপুত্র অম্লান বদনে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে আপনার মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করিলেন। মানিলস যুদ্ধের পুরস্কার-বিজয় মাল্যে পুত্রের মস্তক ভূষিত করিয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিলেন। তাঁহার প্রাণের প্রাণ হত হইল, বুকের বাঁধন ছিন্ন ভিন্ন হইল; তবু নিরশ্রুনয়নে কর্ত্তব্য পালন করিলেন। ইহার দুই একদিন পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিছুক্ষণ পরেই ডিসিয়সের সৈন্যের অগ্রভাগ পিছাইয়া পড়িল, তিনিও এই জন্যই অপেক্ষা করিতে-ছিলেন, ইহা দেখিবামাত্র তিনি রোমের প্রধান পুরোহিতকে ডাকাইলেন। পুরোহিত যথাবিধি মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাঁহাকে পূত করিয়া দিলেন, ডিসিয়স একটী শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া বিদ্যুৎবেগে একাকী শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহারা প্রথমে তাঁহাকে কোন রূপ অমানুষী মূর্ত্তি ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইল, তাহার পর চিনিতে পারিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। এদিকে ডিসিয়স মানিলসকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, সংবাদ পাইয়াই প্রথম মানিলস কাঁদিয়া ফেলিলেন, পুত্রশোকাতুর পিতার আশা ছিল মৃত্যুদেবতা তাঁহাকেই গ্রহণ করিবেন, আর বেশীদিন তাঁহার পুত্র বিরহ সহ্য করিতে হইবে না, তাহাতে নিরাশ হইয়া পুত্র শোক উথলিয়া উঠিল, কিন্তু শীঘ্রই তাহা দমন করিয়া সৈন্য দল একত্র করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ডিসিয়স আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন সুতরাং জয়লক্ষ্মী তাহাদেরই, এই ভাবিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে রোমানসৈন্যেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যুদ্ধে মানিলস জয়লাভ করিলেন, কিন্তু যুদ্ধের কিছু দিন পরেই পুত্রশোকে তাঁহার প্রাণ-ত্যাগ হইল।

ডিসিয়সের পুত্রও পিতার ন্যায় আত্মোৎসর্গ করেন। ২৯৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে রোমানদের সহিত গলদের যুদ্ধ হয়। রোমানরা পরাজিত প্রায়—এমন সময় পুত্র ডাসিয়সের পিতার প্রাণোৎসর্গ কাহিনী মনে হইল, তিনিও যুদ্ধের একজন নেতা ছিলেন পিতার ন্যায় তিনিও প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দেশকে রক্ষা করিতে স্থির করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পুরোহিত ডাকাইয়া যথাবিধি মন্ত্রপূতঃ হইয়া আত্মোৎসর্গ করিলেন। এবারও রোমানরা জয়ী হইল।

এই খানেই আমরা রোমের বীরকাহিনী শেষ করিলাম। ইহার পর কি আর রোমে বীর জন্মে নাই? তাহা নহে, ইহার পর রোমে অনেক বীর জন্মিয়াছে, ইহার পর রোম সভ্য নাম পাইয়াছে, রোমে দর্শন-বিজ্ঞানের আধিপত্য বাড়িয়াছে, পুরাতন বিশ্বাসাদি তখন হাসিবার কথা হইয়া পড়িয়াছে, তখন বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে বুদ্ধিই রোমের চালক; রোমের বীরগণ তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, নিজের লাভা-লাভের প্রতি দৃক্‌পাত শূন্য হইয়া অতদূর উন্মত্তভাবে কার্য্য করেন না, সীজরের,

আণ্টানির ভুবনবিখ্যাত বীরত্বের কথা সকলেই জানে, কিন্তু তাঁহারা নিজের অধিকারের জন্য সম্মানের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, সেরূপ বীরত্ব কাহিনীতে আমাদের হৃদয় মুগ্ধ হয় না, তাই অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া স্বদেশের জন্য অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করার শেষ কাহিনী দিয়া আমরা এই খানেই রোমের বীর কাহিনী শেষ করিলাম।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইয়া বিবাদ, অনেক কাল হইতে চলিতেছে; এই বিবাদের গোড়াটি কোথায় ইহা একবার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। দ্বৈতবাদীরা বলেন যে জীব ও ব্রহ্ম এই দুইএর মধ্যে আমাদের যে ভেদ জ্ঞান আছে ঐ ভেদজ্ঞান নিত্য কিন্তু অদ্বৈত-বাদীরা বলেন যে জীব ও ব্রহ্মে যে ভেদ জ্ঞান আছে তাহা ভ্রান্তিমূলক; এই ভ্রম দূর হইলেই জীব আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে।

'তৎ ত্বং অসি' বেদের এই মহাবাক্য অদ্বৈতবাদীরা যেমন মান্য করেন, দ্বৈতবাদীরাও সেইরূপ মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা উহার যেরূপ অর্থ করেন দ্বৈতবাদীরা সেরূপ অর্থ করেন না।

বেদান্ত জ্ঞানাভিলাষী শিষ্য গুরুর নিকট যখন দীক্ষা লাভ করেন তখন গুরু তাঁহাকে ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম এই কথাটিতে অন্তরে কি অর্থ বোধ হয় তাহা বুঝাইয়া দিয়া শিষ্যকে "তৎ ত্বম্ অসি" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই মন্ত্র আলোচনা দ্বারাই শিষ্য পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হন।

অদ্বৈতবাদীদের মতে "তৎ ত্বম্ অসি" এই মন্ত্রের অর্থ এই—তৎ অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—তৎত্বমসি অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম। শিষ্য তখন এইরূপ ধ্যান করিতে থাকিবেন যে আপাততঃ "আমি" বলিলে আমাকে যেরূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া বুঝি বাস্তবিক সে উপাধি আমার নিত্য উপাধি নহে; আপাততঃ আমি ব্রহ্ম কথার যে অর্থ বুঝিতেছি প্রকৃত পক্ষে আমিই তাই, কেবল ভ্রমবশতঃই এখন আমি আমাকে বিশেষ কোন উপাধি যুক্ত জ্ঞান করিতেছি। গুরুদেবের নিকট হইতে ব্রহ্ম বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান* লাভ করিয়াছি এক্ষণে আপনাকে নিত্য শুদ্ধ মুক্ত ও উপাধিশূন্য স্বরূপ

* যিনি মধু খাইয়াছেন তিনি যদি আমায় বলিয়া দেন যে মধু মিষ্ট দ্রব্য তবে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া মধুর মিষ্টতা সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান জন্মে তাহা পরোক্ষ জ্ঞান কিন্তু মধু খাইয়া মধুর মিষ্টতা অনুভব করিলে পর, মধুর মিষ্টতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান।

বুঝিয়া "ব্রহ্মই আমি" এই ধ্যান করিতে থাকিব তাহা হইলেই ক্রমে ব্রহ্ম বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব।

অদ্বৈতবাদীর মতে "তৎ ত্বম্ অসি" এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—তৎ ত্বম্ অসি অর্থাৎ তস্য ত্বম্ অসি। হে শিষ্য তুমি তাঁহার। সত্য স্বরূপ চৈতন্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তুমি সেই ব্রহ্মের, ইহা জানিও। শিষ্য তখন এইরূপ ধ্যান করিবেন, যে—সেই আদি পুরুষ ব্রহ্মের সহিত আমি একটি নিত্য সম্বন্ধে বদ্ধ। আমি তাঁহার। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাবের কোন না কোন সম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত গাঁথা। তাঁহার সহিত আমার এই যে সম্বন্ধ এ সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ; আমি আমার, নহি, আমি তাঁহার। শুধু আমি নহি জীব মাত্রেই সকলেই সেই আদি পুরুষের। আমিও তাঁহার তুমিও তাঁহার তিনিও তাঁহার, গুরুদেব যিনি আজ এই উপদেশ দিলেন তিনিও তাঁহার, ইহা বুঝিয়া আজি গুরু পদে নমস্কার করি।

অদ্বৈতবাদী বলেন, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদজ্ঞান আমাদের আছে সেই ভেদ যদি নিত্য বল, তবে জীব-চৈতন্য এবং ব্রহ্ম-চৈতন্যের স্বরূপতঃ একটি ভেদ স্বীকার করিতে হয় কিন্তু তাহা হইলে "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মহাবাক্যের সঙ্গে বিরোধ ঘটে। "একমেবাদ্বিতীয়ং" কথার অর্থ এই যে, চৈতন্য পদার্থের উপাধিগত নানারূপ ভেদ দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। এই জগতে যাহা এক এবং অদ্বিতীয় তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে গেলে, সেই এক এবং অদ্বিতীয় পদার্থ কি তাহাই অনুভব করিতে হইবে। যাহার পরিণাম আছে অর্থাৎ আজ যাহা এক রকম আকার ধারণ করে, অন্য সময় অন্য রকম আকার ধারণ করে তাহা এক এবং অদ্বিতীয় নাম পাইতে পারে না। এই জগতে যত জীব আছে এই জীব সমূহের মধ্যে পরস্পরের যে যে বিষয়ে বিভিন্নতা আছে সেই সেই বিষয় চৈতন্য পদার্থ নহে কিন্তু এই সমস্ত জীবের মধ্যে যে বিষয়ে একতা আছে তাহাই চৈতন্য পদার্থ। এইরূপে, এক এবং অদ্বিতীয় কি তাহাই অন্বেষণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং দ্বৈতবাদী, জীবচৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে যদি পৃথকভাবে ভাবেন তবে তিনি ব্রহ্মচৈতন্য বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে কখনই সমর্থ হইবেন না। নিজের চৈতন্য সম্বন্ধেই মানুষের অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব, কেননা পুরুষ নিজের চৈতন্যই নিজে অনুভব করিতে পারেন; চৈতন্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ নহে সুতরাং পরের চৈতন্য সম্বন্ধে তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভবে না; সুতরাং নিজের চৈতন্যকে ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে ভিন্ন ভাবিলে ব্রহ্ম চৈতন্য বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান কখনো সম্ভবে না। সুতরাং নিজের চৈতন্য বিষয়ক যে অপরোক্ষ জ্ঞান আছে অর্থাৎ "আমি" এই জ্ঞানকে, উপাধি শূন্য করিতে চেষ্টা করিয়া, উপাধি শূন্য চৈতন্যের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানের অন্য উপায় নাই। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না সুতরাং দ্বৈতবাদে মুক্তিলাভ হয় না। দ্বৈতবাদীর মতে, জীবের

উপাধি নিত্য সুতরাং সেই উপাধি ঘুচাইতে দ্বৈতবাদীর চেষ্টাও হয় না; অদ্বৈতবাদীর মতে চৈতন্যের জীব-উপাধি অজ্ঞান মূলক, আত্মজ্ঞান জন্মাইলেই সেই উপাধি ঘুচিয়া যায়।

'উপাধিগত ভেদ—' এই কথাটির অর্থ একটু বুঝান আবশ্যক। মনে কর একটী কাচের পুতুল আছে, কাচ এই কথাটিতে যাহা বুঝায়, কাচের পুতুল কথাটিতে তাহাই কিছু বুঝায় না; কিন্তু কাচ ও কাচের পুতুলে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, উপাধিগত একটি ভেদ আছে; এখানে কাচ-বস্তু পুতুল উপাধি পাইয়া অন্য অন্য কাচ হইতেএকটু ভিন্নতা পাইয়াছে। সেইরূপ যাহার কোন বিশেষ নাম নাই তাহা উপাধিশূন্য কিন্তু যাহা কোন বিশেষ নাম পাইয়াছে তাহাই উপাধি যুক্ত। যাহা না থাকিলে আমার 'আমি জ্ঞান' থাকে না তাহাই আমার চৈতন্য; যাহা না থাকিলে অন্যান্য জীবের 'এই আমি জ্ঞান,'—'অস্তিত্ব জ্ঞান' থাকে না তাহা তাহদিগের চৈতন্য, ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ বলেন যে সেই আদি পুরুষ চৈতন্যময় পুরুষ; যেখানেই চৈতন্য দেখিব সেইখানেই যখন এইরূপ দেখিব যে চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বত্রই এক তখন আমার চৈতন্যকে কোন বিশেষ নামে অভিহিত করিতে পারিব না। তখন আমি উপাধিশূন্য হইতে পারিব। কিন্তু আপাততঃ আমার অহংজ্ঞানের উপাধি আছে। আমি জানি যে আমি মনুষ্য, ইতর জন্তু হইতে ভিন্ন পদার্থ। আবার মনুষ্যের মধ্যে আমি একটি বিশেষ দেহ-ধারী মনুষ্য, অর্থাৎ এই দেহ ছাড়া অন্যান্য মনুষ্য-দেহধারী মনুষ্য হইতে আমার প্রভেদ জ্ঞান আছে সুতরাং আমার একটি বিশেষ নাম আছে। এই নামটিই আমার উপাধি। আমি এখন, 'আমি' কথায় যাহা বুঝি এবং ব্রহ্ম কথায় যাহা বুঝি এই দুইটি জ্ঞানের (Idea) মধ্যে প্রভেদ আছে, এই প্রভেদ জ্ঞান নিবন্ধন এখন আমি, আমাকে ব্রহ্ম বলিতে পারি না এবং আমি, চেতন পুরুষ হইলেও, আমাকে জীব এবং ব্রহ্মকে ব্রহ্ম নাম দিয়া থাকি। জীব যতদিন আপনাকে উপাধিশূন্য চৈতন্যময় পুরুষ বলিয়া না বুঝিবে ততদিন জীবের জীব উপাধি থাকিবে। ভেদ জ্ঞান হইতেই উপাধির সৃষ্টি। দ্বৈতবাদীর মতে জীব চৈতন্যের সহিত জীব চৈতন্যের কোন ভেদ নাই কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্যের সহিত ভেদ আছে এবং সেই ভেদ নিত্য, সুতরাং জীব তাহার জীব উপাধি ত্যাগ করিয়া কখনও নিরুপাধিক হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদী বলেন জীব নিরুপাধিক না হইলে তাহার মুক্তি লাভ হয় না অর্থাৎ সেই পুরুষ পুণ্যাত্মা হইলেও স্বর্গাদি ভোগের পর তাহার ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হয়।

অদ্বৈতবাদী 'একমেবাদ্বিতীয়ং' কথার যেরূপ অর্থ করেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহাদের মতে চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বত্র এক, জীবনামধারী চৈতন্য সোপাধিক এবং ব্রহ্ম চৈতন্য নিরুপাধিক। জীবের উপাধি রক্ষা করা কিম্বা ঘুচাইয়া দেওয়া, সেই জীবের নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে; এই উপাধি ঘুচাইয়া দেওয়াই পুরুষার্থ। দ্বৈতবাদী

'একমেবাদ্বিতীয়ং' বাক্যটির কিরূপ অর্থ করেন তাহা দেখা যাক। দ্বৈতবাদী বলেন যে জীব নিয়ত উপাসক; বেদোক্ত দেবতা সকল উপাস্য পদার্থ। কিন্তু এই দেবতা সকল বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা হওয়ায় বিশেষ বিশেষ নাম পাইয়াছেন; দেবতারা নিত্য পদার্থ নহে সুতরাং তাহারা নিত্য সুখ প্রদানে সক্ষম নহে; যে চৈতন্যের স্বত্ত্বা নিবন্ধন দেবতারা কর্ম্মফলানুযায়ী সুখ প্রদানে সমর্থ, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সেই চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইয়াছে। দেবতা-উপাধিগত চৈতন্য অবচ্ছিন্ন চৈতন্য, কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময় পুরুষই নিত্য পদার্থ; জ্ঞানমার্গাবলম্বনে তাঁহার উপাসনা দ্বারা জীব নিত্য সুখ লাভে সমর্থ হয়। সেই চৈতন্যময় পুরুষ বিষয়ক মানসব্যাপারের নামই তাঁহার উপাসনা। প্রণবমন্ত্রই সেই পুরুষের বাচক। ইহাই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' কথার অর্থ।

অদ্বৈতবাদী পুরুষার্থসাধন নিমিত্ত পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক, নিজেই নির্গুণ পুরুষত্ব পদ পাইতে অভিলাষ করেন; দ্বৈতবাদী নিত্য পুরুষের নিত্য উপাসক হইয়া উপাসক থাকিতেই অভিলাষ করেন। কবি রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছিলেন "চিনি হতে চাই না মা, চিনি খেতে চাই" ইহাই দ্বৈতবাদীর মনের ভাব।

অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী উভয়েই বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই অর্থাৎ জন্ম জরা মরণাদি ব্যাপার জনিত দুঃখভোগ হইতে মুক্তি পাইবার অন্য পথ নাই। এখন একটি কথা ভাবিতে হইবে যে, যেখানে জ্ঞান আছে সেই খানেই জ্ঞাতা আছে এবং জ্ঞেয়ও আছে। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান সম্ভবে না। দ্বৈতবাদী বলেন যে যখন ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় বিষয় হইলেন তখন ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতা হইবে কে? অবশ্যই আমিই হইব। তাহা হইলেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে যে পৃথক্ সম্বন্ধ, আমার সহিত ব্রহ্মের সেই পৃথক্ সম্বন্ধ রহিল। জীবের চরম উন্নতি অবস্থাতেও আমার ব্রহ্মজ্ঞান থাকিবে সুতরাং ব্রহ্ম আমার পক্ষে নিত্য জ্ঞেয় হইলেন তাহাহইলেই ব্রহ্মের সহিত আমার একটি নিত্য ভেদ রহিল সুতরাং দ্বৈতবাদীর নিকট ব্রহ্ম পদার্থ, তাহার অহংপদার্থ হইতে ভিন্ন আর কিছু। তাঁহার কাছে 'আমি' জ্ঞাতা, ব্রহ্ম জ্ঞেয় এবং এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহাই ব্রহ্ম জ্ঞান।

অদ্বৈতবাদী যে পদ্ধতি অবলম্বনে ধ্যান করেন তাহাতে যিনি জ্ঞাতা তিনিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এবং আমিই জ্ঞেয় বিষয়, অর্থাৎ জীব যে আমি তাহা কি পদার্থ তাহাই জ্ঞেয় বিষয়, এবং এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে অভেদ সম্বন্ধ তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান।

গত বারের ভারতীতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে "এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ইদম্‌বৃত্তির সহিত একেবারেই সম্পর্ক রহিত হইয়া অহম্‌বৃত্তি একাকী থাকিতে পারে কি না? যদি বল 'হাঁ পারে' তবে তুমি অদ্বৈতবাদী; যদি বল "না—পারে না" তবে তুমি

দ্বৈতবাদী। এই একটি হাঁ ও না'য়ের উপর অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ আলম্বিত রহিয়াছে।" এই একটি হাঁ ও না'য়ের উপর অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ কেমনে আলম্বিত রহিয়াছে তাহা একটু বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ইদম্‌বৃত্তি বলিতে আমার অহং প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কোন প্রত্যয়; এই ইদংবৃত্তি ছাড়া যদি অহংবৃত্তি থাকিতে না পারে তবে ধ্যানের যতই কেন উৎকর্ষতা জন্মাক না,—অহং জ্ঞান থাকিলেই অহং জ্ঞান ভিন্ন যে ইদং জ্ঞান তাহা থাকিবে সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের একটি প্রভেদ নিত্যই রহিল; শাস্ত্রে কথিত আছে যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ধ্যানের উপযুক্ত নহে কেননা ব্রহ্ম ভিন্ন আর সব অনিত্য পদার্থ সুতরাং ব্রহ্মই আমাদের নিত্য জ্ঞেয় এবং তাহা হইলেই অহং ও ব্রহ্ম এই দুইএর একটি নিত্য প্রভেদ রহিল অর্থাৎ দ্বৈতবাদ সমর্থন হইল। কিন্তু যদি এমন হয় যে ধ্যানের চরম অবস্থায় 'আমি জ্ঞান' ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান না থাকিলেও 'আমি জ্ঞান' থাকিতে পারে তবে অহং ও ইদম্‌এর সহিত যে ভেদ তাহা অনিত্য হইল সুতরাং অদ্বৈতবাদীর মত সমর্থন হইল।

আমি এতক্ষণ দ্বৈতবাদীর কথা ও অদ্বৈতবাদীর কথা যাহা বলিলাম তাহাতে কাহার কথা সত্য কাহার কথা বা অসত্য সে বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই; কেননা কেবল তর্ক দ্বারা আমাদিগের ন্যায় লোক এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতে পারেন না। 'তৎ ত্বমসি' 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ইত্যাদি মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ কি অর্থাৎ বেদকর্ত্তা ঐ সকল কথায় ঠিক কি অর্থ যোজনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বেদজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন সুতরাং আমরা কেবল ঐ রূপ বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের কথার উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াই ঐ সকল মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে তাহাই বলিতে পারি। তাহার পর আবার,—সমাধির চরম অবস্থায় আমাদের অহং জ্ঞান কোন অবলম্বন শূন্য অবস্থায়,—অর্থাৎ অহংবৃত্তি ইদংবৃত্তির সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকিতে পারে কি না, এ কথার উত্তর পরমযোগী ব্যতীত আর কেহই দিতে সমর্থ নহেন সুতরাং এই সকল দুরূহ বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে মহাপুরুষগণের বাক্যকেই প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না।

পরম যোগী পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র মতে দ্রষ্টা তাহার নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিলেই কৈবল্য পদ লাভ করিয়া থাকেন। বেদান্ত শাস্ত্রে যাহাকে জীব চৈতন্য বলা হইয়াছে পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে তাহাকেই দ্রষ্টা নাম দেওয়া হইয়াছে। পরম যোগ সমাধা হইলেই দ্রষ্টা কৈবল্য পাইয়া থাকেন, এই যোগ কাহাকে বলে? যোগশাস্ত্রের ২য় ও ৩য় ও ৪র্থ সূত্র এই———

যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ। ১

চিত্ত বৃত্তি সমূহের নিরোধের নাম যোগ।

তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপে হবস্থানং ॥ ২

সেই সময় অর্থাৎ যোগাবস্থায় দ্রষ্টা তাহার স্বরূপে অবস্থান করে।

বৃত্তি সারূপ্য মিতরত্র ॥ ৩

অন্য সময় বৃত্তি সারূপ্য প্রাপ্ত হয়।

অনুমান বা শব্দ প্রমাণ পাতঞ্জল শাস্ত্রের ভিত্তি নহে, যোগমার্গ অবলম্বনে যে সকল অপরোক্ষ জ্ঞানের অনুভূতি জন্মে সেই সকল কথাই যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে যে সকল কথা আছে তাহা হইতে ইহা পাওয়া যায় যে, চিত্তের বৃত্তি সমূহ নিবন্ধন দ্রষ্টা অর্থাৎ জীব, যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা দ্রষ্টার স্বরূপ নহে; চিত্তবৃত্তি নিরোধাবস্থা পাইলে, দ্রষ্টা উপাধিশূন্য হইয়া তাহার স্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপে অবস্থিতি করে। যোগমার্গ অবলম্বনে মনুষ্য যখন এমন অবস্থা প্রাপ্ত হন যে চিত্তের বৃত্তি সমূহের সহিত তাহার সম্পর্ক একেবারে ঘুচিয়া যায় তখনই পুরুষ কৈবল্য পদ পাইয়া থাকেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে পরমযোগী পতঞ্জলির কথায় জীবের যে উপাধি তাহা অনিত্য; এই উপাধি ঘুচানই মোক্ষ এবং ইহাই পরম পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ সাধন জন্য যে যে উপায় অবলম্বন প্রয়োজনীয় তাহাই তাঁহার যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পতঞ্জলির কথা মানিতে হইলে বৈদান্তিক দ্বৈতবাদ ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। সাংখ্যকার কপিল দেবের মতে পুরুষ চিরকালই শুদ্ধ ও মুক্ত, এই পুরুষতত্ত্বই তাঁহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরম তত্ত্ব। দেহী অর্থাৎ পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত হইলেও দেহাভিমান নিবন্ধন তাহার দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, এই দুঃখ নিবৃত্তিই পুরুষের পুরুষার্থ। প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধীয় অবিবেক নিবন্ধন, পুরুষ আপনাকে সাকার ও সোপাধিক জ্ঞান করে, সেই অবিবেক দূর করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়। সুতরাং সাংখ্যকার মতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মায় স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই; জীব যে আপনাকে সাকার ও সোপাধিক জ্ঞান করে তাহাই তাহার বন্ধের হেতু। সাংখ্যকার অসংখ্য পুরুষ স্বীকার করেন অথচ তিনি অদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন যে পুরুষ অসংখ্য হইলেও, আমি পুরুষ, তুমি পুরুষ তিনি পুরুষ ইত্যাদি কাহারো মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই সুতরাং পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য এক এবং অদ্বিতীয়।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের যে ব্রহ্ম স্তোত্র ইদানী ব্রাহ্মসমাজে পাঠ করা হয় তাহাতেও ব্রহ্মকে অদ্বৈত তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা আছে।

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়।

নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তি প্রদায় ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় অর্জ্জুনকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে জীব মোক্ষ লাভ করিলে ব্রহ্ম সারূপ্য লাভ করে সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যে ভেদ জ্ঞান আছে তাহা নিত্য নহে।

ব্রহ্মভূতং প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥
ভক্ত্যা মামভি জানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্বতঃ।
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাতা বিশতে তদনন্তরং॥ গীতা ১৮।৫৪, ৫৫।

ঈশ্বর ভক্ত শ্রীধর স্বামী ইহার এইরূপ অর্থ করেন——

ব্রহ্মাহং ইতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ, প্রসন্ন চিত্তঃ, নষ্টং ন শোচতি ন চ অপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদি অভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্ব্বেষপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগ দ্বেষাদি কৃত বিক্ষেপাভাবাৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনা লক্ষণাং পরাং মদ্‌ভক্তিং লভতে।

ততশ্চ ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্বতো মামভিজানাতি, কথম্ভূতং, যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্ততাভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে, পরমানন্দরূপো ভবতি।

'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানে, নিশ্চল ভাবে অবস্থানের ফল বলিতেছেন। মনুষ্য ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া প্রসন্নাত্মা হইলে কোন কারণে শোক করেন না এবং কিছুরই আকাঙ্খা করেন না। অতএব সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানী হইয়া, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর ভাবনা রূপ যে ঈশ্বর ভক্তি, সেই পরা ঈশ্বর ভক্তি লাভ করেন।

আমি (ঈশ্বর) যেরূপে সর্ব্বব্যাপী এবং আমি যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ইহা এই পরা ভক্তি দ্বারা তত্বতঃ বুঝিতে পারা যায়। ভক্ত এইরূপে আমাকে তত্বতঃ জানিয়া পরে সেই জ্ঞানের চরম অবস্থায় আমাতেই প্রবেশ করে অর্থাৎ পরমানন্দরূপ হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভক্তি-প্রধান-শাস্ত্র ভগবদ্‌গীতা অনুসারেও দ্বৈতবাদ ভ্রমাত্মক। গীতার কথানুসারে ভক্তের পরা ভক্তির চরম ফল ব্রহ্মসারূপ্য লাভ এবং ইহাই মুক্তি। সুতরাং দ্বৈতবাদী যে বলেন যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিত্য, সে কথা ঠিক হইতেছে না।

অদ্বৈতবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে গুটি কত কথা বলা হইল কিন্তু বিবাদের মূলটি কোথায় সেটি এখনো বলা হয় নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

হেঁয়ালি নাট্য।*

নবকান্ত বাবু।

নব। ওঃ! প্রেমের কি মোহিনী শক্তি! তার অগাধ রহস্য কে ভেদ করতে পারে। না জানি সে কিসের বন্ধন যাতে এক হৃদয়ের সঙ্গে আর এক হৃদয় বাঁধা পড়ে! সে কি জ্যোৎস্নাপাশ, সে কি পুষ্প-সৌরভের ডোর, সে কি মুকুলিত মধু মাসের মধুর মলয়ানিলের বন্ধন? হরি হরি! না জানি সে কি কাল-হুতাশন যাতে দগ্ধ হওয়া ভস্ম হওয়াই জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা. একমাত্র উদ্দেশ্য! মরি মরি, সে কি দেখলেম. সে আমার কাছে প্রভাত স্বপ্ন বলে বোধ হচ্চে। সেই প্রভাতে সেই বাগানে, সেই কামিনী গাছের তলায় আপন মনে দাঁড়িয়ে বাগানের পাঁচিলে সে গোবর দিচ্ছিল। আমি রাজা দুষ্মন্তের মত গাছের আড়াল থেকে তাই দেখ্‌ছিলেম।

নরোত্তমের প্রবেশ।

নরো। কি সর্ব্বনাশ! নবকান্তের হাতে পড়লে আর ত রক্ষে নেই; ধর্‌লে বুঝি!

নব। (নরোত্তমকে ধরিয়া) ভাই প্রেমের কি মহান্‌ শক্তি!

নরো। ঠিক বলেছ ভাই, কিন্তু ক্ষিদের শক্তি তার চেয়ে ঢের বেশি। আমি খেতে যাই, আমাকে ছাড়!

নব। হৃদয়ের ক্ষুধা—

নরো। হৃদয়ের না ভাই. উদরের। আমি এখনি খেয়ে আস্‌চি।

নব। খাওয়ার কথা আমি বল্‌চিনে—

নরো। তুমি ত বলচ না আমি বলচি। একটু রোস, আমি—ঐ আদ্যানাথ বাবু আস্‌চেন ওঁকে ধর উনি প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে ঠিক বুঝ্‌বেন। (প্রস্থান)

আদ্যানাথ বাবুর প্রবেশ।

নব। (আদ্যানাথকে ধরিয়া) মশায়, প্রেমের কি মহান্‌ শক্তি!

আদ্যা। মহান্‌শক্তি কাকে বলে বাপু? মহতীশক্তি বলা উচিত। কারণ শক্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, তৎপূর্ব্বে—

নব। আপনি ভেবে দেখুন, প্রেমের সৈন্য নেই সামন্ত নেই অথচ প্রেম বিশ্ব বিজয়ী। সে আপনার জীবন্ত—

---

* গত ভাদ্র আশ্বিন মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "বাকি"। শ্রীযুক্ত, বিহারীলাল গোস্বামী. কুমুদনাথ রায়, নীলমণি বরাট, অনঙ্গমোহন দাস, যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, তারিণীচরণ রায়, অনন্তলাল ঘোষ, কেদারনাথ পুণ্ডরীক ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

আদ্যানাথ। "জীবন্ত" শব্দ ব্যবহার হতে পারে না।

নব। আজ্ঞে হাঁ, সে আপনার জীবন্ত প্রভাবেই—

আদ্যা। "জীবিত" বলনা কেন, কথাটা তা হলে ব্যাকরণ সম্মত—

নব। জীবন্ত প্রভাবে সর্ব্বত্র আপনার পথ সৃজন—

আদ্যা। সৃজন নয় সর্জ্জন—

নব। পথ সৃজন করে নেয়। এই যে সূর্য্যতারাখচিত—

আদ্যা। সর্জ্জন, কেননা সৃজ ধা—

নব। নীলাকাশ, এই যে বিচিত্র পুষ্প শোভিত—

আদ্যা। সৃজ ধাতুর উত্তর—

নব। পুষ্পকানন,—

(কথোপকথন করিতে করিতে প্রস্থান।)

লেখক শ্রীগণেশচন্দ্র বসুর প্রবেশ।

গণেশ। কাকে ধরি! লেখাটা শোনাই কাকে! আমি যেখানে খাতা হস্তে যাই, সেখানে কাউকেই দেখ্‌তে পাইনে। আজ কাউকে শোনাতেই হবে যাই অনুসন্ধানে যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হরিচরণ, নবীন, মাধব, নরোত্তম।

হরি। ওহে, এত দিন ছিলেম ভাল, কোন আপদ ছিল না। এখন কি করা যায় বল দেখি!

নবীন। তাইত কি করা যায়!

নরোত্তম। তাইত হে কি করা যায়!

হরি। এতদিন আমাদের বাসায় আপদের মধ্যে কেবল এক নবকান্ত ছিল, কিন্তু অভ্যেসে তাকে সয়ে গিয়েছিল, এখন কোথা থেকে একটা লেখক জুটেছে।

নরোত্তম। বাসায় লেখক থাকা কোন কাজের কথা নয়।

নবীন। কাল জাতিভেদের উপর এক কবিতা লিখে আমাকে শোনাতে এসেছিল— কিছুতেই ছাড়লে না, আমার ভাত জুড়িয়ে গেল ভাল করে খাওয়াই হল না।

হরি। কাল রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আমার বেশ একটু তন্দ্রা এসেচে, এমন সময়ে লেখক মশায় খাতা হস্তে উপস্থিত। তিনি "হিন্দু ধর্ম্মের প্রহরী" বলে একখানা কাগজ বের করবেন, তাতে "আর্য্য জাতির দূরদর্শিতা" "টিকটিকি পড়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা" ও "বাগবাজারের নীলকমল রায়কে জাতিচ্যুত করা উচিত" এই তিন বিষয়ে তিন প্রবন্ধ লিখেছেন অতি উত্তম কাজ করেছেন, হিন্দু ধর্ম্মকে অত্যন্ত সজাগ করে তুলেচেন কিন্তু

তাই বলে আমি বেচারা ঘুমোতে পাব না কেন? আমি ত মনুও না বেদব্যাসও না, আমাকে পীড়ন করবার ত কোন কারণ দেখিনে।

নরোত্তম। ঠিক বলেচ, আমাকেও ভারি নাকাল করেচে। আমি বলে—

নবীন। (সভয়ে) ঐ আসচে!

হরি। ঐ আস্‌চে!

নরোত্তম। ঐ খাতা!

নবীন। পালাই! (প্রস্থান)

হরি। আমিও পালাই। (প্রস্থান)

নরো। আমি মোটা মানুষ আমার পালাবার সুবিধা হবে না। আমি কি করি!

(খাতা হস্তে লেখক শ্রীগণেশচন্দ্র বসুর প্রবেশ)

গণেশ। (সহাস্য মুখে) দুটো প্রবন্ধ লিখেছি।

নরোত্তম। ক'টা বাজ্‌ল কে জানে।

গণেশ। একটা হোচ্চে আধুনিক স্ত্রী জাতির—

নরোত্তম। মশায়, আপনার কাছে ঘড়ি আছে, দেখুন দেখি সময় কত।

গণেশ। আজ্ঞে ঘড়ি নেই। আমার প্রবন্ধের কথা বল্‌ছিলুম, একটা হচ্চে—

নরোত্তম। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে মোধো, আমার আপিসের চাপকান কোথায় রাখ্‌লিরে!

গণেশ। বুঝেচেন নরোত্তম বাবু, একটা প্রবন্ধ হিন্দু ধর্ম্মের—

নরোত্তম। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ঐ ঐ ঐ সর্ব্বনাশ হল, ছেলেটা প'ল বুঝি! (প্রস্থান)

গণেশ। কাল থেকে চেষ্টা করচি একটা লোকও ধরতে পাচ্চিনে। কে যেন কাকের বাসায় ঢিল ছুঁড়ে মেরেচে বাসাসুদ্ধ লোক চঞ্চল হয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে। এদের ভাব ত কিছু বোঝা যাচ্চে না। পূর্ব্বে যে বাসাটাতে ছিলুম, সে বাসাতে একটি লোকও বাকি রইল না, কাজেই ছেড়ে আস্‌তে হল। এখেনে দেখ্‌লুম অনেকগুলো মানুষ আছে, কিন্তু এরা দু দণ্ড স্থির হয়ে বসে না কেন? যাই নরোত্তম বাবুকে ধরবার চেষ্টা করিগে। লোকটির বেশ ভাল মানুষ চেহারা।

তৃতীয় দৃশ্য।

নরোত্তম ও নবকান্ত।

নব। দেখ নরোত্তম হৃদয়ের রহস্য আজ পর্য্যন্ত কেউ উদ্ভেদ কর্ত্তে পার্‌লে না।

নরো। হৃদয়ের রহস্যের কথা এখন পেড়োনা ভাই, আমাকে এখনি আপিসে বেরোতে হবে।

নব। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আহা! তোমার ত আপিস আছে, আমার কি আছে

বল দেখি! আমার, যে "Occupation gone"! Othello's occupation gone!" সেক্স্পিয়র যে লিখেছে—কোথায় যাও, আঃ শোননা—

নরো। না ভাই আমাকে মাপ কর—সায়েব রাগ করবে, আমারো occupation-টুকু যাবার যো হবে!

নব। কিন্তু ভাই ভালবাসার কথা যদি বল—

নরো। সে কথা আমি বল্‌চিইনে আমি আপিসের কথা বল্‌চি।

নব। আমি বল্‌ছিলুম উভয় পক্ষের যদি—আহা কোথায় যাও শোননা—উভয় পক্ষের—

নরো। উভয় পক্ষের কথা আমি পরে শুন্‌ব ভাই, আমাকে মাপ কর। আর এ সকল কথা আমার ভাল জানা নেই—উভয় পক্ষের কথা শুন্‌লে আমার ভারি গোল বেধে যায়। মাথা ঘুরতে থাকে।

নব। তুমি আমার কথাটা না শুনেই ভয় পাচ্চ—আমি যা বল্‌চি তা তর্কের কথা নয়, হৃদয়ের কথা, সহজ কথা—

নরো। কিন্তু ঐ সহজ কথায় বেলা চারটে বেজে যাবে, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাকে তোমরা ছাড়।

নব। আচ্ছা দেখ, কথাটা বল্‌তে দশ মিনিটের বেশি লাগ্‌বে না—তুমি ঘড়ি ধ'রে দাঁড়াও আমি বলে যাই!

নরো। (সকাতরে) নবকান্ত, আমি তোমার কাছে কি দোষ করেচি আমাকে বল। কেন তোমরা সকলে মিলে আমাকে নিয়েই পড়েচ। ওঘরে হরি আছে নবীন আছে, তাদের কাছে ত কই তোমরা ঘেঁষ না। সে দিন এম্নি সময়ে তুমি হৃদয়ের রহস্যের কথা পাড়লে বেলা দেড়টা হয়ে গেল। সায়েবের কাছে জরিমানা দিতে হল। আজ আবার হৃদয়ের রহস্যর কথা পেড়েছ। গরীবের চাকুরীটি গেলে তোমার হৃদয়ের রহস্য আমার কি কাজে লাগ্‌বে বল? (প্রস্থানোদ্যম)

নবকান্ত। (ধরিয়া) রাগ কর্‌লে ভাই!

নরোত্তম। না রাগের কথা হচ্চে না। এখন কি না আপিসের বেলা হল তাই তাড়াতাড়ি কর্‌তে হোচ্চে। (প্রস্থানোদ্যম)

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই তুমি রাগ করেচ। তোমার আপিস আছে তা কি আমি জানিনে। আমি কখনই তোমাকে দেরি করাতুম না।

নরো। এও ত বিষম মুস্কিলে ফেল্লে। রাগের কথা মোটেই হচ্চে না—রাগ আমার কিছুতেই হয় না। কিন্তু শীতকালের দিনে কথায় কথায় বেলা হয়ে যায়। (প্রস্থানোদ্যম)

নব। (ধরিয়া) না ভাই তুমি রাগ করে চলে যাচ্চ। আমি মনে করিনি যে এত অল্পে তুমি রেগে উঠ্‌বে। আজ সমস্ত দিন আমার মন খারাপ হয়ে থাকবে।

নরোত্তম। আচ্ছা ভাই আপিস থেকে এসে এ বিষয় কথা হবে। (প্রস্থানোদ্যম)

নব। না, তুমি বল আমাকে মাপ করলে!

নরো। মাপ করলুম! (প্রস্থানোদ্যম)

নব। (ধরিয়া) না ভাই তোমার মুখ যে প্রসন্ন দেখ্‌চি নে।

নরো। মুখ কি করে প্রসন্ন হবে নবকান্ত! বেলা যে বিস্তর হল। অথচ এখনও খাওয়া বাকী আছে। (প্রস্থানোদ্যম)

নব। (ধরিয়া) না তুমি প্রসন্নমুখে আমাকে মাপ করে যাও, তবে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব!

নরো। ভাই আমি তোমাকে মাপ করব কি, তুমি আমাকে মাপ করো। আমি নাকে খৎ দিচ্চি আমাকে যা কর্‌তে বল্‌বে তাই করচি! (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

(নরোত্তম বাবুর পশ্চাতে গণেশ বাবু)

গণেশ। মশায় অত হাঁপাচ্চেন কেন? পাড়ায় ডাকাতও পড়েনি, বর্গির হাঙ্গামাও হয়নি, আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন না। আমার প্রবন্ধে আর্য্য-জাতির—

নরোত্তম। কি ভয়ানক! মশায়ের খাওয়া হয়েচে?

গণেশ। আজ্ঞে না। কিন্তু যে লেখাটার কথা বল্‌ছিলুম তাতে—

নরোত্তম। মাছি পড়েছে!

গণেশ। আজ্ঞে মাছি কেন পড়বে!

নরোত্তম। আপনার লেখার কথা বল্‌চি নে আমার দুধে মাছি পড়েছে।

গণেশ। তা যাগ্‌গে কিন্তু লেখাটার সম্বন্ধে—

নবকান্তের প্রবেশ।

নবকান্ত। তুমি ভাই সেই রাগ করে চলে এলে, আমার কিছুতেই মন স্থির হচ্চে না।

নরোত্তম। আমারো মন অত্যন্ত অস্থির, আমাকে একটু ছাড় আমি এলেম বলে! (তাড়াতাড়ি প্রস্থান)

নব। যাই দেখিগে। নরোত্তমের মুখ প্রফুল্ল না দেখে আমি তাকে কিছুতেই ছাড়তে পারচিনে! (প্রস্থান)

গণেশ। নরোত্তম বাবু গেলেন কোথায় দেখে আসি। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

নরোত্তম আহারে প্রবৃত্ত। গণেশের প্রবেশ।

গণেশ। এত সকাল সকাল আহারে বসেচেন যে!

নরো। সকাল আর কই! আমাকে শীঘ্র আপিসে বেরোতে হবে!

গণেশ। শীঘ্র যেতে হবে! তবে যতক্ষণ খাচ্চেন ততক্ষণ যদি আমার এই স্ত্রী-জাতির—

নরো। মশায় আমার খাওয়া হয়ে গেছে আমি উঠ্‌লুম।

গণেশ। কিছুই যে খেলেন না। সবই পড়ে রইল। সে যাহোক পান তামাক ত খাবেন ততক্ষণ যদি—আমার এ বেশি দেরি হবে না!

নরো। (নেপথ্যে চাহিয়া) ঐরে, নবকান্ত মুখ বিষণ্ণ করে আসচে! আজ্ঞে না আমার পান তামাকে প্রয়োজন নেই আমি চল্লুন। আমাকে আচ্ছা নাকাল করেছে! (প্রস্থান)

(অত্যন্ত গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে নবকান্তের প্রবেশ)

নব। নরোত্তম কোথায় মশায়!

গণেশ। (খাতা বাহির করিয়া) তিনি চলে গেছেন, তা হোক্ না, আপনি বসুন্ না!

নব। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঃ! আমাকে দেখে আপনার কি রকম মনে হচ্চে বলুন্ দেখি। অত্যন্ত শীর্ণ অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে হচ্চে না কি?

গণেশ। আজ্ঞে না, কিছু না। আপনি ভাব্‌বেন না, আপনি বেশ আছেন! দেখুন, আমার "হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী"—

নব। আমি বেশ আছি বল্‌চেন! কি করে বল্‌চেন বেশ আছি! আপনি কি দেখ্‌চেন না, আমার চোখের নীচে কালি পড়ে গিয়েছে—আমার—

গণেশ। ও সব কিছুই নয়। বুঝলেন? "হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী"তে আমি গোটা দুয়েক—

নব। কিছুই নয়! বলেন কি! হৃদয়ের তুলনায় জগতে এমন কি আছে—

গণেশ। কিন্তু হৃদয়ের কথা আমি ত বল্‌ছিলুম না। আমি বল্‌ছিলুম আর্য্যমনীষী-গণের—

নব। আর্য্য মনীষী আবার কি! হৃদয়ের কথাই ত হচ্ছিল। আমি বল্‌ছিলুম, হৃদয় যখন তুষানলে দগ্ধ হতে থাকে তখন মানুষের দশা কি হয়!

গণেশ। কিছুই হয় না! কিন্তু আমি যা লিখেচি তার বিষয়টা হচ্চে এই—আর্য্য মনীষীগণ পূর্ব্বে যে সকল বিধান করে গেছেন, এখনকার অবস্থায় তার কি করা উচিত?

নব। তার শ্রাদ্ধ করা উচিত। সে কথা যাক—যার হৃদয়ে প্রণয়ের তুষানল জ্বলচে—

গণেশ। সে যেন কারো চালের উপর গিয়ে না বসে তা হলে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হবে! সে যাহোক, আমার লেখায় এই প্রশ্ন তুলেছি যে, প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রের মূলে কি আছে—

নব। কচু!

গণেশ। এবং তার থেকে কি ফল ফলেচে!

নব। কলা!

গণেশ। এবং সেই মূল উদ্ধার কর্‌বে কে?

নব। বরাহ অবতার!

গণেশ। এবং তার ফল ভোগ করবে কে?

নব। বানর। আপনার প্রশ্ন আর অধিক নয়। আমার প্রশ্ন হচ্চে এই জগতে সকলের চেয়ে গুরুতর রহস্য কি!

গণেশ। আর্য্যশাস্ত্র।

নব। প্রেম।

গণেশ। মনুসংহিতা এবং—

নব। অভিমানের অশ্রুজল—

গণেশ। এবং গৃহ্যসূত্র—

নব। এবং চোখে চোখে চাহনি।

গণেশ। এবং দায়ভাগ।

নব। এবং প্রাণে প্রাণে মিলন!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গণেশ লিখিতে প্রবৃত্ত।

গণেশ। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর। "নারদের ঢেঁকি এবং য়ুরোপীয় বেলুন।" জিনিষটা একই। আরম্ভটা অত্যন্ত চমৎকার ফেঁদেছি, কিন্তু শেষটা কিছুতেই মেলাতে পারছিনে—কিন্তু শেষটার কোন দরকার নেই। ভূমিকা পড়েই সমস্ত লোক আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, আসল বিষয়টা না জান্‌লেও চল্‌বে। যারা ভূমিকার চেয়ে বেশী লেখে তাদের আবার পাঠক যোটে না। আসল মজাটুকু হচ্ছে যতক্ষণ বিষয়ে এসে না পৌঁছান যায়! কিন্তু কাকে শোনাব? নরোত্তম বাবু একেবারে বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। হরি বাবুর কাছে ঘেঁস্‌তে ভয় হয়। আরো খানিকটা লিখি!

নবকান্তর প্রবেশ।

নব। হায় হায়! নরোত্তম বাসা ছেড়েছে এখন কার কাছে যাই।

গণেশ। এই যে নবকান্ত বাবু! "নারদের ঢেঁকি"—

নব। "নিথর জোছনা জালে নধর নবীন"—

আদ্যানাথ বাবুর প্রবেশ।

গণেশ। বাঁচা গেল। আদ্যনাথ বাবু শুনুন্ মহাশয়—আমার নারদের ঢেঁকি—

নব। শুনুন আদ্যানাথ বাবু—"নয়ন-নলিনীদল নিদ্রায় নিলীন"—

গণেশ। আমার বক্তব্য হচ্চে—প্রাচীন আর্য্য মনীষীগণ বিরচিত সনাতন আর্য্য শাস্ত্র সকল মন্থন করে নারদের ঢেঁকি—

আদ্যা। ওস্থলে ঢেঁকি শব্দের ব্যবহারে লেখা গ্রাম্যতাদোষে দূষিত হয়ে পড়ে। সাহিত্য দর্পণের—

নব। সাহিত্যদর্পণের মাথা এবং মুণ্ডু, শুনুন না —"মোহন মদির মধু"—

তাড়াতাড়ি ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। বাবুরা পালাও গো! ঘরে আগুণ লেগেচেন।

আদ্যা। (হাসিতে হাসিতে) বেটার ব্যাকরণ জ্ঞান দেখ একবার, কি বল্লে শোন। আজ কাল বাঙ্গলা ভাষায় এমনিই হচ্চে বটে!

নব। (সনিঃশ্বাসে) আগুণ! হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে—

গণেশ। আগুণের কথা যদি উঠ্‌ল তবে এই খেনে বলে রাখি মহারাজা নল যে বিনা আয়োজনে আগুণ জ্বালাতে পারতেন সে ব্যাপারটা কি! হাইড্রোজেনএবং অক্সিজেন।

আদ্যা। ওটা যাবনিক প্রয়োগ হল। হওয়া উচিত জলযান এবং অম্লজান। কারণ কি না—

(গৃহে অগ্নির আবির্ভাব)

কলঙ্ক।

১১

যখন বিষণ্ণ উৎসুক ভ্রাতার মুখের দিকে সজল দৃষ্টিতে চাহিয়া সত্যবতী কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"ভাই সত্যই আমরা তোমার আপনার লোক নই" তখন মৃত্যুদণ্ডের মত যুবকের কর্ণে তাহা ধ্বনিত হইল. মুহূর্ত্তের জন্য তাহার জীবনের স্রোত যেন বন্ধ হইয়া গেল, ইন্দ্রিয় জ্ঞান লুপ্ত হইয়া পড়িল. কে যেন তাহাকে হঠাৎ পাষাণে অভিশপ্ত করিয়া রাখিয়া গেল। সত্যবতী বড় ভীত হইল, আকুল ভাবে গুহাকে কোলে টানিয়া কাঁদিয়া বলিল "গুহা—" ধীরে ধীরে গুহার মাথা দিদির কোলে লুটাইয়া পড়িল,—দিদির কোলে মুখ লুকাইয়া শিশুর মত গুহা কাঁদিতে লাগিল, সত্যবতীও কাঁদিতে লাগিলেন, ভাই বোনের অশ্রুজলে নিস্তব্ধ নিশাকাল সে দিন সিক্ত হইয়া উঠিল। সেই দিন সেই হৃদয় বেদনার মধ্যে, অশ্রুজলের মধ্যে গুহা তাহার জীবন কাহিনী শুনিতে পাইল। যাহা শুনিল তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই।

কনক সেন নব-কোটের (আধুনিক লাহোর) সূর্য্যবংশোদ্ভব এক রাজপুরুষ। তিনি কোন কারণে লাহোর হইতে সৌরাষ্ট্রে আগমন করিয়া এখানকার প্রমর বংশীয় এক রাজার রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক এইখানে বীরনগর রাজধানী স্থাপন করেন। ইহাঁর প্রপৌত্র-পুত্র বিজয় সেনের রাজ্যকালে কনক সেনের এই স্থাপিত রাজ্য আরো বিস্তৃতি লাভ

করে। বিজয় সেন সমগ্র বিদর্ভ অধিকার করিয়া বিজয়পুর (বিজাপুর) বল্লভিপুর প্রভৃতি কয়েকটি নূতন রাজধানী স্থাপিত করেন। শেষে বীরনগরের পরিবর্ত্তে বল্লভিপুরই সূর্য্যবংশী রাজাদিগের রাজধানী হইয়া উঠে।

কমলাবতীর পিত্রালয় বীরনগর। তাঁহার পিতৃবংশ সূর্য্যবংশী রাজাদিগের কুলপুরোহিত ছিলেন।

সৌরাষ্ট্রের শেষ রাজা শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী কমলাবতীকে বড় ভাল বাসিতেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ব্বে কমলাবতী পিত্রালয়ে শেষ বাস সময়ে যখন মহিষীর সহিত দেখা করিতে যান তখন মহিষী অন্তঃস্বত্বা। তিনি তখন তাঁহার ভাবী পুত্রের মঙ্গলকামনায় পিত্রালয় অম্বর রাজধানী চন্দ্রাবতীতে অম্বাভবাণীর পূজা দিতে গমন করিতেছিলেন, তিনি কমলাবতীকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন, কমলাবতীর তখন শ্বশুরালয় ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়াছিল, রাণী বলিলেন অম্বর হইতে ফিরিবার সময় পথ হইতে তাহাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইবেন।

চন্দ্রাবতী গিয়া রাণীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, দেবী তাঁহার ভাবী পুত্রকে শুভ বর প্রদান করিলেন, মহিষী হৃষ্ট চিত্তে অল্প দিনের মধ্যেই আবার শ্বশুরালয়মুখী হইলেন।

বল্লভিপুর হইতে চন্দ্রাবতীর পথে মলয় পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়, একদিন বিকালে পাহাড়ের একস্থানে শিবিকা রাত্রের জন্য থামিয়াছে—পরদিন কমলাবতীর পথ ও পুষ্পবতীর পথ ভিন্ন হইয়া যাইবে, তাঁহারা সুখের দুঃখের নানা কথা কহিতে কহিতে শেষদিন পাহাড়ে একসঙ্গে বেড়াইতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লোক আসিতেছিল হুকুম পাইয়া তাহারা শিবিরে ফিরিয়া গেল, তাঁহারা দুই জনে একাকী শিবির ছাড়াইয়া খানিকটা দূরে আসিয়া পড়িলেন,—নিকটেই গাছ পালার মধ্যে একটা ভগ্ন মন্দির দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, মহিষী মন্দির দেখিলেই পুত্রের মঙ্গল কামনায় দেবতা উদ্দেশে সেখানে প্রণত হইতেন।

এই জরাজীর্ণ, অশ্বত্থশিকড় প্রবিষ্ট ভগ্ন মন্দিরের গুহা মাত্র অবশিষ্ট ছিল; এই গুহা প্রবেশ কালে তাঁহারা গুহার অপর পার্শ্বে ভগ্ন প্রাচীরের পর পারে কয়েক জন লোকের মস্তক দেখিতে পাইলেন, তাহাদের লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলেন, প্রণাম করিয়া মহিষী যখন বাহিরে আসিবেন হঠাৎ তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল,—অপর পার্শ্বের লোকদিগের কি কথা তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল, তিনি সেই খানে মন্দিরের অশ্বত্থমূলে মাথা ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন, কমলাবতীকে আস্তে আস্তে বলিলেন "উহারা কি বলিতেছে শোন দেখি" কমলাবতীও তাহাদের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন, তিনি কম্পিতচরণে মন্দির ঘুরিয়া তাহাদের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? মহারাজ শিলাদিত্যের কথা কি বলিতেছিলে" তাহারা যখন বুঝিল রমণী বীরনগরের লোক

তখন তাঁহার কাছে কিছুই লুকাইল না, কিন্তু যাহা বলিল তাহা তাঁহার বক্ষ ভেদ করিয়া গেল—শুনিলেন তাতাররা দেশ আক্রমণ করিয়া শিলাদিত্যকে বধ করিয়াছে, সৌরাষ্ট্র এখন তাহাদের, মহিষীগণ অগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন, দেশের লোক পলায়নে প্রাণরক্ষা করিতেছে"।

অবসন্ন কমলাবতী প্রাণ পণে গাছে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন, শোকাপন্না মহিষীকে রক্ষা করিতে হইবে—এই চিন্তামাত্র তাঁহাকে আসন্ন মূর্চ্ছার হাত হইতে রক্ষা করিল—এই বলে বলীয়ান হইয়া তাহার ঘূর্ণ্যমান মস্তক প্রাণপণে উন্নত রাখিয়া আকুল স্বরে বলিলেন "মহারাজ পরাজিত হইয়াছেন তাঁহার সপ্তাশ্ব" উত্তর হইল "মহারাজের মন্ত্র নিষ্ফল হইয়াছে। তাঁহার আহ্বায় সপ্তাশ্ব উঠিল না ; শত্রুরা সূর্য্যকুণ্ডে গোপনে গোরক্ত ঢালিয়াছিল।"

কথিত আছে, কোন দেববরে বল্লভিপুরের দুর্গ মধ্যে এই কুণ্ডের উৎপত্তি হয়,—বর এই, বিপন্ন রাজা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিলেই সূর্য্যদেব সপ্তাশ্ব রথে এই কুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া শত্রুকূল ধ্বংশ করিবেন, কিন্তু যে দিন একবিন্দু গোরক্ত এই কুণ্ডে পতিত হইবে সেই দিন মন্ত্র ব্যর্থ হইবে।

কমলাবতী সেখান হইতে যখন রাণীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন রাণী সংজ্ঞাহীন, তিনি যে সমস্ত কথাই শুনিয়াছেন কমলাবতী বুঝিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে সেই গুহাতেই রাণীর সন্তান জন্মিল, নব শিশুকে কমলাদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন, পর্ব্বতেই তাঁহার অগ্নিকার্য্য সমাধা হইল।

সত্যবতীর কথা শেষ হইলে বড় বড় দুই ফোটা জল গুহার কপোল বাহিয়া মাটীতে পড়িল, গুহা বলিল 'দিদি এ কথা তবে এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলি কেন!"

সত্যবতী বলিল "মৃত্যুকালে তোমার মা আমার মাকে দুই একটি অনুরোধ করিয়া যান প্রধান এই, যেন কোন ক্ষত্রিয়ানীর সহিত তোমার বিবাহ হয়, আর তোমার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তোমাকে যেন ব্রাহ্মণ রূপে প্রতিপালন করা হয়। তোমার সামর্থ্য জন্মিবার আগে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিলে শত্রু কর্ত্তৃক পাছে তোমার কোন অনিষ্ট হয়—বোধ করি এই আশঙ্কায় মহিষী এই অনুরোধ করিয়া থাকিবেন। আমাকে পর্য্যন্ত মা এতদিন ইহা বলেন নাই, এবার এখানে আসিয়া মাত্র আমি এ কথা জানিয়াছি।"

দিদি এবার আসিয়া পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে কেন যে এমন বিষণ্ণ হইয়া পড়িত—হাসিতে হাসিতে সহসা কেন তাহার হাসি শুকাইয়া যাইত, খেলা করিতে করিতে কেন অবসন্ন হইয়া ঘরে চলিয়া যাইত, আদর করিতে করিতে মাঝখানে কেন সে থামিয়া পড়িত—গুহা এখন তাহার কারণ বুঝিল। খানিকক্ষণ পরে বলিল "যদি এ কথা আর কেহ জানে না তবে ভীলপুত্র জানিল কি করিয়া?"

সত্যবতী বলিল "তোমাদের বংশের একটি কুলাচার এই, প্রথম অস্ত্র শিক্ষাকালে একজন রাজপুরুষ স্বহস্তে কুমারের কটিদেশে অসি বন্ধন করিয়া দেন, তাহা ধারণ

করিয়া তখন তাহার অস্ত্র শিক্ষায় অধিকার জন্মে। তোমার অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমে এই নিয়ম রক্ষা করিতে মহিষী মাকে বলিয়া যান। তাঁহার এই কথা পালন করিবার জন্য তোমার জন্মের কথা ভীলরাজকে মায়ের জানাইতে হয়,—কেননা ভীলরাজদিগের পবিত্র অভিষেক অস্ত্র রাজপুরুষের অঙ্গ ছাড়া সাধারণ অঙ্গ স্পর্শ করে না। তোমার ত্রয়োদশ বৎসর না গত হইলে এ কথা কাহাকে তিনি বলিবেন না প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন,—এখন সময় পূর্ণ হইয়াছে—তাই এ কথা তাঁহার পুত্রকে বলিয়া থাকিবেন—"

গুহা চুপ করিয়া রহিল—বুঝিল ভীলপুত্র দোষী নহে সে নিজেই দোষী।

১২

আঁধার সন্ধ্যা, আকাশে চন্দ্র নাই, গাছ পালায় ঢাকাঢোকা ক্ষুদ্র ভীলগ্রাম কাল একটা ছায়া মণ্ডলীর মধ্যে লুকাইয়া পড়িয়াছে, অদূরে ঈষদুচ্চ শিখর প্রদেশে বসিয়া ভীলপুত্র সেই ছায়ার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তাহার আগ্রহপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিধার অন্ধকারের আবরণ যেন ভেদ করিয়া ফেলিয়া ভীলগ্রামের প্রত্যেক কুটীরগুলি প্রত্যেক গাছটি পর্য্যন্ত ভীলপুত্রের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

গ্রামের মধ্যস্থলে- বড় রাস্তার সম্মুখে, তরুশ্রেণীর মধ্যে তাহাদের পাতায় ছাওয়া কুটীরখানি; এতক্ষণ কুটীরে আলো জ্বলিয়াছে, এতক্ষণ তাহার সঙ্গীরা সারাদিনের আমোদ আহ্লাদের পর শ্রান্তস্বরে গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিতেছে, পথিমধ্যে তাহাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়া একবার করিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে, উত্তর না পাইয়া হয়ত বা তাহার মায়ের কাছে গিয়া তাহার খোঁজ লইয়া যাইতেছে। মা এতক্ষণ গৃহের কাজকর্ম্ম সারিয়া তাহার বোনটির চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন, অন্য ছেলেরা ভূতের গল্প শুনিবার জন্য তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে, মাদলা মায়ের আঁচলটা ধরিয়া টানিতেছে, ভুল্লু বোনের বিনুনিটা ধরিয়াই নাড়িয়া দিতেছে, ছোটীয়া খেলা করিতে করিতে 'বলনা বলনা' করিয়া আচমকা মায়ের পিঠের উপর আসিয়া পড়িতেছে,—বোন খাপা হইয়া উঠিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের মারিতে হাত উঠাইয়াছে। বাবা এই গোলমাল হইতে দূরে অস্ত্রশালার রোয়াকে বসিয়া এতক্ষণ অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করিয়া তুলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ভীলপুত্র আজ গৃহে নাই, তিনি একাকী, সে থাকিলে সে তাঁহার সহায়তা করিত! গৃহের এ সময়ের খুঁটিনাটি ব্যাপার—খুটিনাটি ছবি তাহার মনে পড়িতে লাগিল—একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার মর্ম্মস্থল হইতে উথলিত হইল, সে দুই হাঁটুর উপর বাহুর মধ্যে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিল। অনেকক্ষণ পরে যখন আবার চোখ খুলিয়া মুখ তুলিল তখন আর সন্ধ্যা নাই, তখন নূতন তারকা রাশিতে আকাশ ছাইয়া পড়িয়াছে, তখন দ্বিপ্রহরের অন্ধকারের বুকে একটা গম্ভীর আলোক জ্বল জ্বল করিয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতি স্তব্ধ গম্ভীর ঘুমন্ত, ভীলগ্রামের অস্পষ্ট কোলাহলও তখন আর এই নিভৃত প্রদেশকে তরঙ্গায়িত করিতেছে না। এই স্তব্ধ ঘুমন্ত নিশীথে দু একটা

পেচক ও বাদুড় পক্ষী কেবল তাহাদের চীৎকার কোলাহল ও অশান্তি জাগরণ লইয়া ভীল-পুত্রের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল—আর ভীলপুত্র তাহার অশ্রুজল ও মর্ম্মবেদনা লইয়া এখনো জাগিয়া বসিয়া। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপ যেমন জ্বলিয়া উঠে তাহার এ জাগিরণ বুঝি সেইরূপ অনন্ত ঘুমের পূর্ব্ব জাগরণ !

ভীলপুত্র সাশ্রুনয়নে আবার ভীলগ্রামের দিকে চাহিল—একটা অদম্য বাসনায় সে আকুল হইয়া পড়িল—এখন বাড়ীর সকলে নিদ্রিত,—এখন একবার তাঁহাদের সে কি দেখিয়া আসিতে পারে না ? তাঁহারা ত তাহা জানিতেও পারিবেন না। ভীলপুত্র শিখর-দেশ হইতে নামিয়া তাহার পাদদেশে বিচরণ করিতে লাগিল, হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া দেখিল গৃহের প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যেন সে কি একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে—থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক ভয়ে ভয়ে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, কিন্তু সম্মুখেই জল. তখন আর পিপাসা থামাইবার সাধ্য নাই. অতি সন্তর্পণে গৃহের নিকট আসিয়া ঝাঁপে হাত দিল, আস্তে টানিবা মাত্র ঝাঁপ খুলিয়া আসিল, বুঝিল তাহার জন্য এখনো ঝাঁপ বন্দ হয় নাই। তখন পা টিপিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিস্তেজ দীপের আলোকে চারিদিক চাহিয়া দেখিল—মা ছোট ছেলেদের লইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন, কিন্তু পিতা সেখানে নাই। নিরাশ হৃদয়ে, শয্যা পার্শ্বে আসিয়া—উথলিত আবেগ বহুকষ্টে চাপিয়া নিস্তব্ধে মাকে প্রণাম করিয়া তাহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ বড় স্নেহের ঘুমন্ত ভাইটির মুখ চুম্বন করিল. অমনি দুই বিন্দু অশ্রু তাহার গাল বহিয়া শিশুর গালে পড়িল, —ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হঠাৎ শিশু সশব্দে হাসিয়া উঠিল, জানিনা সে অশ্রুস্পর্শে শিশু হৃদয়ে কি স্বপ্ন জাগিয়া উঠিল। অন্য সময় হইলে ভীলপুত্র কত না আহ্লাদে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিত, আজ সে হাসি শুনিয়া সে ভীত হইল, ঘরে দাঁড়াইতে আর তাহার সাহস হইল না—ধীরে ধীরে দ্বারাভিমুখে সে পদ নিক্ষেপ করিল, এই সময় তাহার মা একবার অস্ফুটস্বরে তালগাছ বলিয়া উঠিলেন—ভীলপুত্র চমকিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া পড়িল—বুঝি এইবার সে ধরা পড়ে। কিন্তু তখনি বুঝিল তাহার মা জাগিয়া ডাকেন নাই, তাহা তাঁহার ঘুমন্ত ডাক। বাহিরে আসিয়া আর সে নয়ন জল রাখিতে পারিল না—তাহার বুকফাটা নিস্তব্ধ অশ্রুজলের মধ্যে সেই কুটীর, সেই কুটীরের মধ্যে যে সব স্নেহ মমতা ফেলিয়া আসিয়াছে সেই সব ভাসিতে লাগিল, আর সে ঘরের মধ্যে যাহাকে খুঁজিয়া পায় নাই যাহাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে একবার দেখিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িল। পিতা কোথায় ? তাঁহার ঘুমন্ত মুখখানি একবার শেষ বার দেখিতে পাইবে না ? ভীলপুত্রের নয়নে অন্ধ-কার—হৃদয়ে মর্ম্ম যাতনা, সে অস্ত্রশালার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আস্তে আস্তে সেই দিকে গমন করিল, অনেক সময় মন্দালিক সেই ঘরেই শয়ন করিতেন। গৃহের প্রাঙ্গন পার হইয়া রোয়াক দিয়া অস্ত্রশালায় যাইতে হয়, ভীলপুত্র প্রাঙ্গন ছাড়াইয়া রোয়াকে আসিয়া দেখিল অস্ত্র শালার ঝাঁপও ঈষৎ খোলা, গৃহ মধ্যে একটী দীপও

মিটমিট করিতেছে. গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যেন তাহার আর সাহস হইল না, সে খোলা ঝাঁপের মধ্য দিয়া একটু খানি মুখ বাড়াইয়া ঘরে উঁকি মারিল,—তাহার মুখের ছায়া গৃহ মধ্যে পড়িল—মন্দালিক তখনো জাগিয়াছিলেন, আহ্লাদের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—“তালগাছটা বুঝি—এত্তটা দের কেন হইলু রে—”

তালগাছ চমকিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল—মন্দালিক তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন, আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—তালগাছটা কি হইল রে —”

এই উত্তর এড়াইবার জন্যই তালগাছ সমস্ত সন্ধ্যা এখানে আসে নাই। তাহার মনে ছিল পর দিন তাহাদের দুই জনের একজনের মৃতদেহই পিতাকে উত্তর দিবে. তাহার আগে একথা পিতাকে বলিতে তাহার সাহস নাই—এ কথা শুনিলে এ যুদ্ধে পিতা বাধা দিবেন এই তাহার ভয়,—ভীলপুত্র নিরুত্তর স্তব্ধ হইয়া রহিল।—[ক্রমশঃ]

স্বপ্ন।

বকুলের ডালে বসি পিউ পিউ করিয়া,
গাহিতেছে গীত মধু মন খুলে পাপিয়া।
দুপুরে নির্জন ঘর,
বায়ু বহে ঝর ঝর,
পাতাদের মর মর, লতা উঠে দুলিয়া।
ধীরে ঝরে পড়ে ফুল,
ঘুমে আঁখি ঢুল ঢুল,
শিথীল কবরী চুল পড়িয়াছে খুলিয়া,
আধ তন্দ্রা ঘুম ঘোর
স্বপনে পরাণ ভোর
মৃদুশ্বাসে হৃদি খানি উঠিতেছে কাঁপিয়া,
মলিন অধর টুটি
ধীরে হাসি উঠে ফুটি
দু বিন্দু মুকুতা অশ্রু আসে ধীরে গড়িয়া।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

Calcutta: Prin ted at the Herald Printing Works, 10 Old Post Office Street.

বিজাপুর।

ইতিহাস।

(উপসংহার।)

দ্বিতীয় ইব্রাহিম
১৫৮০—১৬২৬

আলির উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ইব্রাহিম। পিতৃব্যের মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৯ বৎসর মাত্র। তাঁহার নাবালক অবস্থায় আলির মহিষী চাঁদবিবি রাজ্যভার গ্রহণ করেন, কমাল খাঁ সচিব প্রধান, কমাল খাঁর বিদ্রোহ চেষ্টা প্রকাশিত হওয়াতে চাঁদবিবি তাঁহার প্রাণদণ্ড আদেশ করেন, তাঁহার পশ্চাৎ কিশোর খাঁ প্রধান পদে আরূঢ় হইয়া চাঁদবিবির শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন ও ছলে বলে কৌশলে রাজ্ঞীকে গ্রেপ্তার করিয়া সাতারা দুর্গে নির্ব্বাসিত করেন, মন্ত্রীকে শীঘ্রই এই অত্যাচারের ফলভোগ করিতে হইল। চাঁদবিবি স্বপক্ষীয় সৈন্য সাহায্যে বন্ধন মুক্ত হইলেন কিশোর খাঁ প্রাণভয়ে পলায়ণানন্তর গলকণ্ডায় একজন হন্তারকের হস্তে মারা পড়িলেন। অতঃপর মন্ত্রী দিলাবর খাঁ দক্ষতা ও বিজ্ঞতার সহিত কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইল, তিনি আহমদনগর ও গলকণ্ডা সুলতানদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন ও গলকণ্ডা সুলতানের ভগিনী চাঁদ সুলতানার সহিত ইব্রাহিমের বিবাহ দিয়া দিলেন. দিলাবর খাঁ ইব্রাহিম বাদসাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন না, মন্ত্রীর অধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন এবং তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন, ১৫৯৪এ তাঁহার ভ্রাতা ইস্মায়ল বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এই গোলযোগে আহমদনগর সুলতান বহ্রান নিজাম সা বিজাপুর আক্রমণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ হইল না, প্রত্যুতঃ এই যুদ্ধই তাঁহার রাজ্য নাশের মূল, যুদ্ধারম্ভের অনতিকাল পরে বহ্রানের মৃত্যু হয় তাঁহার পুনও রণক্ষেত্রে বিজাপুর সৈন্য হস্তে মারা পড়েন, আহমদনগরে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত।

চাঁদ বিবি

বহ্রান নিজাম সার মৃত্যুর পর আহমদ নগর দুই দলে বিভক্ত হয়; চাঁদ বিবি তন্মধ্যে একদলের অধিনায়িকা ছিলেন, অপর দলের দলপতি মোগল সম্রাটের শরণাপন্ন হইয়া আকবরের পুত্র যুবরাজ মোরাদকে পত্র লেখেন, মোরাদ তখন গুজরাটে ছিলেন। মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর অনেক কাল অন্বেষণ করিতেছিল, তাহারা এই সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নয়। সম্রাটের আদেশ ক্রমে মোরাদ আহমদ নগরের সম্মুখে সসৈন্য-উপনীত হইলেন, মোগল আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী চাঁদ বিবি। তিনি কবচ ধারণ পূর্ব্বক তরবার হস্তে স্বয়ং দুর্গপালদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের উৎসাহদান ও দুর্গ রক্ষণের তত্ত্বাবধারণ করিতেন, তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুর সুলতান ইব্রাহিমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; ইব্রাহিম আসিলেন বটে কিন্তু সময় মত আসিতে পারেন নাই। যখন আসিলেন তখন যুদ্ধ শেষ

হইয়া গিয়াছে, চাঁদ বিবির যত্ন ও চেষ্টায় মোগলেরা প্রথমবার অস্ত্রে তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়, যুবরাজ প্রস্তাব করিলেন যদি বহ্বার-প্রান্ত (Berar) ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। চাঁদ বিবি বিজাপুরের সাহায্যলাভে হতাশ হইয়া এই প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। এবারকার মত যেন কোন প্রকারে নিস্তার পাইলেন, কিন্তু তুইবৎসর পরে আবার যখন মোগলেরা দেশ আক্রমণ করিল তখন আর শত্রু হস্ত এড়াইতে পারিলেন না। রাজ্ঞী দেশরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল, এদিকে বাহিরের শত্রু, তাহার উপর আবার গৃহবিচ্ছেদ. উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগলদের সঙ্গে সন্ধি সাধনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় সৈন্যেরা ক্ষেপিয়া উঠিল, একজন বিদ্রোহী সৈনিকের খড়্গাঘাতে রাণী প্রাণ হারাইলেন ; তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহমদনগর শত্রুহস্তে নিপতিত হইল। চাঁদ বিবি ভারতবীরনারীদের মধ্যে একটী রত্ন ; দাক্ষিণাত্যে তাঁহার নাম ও যশ চিরস্মরণীয়।

দ্বিতীয় ইব্রাহিম শিল্পবিদ্যা বিশারদ সুশিক্ষিত সুযোগ্য নরপতি ছিলেন, মহারাষ্ট্রী ও পারস্য ভাষা মিশ্রিত ব্রজভাষা সদৃশ ভাষার রচয়িতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। জগদ্‌গুরু তাঁহার আখ্যা—লোকে তাঁহাকে ইব্রাহিম জগদ্‌গুরু বলিয়া জানে। গুরুচরিত্র নামক গ্রন্থে আছে যে ইনি পূর্ব্বজন্মে দত্তাত্রয় দেবের একজন অনুগত ভক্ত ছিলেন, দেবতার প্রসাদে নৃপকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্রাহিমের রাজত্বকালে দত্তাত্রয়ের (নরসোবা) মন্দির নির্ম্মিত হয় ও কথিত আছে ইব্রাহিম এই মন্দিরে গিয়া পূজা করিতেন। বিজাপুর-মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে তিনি ইমাম পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যরূপে হিন্দধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার সময়কার কোন কোন প্রকাশ্য দলিলের উপর "শ্রীসরস্বতী প্রসন্ন" শিরোনামা দৃষ্ট হয়। ইব্রাহিমের মৃত্যুকালে বিজাপুরের পূর্ণ সৌভাগ্যের অবস্থা—রাজভাণ্ডার পূর্ণ—প্রজাগণ সুখসমৃদ্ধি সম্পন্ন—২ লক্ষ পদাতিক ৮০০০০ অশ্বারোহী সৈন্যবল।

মাহমুদ ১৬২৬—১৬৫৬ } ইব্রাহিমের পর মাহমুদ আদিল সা। মাহমুদের রাজত্বকাল ৩০ বৎসর। ইনি যদিও যুদ্ধে অনুরক্ত ছিলেন না তথাপি রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাপী সরোবর জলপ্রণালী সমস্ত রচিত হইয়া সহরের জলসৌকর্য্য সম্পাদিত হয়। জুম্মা মসজিদের সুবর্ণ রঞ্জিত ভজনালয় তাঁহার রচিত। বিপুল কাষ্ঠস্তম্ভাবলম্বিত উচ্চছাদ, চিত্রিতপ্রকোষ্ঠ সমন্বিত আসারমহল তাঁহারি কীর্ত্তিস্তম্ভ। আর বিজাপুরের বিশেষ ভূষণাস্পদ যে গোলগুম্বজ তাহা তাঁহারি সুযোগ্য সমাধি মন্দির।

মাহমুদের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রী বীর শিবাজী আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা সাহাজী

শিবাজী } বিজাপুর সুলতানের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। পিতার সর্ব্ববাদী সম্মত রাজভক্তির আড়ালে ও মাতার উৎসাহ বা ক্যতলে তিনি

এক একটী করিয়া পাহাড় দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ রাজ্যের পত্তন করিলেন। লোকে ভাবে যেন তিনি বিজাপুর রাজার হইয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার নিগূঢ় অভিসন্ধি কেহ সন্দেহ করিতে না করিতেই তিনি বিস্তৃত প্রদেশ আত্মবশ করিয়া লইলেন। ১৬৪৬এ পুণার নিকটবর্ত্তী তোরণা দুর্গ অধিকার ও তন্নিহিত গুপ্তধন আবিষ্কার করিয়া অবধি তিনি বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কোকণস্থ কল্যাণ হইতে বিজাপুরে রাজস্ব লইয়া এক দল লোক আসিতেছিল শিবাজী সে ধন লুণ্ঠন করিয়া লন ও ক্রমে অন্যান্য দুর্গ দখল করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন, এই সকল কাণ্ড দেখিয়া রাজা তাঁহাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া স্থির করিলেন। সাহাজী তখন কর্ণাটকে— তাঁহাকে বিজাপুরে আনাইয়া জেলখানায় বদ্ধ করা হইল ও বলা হইল যে তাঁহার পুত্র যত দিন ধরা না দেন তত দিন তাঁহার মুক্তিলাভ নাই, শিবাজী মোগল সম্রাট সাজিহানের নিকট আবেদন করিয়া অনেক কষ্টে পিতার মুক্তি সাধনে কৃতকার্য্য হয়েন ও আবার পূর্ব্ববৎ লুট পাটে রাজ্য বৃদ্ধি করিবার সন্ধি লাভ করেন।

দ্বিতীয় আলি ১৬৫৬—১৬৭২ } মাহমুদের রাজত্বকালে শিবাজীর এই কাণ্ড,—দ্বিতীয় আলি আদিল সার সময়ে তাঁহার দৌরাত্ম্য ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মোগল ও মহারাষ্ট্রীদের উপদ্রবে বিজাপুরের মুহূর্ত্তের তরে সুস্থির হওয়া দুষ্কর। ১৬৫৭ অব্দের পূর্ব্বে শিবাজী বিজাপুরের অধীনস্থ অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন ও মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজীবের নিকট হইতে সনদ আনাইয়া আপন অধিকার বৈধ ও কায়ম করিয়া লন। পরিশেষে শিবাজীকে দমন করিবার ভার বিজাপুর সেনাপতি আফজুল খাঁর হস্তে সংন্যস্ত হয়।

আফজুল খাঁ। } আফজুল খাঁর যুদ্ধ যাত্রার পরিণাম জানাই আছে, তিনি শিবাজীর বিরুদ্ধে ৭০০০ পদাতিক ৫০০০ ঘোড়সওয়ার কামান অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মহা আড়ম্বরে কূচ করত মহাবলেশ্বর পাহাড়ের ক্রোড়ে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। শিবাজী দেখাইলেন যেন তিনি প্রাণভয়ে সেনাপতির হস্তে আত্ম সমর্পণে প্রস্তুত, প্রতাপগড়ে তাহাদের সাক্ষাৎকার সাব্যস্ত হইল। শিবাজীর অনুরোধ এই যে তাঁহাদের সম্মিলনে অন্য লোক জন উপস্থিত না থাকে। নবাব সাহেব তাহাতেই সম্মত হইয়া সৈন্য সামন্ত পাহাড়ের নীচে রাখিয়া একটী মাত্র সহচর সঙ্গে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। শিবাজীকে ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে পদার্পণ করিতে দেখিয়া নবাব সাহেব তাহাকে আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর হাতে বাঘনখ প্রচ্ছন্ন ছিল কোলাকুলির সময় সেই গুপ্তাস্ত্রে তিনি আফজুলের বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাশায়ী করেন ও ভবানী খড়্গাঘাতে কর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলেন। এ দিকে তাঁহার সৈন্যগণ ঝোপ ঝাপ অন্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নবাব সৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদের ছারখার করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ ছলে বলে কার্য্যোদ্ধার করিয়া শিবাজী মহারাষ্ট্র রাজ্যের মূল পত্তন

করিলেন। তাঁহার যশের রব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। ইহার পরেও বিজাপুরের সহিত তাঁহার অনেক যুদ্ধ হয় কিন্তু যুদ্ধে হারাইয়াও তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। এক স্থানে পরাভূত হইয়া অপর স্থানে ফুঁড়িয়া উঠিয়া পূর্ব্ববৎ উপদ্রব আচরণ করিতে থাকেন। ১৬৬২ পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল, অবশেষে বিজাপুর রাজা হার মানিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। শিবাজী যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই হইল। সে রাজ্যের আয়তন কল্যাণ হইতে সাহাপুর পর্য্যন্ত সমুদায় কোঙ্কণ তীর ও ভীমা হইতে বর্ম্মা নদী পর্য্যন্ত ১১০ মাইল দীর্ঘ ১০০ মাইল প্রস্ত মহাদ্রিখণ্ড। শুদ্ধ তাহা নহে শেষে এমন হইল যে শিবাজীর বর্গীনিষ্পীড়িত চৌথাই কর হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বিজাপুর তাঁহাকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা ঘুস দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মহারাষ্ট্রীদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও বিজাপুরের শান্তি নাই। ১৬৬৫ তে সম্রাট ঔরঙ্গজীব বিজাপুর বিজয় মানসে রাজা জয়সিংহকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন। আলি যদিও এই মোগল আক্রমণ অনেক কষ্টে প্রতিরোধ করিলেন কিন্তু দেখিলেন দুর্দ্দান্ত দুর্দ্ধর্ষ মোগলদের হস্ত হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা সুকঠিন, দু বৎসর পরে মোগল সম্রাটের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয় তাহাতে তিনি বিজাপুর রাজ্যের অনেক ভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন, ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া ভীমানদী রাজ্যের উত্তর সীমা নিরূপিত হইল। ১৬৭২ অব্দে ১৬ বৎসরের বিচিত্র ঘটনা-পূর্ণ রাজত্বের পর দ্বিতীয় আলি আদিল সা ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

সেকন্দর আদিল সা ১৬৭২—১৬৮৬ } আলির মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র সেকন্দরের বয়স ৫ বৎসর। সেকন্দর আদিল সা বিজাপুরের শেষ সুলতান, ইহাঁর রাজত্ব কালে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজীব বিজাপুর আক্রমণ করেন।

ঔরঙ্গজীব ১৬৮৩ } অনেক দিন হইতে বিজাপুর বিজয়ে তাঁহার সাধ—যদিও এ পর্য্যন্ত তাঁহার আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই তাঁহার সেনাপতিগণ বার-ম্বার বিফলপ্রযত্নে বিজাপুরের দ্বার হইতে শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন তথাপি সে চিরপোষিত রাজ্যলোভ নিরস্ত হইবার নহে। ১৬৮৩ তে তিনি দক্ষিণ-বিজয় উদ্দেশে অসীম সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—সেই যে দিল্লী ছাড়িলেন আর ফিরিবার অবকাশ পাইলেন না! তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬৩ বৎসর—তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ পথে পথে তাম্বুতে তাম্বুতে অতিবাহিত হইল। অনেক যুদ্ধে তিনি দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য সকল জয় করিলেন বটে কিন্তু মহারাষ্ট্রীদের দমন চেষ্টায় তাহার সমস্ত বল হানি সমস্ত আয়ুঃক্ষয় হইল। পরিশেষে প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে উনশতার্দ্ধ বৎসর রাজত্বের পর অশেষ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার কি শোচনীয় অবস্থা! অতীতের দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর। ভবিষ্যৎ ও সকলি নিরাশা অন্ধকার ময়। পুত্রেরা বিদ্রোহী—উৎপীড়িত হিন্দু রাজাগণ প্রতিপীড়নে

সমুদ্যত। তিনি যদি দক্ষিণ সুলতানের সহিত মিলিয়া মহারাষ্ট্রীদের দমনে সচেষ্ট হইতেন তাহা হইলে হয়ত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কিন্তু দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য সকল গ্রাস করিয়া সে পথ বন্ধ করিলেন। তিনি স্বহস্তে প্রলয়ের বীজ বপন করিয়া গেলেন—অল্প কাল মধ্যেই তাঁহার রচিত প্রকাণ্ড রাজ্য ভগ্ন চূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইল।

ঔরঙ্গজীবের ক্যাম্প } ১৭৯৫এ কাবেরি নামক ইতালিয়ন পরিব্রাজক ঔরঙ্গজীবের ক্যাম্প দেখিতে যান তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে মোগল সম্রাটের চালচলন ও যুদ্ধ প্রবাসের কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাবেরী রাজদরবারে সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঔরঙ্গজীব কৃশাঙ্গ, খর্ব্বকায়, বৃহন্নাসা ও বয়োভারে অবনত—শুভ্রবেশ পরিহিত—মস্তকে মুক্তা জড়িত জরির পাগড়ী। তাঁহার শ্যাম মুখে শুভ্রদাড়ী ফুটিয়া উঠিয়াছে, দরবার তাম্বুর মধ্যে সুরঞ্জিত উচ্চ সিংহাসন—চারিকোণে চারিটি রজত স্তম্ভ—উঠিবার একটি রজত পাদপীঠ—সম্রাট এই সিংহাসনে উপবিষ্ট—আমীর সভাসদেরা তাঁহার আগে আগে চলিয়াছে—দুই জন ভৃত্য চামর ব্যজন করিতেছে একজন ছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। ঔরঙ্গজীব সহাস্যবদনে নিজ হস্তে প্রজাদের আর্জী সকল গ্রহণ করিতেছেন—বিনা চসমায় পাঠ করিয়া আপন হাতে হুকুম লিখিতেছেন, কাবেরি বলেন সম্রাটের সঙ্গে সৈন্যবল দশ লক্ষ পদাতিক—অশ্ব ৬০০০০—মাল বহনের জন্য ৫০০০০ উষ্ট্র আর হস্তী ৩০০০, সেনা নিবাস ৩০ মাইল বিস্তৃত। এতদ্ভিন্ন ব্যাপারী দোকানদার কারিগর কর্ম্মচারী প্রভৃতি লোক মিলিয়া জনসংখ্যা সর্ব্ব শুদ্ধ ৫০ লক্ষ হইবে। নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য সকল প্রকার সামগ্রী সমাকীর্ণ সম্রাটের ক্যাম্প এক প্রকাণ্ড জঙ্গম পুরী বলিলেই হয়। হাট বাজার দোকানে ছয়লাপ। আপন আপন অনুচর বর্গের জন্য প্রত্যেক ওমরার আলাদা আলাদা হাট বাজার, সম্রাট ও রাজাদের তাম্বু প্রায় ৩ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ও বিহিত উপায়ে সুরক্ষিত, তীর ধনুক বর্ষা তরবার পিস্তল বন্দুক—গুরু ও লঘু কামান এই সকল অস্ত্রশস্ত্র। গুরু কামানের উপর পোর্তুগীস ইংরাজ ওলন্দাজ জর্ম্মণ ফরাসিস প্রভৃতি ইউরোপীয় অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত। বিদেশীগণ একবার মোগলের চাকরী গ্রহণ করিলে আর ছাড়িবার পথ পায় না—পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

এই এক দৃশ্য আর মহারাষ্ট্রী সেনাদের ধরণ দেখ। সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সেনা তাহাদের কোন নিয়ম নাই বন্দেজ নাই—পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে হয়ত কোন বিজন প্রদেশে সম্মিলিত। সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ খোরাক—ঘোড়ার জিনের উপর এক একটি কম্বল মাত্র সম্বল, আর লুটের মাল ভরিবার জন্য এক একটি থলি। রাত্রে কোথাও বিশ্রাম করিতে হইলে ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরিয়াই নিদ্রিত—দিবসে গাছতলায় কিম্বা কম্বলের আড়ালেই তাহার যথেষ্ট বিশ্রাম—রৌদ্রের উত্তাপে ভ্রূক্ষেপ নাই, কোমরে তরবার বাঁধা ও অশ্বের সামনে ভূনিখাত এক একটী বল্লম। এই সব সামান্য সরঞ্জাম লইয়া মহারাষ্ট্রী বীরেরা যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইতেন মোগলদের অচল দলবল কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া

উঠিত না। অনেক বৎসর যুদ্ধ সংগ্রামের পর মোগল সম্রাট আপনার ক্যাম্পেই বন্দী হইয়া পড়িলেন, মহারাষ্ট্রী সেনাগণ মুমূর্ষু সম্রাটের চতুর্দ্দিকে বীরদর্পে নৃত্য করিতে করিতে মোগলদের নাজেহাল পিশেহাল করিয়া তুলিল।

বিজাপুর বিজয় এই সব উড় উড় কথার পর এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাক্! ১৬৮৯এ রাজকুমার আজম সোলাপুর আক্রমণ করিয়া বিজাপুর বিজয় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। সোলাপুর হস্তগত হইলে তিনি বিজাপুরের উপর গিয়া পড়েন কিন্তু সে আক্রমণে বিলক্ষণ বাধা পড়িল, মোগলদের আগমনে বিজাপুরের লোকেরা বিবাদ কলহ দলাদলি ভুলিয়া ঐক্য বন্ধনে মিলিত হইল, বিজাপুর সৈন্যের প্রতিঘাতে মোগলেরা বিপদগ্রস্ত হইয়া ভীমার উত্তরে হটিয়া গেল। বর্ষশেষে আজম পুনর্ব্বার সৈন্যসহ প্রত্যাগত হইলেন, এবার বিজাপুর সেনারা আর এক কৌশল অবলম্বন করিল, তাহারা সীমান্তে মোগলদের প্রতিরোধ না করিয়া রাজধানী মধ্যেই বলসঞ্চিত রাখিয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল. এইরূপ আচরণের সুফল আপনা হইতেই ফলিল। বিজাপুরের উত্তর অঞ্চল ধান্য শস্য জলের অভাব—অতবড় মোগল সৈন্যের আহার যোগান বিষম দায়। সোলাপুর হইতে তাহাদের সকল আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইত—এ দিকে বিজাপুরের অশ্বারোহী দল অন্নবাহক লোকদের কাটিয়া ফেলে—মহা উৎপাত! অবশেষে আহমদ নগর হইতে অনেক কষ্টে এক বোঝাই ধান্য আমদানী হওয়ায় মোগল সৈন্য রক্ষা পায়, ইত্যবসরে সম্রাট স্বয়ং রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন হাইদ্রাবাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন তাহা কোনমতে তালি-তুলি দিয়া শেষ করিয়া সসৈন্য যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন, আসিয়া দেখেন তাঁহার পুত্র আজমের সৈন্য বিজাপুর এক প্রকার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে—সে সৈন্যের যে সমস্ত অভাব ছিল তাঁহার আগমনে তাহা দূর হইল। সহরের দক্ষিণে প্রাচীর ভেদযোগ্য কামানসজ্জা প্রস্তুত হইল ও তাহার বলপ্রয়োগে প্রাচীর স্থানে স্থানে শীঘ্রই ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন সম্মুখ যুদ্ধের প্রয়োজন নাই—ভিতরে অন্ন কষ্টেই কার্য্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা, "সবুরে মেওয়া ফলে" এই বাক্য স্মরণ করত পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনোরথ অবিলম্বে সিদ্ধ হইল। যেমন অন্নাভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল বাধা দিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে কমিয়া আসিল, ১৬৮৬, ১৫ অক্টোবরে নগরপালেরা হার মানিয়া সম্রাটের চরণে আত্ম সমর্পণ করিল। ঔরঙ্গজীব তাঁহার আমীর উমরা প্রধান প্রধান সৈনিক সহচরে পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে বিজিত বিজাপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রজাবর্গের বিলাপ ধ্বনির মধ্যে আর্ককেল্লার গগন মহলে উপনীত হইয়া প্রধান প্রধান সরদারদের নজরানা গ্রহণ করিলেন। অভাগা সেকন্দর বিজিত রাজার ন্যায় সম্মানিত হওয়া দূরে থাকুক বন্দীকৃত বিদ্রোহীর ন্যায় রজত শৃঙ্খলে সম্রাটের সমক্ষে আনীত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে বসিবার আসন ও অভয় বচনে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার ১ লক্ষ টাকা বার্ষিকী

বাঁধিয়া দিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে সেকন্দর লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার ইচ্ছা-মতে সহরের উত্তর পূর্ব্বে আপন গুরুর গোরের সন্নিকট এক সামান্য গোরস্থানে তাঁহার সমাধি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, জীবদ্দশার অনুরূপই তাঁহার চরমগতি। তাঁহার প্রবল প্রতাপ পূর্ব্ব পুরুষদের সমুন্নত সমাধি মন্দির সকল আজও সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়-মান আর আদিল সাহী বংশের শেষ রাজা হতভাগ্য সেকন্দরের মৃতদেহোপরি অন্ত্যেষ্টির চিহ্ন স্বরূপ একটী প্রস্তর খণ্ডও দৃষ্ট হয় না।

এই সময় হইতে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া বিজাপুরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অপনো-দিত হইল, এই যে তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল আর ফিরিল না, ঔরঙ্গজীব তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন, বিজাপুর সেনাদের আশ্রয়দান—আমীর ওমরাদের মান মর্য্যাদা রক্ষণ, ভূমি সম্পত্তি নগদ টাকা ইনামে প্রজা রঞ্জন, বসতি বিস্তা-রের উত্তেজন ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বিত হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ভাঙ্গা যেমন সহজ, গড়া তেমন সহজ নয়, স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া অবধি সহরের জীবন বিনষ্ট হইল, তাহার শ্রীসৌভাগ্য চলিয়া গেল, মানুষের অত্যাচারের উপর আবার প্রকৃতির উপদ্রব, ঔরঙ্গজীব থাকিতে থাকিতেই এমন এক ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হইল যে তাহাতে লক্ষাধিক লোক মারা পড়ে ও অনেকে সহর পরিত্যাগ করিয়া পালায়, ঔরঙ্গজীবের মহিষীও এই মড়কের গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার গোরের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, মড়ক থামিয়া গেলে সম্রাটের আদেশে জনসংখ্যা গণনা করিয়া দেখা গেল যে লোক সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১০ লাখের কিছু কম; মাহমুদ আদিলসার রাজত্ব কালে বিজাপুর ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী সাহাপুর মিলিয়া যে লোক সংখ্যা নির্ণীত হয় তদপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ ১৬ হাজার লোক কমিয়া গিয়াছে। মোগল হইতে মহারাষ্ট্রীদের হস্তে পড়িয়া বিজাপুর দিন দিন আরো অবসাদহিমে ম্লান হইতে লাগিল। মোগলদের সময় তাহার শ্রীসৌভাগ্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল বর্গীদের অত্যাচারে তাহাও ক্রমে লোপ পাইল, পেশওয়ার অধিকার গিয়া সাতারার রাজাদের আমল আরম্ভ, সাতারার শেষ রাজা সাহাজী। ১৮৪৮ এ সাহাজীর নিপুত্রিক মরণানন্তর ইংরাজেরা সাতারা আত্মসাৎ করেন সেই সঙ্গে বিজাপুরও ইংরাজ রাজ্যে মিলিত হইল।

ইংরাজ রাজ্য — এই বিখ্যাত প্রাচীন সহর এই ক্ষণে নব্য ইংরাজ মহলে পরিণত হইয়াছে, জিলার রাজধানী হইয়া বিজাপুরের শ্রী ফিরিয়াছে তাহার পাশ দিয়া লৌহ পথ মুক্ত হওয়াতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের উত্তেজন হইয়াছে, তাহার জীর্ণ ভগ্ন গৃহাবলি কতক বাসোপযোগী কতক বা সরকারী কার্য্যালয় রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে, মুসলমান রাজভবন সকল জজ কলেক্টর মাজিষ্ট্রেট পোলিষাধ্যক্ষ প্রভৃতি গবর্ণ-মেণ্ট কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ, নবাব মুস্তাফা খাঁর পান্থ শালা জেলখানায় পরিণত, গবর্ণমেণ্ট এঞ্জিনিয়রগণ গোর মসজিদ প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইমারতের উপর হস্তক্ষেপ করিতেও

কুণ্ঠিত হন নাই, বোখারা মসজিদে পোষ্ট আফিস—ঔরঙ্গজীবের ভজন গৃহে পুলিষ সিপাহিদের বাস, 'তুই বোন' গোরস্থানের এক বোন স্বয়ং এঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাসস্থান। কিন্তু এই সকল উপায়ে কি এই শবপুরীতে প্রাণ সঞ্চার হইবে? বিজাপুর কি নবজীবন পাইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব গৌরবে সমুত্থিত হইবে? সে আশা দুরাশা মাত্র, লোকদের সে জীবন্ত ভাব কোথায়? সে স্বাধীন স্ফূর্ত্তি কোথায়? এই পুরীর ভগ্ন গৃহের উপর কারিগরি মৃত দেহের ফুলসজ্জার সদৃশ বিসঙ্গত বোধ হয়, লাভের মধ্যে পি. ডব্ল্যু. ভির দৌরাত্ম্যে বিজাপুরের পুরাতনের মাধুর্য্য তিরোহিত হইয়াছে, কিছুদিন পরে সে বিজাপুর আর চেনা যাইবে না, কিন্তু আধুনিক কারিগরেরা স্বীয় কারুকার্য্যের যতই বাহার বাহির করুক না কেন কল্পনা এ সকল ছাড়িয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্ন স্তূপের উপরেই অতীতের সহিত ক্রীড়ামোদে মত্ত হয়।*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাপ্ত।

মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীমকোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহারাজা নন্দকুমার বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই গবর্ণর সাহেব সভাভঙ্গ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই দিবস আরও দুইটী কৌতুহলময় ঘটনা ঘটিয়াছিল এস্থলে তাহার উল্লেখ করার আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। নন্দকুমারের জোবানবন্দী শেষ হইয়া গেলে তিনি মন্ত্রীসভা হইতে চলিয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই বোর্ড সেক্রেটারি সাহেবকে হেষ্টিংসের বাটীতে পাঠাইয়া দেন। হেষ্টিংস্ তখন নিজ গৃহে বসিয়া, অতীত ঘটনাবলী আদ্যোপান্ত আলোচনা করিতেছিলেন। কি প্রকার কৌশল অবলম্বন করিলে তিনি এ ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষালাভ করিতে পারিবেন মনে মনে তাহারই কল্পনা করিতেছিলেন। মন্ত্রীসভা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তিনি যে বিশেষ উচিত কার্য্য করিয়াছেন—ইহাই তাহার মনের ধারণা। এই প্রকার অকস্মাৎ সভাভঙ্গ দ্বারা পাপিষ্ঠ নন্দকুমারের সম্মুখে সামান্য অপরাধীর ন্যায় বসিয়া, এক একটী প্রশ্নের উত্তর দিবার দায় হইতে যে অব্যাহতি পাইয়াছেন ইহাই তাঁহার পরম সৌভাগ্য

* Bombay Gazetter Vol. 23, *Bijapur.*
Wheeler's history of India Vol. 4 Part I.

হেষ্টিংস সাহেব এইরূপ স্থির সংকল্প করিয়া নিজ গৃহে বসিয়া উত্তেজিত মনোবৃত্তি গুলিকে প্রশমিত করিতেছিলেন। তাঁহার মনে এ প্রকার ধারণা হয় নাই যে তাঁহার অধীনস্থ মন্ত্রী সভার সভ্যগণ, পুনরায় তাহাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে গবর্ণর সাহেবের এই প্রকার উচ্ছ্বলিত কল্পনাস্রোতে সহসা বাধা পড়িল। বোর্ডের সেক্রেটারী অরিয়ল সাহেব, তাঁহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেক্রেটরী সাহেব উভয় পক্ষেরই নিমক্ খান, সুতরাং বোর্ডের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হেষ্টিংস সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। বোর্ড একখণ্ড মন্তব্য লিখিয়া, গবর্ণরের শিরোণামা দিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র মন্তব্যে লিখিত ছিল "মহারাজা নন্দকুমারের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে ও তিনি বোর্ডের সম্মতি ক্রমে অনেকক্ষণ সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। নন্দকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বোর্ডের সভাপতিত্ব করিতে আপনার আপত্তি ছিল কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন। আপনি আসিয়া পুনরায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীসভার কার্য্যারম্ভ করিলে বড়ই ভাল হয়।"

তখন রাত্রিও কিছু অধিক হইয়াছিল—হেষ্টিংস নিজেও বিশেষরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক উদ্বিগ্নতা, সেই শ্রান্তিকে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেক্রেটারির নিকট বোর্ডের পত্র পাইয়া সেই সময়ে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠিলেন। একাকী সেই রাত্রে, মন্ত্রীসভায় গমন করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক, বিপদে প্রধান সহায়, ও পরামর্শদাতা, রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রধান সহযোদ্ধা বারওয়েল সাহেবও সেই রাত্রে কলিকাতা ছাড়িয়া তাঁহার বাগানবাটিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।* বারওয়েলকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। সে রাত্রে বারওয়েলকে ডাকিয়া আনানও সহজ নহে—সুতরাং এরূপ স্থলে হেষ্টিংস একাকী সেই গভীর রাত্রে মন্ত্রীসভায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি পত্রোত্তর দিয়া সেক্রেটারি সাহেবকে বিদায় করিলেন। নিম্নে আমরা হেষ্টিংসের উত্তরটি সংনিবদ্ধ করিলাম।

---

* আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা সকলেই এক একটি করিয়া বাগানবাটী বা Villa রাখিতেন। রাজকর্ম্ম-পরিশ্রান্ত হইয়া তাঁহারা এই নির্জ্জন স্থলে বাস করিতেন। হেষ্টিংস সাহেব বর্ত্তমান হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে, পাথুরিয়া গির্জ্জার অতি সান্নিধ্যেই অবস্থান করিতেন। এই স্থানে তাঁহার প্রধান আবাস স্থান ছিল। আমরা কলিকাতার প্রাচীন রেকর্ডে দেখিতে পাই—হেষ্টিংস পদব্রজে প্রতি রবিবারে নিকটস্থ ভজনালয়ে গমন করিতেন। St. John গির্জ্জা কলিকাতার অতি প্রাচীন গির্জ্জা, মহারাজা নবকৃষ্ণ এই গির্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য জমী দান করেন। কলিকাতা কৌন্সিলের মন্ত্রীসভাও হেষ্টিংসের বাটী হইতে অধিক দূরে ছিল না। আজ কাল যে

"সেক্রেটারির মুখে শুনিলাম, আপনারা এখনও মন্ত্রণা-সভাগৃহে অবস্থান করিতেছেন জেনারেল ক্লেভারিং, ফিলিপ ফ্রান্সিস্ ও মন্সন সাহেব আমার সম্ভাষণ জানিবেন। আমি মন্ত্রীসভায় এক্ষণে উপস্থিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে বা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নানাকারণে অশক্ত। বারওয়েল সাহেব এক্ষণে কলিকাতা হইতে কিছু দূরে তাঁহার বাগান বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। এত রাত্রে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া একটী সম্পূর্ণ সভা সংগঠন করিবার সুবিধা দেখিতেছি না। এ প্রকার নানাবিধ কারণে আমি আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অশক্ত হইতেছি। কল্য রেভিনিউ বোর্ডের কার্য্য সমূহ দেখিবার জন্য একটী সভা আহূত হইবে। সেই সভায় উপস্থিত হইয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে সম্মানিত বোধ করিব। সহী "ওয়ারেণ হেষ্টিংস"

পত্র নিয়মিত সময়ে বোর্ডের হস্তে পৌঁছিল।

যদি কলিকাতার মন্ত্রীসভার সভ্যগণ একটু ধীরতার সহিত, একটু শান্তিভাবে মহারাজা নন্দকুমারের আনীত অভিযোগগুলির বিচার করিতেন ও পরে সেই প্রকার ধীরতা অবলম্বন করিয়া তদানুষঙ্গিক কার্য্যগুলি করিতেন—তাহা হইলে হেষ্টিংসের দোষগুলি অতিশয়

রাস্তাটীকে Old Court House street বলে তাহারই প্রান্তভাগে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের (লালদিঘির) সান্নিধ্যে এই মন্ত্রীসভাগৃহ ছিল। আজকাল লালদিঘীর কোণে যে স্থানে সেণ্ট আনড্রু গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—অনেকে অনুমান করেন, এই স্থানেই court house ছিল। কোর্ট হাউসের এক অংশে মন্ত্রীসভার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল ও অপরাংশে কাছারি বসিত। হেষ্টিংসের বাগানবাটী আলিপুরে ছিল, আজকালকার বেলভেডিয়ারের ঠিক পশ্চাতে, আজও যাহা Hasting's House নামে কথিত, তাহাই হেষ্টিংসের বাগানবাটী। এ কথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। বারওয়েল সাহেবের বাগানবাটী কোথায় ছিল তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। সুবিখ্যাত স্যর উইলিয়াম জোন্সের বাগান বাটী বর্ত্তমান মুচিখোলায় স্থাপিত ছিল। সেই সময়ে মুচিখোলা বা Garden Reach অতিশয় সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল। অনেক বড় বড় ইংরাজ সদাগর এখানে বাগান ও বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। স্যর উইলিয়াম, প্রতিদিন এই মুচিখোলা হইতে Court Houseএ গিয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভারতীয় শাস্ত্রালোচনার জন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত। নগরের কোলাহলে তাঁহার পাঠের ও চিন্তার ব্যাঘাত জন্মিবে বলিয়া তিনি এই বিজন আবাসে বাস করিয়া দুরূহ শাস্ত্রাদির আলোচনায় কাল কাটাইতেন। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ ইম্পি সাহেবের বাটী বর্ত্তমান চৌরঙ্গীর মিডলটন ষ্ট্রীট ও পার্ক ষ্ট্রীটের মধ্যবর্ত্তী স্থলে ছিল। ইহার মধ্যে তাঁহার স্থাপিত একটী সুদীর্ঘ Park ছিল। ইম্পির পার্ক যে স্থানে ছিল, তন্নিকটবর্ত্তী স্থান আজকাল Park Street বলিয়া কথিত হইতেছে।

পরিস্ফুট রূপে প্রমাণ হইয়া যাইত। কৌন্সিলের সভ্যগণ নন্দকুমারের জোবানবন্দীতে ও দাখিলি-দলিলাদিতে বিশেষ রূপে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন যে, হেষ্টিংস বস্তুতই অপরাধী। কিন্তু তাঁহাদের হঠকারিতায় ও অবিবেচনার দোষে বিপরীত ফল ফলিয়া উঠিল। ইহাতে নন্দকুমারের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইল না! শত্রু ও মিত্র, উভয়বিধ লোক হইতেই মহারাজা নন্দকুমারের অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। মিত্রপক্ষ ধীরতার সহিত বিবেচনা না করিয়া যাহা করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের কোন অনিষ্ট হইল না বটে কিন্তু নন্দকুমারের নিরাপদতার পথে কণ্টক পড়িল। তাঁহারা স্থির বিশ্বাসে ও শুভফল দায়ক বোধে অবশ্য সেই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন—কিন্তু ঘটনাচক্রে সে ব্যবস্থা উল্টাইয়া গেল। শত্রুপক্ষ এই সমস্ত ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে, নন্দকুমারের ধ্বংশ বাসনায় ফাঁদ পাতিতেছিল বটে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ দীর্ঘসূত্রতার সহিত। বর্ত্তমান ব্যাপারে তাহাদের চৈতন্য হইল, দীর্ঘ-সূত্রতা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা অতি দ্রুতভাবে ও ক্ষিপ্রহস্তে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। তাহাদের বিস্তীর্ণ ও দুর্ভেদ্য ফাঁদ হইতে নন্দকুমার অধিকক্ষণ দূরে থাকিতে পারিলেন না। তাহারা শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তিনি ও তাঁহার বন্ধুপক্ষ মুক্তির জন্য অশেষ চেষ্টা করিলেন—কিছুতেই কোন ফল ফলিল না। কিন্তু ইহার পরিণাম ফল হইল নন্দকুমারের শোচনীয় মৃত্যু। পাঠক ক্রমশঃ ইহার প্রমাণ পাইতে থাকিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—অবিমৃশ্যকারিতার ও অপরিণামদর্শিতার দোষে, বোর্ডের মেম্বরগণ কার্য্যস্রোত বিপরীত দিকে ফিরাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় প্রথম আসিয়াই তাঁহারা রোহিল্লা যুদ্ধের সম্বন্ধে হেষ্টিংস সাহেবের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়েও তাহারা ভবিষ্যৎ বুঝিয়া কার্য্য করেন নাই—যেরূপ তীব্রবেগে ও দৃঢ়-তার সহিত তাঁহারা প্রথমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—লোকে ভাবিয়াছিল হেষ্টিংস সাহেবের আর বুঝি এবার নিস্তার নাই। ইহাদের দ্বারাই বুঝি তাঁহার পাপের ও অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে—বিশেষতঃ যখন ইহারা ইংলণ্ড হইতে রাজকীয় সনন্দে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে সহায়তা করিবার জন্য ও তাঁহার অন্যায় ও অধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যগুলিতে বাধা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন—তখন ইহাদের ক্ষমতা যে গবর্ণর সাহেব অপেক্ষা অধিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৌন্সিলের মেম্বরগণও ঠিক এই প্রকার ভাবিতেন। ইহার সত্যাসত্য বিষয়ে এস্থলে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যক নাই কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে তাঁহাদের সমবেত-ক্ষমতা, গবর্ণরের একক ক্ষমতার অপেক্ষা যদিও বস্তুত অধিক কার্য্যকারী ছিল তথাপি তাঁহারা নিজ দোষে সমস্তই খারাব করিয়া তুলিলেন। রোহিল্লা যুদ্ধের ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবার সময় যদি তাঁহারা ধীরে সুস্থে অগ্রসর হইতেন তাহা হইলেই জয়শ্রী সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদেরই হইত; কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম করাতে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল না। নন্দকুমারের সম্বন্ধেও ব্যস্ততা প্রকাশ করায় তাঁহারা কাজ খারাব করিয়া

ফেলিলেন। অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া কিসে কি ঘটিতে পারে, না দেখিয়া তাঁহারা একটি মন্তব্য লিখিয়া গবর্ণরের নিকট পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন—ভাবিলেন ইহাতেই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সেই মন্তব্যটী সময়োপযুক্ত হয় নাই—কিঞ্চিৎ বিলম্বে ভবিষ্যৎ দেখিয়া, অগ্র পশ্চাৎ দেখিয়া মৎলব আঁটিয়া কাজ করিলেই ভাল হইত। তাঁহারা যাহা অব্যর্থ ভাবিয়া স্থির করিলেন ঘটনাবশে তাহা শক্তিবিহীন হইয়া পড়িল। কিন্তু অদৃষ্টের গতি কে রোধ করিতে সমর্থ? আমরা বাঙ্গালী, জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অদৃষ্টবাদী জাতি। তাই আমরা বলিতেছি—মহারাজা নন্দকুমারের এই প্রকার শোচনীয় পরিণাম, বিধাতার লিপি বলিয়াই তাঁহার পক্ষে যাহা ভাল তাহাও মন্দ হইয়া পড়িতে লাগিল। শুধু আমরা কেন—মহারাজা নন্দকুমার স্বয়ং এই প্রকারে অদৃষ্টকে প্রধান কার্য্যকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পাঠক ক্রমশঃ দেখিতে পাইবেন—কৌন্সিলের মেম্বরগণের ব্যগ্রতায় নন্দকুমারের ধ্বংশপথ কত শীঘ্র পরিষ্কৃত হইতেছিল।

মহারাজা নন্দকুমারের পরীক্ষা শেষ হইবার পরে, বোর্ড আর একটী মন্তব্য লিখিয়া গবর্ণর সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—"মহারাজা নন্দকুমারের ৮ই মার্চ্চ তারিখের পত্রোল্লিখিত, তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশত পাঁচ টাকা (যাহা গবর্ণর সাহেব তাঁহার ও মণি বেগমের নিকট হইতে লইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।) আমাদের মতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাপ্য। ঐ অর্থ গবর্ণর সাহেব যে অন্যায় উপায়ে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ও কোম্পানীর ধনাগারে তিনি যে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে সম্পূর্ণ রূপে বাধ্য—এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ বা মতভেদ নাই। অতএব উল্লিখিত অর্থ সমুদায় হেষ্টিংস সাহেবকে কোম্পানীর ধনাগারে কোম্পানীর ব্যবহারের জন্য প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।"

মন্তব্য লিখিয়া গবর্ণরের কাছে তৎক্ষণাৎ পাঠান হইল। সেক্রেটারি সাহেব চিঠিখানি লইয়া গেলেন। সেই পত্রের প্রত্যুত্তর আনিবার জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। এইবারে তাঁহার ক্রোধ বহ্নি সম্পূর্ণ রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ তিনি কৌন্সিলের আবদার ও উপেক্ষাগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে সহিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার আর সহ্য হইল না। তিনি এতদূর আশা করেন নাই যে কৌন্সিলের স্পর্দ্ধাবান্ দুর্ব্বৃত্ত মেম্বরেরা পুনরায় তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে সাহসী হইবে। যে মন্ত্রীসভা তাঁহার অবর্ত্তমানে, (তাঁহার বিবেচনায়) সম্পূর্ণরূপে অঙ্গহীন, যে মন্ত্রীসভায় তাঁহার প্রিয়বন্ধু বারওয়েল সাহেব উপস্থিত নাই,—যে মন্ত্রীসভার সভ্যগণ তাঁহার ন্যায় উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর দোষোদ্ঘাটন করিবার স্পর্দ্ধা রাখে, সেই অসম্পূর্ণ সভার প্রস্তাবকে বিধিসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তিনি সেক্রেটারিকে দিয়া রোষভরে বলিয়া পাঠাইলেন—"এ প্রকার অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন সভার কোন মন্তব্যই আমি প্রকৃত ও কার্য্যকারী বলিয়া বিবেচনা

করিতে পারি না। সুতরাং এই মন্তব্যযুক্ত পত্রের কোন প্রকার উত্তর দিব না।" সেক্রেটারি সাহেব সংবাদ লইয়া নিয়মিত সময়ে কৌন্সিলে পেশ করিলেন। তখন স্থিরীকৃত হইল যে, "মহারাজা নন্দকুমারের অভিযোগ সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র, ও তাঁহার জোবানবন্দী ও তৎসম্বন্ধে এই কৌন্সিলের কার্য্য বিবরণ, কোম্পানীর এটর্ণি সাহেবের নিকট পাঠান হউক। এটর্ণি সাহেব কোম্পানীর নিযুক্ত বারিষ্টারের নিকট সেই সমস্ত কাগজপত্র পাঠাইয়া দিবেন। মহারাজা নন্দকুমারের ও মণি বেগমের নিকট হইতে গবর্ণর যে সমস্ত টাকা উৎকোচ স্বরূপ লইয়াছেন, তাহা তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবার জন্য কোন প্রকারে আইনের সাহায্য লওয়া উচিত কি না ইহাই নির্দ্ধারিত করিবার জন্য, ঐ সমস্ত কাগজপত্র কোম্পানীর নিযুক্ত কাউন্সেলের মতামতের জন্য প্রেরিত হইবে।"

নিয়মিত সময়ে এই মন্তব্যের এক খণ্ড প্রতিলিপি সরকারী উকীলের নিকট উল্লিখিত উদ্দেশ্যে পাঠান হইল। এ সম্বন্ধে তিনি কি প্রকার মত দিলেন,—ভবিষ্যতে উপযুক্ত স্থলে আমরা তাহা বর্ণনা করিব।

১৭ই মার্চ্চ নিয়মিত সময়ে রেভিনিউ বোর্ডের অধিবেশন হইল। প্রধান মন্ত্রীসভার সদস্যগণের সহিত তখনকার রেবেনিউ বোর্ডের সভ্যগণের কোন বিভিন্নতা ছিল না। যাঁহারাই মন্ত্রীসভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন তাঁহারাই আবশ্যক মত রেবেনিউ বোর্ডে বসিয়া রাজস্ব সম্বন্ধীয় নানাবিধ কুটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন। মন্ত্রীসভার ন্যায় গবর্ণরও এই সভার সভাপতি ছিলেন। এই সভার অধিবেশনে সুতরাং হেষ্টিংস, জেনারেল ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিস সাহেব উপস্থিত হইলেন।

কান্তবাবুর ঔদ্ধত্য পূর্ণ ব্যবহারের বিষয় বোর্ডের সদস্যগণের কাহারও মন হইতে অপনীত হয় নাই। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবামাত্রই কান্তবাবু ও কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা আগেই উত্থাপিত হইল। জেনারেল ক্লেভারিং প্রস্তাব করিলেন—"উল্লিখিত কৃষ্ণকান্ত দাস, ও কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের সভায় কোন প্রকাশ্য কার্য্যের জন্য উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু তাহারা সেই আজ্ঞা পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করাতে আমি প্রস্তাব করিতেছি তাহাদিগকে এখনই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য পুনরায় ডাকিয়া পাঠান হউক।" হেষ্টিংস তখনই আপত্তি-জ্ঞাপক এক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিলেন "জেনারেল সাহেব কি উদ্দেশ্যে উল্লিখিত দুই ব্যক্তিকে এই স্থলে উপস্থিত করিতে বাসনা করেন—খুলিয়া বলিলে বাধিত হই।"

জেনারেল সাহেব। "উল্লিখিত দুই ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের প্রজা হইয়াও বোর্ডের আজ্ঞা অবহেলা করিতে সাহসী হইয়াছে। এইরূপ কার্য্য দ্বারা তাঁহারা বোর্ডের ক্ষমতার বিরুদ্ধাচারী হইয়া সভ্যগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক জনের সহিত গবর্ণমেন্টের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে—এ প্রকার স্থলে বোর্ডের ন্যায়ানুমোদিত ক্ষমতার বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিতে গিয়া সেই ব্যক্তি বোর্ডের সম্মানহানিজনিত গুরুতর

দোষে দোষী হইয়াছে। আমি বোর্ডের ক্ষমতা বজায় রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সেই সঙ্গে সঙ্গে অক্ষুন্ন রাখিতে বাসনা করি। এই জন্যই আমি জানিতে চাই তাহারা বস্তুত প্রকৃত পক্ষে বোর্ডের আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে কি না বা তাহা পাইয়াও তল্লিখিত আদেশ প্রতিপালনে অনাস্থা দেখিয়াছে কি না" ?

হেষ্টিংস সাহেব। "আমি বোর্ডকে বলিয়া রাখি—কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বা কান্তবাবুকে বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত করাইবার কোন কারণই আমি দেখিতে পাইতেছি না। তাহাদিগের নিকট হইতে যে সকল বিষয়ের উত্তর পাইবার জন্য জেনারেল সাহেব সমুৎসুক হইয়াছেন—তাহাদের অনুপস্থিতিতে আমি তাঁহাকে সেই সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিতেছি। বোর্ডের নামে, সমার সাহেবের হাত দিয়া যে উপস্থিত আজ্ঞাপত্র (শমন) তাহাদের নিকট পাঠান হইয়াছিল, তাহা তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে, ও তাহার যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহাও আমি দেখিয়াছি। আমিই তাহাদিগকে বোর্ডে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস এই যে, আমার ভৃত্য ও কর্ম্মচারীদিগের উপর অন্যায় ব্যবহার করাই বোর্ডের সদস্যগণের উদ্দেশ্য। তাঁহারা অন্য উপায়ে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের মনে এ প্রকার কোন অভিসন্ধি ছিল কি না—আমিই তাহা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইতেছি। বোধ হয় এ কথা তাঁহারা প্রকাশ করিয়া বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

জেনারেল সাহেব। "বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ। তাহারা এই মন্ত্রী সভার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বোর্ডের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে এই প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশের কারণ কি তাহা জানিবার জন্যই বোর্ড তাহাদিগকে তলব করিয়াছেন—তাহাদের নিকট হইতে এই বিষয়ের কৈফিয়ৎ লওয়াই বোর্ডের উদ্দেশ্য।

গবর্ণর জেনারেল। "আমি জেনারেল ক্লেভারিংকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমার কর্ম্মচারীদিগের প্রতি কোন প্রকার শারীরিক শাস্তি বিধান করিতে চাহেন কি না ? যদি তাহাদের বোর্ডের সম্মুখে নিতান্তই উপস্থিত হইতে হয় তবে এই বিষয়ের উত্তর পাইবার জন্য আমি আপনাদের বিশেষ রূপে জেদ্ করিতে ক্ষমতাবান। তাহাদের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অন্যায়াচরণ না করা হয় তদ্বিষয়ে স্থিরতা জ্ঞাপক কোন কথা আমি আপনাদের মুখ হইতে শুনিতে চাই।"

এ সম্বন্ধে গবর্ণরের এই প্রকার দৃঢ় ব্যগ্রতা দেখিয়াও জেনারেল ক্লেভারিং তাহার কোন বিশেষ উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি উত্তরে কেবল এই মাত্র বলিলেন "যখন কৃষ্ণকান্ত ও কৃষ্ণচরণ এইস্থলে উপস্থিত হইবেন, তখন আমরা তাহার সম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবস্থা করি—গবর্ণর তাহা অনায়াসেই জানিতে পারিবেন। মন্সন ও ফ্রান্সিস্ সাহেব ক্লেভারিংএর এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করাতে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল।

কৃষ্ণকান্ত নন্দী, ও কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়কে কৌন্সিলে উপস্থিত করার সম্বন্ধে হেষ্টিংসের অনেকগুলি আপত্তি ছিল। তাঁহার প্রথম ও প্রধান আপত্তি, তিনি মনে মনে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। সে কথা কাহাকেও তাঁহার প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না—ও করিলেও তাঁহার শত গুণ ক্ষতি হইত। বুদ্ধিমান লোকে কে কোথায় সকল কথা সরল ভাবে প্রকাশ করে! সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করেন নাই। তিনি মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলেন বটে কিন্তু অতীত ঘটনা,ও নিজকৃত কার্য্যগুলি চাপিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইল। যাহারা তাহা জানিত তাহারা বুঝিল অমুক কারণেই হেষ্টিংস কান্তবাবুকে বোর্ডের সমক্ষে উপস্থিত হইতে দিলেন না। যতদূর বাহ্য ঘটনা দেখিয়া বোধগম্য হয়—তাহাতে এই মাত্র বুঝিতে পারা যায়, আত্মসম্মান, ও পদোচিত গৌরব, অকলঙ্কিত রাখাই এ সম্বন্ধে হেষ্টিংসের মুল উদ্দেশ্য। কান্তবাবু তাঁহার প্রধান বেণিয়ান, ও প্রাচীন কর্ম্মচারী। সে কালের বেণিয়ানেরা গবর্ণরের সকল খবরই রাখিতেন। গবর্ণরের সমস্ত বিশ্বস্ত কার্য্যে তাঁহারাই অগ্রে নিযুক্ত হইতেন। নন্দকুমারের ও মণি বেগমের নিকট হইতে গবর্ণর সাহেব যে সমস্ত অর্থ উৎকোচ স্বরূপ লইয়াছিলেন তাহার কিছুই কৃষ্ণকান্তের অজ্ঞাত ছিল না। নরসিংহের নিকট মুরশিদাবাদের গদিতে যে টাকা পাঠান হয় তদ্বিষয়ে কান্তবাবু প্রধান সাক্ষী। তিনি বোর্ডের দরবারে উপস্থিত হইলেই এ সকল কথা প্রকাশ ও প্রমাণ হইতে বাকি থাকিবে না ভাবিয়া হেষ্টিংস কান্ত বাবুকে বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে দিতে আপত্তি করিতেছিলেন। ইহাই তাঁহার এই বিষয়ের প্রতিযোগিতার প্রধান কারণ। কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় হেষ্টিংসের সদর মেট—তিনিও এ সকল গোপনীয় কার্য্যের অনেক সন্ধান রাখিতেন—সুতরাং তাহাকেও বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে না দিবার সম্বন্ধে হেষ্টিংসের পক্ষে বিশেষ কারণ বর্ত্তমান।

এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কারণ এই—হেষ্টিংস বরাবরই মনে মনে স্থির মতলব করিয়া রাখিয়াছিলেন যে মন্ত্রীসভার নবাগত সভ্যগণ যেমন তাঁহার প্রতিকার্য্যে বাধা দিতেছেন তিনি তাহাদের কার্য্যেও সেইরূপ করিবেন। কৌন্সিলের মেম্বরগণ, তাঁহাদের দৃঢ়তার গুণে ও হেষ্টিংসের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহার সমস্ত কার্য্যই দোষাকর ভাবিয়া পদে পদে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন! তাঁহারা হেষ্টিংসের "হাঁ"কে "না" করিয়াছেন—ও যে দোষগুলি আন্দোলিত না হইলে হয়ত বিস্মৃতি গর্ভে লুক্কায়িত থাকিত তাহা উজ্জ্বলরূপে সাধারণের চক্ষের উপর ধরিয়া দিয়াছেন। ইহাতে হেষ্টিংস তাঁহার পদগৌরব হানির আশঙ্কা করিয়া বিশেষ রূপে মর্ম্মপীড়া পাইতেছিলেন—কৌন্সিলের সহযোগীগণকে তিনি নন্দকুমার অপেক্ষাও প্রচণ্ড শত্রু বলিয়া জানিতেন—ও মনে মনে তাহাদের যথেষ্ট ঘৃণা করিতেন। আত্মাভিমানী হেষ্টিংস মনে মনে স্থির করিলেন—তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বয়কে, বোর্ডের সদস্যগণ তাঁহাদের সম্মুখে হাজির করাইয়া—হয়ত সমস্ত গোপনীয় কথাগুলি বাহির করিয়া লইয়া—বোডের আজ্ঞা পালনে অবহেলা জনিত অপ-

রাধের জন্য কোন প্রকার শারীরিক শাস্তি বিধানও করিতে পারেন। লোকে বলিবে—বোর্ডের সদস্যগণ গবর্ণরের দুই জন বিশ্বাসী ভৃত্যকে ধরিয়া আনিয়া শারীরিক শাস্তি দিয়া অপমান করিয়াছেন—ইহাতে যাঁহার ভৃত্য তাঁহারই অপমান হইয়াছে—এ কথার তীব্রতা সহ্য করিতে তিনি সম্পূর্ণ রূপে অপারক ছিলেন। সুতরাং সদস্যগণের কার্য্য কলাপে বাধা দিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া তিনি কুটিল ভবিষ্যতের গতি ফিরাইতে পারেন ততক্ষণই তাঁহার শুভ। এই সকল কারণেই হেষ্টিংস কান্তবাবু ও কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে উপস্থিত করিতে এতদূর আপত্তি করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি পূর্ব্বেকার ন্যায় একটী সুদীর্ঘ মন্তব্য (Minute) লিখিয়া বসিলেন। আমরা তাহার মধ্যে আবশ্যকীয় অংশগুলি এইস্থলে সন্নিবদ্ধ করিলাম। হেষ্টিংস লিখিতেছেন—"আমি ভাবগতিকে, ও বোর্ড আমার এই সম্বন্ধে প্রশ্নের যে প্রকার উত্তর দিয়াছেন, তাহা হইতে এই বুঝিতে পারিতেছি—বোর্ডের সদস্যগণ আমাকে অপমানিত করিবার জন্যই এই প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা আমার সকল প্রকার অপমানই করিয়াছেন—কিন্তু এইটী বাকি আছে—আমার প্রাচীন ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদিগকে অসম্মানজনক শাস্তি দিয়া এক্ষণে তাহাও পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। বোর্ডের মেম্বরগণ প্রথম হইতেই আমার প্রতি যে প্রকার ভাব দেখাইয়া আসিতেছেন—তাহাও বর্ত্তমানে বোর্ডের অসম্পূর্ণ অবস্থা বিবেচনা করিলে এই প্রকার আদেশ পত্র (শমন) যে আমার কর্ম্মচারীগণের উপর প্রকৃত কার্য্যকারী ও বিধি-সঙ্গত উপায়ে প্রেরিত—ইহাত আমার বোধ হয় না। আজও বোর্ড অসম্পূর্ণ দেখিতেছি, আজ এই স্থলে এই সকল বিষয়ের সমালোচনার জন্য আমরা সমবেত হই নাই, সুতরাং আমার মতে বর্ত্তমান বিষয়টী, সভা সর্ব্বাবয়বপূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেওয়া হউক। আমাদের অদ্যকার সভা—এক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংগঠিত। এই সভায় অদ্য আমরা দুই একটী সম্ভ্রান্ত রাজা ও জমীদারকে খেলাত দিতে আসিয়াছি। কণ্ট্রাক্টরের গোলাতে যে সমস্ত লবণ মজুত আছে উপযুক্ত গোমস্তাদিগকে তাহা বিক্রয় করিবার জন্য ছাড় দিতে আজ্ঞা করাই আমাদের একত্র হইবার উদ্দেশ্য—এ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে উল্লিখিত বিষয়ের আলোচনা নিতান্ত অবৈধ। এ সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া আপনারা সহসা এই বিষয়ের উত্থাপন করাতে আমি অতিশয় আশ্চর্য্য ও হতবুদ্ধি হইয়াছি। এ প্রকার কার্য্য দ্বারা কেবল আপনাদের কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা ও মনের অসরলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।"

ইহার উত্তরে—মন্সন সাহেব তীব্র ভাষায় হেষ্টিংসের আপত্তিগুলি খণ্ডন করিয়া দিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর, এই স্থির হইল—কান্ত বাবুকে বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই হইবে। সদস্যগণের মতই অবশেষে প্রবল হইল—হেষ্টিংস এত চেষ্টা করিয়া যে ঘটনার গতিরোধ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন তাহার কিছুই ফল ফলিল না। বোর্ডের সভ্যগণ কান্তবাবুর এই প্রকার ব্যবহারে আপনাদিগকে নিতান্ত অপ-

মানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন—সুতরাং কান্তবাবুকে হাজির না করাইয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। এবার কৌন্সিলের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কান্তবাবুর সাহস হইল না—তিনি বোর্ডের আদেশ মান্য করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! সমগ্র মন্ত্রীসভার হইয়া মন্সন সাহেব তাঁহার নিম্নলিখিত কৈফিয়ৎ তলব করিলেন।* দ্বিভাষীর দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য সমাধা হইল।

প্রশ্ন। আপনি ১০ই সোমবার—বোর্ডের নিকট হইতে একখানি শমন পাইয়াছিলেন কি না?

ঐ শমনে আপনার বোর্ডের সম্মুখে হাজিরা দিবার আদেশ ছিল কি না?

কান্তবাবু। হাঁ সেই শমন পাইয়াছিলাম, ও তাহাতে আমার হাজিরা দিবার আদেশ ছিল—তাহাও দেখিয়াছিলাম।

প্রঃ। তবে আপনার হাজির না হইবার কারণ কি?

উ। শমন পাইবার সময় আমি গবর্ণর সাহেবের কাছে ছিলাম। তিনি শমনের কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া আমায় বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিলেন।

প্র। আপনি কি জানেন না এই রাজ্যের শাসন ভার কৌন্সিলের ক্ষমতার উপর ন্যস্ত।

উ। আমরা দেশী লোক—বাঙ্গালী,—গবর্ণরের আজ্ঞাকেই প্রথমে আমরা জবর বলিয়া মান্য করি। তার পর কৌন্সিলের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি।

প্র। গবর্ণর যদি আপনাকে বোর্ডের আজ্ঞা অমান্য করিতে উপদেশ না দিতেন তাহা হইলে বোধ হয় আপনি বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে কোনমতে অন্যথা করিতেন না?

উ। হাঁ—এইরূপ স্থলে আমি নিশ্চয়ই বোর্ডের আজ্ঞা পালন করিতাম।

প্র। ১৪ই (মঙ্গলবার) তারিখে, বোর্ড অব্ রেভেনিউএর সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য আপনি আর একখানি শমন পাইয়াছিলেন কি না?

উ। হাঁ পাইয়াছিলাম;

প্র। আপনার সে আদেশ পালন না করিবার কারণ কি?

উ। আমি পূর্ব্বেই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি।

প্র। ১৭ই (শুক্রবার) আপনাকে বোর্ড অব রেভেনিউএর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পুনরায় শমন দেওয়া হইয়াছিল—আপনি তাহা পাইয়াছিলেন কি না?

উ। আমি শুক্রবার কোন প্রকার শমন পাই নাই। শনিবার একখানি শমন প্রথম সভায় উপস্থিত হইবার জন্য পাইয়াছিলাম। আমি সুমার সাহেবকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে আগামী প্রথম সভার দিন আমি বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইব। এই বিষয়ের জন্য উক্ত দিবস প্রাতে আমি সমার সাহেবের কাছে গেলাম—সাহেব বলিলেন

* Bengal Secret Consultations. 28 th March 1775

যে সে দিবস সভা হইবে না। সমার সাহেব প্রথম সভার অধিবেশনের দিন পুনরায় আসিতে বলিলেন।

প্র। অদ্য এখানে উপস্থিত হইবার জন্য আপনি কোন আজ্ঞাপত্র পাইয়াছেন কি না?

উ। আজ আমি কোন লিখিত আজ্ঞা পাই নাই। কোম্পানীর একটি হরকরা আমার বাটিতে গিয়া বলিয়া আসিয়াছিল। সেই সংবাদ পাইয়া আমি অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

প্র। সেই পিয়ন কোথা হইতে আসিয়াছিল আপনি তাহার সন্ধান রাখেন?

উ। আমি সেই হরকরাকে দেখি নাই। আমার লোকের মুখে শুনিলাম, যে এক জন হরকরা আমার বাটিতে গিয়া, বোর্ডে উপস্থিত হইবার জন্য বলিয়া আসিয়াছে। সেই কথা শুনিয়া আমি অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

এই প্রকারে জোবানবন্দী শেষ হইলে ক্লেভারিং সাহেব প্রস্তাব করিলেন "আমার ইচ্ছা এই যে "গবর্ণর জেনারেল তাঁহার নিজের ও সেই সঙ্গে বোডের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য কান্তবাবুকে তাঁহার গুরুতর অপরাধের জন্য—কোন প্রকার কঠিন শাস্তি দেন।" গবর্ণর জেনারেল তাহার উত্তরে বলিলেন "কান্তবাবু গবর্ণরের দেওয়ান বলিয়া কলিকাতার সকলে তাঁহাকে একজন উচ্চ পদস্থ লোক বলিয়া জানে ও সম্মান করিয়া থাকে। তিনি কলিকাতার অধিবাসী নহেন এবং অতিশয় সদ্বংশ জাত। দেশের সকলেই ইহা ছাড়া তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী বলিয়া জানে,* ও আজও পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে তাঁহার উপর কেহ কোন দোষারোপ করিতে পারে নাই। আরও আমার কর্ম্মচারী বলিয়া পার্লিয়ামেণ্টের বিধান অনুসারে কান্তবাবু আপনাদের বিচার্য্য হইতে পারেন না। তিনি প্রকৃত পক্ষে আপনাদের সীমা বহির্ভূত ও মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের সীমাভুক্ত।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর ক্লেভারিং সাহেব প্রস্তাব করিলেন "কান্তবাবুকে শাস্তি দিবার প্রস্তাব করাতে গবর্ণর সাহেব তাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমায় ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—যে তিনি কান্তকে নিজের জীবন দিয়া রক্ষা করিবেন! এই জন্য

---

* কান্তবাবু গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন আবশ্যকীয় সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন কি না এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন প্রমাণ পাই নাই। প্রাচীন রেকর্ড হইতে জানা যায় তিনি কয়েক বৎসরের জন্য কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত নিম্নতর আদালত সমূহের একটী রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বটে। হিন্দু বিচারপ্রার্থীদিগের মধ্যে যখন জাতি ঘটিত কোন মোকদ্দমা বা বিষয় লইয়া কূটতর্ক উঠিত—কান্তবাবু তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। ভ্যান্‌সিটার্টের সময় হইতেই এই কার্য্যটি গবর্ণরের বেনিয়ানদিগের একচেটিয়া ছিল। হেষ্টিংসের আমলে প্রথম প্রথম আমরা কান্তবাবুকে এই কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই। ইহার পরিবর্ত্তে কোন পরিশ্রমিকের ব্যবস্থা ছিল কি না তাহা জানি না।

আমি প্রস্তাব করিতেছি—গবর্ণর অতিশয় সামান্য অপরাধের নিমিত্ত প্রতি দিবস শত শত হিন্দুকে যে শাস্তি দিয়া থাকেন আমি অদ্য কান্তবাবুর জন্য সেই প্রকার শাস্তির বিধান কামনা করিব। আমি কান্তবাবুকে তাহাদের ন্যায় তুড়ুম (Stocks) পরাইতে ইচ্ছা করি !* হেষ্টিংস এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন "এ প্রকার শাস্তি দ্বারা কান্তবাবুর অক্ষত সম্মান চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যাইবে ও তিনি লোকের চক্ষে হেয় ও অপমানিত হইবেন।"† সে দিবস এ কথার কোন শেষ হইল না—হেষ্টিংসের আপত্তিতে সেই দিবস তৎক্ষণাৎ সভা ভঙ্গ করা হইল। ইহার পরে কি হইল আমরা আগামী বারে বলিব!—[ক্রমশঃ]

কলঙ্ক।

১৩

পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া মন্দালিক ভাল বুঝিলেন না, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"চুপ কি লাগিন্ রে—কি হইলু বলরে বেটা—"

আর কতক্ষণ ভীলপুত্র পিতার জিজ্ঞাসায় নিরুত্তর থাকিবে ? তাহার সকল সঙ্কল্প বৃথা হইল, দুই হাত সবলে বুকে আঁটিয়া নতদৃষ্টি উন্নত করিয়া সবল মুক্তকণ্ঠে তখন সে বলিল—"বাবা গুহাটা কালসর্প, মুইডা তার মিত হইতে নারিল—শত্রু হয়ে আসিছি। মোর শত্রু হইলে সব পারিত মুই—সেডা যে তোর শত্রু"

---

* ইংরাজ রাজত্বের প্রথম বিকাশ সময়ে অপরাধীদের বড় মজার শাস্তি হইত—হেষ্টিংসের সময়ে গড়ের মাঠে ও Esplandeএর সন্নিহিত কোন স্থানে মলমূত্র পরিত্যাগ করিলে তাহাকে গবর্ণরের আদেশানুসারে তুড়ুম লাগান হইত। তখন মিউনিসিপালিটি ছিল না—নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করা হইত। এ কথা হেষ্টিংস নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন। তখন চুরী করিলে প্রায়ই প্রাণ দণ্ড হইত ! কোন প্রশস্ত জনাকীর্ণ স্থলে লইয়া গিয়া সকলের সমক্ষে বেত্রাঘাত করা বা অপরাধীকে, অপরাধানুসারে রৌদ্রোত্তাপে দগ্ধ করা তখনকার শাস্তি ছিল। পার্ব্বতী নামে একটি বেশ্যা একবার অপহৃত দ্রব্য ঘরে রাখিয়াছিল—এই অপরাধে তাহাকে আট দিন কারাগারে রাখিয়া নয় দিনের দিন বাহির করিয়া বহু বাজারের চৌমাথায় লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করা হইল ও সর্ব্বশেষে এক টাকা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রকারের নূতন ধরণের শাস্তি ছিল। এ স্থলে সে সমস্ত উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক।

† কান্তবাবুর সম্বন্ধে অধিক জানিতে হইলে—নবজীবন—কার্ত্তিক ২৮ সংখ্যা দেখুন।

"তার শত্রু হয়ে আসিছি"—অর্থাৎ তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছি। মন্দালিক হঠাৎ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—"তুইডা তার শত্রু হ'য়ে আসিছিস্ ?"—

আবার দৃঢ়স্বরে উত্তর হইল—"হুঁ ই—"

মন্দালিক কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া একটু পরে বলিলেন—"মুইডার সে শত্রু কোনডা বলিল তোরে—" মন্দালিকের সে কথা বিশ্বাস হয় নাই। সে কথা এতই অসম্ভব। পুত্র বলিল—'তুই খাঁটি কথা বলিলি—সে লাগিন সেইডা তোরে মারিতে চাহিল—কালসপ্পডা জানিল না মোরে আগে না মারিলে তা হইবুর নয়—" বলিয়া সে যাহা শুনিয়াছিল খুলিয়া বলিল। সমস্ত কথা মন্দালিকের একটা ধুঁয়া—একটা অন্ধকার—একটা যেন ভ্রান্তি বলিয়া বোধ হইল,—গুহা তাঁহাকে মারিতে চাহিবে—একথা কেমন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইবে,—অথচ পুত্রের প্রত্যেক কথা বৃশ্চিক হুলের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, শীতল হিমময় রাত্রে তাহার কপাল ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল—তিনি কম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন—"মোরে মারিতে চাহিল গুহাডা ! বেশ মুইকে তার শোধ নিতে দে—তুইডা কিছু করুস্ না—মোর কথাডা রাখ্—"

একবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া তাহাতে নিরস্ত হওয়াই ত কাপুরুষতা, তাহার উপর সে থাকিতে কিনা পিতার অপমানের শোধ পিতা লইতে যাইবেন !

ভীলপুত্রের প্রদীপ্ত চক্ষু অন্ধকারের মধ্যেও জ্বলিয়া উঠিল—সে উত্তেজিত কণ্ঠে ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিল—"বাবাডা মুই যে ধনু ধরিবার কথাডা দিয়ে আসিছি তা ভুললু নাকি ? আর মুই থাকিতে তুইডা শোধ লইবি ?"

এই যুদ্ধ হইতে পুত্রকে যে সহজে নিরস্ত করিতে পারিবেন না তাহা মন্দালিক জানিতেন—তিনি অনুনয়ের স্বরে আবার বলিলেন "বেটারে শোন তুইডা,—তোর কথাডা ফিরাইতে হইবু না, সেইডাই কথা ফিরাইবে—তুইডা ক্ষমা কর শুধু। সেডা মোরে মারিতে চাহে নাই, কথার কথাডা কি বলিল—সে লাগিন সে ক্ষমা চাহিবে—তুইডা ক্ষমা কর—"

এখনো সেই স্নেহ ! যে তাঁহাকে বধ করিতে চাহে—তাহার প্রতি এখনো এত স্নেহ এত ভালবাসা ! আর ভীলপুত্র তাঁহার জন্য যে প্রাণ দিতে যাইতেছে—তাহার জন্য কি একটা মমতার কথাও নাই ? একটা যন্ত্রণার বিদ্যুৎ তালগাছের হৃদয় যেন ভস্ম করিয়া দিয়া গেল,—একটুখানি আগে মরিবার জন্য তাহার যে কষ্ট হইয়াছিল তাহা আর বিন্দু মাত্র রহিল না, মরিবার আগেই সে মরিয়া গেল, তাহার প্রেতযোনী—তাহার প্রবৃত্তি মাত্র তাহার দেহ যেন অধিকার করিয়া রহিল। হায় ! মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে কতবার মরিয়া যায়—কেহ কি জানিতে পারে? তালগাছ তীব্রকণ্ঠে কম্পমান শরীরে বলিল—" মুইডা চলিনু, তুইডা মোরে ক্ষমা কর—কথাটা যা দিয়ে আসিছি—মুই ফিরাইতে নারিবু। মুইডা যা শুনিয়া আইল—ঠিক শুনিয়া আইল"। আগেকার তালগাছ হইলে এমন করিয়া পিতার অমতে কথা কহিতে পারিত না—এমন করিয়া আর কখনো সে কথা কহে নাই। বলিয়াই

সে তীরবেগে বাহির হইয়া গেল—মন্দালিক তাঁহার চিন্তাভার লইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন—'সত্যই কি গুহা তাঁহাকে মারিতে চাহিয়াছে? যুবক—যাহাকে তিনি রাজ্য দিয়াছেন, স্নেহ দিয়াছেন—যাহার জন্য নিজের পুত্রের প্রতি তিনি সত্যই অন্যায় করিয়াছেন—সে তাঁহাকে মারিতে চাহিয়াছে? তাঁহার ভালবাসার, স্নেহের এই প্রতিশোধ? মর্ম্মান্তিক কষ্টে তাহর বুক ফাটিয়া উঠিল। মন্দালিক গুহাকে যে পুত্রাপেক্ষাও ভাল বাসেন তাহা এখন সুস্পষ্ট রূপে বুঝিলেন, আগে তাঁহার নিজের মনের ভাব নিজের কাছেই লুকান ছিল তাই সে দিন না বুঝিয়া তালগাছকে আর এক রকম বলিয়াছিলেন। তিনি কাতর হইয়া এখন মনে মনে বলিলেন "গুহাটারে তুই আমাকে মারিবি, মার তবে, আমি নিজেই গিয়া তোকে বুক পাতিয়া দিতেছি, এ জন্য অন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজের হানি করিবি কেন"

এখনো তাঁহার সন্দেহে বিশ্বাস জড়িত, এখনো তাহার কষ্টে আশাপূর্ণ, এখনো তাঁহার মনে হইতে লাগিল—গুহা যদিই বা না বুঝিয়া কিছু বলিয়া থাকে মন্দালিককে দেখিলে অনুতপ্ত হৃদয়ে নিশ্চয়ই সে ক্ষমা চাহিবে,—তিনি বলিলে তাঁহার পুত্রের নিকটেও ক্ষমা চাহিয়া যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইবে"

এই বিশ্বাস তাঁহার গভীর স্নেহের ফল—এই বিশ্বাস তাঁহার ক্রোধের অতীত, প্রতিশোধ স্পৃহার অতীত স্বার্থহীন পবিত্র ভালবাসার ফল, তাই তিনি যখন ভাবিলেন গুহা তাঁহাকে মারিতে চাহিয়াছে—তাঁহার দুঃখ হইল, অভিমান উথলিয়া উঠিল—রাগ হইল না, তিনি অভিমানের উচ্ছ্বাসে—স্নেহের বিশ্বাসে নীত হইয়া দ্রুতবেগে যুবকের বাড়ীর দিকে গমন করিলেন।

১৪

চাঁদ উঠিয়াছে, জ্যোৎস্না হইয়াছে, তবু চারিদিক মলিন, চারিদিক আচ্ছন্ন, গাছ পালার মধ্যে, গাছ পালার ছায়ার মধ্যে, পাহাড়ের শারদীয় শেষ প্রহরের কুয়াসার মধ্যে জ্যোৎস্না যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভীলপুত্রের ম্রিয়মান বাষ্পাকুল দৃষ্টির দিকে চাহিয়াই যেন প্রকৃতির হাসিমুখ সহসা এমন মলিন হইয়া পড়িয়াছে. প্রভাতের তরুণ অরুণ জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ভীলপুত্রের এ নয়নবারি যখন শুকাইয়া যাইবে তখন ধরণীর মুখও আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে। নিরাশায় সতেজ. যন্ত্রণাভারে উত্তেজিত.বিহ্বল ভীলপুত্র এই কুয়াসার মধ্য দিয়া দ্রুতপদে নির্দ্দিষ্ট গাছ তলায় আসিয়া থামিল। ইহার কিছু আগে হইতেই গুহা রাস্তার পরপারে পুকুরের ধারের বড় গাছের নীচে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, থামিবামাত্র তাঁহার অস্পষ্ট প্রতিকৃতি ভীলপুত্রের নজরে পড়িল, অমনি হঠাৎ একটা জ্বলন্ত আগুণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে হুহু করিয়া ব্যাপ্ত হইল, ধনুক খুলিয়া হাতে উঠাইয়া ধরিবার সময় হাত টলমল করিয়া উঠিল। তালগাছকে দেখিয়া গুহা কথা কহিল, কিন্তু রণোদ্যত শত্রুর ক্রুদ্ধ কর্কশ স্বরের পরিবর্ত্তে গুহার স্বাভাবিক তেজস্বী স্বর তালগাছের

কর্ণে প্রবিষ্ট হইল. গুহা বলিল—"তালগাছ একটু অপেক্ষা কর,—ধনুক ধরিবার আগে আমি যে কথা বলিতে আসিয়াছি শোন।" এখনো আগেকার মত অনুজ্ঞা! কিন্তু এখন আর আগেকার সে ভীলপুত্র নহে। ভীলপুত্র আরো ভাল করিয়া ধনুর্ব্বাণ কসিয়া ধরিল,—তাহার পর তাহার ভাষায় কম্পমানকণ্ঠে বলিল "ধনুক উঠারে কাপুরুষ. এখন কথার সময় নহে, তুই প্রাণভয়ে এত কাতর, আমি নির্ভয়ে তোর কাছে প্রাণ লইয়া আসিয়াছি।"

ভীলপুত্রের হস্ত তাহার প্রতি উন্মুখ হইল. গুহার ধনুক ধরিবার মাত্র অপেক্ষা। তখন গুহাও ধনুক উঠাইয়া বলিলেন তবে তাহাই হউক, এ হত্যার দোষ কিন্তু আমার নাই।" বলিয়া তীর নিক্ষেপ করিলেন, কখনো যাহা হয় নাই আজ তাঁহার অটল হাত কাঁপিয়া গেল। সমকালে ভীলপুত্রের বাণও সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল. হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ রাত্রের বিজনতা বিদীর্ণ করিয়া আকাশে উথলিয়া উঠিল, ভীলপুত্র হঠাৎ বজ্রাহত হইয়া মুচ্ছির্ত হইয়া পড়িল।—[ক্রমশঃ।]

রাগিণী ভুপালী—তাল সুরফাঁকতাল।

চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি, নিরমল; অতি শীতল কিরণ সুখদায়ী;
চৌদিকে তারাগণ উজলি গগন-অঙ্গন, ধারণ করে তোমারি শোভা মনোহারী।
বিতরণ করি জীবন বহিছে মৃদু সমীরণ অমৃত পূর্ণ মঙ্গল ভাব তব প্রচারি।
বরষিয়ে মধুর তান, জুড়ায়ে হৃদয় প্রাণ; বিহগগণ করে গান তব গুণ বলিহারী।

ব্রহ্ম-সংগীত।

ভুপালী—সুরফাঁকতাল।

১
— — — ২ ৩ ১
সা॰নী॰সা—ধা—সা—ধা—(পামাপা)—গা—রে—সা—রে—। পা॰মা॰পা—গা - -
চ ন্দ্র ব রি ষে জ্যো তি তো মা রি

১
২ ৩ ১ ২ ৩ — —
গা—গা—গা—গা—গা—গা—। পা॰মা॰পা—রে—রে—রে - - গা—পা—ধা—-সা—। সা—
নি র ম ল অ তি শী ত ল কি র ণ সু খ দা

২ ৩
— — — ২ ৩ ১ — — —
রে—সা—সা—ধা—পা—গা—রে—(সানীসা)— ॥ঃ॥ গা - - পা—ধা—সা॰নী॰সা—সা॰
য়ী চৌ দি কে তা রা

১ ২ ৩ ১
নী॰সা—সা—সা—। সা—ধা—সা—সা—সা—রে—সা॰নী॰সা—ধা—পা—। পা—রে—
গ ণ উ জ লি গ গ ণ অ ঙ্গ ন ধা

২ ৩ ১ ২ ৩
রে—রে—রে—রে—গা—পা—ধা—ধা—। ধা—রে—সা॰নী॰সা—ধা—ধা—পা—পা—
র ণ ক রে তো মা রি শো ভা ম নো হা

১ ২ ৩
গা॰রে—(সানীসা)—। সা॰নী॰সা—ধা—সা—ধা—(পামাপা)—গা—রে—সা—রে—।
রা চ ন্দ্র ব রি ষে জ্যো তি তো

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
পা॰মা॰পা—গা - - গা—গা—গা—গা—গা—গা—। পা॰মা॰পা—রে—রে—রে - - গা—
মা রি নি র ম ল অ তি শী ত ল কি র

১ ২ ৩ ১
পা—ধা—সা—। সা—রে—সা—স্না—ধা—পা—গা—রে—(সানীসা) - - । গা—গা—
ণ সু খ দা য়ী বি ত

২ ৩ ১ ২ ৩
গা—গা—গা—গা—পা॰মা॰পা—রে—রে—। রে—রে—রে—রে—গা—পা—মা॰পা॰ধা-
র ণ ক রি জী ব ন ব হি ছে মৃ দু স মী

১ ২ ৩ ১
ধা—ধা—। পা--পা—পা—পা॰মা॰পা—পা—গা - - গা—গা—। গা—রে—রে—সা—
র ণ অ মৃ ত পূ র্ণ ম ঙ্গ ল ভা ব ত

২ ৩ ১ ২ ৩
সা—রে—পা॰মা॰পা—গা - - । পা—গা—পা—ধা—সা—সা—সা—সা॰নী॰সা—সা—।
ব প্র চা রি ব র ষি য়ে ম ধু র তা ন

১ ২ ৩ ১ ২
সা—ধা—সা—ঋা—সা—রে—সা॰নী॰সা—ধা—পা—। পা—পা—পা—পা—পা—পা—
জু ড়া য়ে হৃ দ য় প্রা ণ বি হ গ গ ণ ক

৩ ১ ২ ৩
পা—পা॰মা॰পা—পা—। পা—ধা—পা—পা—মা—পা—গা—রে—(সানীসা) - - ।
রে গা ন ত ব গু ণ ব লি হা রী

সুর ফাঁকতালে তিনটি করিয়া তাল থাকে। প্রথম এবং তৃতীয় তাল চারিটি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। দ্বিতীয় তালে দুই মাত্রা মাত্র।

শ্রীপ্রতিভা দেবী

পঞ্জাব ভ্রমণ।

১

লাহোর।

আমি আশ্বিন মাসের ভারতীতে বলিয়াছি যে মোগল সম্রাট্‌দের সময়ে রাভী বা ইরাবতী লাহোরের পাদদেশ চুম্বন করিয়া বহিত। এখন ইরাবতী—লাহোরকে ছাড়িয়া দেড় ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে। লাহোর ইরাবতীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। নৌসেতু বা রেলওয়ের লৌহ-সেতু দিয়া ইরাবতী পার হইলেই সম্মুখে অনতিদূরে শাহাডেরা বা রাজবিরাম স্থান। ইহার নাম শাহাডেরা হইয়াছে কেননা সম্রাট জিহাঙ্গীরের এখানে সমাধি-ক্ষেত্র। এস্থানে জিহাঙ্গীরের জীবদ্দশায় তাঁহার ভুবন বিখ্যাত রূপসী ও প্রতিমাময়ী—মহিষী-নুরজিহান একটি উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে সে উদ্যানে তিনি তাঁহার সমাধি করেন, আর সমাধি ক্ষেত্রের উপরে এক অতি মনোহর স্মৃতি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এরূপ সমাধি-মন্দির ভারতবর্ষেও অধিক নাই। মুসলমানী সমাধি মন্দির অধিকাংশই গুম্বেজশিরা তাজ বা হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত। জিহাঙ্গীরের সমাধি মন্দিরের ছাত আমাদের দেশের দালানের ছাতের মত সমতল। লাল পাথর ও মার্ব্বলে নির্ম্মিত। তাজের মত কারুকার্য্য অত সূক্ষ্ম, নির্ম্মল বা নিষ্কলঙ্ক না হইলেও জিহাঙ্গীরের সমাধিমন্দির নূরজিহানের অনুপযুক্ত নয়। এ রৌদ্র পোড়া দেশে মার্ব্বলের বাড়ী যে কি আরামের স্থান তাহা যে পঞ্জাবী সূর্য্যের তাপে না দগ্ধ হইয়াছে তাহার বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। আমরা অনেক গুলি লোক মিলিয়া একদিন শাহাডেরায় যাই। রোদে পুড়িয়া, অনন্ত ধূলিরাশি নাকে, চোকে, কাণে, মুখে, দাড়িগোঁপে পুরিয়া, আমরা যাইয়া জিহাঙ্গীরের সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। সমাধি মন্দির চারিদিকে বারান্দায় বেষ্টিত। বারান্দায় প্রবেশ করিতেই যেন প্রাণটা ফিরিয়া পাইলাম। যখন মন্দিরের কেন্দ্রস্থানে, সেখানে মার্ব্বল নির্ম্মিত শবাধারে (Sarcophagus) জিহাঙ্গীর অনন্ত অস্বপ্ন নিদ্রায় নিদ্রিত আছেন, সেখানে যাইবার পথে প্রবেশ করিলাম, তখন শরীর ও মন দুইই জুড়াইয়া গেল। বাহিরে এমন উত্তাপ, সেখানে এমনি ঠাণ্ডা যেন গ্রীষ্ম সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। শবাধার

নিষ্কলঙ্ক তুষারশ্বেত মার্ব্বলে নির্ম্মিত—তাহার গায়ে ধর্ম্মোপদেশ সব জ্যোতিষ্মাণ কৃষ্ণ মার্ব্বলে লিখিত। জিহাঙ্গীরের সে প্রিয় মহিষী আজ নাই—তাহার মন্দিরের কোন যত্ন নাই। শবাধারের উপর একখানি সামিয়ানা টাঙ্গান আছে, তাহা অতি জীর্ণ ও অতি সমল। সমাধি মন্দিরের চারি কোণে চারিটি অতি সুন্দর মীনার বা স্তম্ভ আঁছে ইহারাও লাল পাথর ও মার্ব্বলে নির্ম্মিত। শ্বেত মার্ব্বলে এমন সুন্দর করিয়া লাল মার্ব্বল বসান হইয়াছে যে স্তম্ভগুলির দিকে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। তাজের স্তম্ভগুলি তাজের চতুর্দ্দিকে যে চত্বর তাহার চারি কোণে—জিহাঙ্গীরের সমাধি মন্দিরের স্তম্ভগুলি মন্দিরের চারি কোণে। ইহার কোন একটা স্তম্ভে উঠিলে অনতি দূরে ইরাবতী বহিয়া যাইতেছে দেখা যায়। তবে এ দেশের নদী—যখন বৃষ্টি হয় তখন উন্মাদিনীর মত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, বুক ফুলাইয়া, দৃকপাত না করিয়া চলিয়া যায়; আর যখন বৃষ্টি না থাকে তখন বালুরাশি হৃদয়ে লইয়া পড়িয়া থাকে—এখানে ওখানে একটি ক্ষুদ্র স্রোত বহিয়া যায়। এ স্তম্ভগুলির উপর হইতে ইরাবতীর পূর্ব্ব তীরে লাহোর দেখা যায়—জুম্মা মসজিদের স্তম্ভগুলি খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাধি মন্দির নূরজিহানের যে উদ্যানের কেন্দ্র স্থলে নির্ম্মিত হইয়াছিল সে উদ্যান আর নাই। এখন তাহা কৃষক দিগের হাতে দেওয়া হইয়াছে—তাহারা চাস বাস করে আর খাজনা দেয়! সমাধি মন্দিরের নাকি আগে সৌন্দর্য্য আরো অনেক বেশী ছিল। নানা সময়ে নানা রাজদস্যু ইহার সৌন্দর্য্য অপহরণ করিয়াছেন।

জিহাঙ্গীরের সমাধি মন্দিরের অতি নিকটে নূরজিহানের ভাই আসফ্ খাঁর সমাধি মন্দির। ইহা উচ্চ গুম্বেজশিরা মন্দির। এক সময়ে ইহাও নাকি অতি সৌন্দর্য্যশালী ছিল। এখন ইহার কোন সৌন্দর্য্যই নাই। গুম্বেজ মার্ব্বলে আচ্ছাদিত ছিল। সমস্ত মার্ব্বল রাজদস্যুরা লুণ্ঠন করিয়াছে। রণজিৎ সিংহ ইহারই মার্ব্বল প্রস্তর দ্বারা অমৃতসরের গুরুদরবারের শোভা বর্দ্ধন করেন! নূরজিহানের সমাধি মন্দিরও তাঁহার স্বামীর সমাধি মন্দিরের নিকটে। উহা একেবারে শেষ দশায়—চিহ্ন মাত্র আছে। নূরজিহান স্বামীর মৃত্যুর পরে স্বামীর সমাধি মন্দিরেরই নিকটে থাকিতেন—ধর্ম্মকর্ম্মে, বিদ্যালয়সংস্থাপনে, পরোপকারে দিন কাটাইতেন। তিনি অনেক সরাই নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। জিহাঙ্গীরের সমাধি মন্দিরের বাহিরেই একটা বিস্তৃত সরাই। তাঁহারই নির্ম্মিত হইবে সন্দেহ নাই। এখন সরাই রেলওয়ে কোম্পানির কয়লাতে পূর্ণ।

লাহোরের পূর্ব্বদিকে ৩ ক্রোশ দূরে বিখ্যাত শালিমার উদ্যান। এমন চমৎকার উদ্যান বোধ হয় সমস্ত ভারতবর্ষে আর একটিও নাই। ইহা কাশ্মীরের শালিমার উদ্যানের অনুকরণে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাজিহান কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। সে সময়ে শালিমার লাহোর নগরের অন্তর্ভূত ছিল—লাহোর তখন শালিমার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাজিহানের অপূর্ব্ব অতুল অট্টালিকা ও উদ্যানাদি রচনা করার বুঝি একটা অতৃপ্ত তৃষ্ণা

ছিল। শাজিহান লাহোরের দুর্গে কত মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহা আশ্বিনের ভারতীতে আমি বলিয়াছি। আগ্রার তাজ, আগ্রা ও দিল্লীর দুর্গ, আর আগ্রা ও দিল্লীর দুর্গে যে সকল মসজিদ, স্নানাগার, দরবার গৃহাদি দেখিয়া লোক মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়, শাজিহান তাহাদিগের নির্ম্মাতা। লাহোরে তাঁহার দুর্গে মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সাধ মিটিল না। বিমাতা নূরজিহানের নির্ম্মিত পিতৃ সমাধি মন্দিরের শোভা দেখিয়া তিনি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন কীর্ত্তি স্থাপনের সঙ্কল্প করিলেন। শালিমার উদ্যান সে সঙ্কল্প হইতেই প্রসূত। সেজন্য শালিমারকে সাহাডেরার জবাব বা উত্তর কহে। শালিমার উদ্যান সুবিস্তৃত—আগে বিস্তার আরও অধিক ছিল। চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর—প্রাচীর স্কন্ধে স্থানে ২ বুরুজ। প্রবেশ দ্বারটি অনুচ্চ—প্রবেশ কালে মনে হয় না এমন অপূর্ব্ব উদ্যানে প্রবেশ করিতেছি। প্রবেশ করিলেই উদ্যানসম্মুখে সুপ্রশস্ত ইটে বাঁকান পথ—পথকে সমভাগে বিভক্ত করিয়া জলপ্রণালী—জল প্রণালী অসংখ্য ফোয়াড়াতে পূর্ণ। পথের দুদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম গাছের উপবন। এত বড় বড় আম গাছ আমাদের দেশে দেখা যায় না। পথ যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে অতি সুন্দর একটী আরাম বা প্রমোদ গৃহ। আরাম গৃহ বলিলাম কেননা আরামের স্থান তেমন অতি অল্পই আছে। প্রমোদগৃহ বলিলাম কেননা এখানে প্রায়ই নৃত্যগীত হইত। এই আরাম বা প্রমোদগৃহে আসিয়া দাঁড়াইলে সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—সম্মুখে ৭।৮ হাত নিম্ন সমতল ভূমিতে আর এক সুবিস্তৃত উদ্যান—মধ্যস্থলে, আরাম গৃহের সম্মুখে পদতলে একটি পুষ্করিণী—পুষ্করিণী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান—নীচে উপরে ইটে বাঁকান—কেন্দ্রস্থলে একটি বসিবার স্থান—সে স্থানে পৌছিবার জন্যে পুষ্করিণী হৃদয়ে তীর হইতে তীরান্তর পর্য্যন্ত রাস্তা। দুই তীরে দুটী রমণীয় ক্ষুদ্র প্রমোদগৃহ। প্রথমে যে প্রমোদ গৃহের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার পদতলে পুষ্করিণী তীরে একটি বড় মনোহর দৃশ্য। শালিমারে প্রবেশ করিতেই যে জলপ্রণালী দেখা যায় তাহা এই প্রমোদ গৃহের নীচে বহিয়া যাইতেছে। প্রমোদ গৃহের নীচে বহিয়া এই জলপ্রণালী নিম্ন-সমতল উদ্যানে পড়িয়াছে—পড়িয়া পুষ্করিণী পূর্ণ করিতেছে। যেখানে জলপ্রণালী নীচে জল ঢালিতেছে সেখানে একটি চমৎকার ঝরণার সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রমোদ গৃহের ভিত্তিমূল হইতে সম্মুখস্থ উদ্যান সমতলী পর্য্যন্ত মার্ব্বলে বাঁধান—এই মার্ব্বল প্রাচীর বাঁকা হইয়া, অর্থাৎ শির পশ্চাতে ঝুঁকাইয়া আর পাদদেশ সম্মুখে বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহার দেহে কৃষ্ণ প্রস্তরে অনেক কাজ করা আছে। প্রমোদ মন্দিরের নীচে দিয়া প্রণালীর জল এই মনোহর মার্ব্বল প্রাচীরের উপর দিয়া ঝর ঝর করিয়া বহিয়া যায়—প্রাচীরে এমনি কাজ করা যে জল তাহার উপর পড়িলেই তরঙ্গের অভিনয় করে। এ দৃশ্যটি বড় মনোহর। জল নিম্নতল উদ্যানে পড়িয়াই একটি অতি সুন্দর ফোয়ারা রূপে আবার বহু উচ্চে উঠে। এই ফোয়ারারই সম্মুখে একখানি মার্ব্বল সিংহাসন—শাজিহান ঐ সিংহাসনে বসিয়া মার্ব্বল

প্রাচীরে ঝরণার অভিনয়, পুষ্করিণী ও উদ্যানের শোভা, প্রমোদগৃহে নৃত্যগীত দেখিতেন ও ভোগ করিতেন। শরৎকালের পূর্ণিমা রাত্রিতে এক দিন আমি জনকতক বন্ধুর সহিত শালিমারে গিয়াছিলাম, পুষ্করিণী হৃদয়ে যে বসিবার স্থান আছে সেখানে আমরা চাঁদের আলোতে বসিলাম। পুষ্করিণী হৃদয়ে শতাধিক ফোয়ারা—তাহারা খেলিতেছিল—যেন চাঁদের আলোতে দেহটা মিলাইয়া দিবার জন্যে পুষ্করিণীর বারিরাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ণিকা-রাশি স্রোতে পরিণত হইয়া আকাশে উন্মত্ত হইয়া ছড়াইয়া উঠিতেছিল। মার্ব্বল প্রাচী-রের উপর ঝরণা চাঁদের আলোতে চিক চিক করিতেছিল, দেখিয়া আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। তবে এই মোহভাব সারারাত রহিল না। নিকটস্থ বাগোয়ানপুরা গ্রামের এক জন খানসামাকে আমরা ইতিপূর্ব্বে খানার হুকুম দিয়াছিলাম—তিনি রাত দশটার সময়ে মুর্গ্যাদি নব্য ভারতের রসনা তৃপ্তিকর খানা লইয়া হাজির হইলেন। আমরা পুষ্করিণী বক্ষে চাঁদের আলোতে বসিয়া উদরের শান্তি যথাবিধানে সম্পাদন করিলাম। তার পর রাত ১১টার সময় গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে লাহোর পহুঁছিলাম। কিন্তু শালিমার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বাকী আছে। শালিমার উদ্যান দ্বিতল নয় তৃতল। উদ্যানের একতলা ও দোতলা পাঠক দেখিয়াছেন—আমরা শুদ্ধ করিয়া বলিলে বলিতে হয় তেতলা ও দোতলা দেখিয়াছেন, কেননা শালিমার উদ্যান ক্রম-নিম্ন। প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করিলেই পদতলে ও সম্মুখে উদ্যানের তেতলা—তেতলা অতিক্রম করিয়া প্রমোদ গৃহের দু পাশে নীচে যাইবার পথ—সে পথে গেলেই উদ্যানের দোতলা, যাহার পুষ্করিণীর আমি এখনি বর্ণনা করিয়াছি। দোতলা অতিক্রম করিলেই উদ্যানের এক-তলা। দোতলা হইতে নীচে যাইবার শিঁড়ি আছে—৭।৮ হাত নীচে নামিতে হয়। তেতলা বা সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্ব প্রথম তলায় যেমন জলপ্রণালী সরল রেখায় সুপ্রশস্ত বাঁধান পথকে সমদ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া বহিয়া যাইতেছে—একতলায় তেমনি বহিয়া যাইতেছে। তেতলার জলপ্রণালীর জল চলিয়া দোতলার পুষ্করিণী হৃদয় পূর্ণ রাখিতেছে, দোতলার পুষ্ক-রিণী জল ঢালিয়া একতলার প্রণালী-হৃদয়ে স্রোত বহাইতেছে। এ প্রণালীও শত ফোয়া-রায় শোভিত। দোতলায় পুষ্করিণী হইতে একতলায় জল নামিবার একটি মনোহর কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। পুষ্করিণী-তীরে একটি সুন্দর ঘর অথচ তাহার মেজে নাই—ঘরটির চারদিকের দেয়ালের নীচে দিয়া পুষ্করিণীর জল বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টির মত হইয়া পড়িতেছে—বৃষ্টিরই মত শব্দ করিয়া পড়িতেছে। একতলায় প্রণালী কাটা রহিয়াছে—সেই প্রণালীমুখে এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। এই প্রণালী মুখটি যে ঘরের দেয়ালের নীচে হইতে জল বৃষ্টিরূপে পড়িতেছে তাহার নীচের ঘর—দোতলা হইতে একতলায় জল পড়িতেছে। একতলার দেয়ালে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোলঙ্গা বানান আছে। তাহার প্রত্যেকটিতে এক একটি প্রদীপ রাখা যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে এই ঘরটির দেয়ালের গায়ে যে অসংখ্য কোলঙ্গা আছে—সকলের মধ্যেই এক একটি প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া

হয়। সে অসংখ্য জলন্ত প্রদীপের সম্মুখে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে থাকে—সহস্র দীপালোকে সে বৃষ্টি, আর বৃষ্টিতে সে সহস্র দীপালোক কি চমৎকার দৃশ্য! একতলার উদ্যানও একটি প্রকাণ্ড আম্রবন। আম্রবনের ভিতরে সহস্র সহস্র কমলালেবুর গাছ। এত কমলালেবুর গাছ কখনো দেখি নাই। যখন কমলালেবুর গাছ ফুলে আচ্ছাদিত হইয়া যায় তখন তাহার তীব্র মিষ্ট গন্ধে বায়ুকে পীড়িত করিয়া তোলে। যখন গাছগুলি সহস্র সহস্র পাকা কমলালেবুর ভারে অবনত হইয়া পড়ে তখন সে কি সুন্দর দেখিতে হয় বলিতে পারি না। ফলের শোভা এমন আর কোথাও দেখি নাই। শালিমার উদ্যানে বৈশাখ মাসে বৎসর বৎসর একটা প্রকাণ্ড মেলা হয়। তাহার নাম চিরাগোঁকা-মেলা বা দীপোৎসব। ন্যূনাধিক স্ত্রী পুরুষ এ মেলায় আসিয়া শালিমারে জড় হয়। মেলা তিন দিন থাকে। নাচ ও কুস্তির ধূম পড়িয়া যায়। ফোয়ারাগুলি এ সময়ে দিন রাত চলিতে থাকে। সন্ধ্যা হইলে সহস্র সহস্র প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। পঞ্জাবে অবরোধ প্রথা নাই। পঞ্জাবী পুরুষ যেমন দীর্ঘকায়, সবল শরীর ও সুগঠিত দেহ, পঞ্জাবী রমণী তেমনি তপ্তকাঞ্চনবরণী, অঙ্গ সৌষ্ঠবশালিনী, অনিন্দ্যরূপসী। পঞ্জাবী পোষাকও অতি সুন্দর ও সুরুচি সঙ্গত। রঙ্গিন বা জরির কাপড় ছাড়া স্ত্রীলোক অন্য কাপড় পরে না। সহস্র সহস্র সুন্দরী স্ত্রী ও সহস্র সহস্র সুন্দর বালক বালিকা এ মেলার শোভা বর্দ্ধন করে—দেখিয়া বাঙ্গালীর চোখ জুড়ায়। রাত্রিকালে এই মেলার কদিন এই লক্ষ লোক আম্রবনে আম্রবৃক্ষতলে সতরঞ্চি বা কম্বল বিছাইয়া শুইয়া থাকে। আর একটা কথা বলিয়া শালিমার সমাপ্ত করিব। শালিমার নির্ম্মাণ করিতে কত দূর দূর দেশ হইতে কত কত কারিগর আনাইতে হইয়াছিল তাহা এই বলিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে শালিমারের পার্শ্বস্থিত বাগোয়ানপুরা বা বাগানপুর গ্রাম সেই কারিগরদিগের বংশধরদিগেরই গ্রাম। এখানে কোন গাম আগে ছিল না। যে সব কারিগর ও মজুর শালিমার নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারা এইখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। নির্ম্মাণ কার্য্যে বহু বৎসর লাগিয়া যায়—কত কারিগর মরিয়া যায়, তাহাদের স্ত্রী পুত্রেরা এখানেই থাকিয়া যায়। অনেক কারিগর উপনিবেশের বসতি আর ভাঙ্গিয়া দেশে যায় না। বাগোয়ানপুরা এখন একটি ক্ষুদ্র সহর বলিলেই হয়। কত লোক আর কত কালই না জানি শালিমার নির্ম্মাণে লাগিয়াছিল।

লাহোরে বড় ফুলের শোভা—এমন ফুলের শোভা আমি কোথাও দেখি নাই। আনারকালী বা গোলবাগ নামে একটি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান আছে, তাহারই বা কত শোভা। আর লাহোরের লরেন্স গার্ডন্‌সের মত বাগান ত অতি অল্পই আছে। কলিকাতার ইডেন্ গার্ডনসের তুল্য না হইলেও তাহার পরে অদ্বিতীয় বটে। বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, দিল্লীতে ত এমন একটিও বাগান নাই। ইডেন গার্ডন্‌সে প্রবেশ করিলে যেমন ইডেন্ গার্ডন্‌সের অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশল একবারও চোখে পড়ে না, মনে হয় নিসর্গের স্বহস্ত তৈয়ারি উদ্যান, লরেন্স গার্ডন্‌স্ ও তেমনি। গোলাপ ফুল এ উদ্যানে ও গোলবাগে যেমন দেখিয়াছি

তেমন কোথায় দেখি নাই। এক রকম গোলাপ গাছ আছে, এক একটা গাছে এক একটি ক্ষুদ্র উদ্যান পুরিয়া যায় বলিলেও হয়—এক একটা গাছে এক একটা ঝোপের সৃষ্টি আর সে ঝোপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুগ্ধশ্বেত বা ঈষৎ গোলাপী রঙ্গের গোলাপ রাশিতে আচ্ছাদিত, এত বড় সুন্দর ও সুগন্ধ গোলাপ দেখি নাই। এক একটা গাছের গোলাপের গন্ধে এক একটা বাগান আমোদ করে। এই লরেন্স্ গার্ডন্‌সে দুটি রমণীয় হর্ম্ম্য আছে। একটি লর্ড লরেন্সের স্মৃতি চিহ্ন, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। আর একটির নাম মণ্টগমেরি হল—স্যার রবার্ট মণ্টগমেরি পঞ্জাবের একজন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন—তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন। মণ্টগমেরি হলটি ইংরেজি রকমের সুন্দর বাড়ী। দুটা হলই দেশীয়দের টাকায় নির্ম্মিত। কিন্তু দেশীয়দের তাহাতে প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই হয়। শ্বেতকর্ত্তারা উহাদিগকে নাচ গানের, পড়া শুনার স্থান করিয়াছেন।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

বীরকাহিনী।

গ্রীক বীরত্ব।

এবার আর গ্রীসের রক্ষা নাই। রাজাধিরাজ পারস্য অধিপতি তাঁহার অসীম ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কুবের ভাণ্ডারের সাহায্যে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গ্রীস অধিকার করিতে আসিতেছেন। পারস্যপতির অধিকারস্থ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের তুলনায় গ্রীস সমুদ্রে নীহার বিন্দুবৎ কিন্তু তাহা বলিয়া পারস্যরাজ লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। "যার ছেলে যত খায় তার ছেলে তত চায়" পারস্য রাজের নিতান্ত ইচ্ছা গ্রীক রাজগণ* তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন, গ্রীস তাঁহার সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। গ্রীস আক্রমণ করিতে আসিবার পূর্ব্বে গ্রীক রাজগণের নিকট হইতে অধীনতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাদের অধিকারস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জল ও মাটী লইয়া যাইবার জন্য পারস্যরাজ তাঁহাদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন। পারস্য রাজের অতুল ক্ষমতা অসীম ঐশ্বর্য্যের কথা রাজাদের অবিদিত ছিল না, অধীনতা স্বীকার না করিলে যে সম্মুখে নিশ্চিত মরণ উপস্থিত তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তথাপি অধীনতা স্বীকার করিতে, অপমান সহ্য করিতে তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন না। দূত

---

* পূর্ব্বে রাজপুতানার ন্যায় গ্রীস ও থেসেলি, স্পার্টা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। থেসেপিয়ান, থেবান, ফোসিয়ান, মাইসিয়ান, স্পার্টান ইত্যাদি সেই সকল স্বতন্ত্র রাজ্যের স্বতন্ত্র অধিবাসীগণ।

রিক্তহস্তে প্রত্যাগমন করিল। ক্ষুব্ধ হৃদয়, ক্রোধোন্মত্ত পারস্যপতি অর্থবলে অগণ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গ্রীসাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, গ্রীসকে সমুদ্র গর্ভসাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। এ দিকে গ্রীকরাজগণও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের মুষ্টিমাত্র সৈন্য লইয়া পারস্য রাজের অগণ্য সৈন্যের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা অসম্ভব, সুতরাং দেশ রক্ষার অন্য কোন কৌশল স্থির করিতে তাঁহারা সকলে 'করিন্থ' যোজকে সমবেত হইলেন। পারস্য নৌযান সকল ইজিয়ান সাগরে আসিয়া গ্রীস বেষ্টন করিবে এবং হেল্‌স্‌পণ্ট নদী উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যগণ স্থলপথে সহজেই গ্রীসের সীমানায় পৌঁছিবে, তাহাতে বাধা প্রদানে গ্রীস সক্ষম নহে, গ্রীস রক্ষার একমাত্র উপায় দেশের মধ্যে প্রবেশ করিবার যে সঙ্কীর্ণ পথগুলি আছে—যাহার মধ্য দিয়া অধিক সংখ্যক শত্রুসেনা একেবারে প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেই সকল পথগুলি কোন রকমে রক্ষা করা। প্রথম সঙ্কীর্ণ পথ টেম্পিতে অগ্রে সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহা রক্ষা করা তত সুবিধা জনক নহে সেই জন্য সৈন্য-দল সেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া দ্বিতীয় পথ "থর্ম্মাপলি" রক্ষা করাই পরে স্থির হইল।

গ্রীসের উপসাগর এবং এটা পর্ব্বতের মধ্যস্থিত একটী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পথের নাম থর্ম্মাপলি। এটা পর্ব্বতস্থ আগ্নেয় নির্ঝর জলে স্নান করিয়া অনেক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি রোগ-মুক্ত হইতে এখানে আসিত সেই জন্য ইহার নাম থর্ম্মাপলি, অর্থাৎ উষ্ণ স্থানের দ্বার। ইহার স্থানে স্থানে এত সঙ্কীর্ণ যে কেবল একখানি ছোট গাড়ী যাইতে পারে। পূর্ব্বে এই পথের উভয় পার্শ্ববাসী ফোসিয়ান ও থেসেপিয়ান জাতিদের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ হওয়াতে পথের পশ্চিমাংশে একটী প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু পরে ফোসিয়ানরা আর একটী দুর্গম গুপ্ত পর্ব্বত পথের সন্ধান পাইয়া এই প্রাচীর রক্ষায় অযত্নশীল হইয়া পড়ে, এই কারণে প্রাচীরের স্থানে স্থানে এক্ষণে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

এই পথ রক্ষা করিতে স্থির করিয়া পারস্য নৌযান যাহাতে উপসাগর অতিক্রম করিয়া পথের ওপার্শ্বে সৈন্য লইয়া না যাইতে পারে সেই জন্য উপসাগর তীরে সমুদয় নৌযান স্থাপিত ও পথের মুখে স্পার্টার রাজা লিওনিডসের অধীনে গ্রীসের সমগ্র রাজাদিগের সমবেত ৪০০০ সৈন্য রক্ষিত হইল। পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বত্য পথের কথা রাজাগণ জানিতেন না সুতরাং ভাবিলেন সব সুরক্ষিত রহিল। লিওনিডস জানিতেন যে এ যুদ্ধে নিশ্চয় মৃত্যু সেই জন্য যাহাদের সন্তান সন্ততি আছে অর্থাৎ কোন পরিবার একবারে নির্ব্বংশ না হয় এইরূপ সাহসী ও বীর ৩০০ জন স্পার্টান সৈন্য তিনি নিজে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। তাহারা দেশ হইতে আসিবার সময় নিজের নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া আসিল। (তাহা-দের বিশ্বাস ছিল অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন না হইলে মনুষ্য ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়)। লিওনিডসের স্ত্রী ও অন্যান্য স্পার্টান রমণীগণ "যুদ্ধে জয় লাভ কর নয় ত মৃত্যু লাভ কর" এই আশী-র্ব্বাদ করিয়া স্বামী পুত্রকে বিদায় দিলেন। বীর মাতার বীর পত্নীর উপযুক্ত আশীর্ব্বাদ!

লিওনিডস থর্ম্মাপলিতে উপস্থিত হইলে ফোসিয়ানরা তাহাদের আবিষ্কৃত পার্ব্বত্য পথের কথা লিওনিডসকে জ্ঞাপন করিল এবং তাহারাই সে পথ রক্ষা করিবার প্রার্থনা করিল। লিওনিডস তাহাতে সম্মত হইয়া, ভগ্ন প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পারস্য সৈন্য আসিয়া পঙ্গপালের ন্যায় দেশ ছাইয়া ফেলিল তাহা দেখিয়া অনেক গ্রীকের মনে মনে সাহস ক্ষীণ হইয়া পড়িল কিন্তু লিওনিডস অটল সাহসে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। এই সময় পারস্য রাজের এক জন গুপ্তচর আসিয়া দেখিল যে গ্রীকেরা কেহ কেহ অস্ত্র খেলায়, এবং অবশিষ্ট তাহাদের দীর্ঘ কেশ বিন্যাসে রত। চর যাইয়া রাজাকে এই সংবাদ প্রদান করিল। ডিমারাটস নামক এক জন বিশ্বাসঘাতক নির্ব্বাসিত গ্রীক রাজকুমার পারস্য রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; পারস্য পতি তাঁহাকে ডাকাইয়া যুদ্ধের সময় গ্রীকদের এরূপ বিলাসিতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার বলিলেন উহা বিলাসিতার চিহ্ন নহে, তাহারা যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে উহা তাহারই চিহ্ন; গ্রীকদের রীতি এই যে কোন বিশেষ বিপদে যাইবার পূর্ব্বে তাহারা কেশ বিন্যাস করে। তথাপি রাজার বিশ্বাস হইল না যে তাহারা এই মুষ্টি মাত্র সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত বাস্তবিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, ভাবিলেন তাহারা নিশ্চয়ই ভয় পাইয়া বিনা যুদ্ধে অধীনতা স্বীকার করিবে এবং এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি দুই দিন গ্রীক সেনা আক্রমণ করিলেন না কিন্তু তাহাতেও গ্রীকরা অধীনতা স্বীকার করিল না দেখিয়া তৃতীয় দিনে সম্রাট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

গ্রীকদের হস্তে অনেক শত্রু সৈন্য ধ্বংশ হইতে লাগিল, কিন্তু পারস্য সৈন্যগণ পর্ব্বতের ন্যায় দুরভেদ্য গ্রীক ব্যূহের কিছুই করিতে পারিল না। এই দৃশ্যে পারস্যরাজ ক্রোধে তিনবার সিংহাসন হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—তাঁহার সৈন্যগণকে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু গ্রীকরা তাহাদের দেশের জন্য—স্ত্রী পুত্রের জন্য স্বাধীনতার জন্য সিংহ পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছে; বেতনভোগী সৈন্যগণ তাহাদের সহিত যুদ্ধে সক্ষম হইবে কেন? প্রথম দুই দিন যুদ্ধে গ্রীকরা জয়লাভ করিল।

দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যার সময় এফিএণ্টাস নামক স্বদেশদ্রোহী একজন লোক বহু অর্থের বিনিময়ে পারস্যরাজকে অন্যতম ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য পথের সন্ধান বলিয়া দিল। তাহার পর দিন প্রভাতের অস্পষ্ট আলোকে পার্ব্বত্য পথের ফোসিয়ান রক্ষকেরা দেখিল পর্ব্বতের উপর কি শুভ্রবর্ণ পদার্থ ঝক ঝক করিতেছে তাহারা প্রথম মনে করিল পার্ব্বতীয় আগ্নেয় নির্ঝর। কিন্তু সহস্র সহস্র পারস্য সেনা, অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল রৌদ্রকিরণে বর্ষা ঝকমক করিতেছে। অত সৈন্য দেখিয়া তাহারা আর পথ রক্ষার কোন চেষ্টা না করিয়া সভয়ে পলায়ন করিল, পারস্য সৈন্য নির্ব্বাধে অগ্রসর হইল। লিওনিডস এ সংবাদ শুনিলেন, বুঝিলেন যে এবার আর কোন রকমে রক্ষা নাই, কিন্তু বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে

আসিতে শত্রুদের অনেক সময় লাগিবে, তাহার মধ্যে গ্রীকরা পলায়ন পূর্ব্বক নিরর্থক নিশ্চিত মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারে, এই ভাবিয়া যাহারা পলায়ন করিতে চাহে লিওনিডস তাহাদিগকে পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন, নিজে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পুরোহিত মেজেসটিয়স বলির অমঙ্গল চিহ্ন দর্শনে বলিলেন এ যুদ্ধে পরাজয় হইবে। লিওনিডস ও তাঁহার ৩০০ স্পার্টান ৭০০ থেসেপিয়ান ৪০০ থেবান এবং ৮০ জন মাইসিয়ান ভিন্ন অন্য সমুদয় সৈন্য পলায়ন করিল। পারস্যরাজের এখনও দুই লক্ষ সৈন্য আছে। স্পার্টান সৈন্যদের মধ্যে লিওনিডসের আত্মীয় দুই জন রাজকুমার ছিলেন, তাঁহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত করিয়া তাঁহাদের প্রাণ রক্ষার মানসে লিওনিডস তাঁহাদের দুই জনকে স্পার্টায় লইয়া যাইবার জন্য দুইখানি পত্র দিলেন, কিন্তু একজন উত্তর করিলেন তিনি যুদ্ধ করিতেই আসিয়াছেন, পত্র বহন করিতে আসেন নাই, আর একজন বলিলেন স্পার্টায় পত্র প্রেরণের কোন আবশ্যক নাই, তাঁহার কাজেই স্পার্টা তাঁহার বক্তব্য জানিতে পারিবে। কেহই যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। এ দিকে শত্রু সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল—তুমুল যুদ্ধ বাধিল। লিওনিডস নিহত হইলেন, তাঁহার নগর অধিকারের নিমিত্ত প্রবল বেগে সংগ্রাম চলিতে লাগিল। পরিশেষে থেসেপিয়ানরা সমুদয় হত হইল, থেবানরা ভয় পাইয়া পারস্য রাজের আশ্রয় যাচিঞা করিল, তিনি আশ্রয় দান করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে তাহাদের গাত্রে "বিশ্বাসঘাতক" এই অপরাধের বাক্য খোদিত হইল।

এখন কেবলমাত্র স্পার্টানরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবশিষ্ট রহিল তাহারা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। যতক্ষণ একজনও জীবিত ছিল যুদ্ধের শেষ হয় নাই। সন্ধ্যার সময় গ্রীক ক্ষেত্রে কেবল হস্ত-পদ-ছিন্ন মৃতদেহ ও ইতস্তত নিক্ষিপ্ত তীর বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রাদি ভিন্ন জীবিতের কোন চিহ্নই ছিল না। ৩০০ শত স্পার্টান বিশ হাজার পারস্য সেনা বিনষ্ট করিয়া একে একে হত হইলে যুদ্ধের শেষ হইল।

পারস্যরাজ জয়ী হইয়া অগ্রে তাঁহার সৈন্যদের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অধিকাংশ সরাইয়া ফেলিলেন, তাঁহার অত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে তাহা কাহাকেও জানিতে দিবেন না এই ইচ্ছা। তাহার পর তাঁহার অমাত্য পারিষদবর্গকে ডাকাইয়া জয়বিন্দু স্বরূপ লিওনিডসের মস্তক সকলের সম্মুখে কাষ্ঠদণ্ডে স্থাপন করিলেন।

গ্রীকরা তাহাদের পরাজয়ের চিহ্ন স্বরূপ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে পরে লিওনিডসের স্মরণার্থে তাঁহার যশকাহিনী সমন্বিত একটী সিংহমূর্ত্তি ও অন্য চারি হাজার বীরসেনার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ প্রথম দুই দিনের যুদ্ধকালিনী খোদিত আর একটী স্তম্ভ যুদ্ধক্ষেত্র দ্বারে স্থাপন করিল। নিজ স্পার্টাতেও ৩০০ শত স্পার্টানদের নাম খোদিত আর একটি স্তম্ভ স্থাপিত হইল, এবং এই সমস্ত স্তম্ভগুলি গ্রীক কবি সাইমোনিডস রচিত কবিতায় ভূষিত হইল।

আজ অনেক দিন হইল সে সিংহমূর্ত্তি সে স্তম্ভ সে খোদিতাক্ষর ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে, এখন নূতন জমী এটা পর্ব্বত ও উপসাগরের মধ্যে আসিয়া আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়া বিস্তৃত প্রদেশের সৃষ্টি করিয়াছে, এখন আর সে থর্ম্মাপলিও নাই, কিন্তু লিওনিডসের ও তাঁহার বীর সেনাদের নাম; তাঁহাদের স্বদেশহিতৈষীতা, তাঁহাদের গৌরবময় পরাজয়-কাহিনী আজও জগতে ঘোষিত হইতেছে, তাহা ধ্বংশ হইবার নহে।

দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ।

ত্রয়ীসাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদং
পথ্যমিতি চ।
রুচিণাম্ বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাংনৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি
পয়সামর্ণবইব॥
মহিম্নস্তবঃ॥

"দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ" শীর্ষক প্রস্তাবে পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিষ্কাম ঈশ্বর প্রেমকেই মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার উপর আর কথা নাই, পরমেশ্বরের পর আর তত্ত্ব নাই। এই প্রেমটি যে কি পদার্থ তাহা কুতর্কের স্পর্শযোগ্য নহে; যজ্ঞের হবিঃ কুকুরকে দেওয়াও যা প্রেমভক্তিকে তর্কের মুখে দাঁড় করানও তাই। বসন্ত ঋতুতে উৎকট প্রেমোন্মত্ত কোকিল যখন চূতাঙ্কুর আস্বাদে রক্তকণ্ঠ হইয়া গীতচ্ছলে প্রাণ ঢালে তখন তাহার কোন তর্কের অপেক্ষা থাকে। তোমার কচি ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া তোমার কাপড় ধরিয়া পড়িতে পড়িতে দাঁড়াইতে যায় তখন যে রোমাঞ্চ হইয়া হৃদয় উথলিয়া উঠে তাহা কোন যুক্তির অধীন। দীর্ঘকাল তীব্র বিরহে দুঃখ সহ্য করিয়া প্রিয়সম্ভাষণে যে সুখ তাহাতে বিচারের নিষ্প্রয়োজন। তদ্রূপ ঈশ্বর প্রেম যুক্তির বহির্ভূত।

নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্ব চলাভক্তিরচ্যুতাস্তু সদাত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সামে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

ঈশ্বর প্রীতির এইটি নিগূঢ় সন্ধান। ইহা ভক্তরাজ প্রহ্লাদের উক্তি। অন্যত্র প্রেমোজ্জ্বল ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ইহাই প্রস্ফুটিত।

নাহং বন্দেতবচরনয়োর্দ্বন্দ মদ্বন্দহেতোঃ।
কুম্ভীপাকং গুরুমপিহরেনারকংনাপনীতুং।

রম্যা রামা মৃদুতনুলতানন্দনে নাপিরস্তং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তং ॥
নাস্থাধর্ম্মেনবসুনিচয়ে নৈবকামোপভোগে
যদ্ভাব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপং।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেঽপি
ত্বপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলাখ্য পঞ্চাধ্যায়ের প্রথমাধ্যায়ে ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণি দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। শ্রুতিও এ বিষয়ে একবাক্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এ তত্ত্ব বার বার শ্রুত হওয়া যায়। কুটবল্লীতে ঈশ্বর কামেই ব্রহ্মচর্য্য আচরিত হয় ইহা শ্রোতব্য। তৈত্তিরীয় সংহিতাও ইহাই বলেন, সুতরাং পূজনীয় প্রস্তাবক মহাশয়ের নির্দ্দেশ শ্রুতিস্মৃতি অনুকুল।

তবে অদ্বৈতবস্তু ব্যতীত প্রেমভক্তি অপ্রাপ্য। প্রমাণ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ সকলেই অদ্বৈতভাবযুক্ত।

কর্ত্তা ক্রিয়াণাং সচ ইজ্যতে ক্রতুঃ
স এবতৎকর্ম্মফলঞ্চতস্য তৎ।
স্রুগাদি যৎ সাধনমপ্যশেষতঃ
হরের্ণকিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি ॥

অপি চ।

একঃ সমস্তং যদিহাস্তিকিঞ্চিৎ
তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ।
সোঽহং স চ ত্বং সচ সর্ব্বমেতৎ
আত্মস্বরূপং ত্যজভেদমোহং ॥

বৃন্দাবনের গোপিকারা অদ্বৈত ভাবাশ্রিতা। ইহার প্রমাণ ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে। যে কারণে সে প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। নারদ পঞ্চরাত্রে ইহাই ব্যক্ত রহিয়াছে যথা,

নামাপ্যস্যাপ্যনন্তানি তীর্থপূতানি নারদ।
অনন্তানি চ বিশ্বানি বিচিত্রকৃত্রিমাণিচঃ ॥
নানাবিধানি সর্ব্বাণি জীবরূপাণি সর্ব্বত।
তথাচ যথৈব শাতকুম্ভেষু নির্ম্মলেষু জলেষু চ।
প্রত্যেকং প্রতিবিম্বশ্চ দৃশ্যএব হি জীবিনাং ॥

অন্যচ্চ।

সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ প্রত্যক্ষং প্রতিজীবিষু ॥
ইত্যাদি

শ্রুতি যে কখন দ্বৈত সহ্য করেন না ইহা নিশ্চিৎ।

অথ যোঽন্যাংদেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি নসবেদ যথা পশুরেব সদেবানামিতি শ্রুতিঃ।

সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে যুক্তি দিবার কালে রামমোহন রায় এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

উদমন্তরং কুরুতেঽথ তস্যভয়ং ভবতীতিশ্রুতিঃ।

যত্রনান্যৎ পশ্যতিনান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি সভূমা যো বৈভূমা তৎ সুখমিতি শ্রুতিঃ।

এই প্রকার রাশি রাশি অদ্বৈত শ্রুতি রহিয়াছে। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অবতারণ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে ভক্তি শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত, পরম পুরুষার্থ-সাধক এবং এই প্রেম ব্রহ্মজ্ঞানের অবান্তর ব্যাপার মাত্র। শাস্ত্ররত্নগীতা স্মৃতির সুবোধিনী নাম্নী টীকা সমাপনকালে শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন

ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদ্রিতি গীতার্থসংগ্রহঃ॥
পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ। ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া॥
ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোর্জ্জুন॥

ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তের্মোক্ষং প্রতিসাধকত্বশ্রবণাৎ তদেকান্ত ভক্তিরেব মৎপ্রসাদো খজ্ঞানাবান্তর ব্যাপারযুক্তামোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে জ্ঞানস্যচ ভক্ত্যবান্তর ব্যাপার ত্বমেব,

তেষাং সততযুক্তানাম ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তিতে॥

মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ইত্যাদি বচনাৎ। নচ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতিযুক্তং

সমঃসর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মিতত্ত্বতঃ॥

ইত্যাদৌ ভেদ দর্শনাৎ। নচৈবং সতি তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতিনান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি যেতি শ্রুতিবিরোধ শঙ্কনীয়ঃভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জ্বলনানাম সাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ

যস্যদেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথাগুরৌ।
তস্যৈ তে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন॥

দেবং পরংব্রহ্মব্যাচষ্টে। যমেবৈষবৃণতে তেন লভ্য ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি পুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি তস্মাৎ ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতিসিদ্ধং।

এ কথাগুলি অতিশয় গুরুতর। এ নিমিত্ত ইহার অনুবাদ করিয়া পরে ইহাতে অন্য শাস্ত্র সম্মতি দেখান যাইবেক।

"গীতার সংক্ষেপ অর্থ এই যে ভগবদ্ভক্তিযুক্ত জীব তাঁহার প্রসাদজাত আত্মবোধ হইতে সুখে বন্ধন বিমুক্তি হয়। তথাহি,

"হে পৃথা তনয় সেই পরম পুরুষ অনন্য ভক্তির দ্বারা লভ্য।"

"হে অর্জ্জুন এবম্বিধ অর্থাৎ বিশ্বরূপ যে আমি হে পরন্তপ সেই আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে দর্শন করিতে ও তদাত্ম্য লাভ করিতে এক নিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা সক্ষম হয়।" ইত্যাদি স্থলে ভগবদ্ভক্তির মোক্ষ সাধকত্ব শ্রবণ করা বিধায়ে তদেকান্ত ভক্তিই আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রসাদোত্থ জ্ঞানাবান্তর ব্যাপারযুক্ত হইয়া মোক্ষহেতুভূত হয় ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। ভক্তি যে জ্ঞানের অবান্তর ব্যাপার তাহার প্রমাণ,—"যাহারা নিত্য অভিযুক্ত হইয়া স্নেহ বশতঃ আমার ভজনা করে তাহাদিগকে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করি যাহা দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।" "আমার ভক্ত ইহা অর্থাৎ ঈশ্বর স্বরূপ অনুভব করিয়া আমার ভাব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন"—ইত্যাদি বচন হইতে পাওয়া যায়, জ্ঞানই যে ভক্তি ইহা যুক্ত নহে যেহেতু—"সর্ব্বভূতে সাম্যাশ্রিত জীব আমার সম্বন্ধে পরাভক্তি লাভ করেন। "ভক্তি দ্বারা আমি যিনি ও যেরূপ তাহা স্বরূপতঃ ভক্ত অনুভব করেন।"—ইত্যাদি বচনে জ্ঞান ও ভক্তির ভেদ দেখা যায়, যদি এরূপ হইল তবে আর এই যে শ্রুতি—"তাঁহাকে জানিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন, মোক্ষের অন্য পন্থা নাই"—ইহার বিরোধশঙ্কা অকর্ত্তব্য যেহেতু ভক্তি জ্ঞানের অবান্তর ব্যাপার। কাষ্ঠের দ্বারা পাক করিতেছে বলিলে জ্বলনের অসাধনত্ব উক্ত হয় না।

আরও দেখা যায় যে এইরূপ হইলেই এই সমস্ত শ্রুতি স্মৃতিপুরাণ বচনের সামঞ্জস্য হয়। বচন যথা, "যাহার ঈশ্বরে পরাভক্তি ও গুরুর প্রতিও তদ্রূপ সেই মহাত্মার কথিত অর্থ সকল প্রকাশিত হয়।" "পরব্রহ্ম তারকদেবকে ভজন করি।" "এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন তাহার দ্বারাই তিনি লভ্য হয়েন।" অতএব ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষহেতু ইহা সিদ্ধ হইল।"

মহাভারতে পরম ভক্ত বিদুর বলিয়াছেন,

যা প্রীতি পুণ্ডরীকাক্ষ তবাগমন কারণাৎ।
সা কিমাখ্যায়তেতুভ্যং অন্তরাত্মাসিদেহিনাম॥

যদি চৈতন্যরূপী ঈশ্বর সর্ব্বদেহীর আত্মবোধ হইতেন তাহা হইলে কি আর এমন প্রীতি উদয় হইত? "পরমাত্মন্ তোমাকে ভাল বাসি" ইহা জ্ঞান সুতরাং এই জ্ঞানের যে তাদাত্ম্যে পর্য্যবসান হইবে তাহা সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাদাত্ম্যের অধিক আর জ্ঞান নাই। আর এই তাদাত্ম্য জ্ঞানেরই নামান্তর মোক্ষ। ব্রহ্মোবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবাতীতি শ্রুতিঃ। বিষ্ণুপুরাণেও শুনা যায় ন জ্ঞানাৎ বিদ্যতে পরম্। সুতরাং জ্ঞান যে মোক্ষের অব্যবহিত হেতু তাহা শাস্ত্র সম্মত ইহা কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন না। ভক্তগণ যে জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করেন তাহা অহংকার মিশ্রিত বাহ্য জ্ঞান, আন্তরিক অনুভব নহে।

এখানে এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে অদ্বৈত জ্ঞান ভেদজ্ঞান শূন্য তবে কি প্রকারে ভক্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্য হইতে পারে। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, অদ্বৈত জ্ঞান সিদ্ধাবস্থাতেই উদয় হয়। সাধন কালে দ্বৈত মানিয়া লইতে হইবে। তৎত্বমসি বাক্যের এরূপ অর্থ নয় যে "তুমিই ঈশ্বর," "ঈশ্বরই তুমি" ইহাই এস্থানে উপদিষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান অনন্তগুণপেত ঈশ্বর ও অল্পগুণ অল্পশক্তিমান ও অসদ্‌গুণযুত জীব এই দুয়ের প্রভেদ দেখিয়া পরে তৎপদ ও ত্বম্পদ শুদ্ধ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়।

উপাধি বিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেম্মুনিঃ।
জলে জলং বিয়দ্ব্যোম্নিতেজস্তেজসিবা যথা॥

ভগবদ্‌গীতাতেও জ্ঞানভেদ কালে প্রদর্শিত হইয়াছে—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধিসাত্ত্বিকং॥ ১॥
পৃথক্ত্বে ন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধিরাজসং॥ ২॥

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত জ্ঞান অদ্বৈতাত্ম দর্শন। দ্বিতীয় দ্বৈতজ্ঞান। সত্ত্বোৎকর্ষ হেতু আত্ম দর্শন যাবৎ উপস্থিত না হয় তাবৎ দ্বৈত জ্ঞানাবলম্বন করা প্রয়োজন। রজোগুণ কর্ম্মাত্মক সুতরাং সাধন ক্রিয়োপহিত জ্ঞান অবশ্যই রাজসিক ও দ্বৈত। অদ্বৈতাচার্য্যগণ কখনই এমন উপদেশ করেন না যে ব্যবহার দশায় অদ্বৈত জ্ঞানের ভান করিয়া বস্তুতঃ দ্বৈত জ্ঞানাবলম্বন করিবে। অনেকে আত্মোপদেশ ধারণে অপারগ হইয়া তামসিক জ্ঞানকে অদ্বৈত আত্মদর্শন বলিয়া গ্রহণ করেন। এই তামস জ্ঞান বিশেষ রূপে হেয়। ইহা গীতা স্মৃতিতে প্রকটিত রহিয়াছে।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যেসক্তমহেতুকং।
অতত্ত্বার্থ বদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং॥

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যচ্চন্দ্রতারকেতিষ্ঠন্ যশ্চন্দ্র তারকান্তর। সুতরাং অদ্বৈত আত্মা বিশ্ব নহে।

দ্বৈতগুরু মধ্বাচার্য্য এই প্রকার শ্রুতি বিরোধী ও তমোগুণ জাত প্রমাদ বশতঃ জাত ব্যবহারিক দশাতেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ মিথ্যা জ্ঞানকে অদ্বৈত জ্ঞান ভ্রমে গ্রহণ যাহাতে না হয় তাহারই উপদেশ করিয়াছেন। রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে জীব ও ঈশ্বর এ উভয়ের প্রভেদকারিণী যে মায়া তিনি ঐকান্তিক অসৎ নহেন। যেহেতু একটী জীবেরই মুক্তি হইলে সকল জীবের মুক্তি হয় না। পুরাণী প্রবৃত্তি অবিদ্যা প্রবাহ রূপে নিত্য সুতরাং যিনি মুক্ত তাঁহার পক্ষে অবিদ্যার নাশ হইল বটে কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা অক্ষুণ্ণ রহিল সুতরাং মায়াকে পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি বলিলে তাহা কোনমতেই তাহাকে ঐকান্তিক অসৎ বলা যায় না। যেহেতু

ইহা চৈতন্যময় পরমাত্মার শক্তি কিন্তু অন্য পক্ষে উহা সৎও নহে যেহেতু উহার স্বাতন্ত্র্য নাই, উহা জড়, ঈশ্বরের চৈতন্য অংশ হইতে বিবিক্ত করিয়া লইলে উহা অসৎ কেননা বস্তুতঃ অগ্নি ও তৎদাহিকী শক্তির ন্যায় মায়া ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে সুতরাং যে অংশে উহাকে বিবিক্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয় সে অংশে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না, মায়া যে তাহা সদসৎ উভয়াত্মিকাও নহেন যেহেতু উভয়াত্মিকত্ব দেশকাল অধীন কিন্তু মায়া পরাশক্তি বলিয়া ক্রিয়াশক্তিরূপ কাল ও তমঃপ্রধান ভূতাদি আকাশ হইতে উচ্চ পদবীস্থা ও তাহাদের নিয়ন্ত্রী। এই নিমিত্তই মায়া সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান বিরোবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।

আসল কথাটা এই যে যাহা ভ্রম তাহাকে যদি ইহা এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইত তাহা হইলে তাহা ভ্রম না হইয়া সত্য হইত। মায়া পরমেশ্বরের শক্তি সুতরাং উহা স্বতন্ত্র শক্তি এই বলিয়া কেহ অস্বতন্ত্র করিতে পারিবেন না। পরমেশ্বর যাহা খুসী তাহাই করিতে পারেন ন তস্য কশ্চিৎপতিরস্তি লোকে। ন তৎসমোস্ত্যধিকং কুতোহন্যে। এইরূপ শ্রুতিস্মৃতি প্রতিপাদিত পরমেশ্বরের ইচ্ছাকে কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারে না যেহেতু তদ্বহির্ভূত কোন নির্দ্দেষ্টা কেহ নাই। একমাত্র মায়াবী পরম পুরুষই মায়াকে জানেন। কি বলিয়া জানেন? নিজের স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া। তাঁহার জ্ঞানশক্তি অনাবৃত। এই নিমিত্তই রামানুজাচার্য্য খল দূষিত নাম মাত্র অদ্বৈতবাদকে প্রত্যাখান করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত প্রতিপন্ন করেন। তিনি ইহাই শিক্ষা দেন যে মায়া সম্পূর্ণাসৎ নহে আর সাধন দশায় অদ্বৈতাবলম্বন দুষ্ট যেহেতু উহা কেবল ভান মাত্র। বল্লভাচার্য্য স্বীয় প্রস্থানকে শুদ্ধাদ্বৈত নামে প্রকাশিত করেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় এই যে যাবৎবহিঃ কলকল তাবৎই নানা বিবাদ বিসম্বাদ যথার্থ পক্ষে নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব।

আসল কথাটা এই যে পরমেশ্বর অনন্তরূপে সগুণ ও নির্গুণ এ উভয়ই। কিন্তু যুক্তি দ্বারা এ অগাধ সমুদ্র পার হওয়া যায় না যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যঃ। ভেবে দেখ, তোমার খোকা ক্রমে মানুষ হইয়া পরে দেশ বিখ্যাত মান্যগণ্য হইয়া উঠিল কিন্তু তোমার বাৎসল্য প্রেমের নিকট সে সকল গুণ কোথায়? প্রেমের এমনই স্বভাব যে উহাতে সর্ব্বগুণ লোপ পাইয়া কেবল তাদাত্ম্যই স্থির থাকে। যতদিন ঈশ্বরের গুণ দৃষ্টিগম্য হয় ততদিম প্রেমেব পরিপাক হয় না। ততদিন জীব ঈশ্বরকে চায় না তাহার গুণকেই চায়। যে বস্তুতে তোমার কিছু মাত্র লোভ নাই সে বস্তু কখনই তোমার জ্ঞানগম্য হইবে না। সুতরাং যখন তুমি ঐকান্তিক ভক্তি যোগে ঈশ্বরকেই কামনা করিবে অপর সমুদয় বস্তু অসার বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি ফিরিয়াও চাহিবে না তখনই তুমি কৃতকৃতার্থ হইবে। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত পরম গুরু শারীরক ভাষ্যে ক্রমমুক্তি বিচার কালে ইহা উপদেশ করিয়াছেন। গীতাস্মৃতির অষ্টমাধ্যায়ে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রে শ্রদ্ধা করেন তাঁহাদিগকে আর অধিক বলি-

বার আবশ্যক নাই। শুষ্ক হেতুবাদের দ্বারা প্রেমতত্ত্ব অপ্রাপ্য। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রুতিরাশি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজ হেতুবাদী। পূজ্যপাদ দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ প্রস্তাব লেখক সুতরাং যুক্তি ভিন্ন সন্তুষ্ট হইবেন না। এনিমিত্ত শ্রুতি অনুকূল যুক্তি দ্বারা বিরোধি যুক্তি খণ্ডন করিয়া পাঠককে অদ্বৈতাভিমুখী করিতে চেষ্টা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ ইহা বক্তব্য যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের বিষয়ী অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় চৈতন্যাভাসকে মুখ্য আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই—ইহা সহজেই দেখা যায়। অস্মৎ প্রত্যয় গোচর জীব ও যুষ্মৎপ্রত্যয় গোচর ঈশ্বরে ভেদ কথন স্থলে অদ্বৈত মুখ্য আত্মা গ্রহণ করিলে প্রকৃতের হানি ও অপ্রকৃতের কল্পনা করা হয়। এস্থলে ব্রহ্মের শাস্ত্র প্রতিপাদ্যত্বই বিচার্য্য। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ। যদি তিনি প্রসিদ্ধ হয়েন তবে তৎবিষয়ে মীমাংসার আবশ্যক নাই। যদি অপ্রসিদ্ধ হয়েন তাহা হইলে মীমাংসা অসম্ভব। সুতরাং অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ইত্যাদি শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্ম একেবারে অবিষয় নহেন কেন না চিদচিদ্গ্রন্থি অহংকারে তিনি আভাস রূপে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু এই বুদ্ধিতে উপহিত চৈতন্য মুখ্য আত্মা নহেন। শরাবস্থ জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য মুখ্য সূর্য্য নহে। পূজনীয় লেখক মহোদয় এই আভাসচৈতন্যকে মুখ্য চৈতন্য বলিয়া মানিয়া লইয়া দেখাইয়াছেন যে যদি উপাধি অর্থাৎ বিষয় না থাকে তবে উপহিত চৈতন্য থাকিতে পারে না। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই। শরাবস্থ জল না থাকিলে প্রতিবিম্ব-সূর্য্য থাকিবে না—ইহা সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বিচার্য্য বিষয় এই যে উপাধিভঙ্গ অর্থাৎ অন্তঃকরণ ধ্বংশহেতু জীব চৈতন্য নিরুপাধিক মহাচৈতন্যে লীন হইলে পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় কি না এবং এই পুরুষার্থ লাভের অদ্বৈতজ্ঞান ভিন্ন অন্য উপায় আছে কি না এ বিষয়ে অদ্যাপি কোন সারগর্ভযুক্তি বা শ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং শাস্ত্রযোনি ঈশ্বর যদি মিথ্যাবাদী না হ'ন ও আচার্য্যগণ যদি বঞ্চক না হ'ন এবং সদ্যুক্তি যদি অসৎ না হয় তবে কোনকালে অদ্বৈত বিরোধী ন্যায় বা শ্রুতি কখনও কুত্রাপি পাওয়া যাইবে ও না।

পঞ্চদশী হইতে যে বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাও মুখ্য আত্মা প্রতিপাদক নহে।

অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যবেদ নতুকচিৎ।

এস্থলে আত্মা শব্দে বিজ্ঞানময় কোশ বা জীব। ইহা সুস্পষ্ট।

অহং বৃত্তি রিদম্বৃত্তি রিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহং বৃত্তি রিদম্বৃত্তি র্মনো ভবেৎ॥

যাহাকে আত্মা বলা হইয়াছে এ স্থলে তাহাকেই অহংবৃত্তি যুক্ত অন্তঃকরণ বলা হইয়াছে। আত্মা অন্তঃকরণের অন্তর্ভূত বা বৃত্তি নামধেয় নহেন। সুতরাং বিষয়

সংযোগ ভিন্ন বিজ্ঞানময় কোশ থাকিতে পারে না ইহা সহজে বোধগম্য হয়। বিজ্ঞানময় কোষ অবিদ্যার বিজৃম্ভন মাত্র সুতরাং যত দিন বিজ্ঞানময় ততদিন যে অবিদ্যা ও যতদিন অবিদ্যা ততদিন যে বন্ধন ইহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

যদি এমন তর্ক উঠে যে মোক্ষ বলিয়া কোন কিছু একটা নাই তাহাতে এই উত্তর, যে মোক্ষ প্রতিপাদিকা বলবতী শ্রুতি রহিয়াছে। শ্রুতি অগ্রাহ্য করিলে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিতে হয় যেহেতু যুক্তি দ্বারা কেহ কখনও ঈশ্বর সপ্রমাণ করিতে পারিবে না—ইহা জৈমিণি দর্শনে সুস্পষ্ট। যাহাহউক এ স্থানে সে বিষয়ের বিচার নিষ্প্রয়োজন। শ্রুতি অনুমোদিত মার্গানুসরণ করিয়া জ্ঞান লিপ্সু হওয়া অপেক্ষা মনুষ্যের উচ্চতর লক্ষ্য কেহই দেখাইতে পারিবেন না। যে কোন আশ্রমে থাকুক্ যে কোন বর্ণ হউক না জ্ঞানের জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আমার ঘুম ভেঙ্গেছে।

আমার ঘুম ভেঙ্গেছে,
শীতের প্রভাতে আছে বসন্তের পাখী
আঁধার বকুল শাখে উঠিয়াছে ডাকি !
কাননের প্রাণ হতে
কুয়াশা পড়িছে ছুটে,
আশার উষার রাগে মুখানি রেঙ্গেছে ;
আমার ঘুম ভেঙ্গেছে।
যেতে যেতে বল পাখি, কোন ফুলময় দেশে ?
সুদূর প্রবাসে এই একাকী পড়েছ এসে ?
দিশাহারা সাথী হারা
ডাকিছ, আকুল পারা.
সে গানের প্রতিধ্বনি হৃদয়ে জেগেছে ;
আমার ঘুম ভেঙ্গেছে।
না পাখি; গেয়োনা আর অমন আকুল তানে ;
দেখদেখি কে চাহিয়ে তোমার মুখের পানে !
কেনগো উতলা তুমি !
এ নহে প্রবাস ভূমি—
তোমারি কানন, এযে তোমারি আশায় আছে।

সে দিনের কথা হায় মনে কি পড়েনা তোর ?
গাহিতে কাননে থাকি সুখের স্বপনে ভোর ?
শাখে শাখে ফুল ফুটে
চরণে পড়িত লুটে,
হায়রে সে ফুল বটে বহুদিন ঝরিয়াছে !
তবুত এ বন সেই যদিও কুসুম হীন,
সবি আছে. গেছে তার শুধু বসন্তেরি দিন।
তাই আজ পাখি হা রে !
চিনিতে নারিস তারে—
এমন মলিন দীন তোরি তরে যে হয়েছে !
যে দিন হইতে তুই গিয়েছিস দেশান্তরে,
সেই দিন হতে তার ফুলগুলি গেছে ঝরে ;
সেই দিন হতে তার
হৃদি মন অন্ধকার
সেই দিন হতে তার হাসি সব ফুরায়েছে।
আজ তুই চাহিলিনে,
আজ তারে চিনিলিনে
আকুল যাবার তরে প্রবাসীর মত এসে !

সরলা কানন বালা—
কেমনে সঁপিবি জ্বালা!
সে যেরে নেহারি তোরে সব দুঃখ ভুলিয়াছে!
বসন্তের নব আশা তাহার শীতের প্রাণে—
জাগিয়ে উঠেছে যেরে তোর কুহু কুহু তানে!
হায় সে বসন্ত হ'রে
সে আনন্দ ম্লান ক'রে
কেমনে চলিয়া যাবি কে হেন নিঠুর আছে!
ভাল বেসেছিস তুই এক দিন যারে!
এবে ফুল হীন ব'লে
কেমনে যাইবি চলে?
ভাসাইবি নিরাশায় কেমনে তাহারে?
পাখিটিরে—
এলি যদি পথ ভুলে
গারে গা হৃদয় খুলে,
মরমের সাধখানি পুরুক তাহার,
কাননের ফুল্ল হাসি
করিসনে যেন বাসি
—ফুটেছে শীতের প্রাতে বসন্ত বাহার—
ফুটুক তাহারে ম্লান করিস নে আর।
ঘুম ভেঙ্গেছে আমার।

হেঁয়ালি নাট্য।

কৃষ্ণ। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" এ কথার মানে এত দিন বুঝতে পারিনি, এখন ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছি।

হরি। কি ভাই, অর্থ টা আমাকে বুঝয়ে দেও না।

কৃষ্ণ। এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করে এই বাঙ্গালা কথাটার ভিতর যে গূঢ়ভাব লুকান আছে সেটা যে না বুঝতে পারে তার বাঙ্গালী নাম গ্রহণ করাই উচিত নয়। বঙ্গের প্রধান কবি ভারতচন্দ্রকে উপলক্ষ করে ঐ কথাটি প্রচার হচ্ছে ইহা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

হরি। সোজা করে বুঝিয়ে বল; আমি তোমার কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলুম না।

কৃষ্ণ। যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে—অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ভিতর যা নেই এই ভারতবর্ষে তা নেই। ধর্ম্ম বল কর্ম্ম বল জ্ঞান বল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রহস্য বল যা কিছু জানবার বা শিখবার আছে বিদ্যাসুন্দরের ভিতর সব পাবে। সাধারণ লোকে বিদ্যাসুন্দরের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করতে সমর্থ নয় সেই জন্য লোকে বিদ্যাসুন্দরের প্রকৃত মর্য্যাদা এখনও বুঝতে পারেনি। আমি কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের প্রকৃত মর্য্যাদা

* গত কার্ত্তিক মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "নাকাল"।" শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, অনঙ্গমোহন দাস, নীলমণি বরাট, অনন্তলাল ঘোষ, কেদারনাথ পুণ্ডরীক, বিহারীলাল গোস্বামী, কুমুদনাথ রায়, জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

স্থাপন করতে বৃতসঙ্কল্প হয়েছি। আমি উহার আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করব। কবি ভারতচন্দ্র যা কখনও ভাবেন নাই আমি বিদ্যাসুন্দরের ভিতর থেকে সেই সকল ভাব বার ক'রে জনসমাজে ছড়াব, আধ্যাত্মিক ভাবে ভারত ভূমি মাতাব, ভারতবর্ষের পূর্ব্বগৌরব সংস্থাপন করব এ বিষয়ে আমি দৃঢ়সংকল্প করেছি।

হরি। তোমার বিদ্যাসুন্দরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও না।

কৃষ্ণ। তবে বলি শুন। ধর্ম্ম কাকে বলে? যাতে জগতের প্রকৃত হিত সাধন হয় তারই নাম ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য চেষ্টা করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সেই জন্যই ত আমি ধর্ম্ম সংস্থাপন উদ্দেশ্যে এত পরিশ্রম করছি।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

হরি। ভালরে ভাল, তোমার বিদ্যাসুন্দরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটাই বল না।

কৃষ্ণ। আরে কথা একটা বোঝাতে গেলে একটা ভাল রকম ভূমিকা করা চাইত। ধর্ম্ম কাকে বলে তাত তোমাকে বলেছি, এখন সেই ধর্ম্ম কোথা হতে শিক্ষা করতে পার? আমি বলি যে, যেখানে বিদ্যাসুন্দরের মিলন দেখতে পাবে, যাও সেইখানে খুঁজে দেখ দেখতে পাবে যে সেই বিদ্যাসুন্দরের মিলনেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। "Union of Knowledge and Beauty" এই কথাটির ভিতর মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নিহিত রয়েছে কি না একবার ভেবে দেখ দেখি। তাই বলছি যে বিদ্যাসুন্দরের মিলন যা কবিবর ভারতচন্দ্র বর্ণনা করে গিয়েছেন, তাহার ভিতর তুমি জগতের সকল রহস্য লুকান দেখতে পাবে।

হরি। বেশ বেশ, তুমি বিদ্যাসুন্দর কথার ত বেশ মানে করেছ দেখছি; তা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ভিতর ধর্ম্মের কথাটা কি আছে এইবারে বুঝিয়ে দাও দেখি।

কৃষ্ণ। বিদ্যাসুন্দর নামটার আধ্যাত্মিক অর্থ যখন বুঝেছ তখন ও কাব্যটার ভিতরে যে আধ্যাত্মিক ভাব আছে তা একটু ভাবলেই বেরুবে এখন; ও রকম অর্থ বার করা ত আর শক্ত কথা নয়। আমি এইবারে একখানি বিদ্যাসুন্দর কিনে পড়ব, তা হলেই ওর ভিতরকার গূঢ়ভাব সব বার করে ফেলতে পারব।

হরি। তুমি বুঝি বিদ্যাসুন্দরখানা এখনও পড়নি?

কৃষ্ণ। না, বইখানা পড়ি নাই বটে কিন্তু আমি বই না পড়েই উহার যে গূহ্যভাব বুঝতে পারব অন্য লোকে ৫ বৎসর পড়েও তা পারবে না। আমার মন আজকাল আধ্যাত্মিক ভাবে ভরিয়ে ফেলিছি; যেখানে যা দেখি, তার ভিতর থেকেই আধ্যাত্মিক ভাব বার করে ফেলে, অমনি টাট্‌কা টাট্‌কা হাতে হাতে খবরের কাগজে তা ছাপিয়ে ফেলি; বাসী হতে দিই নে। এই সে দিন মুকুজ্যেদের রথের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা করেছি সেটা পড় নি?

হরি। কই না।

কৃষ্ণ। তা তোমরা পড় না পড় তাতে আমার লাভালাভ নাই ; কাগজটায় এক কলম লেখবার দরুণ আমার যা পাবার তা ত আমি পেয়েছি।

হরি। ভাল, মুখুজ্যেদের রথের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা কি বল না শুনি।

কৃষ্ণ। রথটা হচ্চে মনোরথ আর ঐ যে দুটা ঘোড়া আছে একটা সাদা আর একটা নীল, উহার সাদাটা ধর্ম্ম আর নীলটা অধর্ম্ম। ঐ যে পুতুলগুলা সাজান আছে উহাদের ভিতর বড় গভীর অর্থ আছে। ঐ যে কাঁটাল মাথায় মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে উহার অর্থ মানুষ মাত্রেরই মাথার উপর তাহার কর্ম্মফল চাপান আছে।

হরি। ঐ যে পুতুলটা মেছুনী মাছ কুটচে—তার কথা কিছু লিখেছিলে।

কৃষ্ণ। লিখেছিলাম বই কি। ঐ স্ত্রীলোকটি স্বয়ং প্রকৃতি, মাছটি মৎস্যরূপী চৈতন্য, আর মাছ কুটছে—উহার অর্থ প্রকৃতির বশে সমষ্টি ভাবাপন্ন চৈতন্য ব্যষ্টিভাবাপন্ন হচ্চে। এক হতে বহু উৎপন্ন হচ্চে।

হরি। বেশ লিখেছ বটে, কিন্তু ওরূপ আর না লিখলেই ভাল ; তা হলে লোকে তোমাকে পাগল বলবে ;

কৃষ্ণ। হাহাঃ! লোকে আমাকে পাগল বলবে? আমার মত পাগল তারা আগে হোক দেখি—তা হলে দেশ উদ্ধার হয়ে যায় ”

হরি। “ কি রকম করে ভাই ”

কৃষ্ণ। “ কি রকম করে ? তা হলে আর দেশের দৈন্যদশা থাকে না। হে বঙ্গবাসী ভ্রাতাগণ তোমরা যদি দেশকে ধনী করিতে চাও, যদি দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর, যখন যে দিকে স্রোত চলে পয়সার খাতিরে সেই দিকে অঙ্গ ঢালিয়া দাও, অমূল্য পয়সা রত্নের জন্য স্বদেশের রমণীগণকেও ছার জ্ঞান করিয়া তাহাদের অপমান করিতেও লজ্জা বোধ করিও না।

হরি। Bravo! Bravo!

প্রেমফোটা।

কতবার দেখিয়াছি তারে
স্রোতময়ী তটিনীর ধারে,
এলান রয়েছে কেশপাশ,
নয়নে ঝরিছে সুধা হাস,
জলরাশি লুটিছে চরণে,
হাতখানি আনত আননে,—
—জীবন্ত নলিনী যেন মেয়ে ;
—একবার গেছি শুধু চেয়ে।
কতবার দেখেছি তাহায়
ফুটন্ত সে বকুল তলায়,
ফুলগুলি ঝর ঝর ঝরে
আশে পাশে গায়ের উপরে,

কি জানি কাহার তরে বালা
কুড়ায়ে গাঁথিছে ফুলমালা।
কতবার দেখিয়াছি তায়
গাঁথা মালা কোলেতে শুকায়—
—স্বর্ণময়-সন্ধ্যার আকাশে
আধোখানি চাঁদ আধো হাসে,
—গান গায় চেয়ে তার পানে,
অশ্রুফোটা শোভে দুনয়ানে।
একবার দেখে শুধু চেয়ে,
পাশ দিয়ে গিয়েছি চলিয়ে।
কত ফুল ফুটিছে ধরায়,
কত তারা আকাশের গায়,
ছবি ভরা জগৎ এ হেন,
তারি একখানি সেও যেন,
বাখানি চাহিয়ে মুখপানে
চলেগেছি উদাসীন প্রাণে।
শুধাতেও পড়ে নাই মনে
কোন দুখে জল সে নয়নে।
সহসা মুহূর্ত্তে কেন আজ
বিপ্লব বাধিল হৃদি মাঝ?
আজিকে কাননে যেতে বালা,
চমকি রাখিয়ে ফুলতোলা—
মুখপানে চাহিল যখন,
সুধায় ডুবিল ত্রিভুবন।

একটি সে মধুর তাকানি
প্রকাশিল ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য খণি;
আপনারে হনু বিস্মরণ,
নূতনে বিলীন পুরাতন!
প্রেমের একি এ যাদুখেলা!
উষার স্বপন সন্ধ্যাবেলা!
প্রতি দিন শত আঁখি পরে
কত ফুল ফোটে আর ঝরে,
এক দিন একটি সে ফুল
করি শুধু কবিরে আকুল,—
বাঁচিয়ে থাকে সে কবিতায়,
অন্যে যবে মৃত্যু কোলে ধায়।
প্রতি দিন শ্বেত পীত রাঙ্গা
কত শত মেঘ ভাঙ্গা ভাঙ্গা
আকাশে ভাসিছে স্তর স্তর,
একটি রঙ্গিণ শুধু থর
ধরি তার রাখে চিত্রকর,
ধরা মাঝে থাকে সে অমর।
একটি সে মধুর তাকানি
নয়নের নীরব সে বাণী
কোনক্ষণে কখন কে জানে,
কেমনে আসিয়া পড়ে প্রাণে!
কেমনে বাজে গো কাণে হায়!
সহসা সে প্রেমেরে ফুটায়?

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী

কুড়ানো।

শ্যামবাবু তাঁহার একমাত্র পুত্রকে লেখাপড়া শিক্ষার নিমিত্ত বিলাতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু গুণধর পুত্রের সে দিকে বড় লক্ষ্য নাই। তিনি আমোদ লইয়া ও বাবুগিরি করিয়াই বেড়ান। ক্রুদ্ধ শ্যাম বাবু ওরূপ স্বভাবের জন্য মহা ভৎর্সনা করিয়া পুত্রকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার স্বভাব না শোধরাইলে তাহাকে যে আর একটিও টাকা পাঠাইবেন না ইহাই বিশেষ করিয়া সে পত্রে তাহাকে জানাইয়া দিলেন। পত্র পুত্রের নিকট

পৌঁছিল ; পত্রে পুনশ্চ পূর্ব্বক লেখা "তোমার মা আমার অজ্ঞাতে তোমাকে ২০০৲ টাকা এই সঙ্গে পাঠাইতেছেন।"

চন্দ্রবাবু পল্লীগ্রামে থাকেন না। ছেলেবেলা হইতেই পড়িবার জন্য কলিকাতা বাসী। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার পীড়ার সংবাদে এবার দেশে আসিয়াছেন। নদীর অপরিষ্কার জল পানে তাঁহার বড়ই আপত্তি, তাই আসিবার সময় সঙ্গে একটী জল পরিষ্কার করা ছোট ফিলটার আনিয়াছেন, কিন্তু তবুও এক দিন পানীয় জল অপরিষ্কার দেখিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জল এত ময়লা কেন ? কলে বুঝি পরিষ্কার করতে দেওয়া হয় নি ?"

ভৃত্য। "আজ্ঞে হাঁ কলেরই জল দিয়েছি"।

চন্দ্রবাবু। "তবে বোধ হচ্ছে কলটাই ময়লা আছে পরিষ্কার করা হয় নাই, আঃ— তোদের আলসেমির জ্বালায় পারিনে !

ভৃত্য। "আজ্ঞে না আজ সকালে খুব ভাল করে কল পরিষ্কার করেছি, তাই কর্ত্তেই দিনটা কেটে গেল। কলের ঢাকা খুলে দেখি তার ভিতর একরাশ কয়লা বালি মাটী কত কি। তা সব ফেলে দিয়ে বেশ করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখলুম।"

চন্দ্রবাবু। (মহাক্রুদ্ধ স্বরে) "তার চেয়ে তোমার শ্রাদ্ধ করতে পারিনি !"

হরিহর ডাক্তার ও গোবর্দ্ধন উকীলকে হাত টরাধরি করিয়া যাইতে দেখিয়া প্রথম পথিক দ্বিতীয় পথিককে বলিল "ওরা দুয়ে মিলে একজন ডাকাত তা জান ?" দ্বিতীয় পথিক বলিল "কেন" ? প্রথম উত্তর করিল "ওরা একজন উকীল আর এক জন ডাক্তার—এক জন অর্থ নেয়—একজন প্রাণ নেয়।"

নূতন জজ মাধব বাবুর আজ লাট সাহেবের বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে। মাধব বাবু কাজ কর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যাবেলা কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে নিমন্ত্রণে যাই-বার জন্যে তিনি যে কাপড় করিতে দিয়াছিলেন এখনও দর্জি তাহা দিয়া যায় নাই। সকালেই তাঁহার কাপড় আসিবার কথা ছিল। মাধব বাবু তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন " ও হরে শীঘ্র গিয়ে দর্জি বাড়ী থেকে কাপড় আন দেখি। তখন বর্ষাকাল—ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে—কাপড় আনিতে ভিজিয়া যাইবে—দ্বারেই তাঁহার জুড়ি প্রস্তুত। তিনি আবার বলিলেন "দেখ ওই গাড়ীটা নিয়ে চট করে কাপড়গুলা নিয়ে আয়, তাতে কাপড়গুলা শীঘ্রও পাব—আর নষ্টও হবে না—"

চাকর কিছুক্ষণ পরে জবজবে ভিজা কাপড় তাঁহার হাতে আনিয়া দিল—বাবু মহা রাগিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল "আপনিত আমাকে গাড়ীর ভিতর বসিয়া কাপড় আনিতে অনুমতি করেন নাই—বিনা হুকুমে সেখানে বসিতে আমার সাহস হইল না—তাই কোচবাক্সে বসিয়া কাপড় আনিলাম।

সমালোচনা।

STAR IN THE EAST.

(পূর্ব্বাকাশে শুকতারা)

আজও যদি তোমাকে বলিতে হয় যে এ নূতন জাতীয় ধর্ম্ম কি—এ প্রবন্ধ পড়িওনা, পড়িলেও বুঝিতে পারিবে না। জাতীয় ভাব এই নব যুগের। সম্প্রদায়ে২ বিভক্ত যে জাতি-বর্ণভেদ যে সমাজে প্রবল—বর্ণশাসন যেখানে জাতীয় জীবনের মূলে, সেখানে জাতীয় একতা একটি নূতন ভাব—সেই নূতন ভাব যদি তোমার চক্ষে না পড়িয়া থাকে তোমাকে তাহা কেমন করিয়া দেখাইব। তুমি জান আর নাই জান নূতন জীবন আমরা পাইয়াছি। সে জীবন আমাদিগের জাতির মজ্জার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, আজ হোক্ কাল হোক্ তুমিই বুঝিতে পারিবে যে তোমার ক্ষীণ শরীরে নূতন বল সঞ্চার হইতেছে।

"বৃদ্ধের আশা" Oldman's Hope যাঁহার লেখনী প্রসূত "পূর্ব্বাকাশে শুকতারা"ও তাঁহারই। এই জাতীয় জীবন কেমন করিয়া দিন দিন আমাদিগের সঞ্চার হইল, কেমন করিয়া নিরবয়ব একটি ভাব অবয়ব লাভ করিল—তাহার একটি সুন্দর সুবিস্তার ইতিহাস সমালোচ্য পুস্তকখানিতে পাওয়া যায়। কেমন করিয়া আমরা দিন দিন ইংরাজশাসনের প্রতি বীতরাগ হইয়াছি, কেমন করিয়াই বা শাসন কর্ত্তারা আমাদিগের অপেক্ষা না করিয়া নূতন নূতন শাসন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন—আমাদিগকে দিন দিন দূরে রাখিয়া চলিয়াছেন তাহার ইতিহাস অতি সহজ—আমরা সকলেই তাহা জানি। একদিন ছিল যখন আমাদের নূতন কর্ত্তারা আমাদিগের মত লইয়া আইন করিতেন—আমাদিগের মতামত গ্রাহ্য করিতেন। আমাদিগের ভালবাসার জন্য চেষ্টিত ছিলেন,—কিন্তু যেমন দিন দিন তাঁহারা সংখ্যায় অধিক হইতে লাগিলেন, স্বজাতীয় সেনাএদেশে অধিক সংখ্যা আনীত হইতে লাগিল, অমনি দিনদিন নিজের খেয়ালে তাঁহারা যেমন তেমন আইন জারী করিতে লাগিলেন ; আমরাও খানিকটা শান্তি পাইয়া চোর ডাকাতের ভয়শূন্য হইয়া, কোন রূপে আহার জোটাইয়া রাজা কি রকমে রাজ্যশাসন করিতেছেন তাহা আর বড় দেখিলাম না। হঠাৎ গ্রীষ্মে তপ্ত এক মধ্যাহ্নে দূর দক্ষিণ হইতে—যমের দুয়ার হইতে অভুক্ত লক্ষ২ জরা জীর্ণ শীর্ণ আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার শুষ্ককণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। হঠাৎ তাহাদের কোটর প্রবিষ্ট নিস্তেজ চক্ষুর ভিতর রক্ত বিন্দু দেখিতে পাইলাম—শুষ্ক স্তনমুখে আসন্ন মরণ শিশু মৃত মাতার ক্রোড়ে দেখিলাম—দাক্ষিণাত্য দগ্ধ-মরুবৎ, শেষ-নিশ্বাস ধূমাভিভূত শশ্মানবৎ দেখিয়া হৃদয়ে আতঙ্ক হইল—হতাশা যেখানে সেখানে, দগ্ধক্ষেত্র তপ্তধূলি ধূসরিত—কঙ্কালরাশি দক্ষিণ রাজ্যে জনশূন্য কুটীর দ্বারে, পথে ঘাটে মাটে প্রতি পদক্ষেপে।

যেরাজ্যে কখনও আহারাভাবে কেহ মরে নাই, সেই দেশে বৃক্ষেও পাতা নাই—চারিদিকে হাহাকার—চারিদিকে অশ্রুসিক্ত নির্ম্মম ভূমি বিস্তৃত—এ সোনার দেশে দাবানল জ্বালিল কে?

এ মহা দুঃস্বপ্ন কোন পিশাচ রাজ্যের? মুষ্টি আহারের বিধানে অধিক সংখ্যা বাঁচিলনা, কঙ্কালাবশিষ্ট জনকত প্রাণী রক্ষা পাইল। আতঙ্ক খানিকটা অবসান হইল। বিষন্ন মনে কাতর প্রাণে রাজার দিকে তাকাইলাম—কিন্তু রাজা তখন মহা সমারোহোন্মত্ত। এ সময়ে সমারোহ কেন? রাজ্ঞী কাইজারই—হিন্দ নাম গ্রহণ করিতেছেন! কাহার হৃদয়ে আঘাত না লাগিল, আমরা মমতাময় হিন্দু মুসলমান, আমাদের মায়া আছে, আমাদিগের রাজার কি মায়া, মমতা কিছুই নাই; না, না, তাহা হইতে পারেনা। রাজ্ঞী আমাদিগের দেশে থাকেন না—দূর সমুদ্রপারে তিনি, তাঁহার কাণে আমাদিগের আর্ত্তনাদ পঁহুছেনা, আমাদিগের অশ্রু তিনি দেখিতে পান্ না—তাঁহার ও তাঁহার মন্ত্রীদিগেরত মানুষের প্রাণ, তাঁহারা যদি জানিতেন তাহা হইলে আর্ত্ত আমাদিগের উপায় হইত। রক্ত শূন্য শরীর হইতে আর রক্ত ব্যয় যাহাতে না হয় তাঁহারা তাহা করিতেন—তাঁহাদিগের নিকট দুঃখ জানাইতে হইবে—এই নূতন কথা আমরা সকলে বুঝিলাম আমাদিগের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হইল।

দীর্ঘ আবেদন পত্র আমরা ইংরাজ পার্লিয়ামেণ্টে পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম। অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহা ভিন্ন আর কিছু শিখিলাম না। আমাদিগের নিস্তেজ ভাব, সহজগমন-প্রবণতা দেখিয়া রাজ প্রতিনিধি লীটন অম্লানবদনে, সহস্র২ রাজা প্রজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন "রাজ্ঞী ১৮৫৭—সালে তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, "যে বর্ণ হওনা কেন, যে জাতি হওনা কেন তোমরা সকলে একরূপে এই বিস্তৃত রাজ্যে একভাবে থাকিবে, এক নিয়ম, এক আইন আমাদিগের সকলের জন্যই" এই উদার ভাবের কথা গুলি যে পূর্ণমাত্রায় বুঝিতে হইবে তাহা নহে। তোমরা পরাজিত আমরা জেতা। এ সম্বন্ধ যখন আছে তখন উচ্চশ্রেণীর কাজ তোমাদিগের পাইবার আশা করা অন্যায়—তোমাদিগের উচ্চশিক্ষা খানিকটা ভুল। এই সব কথা একজন রাজ প্রতিনিধি নির্লজ্জ ভাবে বলিল আর আমরা আনন্দে না হউক বিনা বিরক্তিতে শুনিলাম। আর সেই রাজ প্রতিনিধির দুই একটি বিধির কথা মনে কর। Arm's Act, Press Act,কে বিধিবদ্ধ করিয়াছিল। লীটন সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা বলিলেই হইবে—যে একজন নীচদরের কবি ও নীচদরের সাধু পুরুষের নিকট আর কি আশা করা যাইতে পারে। তবে ইহা নিশ্চয় যে লীটনের মত আর একজন যদি গবর্ণর হইতেন কিংবা লীটন যদি আর কিছুকাল এদেশে থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার শাসনের ফল হাতে২ ফলিত। একটি ঘোর বিপ্লবের যে সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা পূর্ণতা লাভ করিত। কিন্তু তাঁহার পরেই রীপন আসিলেন। রীপনের বিষয় কিছু কি বলা আবশ্যক। হৃদয়ের অন্ত হইতে যাহাকে আমরা ভালবাসি

তাহার কথা আর কি বলিব? এই পুস্তকখানিতে রীপনের আগমন এবং লীটনের প্রতি-গমন, যুগপৎ উদয় ও অবসানের বিষয় যাহা আছে তাহা অতি সুন্দর চিত্র। নীলাকাশমেঘে পাটলতাম্র রঙমাখা দেখাইতেছে। শীতের বাতাস এমনই তীব্র যে শীতকালের "হিমানী ফুল" "Snowdrops যাহা তুষার শয্যায় ফুটিয়া থাকে তাহাও শুকাইয়া যাইতেছে। নদীর জল জমিয়া গিয়াছে—গাছে পাতানাই—লতার বেষ্টন যেন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়-এই বরফ পড়িয়াছে আরও বরফ পড়িবে—হঠাৎ এমন সময় সূর্য্য দেখা দিল—নদীর স্রোত আবার বহিল—লতার গায়ে সবুজ কোরক দেখা দিল—আকাশ আবার সেই সুন্দর নীল—অন্ধকার গৃহে আবার আলোক হাসিয়া উঠিল। এ মার্চ্চমাসের চিত্র যে একবার দেখিয়াছে, সে বুঝিবে লিটনের পর রিপনের শাসনে আমরা কেমন হৃষ্ট হইয়াছিলাম।

পুস্তক খানির একাংশে লড ডফরিনের শাসনের কথা আছে। আমরা দুই একটি বিষয়ে তাঁহাকে অন্যায় দোষ দিয়াছি। না দেখিয়া না শুনিয়া ভাল করিয়া না ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা তাঁহাকে অপরাধী করিয়াছি। উদাহরণ যে কয়েকটি দেওয়া হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই—সংবাদ পত্রের জন্য নূতন আইন সম্বন্ধে সম্বাদ পত্রে যাহা বাহির হইয়াছিল তাহা নিতান্ত অমূলক না হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে এবং অসম্পূর্ণ সত্য বলি-য়াই দোষের। লর্ড ডফরিন ইংলণ্ডে লেখেন যে যদি দেশীয় সংবাদ পত্র অনেক সময় অমূলক কথা লেখে—তাহার প্রধান কারণ যে সম্পাদকেরা যথার্থ যাহা ঘটে তাহার খবর পায় না। অতএব যাহাতে তাহারা ঠিক খবর পায় তাহা করিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে যদিও বোধ হয় লর্ড ডফরিন Censorship of the Press কথাগুলি ব্যবহার করেন নাই তথাপি তাঁর মনের ভাব খানিকটা ঐরূপ ; যদি তাহা হয় তাহাহইলে প্রস্তাবটি যে আমা-দিগের অভিমত হইবে তাহা আশা করা যায় না। অন্ততঃ না হওয়াই উচিত।

রাইয়ৎদিগের সভা প্রভৃতির কথাতে তিনি বলিয়াছেন যে কালে তাহার কল খারাপ হইতে পারে কিন্তু তাহা দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া এ দেশের সাধারণ লোক যাহা চায় তাহা যদি যুক্তি সঙ্গত হয় তাহা হইলে তাহা দেওয়া মন্দ নহে। এটি সাধু ইচ্ছা। সিমলা যাওয়া সম্বন্ধে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে যাহা বাহির হইয়াছিল যে লর্ড ডফরিন বলিয়াছেন—যে "বিরাট সভা হইয়াছে—হইলই বা তাহার দ্বারা গবর্ণ-মেণ্টকে ভয় দেখান বৃথা। এ দেশে এখনও Gulliver এর কথিত পশু শাসিত মানব রাজ্য হয় নাই"। এ কথা গুলি নিতান্ত অমূলক, কিন্তু লেখক বলেন যে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের দোষ নাই—যে লোকটি ঐ সংবাদ দেন তাঁহার দোষ। তিনি যখন সদা সর্ব্বদা গবর্ণর জেনারলের সহিত মিশিতে পারেন তখন ওরূপ অযথা অপবাদ রটাইবার দোষ সম্পূর্ণতঃ তাঁহারই।

একথা গুলি জন সাধারণের জানা নিতান্ত আবশ্যক। রাজা প্রজার মধ্যে সদ্ভাব নিতান্ত ইচ্ছনীয়, যিনি সে সদ্ভাব ঘটাইয়া দিবার প্রয়াস পান তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগের শ্রদ্ধার পাত্র। লেখক লর্ড ডফরিনের অনেকগুলি কার্য্য অবিবেচনার বলিয়া নিতান্ত

অন্যায় বলিয়াছেন। উদাহরণ স্থল আয় কর (Income tax) বর্ম্মার সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি। পুস্তকখানির প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস, কিংবা প্রতিনিধি পরম্পরায় জীবনী লেখা নহে—বঙ্গ জাতীয় সমিতির (Bengal national League) উদ্দেশ্য আশা, কার্য্যকারিতা সকলে জানিতে পারে ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য মহান্ তাহার আর সন্দেহ ? কি ? এই বিরাট সমিতির বিস্তৃতি দিন দিন যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা সকলেরই কর্ত্তব্য। বঙ্গজাতীয়-সমি... ...্যপরায়ণ, বক্তৃতা পরায়ণ নহে, দেখিয়া আশা হয় যে তাহা স্থায়ী হইবে এবং উত্তরোত্তর দেশের উন্নতির কারণ হইবে। পুস্তকখানির একটি অংশে ইংরাজ রাজাধীন সেসব প্রদেশ তাহার গৌরবের শাসন কেমন করিয়া দিন দিন উদার করা হইয়াছে তাহারই ইতিহাস আছে। সে প্রবন্ধগুলি মিরারে প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহার দীর্ঘ সমালোচনা এখানে করা গেল না।

পুস্তকখানি দেশীয় মাত্রেরই পড়া উচিত। ইহা যে ভাবে লেখা তাহা উদার, যে উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছে তাহা মহান—যে সহানুভূতির পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায় তাহা চিরস্পৃহনীয়। পূর্ব্বাকাশে শুকতারা দেখাইয়া লেখক ভবিষ্যতের যে আশা হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছেন—যদি আমরা সকলে এই নূতন জাতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া লেখকের ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে কার্য্যপরায়ণ হই তবেই সে আশা আমাদের সফল হইবে।

সাধক সঙ্গীত (শ্যামাবিষয়ক পদাবলী) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইহাতে কবিকঙ্কন রামপ্রসাদ সেন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, নরচন্দ্র রায়, কমলাকান্ত ভট্টাচাষ্য, রামদুলাল নন্দী প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ ব্যক্তির রচিত সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ সংগ্রহে বঙ্গভাষার যে কতদূর উপকার হয় তাহা বলা বাহুল্য। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু "কবিতাসংগ্রহের" উপক্রমণিকায় এক স্থলে বলিয়াছেন—এক দিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগিরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীরগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি, কাব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাইতেছে।

" সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল, বাঙ্গালাভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম। এ জাহ্নবী জীবনে দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

বঙ্কিম বাবু সেদিন "খাঁটী বাঙ্গালা কথায় খাঁটি বাঙ্গালির মনের ভাব " শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন—সেইরূপ খাঁটি বাঙ্গালী ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সাধক সঙ্গীতপূর্ণ, তাই এ সঙ্গীতে তিনি বলিয়া নহেন বাঙ্গালী হৃদয় মাত্রেই মু গ্ধহয়। ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই আদরের সামগ্রী। সম্পাদক এই সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এই পুস্তকখানিতে শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতাবলী ছাড়া সম্পাদক কর্তৃক শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনা প্রণালী এবং কয়েক জন প্রসিদ্ধ সাধকের জীবনচরিতও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার মধ্যে কবিকঙ্কন রামপ্রসাদ সেনের জীবনী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, আমরা নিম্নে সেইটি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি।

"এ দুঃখসঙ্কুল পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ জুড়াইবার স্থান কোথায়? এ জরা মৃত্যুময় সংসারে দগ্ধ হৃদয় কোথায় শান্তি লাভ করিবে? এ ঘোর নিশীথে, এ বিকট শ্মশানে কে আশা বর্ত্তিকা হস্তে নিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইবে? সাধক হৃদয়ের শত প্রবাহিত অমৃতবারি দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে প্রাণে শান্তি ঢালিয়া দেয়, সাধক হৃদয়ের পবিত্র আদর্শ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যের পথ দেখাইয়া দেয়, সাধক মানব জাতির আদর্শ পুরুষ, সাধক মানুষের মধ্যে দেবতা। পুণ্যভূমি ভারত অন্য বিষয়ে দরিদ্রা হইলেও তাঁহার একটী গৌরবের জিনিস আছে। তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে, তাঁহার বনে প্রান্তরে, তাঁহার গ্রামে নগরে যেখানে যাও সেই খানেই স্বর্গীয় পারমার্থিক সঙ্গীত শ্রবণ করিতে পারিবে। ভারত এক দিকে যেমন কবিতার রম্য কানন, অন্য দিগে সাধনার মনোজ্ঞ তপোবন।

এই রম্য কাননে, এই তপোবনে, কত কবির, কত সাধকের জীবনস্রোত নীরবে মিশিয়াছে কে বলিতে পারে? সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেই জ্বলন্ত ভস্ম রাশির একটী দীপশিখা. এই দীপশিখা কবে জ্বলিয়াছিল এবং কোন স্থান আলোকিত করিয়াছিল, অনেক দিন তাহা সাধারণের অগোচর ছিল, বহু কষ্টে, বহু যত্নে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে, কবিরঞ্জন ১৬৪২ শঃ অব্দে হালি সহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বৈদ্যবংশ সম্ভূত। যদিও তাঁহার কোন কোন সঙ্গীতের ভণিতাতে দ্বিজ

শব্দ* দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন. কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অপ্রামাণ্য। এই সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথা যতদূর বিশ্বাস্য এমত আর কিছুই নহে। তিনি বিদ্যাসুন্দরে আপনার পূর্ব্ব পুরুষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে তাঁহার আদি পুরুষেব নাম কৃত্তিবাস। সেই বংশ ধনবান, দানশীল ও দয়াবান ছিল। আমাদের বন্ধু ৺ দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কবিরঞ্জনের স্বহস্ত লিখিত এবং তাঁহার বংশধরগণ হইতে শ্রুত যে বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অতীব বিশদ এবং প্রামাণ্য।

প্রসাদের পূর্ব্বপুরুষের ও বংশধরগণের সংযোষিত বংশাবলী দেওয়া যাইতেছে। কবিরঞ্জনের পিতার নাম রামেশ্বর সেন।

রামপ্রসাদ বাল্যকালেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। যাঁহারা মিল, রামমোহন রায় প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মাগণের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইবার কোন কারণ নাই।

রামপ্রসাদ যে শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন, যে ঘোর সমস্যা পূরণে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহার নিকট সংসারের শাস্ত্র নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে না করিতে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। সংসারের গুরুভার মস্তকে ন্যস্ত হইল। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বিষয় কর্ম্মের অনুসন্ধানে যাইতে হইল। তিনি কলিকাতায়

* দ্বিজ শব্দ পরবর্ত্তী যোজনা মাত্র। রামপ্রসাদের অনেক গান এইরূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

কোন* ধনবানের বাড়ীতে মোহরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু সাংসারিক কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিত না। কেমন করিয়া ভাল লাগিবে? যাঁহার মন অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অমৃতময় আস্বাদ পাইয়াছে তিনি কেমন করিয়া সংসার পিঞ্জরে প্রাণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন? তাঁহার প্রাণ ভক্তিরসের নির্ম্মল উৎস ছিল, ভক্তিতরঙ্গে হৃদয় এমনই উছলিয়া উঠিত যে তিনি সংসার ভুলিয়া, কায ভুলিয়া, মহাজনী খাতাতেই সঙ্গীত লিখিয়া রাখিতেন। একদিন তাঁহার উপরস্থ কর্ম্মচারী এই সকল দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং প্রভুকে তাহা দেখান। এই ঘটনা হইতেই প্রসাদের ভাবী জীবনের পথ পরিষ্কার হইল। তাঁহার প্রভু একজন গুণগ্রাহী ও ভক্তিপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি মনোযোগের সহিত রামপ্রসাদের সঙ্গীত গুলি পাঠ করিলেন, এবং "আমায় দেওমা তবিলদারী" এই গানটী পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রসাদের জীবনের কি উচ্চতর ব্রত ও মহত্তর সাধনা। তিনি সেই ব্রত ও সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে ত্রিশ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দেন। রামপ্রসাদের সংসারের চিন্তা ঘুচিল, নিশ্চিন্ত মনে শক্তি সাধনায় রত হইলেন। ঐ সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কুমার হট্টে আগমন করেন, "তিনি রামপ্রসাদের কথা শুনিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আলাপ পরিচর্য্যাদি করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তি ও পারমার্থিক ভাব দেখিয়া মোহিত হইলেন; এবং রামপ্রসাদকে আপন সভাসদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামপ্রসাদ সম্মত হইলেন না। কেন হইবেন? যাহার মন মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিতে শিখিয়াছে সে কেন কারাগারে বদ্ধ হইতে যাইবে? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোনরূপ বিরক্ত হইলেন না, বরং তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিলেন। রামপ্রসাদ এই অনুগ্রহের প্রতিদান স্বরূপ "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিয়া রাজাকে উপহার প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন রামপ্রসাদ "কালী কীর্ত্তন" "কৃষ্ণ কীর্ত্তন" ও "শিব কীর্ত্তন" কাব্য রচনা করেন। কালী কীর্ত্তনে তাঁহার রচনা শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। যিনি সমস্ত জীবন কালী সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছেন; কালীতে আহার, কালীতে বিহার কালীতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কালী কীর্ত্তন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইবে তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে? তবে সঙ্গীতই তাঁহার অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি। সেই সঙ্গীত বাহ্যাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকায় আবৃত নহে, বিলাস বাসনার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন নহে। তাহা সরল হৃদয়ের সরল স্রোত; ভক্তিরসের সুবিমল উৎস। তাহাতে গাম্ভীর্য্য আছে, কঠোরতা নাই, অবিরাম গতি আছে,

---

*এই রূপ জনশ্রুতি যে এই ধনবান ব্যক্তি ভূকৈলাসের দেওয়ান গোলকচন্দ্র ঘোষাল, কেহ বলেন ৺দুর্গাচরণ মিত্র।

আস্ফালন নাই, ভাব আছে, ভাবুকতা নাই। একজন বঙ্গীয় সুলেখক বলিয়াছেন "এই আদিরস প্লাবিত বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে" প্রসাদী সঙ্গীত নিচয় একটী সুশোভিত দ্বীপরূপে প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বর তত্ত্ব সেই দ্বীপের ভূমি, কালীরূপ সেই ভূমির বাহ্যদেশ। ধর্ম্মের সহস্রবিধ তৃণ ও তরুরাজি এই দ্বীপকে সুশোভিত করিয়াছে। ভক্তি রস সেই তৃণ ও তরুরাজিকে পরিশোষণ করিতেছে। আর রামপ্রসাদের আত্মা কবির মত যেন এই দ্বীপের চারিদিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, বৈরাগ্য শান্তি ও সুখের বিহঙ্গগণ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে পড়িয়া কালী নামের সঙ্গীতে দ্বীপকে পরিপূর্ণ করিতেছে। আহা কি মধুময় স্থান! কি অমৃতময় নিকেতন! আমরা আদিরসে সন্তরণ দিয়া যখন এই দ্বীপে উপনীত হই,—তখন আমাদের লোচনদ্বয় একদা সন্তপ্ত হয়, মন একদা প্রমত্ত হইয়া উঠে, মন প্রমত্ত হইলে আমরা রামপ্রসাদের সঙ্গে গান গাইয়া একদা হৃদয় পরিতৃপ্ত করি'। এই অলোকসামান্য গুণেই প্রসাদী সঙ্গীত সাহিত্য সংসারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই রূপ একাধারে কবিত্ব ও সাধকত্ব কোথাও দৃষ্ট হয় না।

প্রসাদ একজন সুগায়ক ছিলেন না, কিন্তু সঙ্গীতের ভাব অজ্ঞাত ভাবে প্রাণের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিয়া মন প্রাণ আকুলিত করিত। কথিত আছে, প্রসাদের গান শুনিয়া বিলাসী নবাব সিরাজের মনও বিগলিত হইয়াছিল। প্রসাদের নামের সঙ্গে একজন বৈষ্ণব কবি অচ্যুত গোস্বামীর নাম সংযুক্ত দেখা যায়। শৈব এবং বৈষ্ণবে চিরদিনই বিবাদ, প্রসাদ যখন কোন সঙ্গীত রচনা করিতেন, গোস্বামী—তাহার পাল্টা গান রচনা করিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতেন। এই সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে অপ্রাসঙ্গিক বোধে তাহা উদ্ধৃত করা গেল না।* প্রসাদের সঙ্গীত রচনার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আহার বিহার যেরূপ স্বাভাবিক, সঙ্গীত রচনা তাঁহার পক্ষে সেই রূপ স্বাভাবিক হইয়াছিল। একটী সঙ্গীতে "লাখ উকীল করেছি খাড়া" কথাটী দেখিয়া কেহ কেহ রামপ্রসাদ লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। লক্ষ সঙ্গীত রচনা কথাটা আমরা কোনরূপ অসম্ভব মনে করি না—; অথবা যদিও ঠিক একলক্ষ রচনা না করিয়া থাকেন তবুও যে বহুসংখ্যক রচনা করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান আছে।

১। রামপ্রসাদ তীর্থ ভ্রমণের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না, তথাপি অন্নপূর্ণাকে গান শুনাইবার জন্য একবার কাশীতে গিয়াছিলেন।*

---

*৫০ পৃষ্ঠার ৪৯ সংখ্যক সঙ্গীত দেখ। কালীকীর্ত্তনে রামপ্রসাদ বলিয়াছেন; ভগবতী গোপবধূ বেশে একাম্রকাননে ধেনু চরাইয়া ছিলেন। (২৮, ২৯, ও ৩০ পৃষ্ঠা—দেখ) ইহাকে বিদ্রূপ করিয়া গোস্বামী বলিলেনঃ—

না জানে পরম তত্ত্ব, কাঠালের আমসত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।

২। স্বয়ং কালী তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরীর পরিবর্ত্তে বেড়া বাঁধিয়া দেন।

৩। স্বয়ং শিবা শিবারূপ ধারণ করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে আহার গ্রহণ করিতেন।

৪। "গাবগাছ" হইতে পদ্ম নামাইয়া কালী পূজা করিয়াছিলেন।

৫। রামপ্রসাদ পূর্ব্বেই আপনার মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি কালী পূজা করেন, পরদিন কালী বিসর্জ্জনের সময় সকলের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, তথায় অর্দ্ধনাভী গঙ্গা জলে নামিয়া চারিটী গান করেন। "বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে।" "নিতান্ত যাবে দিন" "কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে" ইত্যাদি সঙ্গীতত্রয় গান করিয়া শেষে চতুর্থ সঙ্গীতের শেষ চরণে "মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা দক্ষিণা হয়েছে" বলিতে বলিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণ পাখী দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া পলাইল। দয়ালচন্দ্র বলেন "তাঁহার মৃত্যু রোগে হয় নাই; ভাবে মৃত্যু।" তাহাই সত্য। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ঘুমাইল, ভাবের ঘোরে অচেতন হইল। এখন দেখা যাউক রামপ্রসাদের সাধনার লক্ষ্য কি ছিল, রামপ্রসাদের সাধনার লক্ষ্য ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও আদিভৌতিক হইতে মুক্ত হইয়া। তিনি (১১৩ সঙ্গীতে) বলিয়াছেন "সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদিভূমি গেল ফেটে।" * আমরা দেখিতে পাই সকল হিন্দুরই সাধনার লক্ষ্য এই এক কথা—দুঃখের নিবৃত্তি। মহাত্মা শাক্যসিংহ এই দুঃখ হইতে নিবৃত্তি লাভ করিবার জন্য রাজসিংহাসন পায়ে ঠেলিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন। হিন্দুদর্শনে ও পাশ্চাত্য দর্শনে এই প্রভেদ, হিন্দুদর্শনের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জাতে মজ্জাতে মুক্তির কথা—দুঃখ নিবৃত্তির কথা, পাশ্চাত্য দর্শন কেবল মন নিয়া ব্যস্ত। রামপ্রসাদের সাধনার লক্ষ্যও দুঃখনিবৃত্তি। রামপ্রসাদ কি প্রকার মুক্তি চাহিতেন? হিন্দু শাস্ত্রে সালোক্য, সামীপ্য, সাযোজ্য, নির্ব্বাণ এই চারি প্রকার মুক্তির উল্লেখ আছে, রামপ্রসাদ ইহার কোন প্রকার মুক্তিরই কামনা করিতেন না, যথা—"নির্ব্বাণে কি আছে ফল।" রামপ্রসাদ ভক্তিই মুক্তির সোপান স্থির করিয়াছিলেন, যেমন একটী সঙ্গীতে বলিয়াছেন, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।" বৈষ্ণবগণও ভক্তিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। বস্তুতঃ—সকল সাধকেরই একটী সম্মিলন স্থান আছে; যেখানে সকলকেই এক কথা বলিতে হয়, যাহা আসল সত্য তাহা সকলের পক্ষেই এক।

রামপ্রসাদের ধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্ম ছিল, তিনি স্বর্গের আশায় অথবা নরকের ভয়ে ধর্ম্ম করেন নাই। যাহারা কামনা রাখিয়া ধর্ম্ম করে তাহাদের ধর্ম্ম নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, স্বার্থপর ধর্ম্ম।

তা যদি হইত যশোদা যাইত
গোপালে কি বলে পাঠায় রে।

*৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

" বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি ॥"

(৭১ দ্বিঃ অঃ ভঃ গীঃ)

রামপ্রসাদ এই শান্তির জন্য বাসনাকে বিনাশ করিতে সতত যত্ন করিতেন, তিনি একটী সঙ্গীতে বলিয়াছেন—

" বাসনাতে দাও আগুণ জ্বেলে
ক্ষার হবে তার পরিপাটী " (৪৮ গীত)

ধার্ম্মিক লোকদিগের মধ্যে প্রধান বিষয় এই দেখা যায় যে তাঁহারা দ্বন্দাতীত অর্থাৎ সুখ দুঃখের অধীন নহেন। সুখ যদি আসে আসুক, দুঃখ আসে আসুক ক্ষতি নাই, তাঁহারা সুখে উল্লাসিত হন না।

" যংহি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥

(১৫ দ্বিঃ অঃ ভঃ গীঃ

রামপ্রসাদও দ্বন্দাতীত হইয়াছিলেন ; তিনি বলিয়াছেন ঃ—

" আমি কি দুখেরে ডরাই
*   *   *   *,
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ
দিয়ে মা বাজার বসাই " (৫৯ গীত)

" মন করোনা সুখের আশা
যদি অভয় পদে লবে বাসা"

মানুষ যখন প্রার্থনা করে ঈশ্বর তখন তাহার সহিত কথা কহেন ইহা ধর্ম্ম জগতের একটী সার কথা। ইহাকেই প্রত্যাদেশ কহে। প্রত্যেক ধার্ম্মিকেরই প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে ; রামপ্রসাদেরও তাহাই হইয়াছিল, যথা ;—" জেনেছি শ্রীনাথের বাণী " " পাগল বেটার কথায় মজে " ইত্যাদি। রামপ্রসাদ শাস্ত্র অভ্রান্ত মনে করিতেন না। অন্য শাস্ত্র দূরে থাকুক বেদের কথা বলিয়াছেন " বেদে দিল চক্ষে ধূলা " তিনি তীর্থ পর্য্যটন অনাবশ্যক মনে করিতেন, তিনি বলিতেন " কাজ কি আমার কাশী। যার কৃত কাশী তদুরসী বিগলিত কেশী ॥ (৯১ গীত)

" আর কাজকি আমার কাশী।"
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী।" (৯২ গীভ)

সাধুজনের মৃত্যুর প্রতি নির্ভয় ভাব রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেমন দেখা যায় এমত আর

---

* ১০৬ পৃষ্ঠা দেখ। কিন্তু টীকার মুদ্রাঙ্কন ভ্রমাদি আছে।

কোথাও নয়। রামপ্রসাদ মৃত্যুকে খেলার পুতুলের ন্যায় মনে করিতেন যাঁহার পশ্চাৎ ভাগে স্নেহময়ী জগজ্জননী দণ্ডায়মান, যাহার মন ধর্ম্মের অক্ষয় কবচে বদ্ধ তিনি কেন মৃত্যুকে ভয় করিবেন। তিনি মৃত্যুকে ভয় করিবেন; তিনি মৃত্যুকে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেন, রাপ্রসাদ মার বলে বলীয়ান্ তাই তিনি বলিয়াছেন।

তুই যারে কি করিবি শমন
শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি। (১৫৩ গীত)
দূর হয়ে যা যমের ভাটা।
আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। (১৩৬গীত)
ওরে আমি কালীর সুত, যমের দূত
বলগে তোর যমরাজারে॥ (১৩৭ গীত)

৬৫, ১৩৮, ১৩৯ প্রভৃতি সঙ্গীতে তিনি যমকে তুচ্ছ করিয়াছেন।

ঈশ্বর জ্ঞান। রামপ্রসাদ যুক্তি, তর্কদ্বারা ঈশ্বর নিরূপণ করিতেন না। সৃষ্টির কৌশল দেখিয়া স্রষ্টার পরিচয়ের আবশ্যকতা মনে করিতেন না। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে দর্শন, বিজ্ঞানের সাহায্য অনাবশ্যক। তিনি নিত্যপ্রত্যক্ষ। (Direct consciousness) রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাঁসি।" অর্থাৎ স্বাভাবিক। রামপ্রসাদ কালীর সাধক ছিলেন, তিনি কিরূপ কালীর সাধনা করিতেন? তিনি কি মৃত্তিকানির্ম্মিত কালীর সাধনা করিতেন? তিনি কি সীমাবদ্ধ দেবতার উপাসক ছিলেন? কখনই না। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন

"ওরে শত শত সত্যবেদ তারা আমার নিরাকারা।"

"শ্রীরাম প্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।"
মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখনা॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি—
জেনেও কি মন তা জান না।
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তার
কর্‌তে চাওরে উপাসনা। (১৫১ গীত)

এই রূপ অনেক সঙ্গীতে তিনি নিরাকার উপাসনার কথা বলিয়াছেন।

ঈশ্বরকে কিরূপ উপাসনা করিতে হইবে? তাঁহাকে কি কোনরূপ বাহ্য বস্তু দ্বারা পূজা করিতে হইবে? না, প্রসাদ বলিতেছেন

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা
সুমধুর খাদ্য নানা।

ওরে কোন লাজে খাওয়াইতে চাস তায়
আলো চাল আর বুট ভিজানা। (১৫১ গীত)

ঈশ্বর ভাবের বিষয় (Spirit) তাহাকে ভাবে ধরিতে হইবে। যথা

সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে। (৫৫ গীত)

রামপ্রসাদ ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানকে সাধনার পথের অন্তরায় মনে করিতেন। যথা;—

জাক জমকে কর্‌লে পূজা
অহঙ্কার হয় মনে মনে।

*　　*　　*　　*

ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি
কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি
বসাও—হৃদি পদ্মাসনে। (৬৯ গীত)

রামপ্রসাদ দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। আমরা দেখাইয়াছি রামপ্রসাদ পৌত্তলিক ছিলেন না, এখন দেখাইব তিনি দ্বৈতবাদীও ছিলেন না। রামপ্রসাদ বলিতেন তাহার মন অবিদ্যায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে; তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুচি অশুচি, সুখ দুঃখের প্রভেদ মানিতেন না। তিনি বলিতেন অহঙ্কারের বিনাশ না হইলে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থাৎ কালী ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। আমরা প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"অশুচি শুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, সে' টাকে তাড়ায়ে দিবি।
"ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা॥"
"যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।"
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি ভক্তি জল, ফল ফলাচ্চ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে।
"ওরে ত্রিভুবন যে" মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না।"

পাঠক। অদ্য সাধক শিরোমণি রামপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। শক্তিসাধকদিগের মধ্যে রামপ্রসাদের পরেই

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান রামদুলাল রায় ও দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের স্থান। আমরা তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গানগুলি সাধকসঙ্গীতের দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তাঁহাদের জীবন-চরিত পাঠকদিগকে উপহার দিতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না—

"কোথা মম অবকাশ রঞ্জিব কি ছার।"

যদি সময় পাই তবে একদিন এই অভাব পূরণ করিব।"

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

গোধূলি।

গোধূলি কনক বেলা,
পরায় কিরণ-বালা
পল্লবের কাণে সোনা দুল ঝিকিমিকি,
মাথা নাড়ি কয় কথা
অনিলের সনে পাতা,
তরুর পিছন হতে রবি মারে উঁকি,
ঘন কাননের ছায়া
দূরান্তরে মিশি গিয়া
অন্ধকার জমিয়াছে যেথা রাশি রাশি,
একটু একটু করে
সুদূর সেখান হতে
তরল আঁধার ধীরে পড়িতেছে খসি ;
ধরার উজ্জ্বল সুখ
কাননের শ্যাম বুক,
মলিন ছায়ায় তার দিবে আঁধারিয়া।
শোকের প্রকৃতি যথা
হৃদয়েতে দেয় ব্যথা
নিজে আঁখিনীরে ভাসে দেয় ভাসাইয়া॥

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

পুরস্কার।

(A comparison.)

The lapse of time and rivers is the same,
Both speed their journey with a restless stream;
The silent pace, with which they steal away,
No wealth can bribe, no prayers persuade to stay;
Alike irrevocable both when pass'd,
And a wide ocean swallows both at last;
Though each resemble each in every part,
A difference strikes at length the musing heart;
Streams never flow in vain; where streams abound,
How loughs the land with various plenty crowned!
But time, that should enrich the nobler mind,
Neglected, leaves a dreary waste behind".

বালকের গ্রাহকগণের মধ্যে উল্লিখিত ইংরাজি পদ্যটির যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ করিবেন, নিবাধই নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার দাস দত্ত তাঁহাকে কয়েকখানি ইংরাজি গ্রন্থ পুরস্কার দিবেন, পুরস্কার আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। অনুবাদ বর্ত্তমান চৈত্রমাসের ১৫ই মধ্যে আমাদের নিকট আশা আবশ্যক। অনুবাদটি পয়ারচ্ছন্দে এবং এক একটি লাইনের অনুবাদও এক একটি লাইনের মধ্যে হওয়া চাই।

নিম্নলিখিত ধাঁধাঁ দুইটি লক্ষ্ণৌ হইতে বালকের জনৈক পাঠক তাঁহার সহপাঠকদিগকে উপহার পাঠাইয়াছেন।

জন্ম আমার অগ্নি হতে অযোনি সম্ভবে, বীরত্বে পতিত্বে বরেছিলাম পাণ্ডবে!
দ্রৌপদী না হই আমি নাতিনি সতিনী, বীর সোহাগিনী আবার বীর বিঘাতিনী।
অতি রমণীয় রূপে আমি রূপবতী, ঈষৎ বাঁকায় আবার মুগ্ধ বীরপতি।
পতির অত্যন্ত ভালবাসা আমি হই, সজ্জায় সময়ে তাঁর বামে আমি রই।
কার্য্যকালে দক্ষিণেতে হই উপনীত, সেইকালে রক্তে শিক্ত হই উন্মাদিত।
পতির যতনে দীর্ঘ জীবনে জীবিত, যৌবনে বার্দ্ধক্যে কদাচিত কলুষিত।
অতি বৃদ্ধ হয়ে পতি হইলে নিধন, তখনও আমার প্রায় নবীন যৌবন।
পতির বিয়োগে আমি বিধবা না হই, অকলঙ্কে পতি পুত্রের পত্নী হয়ে রই।
পরিবার আমার নাহিক এক জন, পরিবার মধ্যে কিন্তু থাকি অনুক্ষণ।
করিবেন কৃপা যিনি সদুত্তর দানে, শোধিব সুধীর ধার বিধির বিধানে।

২

বনমধ্যে সদা থাকি বনবাসী নই চালনা সংযোগে আমি বহুরূপী হই।
বানের অগ্রেতে হলে জয়ী বীর যুধে মধ্যে হলে যুদ্ধে গণ্য পশুরাজ সাতে।
বনমধ্যে হলে শুভ কার্য্যে সম্ভাষণ মন মধ্যে হলে হই অত্যন্ত ভীষণ।
বাহন বিহনে আবার অন্য নাম ধরি বাহন আমার চক্র রথ পরিহরি।
প্রবর্ত্তিত কার্য্যে বাধা দেওয়া মম কায কে আমি আমারে বল পণ্ডিত সমাজ।

নূতন সেলায়ের কল।

দশটাকামাত্র ব্যয় করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার নিজের নিজের পোসাক প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

অতি সহজেই কলকৌশল বুঝিয়া ব্যবহার করা যায়, এমন সুন্দর নিকেল প্লেটেড্ "পকেট সেলাই যন্ত্র" নিম্ন সাক্ষরকারী ব্যক্তি কেবল মাত্র দশটাকা মূল্যে বিনা মাশুলে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে পাঠাইবার নিমিত্ত অর্ডার রেজেষ্টরি করিতে প্রস্তুত আছেন। এই কলের কাটতি এখনি অনেক বেশী, এবং আরো বেশী হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং অর্ডারের নম্বর ও তারিখ অনুসারে ক্রেতাগণের নাম রেজষ্টরি করিয়া পর পর জিনিস প্রেরিত হইবে। অতএব গ্রহণেচ্ছুকগণ অবিলম্বে তাঁহাদিগের স্ব স্ব নাম ও পূর্ণ ঠিকানার সহিত প্রত্যেক কলের জন্য আপাততঃ ২৲ টাকা ষ্টাম্প অথবা মনি অর্ডার দ্বারা পাঠাইয়া তাঁহাদিগের অর্ডার রেজষ্টরী করাইবেন; জিনিস পাইলে অবশিষ্ট টাকা দিতে হইবে।

জোসেফ সোয়ারেস।
৩৩ নং এলফিনষ্টোন সার্কেল, বম্বে।

উৎকৃষ্ট অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ।

ডাক্তার রামদাস সেন এম, আর, এ, এস, কৃত
ভারত রহস্য প্রথম ভাগ।
৩০১ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা, ডাক মাসুল ৵১০ আনা।

ইহাতে আর্য্যজাতির আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়ম অতি উত্তমরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকার কৃত ঐতিহাসিক রহস্য ১।২।৩ ভাগ মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ১৲ টাকা, ডাক মাসুল ৵০ আনা, ও রত্নরহস্য মূল্য ১৷০ ডাক মাসুল ৵১০ আনা ও অগস্তি মতম্ মূল্য ৷৷০ আনা। কলিকাতা যোড়া সাঁকো, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ১৪৮ নং সংস্কৃত ডিপজিটরিতে ও ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে বিক্রয় হইতেছে।

অতি অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

বাঙ্গালীর ইউরোপ-দর্শন।
২৫২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ১৲ টাকা, ডাক মাসুল ৵০ আনা।

" এই পুস্তকে এমন অনেক নূতন নূতন দৃশ্যের বর্ণনা আছে, যাহা বাঙ্গালার আর কোন পুস্তকে নাই। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচারে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, মন তৃপ্তি পায়।" নব্যভারত। " এই পুস্তক পাঠ করিতে করিতে অন্তঃকরণ কৌতূহল ও আনন্দে অধীর হইয়া উঠে।" আলোচনা। " ইহাতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালীর দৃশ্য সকলের সুন্দর চিত্র আছে এবং সেই চিত্র সকল হৃদয়গ্রাহী ও কৌতূহলোদ্দীপক।" বামাবোধিনী। "গ্রন্থখানি পড়িলেই বুঝা যায় ইহা কোন শিক্ষানবিশের লেখা নহে। প্রাপ্ত বয়স্ক মার্জ্জিত বুদ্ধি, মার্জ্জিত-রুচি দূরদর্শী লোকের লেখা। বস্তুতঃ গ্রন্থকার সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত।" সুরভি। এই পুস্তক সংস্কৃত ডিপজিটরী, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মের নিয়ম।

নানা দেশের নানা প্রকার আচার-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহসা মনে হইতে পারে যে, ধর্ম্ম-নিয়মের কিছুই স্থিরতা নাই—ধর্ম্ম কেবল একটা কথার কথা। কিন্তু সেই-সকল বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের মধ্যে স্থির-চিত্তে তলাইয়া দেখিলে তাহার অবিকল বিপরীত দেখিতে পাওয়া যাইবে; দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সর্ব্বত্রই মনুষ্যের অন্তঃকরণে ধর্ম্মের নিয়ম ন্যূনাধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। আফ্রিকা দেশের জঙ্গুলিয়ারা (Bushmen) ব্যাধ-বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানে না; যাহা উপস্থিত পায় তাহাই ভক্ষণ করে; কল্য কি খাইবে অদ্য তাহা ভাবে না; খাদ্য সম্মুখে পাইলে থামিতে জানে না; উপবাস করিতেছে তো উপবাসই করিতেছে,—কিন্তু দৈব-যোগে যদি একটা বড়-রকমের শিকার সংগ্রহ করিতে পারিল, তবে তাহার সমস্তটা যতক্ষণ না উদরস্থ করে, ততক্ষণ তাহাকে ছাড়ে না; অদ্যকার পুঁজি অদ্যই পার করিয়া দেয়, কল্যকার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। ইহাদের মধ্যে যদি কোন অসাধারণ ব্যক্তি একটা শা-মোরোগের বারো আনা অংশ ধ্বংশ করিয়া চারি আনা অংশ কল্যকার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখে, তবে সে-তাহার অসামান্য কার্য্য কত-না ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও মনঃসংযমের পরিচয় প্রদান করে। এইরূপ কার্য্যই এখানকার এক মাত্র ধর্ম্ম কার্য্য। এ ধর্ম্ম কার্য্য—আর কিছু নয়—কল্যকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অদ্যকার লোভ প্রবৃত্তিকে দমন করা; এরূপ কার্য্যের লক্ষ্য স্বার্থের অধিক আর কিছুই নহে। স্বার্থ-শব্দ এখানে নিতান্ত চলিত অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে—এটি যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। আপনি ভাল খা'ব—ভাল পর'ব, ইহাই যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাকেই লোকে স্বার্থ-পর বলে; শুদ্ধ কেবল আপনার কায়িক কুশলই প্রধানতঃ স্বার্থ-শব্দের বাচ্য। যেখানে স্বার্থের উপরে আর-কোন নিয়ামক নাই, সেখানে শারীরিক কুশল এবং মানসিক কুশল এ-দুয়ের মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ। স্নেহ-প্রেমাদি বৃত্তির চরিতার্থতার উপরেই মানসিক কুশল নির্ভর করে; কিন্তু স্নেহ-প্রেমাদির লক্ষ্যের ভিতর—শুধু কেবল আপনার হিত নহে—অন্যেরও হিত—অন্তর্ভূত রহিয়াছে,—সুতরাং এ-সকল বৃত্তির পরিচালনা স্বার্থকে ছাড়াইয়া উঠে; প্রত্যুত, যেখানে শুদ্ধ কেবল আপনার শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যের একমাত্র কাম্য বস্তু, সেখানে অন্যের হিতের প্রতি লক্ষ্য-সমাধানের পথ এখনো উন্মুক্ত হয় নাই; সুতরাং সেইখানেই স্বার্থের—খাঁটি স্বার্থের—নিজ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এই স্বার্থোদ্দিষ্ট কায়িক কুশল-টি নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিতে হইলে লোভাদি প্রবৃত্তি-সকলকে কিয়ৎ পরিমাণে দমন করা আবশ্যক,—ইহারই নাম স্বার্থ দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা; বিষয় তো এই—কিন্তু ইহাই এখানকার পক্ষে এমনি

কঠিন কার্য্য যে, অতি অল্প লোকেই তাহা পারে;—যে ব্যক্তি দুই দিনের খাদ্য সম্মুখে পাইলে এক দিনেই তাহা উদরস্থ না করে, সে ব্যক্তি এখানকার অসাধারণ ব্যক্তি।

এই সকল জঙ্গুলিয়া-দিগের অনতিদূরে গৃহস্থ কাফ্রীদের বসতি-স্থান। গৃহস্থ কাফ্রী-দের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রস্ফুটিত হওয়াতে ইহারা স্বার্থের আস্বাদ বিশেষ-রূপে অবগত হইয়াছে। মৃগয়া-লব্ধ পশুর মাংস তো আছেই—তদ্ভিন্ন গো-দুগ্ধ ও ভুট্টা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। হস্তীর মাংস—বিশেষতঃ হস্তীর পদ-পল্লব—ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী। ইহাদের এক এক পুরুষের অনেক-গুলি স্ত্রী; আর, গৃহপতির নিজের একটি স্বতন্ত্র কুটীর তো আছেই, তদ্ভিন্ন, যাহার যতগুলি স্ত্রী—তাহার আলয় ততগুলি কুটীরের সমষ্টি; আর, এক-একটি কুটীর এক-একটি স্ত্রীর বাসস্থান। সেই কুটীর-গুলি চক্রাকারে সন্নিবেশিত হইয়া মাঝখানকার উঠানের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে, ও সেই উঠানে গৃহের গরুরা মুক্ত ভাবে বিচরণ করে। এক কথায় বলিতে হইলে—এক-একটি আলয় এক-একটি অনাবৃত গোয়াল ঘর, ও তাহার চারিদিগের কুটীর-মণ্ডলী সেই গোয়াল-ঘরের বেষ্টন-পরিধি। ইহাদের কৃষি-কার্য্য এরূপ অপকৃষ্ট যে, ইহারা হল-কর্ষণ জানে না। ইহাদের স্ত্রীরা শুদ্ধ কেবল রন্ধনাদি করিয়াই পার পায় না; ক্ষেত্রের কার্য্য, কুটীর-নির্ম্মাণ, মোট বহা, প্রভৃতি যত কিছু কষ্টকর ব্যাপার—সমস্তই স্ত্রীর স্কন্ধে চাপাইয়া, স্বামী, বাহিরে পশু-হত্যা ও গৃহে স্ত্রী-হত্যার কাছাকাছি, এই দুয়ের মধ্যে এ-পাশ ও-পাশ করিয়া দিনপাত করে। স্ত্রীকে দিয়া মুটে-মজুরের কার্য্য করাইয়া লইবার জন্যই স্বামী তাহাকে ঘরে রাখে ও প্রতিপালন করে—নহিলে তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার কোন আপত্তি ছিল না। স্বামী আপনার স্বার্থের উদ্দেশে—যত অল্প ব্যয়ে পারে—স্ত্রীকে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে; ও স্বামীর উচ্ছিষ্টাবশেষ যৎ-স্বল্প অন্নের একমাত্র ভরসায়, স্ত্রী, জীবন এবং মৃত্যুর সন্ধিস্থলে কায়-ক্লেশে বর্ত্তিয়া থাকে। এক তো আধ-পেটা অন্ন, তাহার উপর কঠোর পরিশ্রম, তাহার উপর সন্তান প্রতিপালন, তাহার উপর সপত্নী-কলহ, তাহার উপর স্বামীর উৎপীড়ন,—স্ত্রীরা যে মধ্য-যৌবন পার হইতে-না-হইতেই বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করে—ইহাতে তাহাদের কোন অপরাধ নাই; আর, বিবেচনা করিয়া দেখিলে—তাহাই তাহাদের পরম সৌভাগ্য। এই সকল গৃহস্থ কাফ্রীরা জঙ্গুলিয়াদিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সভ্য। পূর্ব্ব-কথিত জঙ্গুলিয়াদের ধর্ম্ম-নিয়ম বড় জোর এই পর্য্যন্ত সম্ভবে যে, প্রবৃত্তি-বিশেষকে স্বার্থ দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। গৃহস্থ কাফ্রীরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে স্বার্থের নিয়মটি মানিয়া চলে; তদ্ব্যতীত, এখানকার নূতন আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই হওয়া উচিত যে, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে,—উচিত কেবল নয়—হইতে-করিতে কালে তাহাই হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু গার্হস্থ্যের এখানে নিতান্তই হীনাবস্থা;—কন্যা-বিক্রয়ই এখানকার কন্যা-সম্প্রদান; স্ত্রী এখানে স্বামীর

সহধর্ম্মিণী হওয়া দূরে থাকুক্—দাসী অপেক্ষাও অধম। পুত্র বড় হইলে পাছে সে মাতাকে ঘরের দাসী অপেক্ষা অধিক কিছু মনে করে, এজন্য এখানকার শাস্ত্র এই যে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের পক্ষে মাতার বাধ্য হওয়া কা-পুরুষের লক্ষণ; কিন্তু পুত্রের গোঁপ দাড়ি উঠিতে না উঠিতেই সে যদি মাতাকে প্রহার করিতে শেখে, তবে কালে সে যে একজন বীর-পুরুষ হইবে—এ বিষয়ে আর কাহারো অণু-মাত্র সংশয় থাকে না। কৌলীন্য বলিয়া একটা যে. সামগ্রী, অর্থাৎ যাহাকে আমরা সৎকুলোচিত ভদ্র ব্যবহার বলি, তাহা এখানকার ত্রিসীমায় স্থান পাইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে কেহ যদি সুবুদ্ধি এবং স্নেহ-মমতার বশবর্ত্তী হইয়া গার্হস্থ্যের নিয়ম কিয়ৎ পরিমাণে মানিয়া চলে, স্বার্থকে কিয়ৎ-পরিমাণে গার্হস্থ্য-দ্বারা নিয়মিত করে,—স্ত্রীকে মর্ম্মান্তিক প্রহার না করে ও নিতান্ত গর্দ্দভের মত না খাটায়, তবে তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম্ম-কার্য্য।

অতঃপর আরব দেশের মরুভূমির মধ্যে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যা'ক্। চারি দিকে বিশাল মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে—তাহার মধ্যে এখানে তিন চারি ঘর গৃহস্থ (গৃহস্থ ঠিক্ নয়—তাঁবুস্থ) ও তাহার বহু দূরে ঐরূপ আর কতক-গুলি ঘর, বাস করি-তেছে। খর্জ্জূরের ফল, কূপের জল, উষ্ট্রের দুগ্ধ, মেষ মাংস, কদাচিৎ কখনো বা উষ্ট্রের মাংস, ইহাদের জীবনের একমাত্র সম্বল। কাজেই, লোকাচার বলিয়া একটা যে, সামগ্রী, অর্থাৎ সমাজের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংঘর্ষে যেরূপ আচার-ব্যবহার প্রসূত হয়—সেরূপ কোন-কিছু, এখানে স্থান পাইতে পারে না; তথাপি কুল-পরম্পরা-ক্রমে যেরূপ আচার-ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহা এখানে সকলেরই সম্ভজনীয়; কুলাচারই এখানে সর্ব্বপ্রধান নিয়ামক। কৌলীন্যের মর্য্যাদা ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে অব-গত আছে; ইহার সামান্য একটি উদাহরণ এই যে. ইহাদের অনেকের নামের সঙ্গে "অমুকের সন্তান" এই ভাবের একটি উপাধি গ্রথিত থাকে,—যেমন বেন্‌জামিন্ অর্থাৎ জামিন বংশের সন্তান। এই সকল অসভ্য আরবেরা যদিচ দস্যুবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানে না, তথাপি, শুদ্ধ কেবল কুলাচারের বশবর্ত্তী হইয়া অভ্যাগত অতিথির দ্রব্যাদি হরণে ক্ষান্ত থাকে,—ইহাই ইহাদের পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম্ম-কার্য্য। এরূপ অসভ্য লোকেরা যদি কুলাচারকেই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম-নিয়ম মনে করে—তবে তাহাদের সে কথা নিতান্ত অবজ্ঞার সামগ্রী নহে; এখানকার পক্ষে তাহা বাস্তবিকই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম-নিয়ম—তাহা বাস্তবিকই ঈশ্বরের আদেশ; কারণ, এখানে তাহা-অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাদের স্ত্রী-পুত্রেরা স্নেহ এবং যত্নের সামগ্রী—গৃহপতিরা ভক্তির পাত্র। স্বার্থ, এখানে, গার্হস্থ্যের অধীন,—শারীরিক প্রাণ মানসিক প্রাণের অধীন; মানসিক প্রাণ—অর্থাৎ স্নেহ-মমতা। অভ্যাগত অতিথির রীতিমত সৎকার না করিলে—শুধু কেবল আপনার নয়—কিন্তু সমস্ত গৃহের অকল্যাণ হইবে, এই ভাবিয়া ইহারা সাধ্য-মতে অতিথি-সেবার ত্রুটি করে না। কঠোপনিষদে আছে "বৈশ্বানরঃ

প্রবিশত্যতিথি ব্রা্হ্মণো গৃহান্” অগ্নির ন্যায় ব্রাহ্মণ অতিথি গৃহে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তাঁহাকে যদি না শান্ত করা যায় তবে তাঁহার নিশ্বাসে গৃহ দগ্ধ হইয়া যাইবে। হইলে হয় কি,—আরব দেশীয় অসভ্যদিগের আতিথ্য কিছু অদ্ভুত প্রকার;—অতিথি যতক্ষণ গৃহে থাকে, ততক্ষণ সে মস্তকের মণি; কিন্তু সেই অতিথি যখন গৃহাভিমুখে আসিতেছে—গৃহে প্রবেশ করিতে কেবল বাকি—তখন ঐ আরব তস্করেরা তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে কিছু মাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না; তবে, অতিথির ভার-লাঘব কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়া—তাহার পর—তাহাকে গৃহে আনিয়া তাহার যথোচিত সৎকার করে ও তাহাকে গন্তব্য পথে নিরাপদে অগ্রসর করিয়া দেয়; এই যে করে—ইহাই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট ধর্ম্ম কার্য্য। পূর্ব্বে যে দুইটি নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা ও স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, এ দুইটি নিয়ম এখানে অপেক্ষা-কৃত অধিক পরিমাণে প্রচলিত; তদ্ব্যতীত, এখানে নবোন্মেষিত আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্য দ্বারা (অর্থাৎ কুলোচিত ভদ্রতা-দ্বারা) গার্হস্থ্যকে নিয়মিত করিতে হইবে। গার্হস্থ্য হইতে কৌলীন্য, অথবা যাহা একই কথা—ভদ্রতা, কিরূপে অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়, এই স্থলে তাহার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আবশ্যক।

গৃহপতির যখন সন্তান-সন্ততি বিস্তৃত হইয়া এক গৃহের অধিবাসীরা নানা গৃহে ছট্‌কিয়া পড়ে, তখন গৃহপতি সেই সকল গৃহের মধ্যস্থলে বাস করিয়া কুলপতি হইয়া দাঁড়া'ন। তিনি সকলকেই আপনার সন্তান-সন্ততি জানিয়া সকলেরই মঙ্গল কামনা করেন; কাজেই সকলে তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ও তাঁহার আদেশ পালন করে। তিনি যদি অবিবেচনা-পূর্ব্বক যাহাকে তাহাকে যাহা তাহা আদেশ করেন, তবে তাঁহার শাসন অচিরে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়, তাহা না করিয়া, যে-সকল মঙ্গল-নিয়ম পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই তিনি আদর্শ-পদবীতে দাঁড় করাইতে প্রয়াস পা'ন। তিনি উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অভিপ্রায়-টি ব্যক্ত করেন যে, "আমিই এখানে সর্ব্বে সর্ব্বা—আমার উপরে আর কেহই নাই—আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিতে পারি, তবুও দেখ—পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মঙ্গল নিয়মের অধীনে মস্তক অবনত করিয়া আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি; অতএব সেরূপ করা তোমাদের আরো কত না কর্ত্তব্য।" কুলের কোন অবাধ্য সন্তান যদি কোন-প্রকার কুতর্ক উত্থাপন করে, তবে কুলপতি পূর্ব্বপুরুষদিগের নজির দেখাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন;—তিনি হয় তো বলেন "পূর্ব্বপুরুষেরা অমুক অমুক নিয়মে চলিতেন বলিয়া তাঁহারা তিন শত বৎসর জীবিত থাকিতেন; তাঁহাদের বাহুবল এরূপ ছিল যে, সমগ্র একটা তালগাছ তাঁহারা অবলীলাক্রমে উৎপাটন করিয়া ফেলিতেন; তোমরাও সেইরূপ নিয়মে চলিলে তোমরাও তাঁহাদের মত আয়ুষ্মান্ বলবান্ ও বীর্য্যবান্ হইবে।" এরূপ বলবৎ এবং

অকাট্য প্রমাণের উপর কাহারো আর কোন কথা চলিতে পারে না! এই স্থানটিতেই ইতিহাস-পুরাণাদির বীজ-বপনের প্রথম সূত্রপাত হয়। এইরূপ করিয়া ক্রমে যখন কুলোচিত আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি কুলক্ষেত্রে বদ্ধমূল হয়, তখন সমস্ত গৃহের গার্হস্থ্য সেই সকল রীতি নীতি দ্বারা নিয়মিত হয়। প্রসঙ্গাধীন, এই একটি কথার উল্লেখ এখানে আবশ্যক মনে হইতেছে যে, যত কিছু বলা হইল সমস্তই—যুদ্ধ বিগ্রহাদি কাঁটা খোঁচা বাদ দিয়া যত সংক্ষেপে পারা যায়—বলা হইল। সমস্ত বিবরণ যদি আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিতে হয়, তবে তাহার এ স্থানও নহে—এ সময়ও নহে; তাহা করিতে গেলে এক-তো পুঁথি বাড়িয়া যায়, তাহাতে আবার, তাহার নানা দিকে নানা ছিদ্র পাইয়া বহুতর অপ্রাসঙ্গিক কথার বন্যা আসিয়া প্রকৃত প্রস্তাবটিকে সাত হাত জলের নীচে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। এখানকার বীজ মন্ত্র এই যে, "যৎস্বল্পং তন্মিষ্টং" যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট।

এক গৃহ হইতে যেমন নানা গৃহ প্রসূত হইয়া সকলে একই কুল-সূত্রে গ্রথিত হয়, সেইরূপ এক কুল হইতে নানা কুল প্রসূত হইয়া সকলে একই সমাজ-সূত্রে গ্রথিত হয়। এই সময়ে কুলপতির সিংহাসনে লোকপতি আবির্ভূত হ'ন; কুলপতিদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি দেশের রাজা হইয়া দাঁড়া'ন। এখন রাজসভাই সমস্ত দেশের মথিত সারাংশ এবং অনুকরণীয় আদর্শ। যে গ্রাম রাজধানী হইতে যত দূরবর্ত্তী, সে গ্রাম সভ্যতা-সোপানে তত পশ্চাদ্বর্ত্তী; যে গ্রাম রাজধানীর যত নিকটবর্ত্তী, সে গ্রাম সভ্যতা-সোপানে তত অগ্রবর্ত্তী। ক্রমে রাজ-সভার সভ্যতা সমস্ত দেশময় ক্রমে ক্রমে পরিব্যাপ্ত হইয়া—তাহাই দেশের সভ্যতা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দূর-দূর-স্থিত পল্লীগ্রামের প্রজারা সভ্যতার বড় একটা ধার ধারে না; তাহারা পূর্ব্বে যেমন স্ব স্ব কুলপতির অধীনে অবস্থিতি করিত, এখনো অনেকটা সেই ভাবেই অবস্থিতি করে। যে প্রদেশ রাজধানীর যত নিকটবর্ত্তী, সেই প্রদেশের কুলাচার ততই লোকাচার দ্বারা নিয়মিত হয়। পূর্ব্বে যে তিনটি ধর্ম্ম-নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, কি না—প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌলীন্য দ্বারা, নিয়মিত করিতে হইবে, এ তিনটি নিয়ম তো আছেই—তদ্ব্যতীত—এখানে নবোন্মেষিত আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্যকে সভ্যতা-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে।

সভ্যতার নূতন উদ্রেকের সময়, রাজধানীর নিকটবর্ত্তী কুলপতিদিগের প্রাধান্য রাজার দোর্দণ্ড প্রতাপের অভ্যন্তরে কবলিত হইয়া যায়; কিন্তু দূরবর্ত্তী কুলপতিদিগের প্রতাপ ন্যূনাধিক পরিমাণে অব্যাহত থাকে। এই-সকল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন কুলপতিরা দলবদ্ধ হইয়া লোকপতির প্রতাপ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায়—একদিকে লোকপতি রাজা এবং আর-এক দিকে কুলপতি-ব্যূহ উভয়েই জন-সাধারণকে আপনার আপনার দলে টানিতে সবিশেষ প্রয়াস পা'ন; সুতরাং লোকরঞ্জন দুই দলেরই প্রধানতম কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফল এই হয় যে, জন-

সাধারণের উপর রাজা এবং কুলপতি-বূহ উভয়েরই অত্যাচারের পথ ক্রমশই সংকীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে; অবশেষে সে পথ এরূপ অবরুদ্ধ হইয়া যায় যে, রাজা ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য শাসন না করিলে তাঁহার রাজত্ব কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না। পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়-প্রতাপ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ দ্বারা সময়ে সময়ে পরিশোধিত হইত; এজন্য এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, অতীব পূর্ব্বকালে লোকপতির দল ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় জাতিতে ও কুলপতির দল ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। কুলপতিরা যে, লোকপতির সহিত বাহুবলে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন—তাহার অতি অল্পই সম্ভাবনা; কাজেই, গত্যন্তর-বিহীন কুলপতিরা লোকরঞ্জন-কার্য্যে সমধিক আগ্রহান্বিত হইলেন ও প্রতাপোন্মত্ত রাজা সে দিকে ততটা মনোযোগী হইলেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, যিনি জ্ঞাতি-দিগকে বশ করিতে পারেন তিনিই বশিষ্ঠ; ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, পুরাকালে বশিষ্ঠ নামক বিশেষ একজন মহর্ষি থাকুন বা না থাকুন—কিন্তু এটা স্থির যে, ঐ নামটি প্রধান প্রধান কুলপতিদিগের উপাধি ছিল। এই সময়ে, রাজা বাহুবল দ্বারা লোকের বল-বীর্য্য বশ করিলেন, কুলপতিরা সদ্ভাব দ্বারা লোকের হৃদয় বশ করিলেন। জন-সাধারণের হৃদয় কিছু কম সামগ্রী নহে,—তাহার বলে বলী হইয়া কুলপতির শাপাস্ত্র যে, সময়ে সময়ে লোকপতির শরাস্ত্রের উপরে জয়লাভ করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কুলপতি বশিষ্ঠের সহিত লোকপতি-বিশ্বামিত্রের সংগ্রামের অভ্যন্তরে কত-যে ঐতিহাসিক রত্ন মাটি-চাপা রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র নামটিই ইঙ্গিতচ্ছলে ব্যক্ত করিতেছে যে, বিশ্বামিত্র কুলপতিদিগের ন্যায় মৈত্রী-দ্বারা বিশ্বের লোককে অর্থাৎ জনসাধারণকে বশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন—কুলপতি-দিগের নিজের অস্ত্রে কুলপতিদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গুহা-গহ্বরে আর অধিক প্রবেশ না করিয়া এখানে আমার যাহা প্রকৃত বক্তব্য তাহাই বলি; তাহা এই যে, একদিকে লোকপতির দল, আর একদিকে কুলপতির দল, এই দুই দলের ঘর্ষাঘর্ষি হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সভ্য-সমাজে প্রসূত হইয়া দীপ্ত হুতাসনের ন্যায় সর্ব্বোপরি মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠে। এই শুভ ঘটনাটি যখন উপস্থিত হয়, তখন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম রাজারও রাজা হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বে রাজ-সভা-হইতে সভ্যতা উৎসারিত হইয়া দেশ-ময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এখন রাজা-প্রজার মধ্য হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম উদ্ভাসিত হইয়া সভ্যতাকে নিয়মিত করিতে লাগিল। এখন ধর্ম্মই প্রকৃত পক্ষে রাজা;—রাজা ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী—এই মাত্র। এখনকার এই ধর্ম্মরাজ্যে রাজা যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, তখন ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। পূর্ব্বে রাজা লোকপতি হইয়া লোকাচার ও সভ্যতা দেশময় বিকীর্ণ করিয়াছিলেন—এখন তিনি ধর্ম্মাবতার হইয়া ধর্ম্মের আদেশ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মনু-

রাজা এইরূপ একজন রাজা ছিলেন ও মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র মানব-সমাজের একটি অদ্বিতীয় এবং অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি কুলপতিদিগের অধিকার স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, লোকপতিরও অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; কুলপতিদিগের আর যোট-বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা রহিল না সুতরাং তাঁহাদের যোট ভাঙ্গিয়া গেল; সকল শ্রেণীর লোকেরই স্ব স্ব অধিকার সুনির্দ্দিষ্ট হইল; শান্তি-সূর্য্য অভ্যুদিত হইল, ও ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা কি ফল লাভ করিলাম তাহা একবার গণণা করিয়া দেখা যা'ক্। ধর্ম্ম-সোপানের প্রথম পংক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রবৃত্তিকে স্বার্থ-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, ইহাই সেখানকার একমাত্র ধর্ম্ম-নিয়ম। এক প্রকার অধম কীটাণু আছে যাহার সমস্ত শরীরটাই উদর;—এরূপ জীবের উদরকে তাহার শরীরের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না—যেহেতু তাহার উদরই তাহার শরীর, ও তাহার শরীরই তাহার উদর; এখানে সেইরূপ স্বার্থকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু স্বার্থই এখনকার একমাত্র ধর্ম্ম। দ্বিতীয় পংক্তিতে ও-নিময়টি তো আছেই (কিনা স্বার্থ দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে, এই নিয়মটি), তদ্ব্যতীত—এখানে আর একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, গার্হস্থ্য দ্বারা স্বার্থকে নিয়মিত করিতে হইবে। পূর্ব্ব পংক্তিতে ধর্ম্ম স্বার্থ-পাশে জড়িত হইয়া ছিল; এখানে সেই স্থূলতম পাশ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া, ধর্ম্ম, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম-পাশে—গার্হস্থ্য-পাশে—আটক পড়িয়া রহিল। গার্হস্থ্যই এখানে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম—স্বার্থ ধর্ম্মের অঙ্গ মাত্র। তৃতীয় পংক্তিতে ও-দুইটি ধর্ম্মের নিয়ম তো আছেই—কিনা প্রবৃত্তিকে স্বার্থ দ্বারা ও স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত, এখানে আর একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্য দ্বারা—অর্থাৎ কুলোচিত ভদ্রতা দ্বারা—গার্হস্থ্যকে নিয়মিত করিতে হইবে। এখানে গার্হস্থ্য-পাশ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া, ধর্ম্ম, তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর পাশে—কৌলীন্য-পাশে—আটক পড়িয়া রহিল; এখানে কৌলীন্য সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্থানীয়, ও গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ ধর্ম্মের অঙ্গ-স্থানীয়। চতুর্থ পংক্তিতে ও তিনটি ধর্ম্মের নিয়ম তো আছেই—কি না প্রবৃত্তিকে স্বার্থ-দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌলীন্য-দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত, এখানে আর-একটি ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, কৌলীন্যকে সভ্যতা-দ্বারা, অর্থাৎ লোকারাধ্য আচার-ব্যবহার দ্বারা—এক কথায় লৌকিকতা দ্বারা—নিয়মিত করিতে হইবে। এখানে কৌলীন্য-পাশ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া, ধর্ম্ম, তদপেক্ষা আরো সূক্ষ্মতর পাশে—সভ্যতা পাশে—আটক পড়িয়া রহিল। এখানে সভ্যতাই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্থানীয়, ও কৌলীন্য গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ ধর্ম্মের অঙ্গ-স্থানীয়। যেখানে সভ্যতার উপরে—বা লোকাচারের উপরে—আর কোন নিয়ামক নাই, সেখানে লোকাচার যে, সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ হইবে, তাহা হইতেই পারে না; এরূপ নির্ম্মস্তক লোকাচারের সভ্য রীতি নীতির সঙ্গে

অনেক-এমন কুরীতি জড়িত থাকে, যাহা বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া প্রার্থনীয়। এ পর্য্যন্ত যে-সকল ধর্ম্ম-নিয়মের কথা বলা হইল, তাহাদের কাহারো এত দূর চক্ষু ফুটে নাই যে, ভাল বস্তুকে মন্দ বস্তু হইতে বাছিয়া লইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্ম যখন সভ্যতা-হইতেও উপরে উঠিয়া নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে দণ্ডায়মান হয়—আত্ম-বিস্মৃত অজ্ঞাত-বাসের বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া যখন সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন কি ভাল ও কি মন্দ তাহা সে স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায়। প্রথম পংক্তির স্বার্থ-ধর্ম্ম আপনার শারীরিক কুশলকে (সংক্ষেপে শরীরকে) অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিয়া থাকে; দ্বিতীয় পংক্তির গার্হস্থ্য ধর্ম্ম স্ত্রী-পুত্রাদিকে এবং প্রধানতঃ গৃহপতিকে; তৃতীয় পংক্তির কৌলীন্য-ধর্ম্ম জ্ঞাতি-বন্ধুকে এবং প্রধানতঃ কুলপতিকে; চতুর্থ পংক্তির লৌকিক ধর্ম্ম দেশকে এবং প্রধানতঃ দেশের রাজাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিয়া থাকে; কিন্তু পঞ্চম পংক্তির বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দেশেরও উপরের বস্তু—তাহার অবলম্বন কে? যখন সমস্ত দেশ একদিকে ও গালিলিও একদিকে—গালিলিওর সেই অবস্থাটি এক বার মনে ভাবিয়া দেখ! সে অবস্থায় কয়-জন লোকের প্রকম্পিত আড়ষ্ট কণ্ঠ-নলী হইতে সত্য মস্তক উত্তোলন করিয়া বাহির হইতে পারে? গালিলিও যখন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন যে, "সূর্য্য স্থির রহিয়াছে—পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে" তখন তাঁহার অবলম্বন জগতের কেহই নহে—তখন অন্তরতম বিশুদ্ধ সত্যই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ দেশকাল-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আর-এক নাম পরমার্থ। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের নিয়ম দেশ-বিশেষে বা কাল-বিশেষে বা জাতি-বিশেষে বদ্ধ থাকিবার নহে। এইরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নিয়ম যোগ-শাস্ত্রে "সার্ব্বভৌম মহাব্রত" বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা, "এতে তু জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতং"। পঞ্চম পংক্তিতে পূর্ব্বেকার চারিটি নিয়ম তো আছেই—কি না প্রবৃত্তিকে স্বার্থ-দ্বারা, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা, গার্হস্থ্যকে কৌলীন্য দ্বারা, কৌলীন্যকে সভ্যতা দ্বারা, নিয়মিত করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত এখানকার আর একটি ধর্ম্ম নিয়ম এই যে, সভ্যতাকে পরমার্থ দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; অথবা যাহা একই কথা—লোকাচারকে সার্ব্বভৌমিক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। পঞ্চম পংক্তিতে পরমার্থই ধর্ম্ম-স্থানীয়, ও সভ্যতা কৌলীন্য গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ এ সমস্তই ধর্ম্মের অঙ্গ-স্থানীয়। পরমার্থ আবির্ভূত হইলে নিম্ন-নিম্ন সমস্ত পংক্তিরই শ্রী ফিরিয়া যায়; তাহার নির্নিমেষ চক্ষে পড়িয়া, সভ্যতা হইতে কুরীতির সমস্ত দল-বল ঘর-দ্বার উঠাইয়া লইয়া একে একে প্রস্থান করিতে থাকে; এখন সভ্যতা শুদ্ধ কেবল সভ্যতা-মাত্রেই ক্ষান্ত থাকে না, সভ্যতা এখন সুসভ্যতা হইয়া দাঁড়ায়; সুস-ভ্যতার প্রভাবে কৌলীন্য সুশোভন ভদ্রতা হইয়া দাঁড়ায়; সুশোভন ভদ্রতার প্রভাবে গার্হস্থ্য এবং স্বার্থ উভয়েই নব-তর কল্যাণ-তর মূর্ত্তি ধারণ করে।

এই স্থল-টিতে বিষম এক কুতর্ক উপস্থিত হইতে পারে—সে-টি এই যে, ধর্ম্ম-শব্দের

অর্থ নিতান্তই চল্‌তি-মুখে পড়িয়া আছে—তাহার অর্থের কোন ঠিকানা নাই; এক-দেশে (যেমন জঙ্গুলিয়া দেশে) স্বার্থই পরাকাষ্ঠা ধর্ম্ম, আর-এক দেশে স্বার্থকে দমন করাই পরাকাষ্ঠা ধর্ম্ম; তবে আর ধর্ম্মের স্থিরত্ব কোথায়? স্থিরত্ব যে, কোথায়, তাহা উপরি-উক্ত ধর্ম্ম-সোপানের প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে। ধর্ম্ম-সোপানের পাঁচটি পংক্তির পাঁচটি ধর্ম্ম নিয়ম পাঁচ প্রকার নহে কিন্তু একই প্রকার। মূল নিয়ম একটি মাত্র; সেটি এই যে, অন্তঃকরণের বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। ইহা-অপেক্ষা সুস্পষ্ট আর কি হইতে পারে যে, লোভাদি প্রবৃত্তি অপেক্ষা আপনার শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; আপনার শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা দেশের মঙ্গল-ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; দেশের মঙ্গল-ইচ্ছা অপেক্ষা সার্ব্বভৌমিক বিশুদ্ধ মঙ্গল ইচ্ছা সাধারণ বৃত্তি; সুতরাং সকল পংক্তিরই ধর্ম্ম-নিয়ম এই যে, বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ-বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে। শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিভাগের সহিত এখানকার এই ধর্ম্ম-সোপানের পংক্তি-বিভাগের চমৎ-কার মিল রহিয়াছে। আমাদের দেশের প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে, প্রথমে প্রাণ, তাহার পর মন, তাহার পর অহঙ্কার, তাহার পর বুদ্ধি, তাহার পর আত্মা, উত্তরোত্তর প্রধান-পদবীতে আরূঢ়। প্রথম, প্রাণ;—শরীর-রক্ষাই প্রাণের ধর্ম্ম; স্বার্থের পংক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, পশুবৎ জঙ্গুলিয়াদিগের প্রাণে বাঁচিয়া থাকাই জীবনের প্রধানতম কার্য্য। দ্বিতীয়, মন;—প্রাণে বাঁচিয়া থাকা তো আছেই—তাহার উপর স্ত্রী পুত্রের মুখ-দর্শন করিয়া মনকে সুখে রাখা গার্হস্থ্যের উদ্দেশ্য। তৃতীয়, অহঙ্কার; বাহিরের বিষয় দ্বারা উপরঞ্জিত হওয়া (স্ত্রীপুত্রের মুখ-দর্শনে সুখী হওয়া) যেমন মনের ধর্ম্ম, তেমনি আপনার পৌরুষ-কার্য্যে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখা অহঙ্কারের ধর্ম্ম। মনের দৃষ্টি সম্মুখ পানে—সম্মুখস্থিত বিষয়-সমূহে; অহঙ্কারের দৃষ্টি পশ্চাৎপানে,—পৌরুষ কার্য্য করিয়া অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব করিয়া—"আমি এই কার্য্য করিলাম" এই বলিয়া আপনার প্রতি ফিরিয়া দেখা, অহঙ্কারের লক্ষণ। পূর্ব্ব পুরুষদিগের কীর্ত্তির প্রতি ফিরিয়া দেখা ও আপনার পৌরুষ-দ্বারা সেই কীর্ত্তিতে নূতন জীবন সঞ্চার করা, আর, পুত্র-পৌত্রাদিকে তাহার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা, কৌলীন্যের প্রধান উদ্দেশ্য; কৌলীন্য এইরূপ অহঙ্কার-প্রধান। এখানে এইটি দেখা কর্ত্তব্য যে, যেখানে পারমার্থিক ধর্ম্ম পরিস্ফুট হয় নাই, সেখানে কম্‌টের শাস্ত্রানুযায়ী লৌকিক ধর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম—ও সেখানকার পক্ষে তাহা ভাল বই মন্দ নহে; তেমনি আবার, যেখানে লৌকিক ধর্ম্ম পরিস্ফুট হয় নাই, সেখানে ইউরো-পের মধ্যমাব্দীয় অহঙ্কার-প্রধান কৌলিক ধর্ম্ম, যাহা Chivalry নামে প্রসিদ্ধ, তাহাই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম; সুতরাং সেখানে তাহাই শ্রেয়স্কর। দেশকাল-পাত্রোচিত শোভন অহ-ঙ্কার মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া নীচ প্রবৃত্তির পথ-রোধ করে—সুতরাং তাহা

ভাল বই মন্দ নহে; কিন্তু যদি অহঙ্কার মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়া অযোগ্য তীব্র ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই নিন্দনীয়। এমন কি, অহঙ্কারে অতি মাত্র স্ফীত হইলে, মনুষ্য উন্মাদ হইয়া উঠিতে পারে; Don Quixot-এর উপন্যাস ইহার একটি পরিপাটি উদাহরণ। অহঙ্কারের উত্তেজনায় মনুষ্যের স্পর্দ্ধা কখনো কখনো আকাশ ছাড়াইয়া উঠে,—ক্ষুদ্র মনুষ্য পরাৎপর পরমেশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হইতে লজ্জিত হয় না,—ভেক ফুলিয়া হস্তী হওয়া ইহার কাছে কোথায় লাগে! কিন্তু "আমি ভদ্র-সন্তান" বলিয়া মনুষ্যের যে-একটা দেশ কালপাত্রোচিত কৌলীন্য-অহংকার, তাহা নিন্দনীয় হওয়া দূরে থাকুক, তাহাই ধর্ম্ম-সোপানের মধ্যম পংক্তি। চতুর্থ, বুদ্ধি;—কৌশল দ্বারা কার্য্য সমাধা করাই বুদ্ধির ধর্ম্ম; বুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য আপনার পৌরুষের প্রতি নহে, কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের প্রতি। একাকী সকল-কার্য্যে কর্তৃত্ব করিলে আপনার পৌরুষেরই পরিচয় দেওয়া হয়—কিন্তু তাহাতে কার্য্য ভাল হয় না; সকলে মিলিয়া সকলের জন্য কার্য্য করিলে আপনার আপনার পৌরুষ অনেকটা চাপা পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কার্য্য যেমন ভাল হয়—তেমন আর কিছুতেই নহে; এইরূপ সুকৌশলে কার্য্য সুনির্ব্বাহ করা সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ। কৌলীন্য যেমন অহঙ্কার-প্রধান, সভ্যতা সেইরূপ বুদ্ধি-প্রধান। পঞ্চম, আত্মা;—সার্ব্বভৌমিক মঙ্গল, বিশুদ্ধ মঙ্গল, পরিপূর্ণ মঙ্গল, এক কথায় পরমার্থ, বহির্জগতের কুত্রাপি দৃষ্ট হইতে পারে না—আত্মাই তাহার একমাত্র বসতিস্থান। স্বার্থ যেমন শরীরের মঙ্গল, গার্হস্থ্য যেমন মনের মঙ্গল, কৌলীন্য যেমন অহঙ্কারের মঙ্গল, সভ্যতা যেমন বুদ্ধির মঙ্গল, পরামর্থ সেইরূপ আত্মার মঙ্গল। মনুষ্য-জাতির আত্মার মঙ্গল সাধিত হইলে—মনুষ্য-জাতির আত্মা সার্ব্ব-ভৌমিক বিশুদ্ধ মঙ্গল-ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হইলে—দেশের—কুলের—গৃহের—শরীরের—সমস্তেরই মঙ্গল সেই-এক মহা-মঙ্গলের অনুগামী হয়। আর একটি কথা এখানে বক্তব্য এই যে, অহংকার যেমন মনের উপর কর্তৃত্ব করে—আত্মা (স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আকর আত্মা) সেইরূপ বুদ্ধির উপর কর্তৃত্ব করে; বুদ্ধি যেমন উচ্চতর মন—আত্মা সেইরূপ উচ্চতর অহং। অহঙ্কার মনের কেন্দ্রস্থানে—আত্মা বুদ্ধির কেন্দ্রস্থানে——অধিরূঢ়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিভাগের সহিত ধর্ম্ম-সোপানের পংক্তি-বিভাগের আগা-গোড়া মিল রহিয়াছে। এখন বক্তব্য এই যে, বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে—এ নিয়মটি এমনি স্থির যে, কোথাও ইহার বিন্দু-বিসর্গেরও অন্যথা হইতে পারে না; ইহাকে ধর্ম্ম-সোপানের যে পংক্তিতে খাটাও, সেই পংক্তিতে খাটিবে। জ্যোতিষের একটি মূল নিয়ম এই যে, গুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে লঘু মণ্ডল ঘুরিবে; এই নিয়মটিকে যখন সূর্য্য-মণ্ডলে প্রয়োগ করি, তখন পাই যে, সূর্য্য বৃহত্তর আর-একটা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; উহাকে যখন ভূমণ্ডলে প্রয়োগ করি তখন পাই যে, সূর্য্য অপেক্ষাকৃত স্থির ও পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; উহাকে যখন চন্দ্র-মণ্ডলে প্রয়োগ করি, তখন পাই যে, পৃথিবী

অপেক্ষাকৃত স্থির ও চন্দ্র তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; কিন্তু তাহা বলিয়া উপরি-উক্ত ভারাকর্ষণের নিয়ম তিন নিয়ম নহে—উহা একই নিয়ম। ইহারই ন্যায়, এ নিয়মটি একই নিয়ম যে,অন্তঃকরণের বিশেষ বৃত্তিকে সাধারণ বৃত্তি দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে;—এ নিয়মটিকে প্রথম পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, প্রবৃত্তিকে আপনার শারীরিক মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা আপনার স্বার্থকে নিয়মিত করিতে হইবে; তৃতীয় পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, কুলের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা গৃহের মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে হইবে; চতুর্থ পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, লোকের বা দেশের মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা কুলের মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিয়মিত করিতে হইবে; পঞ্চম পংক্তিতে প্রয়োগ করিয়া পাইতেছি যে, সমস্ত মঙ্গল-ইচ্ছাকে নিরপেক্ষ সার্ব্বভৌমিক মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে, ইহাই পারমার্থিক ধর্ম্ম-নিয়ম। ধর্ম্মের মূল নিয়মটি (অর্থাৎ সাধারণ বৃত্তি দ্বারা বিশেষ বৃত্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে, এই নিয়মটি) যদি ঐ পাঁচ পংক্তির একটি-কোন স্থানে না খাটিত, তবেই বলিতে পারিতাম যে, ধর্ম্ম-নিয়মের কোন স্থিরত্ব নাই; কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, ও-নিয়মটি এমনি অটল ও অপরিবর্ত্তনীয় যে, কোথাও উহার বিন্দু-বিসর্গেরও অন্যথা হইতে পারে না, তখন কোন্ লজ্জায় এরূপ কথা মুখে আনিব যে, ধর্ম্ম-নিয়মের কিছুই স্থিরতা নাই। কেহ বলিতে পারেন যে, গার্হস্থ্যও তো এক প্রকার স্বার্থ; স্ত্রী-পুত্র তো আমারই স্ত্রীপুত্র; স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল তো আমার আপনারই মঙ্গল; ইহার উত্তর এই যে, তোমার নিজের স্বার্থ (অর্থাৎ আপনি খাওয়া আপনি পরা) স্ত্রী-পুত্রের মঙ্গল-ইচ্ছা দ্বারা এরূপ ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে যে, এখন তাহাকে চেনা ভার; তোমার স্বার্থ গৃহের মঙ্গলের মধ্যে এরূপ কবলিত হইয়া রহিয়াছে যে, স্বার্থ বলিবামাত্রই গৃহের মঙ্গল তোমার মনোমধ্যে উদিত হয়; ইহাতে কেবল ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, তোমার স্বার্থ অনেককাল-যাবৎ গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত হইয়া চুকিয়াছে; সুতরাং তোমাকে এরূপ উপদেশ দেওয়া বাহুল্য যে, স্বার্থকে গার্হস্থ্য দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে; কিন্তু একজন জঙ্গলিয়া—যে প্রথম পংক্তির উপরে উঠে নাই—তাহার পক্ষে ঐ নিয়মটিই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম-নিয়ম। কোন পংক্তির নিয়ম কাহারো পক্ষে সহজ, কাহারো পক্ষে কঠিন,—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার নিয়মত্বের একচুলও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ধর্ম্ম-নিয়মের স্থিরত্ব সংস্থাপিত হইল, এখন আর-একটি বিষয়ের মীমাংসা কেবল অবশিষ্ট—সেইটি হইয়া গেলেই আজিকের মত আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি হয়।

স্বার্থ ধর্ম্ম-সোপানের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন পংক্তি, পরমার্থ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পংক্তি। স্বার্থ সহজত্বের আদর্শ এবং পরমার্থ উৎকর্ষের আদর্শ। গার্হস্থ্য যখন স্বার্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই গার্হস্থ্যের সিদ্ধাবস্থা; কৌলীন্য এবং সভ্যতা যখন

স্বার্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই কৌলীন্য ও সভ্যতার সিদ্ধাবস্থা; পরমার্থ যখন স্বার্থের ন্যায় সহজ হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাই মনুষ্যের চরম সিদ্ধাবস্থা ও পরম পুরুষার্থ; আর, তাহার সাধন মনুষ্যের অনন্তকালের উপজীবিকা। স্বার্থ যে কি—তাহা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু পরমার্থ যে কি, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া না বলিলে—নানা লোকে তাহার নানা প্রকার বিপরীত অর্থ বুঝিতে পারেন। পরমার্থ কি—ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, প্রথমে পরমার্থের দিক্ নিরূপণ করা আবশ্যক। পূর্ব্ব-কথিত পংক্তি-গুলির মধ্যে যেখানে পরমার্থ প্রকাশ্য ভাবে নাই, সেখানেও পরমার্থের দিক্ আছে; অর্থাৎ যেখানে পরমার্থের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই, সেখানেও পরমার্থের দিকে গতি চলিতেছে। স্বার্থ যদিচ পরমার্থ নহে, কিন্তু প্রবৃত্তি হইতে স্বার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্; স্বার্থ হইতে গার্হস্থ্যের দিক্ পরমার্থের দিক্; গার্হস্থ্য হইতে কৌলীন্যের দিক্ পরমার্থের দিক্; কৌলীন্য হইতে সভ্যতার দিক্ পরমার্থের দিক্; সভ্যতা হইতে সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলের দিক্ পরমার্থের দিক্। জন-সাধারণের শুধু নয়—কিন্তু প্রতি জনেরই—শৈশব কাল হইতে পরমার্থের দিকে গতি চলিতে থাকে। নিতান্ত শিশুর, প্রথমে, কেবল স্তন পানের দিকেই ঝোঁক। তাহার পর সে মাতাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে; মাতাকে লইয়াই শিশুর গার্হস্থ্য—কেননা শিশুর নিকটে মাতাই গৃহের সর্ব্বস্ব ধন। তাহার পর শিশু পিতাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। শিশুর নিকটে পিতা-অপেক্ষা ক্ষমতাশীল ব্যক্তি জগতে আর কেহই নাই; কাজেই "সেই অদ্বিতীয় ক্ষমতাশীল ব্যক্তি আমার স্নেহের বশ" এই বলিয়া তাহার মনোমধ্যে অহঙ্কারের মতো একটা সামগ্রী দেখা দেয়; এ অহঙ্কার নিতান্ত শিশু-অহঙ্কার, ইহার এখনো বিষ দাঁত বাহির হয় নাই—এটি যেন মনে থাকে। মাতাকে লই-য়াই যেমন শিশুর গার্হস্থ্য, সেইরূপ পিতাকে লইয়াই শিশুর কৌলীন্য। দাম্ভিক কুলীন যেমন সমাজকে জ্বালাইয়া তোলে, আদুরে ছেলে সেইরূপ বাড়ি মাথায় করিয়া তোলে; প্রভেদ কেবল এই যে, শিশুর অহঙ্কার নির্ব্বিষ, সুতরাং একটুতে শান্ত হয়,—দাম্ভিক কুলীনের অহঙ্কার বিষাক্ত সুতরাং কিছুতেই শান্তি মানে না। আমরা দেখা-ইলাম যে, নিতান্ত শিশুর কেবল স্তনপানের দিকেই একমাত্র ঝোঁক,—ইহাই শিশু স্বার্থ; তাহার পর সে মাতাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে,—ইহাই শিশু-গার্হস্থ্য; তাহার পর পিতাকে ভালবাসিতে শেখে, ও "পিতা, যাঁহা-অপেক্ষা উচ্চ আর কেহই নাই, তাঁহার আমি স্নেহের পাত্র" এই বলিয়া অহঙ্কৃত হয়, ইহাই শিশু-কৌলীন্য;—গৃহের বালকেরা এখানে কুল, ও পিতা এখানে কুলপতি। অতঃপর বক্তব্য এই যে, শিশুর কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে সে যখন পর-গৃহের সমবয়স্কদিগের সহিত ক্রীড়া কলহ ও পাঠাভ্যাসে রত হয়, তখন অনেকের টক্‌রাটক্‌রিতে তাহার অহঙ্কারের উপশম হইয়া বুদ্ধির উদ্রেক হয়; সমবয়স্কদিগের সহিত সদ্ভাবে মিলিত হওয়াই শিশু-সভ্যতা বা শিশু-

লৌকিকতা। তাহার পর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যা কহিতে কোন কোন বালকের রসনায় বাধে; কোন কোন বালক অনর্গল মিথ্যা কহে; এইরূপ বালক-গণের মধ্যেও পারমার্থিক ধর্ম্ম-ভাবের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে বালক মিথ্যা কহে না—পিতামাতার বাধ্য—দুর্ব্বলতর বালকের সহায়, তাহার মনোমধ্যে পরমার্থের ভাব নবোন্মেষিত হইয়াছে—এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই তো গেল বালকের,—এখন যুবার কিরূপ ধর্ম্ম-সোপান—দেখা যা'ক। শিশুর যেমন স্তন পান—যুবার সেইরূপ অর্থোপার্জ্জন—উভয়ই জীবন-ধারণের জন্য; এইটি স্বার্থের পংক্তি। প্রাণকে কুশলে রাখিবার জন্য যেমন অর্থোপার্জ্জন, তেমনি মনকে ভাল রাখিবার জন্য বিবাহ; শিশুর যেমন মাতা—যুবার সেইরূপ স্ত্রী—মনের শূন্য যত-কিছু সমস্তই পূর্ণ করে;—এইটি গার্হস্থ্যের পংক্তি। তাহার পর বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা, আপনার প্রভুত্ব এবং কর্তৃত্ব সমর্থন, ও দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ-দ্বারা পুত্র কন্যাগণকে কুলোচিত রীতি নীতি ও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, জ্ঞাতি বন্ধুকে সদ্ভাব-দ্বারা বশীভূত করা, ইহাই কৌলীন্যের পংক্তি; তাহার পর দেশহিতৈষী বিজ্ঞ-মণ্ডলীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া দেশের হিতানুষ্ঠানে লিপ্ত হওয়া,—এইটি সভ্যতার পংক্তি; তাহার পর, আত্মার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হওয়া, এইটি পরমার্থের পংক্তি। এখানে এইটি দেখা আবশ্যক যে, যে যে ভাব যে যে পংক্তির অধিকারস্থিত—সেই সেই ভাব যে, সেই সেই পংক্তিতে সহসা আসিয়া আবির্ভূত হয়, তাহা নহে; তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পংক্তিতে অপেক্ষাকৃত অপরিস্ফুট ভাবে বিদ্যমান থাকে—স্বপংক্তিতে আসিয়া পরিস্ফুট ভাব ধারণ করে, এই মাত্র। আর একটি কথা এখানে বিবেচ্য; সে টি এই যে, যে পংক্তির যে-টি—সে পংক্তির সে-টি নহিলে আর-কিছুতেই আশ মিটিতে পারে না। গার্হস্থ্য-ভিন্ন আর কিছুতেই—মনের—আশ মিটিতে পারে না; কিন্তু অহংকারের আশ মিটাইতে হইলে গৃহ তাহার স্থান নহে,—স্ত্রীপুত্রের উপর কর্তৃত্ব করিয়া অহঙ্কারের পেট ভরিতে পারে না,—জ্ঞাতি বন্ধুকে সদ্‌গুণ-পাশে বদ্ধ করিতে পারিলেই অহঙ্কার রীতিমত পরিতৃপ্ত হয়; তেমনি আবার, পল্লীগ্রাম-সুলভ দলাদলি-ব্যাপারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সমস্ত ঝোঁক সমর্পণ করিলে, বুদ্ধির নিতান্ত অপব্যয় করা হয়,—অথচ তাহাতে বুদ্ধির পেট ভরে না; দেশের হিতসাধন কার্য্যে বুদ্ধির যেমন উদর-পূর্ত্তি হয়, এমন আর কিছু-তেই নহে। এখানে আরও-একটি কথা বিবেচ্য; সেটি এই যে, উচ্চ পংক্তির অধিকার নিম্ন-পংক্তিতেও বলবৎ;—লোকার্থ (অর্থাৎ দেশের মঙ্গল) বুদ্ধির স্বপংক্তি-সুলভ লক্ষ্য, কিন্তু বুদ্ধির অধিকার শুদ্ধ কেবল তাহার স্বপংক্তিতেই বদ্ধ নহে—কৌলীন্য এবং গার্হস্থ্য পংক্তি ভেদ করিয়া তাহা স্বার্থ-পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহার ঠিক্ বিপরীত এই দেখা যায় যে, উচ্চ পংক্তিতে নিম্ন পংক্তির জোর খাটে না; বুদ্ধির পংক্তিতে অহঙ্কারের তেজ নরম পড়িয়া যায়; অহঙ্কারের পংক্তিতে স্নেহ-মমতার কোমল কলিকা

মুসড়িয়া যায়; গার্হস্থ্য-পংক্তিতে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য চাপা পড়িয়া যায়। পঞ্চম পংক্তির আদর্শ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; পরমাত্মা ভিন্ন আরকোন কিছুতেই আত্মার আশ মিটিতে পারে না; এটি কেবল এখানে উল্লেখ মাত্র করিলাম, পরিশেষে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিব। ফরাসীস্ দেশীয় কম্‌ট্‌—স্ত্রী কন্যা ও মাতা দ্বারা আত্মার আশ মিটাইতে বৃথা আয়াস পাইয়াছেন! গার্হস্থ্যের দৌড় মন পর্য্যন্ত; –আত্মার সাগর-স্পৃহা শান্ত করা সে-এক-ফোঁটা শিশিরের কর্ম্ম নহে! স্ত্রীলোক এবং প্রাকৃত লোকদিগের আত্মার তৃপ্তির জন্য,কম্‌ট্‌, গার্হস্থ্যকেই আদর্শরূপে বরণ করিয়াছেন,—কিন্তু পণ্ডিত লোকেরা তা-হাতে ভুলিবার পাত্র ন'ন,--ইহাঁদের আত্মার তৃপ্তির জন্য তিনি 'মনুষ্যত্ব' বলিয়া একটি দেব-মূর্ত্তি সাজাইয়া তুলিয়াছেন; আর,সভ্যতার মূল প্রবর্ত্তক পিতৃপুরুষদিগকে জড়ো করিয়া তাঁহাদের নামের মন্ত্র-বলে সেই মূর্ত্তিটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ চেষ্টাও বৃথা চেষ্টা; কেননা সভ্যতার দৌড় বুদ্ধি পর্য্যন্ত—তাহার উপরে নহে; সভ্যতা কিছু আর পরমার্থ নহে—যে, আত্মার পিপাসা শান্তি করিবে! লোকে কথায় বলে "দুধের সাধ ঘোলে মেটে না"——এ কথাটি দিব্য এখানে ফলিয়াছে; যে পংক্তির যেটি নহিলে নয়—সে পংক্তিতে তাহার বদলে আর-একটা কিছু আনিয়া দাঁড় করানো নিতান্তই বাল্য-ক্রীড়া। আমরা ওরূপ 'গায়ের জোর' প্রকটনে ক্ষান্ত হইয়া—স্বভাবতঃ যে পংক্তির পর যে পংক্তি আইসে, ও সত্য-সত্যই যাহাতে যে-পংক্তির অভাব-পূরণ হয়, তাহাই যথা-ক্রমে প্রদর্শন করিলাম। এইরূপ, কি পৃথিবীর নানা দেশ-বিদেশ, কি ব্যক্তি-বিশেষের জীবন, যেখা-নেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন—সেইখানেই দেখিতে পাই যে, স্বার্থ হইতে পর-মার্থের দিকে গতিই—দৈহিক মঙ্গল হইতে আধ্যাত্মিক মঙ্গলের দিকে গতিই—জড়ত্ব হইতে মনুষ্যত্বের দিকে গতিই—প্রকৃতির অন্তরতম উদ্দেশ্য; আর, প্রকৃতিকে যদি অন্ধভাবে না দেখিয়া চক্ষুষ্মান্ ভাবে দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত; আবার, আত্মাতে যদি পরমাত্মার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাই ঈশ্বরের আদেশ।

পরমার্থের দিক্ নিরূপিত হইল; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমার্থ বস্তুটা কি?

জগতে যদিও নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে, কিন্তু সকলেরই গতি যে, মঙ্গলের দিকে, ইহা সহজ বুদ্ধিতে সকলেরই ধারণা হয়; কিন্তু ইহার উপর তর্ক চালাইলে বিধিমত প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন তাহার মীমাংসা হইতে পারে না; কিন্তু সে-সকল প্রমাণ কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া অনুসন্ধান করে, কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া আদ্যোপান্ত লিপিবদ্ধ করে, কেবা ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ বা অধ্যয়ন করে! সরল-বুদ্ধি বা সহজ-বুদ্ধি বিনা প্রমাণেই শ্রেয়ঃ হৃদয়ঙ্গম করে; কুটিল-বুদ্ধি বা বিকৃত বুদ্ধি বিনা প্রমাণেই তাহা অগ্রাহ্য করে; প্রমাণ যিনি—তিনি সপক্ষ এবং বিপক্ষ দুই পক্ষেরই নিকট তাড়া খাইয়া নতশিরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও চারিদিকের জানালা কপাট বন্ধ করিয়া

দে'ন। মনে কর অপরাহ্নের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে দুইটা তালগাছের দুইটা ভূতল-শায়ী ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিয়া এইরূপ দেখা গেল যে, ছায়া-দ্বয়ের দৈর্ঘ্য অবিকল সমান; যিনিই ঐরূপে ঐদুটা ছায়া মাপিয়া দেখিবেন তিনিই বলিবেন যে, ও-দুই বৃক্ষের আয়তন অবিকল সমান—কেহই তাহার প্রমাণ চাহিবেন না; কিন্তু যদি কেহ তাহার প্রমাণ চাহেন, তবে তাঁহাকে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করা কি ভয়ানক কষ্টকর ব্যাপার! তিনি হয় তো জ্যামিতির নামও শুনেন নাই, অথচ তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত জ্যামিতির সমস্ত সিদ্ধান্ত-গুলির মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে হইবে; তাহার দুই পংক্তি শুনিয়াই তিনি হয় তো মর্ম্মে জ্বলিয়া বলিবেন "থা'ক্—যথেষ্ট হইয়াছে—আমি এখন বিদায় হই!" সহজ বিষয়ের প্রমাণ এইরূপ ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। যাহা প্রমাণ করা কঠিন, তাহাই যে অপ্রামাণ্য—এ কথার কোন অর্থ নাই। জগতে নানা প্রকার অমঙ্গল রহিয়াছে—এইটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই তার্কিকেরা মনে করেন যে, ঈশ্বর যে—মঙ্গল স্বরূপ নহেন—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখানো হইল; কিন্তু জগতে যদি সহস্র অমঙ্গল থাকে, তাহা হইলেও এটি অপ্রমাণ হয় না যে, সকল অমঙ্গলেরই গতি মঙ্গলের দিকে। সকল অমঙ্গলেরই গতি মঙ্গলের দিকে—ইহাই ঈশ্বরের অসীম শক্তি এবং মঙ্গল-ভাবের পরিচয় দিতেছে। জগৎ কিছু-আর পূর্ণ মঙ্গল নহে—স্বয়ং ঈশ্বর নহে—সুতরাং জগতে ন্যূনাধিক পরিমাণে অমঙ্গল থাকিবারই কথা; কিন্তু জগতের মূলে ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তি এবং মঙ্গল ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে বলিয়াই, যাবতীয় অমঙ্গল উত্তরোত্তর-ক্রমে মঙ্গল হইতে মঙ্গলে পরিণত হইতেছে। নিরীশ্বর মহলে এই কথাটি অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় যে, ঈশ্বর যদি সর্ব্ব-শক্তিমান্—তবে কেন তিনি জগৎকে পূর্ণ মঙ্গল করিয়া সৃষ্ট না করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ কতকগুলি কার্য্য আছে—যাহা পাগলে স্বচ্ছন্দে করিতে পারে,—বিজ্ঞলোক কোন মতেই করিতে পারে না;—কিন্তু বিজ্ঞ-লোক পাগলের কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া—আমরা কি তাঁহাকে ক্ষমতাহীন বলিব? গোল-চতুষ্কোণ—দুই পূর্ণ মঙ্গল—দুই মহাকাশ—সমস্তই উন্মাদের কল্পনা; চতুষ্কোণ বলিবা-মাত্রই অ-গোল চতুষ্কোণ বুঝায়—জগৎ বলিবামাত্রই অপূর্ণ জগৎ বুঝায়;—ঈশ্বরের আবির্ভাব অল্পে অল্পে জগতে পরিস্ফুট হইতেছে,—কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীন ভাব জগতে থাকিতে পারে না,—তাই জগৎ অপূর্ণ; গোল-চতুষ্কোণ যেমন অসঙ্গত—দুই মহাকাশ যেমন অসঙ্গত—দুই ঈশ্বর যেমন অসঙ্গত—দুই পূর্ণ-মঙ্গল সেইরূপ অসঙ্গত। গোল-চতুষ্কোণ হইতে পারে—এরূপ মনে করাই উন্মাদের লক্ষণ,—তাহাতে বুদ্ধির শক্তিহীনতাই প্রকাশ পায়—ক্ষমতার পরিবর্ত্তে অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। গোল-চতুষ্কোণ সৃষ্টি করা তো অনেক দূরের কথা—গোল-চতুষ্কোণের সম্ভাব্যতা বিশ্বাস করা পর্য্যন্ত অশক্তির লক্ষণ—নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। গোল চতুষ্কোণ—দ্বিতীয় পূর্ণ মঙ্গল—পাগলের জ্ঞানেই স্থান পাইতে পারে,—ঈশ্বরের

সুমহৎ জ্ঞানে তাহা কিরূপে স্থান পাইবে? ঈশ্বরের জ্ঞানে, যাহা, স্থান পাইবার অযোগ্য—তাঁহার সৃষ্টিতে তাহা কিরূপে স্থান পাইবে? বাহিরে যেমন দুই মহাকাশ অসম্ভব, অন্তরে যেমন দুই জীবাত্মা অসম্ভব, জগতে সেইরূপ দুই পরমাত্মা অসম্ভব; পরমাত্মা স্বয়ংই পূর্ণ'মঙ্গল, দ্বিতীয় পূর্ণ মঙ্গল অসম্ভব। গোল-চতুষ্কোণ জানা বুদ্ধি-বিপর্য্যয়েরই লক্ষণ,—যাহা বাস্তবিক সত্য তাহা জানা (যেমন জ্যোতিষ জানা)—ইহাই জ্ঞানের লক্ষণ। সেইরূপ, যাহা জ্ঞান সঙ্গত নহে—তাহা করিতে না পারা অশক্তির লক্ষণ নহে; উল্টা আরো, তাহা করিতে পারা যায়—এরূপ মনে করাই অশক্তির লক্ষণ। ঈশ্বর সর্ব্বগত হইয়া সমস্তই জানিতেছেন; কিন্তু গোল-চতুষ্কোণ—দুই পূর্ণ মঙ্গল—এ সমস্ত অলীক কথা, যাহা আমাদেরই জ্ঞানের অযোগ্য, তাহা তাঁহার পরিশুদ্ধ জ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না;—যাহা তাঁহার জ্ঞানে স্থান পাইবার অযোগ্য, তাহা তাঁহার সৃষ্টিতে কিরূপে আসিবে? জগতে যখন পূর্ণ মঙ্গল নাই—তখন জগতে অমঙ্গল অবশ্যই আছে; কিন্তু ঈশ্বরের অপরিসীম শক্তির প্রভাবে জগৎ মঙ্গলের দিকে আকৃষ্ট রহিয়াছে—জগৎ মঙ্গলের জন্য নানা-বিধ বেদনা অনুভব করিতেছে—নানা-বিধ শক্তি প্রকটন করিতেছে;—সকল শক্তির মূলে ঈশ্বরের মহতী শক্তি বিদ্যমান—এই অর্থে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; ও ঈশ্বরের মহতী-শক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন ঘটনাতেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না—এই অর্থে ঈশ্বরের শক্তি অসীম শক্তি। অতএব, "ঈশ্বর গোল-চতুষ্কোণ সৃষ্টি করিতে পারেন না" বলিলে নহে—কিন্তু "পারেন" বলিলেই তাঁহার জ্ঞান এবং শক্তিতে কলঙ্ক আরোপ করা হয়। পরমার্থ কি—ইহা যিনি সত্যসত্যই প্রমাণ দ্বারা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, তিনি শেষ-পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া যত্ন-পূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করেন—একটুতেই অধৈর্য্য না হ'ন। আপনি অনুসন্ধান করা স্বতন্ত্র, আর, তর্ক দ্বারা অন্যের মত খণ্ডন করা স্বতন্ত্র; তর্কের ভিতর নানা প্রকার কুতর্ক প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু সযত্ন অনুসন্ধানের মধ্যে কুতর্ক প্রবেশ করিতে পথ পায় না। অনুসন্ধান নিষ্ফল হইতে পারে,—তাহা হইলে সত্য জানা গেল না—এই পর্য্যন্ত; কিন্তু কুতর্ক যেমন সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যা দাঁড় করায়—অনুসন্ধান সে পাপে লিপ্ত হয় না। কোন একটা স্বাভিপ্রেত বিষয়—যাহা আমরা নিজে বুঝি না, তাহা যখন আমরা অন্যকে বুঝাইতে যাই, তখন আমরা কুতর্ক দ্বারা তাহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করি; কিন্তু আমরা যখন প্রাণপণ যত্নে কোন-একটা বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে যাই, তখন আমরা পারৎপক্ষে আপনার চক্ষে সেরূপ ধূলি নিক্ষেপ করি না। পরন্তু যেখানে সত্য অনুসন্ধান নহে—কেবল জয়-পরাজয়ই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে আমরা আপনার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিব—তাহাও স্বীকার, তথাপি—কোটি বজায় রাখিতেই হইবে—তাহা প্রাণান্তেও ছাড়া হইবে না—এইটি আমাদের সংকল্প। অতএব পরমার্থ কি—ইহা যাঁহারা সত্যসত্যই জ্ঞানে

আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যত্ন-পূর্ব্বক তাহার তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হউন্; অন্য কাহাকেও তাহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বুঝাইতে না গিয়া, অগ্রে যত্ন-পূর্ব্বক আপনি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করুন্। পরমার্থ-সম্বন্ধে তাঁহার মনো-মধ্যে যদি কোন প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে—"পরমার্থ আছে অথবা পরমার্থ নাই" এইরূপ যদি কোন প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে, তবে তিনি আপনি সেই প্রশ্নের ভিতর তলাইয়া দেখুন্,—তাঁহার যত্ন নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। তাঁহার প্রশ্নের গভীর অভ্যন্তরে তিনি যে এক মুহূর্ত্তেই তলাইতে পারিবেন—এরূপ প্রত্যাশা করাই অন্যায়; ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহাকে অল্প অল্প করিয়া তলাইতে হইবে,—ক্রমে তিনি দেখিবেন যে, সেই প্রশ্নের গভীর অন্তস্তলে তাহার উত্তর ঝক্‌মক্ করিতেছে; দেখিবেন যে, সে উত্তর মনুষ্য-জ্ঞানের নিতান্ত অগম্য নহে। এখন, পরমার্থ কি, এই প্রশ্ন-টির ভিতর কি জ্যোতির্ম্ময় রত্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

পরমার্থ কি? অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনের পরম অর্থ কি? এ প্রশ্নের ভিতর আর একটি প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; সে-টি এই যে, মনুষ্য-জীবনের পরম অভাব কি? ক্ষুধা-রূপী অভাব যদি আমাদের না থাকিত, তবে ধান্য আমাদের অর্থের মধ্যে পরিগণিত হইত না। ক্ষুধা আছে বলিয়াই ধান্যের অন্বেষণ; পরম অভাব আছে বলিয়াই পরম অর্থের অন্বেষণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাদের বিশেষ একজাতীয় অভাব; কিন্তু তাহা ছাড়া আরো অসংখ্য-জাতীয় অভাব আমাদের আছে; কারাগারস্থিত ব্যক্তির ক্ষুধা-তৃষ্ণার জন্য কোন ভাবনা নাই, কিন্তু তাহার সমস্ত হৃদয়ই অভাবে পরিপূর্ণ। আমাদের বিশেষ-বিশেষ নানা-জাতীয় অভাবের মধ্যে সর্ব্বসাধারণ অভাব কি? পরম অভাব কি? আমরা পরিমিত—এইটিই আমাদের পরম অভাব। বিশেষ বিশেষ অভাবের বিশেষ বিশেষ আধার আছে এবং বিশেষ বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বিষয় আছে;—অন্ধকার-রূপী অভাবের আধার চক্ষুরিন্দ্রিয়; যে জীবের মূলেই চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই, সে জীব আলো-কের অভাব (কি না অন্ধকার) উপলব্ধি করে না; অন্ধকার-রূপী অভাবের আধার চক্ষু-রিন্দ্রিয়, এবং তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয়—আলোক। নিস্তব্ধতা-রূপী অভাবের আধার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয়—শব্দ। এখানে দেখিতে হইবে যে, চক্ষু কেবল অন্ধকার-রূপী একটি-মাত্র অভাবের আধার; কর্ণ কেবল নিস্তব্ধতা-রূপী একটি মাত্র অভাবের আধার; উভয়ের কেহই সাধারণতঃ সকল অভাবের আধার নহে; কিন্তু "আমরা পরিমিত" ইহা আমাদের সকল অভাবের মূলস্থিত একমাত্র সাধারণ অভাব—এই সাধারণ অভাব-টির আধার কে? আত্মাই, চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রি-য়ের সাধারণ মধ্যস্থল; ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আত্মাই ঐ সাধারণ অভাবটির আধার; আত্মাই অপূর্ণতা-রূপী অভাবের আধার। আত্মার এই যে, পরম অভাব, ইহার অর্থ (কি না আকাঙ্ক্ষার বিষয়) কাজেই পরম অর্থ—এক কথায়—পরমার্থ। সে

পরমার্থ কি? চাক্ষুষ অভাব যে, অন্ধকার, তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় অন্ধকারের অবিকল বিপরীত; কি? না আলোক; তেমনি আত্মার অভাব যে, অপূর্ণতা, তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় অপূর্ণতার অবিকল বিপরীত—কি? না পূর্ণ মঙ্গল। অতএব, পূর্ণ মঙ্গলই আত্মার পরম অর্থ—এক কথায়—পরমার্থ। এখন, চক্ষু অন্ধকার-রূপী অভাবের আধার, আত্মা অপূর্ণতা-রূপী অভাবের আধার, এ যেন হইল; কিন্তু আলোকের আধার কে? পূর্ণ মঙ্গলের আধার কে? আলোকের আধার—সূর্য্য; পূর্ণ মঙ্গলের আধার—পরমাত্মা।

পরমার্থের দিক্ যে কি, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি; প্রবৃত্তি হইতে স্বার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্, স্বার্থ হইতে লোকার্থের দিক্ পরমার্থের দিক্, লোকার্থ হইতে নিরপেক্ষ মঙ্গলের দিক্ পরমার্থের দিক্; এখন পাইতেছি যে, পূর্ণ মঙ্গলই পরমার্থ এবং তাহার আধার—পরমাত্মা। প্রকৃতির অভ্যন্তরে কোথাও সাক্ষাৎ পরমার্থ নাই—পূর্ণ মঙ্গল নাই; কিন্তু প্রকৃতির সর্ব্ব স্থানেই পরমার্থের দিকে—পূর্ণ মঙ্গলের দিকে—গতি নিরন্তর চলিতেছে; তাই, অসভ্যতার মধ্য হইতে সভ্যতা, অধর্ম্মের মধ্য হইতে ধর্ম্ম, অজ্ঞানের মধ্য হইতে জ্ঞান, ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতেছে। কোথায় কোন্ এক অলক্ষিত ভাণ্ডার রহিয়াছে (আছে এই খানেই—আমরা মনে করিতেছি কতই না জানি দূরে) সেই পরমাশ্চর্য্য অলৌকিক ভাণ্ডার হইতে মনুষ্যের আত্মার অভাব নিত্য নিত্য পরিপূরিত হইয়া আসিতেছে; সে ভাণ্ডার পূর্ণ ভাণ্ডার—সে ভাণ্ডার অক্ষয় ভাণ্ডার; তাহার নাম পূর্ণ মঙ্গল এবং তাহার অধ্যক্ষ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা। পরমাত্মার এই পূর্ণ মঙ্গল—যাহা সমস্ত প্রকৃতির মূলে কার্য্য করিয়া সকলকেই নিম্ন পংক্তি হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পংক্তিতে উঠাইয়া দিতেছে—এই পূর্ণ মঙ্গলের সহিত আমরা যদি আমাদের ইচ্ছাকে একতানে মিলিত করি, তাহা হইলে—যদি সমস্ত জগতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তবেই আমাদের ইচ্ছা ব্যর্থ হইবে, কিন্তু বরং সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইতে পারে, নিখিল আকাশ রসাতলে নিমগ্ন হইতে পারে, তথাপি পূর্ণ মঙ্গলের একটি রেণু-কণাও বিচলিত হইতে পারে না, যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অন্তঃসারের দূরতম প্রভাবও ব্যর্থ হইতে পারে না।

সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এপর্য্যন্ত যত কিছু বলা হইল, সমস্তই কাঁটা খোঁচা বাদ দিয়া বলা হইল। কিন্তু উপসংহার-স্থলে কাঁটা খোঁচা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেক কাল প্রসব বেদনা ভোগ করিয়া, স্বার্থ—গার্হস্থ্য প্রসব করে, গার্হস্থ্য—কৌলীন্য প্রসব করে, কৌলীন্য—সভ্যতা প্রসব করে, সভ্যতা—পরমার্থ প্রসব করে। এই-সব প্রসব-বেদনা বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম-সোপানের প্রত্যেক পংক্তিতে হাঁ এবং না এই দুইটি দিক্ আছে; তাহার মধ্যে না'য়ের দিকে লোকের বেশী ঝোঁক পড়িলেই লোকসমাজে বিপ্লব ও মাতামাতি উপস্থিত হয়। গত শতাব্দীর ফরাসিস্ রাজ্য-

বিপ্লব ইহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। গত শতাব্দীতে, ইউরোপে, সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ-পংক্তিতে উত্থান করিবার একটা অব্যবস্থিত উদ্যম—আঁকুবাঁকু—চারিদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থায়, সভ্যতা-পংক্তি ছাড়িয়া দেওয়া না'য়ের দিক্ (প্রসিদ্ধ ফরাসিস্ গ্রন্থকার রোসো ইহার পথ-প্রদর্শক), ও পরমার্থ-পংক্তি অবলম্বন করা হাঁ'য়ের দিক্। যাঁহাদের মনোমধ্যে হাঁ'য়ের দিক্ আদর্শ পদবীতে উত্থান করিয়াছিল, সে-সকল জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অতীব অল্প হইবারই কথা। জ্ঞানী-লোকদিগের জ্ঞানাধিষ্ঠিত আদর্শ সাধারণ লোকেরা কেমন করিয়াই বা বুঝিতে পারিবে—কাজেই সাধারণ লোকের মনে না'য়ের দিক্‌টাই বিপরীত প্রবল হইয়া উঠিল। সভ্যতা ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে—এইটিই তাহাদের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল; ও পরমার্থ-পংক্তিতে আরোহণ করিতে হইবে—এ ভাবটি সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া গেল। ইহার ফল কি হইল? জন-সাধারণের উপদ্রবে সভ্যতা তো ছারখার হইয়া গেল—এখন উপায় কি? পরমার্থের আকর্ষণ এখনো এত প্রবল হয় নাই যে, তাহা জন-সাধারণকে উপরে টানিয়া তুলিবে; কাজেই স্বার্থের আকর্ষণ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জন-সমাজকে নীচে টানিতে বিলক্ষণ সুযোগ পাইল। স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃভাব, এই শব্দগুলি শুনিতে কেমন সুমধুর,—সাক্ষাৎ পরমার্থ! কিন্তু ফরাসীস্ বিপ্লবের অভিধান খুলিয়া দেখ দেখিবে—কি ভয়ানক! স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচার, সমতার অর্থ নীচতা, ভ্রাতৃভাবের অর্থ ভ্রাতৃবধ! বর্ত্তমান শতাব্দী সভ্যতা পংক্তি হইতে পরমার্থ পংক্তিতে উত্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু না'য়ের দিক্‌কে—মায়াবিনী না'য়ের দিক্‌কে—সাবধান! আমরা সভ্যতা লৌকিকতা এবং সামাজিকতা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত;—অনেকেই আমরা মনে মনে ঠাহরাইয়াছি যে, আমরা পারমার্থিক লোক—লৌকিকতা বা সামাজিকতা আমাদের জন্য নহে; লোককে (অর্থাৎ অক্ষম লোককে—ক্ষমতাশালী লোকের কথা স্বতন্ত্র!) আমরা ডরাই না,—লোক যেন শুধু-কেবল ডরাইবারই সামগ্রী—ভাল বাসিবার সামগ্রী নহে! মনে কর যেন আমরা আমাদের দেশারাধ্য যতকিছু আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সভ্যতা সমস্তই ছারখার করিয়া ফেলিলাম—তাহার পর আমাদের দশা কি হইবে? বর্ত্তমান কালে পরমার্থের আকর্ষণ কি এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, তাহা আমাদিগকে সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ-পংক্তিতে এক নিমেষে টানিয়া তুলিবে? কখনই না—হইবে যাহা তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; আমাদের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত সভ্যতাকে, স্বার্থ, এক আছাড়ে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবে—এই মাত্র। ইউরোপে এখন সভ্যতার না-অঞ্চলে, Nihilism (অর্থাৎ নাকিঞ্চিৎক্য), নূতন দেখা দিয়াছে; সে যে কি কাণ্ড করে—তাহা এখন ভবিষ্যৎ-গর্ব্ভে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের উচিত যে, আমরা দেশকালপাত্রোচিত সামাজিকতা

লৌকিকতা এবং সভ্যতা যতদূর পারি অব্যাহত রাখিয়া অল্পে অল্পে পরমার্থের দিকে পদ-নিক্ষেপ করি ;—পূর্ব্বতন সভ্য রীতি-নীতি সমস্তই পরিত্যাগ না করিয়া—শুদ্ধ কেবল তাহার অসার অংশ-গুলিই পরিত্যাগ করি ও তাহার সমস্ত সারাংশ নিষ্কর্ষণ করিয়া তাহার উপরেই পরমার্থের মূল-পত্তন আরম্ভ করি,—তাহা হইলেই আমাদের ইতিহাস পড়া সার্থক হইবে, ও আমাদের অভীষ্ট কার্য্য রীতিমত অগ্রসর হইবে। আর-একটি কথা এই যে, কৌলীন্যের কাল এখন গিয়াছে—এখনকার কাল সভ্যতার কাল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন এক এক জন অসাধারণ ব্যক্তি উত্থিত হইয়া আর-আর ব্যক্তিকে অনেক দূর পশ্চাতে ফেলিয়া দিতেন, এখনকার কালে সেরূপ প্রাধান্য লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। এখনকার কাল পৌরুষ-প্রকাশের কাল নহে, কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের কাল; যাহাতে বিশিষ্টরূপে কার্য্যোদ্ধার হয়—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করাই এখনকার কালে শোভা পায়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো কৌলীন্যের এমনি প্রাদুর্ভাব ও সভ্যতার এমনি হীনাবস্থা যে, কোন একটি কার্য্য-সাধনের অভি-প্রায়ে দশ জন একত্র হইলেই কার্য্যোদ্ধারের দিকে কাহারো লক্ষ্য থাকে না—আপনার আপনার প্রাধান্যের দিকে সকলেরই লক্ষ্য সন্নিবিষ্ট হয়। ইউরোপীয় কার্য্য-ক্ষেত্রে, অগ্রে কার্য্যোদ্ধার—তাহার পরে আর যাহা কিছু, এই-যে-একটি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান পরিচায়ক। ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে আমরা আর-কিছু শিখি বা না শিখি—এই পরস্পরাধীনতার ভাবটি শিক্ষা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে। আমার আপনার দ্বারাই বা কি কার্য্য ও কতটা কার্য্য হইতে পারে, এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগেরই বা কাহার দ্বারা কি কার্য্য ও কতটা কার্য্য হইতে পারে, এইটি নিরপেক্ষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়া আপনি আপনার উপযুক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অন্যকে তাহার আপনার উপযুক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া—তাহার সে কার্য্যে কোন প্রকার বাধা নিক্ষেপ না করা, এইটি হইলেই, সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার পথ—এক কথায় সভ্যতার সোপান—আমাদের দেশে উন্মুক্ত হইয়া যায়। এরূপ হইলে, সভ্যতা-পংক্তি হইতে পরমার্থ পংক্তিতে উত্থান করিবার পথ এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।*

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক মধ্য বাঙ্গলা সম্মিলনী সভায় পঠিত হয়।

ভ্রম সংশোধন।

৫০২ পৃষ্ঠায় ১০ম পংক্তিতে যেখানে রহিয়াছে “যিনি জ্ঞাতিদিগকে বশ করিতে পারেন তিনিই বশিষ্ঠ” তাহার পরিবর্ত্তে “বাক্যই বশিষ্ঠ (অর্থাৎ লোককে বশ করিতে পারে—তাই বশিষ্ঠ); বাক্যকে যিনি বশিষ্ঠ জানেন তিনি জ্ঞাতৃবর্গের মধ্যে বশিষ্ঠ হ’ন (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে বশ করেন)” এইরূপ পঠিত হইবে।

বোম্বাই সহর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(ইতিহাস-অনুক্রম)

শিবাজীর প্রতিভা গুণে এই যে মহারাষ্ট্রী রাজ্য পতন হইল, তাহা অনতিকাল মধ্যেই সমুদায় ভারতে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু বলিতে কি, শিবাজীর বংশজ রাজগণের মধ্যে কেহই তাঁহার মত বীর ও যশস্বী হয় নাই। তাঁহার পুত্র শম্ভোজী নিকৃষ্ট আমোদা-

শম্ভোজী

সক্ত নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন। সঙ্গমেশ্বরে আমোদ প্রমোদে মত্ত আছেন, এমন সময় জনৈক মোগল সরদার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজীবের নিকট ধরিয়া আনে, শম্ভোজীর প্রাণ রক্ষার্থে বাদসাহকে অনেক অনুরোধ করাতে সম্রাট বলিয়া পাঠাইলেন "তোর জীবন মরণ আমারি হাতে তা তুই জানিস্। যদি মুসলমান হতে রাজী হোস্, তা হলেই তোর প্রাণ রক্ষা, নতুবা জল্লাদের হাতে তোর মৃত্যু।" শম্ভোজী উত্তর দিলেন "বাদসা যদি আপন কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী হন, তা হলে আমি মুসলমান হই।" এই উত্তরে ঔরঙ্গজীব ক্রোধান্ধ হইয়া শম্ভোজীর প্রাণদণ্ড আদেশ করিলেন।

সাহু ১৭০৭

শম্ভোজীর পুত্র সাহু শৈশবকালে ঔরঙ্গজীবের হস্তে পতিত হইয়া অনেক বৎসর কারাবাসে কালাতিপাত করেন, ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন কিন্তু মোগলদের মধ্যে সুদীর্ঘ কারাবাস প্রযুক্ত তাঁহাতে আর কোন পদার্থ ছিল না। রাজদণ্ড ধারণ সামর্থ্যাভাবে ক্রমে রাজ্যভার সচিব প্রধান পেশওয়ার হস্তে সংন্যস্ত হইল। প্রথম

প্রথম পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৪

পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ। ১৭১৪এ বালাজী প্রধান মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে নৃপতিকে অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। পেশওয়া পদ তাঁহার বংশানুগামী হইল। সাহু কেবল নামে ছত্র পতি—তাঁহার রাজ্যাধিকার গেল—স্বাধীনতা পর্য্যন্ত অপহৃত হইল। শেষে এমন হইল সাতারার রাজা সাতারায় বন্দী—পেশওয়াই সর্ব্বময় কর্ত্তা। নূতন পেশওয়ার অভিষেক কালে অভিষেক বসন মহারাজের নিকট হইতে আনান হইত এই যা রাজ মর্য্যাদার অবশিষ্ট রহিল। ১৭১৮ এ বালাজী পেশওয়া সইয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পোষকতায় সসৈন্য দিল্লী যাত্রা করেন। তার বৎসর দুই পরে দাক্ষিণাত্য রাজস্বের চৌথ আদায়ের বাদসাহী পরওয়ানা লাভ করেন। তাঁহার প্রযত্নে পুণা ও সাতারার অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে মহারাষ্ট্র রাজপতাকা বিধিমত বদ্ধমূল হইল।

বালাজীর পুত্র বাজিরাও দ্বিতীয় পেশওয়া। ইনি একজন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন তেজীয়ান্ পুরুষ ছিলেন। যোগ্য পিতার যোগ্যতর সন্তান। মহারাষ্ট্রী আধিপত্য উত্তর হিন্দুস্থানে সংস্থাপিত করা বাজীরায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মোগল রাজ্যের ভগ্ন জীর্ণদশা তিনি বিশিষ্টরূপ অবগত ছিলেন। তিনি কথায় কথায় সাহু রাজাকে বলেন "এই আমাদের সময়। ভারত ভূমি হইতে বিদেশীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জনের এই অবসর। শুষ্ক তরুমূলে কুঠারাঘাত কর শাখা সকল আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে।" তাঁহার উৎসাহ বাক্যে সাহুর চিত্ত পিতামহোচিত জ্বলন্ত উৎসাহে ক্ষণকালের নিমিত্তে উত্তেজিত হইল। তিনি উত্তর করিলেন "তুমি পিতার যোগ্য পুত্র তুমিই স্বহস্তে মহারাষ্ট্র জয়ধ্বজা হিমালয় বক্ষে নিখাত করিবে।" বাজিরায়ের বলবীর্য্যে মহারাষ্ট্রী রাজ্য বিপুল বিস্তার লাভ করিল, ১৫ বৎসরের মধ্যে তিনি বাদসাহী মুলুক হইতে মালব ছিনিয়া লন ও বিন্ধ্যাচলের উত্তর পশ্চিম নর্ম্মদা হইতে চম্বল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ১৭৩৯ এ পোর্ত্তুগীস নিকট হইতে বাসীন অধিকার করেন। এই সকল দেখিয়া মহারাষ্ট্রী রাজের উপর ইংরাজদের কটাক্ষ পড়ে। বাসীন বিজয়ানন্তর ইংরাজেরা সাহু রাজার নিকটে দূত প্রেরণ করেন। দূতের প্রতি উপদেশ এই :—

দ্বিতীয় পেশওয়া বাজিরাও ১৭২১—৪০

"রাজ সভায় বাজিরায়ের শত্রু আছে কি না সন্ধান নিবে। পোর্ত্তুগীস মুলুক জয়ে দিন দিন তাঁহার বলবৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তি সিদ্ধ। তাঁহার বিরুদ্ধে লোকের ঈর্ষা জ্বালাইয়া দিবার সুযোগ পাইলে অমন সুবিধা যেন ছাড়া না হয়, কিন্তু সাবধান তিনি যেন আমাদের শত্রু হইয়া না দাঁড়ান তাহা হইলে আমাদের সমূহ ক্ষতি,"

১৭৩৯এ পেশওয়ার সহিত সন্ধিবন্ধনে মহারাষ্ট্রে ইংরাজ বাণিজ্য প্রমুক্ত হইল। এই সন্ধির এক বৎসর পরে বাজিরায়ের মৃত্যু।

বাজিরাও রূপবান্ বীর্য্যবান্ অমায়িক সরলান্তঃকরণ ছিলেন। যুদ্ধযাত্রা কালে তিনি বীরোচিত কঠোর ব্রত পালন পূর্ব্বক আড়ম্বর শূন্য সহজ ভাবে চলিতেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা গল্প আছে—তাঁহার সহিত নিজাম-উল্-মুল্কের প্রথম যুদ্ধারম্ভে নিজাম একজন সুবিখ্যাত চিত্রকরকে ডাকাইয়া আদেশ করেন "বাজিরাওকে গিয়াই যে ভাবে দেখিবে সেই ভাবে তাঁহার ছবি তুলিয়া আনিবে।" চিত্রকর দেখিলেন বাজিরাও বল্লম স্কন্ধে দুই হাতে জোয়ারীর দানা ভাঙ্গিয়া চিবাইতে চিবাইতে অশ্বপৃষ্ঠে সামান্য সেনার মত চলিয়াছেন—এই ভাবে তাঁহার চিত্র চিত্রিত হয়।

বাজিরায়ের তিন পুত্র—তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বালাজী তাহার উত্তরাধিকারী, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ রাও (রাঘোবা) মহারাষ্ট্রে যে অপূর্ব্ব নাট্যাভিনয় করিয়া গিয়াছেন তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে এই রাঘোবা ইংরাজ মহলে

বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ইংরাজদের ডাকিয়া ইনিই রাজ্যনাশের সূত্রপাত করেন—ইহাঁর পুত্র দ্বিতীয় বাজিরাও পিতার কার্য্য শেষ করিয়া রাজ্যের সমাধি স্বহস্তে প্রস্তুত করেন।

তৃতীয় পেশওয়া বালাজী বাজিরাও (নানা সাহেব) ১৭৪০—৬৯ } বালাজীর অপর নাম নানা সাহেব। নানার রাজত্ব কালে মহারাষ্ট্রবল মোগল রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃৎকম্প উৎপাদন করে। ১৭৪১-৪২এ নাগপুর শাখীর সেনাপতি ভোঁসলা বাঙ্গলায় মুরসিদাবাদ পর্য্যন্ত লুঠপাঠ করিয়া ফিরিয়া আসেন। আমাদের শিশু ঘুমপাড়ানী গান ও "মারাট্টা ডিচ" নামক নগর সংরক্ষণী খন্দকে বর্গীদের উৎপাতের স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। ১৭৫১এ নবাব আলিবর্দ্দির নিকট হইতে তাঁহারা বাঙ্গলার চৌথ ও উড়িষ্যায় অধিকার লাভ করেন।

জল দস্যু আঙ্গ্রে ১৬৯০—১৮৪০ } নানার শাসনকালে ইংরাজেরা জল দস্যু আঙ্গে দমনে পেশওয়ার সহযোগিতা করেন। পূর্ব্বে সমুদ্রের উপর জিঞ্জিয়া নবাবের আধিপত্য ছিল। মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর মহারাষ্ট্রী সরদার আঙ্গ্রে তাহার স্থান অধিকার করেন। ১৬৯০ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত, কানোজী হইতে রাঘোজী পর্য্যন্ত, আঙ্গ্রে বংশের আধিপত্যকাল। রাঘোজীর মরণান্তর তাঁহার বংশ লোপ পাইয়া ডাল্‌হৌসী রাজনীতি অনুসারে আঙ্গ্রে-রাজ্য ইংরাজ হস্তগত হয়। আঙ্গ্রে বংশের আদি পুরুষ কানোজী সামান্য লোক ছিলেন না। বোম্বায়ের কাছাকাছি যত জাহাজ আসিত, তাহারা তাঁহার লৌহহস্ত এড়াইতে পারিত না। ত্রাবাঙ্কুর হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত পশ্চিম কূলের প্রধান প্রধান নগর এই জলদস্যুর উপদ্রবে শশব্যস্ত। আঙ্গ্রের হস্তে ইংরাজদেরও অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৭২৪ ও ১৭৩৪র মধ্যে দুই ইংরাজ রণতরী আঙ্গ্রে কর্ত্তৃক ধৃত হয়। কলিকাতাবাসীগণ যেমন বর্গীদের উৎপাত ভয়ে সহরের চারিদিকে গর্ত্ত খনন করিয়া সুরক্ষিত হন, বম্বের বণিকগণও আঙ্গ্রের আক্রমণ শঙ্কায় সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একবার ইংরাজ পোর্ত্তুগীস মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না। ১৭৫৫ অব্দে কানোজীর পুত্র তুলাজীকে বশে আনিবার জন্য ইংরাজেরা পেশওয়ার সহিত যোগ দেন; পর বৎসরে সুবর্ণ দুর্গ ও বিজয়দুর্গ (ঘেরিয়া) তাঁহার প্রধান দুই দুর্গ বিজিত হয়। সুবর্ণ দুর্গ হারাইয়া তুলাজী সাগর পরিরক্ষিত বিজয়দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আডমিরল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইব মিলিয়া—ওয়াটসন জলে ক্লাইব স্থলে আক্রমণ করত দুর্গ দখল করেন। অতঃপর ইংরাজগবর্ণর বিজয়দুর্গ লাভ লালসে পেশওয়াকে বিস্তর অনুরোধ করেন কিন্তু তাহা যদিও পাইলেন না, তৎপরিবর্ত্তে বোম্বায়ের দক্ষিণস্থ বাঙ্কোট ও অপর কতকগুলি গ্রাম উপার্জ্জনে ক্ষতিপূরণ করিয়া

লইলেন। অপিচ পেশওয়ার নিকট হইতে এইরূপ বচন পাইলেন যে ওলন্দাজেরা মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবেশ ও বাসের অনুমতি পাইবে না—তাহাদের বাণিজ্য পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবেন। পোর্টুগীসদের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পোর্টুগীসদের পতন ও মহারাষ্ট্রীদের সহিত উক্তরূপ সন্ধিস্থাপন বশতঃ অন্যান্য প্রতিদ্বন্দী ইউরোপীয় জাতির মধ্যে ইংরাজদের প্রভুত্ব বলবত্তর হইয়া উঠিল।

নানা সাহেবের শেষ দশা শোচনীয়। তিনি পাণিপতের যুদ্ধে স্বজাতির অধঃপাত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আইলেন—ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপনের আশা জলাঞ্জলি দিতে হইল। ইহার পর নানাসাহেব আর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। এই মর্ম্মান্তিক আঘাতে তাঁহার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি আস্তে আস্তে পুণায় ফিরিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন ও কয়েক মাসের মধ্যেই পার্ব্বতী মন্দিরে দেহত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পেশওয়া বড় মাধবরাও ১৭৬১—৭২ } নানার জ্যেষ্ঠপুত্র পাণিপতের যুদ্ধে মারা পড়েন—তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধবরাও পেশওয়া পদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম ১৭ বৎসর। তাঁহার পিতৃব্য রাঘোবা পেশওয়াকে হাতে রাখিয়া স্বয়ং কর্ত্তা হইবার প্রয়াসী ছিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মাধবরাও স্বহস্তে রাজ্য ভার গ্রহণ পূর্ব্বক অসামান্য চাতুর্য্যের সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, মহারাষ্ট্রীদের দিন দিন শ্রীসমৃদ্ধি দর্শনে ইংরাজেরা সশঙ্কিত, কিন্তু এই সময়ে তাঁহারা হাইদর আলির উপদ্রব নিবারণে সমুৎসুক। হাইদর দমনে মহারাষ্ট্রীদের সহিত সদ্ভাব বন্ধন প্রয়োজন সুতরাং তাঁহাদের মনোগত ভাব মনেই সংবৃত করিতে বাধ্য হইলেন। সদ্ভাবব্যঞ্জক দৌত্যে পেশওয়াকে কোন মতে থামাইয়া রাখিবার চেষ্টা, ইংরাজ দৌত্যের ৫ বৎসর পরে মাধবরাও লোকান্তর গমন করেন। তিনি সন্তান সন্ততি রাখিয়া যান নাই। তাঁহার স্ত্রী রমাবাই অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন, মৃতপতির অনুমৃতা হইয়া চিতানলে দেহ ত্যাগ করেন। মাধবরাও পেশওয়া ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রখ্যাত। বলবানের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের, ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের সহায় ছিলেন। এই ন্যায়ী সাহসী প্রজাবল্লভ দৃঢ়মতি নৃপতি বিয়োগে রাজ্যের যত হানি হয়, পাণিপতের যুদ্ধেও তেমন হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

পঞ্চম পেশওয়া নারায়ণরাও ১৭৭২—৭৩ } ১৭৭২এ মাধবরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণরাও অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি রাঘোবা কাকার ষড়যন্ত্রে অকালে কাল কবলে পতিত হন। রাঘোবাপত্নী আনন্দীবাই এই কাণ্ডের মূলকারণ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। মাধবরাও পেশওয়া দুরন্ত রাঘোবাকে বশে রাখিবার জন্য কয়েদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, অবশেষে স্বীয় মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া তিনি রাঘোবাকে ডাকাইয়া ভাইটিকে তাঁহার হস্তে সঁপিয়া

যান। কতককাল খুড়া ভাইপোর মধ্যে মৌখিক সদ্ভাব বজায় ছিল কিন্তু নারায়ণ রায়ের মাতা গোপিকা বাই ও রাঘোবার স্ত্রী আনন্দী বাই এই দুজনের মধ্যে বনিবনাও ছিল না। মন্ত্রীবর্গের সঙ্গেও রাঘোবার মনান্তর এই সকল কারণে তিনি পুনর্ব্বার প্রাসাদে বন্দীকৃত হইলেন। তদবধি তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের অনিষ্ট সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। সেনাদের ঘুস দিয়া বশ করা তাঁহার প্রথম চেষ্টা। হঠাৎ একদিন গোল উঠিল পেশওয়ার সৈন্যদল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। নারায়ণরাও তখন প্রাসাদে নিদ্রিত ছিলেন। বিদ্রোহীদলের নেতা সমর সিংহ। তুলাজী পণ্ডয়ার নামক রাঘোবার অনুচর সমর সিংহের সহযোগী। বিদ্রোহীগণ সম্মুখ দ্বার ছাড়িয়া অন্য দ্বার দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ লাভ করত পেশওয়ার শয়নগৃহের দিকে ধাবিত হইল। নারায়ণ রাও তাহাদের গোলমাল শ্রবণে ভীত হইয়া কাকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন—সমর সিং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যুবক কাকার পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়া কাতরস্বরে প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। রাঘোবা সমর সিংহকে ক্ষান্ত হও বলিয়া অনুরোধ করিলেন কিন্তু সে অনুরোধ শোনে কে? সমর সিং উত্তর করিল "এতদূর আসিয়া এখন কি আমি নিজেই মরিতে যাইব—ছাড়িয়া দেও নতুবা তুমিও মারা পড়িবে।" রাঘোবা ছাড়াইয়া ছাতে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। নারায়ণ রায়ও পলায়নোদ্যত কিন্তু পাষণ্ড তুলাজী তাঁহার পা টানিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। এমন সময় চাপাজী নামক একজন বিশ্বাসী রাজভৃত্যের প্রবেশ। তার হাতে যদিও কোন অস্ত্র শস্ত্র নাই, সে দৌড়িয়া গিয়া তাহার প্রভু ও অস্ত্রধারীদের মধ্যে ব্যবধান হইল। তাহাকে দেখিয়া নারায়ণ রাও তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন—চাকর মনিব দুজনেই নরাধম নিষ্ঠুর হন্তারকদ্বয় কর্ত্তৃক নিহত হইল।

রাঘোবা এই হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত কি না তাহার কোন প্রমাণ ছিল না—রামশাস্ত্রীর উপর অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইল। রামশাস্ত্রী ন্যায়বান্ সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টবাদী সুবিজ্ঞ বিচারপতি—পুণাদরবারে বশিষ্টস্বরূপ ছিলেন। ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও ভয় করিয়া চলিত। অনুসন্ধানে তিনি শেষে জানিতে পারিলেন রাঘোবা নারায়ণ রায়ের বধের আদেশ দেন নাই—তাঁহাকে ধরিবার অনুমতি দিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার আজ্ঞাপত্রে "ধরিবে" এই কথা বদলাইয়া "মারিবে" এই কথা কে একজন লিখিয়া দিয়াছে। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে রাঘোবার পত্নী পিশাচিনী আনন্দীবাই এই জালের মনয়িত্রী। এই ঘটনার কতক দিন পরে রাঘোবা রামশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন "তোমার নিজের প্রাণ উৎসর্গ ভিন্ন ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার জীবনে আর সুখ নাই—তোমার কিম্বা তোমার রাজ্যের কল্যাণ নাই। তুমি যতদিন কর্ত্তা থাকিবে

রামশাস্ত্রী

ততদিন আমি এ সরকারে চাকুরী করিব না—আর এ মুখো হইব না।” শাস্ত্রী তাঁহার বচন রক্ষা করিলেন। সেই অবধি তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণা ছাড়িয়া বিজন গ্রামে একান্তে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

ষষ্ঠ পেশওয়া রঘুনাথ রাও (রাঘোবা) ১৭৭৩-৪

রঘুনাথ রাও পেশওয়া-পদে আরূঢ় হইলেন কিন্তু নিস্তব্ধ দিন টিকিতে পারেন নাই। তিনিও যেমন যুদ্ধ যাত্রায় পুণায় বাহির হইলেন, তাঁহার বিপক্ষ-দলও শির উত্তোলন করিল। মন্ত্রী প্রধান খ্যাতনামা নানা ফর্ণবীস সে দলের নেতা। রাঘোবার সহচর অনুচরগণ একে একে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। রাঘোবা বেগতিক দেখিয়া শিন্দে হোলকর ও ইংরাজদের শরণ ভিক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই সময় হইতে পেশওয়া বংশের অবনতি। প্রথমে যখন বাজিরাও রাজ্যের

পেশওয়া বংশের অবনতি

সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, তখন সেনাপতি রাঘোজী ভোঁসলা বহ্রাড় প্রান্তের জায়গীরদার ছিলেন। তিনিও পেশওয়ার দৃষ্টান্তে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। পেশওয়ার অধীনস্থ অপরাপর কর্ম্মচারীরাও প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে তৎপর হইল। ক্রমে মহারাষ্ট্র রাজে

পঞ্চশাখা

পঞ্চশাখা বিস্তৃত হইল। পেশওয়া তাহার মধ্যবিন্দু, তাঁহার রাজধানী পুণা। ভোঁসলার রাজধানী নাগপুর। সিন্দে গোওয়ালিয়রের আধিপত্য পাইলেন। হোলকর ইন্দোরে, বরদায় গাইকওয়াড় স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করিলেন। পেশওয়া চিতপাবন ব্রাহ্মণ অন্যান্য সরদারগণ শূদ্রজাতীয় মহারাট্টা। মহ্লাররাও হোলকর হীনবর্ণ সেনা ছিলেন; রাণোজী সিন্দে পেশওয়ার পাদুকাধারী; পিলোজী গাইকওয়াড় রাখালরাজ। ইহাঁরা সকলেই দীনহীন সামান্য শ্রমজীবির জীবিকা হইতে স্বভুজবলে রাজসিংহাসন উপার্জ্জন করেন, নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজবংশ পত্তন করিয়া যান। পেশওয়া প্রথমতঃ এই সকল বীরদিগকে দেশবিজয়ে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর সৈন্য সংস্থানের ভার। তাঁহারা দূরে দূরে থাকিয়া কার্য্য করিতেন, পেশওয়া তাঁহাদের উপর কর্তৃত্ব খাটাইবার সুবিধা পাইলেন না। পেশওয়ার অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছানুসারে তাঁহারা সন্ধি বিগ্রহ করিতে লাগিলেন ও রাজ্য রক্ষার্থে সেনা নিয়োগ না করিয়া স্বার্থ সিদ্ধিতেই নিযুক্ত করিলেন। কালক্রমে তাঁহারা নিজে নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন—পেশওয়ার অধিকার নাম মাত্র। সাতারার রাজা সম্বন্ধে যেমন পেশওয়া, পেশওয়া সম্বন্ধে তদ্রূপ তাঁহার ভৃত্যবর্গ।

পুণার দলাদলি।

পুণা দরবার দুই দলে বিভক্ত—একদল রাঘোবার পক্ষ—অপর দল মৃত নারায়ণ রায়ের পত্নী গঙ্গাবাইয়ের পক্ষ। গঙ্গাবাই তখন গর্ভবতী, সুরক্ষিত ভাবে পুরন্দর দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাঘোবা সৈন্য

সামন্ত লইয়া স্বপক্ষ সমর্থনে যত্নশীল হইলেন প্রথম প্রথম কতকটা কৃতকার্য্যও হইলেন। তিনি যুদ্ধে অরিদল জয় করিয়া বিপক্ষ সেনাপতিকে গ্রপ্তার করিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতিকূল। পুণার সিংহাসন স্পর্শ করেন করেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় বজ্রপাত সদৃশ সংবাদ আসিল যে রাণীর পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে—৪০ দিন গত হইলে শিশু

সপ্তম পেশওয়া সওয়াই মাধবরাও ১৭৭৪—১৭৯৫

রাজার রীতিমত রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। জ্যেঠা অপেক্ষাও বড় এই অর্থে "সওয়াই" মাধবরাও নামে শিশুর নামকরণ হইল। এই সঙ্কটে হোলকর সিন্দিয়ার সাহায্য লাভে নিরাশ্বাস হইয়া রাঘোবা ইংরাজদের শরণাপন্ন হইলেন। বম্বে গবর্ণমেণ্ট অর্থ ও ভূমিলাভ লালসায় তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রাঘোবা ও বম্বে গবর্ণমেণ্ট।

১৭৭৫ এ রাঘোবা ও বম্বে গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সন্ধিস্থাপন হয়, নাম সুরাট সন্ধি। সন্দির তাৎপর্য্য এই, ইংরাজেরা রাঘোবাকে সসৈন্য পুণায় পৌছাইয়া দিয়া পেশওয়া সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিবেন—রাঘোবা ইংরাজদের পুরস্কার স্বরূপ বাসীন সালসেট প্রভৃতি কতকগুলি লোভনীয় স্থান ছাড়িয়া দিবেন। ইংরাজ ও মহারট্টাদের মধ্যে যুদ্ধের এই সূত্রপাত।

সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট

রাঘোবার সহিত এইরূপ বন্দবস্ত সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের মনঃপূত হয় নাই। তাঁহারা সন্ধি প্রত্যাখ্যানের আদেশ জারী করিলেন। তাঁহাদের আদেশ ক্রমে পুণা দরবারের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া

পুরন্দরের সন্ধি

পুরন্দরের সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

পুরন্দরের সন্ধি মৌখিক ও ক্ষণস্থায়ী। রাঘোবাকে দিয়া কার্য্যোদ্ধার করা ইংরাজদের প্রকৃত অভিপ্রায়। এই সময় আবার সেণ্ট লুবিন নামক একজন ফরাসিস পুণায় আসিয়া গোলযোগ আরম্ভ করেন। পুণায় একটা ফরাসিস কুঠী স্থাপন করা ও কুঠী রক্ষণে ফরাসিস সৈন্য নিয়োগ করা তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য। পেশওয়া তাঁহাকে মহা ধূমধাম করিয়া অভ্যর্থনা করেন। মন্ত্রীবর নানা ফর্ণবীস তাঁহার পোষক। এই সব দেখিয়া ইংরাজেরাও পুণা দরবারে প্রবেশ লাভে সমুৎসুক হইলেন। মন্ত্রীবর্গের মধ্যে বিচ্ছেদ সূত্রে তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির সুবিধাও হইল। রাঘোবার পক্ষপাতী সখারাম রাও বম্বে গবর্ণমেণ্টের সহিত কুমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। বম্বে গবর্ণমেণ্টের সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের মত চাহিয়া পাঠাইলেন। সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের মতের ঐক্য নাই। দুজন কৌন্সলর একদিকে, তাঁহাদের মতে পুরন্দর সন্ধি ভঙ্গ করা "অবৈধ, অন্যায় ও অনিষ্টকারী," অপর দুজনার স্বতন্ত্র মত। যখন দুই পক্ষ সমান সমান, তখন গবর্ণরজেনেরল যে পক্ষে যোগ দেন সেই পক্ষই বলবত্তর। হেষ্টিংস সাহেবের অনুকূল মতেই

বম্বে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। ১৪ নবেম্বর ১৭৭৮এ রাঘোবার সহিত নূতন সন্ধি। মহারাট্টাদের সহিত ইংরাজদের এই প্রথম যুদ্ধ।

প্রথম মহারাট্টা-যুদ্ধ ১৭৭৯—৮১ } সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট বম্বের সাহায্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহাদের আগমন অপেক্ষা না করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। বম্বের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণল এজরর্টন। তাঁহার যে একাধিপত্য তাহা নহে, তাঁহার উপর আবার এক যুদ্ধ কমিটির অধিকার। এই অল্প সৈন্য লইয়া মহারাষ্ট্র-গর্ত্তে প্রবেশ করা যত সহজ মনে হইয়াছিল, ফলে দেখা গেল তত সহজ নয়। ব্রিটিস সৈন্য যত অগ্রসর হয়, মহারাট্টারা আশপাশ প্রদেশ অগ্নিসাৎ করত তত পিছু হটে। ইংরাজ সৈন্য তলেগাম গিয়া দেখে সকলি ভস্মরাশি—লোকজন গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। দু দিন পরে কমিটি হইতে সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনের হুকুম আসে। যদিও কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির ইহাতে অমত ছিল, তথাপি এই আদেশ মত কার্য্য করিতে হইল। রাত্রে ভারি ভারি তোপ সকল ডোবার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। বেশীর ভাগ জিনিস পত্র অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়া ব্রিটিস সৈন্য ফিরিল। কমিটি মনে করিয়াছিলেন সৈন্যেরা নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিবে, কেহ কিছু জানিতেও পারিবে না। সকাল হইতে না হইতেই শত্রু দলের গোলাবৃষ্টিতে ইংরাজ সৈন্যের স্বপ্নভঙ্গ হইল। সন্ধ্যার সময় সে সৈন্য অনেক কষ্টে বড়গাম পৌঁছে। পরদিন প্রভাত হইতে তাহাদের উপর পুনর্ব্বার গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল—অবশেষে ব্রিটিস সেনা হার মানিয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইল। ইংরাজদের এমন হার আর কখন হয় নাই। মহারাট্টারা যাহা চাহিলেন তাহা পাইলেন। ইংরাজেরা সালসেট্ প্রভৃতি তাঁহাদের কতকগুলি অধিকৃত প্রদেশ ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সিন্ধের ভোগে ডরুচ অর্পণ এবং তাঁহার অনুচর বর্গের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধিত হইল।

ইংরাজদের দর্প চূর্ণ। এই কলঙ্কপূর্ণ বড়গাম সন্ধি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলেন না। সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট অন্যতর প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন তাহা মহারাট্টাদের অগ্রাহ্য হইল। পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ।

জেনেরল গডার্ড্ ১৭৮০—৮১ } এই শঙ্কটে জেনেরল গডার্ড্ বম্বে সৈন্যের সাহায্যে আগমন করেন। তিনি তখন বন্দেলখণ্ডে ছিলেন। তথা হইতে বিশ দিনের মধ্যে একেবারে ৩০০ মাইল কুচ করিয়া সুরাটে আসিয়া পড়িলেন। প্রথমে গুজরাট, পরে কোঙ্কন তাঁহার রণক্ষেত্র। ১৭৮০ অব্দে তিনি মহারাট্টাদের উপর জয়লাভ করিয়া বাসীন অধিকার করেন।

হাইদর আলি } এই সময় হাইদর আলির কর্ণাটক আক্রমণ সংবাদ বম্বে পৌঁছে। হাইদর দমনে ইংরাজদের সমুদায় বল সমুদায়

শক্তি প্রয়োগ করা চাই, মহারাষ্ট্রীদের সঙ্গে বিবাদ ভঞ্জন প্রয়োজন। সেনাপতির প্রতি মহারাষ্ট্রীদের সহিত সন্ধি বন্ধনের অনুমতি হইল। মনোমত কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে পেশওয়ার ভয় দেখান আবশ্যক এই বিবেচনায় গডার্ড্ সৈন্য সামন্ত লইয়া বরঘাটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আপনি ঘাটের নীচে অবস্থিতি করিয়া এক দল সেনা উপরে খণ্ডালায় প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীরা তাঁহার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া বোম্বাই ও গডার্ড্ সৈন্যের মাঝখানে ঝুঁকিয়া পড়িল। পলায়ন শ্রেয় বিবেচনায় গডার্ড ফিরিয়া যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বরং অল্প সৈন্য লইয়া সম্মুখ যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা কিন্তু মহারাষ্ট্রীদের কাছে পিছন ফিরিলে আর রক্ষা নাই। গডার্ড্ তাহাই ঠেকিয়া শিখিলেন। এই প্রত্যাবর্ত্তনে ব্রিটিস সৈন্যের সমূহ ক্ষতি। দেশী ইউরোপীয় সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬১ জন সেনা হত—কামান ও অন্যান্য জিনিসপত্র শত্রু হস্তে পতিত হইল।

সালবাই সন্ধি ১৭৮২ } এই দুই হারের পর সালবাই সন্ধি। এই সন্ধিমার্গে ইংরাজ মহারাষ্ট্রীদের মধ্যে দেশের আদান প্রদান হইল। ইংরাজেরা রাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন—তিনি অতঃপর পেন্সন-ভোগী হইয়া গোদাবরীতীরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অন্য ইউরোপীয় জাতির সহিত মিত্রতা বন্ধন করিবেন না, পেশওয়ার এইরূপ বচন দিলেন। এই সন্ধি করিয়া ইংরাজেরা হাইদারের বিপক্ষে অবাধে অস্ত্র চালনা করিবার সুযোগ পাইলেন।

সালবাই সন্ধি সাধনে মহারাষ্ট্রী পক্ষের প্রধান উদ্যোগী মহাদাজী সিন্দে। এই সন্ধি-সূত্রে সিন্দিয়ার গুমর বাড়িয়া উঠিল। মহাদাজী (আসল নাম মহাদেব) প্রথমে

মহাদাজী শিন্দে } সামান্য পাটেল ছিলেন, গাঁয়ের মড়ল বৈ নয়—পেশওয়া সরকারের চাকর; এইক্ষণে তিনি স্বাধীন রাজা, মহারাষ্ট্রী সরদারদের অধিনায়ক হইয়া দাঁড়াইলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার পদবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য বিস্তার হইতে চলিল। এই মহাদাজী সিন্দে মহারাষ্ট্রে বিপুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—জাতীয় বীরের মধ্যে ইনি শিবাজীর নীচেই গণনীয়; ইঁহার কার্য্য কলাপ এইস্থলে কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা অসঙ্গত হইবে না।

মহাদাজী সিন্দে উত্তর হিন্দুস্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করত পাণিপথের কলঙ্ক মোচনে ব্রতী হইলেন। সময় অনুকূল। মোগল রাজ্য জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন চূর্ণ, চতুর্দ্দিকে অরাজকতা—যার বল তারই জয়, জোর যার মুল্লুক তার। উত্তর হিন্দুস্থান ঘন মেঘাচ্ছন্ন—সেই মেঘের মধ্য দিয়া ঘোর উপদ্রবের চিহ্ন সকল সূচিত হইতেছে; কত বাড়ী ঘর লণ্ডভণ্ড, পরিবার ছারখার, কত শস্যক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত—কত নির্দ্দোষী ব্যক্তির রক্তপাত হইতেছে। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও দিল্লী সিংহাসনের উপর লোকের অটল অনুরাগ। দিল্লীশ্বর বীর্য্যহীন ঐশ্বর্য্যহীন কিন্তু তথনো তাঁহার নাম-মাহাত্ম্য

ভারতভূমিতে প্রসারিত। দিল্লীশ্বরের নামে সকলেই মোহিত—তাঁহার সহযোগী হইয়া কার্য্য করিতে লোকে উৎসাহিত—তাঁহার প্রদত্ত মানার্জ্জনে মহা মহা আমীরও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। সিন্দিয়াও অবসর বুঝিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। দিল্লীর বাদসা সা আলম—তাঁহার উজীর নজফ খাঁর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, এই ঘটনায় উজীর পদের জন্য মহা বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। নজফের উত্তরাধিকারী আফ্রাসিয়াব—মহম্মদ বেগ তাঁহার প্রতিদ্বন্দী। এই প্রতিদ্বন্দী দমন মানসে আফ্রাসিয়াব সিন্দিয়াকে ডাকিয়া পাঠান। মন্ত্রীর আমন্ত্রণে সিন্দে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আগ্রায় গিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু পরেই আফ্রাসিয়াব শত্রু হস্তে নিহত হওয়ায় রাজ্য বিপ্লব দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল। সকলেই সিন্দিয়ার দিকে তাকাইয়া, সিন্দের সাহায্যে নিজ নিজ কাজ সাধিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। সিন্দে দিল্লী প্রয়ান করিয়া পেশওয়ার তরে "বাদসাহী উজীর" পদবী আদায় করিলেন—স্বয়ং বাদসাহী সেনাপতি পদ গ্রহণ করিলেন। সৈন্য সংরক্ষণে আগ্রা দিল্লীর রাজস্ব নিয়োজিত হইল, এইরূপে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোআব প্রদেশ তাঁহার বশবর্ত্তী হইল। বাদসা সৈন্য মাঝে সঙের মত এদিক্ ওদিক্ ফিরিতে লাগিলেন—সিন্দিয়া মথুরাধামে নিজ নিকেতন স্থাপন করিলেন। তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন তাহা নহে, ডিবইন নামক জনৈক ফরাসিসকে পাইয়া সুশিক্ষিত প্রবল সৈন্যদল গড়িয়া লইলেন—সে সৈন্য শীঘ্রই কাজে লাগিল। দিল্লীতে অশান্তির আর অন্ত নাই। বাদসাহের উপর রোহিলা দলপতি গোলাম কাদরের প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য সিন্দিয়ার কর্ণগোচর হইল। এই গোলাম কাদর দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া যে ভয়ানক মারকাট অত্যাচার জারী করে তাহার তুলনা পাওয়া ভার। কতক দিন ধরিয়া নগর লুণ্ঠন, প্রাসাদ লুণ্ঠন; লুণ্ঠনে আশানুরূপ ধন লাভে নিরাশ হইয়া গুপ্ত ধন বাহির করিবার মতলবে বাদসাহের উপর রাজপরিবারের উপর অকথ্য দারুণ উৎপীড়ন প্রবর্ত্তিত হয়। এই সকল অত্যাচারে জর জর হইয়া বেচারা সা আলম মনস্তাপে বলিয়া উঠিলেন—"এ দৃশ্য দেখা অপেক্ষা আমার অন্ধ হওয়া ভাল ছিল"—এই কাতরোক্তি শ্রবণে নৃশংস কাদর তরবার দিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া সেই দণ্ডে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ছাড়ে। মড়ার উপর আবার খাঁড়ার ঘা না দিয়া সে সন্তুষ্ট নয়। সেই শোনিতাক্ত অন্ধ বাদসাকে পাষাণ হৃদয় পাষণ্ড আবার উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল "এখন বাবা কি দেখিতেছ?" বাদসা উত্তর করিলেন "তোমার আমার মাঝখানে আমি বাপু কোরাণ দেখিতেছি।" সমর্পক উত্তর, কেননা কোরাণ ছুঁইয়া শপথের পর গোলামের শেষে এই আচরণ। এই দুরাত্মাকে শীঘ্রই তাহার পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইল। সিন্দিয়ার সৈন্যাগমে সে দিল্লী ছাড়িয়া পালায় এবং কতকদিন পরে ধৃত হইয়া স্বীয় পাপানুরূপ কঠোর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মহাদাজী অন্ধবৃদ্ধ বাদসাহকে মহা সমারোহে দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিয়া যথো-

চিত সান্তনা সহকারে তাঁহার কষ্ট লাঘব করেন। এই অসহ্য দুঃখ ক্লেশের পর সা আলম যে গভীর শোকোচ্ছাসময় কবিতা উদ্গার করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

বিষয় বিভব যাহা আছিল তা বালাই আমার।
কৈনু কত পাপ, পাইনু মনস্তাপ,
যেমন করম তার প্রতিফল যোগ্য
ক্ষমাগুণে এবে প্রভু তারিলে হে, আনিলে আরোগ্য।
দুধ দিয়ে পুষেছিনু সাপ,
সেই বিষে পাই শেষে কত শোক তাপ।

* * * *

পাঠান হানিয়া বাণ, রাজ্য মোর করে ছারখার ;
তুমি বিনা আর, প্রভু হে আমার
আছে কেবা ত্রিভুবনে করিতে উদ্ধার।
হয়ত তাইমুর আসি, কাটিবেন দুঃখ রাশি,
ঘুচিবে যন্ত্রণা জ্বালা লভিয়ে সহায় ;
না হয় মহাদাজী, পুত্রসম আজি
প্রতিশোধ তুলি বীর বাঁচায়ে আমায়,
* আসফ রাখিবে লাজ, অথবা ইংরাজ রাজ
করে ত্রাণ বহে প্রাণ ধ'রে সে আশায়।

* * * *

† মিহির রে, আজি তোরে ভাগ্য দোষে ঘিরিল দুর্দ্দিনে
এ ঘোর তিমির, রহিবে কি চির
বিভু কৃপাগুণে পুন, প্রকাশিবি, দেখিবি সুদিন।

সিন্দিয়ার মথুরা প্রবাস কালে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট পুণাদরবারে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট বসাইবার চেষ্টায় মহারাজা সিন্দে সন্নিধানে দূত প্রেরণ করেন। ব্রিটিস দূত ম্যালেট সাহেব মথুরায় সিন্দিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মোগল সম্রাট সা আলম তখন সিন্দের ক্যাম্পে, তাঁহার সহিতও সাক্ষাৎ হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি অগাধ পরিবর্ত্তন! ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রী বীরেরা তাহাদের কোটর হইতে বিনির্গত হইয়া ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তখন দিল্লীশ্বরের মহিমা-মিহিরে দিগ্বিদিক্ ঝলসিত—এই

* আসফ-উদ্দৌলা।

† মূল ভাষায় আফতাব—সূর্য্য—বাদসার অন্য নাম।

অল্পকাল মধ্যেই তাঁর সমস্ত মহিমা অস্তমিত। সেই দিল্লী সম্রাট এখন বর্গীদের অনুগ্রহ ভিখারী, সিন্দিয়ার ক্যাম্পে আবদার করিতে আসিয়াছেন। সে যাহা হউক সিন্দিয়ার প্রসাদে ব্রিটিস দৌত্য সফল হইল। ম্যালেট সাহেব ব্রিটিস কার্য্য কর্ত্তা হইয়া পুণায় প্রবেশ লাভ করিলেন। ছুঁচ হইয়া প্রবেশ সঙ্গীন হইয়া বাহির হওয়া, ইংরাজদের এই আশ্চর্য্য নয় কৌশল ভারত ইতিহাসে পদে পদে প্রত্যক্ষ করা যায়।

পুণা দরবারে ব্রিটিস দূত ১৭৮৬ — ম্যালেট সাহেব পুণাদরবারে ব্রিটিস দূতরূপে কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন টিপুসুলতানের সঙ্গে দুর্দ্দান্ত সমরে প্রবৃত্ত হন, তখন ম্যালেটের মন্ত্রণায় পেশওয়া ও নিজাম ইংরাজদের সহিত যোগ দিয়া চলেন। ফেব্রুয়ারি ১৭৯২ এ কর্ণওয়ালিস শ্রীরঙ্গপট্টন আক্রমণ করিয়া টিপুর উপর জয়লাভ করেন। টিপু হার মানিয়া ১৯ মার্চ্চ ইংরাজদের কথামত সন্ধি লিখিয়া দেন। ইংরাজ ভাগ্যে সুলতান রাজ্যের বহুতর প্রদেশ পতিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা যে সকল স্থান জয় করেন, তাহার তৃতীয়াংশ পেশওয়াকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আরো অনেক প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা চান যে নিজামের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া পেশওয়াও ইংরাজ সৈন্য পোষণে স্বীকৃত হন। ইংরাজেরা এইরূপ নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন কিন্তু সিন্দিয়ার চতুর পরামর্শে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

উত্তর হিন্দুস্থানে কিয়ৎপরিমাণে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনানন্তর মহাদাজী সিন্দে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৭৯২ অব্দে তিনি পেশওয়ার হস্তে দিল্লীশ্বর প্রদত্ত নূতন পদমর্য্যাদা প্রদান উপলক্ষে পুণায় পদার্পণ করেন। এই অভিষেক ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। পুণায় এমন ধূমধাম আর কখনও হয় নাই। প্রথমে পেশওয়ার "বাদসাহী উজীর" পদবী গ্রহণ। সিন্দিয়া অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি করেন নাই। উৎসবের জন্য সারি সারি চিত্র বিচিত্র তাম্বু পড়িয়াছে। প্রান্তবর্ত্তী তাম্বুতে এক স্বর্ণ সিংহাসন প্রস্তুত, তৎসমীপে বাদসাহী সনদ, বসন ভূষণাদি উপহার সামগ্রী সকল বিরচিত। পেশওয়া সিংহাসনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া তিনবার সেলাম করিয়া শতৈক স্বর্ণ মোহর নজরাণা দিয়া বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। পরে বাদসাহী পরওয়ানা পঠিত হইল। ইহার শেষ ভাগে হিন্দুস্থানে গোহত্যানিষেধের অনুজ্ঞা ছিল, পাঠক যখন সেই ভাগে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন সভাসজ্জনের উল্লাসের আর সীমা রহিল না। তৎপরে আড়ালে গিয়া অভিষেক বসন ভূষণ সাজসজ্জা করিয়া দরবারে পেশওয়ার পুনঃ প্রবেশ, সভাস্থ সরদারদের অভিবাদন ও দস্তুরমত নজর দান। অনন্তর তিনি দিল্লীশ্বর প্রেরিত অশ্ব রথ গজ, ঢাল তলবার, বসন ভূষণ, চামর নিশান প্রভৃতি বিবিধ উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। সভা ভঙ্গ

করিয়া পেশওয়া যখন সহরে প্রবেশ করেন, তখন সমস্ত পথ লোকে লোকারণ্য --বাদ্য-ধ্বনি, তোপধ্বনি, পৌরজনের জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া যে কি গগন ভেদী গভীর নাদ সমুত্থিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। প্রাসাদে গিয়া উজীরের প্রতিনিধি পদে সিন্দের বরণ। এই উপলক্ষে ও অন্যান্য প্রসঙ্গে সিন্দিয়ার বিনয় অভিনয় অতীব কৌতুকাবহ। পাত্র মিত্র সভাসৎ সমস্ত লোকে তাঁহার সম্মানার্থে যেমন ব্যগ্র, সিন্দে নিজ পদ লাঘব বজায় রাখিতে তেমনি তৎপর। সমবেত আমীর ওমরাদের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন গ্রহণ করা—স্বভুজার্জ্জিত উচ্চ পদবী সকল তুচ্ছ করিয়া আপনার পাটেল নাম লোক মধ্যে ঘোষণা করা—মোরচল (ময়ূর পুচ্ছের চামর) ধরিয়া পেশওয়ার পালকীর সঙ্গে সঙ্গে চলা—পৈতৃক রীতি অনুসারে পেশওয়ার পার্শ্বে পাদুকা ধরিয়া দাঁড়ান, ইত্যাদি বিনয় ভাবে তিনি লোকরঞ্জনের চেষ্টা করেন. কিন্তু তাহার ফল উল্টা হইল—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, এ ত ধরা কথা। সিন্দে যেমনই অভিনয় করুন না কেন, নানা ফর্ণবীসের ন্যায় দূরদর্শী চতুর লোকের তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি তলাইয়া বুঝিতে আর বাকী রহিল না এবং ফলেও প্রকাশ পাইল, পুণায় থাকিয়া প্রধান মন্ত্রীরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এই তাঁহার ভিতরকার মতলব।

নানা ও সিন্দের মধ্যে মহা রেষারেষি—পেশওয়া বেচারা ভাবিয়া পান না কোন্ দিক্ রক্ষা করেন—দুই জন তাঁহার দুই বাহু। নানার বিপক্ষতা সত্ত্বেও পুণা দরবারে সিন্দের আধিপত্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল। পেশওয়াকে তিনি শিকার, ব্যায়াম চর্চ্চা, নানাপ্রকার প্রদর্শন, আমোদ প্রমোদে ভুলাইয়া তাঁহার মমতা আকর্ষণ করেন—নানা ফর্ণবীসের মহিমা ম্লান। মহাদাজীর প্রভুত্ব নানার অসহ্য হইয়া উঠিল—এমন কি তিনি রাজ্য কারবার ছাড়িয়া কাশীবাসের সঙ্কল্প করিলেন। পেশওয়া তাঁহাকে অভয় বচন দিয়া অনেক করিয়া সান্ত্বনা করেন। তাঁহাদের পরস্পর বৈমনস্য প্রকাশ্য লাঠালাঠিতে পরিণত হইবার উপক্রম, এমন সময় যমদূত আসিয়া নানার পক্ষ অবলম্বন করিল। সিন্দিয়া সহসা জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। নানার একমাত্র অপ্রতিহত প্রতিদ্বন্দ্বী সরিয়া যাওয়াতে তাঁহার প্রভুত্বের পথ নিষ্কণ্টক হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাড়া গাঁ।

রোদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে,
ঘাসে শিশির মেলা,
চুপড়ি হাতে যায় ক্ষেতেতে
প্রাতে কৃষক-বালা।
শীতের প্রভাত নয় প্রতিভাত,
কুয়ার ধূঁয়ায় ঢাকা—
সুদুর দূরে নাই কিছু রে
কেবলি ধূম মাখা।
তুলছে খুঁটি কলাই শুঁটী
ক্ষেতের মাঝে ব'সে,
বালক রবির সোণার কিরণ
গায় পড়েছে এসে।

ছোট ছোট হলদে ফুলে
শরিষার ক্ষেত আলা,
পূরব ধারে মেঘের শিরে
রাঙা সোণার থালা।
পথের ধারে ঝিলের তীরে
বক শাদা শাদা,
খেজুর গাছের গালার কাছে
কলসীগুলি বাঁধা।
কুঁড়ের পিছে তালের গাছে
বাবুই বাসার সার—
কি চাতুরী কারিগরি
মানুষ মানে হার।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীম-কোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভারতীর পূর্ব্ব কয়েক সংখ্যায়—মহারাজা নন্দকুমারের আবশ্যকীয় জীবনী ও তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আমরা যথাসাধ্য পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সহৃদয় পাঠকও তাহা হইতে হেষ্টিংসের প্রকৃত চরিত্রের অনেকটা আভাস পাইয়াছেন। এক্ষণে হেষ্টিংসের—মহারাজা নন্দকুমারের সম্বন্ধে কার্য্যগুলির সমালোচনা দ্বারা ও তাঁহার সহিত তিনি আদ্যোপান্ত যে প্রকার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার চরিত্রের বিকৃত অংশ পাঠকবর্গকে দেখাইব। ইহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, হেষ্টিংসই নন্দকুমারের জীবন নাশের মূল কারণ, ও তাঁহার (নন্দকুমারের) বিরুদ্ধে—এক ঘোরতর চক্রান্তের মূল যন্ত্র-পরিচালক। নন্দকুমারকে তিনি আদ্যোপান্তই শত্রু বলিয়া ভাবিতেন, এবং কোন প্রকারে সেই শত্রু দমন করিতে না পারিয়া পরিশেষে নিতান্ত অমানুষিক ও কলুষিত

উপায়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। মহম্মদ রেজাখাঁর অভিযোগের বিচার লইয়াই আমরা প্রথমে সমালোচনা আরম্ভ করিব। ইহাতে দেখাইব (১) তিনি নন্দকুমারকে চিরকালই তাঁহার প্রতিযোগী বলিয়া ভাবিতেন, অথচ নন্দকুমার না হইলে তাঁহার অনেক আবশ্যকীয় কার্য্য আট্‌কিয়া যাইত। (২) মহম্মদ রেজাখাঁর অভিযোগের বিচার হেষ্টিংস অপক্ষপাতিতার সহিত করেন নাই, ও এই কার্য্যে সহায়তা জন্য নন্দকুমারকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিয়া নিতান্ত অকপট ব্যবহার করিয়াছেন। (৩) কুমার গুরুদাসের নবাব সরকারে নিয়োগ সম্বন্ধে হেষ্টিংস নন্দকুমারের প্রকৃত চরিত্র পরিস্ফুট করিয়া যে এক মন্তব্য লিখিয়াছিলেন,তাহাই তাঁহার (নন্দকুমারের) প্রকৃতচরিত্র, ও ইহাঁর পূর্ব্বে বা পরে তিনি নন্দকুমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই বিদ্বেষ বুদ্ধি-প্রণোদিত। (৪) গুরুদাসের নিয়োগ সময়ে হেষ্টিংস যে তাঁহার পিতার নিকট হইতে কোন প্রকার উৎকোচ লইয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহার নিজ-লিখিত পত্র হইতে বা তাঁহার ভবিষ্যতের সমস্ত কার্য্য হইতে বিশেষরূপে পাওয়া যায়।

কার্টিয়ার সাহেব গবর্ণরী পরিত্যাগ করিয়া নবাগত হেষ্টিংসকে কাজকর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিলে হেষ্টিংস বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই নন্দকুমারের সহিত তাঁহার সংমিশ্রণ হইল। এই সংমিশ্রণই যত অনর্থের মূল। ইহা হইতে যে এতদূর বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, ইহা জানিলে বোধ হয় মহারাজা নন্দকুমার সে সময়ে তাঁহার সহিত মিশিতেন না। উভয়েই উভয়কে সেই সময়ে স্বস্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এই ভ্রান্ত বিবেচনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা রাজনৈতিক কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। হেষ্টিংসের নন্দকুমারের সহায়তা প্রথম হইতেই বাঞ্ছনীয় ছিল। বাঙ্গলায় আসিয়া তিনি চারিদিকে বড়ই বিশৃঙ্খলা দেখিলেন। সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করা তাঁহার পক্ষে আয়াসসাধ্য ও অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল—একজন উপযুক্ত পরামর্শদাতা এসময়ে বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু তখন বাঙ্গলায় এমন কোন্‌ ব্যক্তি আছে যে হেষ্টিংসের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করিবে? মহম্মদ রেজা খাঁ রাজকার্য্যে ব্যস্ত, কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দী—অথচ তাঁহা অপেক্ষা বিচক্ষণ—মহারাজা নন্দকুমার এক্ষণে রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। নন্দকুমার ভিন্ন এ সময়ে আর কে তাঁহাকে উপদেশ দিবে? তিনি নিরুপায় হইয়া সুতরাং মহারাজা নন্দকুমারের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। মহারাজা নন্দকুমারও হেষ্টিংসের বাসনা অনুসারে তাঁহার সহায়তা করণোদ্দেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদের এই অশুভসম্মিলনেই বিষবৃক্ষের বীজ উভয়েরই অজ্ঞাতসারে রোপিত হইল। ইহার পর আর একটী কারণ ঘটিয়া হেষ্টিংসের সহিত নন্দকুমারের সংমিশ্রণ কিয়ৎকালের জন্য অপরিহার্য্য করিয়া

তুলিল। বিলাত হইতে হুকুম আসিল মহম্মদ রেজা খাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনিতে হইবে। হেষ্টিংস প্রভুদিগের আদেশানুসারে মহম্মদ রেজাখাঁকে সপরিবারে ও অনুচরবর্গের সহিত নজরবন্দী করিয়া কলিকাতায় আনিলেন। মহম্মদ রেজাখাঁর অপরাধটি অতিশয় গুরুত্ববিশিষ্ট। নরহন্তাকেও স্থল বিশেষে ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁর এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। তাঁহার হস্তে প্রজার ধন, প্রাণ, সুখ, ঐশ্বর্য্য সমস্তই সমর্পিত হইয়া ছিল, কিন্তু তিনি অর্থ গৃধ্নুতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছায় সেই সমস্ত দায়িত্বের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন। ভীষণ মন্বন্তরের সময় তিনি কোথায় প্রজাদিগকে আত্মনির্ব্বিশেষে পোষণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন ও ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি সেই সকল মুমূর্ষু—কঙ্কালময়, অদন-বিহীন আর্ত্তপ্রজার মুখ হইতে অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়াছেন। নিজের অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এই ভীষণ সময়েও তিনি দোকানদারি আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ অপরাধ সাধারণের চক্ষে—বিশেষতঃ তাঁহার নিয়োগকর্ত্তাদের নিকট নিতান্ত অমার্জ্জনীয় ও কলঙ্কময়। মহম্মদ রেজাখাঁ স্বীয় পদোচিত ক্ষমতার সহায়ে—এই সমস্ত অত্যাচর করিলেন; আর্ত্ত-প্রজাকুল নীরবে নিরুপায়ে ভগ্নমনে সেই সমস্ত সহ্য করিয়া থাকিল। নবাবের তখন কার্য্যকারী ক্ষমতা লোপ হইয়াছে—বঙ্গভূমি এক প্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছে—অর্থ লইয়াই ইংরাজের প্রয়োজন—প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি ততদূর মনোযোগ নাই, সুতরাং সেই সময়ে ইংরাজের নিম্নে মহম্মদ রেজাখাঁই দেশের কর্ত্তা। এই জন্যই কেহ [illegible] বলিতে সাহস করে নাই। বিলাত হইতে হুকুম আসিলে—যখন মহম্মদ রেজাখাঁ বন্দী র[illegible] কলিকাতায় আনীত হইলেন, তখন সর্ব্বাগ্রে বাবু হুজুরীমল অভিযোগ লইয়া হেষ্টিংসের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। বাবু হুজুরীমল সেই সময়ে কলিকাতার একজন গণনীয় লোক—ধনে মানেও বড় একটা কম নহেন। এই হুজুরীমলকে স্বয়ং হেষ্টিংস সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন "হুজুরীমলের ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সৎস্বভাব বিশিষ্ট লোক আর আমি দেখি নাই।* "

মহম্মদ রেজা খাঁর বিচার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার দুর্ভেদ্য কূট হিসাবাদির ভিতর প্রবেশ করা একক হেষ্টিংসের কার্য্য নহে।

সেই সময়ে দেশেও এমন কোন লোক ছিল না—যে এসম্বন্ধে সহায়তা করিয়া এই দায় হইতে উদ্ধার করে। মহারাজা নন্দকুমারই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁহার সহায়তা যে এই প্রকার কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়,—ডাইরেক্টরেরা তাহা জানিতেন। সুতরাং তাঁহারা হেষ্টিংসকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আপনার সহিত নন্দকুমারের অন্য কোন বিষয়ে

---

* ইনি সুপ্রসিদ্ধ উমিচাঁদের শ্যালক ও একজন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন—আজও "হুজুরীমল্‌স ট্যাঙ্ক লেন" কলিকাতায় তাঁহার নাম প্রচার করিতেছে।

মনোমালিন্য থাকিলেও এ সময়ে তাহা চাপিয়া রাখিয়া—কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নন্দকুমারকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা বিশেষ আবশ্যক—সুতরাং এবিষয়ের যেন কোনও অন্যথা না হয়। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ মহারাজা নন্দকুমারকে পরে কোন প্রকার বিশেষ প্রতিদান করিলে চলিবে।" *

হেষ্টিংসও মনে মনে বুঝিলেন একাকী মহম্মদ রেজা খাঁর দোষোদ্‌ঘাটন ও তাঁহার অপরাধের বিচার করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং নন্দকুমারকে তিনি সহায়রূপে অবলম্বন করিলেন। নন্দকুমারের সহিত এবারের সম্মিলন কেবল তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধির পথ সরল করা মাত্র। গভীর স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া তিনি এই কার্য্যে নন্দকুমারের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমরা এই প্রস্তাবে দেখাইব যে, হেষ্টিংস নন্দকুমারকে শত্রু বলিয়াই ইহার পূর্ব্ব হইতেই ভাবিতেন। সুতরাং এ প্রকার স্থলে শত্রুর সহিত সম্মিলনে তাঁহার স্বার্থ কি রূপে বজায় থাকিতে পারে? আমরা হেষ্টিংসের চরিত্র আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া যাহা কিছু বুঝিয়াছি, তাহাতে এই বোধ হয় যে তিনি বিনা স্বার্থে তাঁহার শাসন সময়ের মধ্যে কোন কার্য্যই করেন নাই। মহম্মদ রেজা খাঁর বিচারের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল। ডাইরেক্টারেরা বহুদিন হইতেই বুঝিয়াছিলেন—এক্ষণে তাঁহারাই প্রকৃত রাজ্যে-শ্বর। বৃথা একটা ডবল গবর্ণমেণ্টের ব্যাপার রাখিয়া—অনর্থক ব্যয়ভার সহ্য করা বা রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা বর্দ্ধন করার আবশ্যকতা কি? হেষ্টিংস ডবল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিতে উপরওয়ালাদের কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত সুযোগ না পাইয়া তিনি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁর দোষ বাহির করিতে পারিলে ও তাহার অব্যবহিত পরেই ডবল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিতে পারিলে তিনিই সকল বিষয়ে বাঙ্গালার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িবেন। রাজস্ব বন্দোবস্ত বা ইজারাদি দেওয়া সম্বন্ধে সেই বেবন্দবস্তা সময়ে ক্ষমতা বা ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের যথেষ্ট লাভ হইত। এ বিষয়ও হেষ্টিংস বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁর বিচার করিয়া দোষোদ্‌ঘাটন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং সেই দুরূহ ব্যাপার সহজ করিবার নিমিত্ত মহারাজা নন্দকুমারের সহিত সখ্যতা বন্ধনে হেষ্টিংস আপাততঃ স্থির মনোরথ হইলেন। উভয়ে একযোগে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজা নন্দকুমারের যে ইহাতে স্বার্থ একেবারে ছিল না একথা আমরা বলিতেছি না। মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহার সম ব্যবসায়ে প্রতিযোগী। এই প্রকার প্রতিযোগীতায় এক সময়ে মহম্মদ রেজা খাঁ নন্দকুমারকে পরাভূত করিয়া জয়শ্রী লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে

---

* Vide—The letter from the Secret committee of the Directors to Warren Hastings Esq, Dated London, 16th April.

আবার মহারাজাও উপযুক্ত সুযোগাবলম্বনে মহম্মদ রেজা খাঁর প্রতিযোগীতা করিয়া জয়লক্ষ্মীকে নিজায়ত্ত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁর কার্য্যের আদ্যন্ত তাঁহার নখ দর্পণের মধ্যে ছিল। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা ও কূট বুদ্ধি বলে, সমস্ত জটিল বিষয় সরল করিয়া আনিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ বিপদ দেখিয়া গবর্ণর ও নন্দকুমারকে বহুল পরিমাণে উৎকোচ দিতে চাহিলেন। মহারাজা নন্দকুমার দরিদ্র বা অর্থ পিপাসু ছিলেন না—তাঁহার উচ্চ আশার ন্যায় অর্থ পিপাসা ততদূর প্রবল ছিল না। সুতরাং তিনি কিছুতেই টলিলেন না। হেষ্টিংস নন্দকুমারের মুখে শুনিলেন যে রেজা খাঁ উৎকোচ দিতে চাহিতেছেন। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন—"সামান্য উৎকোচের জন্য কোম্পানীর কার্য্যহানি ও এই প্রমাণ-সাপেক্ষ অভিযোগ হইতে রেজা খাঁকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে না।" মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির প্রমাণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় প্রায় সুসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু হঠাৎ হেষ্টিংস তাঁহার মনের গতি ফিরাইলেন। মহম্মদ রেজা খাঁকে হঠাৎ কঠিন প্রহরী-বেষ্টন হইতে মুক্ত করা হইল—গবর্ণরের বিনা সম্মতিতে তিনি কলিকাতার বাহিরে যাইতে পারিবেন না, এই প্রকার মোচ্‌লেখা লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইল। লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল—হেষ্টিংস সাহেব উৎকোচ লইয়া রেজা খাঁকে ছাড়িয়া দিলেন। বিচার প্রার্থীরা ক্ষতিপূরণের আশা করিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। তাহারাও নানাবিধ কুসন্দেহ করিতে লাগিল। ভিতরের ব্যাপার কি, মহারাজা নন্দকুমার বেশ বুঝিয়া লইলেন। †

হেষ্টিংস এই প্রকার কার্য্য করিবার সময় অবশ্য মন স্থির করিয়া বুঝিয়াছিলেন রেজা খাঁ দোষী প্রমাণ হইলেও ডবল গবর্ণমেণ্ট উঠিবে, না হইলেও তদ্রূপ ফল ফলিবে, সুতরাং স্বার্থ ত্যাগ না করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁকে ছাড়িয়া দিলেন। মহারাজা নন্দকুমার এই ব্যাপারে লাভ করিলেন—অভাবনীয় মনস্তাপ, ও অনুল্লঙ্ঘনীয় লোক লজ্জা। যে বিষয় তিনি নখদর্পণের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া সাধারণের চক্ষে ধরিতে পারিতেন, যাহার জন্য তিনি এতদূর পরিশ্রম ও নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিলেন—

---

† হেষ্টিংস তাঁহার কোন বন্ধুর পত্রের এক স্থানে লিখিতেছেন—"আমি মহম্মদ রেজা খাঁর অভিযোগের বিচারের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছি। অনেক সাক্ষীর নিকট আমি নিজে গিয়াছি ও তাহাদিগকে আশ্রয় বা উৎসাহ দিয়া বা নানাবিধ স্তোক বাক্যে উত্তেজিত করিয়া রেজা খাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষীর যোগাড় করিতেছি। নিজে প্রতিদিন উপস্থিত থাকিয়া অনিয়মিত পরিশ্রম করিয়া হিসাব পত্র দেখিয়া থাকি ও জোবানবন্দী লিখিয়া লই।" ইত্যাদি—

Hastings to Lawrence Sullivan Esq, Dated Fort William, 20th March and 25th Aug. 1774.

হেষ্টিংস এক কথায় সেই সমস্ত বহুমূল্য পরিশ্রমের ফল নষ্ট করিলেন। ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। মহম্মদ রেজাখাঁকে ছাড়িয়া দেওয়াতে কোম্পানীর ও মহারাজা নন্দকুমারের যথেষ্ট ক্ষতি হইল এবং লোকে ভাবিল মধ্য হইতে হেষ্টিংসই কিছু বিশেষ লাভ করিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য করিলেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর অভিযোগের বিচারের সময় কি প্রকার বহ্বাড়ম্বরে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আমরা হেষ্টিংসের নিজ পত্র হইতেই দেখাইব। তিনি লিখিতেছেন "মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী অভিযোগই প্রধান (১) মন্বন্তরের সময় দেশের চাউল এক চেটিয়া করিয়া রাখা। (২) নিজামতের অনেক টাকা আত্মসাৎ করা। (৩) বৃদ্ধ মীরজাফরের মৃত্যুর পর সমগ্র ঢাকা প্রদেশ ইজারা লওয়া, ও তজ্জন্য কোম্পানীরও নিজামতের নিকট অনেক টাকার দেনদার থাকা। (৪) ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে মারহাট্টাদিগের ও বাদসাহের সহিত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পত্রাদি লেখা। আমি সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিতার সহিত এই অভিযোগ-গুলর বিচার করিব। কিন্তু এক বিষয়ে আমি তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইব—তিনি যদিও এই বিচারে দোষমুক্ত হন, তত্রাচ তাঁহাকে পূর্ব্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে বা পূর্ব্ব ক্ষমতা লাভ করিতে কখনই দিব না।" পাঠক এই. পত্রখানি হইতেই আভাস পাইবেন—ডবল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া সমস্ত ক্ষমতা নিজহস্তে সংযত করিতে হেষ্টিংস পূর্ব্ব হইতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। একথা তিনি নিজে, ডাইরেক্টার সভার সভ্যগণ, ও তাঁহার কয়েকটী প্রিয় বন্ধু ভিন্ন আর কেহই জানিত না। হেষ্টিংস নিজমুখেই মহম্মদ রেজা খাঁর সম্বন্ধে আর একটী নূতন গোছের অভিযোগের নাম করিতেছেন। মারহাট্টা ও বাদসাহের সহিত ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছেন—বলিয়া মহম্মদ রেজা খাঁর আর একটী নূতন কলঙ্ক উঠে। প্রথমটির ন্যায় এই অভিযোগটিও বিশেষরূপে তদন্ত করিবার জিনিস। কিন্তু প্রথমটির সম্বন্ধে হেষ্টিংস যে প্রকার শৈথিল্য দেখাইলেন, এইটিরও সেই প্রকার গতি হইল। মহারাজা নন্দকুমারের নামে যখন এই প্রকার একটা কলঙ্ক উঠিয়াছিল, তখন হেষ্টিংস প্রমুখ মন্ত্রীসভা, ও তাঁহার বন্ধুগণই বড়ই লাফালাফি আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহম্মদ রেজাখাঁর সম্বন্ধে এ প্রকার অভিযোগ লইয়া যে কোন প্রকার আন্দোলন হইল না, ইহার কারণ হেষ্টিংসই বলিতে পারেন। মহারাজা নন্দকুমার একজন আদর্শ হিন্দু ছিলেন। হিন্দু হৃদয়ের সারবত্তা তাঁহাতে সম্পূর্ণ ছিল। কৃতজ্ঞতা, প্রভুভক্তি প্রভৃতিগুণে তিনি ভূষিত ছিলেন বলিয়া তিনি ইংরাজ দিগের দ্বারা "বিরুদ্ধাচারী" ও "রাজদ্রোহী" বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি মীরজাফরের অতিশয় প্রিয় পাত্র ও বিশ্বস্তমন্ত্রী ছিলেন। নবাবের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিতে সুতরাং ইংরাজের স্বার্থে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইতেন বলিয়া হেষ্টিংস তাঁহাকে বড়ই নিন্দা করিতেন ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি এক স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন—"I was

engaged in a continued opposition to the interests and designs of that man, because I judged him to be adverse to the welfare of my employers" নন্দকুমার ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া—কৃতজ্ঞতার প্রতিদান করিতে গিয়া—প্রভুর স্বার্থ বজায় রাখিতে গিয়া—ইংরাজের ও ডাইরেক্টরদিগের উদ্দেশ্যের হন্তারক হইয়াছেন, ইহা তাঁহার বড়ই অপরাধ! হেষ্টিংস যে প্রভুভক্তি-প্রণোদিত হইয়া নন্দকুমার সম্বন্ধে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন—নন্দকুমারও সেই প্রভুভক্তির দ্বারা চালিত হইয়া স্বীয় প্রভুর মঙ্গলোদ্দেশে কোম্পানীর বিরুদ্ধে কতকগুলি কার্য্য করিয়াছেন। এই কার্য্যগুলি ইংরাজের চক্ষের নিতান্ত হেয় হইলেও আমাদের নিকট অতি পবিত্র ও গৌরবের বিষয়। ইহার পরেই এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিতরূপে বলিব। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হেষ্টিংস এইস্থলে নন্দকুমারকে প্রভুভক্তির জন্য এতদূর তিরস্কার করিলেন, আবার ইহার কিয়ৎকাল পরেই অপর একস্থলে দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া, এই কার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সুখ্যাতিতে ছাইয়া ফেলিলেন। পাঠক এ মন্তব্য পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। রাজা গুরুদাসের নিয়োগ সময়ে যখন হেষ্টিংস সমস্ত সভ্যগণের তাঁহার (গুরুদাসের) নিয়োগ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে নিজ মত প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি নন্দকুমারকে এই প্রভুভক্তির জন্য মুক্তকণ্ঠে অশেষ প্রসংশা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত নিন্দা বাক্য হইতে এ প্রশংসা বাক্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। ইহাদের দুইটিরই মূলে দুটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, এই দুইটির সামান্য তুলনায় একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। হেষ্টিংসের এই প্রকার কার্য্য তাঁহার নিকট আশ্চর্য্য ও সন্দেহোৎপাদক না হইলেও, আমাদের মনে নানাবিধ কূটতর্কের ও সন্দেহের উদ্রেক হয়। ইংরাজিটি দেখিলে পাঠক হেষ্টিংসের মনের ভাব সম্যক বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা ইহার আবশ্যকীয় অংশ অবিকল তুলিয়া দিলাম। *

---

* He has never been charged with any instance of infidelity to the Nabob Mirjaffer; the constant tenor of whose politics, from his first accession to the Nizamut till his death, corresponded in all points so exactly with the artifices which were detected in his minister, that they may be as fairly ascribed to the one, as to the other; their immediate object was beyond question, the aggrandizement of the former, though the latter had ultimately an equal interest in their success. The Opinion which the Nabob himself entertained of the services and of the fidelity of Nundkumar, evidently appeared in the distinguished marks, which he continued to show him of his favour and confidence to the latest hour of his life. His conduct in the succeeding administrations appears not only to have been dictated by the same principles but if we may be allowed to speak

হেষ্টিংসের এই মন্তব্যে তিনি নন্দকুমারের চরিত্র অতি উজ্জ্বল ও পবিত্ররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এ চিত্র বঙ্গবাসীর দেখিবার জিনিস বটে। বাঙ্গালী যে এক সময়ে এই প্রকারে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন কার্য্যে প্রভূত ক্ষমতা চালনা দ্বারা দেশের রাজাকে (নবাব) সাহায্য করিতেন, বা তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত দেশ শাসন করিতেন, ইহাতে বাঙ্গালীরই প্রভূত রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হেষ্টিংস যখন এই মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ভাবে ছিল। তাঁহার মনে তখন শান্তি ও উচ্চ আশার মিশ্র-স্রোত বহিতেছিল। যদি নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে হেষ্টিংসের লিখিত কোন প্রকার মত আমাদের গ্রাহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা এই সময়ের মন্তব্যটীকেই প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইব। এই মন্তব্যে তিনি নন্দকুমারকে প্রভুভক্ত, প্রভুর মঙ্গল-কামনায় একান্ত চিত্ত, তাঁহার স্বাধীনতা বর্দ্ধনে ও ক্ষমতারক্ষণে সর্ব্বদা ইচ্ছুক—এই প্রকার বিশেষণ দ্বারা উচ্চ দরের চরিত্র প্রদান করিয়াছেন। নন্দকুমার জীবনে কখনও মীরজাফরের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই, ও নবাব তাঁহাকে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বলিয়া ভাবিতেন ইহাও তিনি বলিয়াছেন। উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে—হেষ্টিংসের নিজের পক্ষে—যাহা গৌরবময় ও স্পৃহনীয়, মহারাজা নন্দকুমার তাহার সমস্তই করিয়াছেন। হেষ্টিংস বরঞ্চ পার্লামেণ্ট সভায়, প্রভু কার্য্যে অবহেলা জন্য ও কোম্পানীর স্বার্থ হানি জন্য সামান্য অপরাধীর ন্যায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। যে ডাইরেক্টার সভা ব্যগ্রভাবে ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় তাঁহাকে ভারতের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারাই শেষে তাঁহার কার্য্যে সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত করিতে ছাড়েন নাই। হেষ্টিংস নিজে নন্দকুমারকে যে প্রকার আদর্শ রাজপুরুষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, নিজে সেই প্রকার হওয়া বা তাহার কাছে যাওয়া দূরে থাকুক—তাহা অপেক্ষা শতগুণে অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নন্দকুমারের কার্য্যের ফল—প্রভুর রাজপ্রসাদ, দেশের লোকের সম্মান

---

favourably of any measures, which opposed the views of our own government, and aimed at the support of an adverse interest, *surely it was not only not culpable but praiseworthy.* He endeavoured as it appears by the extracts before us to give consequence to his master, and to pave the way to his independence by obtaining a Firman from the King for his appointment to the Subaship ; and he opposed the promotion of Mahamud Reza khan because he looked upon it as a suppression of the rights and authority of the Nabob. He is now an absolute dependant and subject to the Company, on whose favour he must rest all his hopes of future advancement.

Vide—Bengal Narrative, P. 250. The Minute of the Com. of Circuit at Cassimbazar, Dated 28th of July.

ও ভক্তি, স্বজাতির মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ ও শুভকামনা। হেষ্টিংসের কার্য্যের ফল—প্রভুদের অসন্তুষ্টি ও অবিশ্বাস, দেশের লোকের অশ্রদ্ধা ও অবহেলা, ও স্বজাতির যশঃ ও নাম গৌরব কলঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া শত শত বিদ্রূপ ও অভিসম্পাত বাক্য। উভয়ের চরিত্র ও রাজনৈতিক জীবনের কি আশ্চর্য্য অসামঞ্জস্য! এপ্রকার স্থলে হেষ্টিংসের নিজের লেখাকেই নজীর করিয়াই তবে কি আমরা মহারাজা নন্দকুমারকে উচ্চ দরের রাজনৈতিক চরিত্র দিতে পারি না? তুলনার সমালোচনে বোধ হয় অবশ্য পারি। মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংস অপেক্ষা উচ্চদরের ও বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছিলেন, হেষ্টিংস স্বীয় কার্য্য দ্বারা বুদ্ধির দোষে দেশের অগৌরবের স্থল হইয়াছিলেন—কিন্তু নন্দকুমার তাঁহার কার্য্য দ্বারা (তাঁহার কয়েকটী দেশীয় প্রতিযোগী ছাড়া) ছোট বড় সকলেরই নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি শত বৎসর পূর্ব্বে দেশের জন্য যাহা কিছু করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী জাতি তাহা আজও বংশাবলীক্রমে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া আসিতেছে ও তাঁহাকে ভক্তির আসনে বসাইয়া বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বোচ্চ কোমল মনোবৃত্তিসকল দ্বারা তাঁহার পূজা করিতেছে।

যে সময়ে মহম্মদ রেজা খাঁর অভিযোগের বিচার চলিতেছিল, যে সময়ে কুমার গুরুদাসের নবাব সরকারে উচ্চপদে নিয়োগ সম্বন্ধে হেষ্টিংসের মন্তব্য বাহির হইল, সেই সময়ে তাঁহার গ্রেহাম-প্রমুখ সঙ্গীগণ নন্দকুমারের পুত্রের এই রাজকার্য্যে নিয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বাধা দেন। তাঁহারা বলেন—নন্দকুমার নিজে চক্রান্তকারী ও দুষ্ট বুদ্ধির লোক, তাঁহার পুত্রকে উচ্চ কর্ম্মে নিয়োগ করিলে প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই ক্ষমতা বজায় থাকিবে। হেষ্টিংস কিন্তু এ ঘোরতর আপত্তির কথা শুনিলেন না, নন্দকুমারের চরিত্রের উৎকর্ষতা দেখাইবার জন্য উল্লিখিত দীর্ঘ মন্তব্য লিখিলেন। এই প্রধান আপত্তিকারী গ্রেহামসাহেবকে পাঠক কি জানেন? ইনি মহারাজা নন্দকুমারের চিরশত্রু—বৰ্দ্ধমানের রাজসংসারে ও অন্যান্য দুই এক স্থলে হেষ্টিংসের এজেণ্ট স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। নন্দকুমার ইহার প্রকৃত চরিত্র জানিতেন, সুতরাং ইহার প্রত্যেক অন্যায় ও কলুষিত কার্য্যের বিরুদ্ধে বাধা দিতে সাধ্য মতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সময়ে হেষ্টিংস মোহনপ্রসাদকে লইয়া নন্দকুমারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ করেন, সেই সময়ে মহারাজা নন্দকুমার গ্রেহামসাহেবকেও এই ব্যাপারে লিপ্ত দেখিয়াছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রের এক স্থলে লিখিয়াছেন—"আমি গবর্ণরের বাটীতে গিয়া দেখিলাম আমার পরম শত্রু গ্রেহাম সাহেব গবর্ণরের সহিত একত্রে বসিয়া কি মন্ত্রণা করিতেছেন।" যে গ্রেহাম নন্দকুমারের চিরশত্রু, সে যে তাঁহার পুত্রের নিয়োগ কার্য্যে বাধা দিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

নন্দকুমারের শত্রু পক্ষীয়েরা তাঁহার বিরুদ্ধে "চক্রান্তকারী" বলিয়া একটা রব তুলি-

য়াছেন। আত্ম ক্ষমতা ও সেই সঙ্গে প্রভুর পদ মর্য্যাদা, বৈদেশিক ক্ষমতা গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা যদি "চক্রান্ত" হয়—রাজনীতি কৌশল যদি দুষ্ট মন্ত্রণা হয়—সেই ভীষণ সময়ে, সেই বিশৃঙ্খলার সময়ে, সেই অর্দ্ধ অরাজকতার সময়ে—যদি স্বীয় পদোচিত প্রাধান্য রক্ষণ কৌশল—"কুটিল চক্রান্ত" বলিয়া কথিত হয়,তবে নন্দকুমারের ন্যায় অনেক ইংরাজ গবর্ণর ও প্রধান কর্ম্মচারীরাও এই প্রকার কত শত চক্রান্ত করিয়াছেন। নন্দকুমারের বিরুদ্ধে "চক্রান্তকারী" এই দুর্নামের অপ্রয়োগতা ও অপ্রাকৃততা প্রমাণ করিয়া হেষ্টিংসের সম-সাময়িক কোন উচ্চদরের ইংলণ্ডীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি বলিয়াছেন—দেখুন। তিনি হেষ্টিংসের উল্লিখিত দীর্ঘ মন্তব্যকে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"হেষ্টিংস এই মন্তব্য দ্বারা নন্দকুমারের চরিত্রের প্রকৃত অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন—তাঁহার প্রাপ্য অংশই তাঁহাকে দিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সেই প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ে তিনি যে তাঁহাদের ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের পাত্র হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই মনোযোগের সহিত দেখিবেন—তাহার আর সন্দেহ কি? তাঁহারা নন্দকুমারকে অন্য যাহা কিছু বলুন না কেন, কোন প্রকার নিন্দনীয় ও অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া দিতে বা তাঁহার চরিত্রকে কালিমাময় করিতে সাহস করেন নাই। সেই সময়ে বাঙ্গলায় দুই দল লোক নিজ নিজ ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে একদল কোম্পানীর পক্ষায়, অপর দল দেশীয় ক্ষমতার সমর্থক। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে দেশ মধ্যে কোম্পানীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে ছিল, সুতরাং অপর পক্ষীয়েরা সেই ক্ষমতায় বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বিরুদ্ধউদ্দেশ্য-চালিত উভয় পক্ষের সংঘাতী কৌশলে যখন প্রচণ্ডাঘাত হইত, তখন বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। কোম্পানী জোর করিয়া দেশীয় ক্ষমতা লোপের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কার্য্য করিতেন, দেশীয় ক্ষমতার সমর্থক লোকেরা তাঁহাদের অপেক্ষা ক্ষমতায় দুর্ব্বল হইলেও, তাহার বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিত। সেই সময়ে দেশীয় ক্ষমতার বিশৃঙ্খল অবস্থা—সুতরাং তাহা নিতান্ত অপরিণত ও শৈশবভাবযুক্ত। যখন কোম্পানীর পরিণত ও পরিপুষ্ট ক্ষমতা আসিয়া ইহার বিরুদ্ধে আঘাত করিত, তখন দেশীয় প্রাধান্য রক্ষকেরা প্রথমতঃ বল দ্বারা বা তাহার ব্যর্থতায়, কৌশল দ্বারা সেই আঘাত ব্যর্থ করিবার চেষ্টা পাইতেন। দুর্ব্বলের শারীরিক বলের অভাব কৌশলের জোরেই পূরণ হইয়া যায়। দেশীয় গবর্ণমেণ্ট ও রাজকর্ম্মচারীরা সেই সময়ে কোম্পানীর তুলনায় দুর্ব্বল। কোম্পানীই তাহাদের সেই দুর্ব্বল ও চঞ্চল ক্ষমতার উপর নানাবিধ অসঙ্গত দাবি দাওয়ার প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহাদের সেই প্রকার দশা করিয়াছিলেন। দেশ হিতৈষিতা তখনও তাহাদের ধমনীতে খরভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। বিদেশীয় শাসনকর্ত্তাদের প্রতি তাহাদের আদৌ আস্থা ছিল না—সুতরাং তাহাদের

বর্দ্ধিষ্ণু ক্ষমতা সংযত করিবার জন্য তাহারা নানা চেষ্টা করিত। যখনই তাহারা এই দেশ-হিতৈষিতা দেখাইবার সুযোগ বা অবসর পাইত—তখনই বলে বা কৌশলে তাহা সম্পন্ন করিত। আমরা এই ব্রিটন দ্বীপে একচ্ছত্রা শাসনের মধ্যে বাস করিতেছি—ইহার ত আর কেহ প্রতিদ্বন্দী নাই। আমাদের ন্যায় স্বাধীন ও সুশৃঙ্খল দেশের প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা রাজনৈতিক সকল কার্য্যই প্রকাশ্যভাবে ও বিনা গোপনীয় মন্ত্রণায় সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু তত্রাপি আমাদের এই শান্তিময় দেশে এত বিভিন্ন উদ্দেশ্যমুখী ভিন্ন ভিন্ন দলের গোপনীয় মন্ত্রীসমাজ কেন স্ব স্ব দলের প্রভুত্ব রক্ষা জন্য এত গোপনে মন্ত্রণা করিতেছে? এ শান্তির ক্রীড়াভূমিতে—এই একচ্ছত্রা রাজত্বে—তবে এত দলাদলির প্রাদুর্ভাব কেন? সেই ঘোর বিশৃঙ্খলার সময়—সেই ঘোর অরাজকতার সময়—বঙ্গদেশেও যে এই প্রকার দলাদলি আরম্ভ হইবে,তাহার আর বিচিত্র কি? সুতরাং সেই সময়ে বাঙ্গালায়ও ভিন্ন ভিন্ন দলে স্ব স্ব স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিত। তজ্জন্য তাহাদের দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। ইহাই রাজনৈতিক জগতের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম। হেষ্টিংস নন্দকুমারকে দেশীয় প্রাধান্য রক্ষার প্রধান উদ্যোগী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নন্দকুমার তাঁহার দেশীয় প্রভুর কার্য্যে বিশ্বস্ত—তাঁহার অমানুষিক চেষ্টা—প্রভুর ক্ষমতাবর্দ্ধন। তিনি নবাবকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুখাপেক্ষী না করিয়া নবাব নামের প্রকৃত মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস এই জন্য তাঁহার সম্বন্ধে একস্থলে বলিয়াছেন—"ইহাতে নন্দকুমারের চরিত্র যে কেবল নির্দ্দোষ ভাবাপন্ন তাহা নহে, তাহার কার্য্য নিতান্ত গৌরব-প্রণোদিত।" * বোধ হয় এই মহা সভার কোন সভ্য বা কোন প্রকৃত ইংলণ্ড সন্তান এই বিষয়ে নন্দকুমারের সম্বন্ধে হেষ্টিংসের মত অপেক্ষা কোন বিভিন্ন মত দিতে পারিবেন না।" †

আমরা সংক্ষেপে ইলিয়ট সাহেবের বক্তৃতার মর্ম্মাংশ যাহা উপরে তুলিয়া দিয়াছি, পাঠক তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারিবেন নন্দকুমারকে কি জন্য চক্রান্তকারী বলিয়া তাঁহার শত্রুপক্ষ অভিযুক্ত করিয়াছেন। সেরাজের বিরুদ্ধে—জগৎশেঠ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, নবাব মীরজাফর, রাজা রায় দুর্ল্লভ প্রভৃতির চক্র, বা উমিচাঁদের বিরুদ্ধে ক্লাইবের চক্রান্ত অনেক ইংরাজ আদতে চক্রান্ত বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইহাঁদের

---

* সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক হেষ্টিংসের এই সময়ের মন্তব্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"The character here given to him (Nundkumer) is that of an excellent Patriot. The character of a servant who stuck to his master against all Foreign encroachments, who stuck to him to the last hour of his life and had the dying testimony of his master to his services."

Vide—Burke's Speeches, in the Impeachment of W. Hastings.

† Vide—Sir Guilbert's speech in the Impeachment of Sir Elizah Impey before the House of Commons.

সহিত তুলনায় নন্দকুমারের নামে কোন মতেই ঐ প্রকার কলঙ্কারোপ করা যাইতে পারে না। তিনি সাধ্যমতে অনেক দুষ্ট ইংরাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা তাঁহার নামে এই প্রকার বৃথা গ্লানি করিয়াছেন। ইংরাজেরা নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বজাতির কথা শিরোধার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহা করিব না। সেই অন্ধকারময় সময়ের সমস্ত ঘটনাই মনুষ্য-হস্ত-চিত্রিত সিংহ মূর্ত্তির ন্যায় বিকৃত ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ইংরাজের যেমন লিখিত বিবরণ আছে, যদি সেইরূপ মহারাজা নন্দকুমারের বা সেই সময়ের কোন বাঙ্গালীর বা হিন্দুর লিখিত কোন লিখিত বিবরণ আজও বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহাপেক্ষা ঘটনাবলী অন্যভাবে চিত্রিত দেখিতাম।

(ক্রমশঃ।)

উদাসিনী।

১

ভাবের কোলে ডুবে আছে
কোমল প্রাণের ছায়া;
মরম-গান গেয়ে গেয়ে
ঢুলি পড়ে কায়া।

২

সাঁজের বায় ঝুরু ঝুরু
কঠিন পরশ প্রাণে;
আদরের কথা যথা
প্রেমের অভিমানে।

৩

সাঁজের বেলায় কে তুমি গো
ব'সে নদীতীরে?
পবন চুমি মৃদু মৃদু
ব'হে যায় ধীরে।

৪

কেশের রাশি কাল কাল
পড়িয়াছে মুখে;
তুমিই কি গো সন্ধ্যা দেবী
সাঁজের আকাশ বুকে?

৫

মুখটী রাঙা টুকটুকে
প্রেমের মোহন ছবি;
সাঁজের তারা তুমিই কি গো?
নীলাকাশের কবি!

৬

শিথিল সাজে এলোথেলো
লুটায় শিথিল প্রাণ;
রাখিয়া গেছে ভালবাসা
নিজের প্রতিমাণ।

৭

শিখর হ'তে হৃদয়ের
প্রেমের ঝরণা ঝরে ;—
স্মৃতির স্রোতে মিশে শত
অতীত-সাগরে।

৮

উঠিয়াছে কোন্ ভাব ?
কেন উদাসিনী ?
প্রেমছায়ে আধমগনা
যেন মহান মুনি !

৯

কোলে প'ড়ে আছে বাঁশী
গাহে না আর গান ;
মৃণাল-করে বাজেনাতো—
বীণার মধু তান।

১০

বাসিয়াছ ভাল কারে ?—
কোন্ স্বপনের লোক ?—
কোন জগতে গিয়েছে সে—
কোথায় পেতে শোক ?

১১

পাখীর মত মর্ম্মাহত
ব'সে ভাঙা বনে !
জ্যোৎস্না ঝরা বায়ু বহে
চাহ শূন্য পানে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যাত্রা।

ভোরের বেলার বাঁশীর স্বর শুনিয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছি। অস্ফুট স্থর্য্য কিরণে সেই বাঁশীর স্বরের উপর একটী মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতদিন শুধু লোকের মনে একটা অস্থির আশামাত্র ছিল, এখন সেই আশা সপ্তমীর উষালোকে প্রথম বিভাসিত হইল। এ নিরাশার দেশে লোকের প্রাণ খুলিয়া আশা করিবার যো নাই—মুহূর্ত্তে প্রাণের আশা শুকাইয়া যাইতে পারে। আশা করিবারও আমাদের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। আমাদের আশাপূর্ণ ভাবের মধ্যে একটা নৈরাশ্য—একটা মরীচিকা। বাঙ্গালী হৃদয়ের উদারতায় ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া ক্ষুদ্রত্বের দুয়ারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনার গর্ব্ব করিতেছে—চতুর্দ্দিকে শুধু এই দৃশ্য।

আমরা চলিয়াছি—পশ্চাতে একটা কোলাহলময় আশা-নিরাশাময় ভাব ফেলিয়া রাখিয়া, প্রকৃতির শ্যামল শোভার মধ্য দিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের চারিদিকে মেঘ কাঁদিয়া ফিরে, বায়ু গাহিয়া যায়, স্বপ্ন ঝরিয়া পড়ে। অতীতের ক্ষীণালোকে আমরা ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া রহিয়াছি—একটা দূর শুভ মুহূর্ত্তের ছায়ার অপেক্ষা করিতেছি। সহসা ভোরের বাঁশী থামিয়া গেল——দেখিলাম যে এই

বাঁশীর স্বরে চড়িয়া বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে একটা অপরিচিতের মধ্যে পরিচিতের ভাব—পুরাতনের মধ্যে নূতনত্ব—বিস্মৃতির মধ্যে স্মৃতি।

এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় মনটা কি রকম উদাস উদাস হইয়া পড়িত—মনের উপরে একটা দূরব্যাপী ঘুমন্ত স্বপ্নের ছায়া পড়িয়া তাহাকে উদাসী করিয়া তুলিত। 'দূর বৃক্ষাবলীর মধ্য দিয়া কল্পনার মত আমার প্রাণে কি যেন আসিয়া আঘাত করিত—আমার চক্ষের সম্মুখে কলিকাতার একটী প্রাচীন কুটীরের ছবি ফুটিয়া উঠিত। সেখানে যেন একটা অস্থির স্থিরতা—শত বৎসরের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে বর্ত্তমানের নূতনত্বের একটা আব্‌ছায়া রকম সংযোগ—স্মৃতি বিস্মৃতির নীরব কোলাহলের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণ মন। কলিকাতার এই সংযোগ বিয়োগময় ভাবের মধ্যে গঙ্গা তরঙ্গের এক রকম প্রাণময়, প্রেমময়, ছায়াময় স্বপন মিশাইয়া প্রাণের মধ্যে একটা গভীর প্রাণ—আত্মার মধ্যে একটা গভীর আত্মা—মরণের মধ্যে একটা জীবনের ছায়া ফুটাইয়া দিত। এখানকার রামধনুর পূর্ণভাবময় ছায়া—ধরণী তাহার জ্যা। কলিকাতার অসম্পূর্ণ রামধনুর সহিত এখানকার রামধনুর কেমন একটা বিভিন্নতা। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেও ঐক্য। এই রামধনুর মধ্যে সেখানকার রামধনুগুলি স্মৃতির আকারে বর্ত্তমান।

কলিকাতার ন্যায় এখানেও জীবনের অনেক ঘটনা সাজাইয়া গিয়াছি। সেই জন্য এখান দিয়া যাইতে হইলে খানিকটা করিয়া পুরাতনের স্মৃতি জাগিয়া উঠে—বিস্মৃতির ঘুমন্ত ভাবের মধ্যে একটা অস্ফুট সজীবতা দেখা দেয়। এখানকার গঙ্গায় অনেক দিন অনেক মালিন্য প্রক্ষালন করিয়াছি, তাহারা হয়ত জগতের মহান্ স্রোতে ভাসিয়া গিয়া কত কত দূর হইতে দূরতর দেশের বালুকাময় বেলাভূমি চুম্বন করিয়া আবার এক দিন ঘুরিতে ঘুরিতে এইখানে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের তলায় আসিয়া আট্‌কাইয়া যাইবে। এখানকার রাস্তা ঘাটে আমার সহস্র জীবন্ত পদচিহ্ন বসিয়া গিয়াছে। তাহারা অস্ফুটভাবে আমার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অস্ফুটাকারেই মিলাইয়া যায়।

এখানকার সঙ্গে কলিকাতার কি একটা মহাযোগ আছে। এখানকার প্রত্যেক বস্তুতে খানিকটা করিয়া কলিকাতার ধূলার চিহ্ন। এখানে মধ্যে মধ্যে যে দু'এক খানা ষ্টীমার যায়, তাহারা সেখানকার রাজ্যশুদ্ধ ধোঁয়া এইখানে ছাড়িয়া দিয়া যায়—প্রকৃতির শ্যামল ক্রোড়ে তাহাদের ধূমময় উষ্ণ নিশ্বাসের খানিকটা করিয়া কয়লার গুড়া ছড়াইয়া দিয়া যায়। এখানকার নৌকার পালে খানিকটা যেন মহানগরীর বাতাস লাগিয়া থাকে। এখানে যাহারা বাস করে, তাহাদের অনেকেরই মুখে খানিক খানিক কলিকাতার ধূলা, খানিক খানিক রাজধানীর ছায়া দেখা যায়।

আমি শুধু এখানে নদীর ধারে বসিয়া থাকিতাম—বসিয়া বসিয়া ঢেউ গণিতাম—মধ্যে মধ্যে উপরের আকাশ দিয়া দু'একখানি ছোট ছোট মেঘের টুকরা ভাসিয়া যাইত—আমার মনে হইত যে উহারা বুঝি কোন্ দূর দেশ হইতে আমার জন্য কি সম্বাদ লইয়া

আসিতেছে। মেঘেরা বলিয়া যাইত—আমার প্রাণে খানিকটা সন্ধ্যাময় ভাব পড়িয়া থাকিত।

সেই এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা উত্তর বাতাস বন্ধ হইয়া গেল—প্রবলবেগে দক্ষিণা-বায়ু বহিতে লাগিল। ফেনময় তুফানে তুফানে নদীর ফুটন্ত প্রাণ পূরিয়া গেল। সে সময়ে মাঝিদের কি আনন্দ! তাহাদের আনন্দময় কোলাহলে, বাতাসের সন্ সন্ শব্দে, পাল তোলা নৌকাদের অহঙ্কারময় গতিতে, এবং নদীতরঙ্গের কল্লোলময়ী কাহিনীতে একটা যেন মহা মহোৎসব পড়িয়া গেল। চারিদিকেই একটা উৎসাহ—চারিদিকেই একটা আনন্দের ফুটন্ত ভাব। গাছে পাতায় কুটীরে একটা নব আনন্দের—নূতন উৎসাহের জ্যোতি।

এখানকার মুক্ত বায়ুতে একটা মুক্তভাব। কলিকাতার দলাদলিময় দ্বেষ-হিংসাপূর্ণ সমালোচনার পরিবর্ত্তে এখানে কেমন শান্তি—এখানে কেমন নিস্তব্ধতা। সেখানকার বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর—সেখানকার মহামহা সংবাদপত্রের মিথ্যা কথার স্তূপ এখানে যেন আসিয়াও আসিতে পারে না। এখানে একটা প্রকৃতির শান্ত শিষ্ট কোমল ভাব। সেখানে শুধু ছ্যাঁকড়াগাড়ীর আড়ম্বর-পূর্ণ কোলাহল।

কিন্তু এই মহা আড়ম্বরময় নূতনত্বের মধ্যেও একটা প্রাচীনত্ব আছে—সেখানকার অশান্তিময় ভাবের মধ্যেও খানিকটা শান্তির ভাব আছে। দূর স্মৃতির মধ্যে তাহার একটা মাধুর্য্য—আরও দূর বিস্মৃতির মধ্যে তাহার আরও মাধুর্য্য। সেখানকার অনেক জিনিষেই খানিকটা করিয়া স্মৃতি জাগিয়া আছে, খানিকটা বিস্মৃতি ঘুমাইয়া আছে।

এখানকার গাছ পালায় কেমন একরকম ঔদাস্যের ভাব—বৈরাগ্যের ছায়া। সহরে শুধু বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। সেখানে শুধু বিলাস—সেখানে শুধু অহঙ্কার—সে-খানে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাব। আর এখানকার কি অসীম উদার ভাব! এখানে জগতের মহান্ প্রেমের ছায়া পড়িয়াছে।

এই প্রেমের শান্তিময় ভাবের মধ্যে ডুবিতে পারিলে আমাদের ক্ষুধিত হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়—আমাদের পাষাণ-অন্তঃকরণের পাষাণত্ব চলিয়া যায়—অনন্ত আনন্দের বিমল ছায়ায় আমাদের প্রাণ মন ভরিয়া যায়।

সেই যখন ধীরে ধীরে ওপারের সন্ধ্যা-দীপগুলি জ্বালিয়া উঠিত—টুপটাপ্ করিয়া সাঁঝের অকাশ হইতে দু'একটী ঘুমন্ত তারকা পৃথিবীর বক্ষে খসিয়া পড়িত, আর ঐ দূর শ্মশান ক্ষেত্রের একপ্রান্তে এক একটী অহঙ্কারের প্রতিমা পশ্চাতে শুধু একটা ক্ষণিক কান্নার রোল উঠাইয়া নির্ব্বাণ প্রায় চিতাগ্নিতে মানব জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জন দিয়া প্রবাসীর মত চলিয়া যাইত, তখন মরমের মধ্যে মরণের সৌন্দর্য্যটুকু কেমন ফুটিয়া উঠিত।

আর সেই যখন মাঝিবর শম্ভুনাথ তাঁহার সুকোমল কোকিল-কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল মাতাইয়া

দুই চারিটী সুললিত রাগ রাগিণী আলাপে মগ্ন থাকিতেন—তাঁহার পবিত্র একতারায় বারকতক বীরোচিত ঝঙ্কার দিয়া বত্রিশপাটী রাণীগঞ্জের হৃদয়-বিদারক দন্ত বাহির করিয়া তিনি যখন "মন মাঝিরে সামাল সামাল" বলিয়া তানসেনের তানকে লজ্জা দিতেন, তখন শ্রোতামণ্ডলীর কর্ণকুহর অতি পরিতৃপ্তি লাভে কেমন বধির হইয়া আসিত।

* * *

মেঘের উপর মেঘের রেখা পড়িয়া ধীরে ধীরে বিজয়া কাটিয়া গেল। বিজয়ার পর আরও কতদিন কাটিয়া গিয়াছে—সন্ধ্যার শুভ্র মেঘগুলির কোমল বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া কতদিনকার শেষ-সূর্য্যকিরণগুলি ঢেউয়ের মত মিলাইয়া গিয়াছে—কত স্বার্থের কীট এতদিন ধরিয়া ক্রমাগত ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া জ্বলন্ত হুতাশনে প্রাণ হারাইয়াছে।

সেই যে স্মৃতিময়ী ভোরের বাঁশী শুনিয়া সেদিন উষালোকে যাত্রা করিয়াছিলাম এতদিন প্রাণের মধ্যে সেই বাঁশীর স্বরের কি যেন অস্ফুট ছায়া পড়িয়াছিল, আজ সহসা তাহা নাড়া চাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল। সেই ছায়ার মধ্যে সেদিনকার শুষ্ক তারার ম্লানমূর্ত্তি শরতের ঘুমন্ত হাসির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে দিনকার সূর্য্যালোক—সে দিনকার স্মৃতি—সে দিনকার সেই শ্যামল-বসনা উষার প্রাণের কাহিনীগুলি মরমের চারিদিক ছাইয়া ফেলিল।

প্রাণে একটা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা শুনার আশা—কলিকাতার সেই প্রাচীন কুটীরের একটুকু প্রেমময় হাসির আলোক—আর বহুদিন পরে আবার সেই মৃদু মন্থর গমনশীল ছ্যাকড়া গাড়ীর কোলাহল শুনিবার একটা কৌতূহল। খানিকটা আশা হাসি কৌতূহল লইয়া মনটা বোঝাই হইল—তাহাতে আর কিছু ধরিবার রহিল না। কিন্তু এই সকল হাসি আশা কৌতূহলের মধ্যে একফোঁটা শুভ্র অশ্রুজল—মরমের কাহিনী ভাঙা সন্ধ্যার জ্যোছনাময় তটিনী চুম্বিত শীতলবায়ু সংযুক্ত একফোঁটা নীরব অশ্রুজল।

এই একটী ফোঁটা অশ্রুজলের মধ্যে মরমের ছিন্নতন্ত্রী বীণাধ্বনিত পুরাতন গীতগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে—কাহিনীময় জীবনের শেষ আশাগুলির উপরে একটুকু নৈরাশ্যের ছায়া পড়িয়া সেই ঘুমন্ত গানগুলিকে জাগাইয়া দিতেছে—ভগ্ন হৃদয়ের নিভ নিভ স্বপনের কোলে তাহারা মিলাইয়া যাইতেছে।

কল্পনার মত প্রাণের উপর দিয়া কি চলিয়া গেল। মনে হইল যে একটা অস্থিপঞ্জর যুগলটানিত পুষ্পকরথে চড়িয়া ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া চলিয়াছি। এতক্ষণের আকাশ পাতালব্যাপী ভাবটা সহসা একটা সামান্য খর্‌খরানি চাপা পড়িয়া মরিয়া গেল—চাহিয়া দেখিলাম যে সম্মুখে সেই স্মৃতিময় প্রাচীন কুটীর।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের সমন্বয়।*

কল্যাণাস্পদ শ্রীমান্ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় আমার লিখিত "দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া গত মাসের ভারতীতে একটি প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ মেধা ও শাস্ত্র দৃষ্টি—তিনি আপনি একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বরের একত্ব শুদ্ধ যে কেবল শূন্য-গর্ভ একত্ব, তাহা নহে, তাহা সমস্ত বৈচিত্র্যের মূল নিবন্ধন। মূল বৈচিত্র্য যাহা ঈশ্বরের একত্বের অন্তর্ভূত, তাহাকে কেহ বলেন "মায়া ও অবিদ্যা," কেহ বলেন "মূল প্রকৃতি," আবার লেখক নিজেই বলিয়াছেন "মায়া পরমেশ্বরের শক্তি;" আমরাও বলি যে, পরমেশ্বরের ঐশী শক্তিই জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের মূল—ও সে শক্তি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে; এখন, কথা এই যে, বৈচিত্র্য-সম্ভাবনার একটা মূল (যিনিই যে নামে বলুন্ না কেন—মায়া বলুন্—প্রকৃতি বলুন্—শক্তি বলুন্—নাম-ভেদে কিছুই আইসে যায় না—বৈচিত্র্য-সম্ভাবনার একটা মূল) ঈশ্বরের অন্তর্ভূত,এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি বল যে, একত্বই সত্য ও বৈচিত্র্য কেবল ভ্রান্তি-মাত্র; তবে জিজ্ঞাসা করি—সে ভ্রান্তি কাহার? হয় তাহা পরব্রহ্মের, নয় তাহা জীবের, নয় তাহা কাহারো নয়। ভ্রান্তি পরব্রহ্মের—ইহা তো হইতেই পারে না,—যিনি সকল ভ্রান্তির মহৌষধি তিনি যে, স্বয়ং ভ্রান্ত, ইহা হইতেই পারে না; ভ্রান্তি কাহারো নয় অথচ ভ্রান্তি—ইহাও অসম্ভব; সুতরাং ভ্রান্তি জীবের—এ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই; অতএব বৈচিত্র্যকে যদি ভ্রান্তি বল—তবে শুধু কেবল "ভ্রান্তি" বলিয়াই পার পাইতেছ না—তাহার সঙ্গে সেই ভ্রান্তির আশ্রয়-ভূত জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করা, পরব্রহ্মের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করা, প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে; এইরূপ, দ্বৈত এক দ্বার দিয়া বহিষ্কৃত হইবা-মাত্র তাহা আর-এক দ্বার দিয়া উপস্থিত হইতেছে,—কাজেই অদ্বৈত-বাদ আর অদ্বৈতবাদ থাকিতেছে না, ফলে দাঁড়াইতেছে—দ্বৈতবাদ। অবশেষে ঘোর

---

* সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান প্রস্তাবটির প্রতি প্রণিধান করিলেই আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি-বেন;—সে তাৎপর্য্য এই যে, যোগীই হউন্—আর, ভোগীই হউন্—আর যিনিই হউন্—তাঁহার জ্ঞানের সহিত আর-এক ব্যক্তির জ্ঞানের আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকিতে পারে—ইহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু তাহা বলিয়া—এটা কেহই স্বীকার করিতে পারিবে না যে, কোন জ্ঞানই আপনাকে-এবং-অন্যকে-জানা বর্জ্জিত, অথবা যাহা একই কথা—কোন চতুষ্কোণই চারি-কোণ-বর্জ্জিত। আপনাকে জানা এবং অন্যকে জানা যে, একই জ্ঞানের এপিট ওপিট, ইহা আমি পূর্ব্ব প্রস্তাবে জলের ন্যায় স্পষ্ট করিয়া প্রমাণ করিয়াছি; সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক।

অদ্বৈতবাদীকেও অগত্যা স্বীকার করিতে হয় যে, (প্রতিবাদী যেমন বলিয়াছেন) "আসল কথাটা এই যে, পরমেশ্বর অনন্তরূপে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই।" এখন, বক্তব্য এই যে, পিছন দিক্ হইতে পেঁচাইয়া নাকে হাত দেওয়া অপেক্ষা সম্মুখ দিয়া নাকে হাত দেওয়াই শ্রেয়;—বৈচিত্র্যকে এক দ্বার দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া আর এক দ্বার দিয়া ঘরে আনা অপেক্ষা—গোড়া হইতেই তাহাকে ঘরে আনা শ্রেয়;—একেবারেই এইরূপ বলা শ্রেয় যে, ঈশ্বরের একত্ব শূন্য-গর্ভ একত্ব নহে কিন্তু বৈচিত্র-গর্ভ একত্ব; আর, ঈশ্বর আপনার অভ্যন্তর-স্থিত বৈচিত্র্যের বীজকে আপনার ঐশী-শক্তি দ্বারা জগৎ রূপে বিকসিত করিতেছেন—ইহাই সৃষ্টি। বেদান্তে উক্ত হইয়াছে যে, মাকড়সা যেমন আপনার অন্তর্ভূত উপাদান হইতে আপনি স্বেচ্ছা-ক্রমে জাল বিস্তার করে, ঈশ্বর সেইরূপ আপনার অভ্যন্তর হইতে সৃষ্টি উদ্ভাবন করেন। আসল কথা এই যে, ঈশ্বরের শক্তি অবশ্য ঈশ্বর হইতে অভিন্ন; কিন্তু জগৎ—যাহা সেই শক্তির কালিক আবির্ভাব—তাহাকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলা ভয়ানক একটি দোষের কথা; জগৎকে ঈশ্বর বলিলে তাহাতে প্রকারান্তরে দাঁড়ায়—ঈশ্বর এবং তাঁহার অসীম শক্তি জগতে সম্পূর্ণরূপে পর্য্যবসিত। বেদান্ত-শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ঈশ্বরের শক্তির এক-পাদ মাত্র জগতে ব্যয়িত হইতেছে—অবশিষ্ট তিন পাদ জগতের অতীত (অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপাশ্রিত)। কিন্তু জগৎকে ঈশ্বর বলিলে দাঁড়ায় এই যে, ঐশী শক্তির চতুষ্পাদই—এক কথায় স্বয়ং ঈশ্বরই—জগৎরূপে পরিণত;—ইহা শ্রুতি এবং জ্ঞান উভয়েরই বিরোধী। ঈশ্বর কালাতীত পুরুষ—জগৎ তাঁহার কালিক প্রতিরূপ,—সুতরাং তাঁহার কালাতীত স্বরূপ হইতে তাঁহার কালিক প্রতিরূপ যে ভিন্ন ইহা বলা বাহুল্য;—অথচ—সেই স্বরূপ এবং প্রতিরূপের মধ্যে অতীব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ-সূত্র বিদ্যমান; যেহেতু প্রতিরূপ সে—স্বরূপেরই প্রতিরূপ। এইরূপ একদিকে ঈশ্বর এবং জগতের ভিন্নতা এবং আর-একদিকে উভয়ের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—দুইই আমার শিরোধার্য্য;—আমার নিজের মত যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী;—(১) ঈশ্বরের ঐশী-শক্তি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন এই হিসাবে আমি অদ্বৈতবাদী; (২) এই জগৎ—যাহা ঈশ্বরের কালিক প্রতিরূপ—তাহা তাঁহার কালাতীত স্বরূপ হইতে ভিন্ন, এই হিসাবে আমি দ্বৈতবাদী; (৩) ঈশ্বরের কালিক প্রতিরূপ তাঁহার কালাতীত স্বরূপের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ—এই হিসাবে আমি দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী। এই গেল আমার নিজের মত। ভারতীতে আমি যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছিলাম—তাহাতে (দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর নহে কিন্তু) একজন ঐকান্তিক অদ্বৈতবাদীর অবতারণা করিয়া দ্বৈতবাদীর নিকট তাঁহার পরাভব মানাইয়াছিলাম। ঐকান্তিক অদ্বৈতবাদী যিনি কোন হিসাবেই দ্বৈত মানেন না—আমার প্রস্তাবটি তাঁহারই বিরোধী; কিন্তু কোনও হিসাবে যিনি দ্বৈত মানেন—তাঁহার সহিত আমার কোন বিবাদ নাই।

কিন্তু মোহিনীমোহনের এ কথার অর্থ কি আমি বুঝিতে পারিলাম না—"ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রুতিরাশি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে—ব্রাহ্মসমাজ হেতুবাদী।"—শুধু কি ব্রাহ্মসমাজই হেতুবাদী? শঙ্করাচার্য্য কি হেতু-প্রদর্শন করেন নাই? রামানুজাচার্য্য কি হেতু-প্রদর্শন করেন নাই?—এ কথা কিরূপ কথা! বেদান্ত-দর্শন আদ্যন্ত হেতুতে হেতুতে আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন! তবে কি না—দর্শনকার বলেন যে, তাঁহার হেতুবাদ শ্রুতির অনুকূল; গৌতম যিনি পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করেন—তিনিও বলেন ঐ! অথচ শঙ্করাচার্য্য এবং গৌতমের মতের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ!! ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ড আদ্যোপান্ত শ্রুতিরাশি ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহারই নাম কি শ্রুতি-রাশির প্রত্যাখ্যান!!! ঐকান্তিক অদ্বৈতবাদী শ্রুতির যেরূপ এক-দিক্-ঘেঁসা অর্থ করেন—শ্রুতি সেরূপ এক-দিক্-ঘেঁসা নহে;—দ্বৈতবাদী—অদ্বৈতবাদী—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী—সকলেই একই শ্রুতি হইতে রসাকর্ষণ করিতেছে;—শ্রুতি সকলেরই সাধারণ মাতা; শ্রুতি যেমন বলেন "ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং" তেমনি বলেন "তে ধ্যান-যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্ম-শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং॥" ইহার অর্থ এই—সাধকেরা ধ্যান-যোগের অনুবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন—দেবাত্ম-শক্তি আপন গুণ-সমূহে নিগূঢ়। ব্রাহ্মদিগের যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে তবে তাহা এই যে, তাঁহারা শ্রুতির এক-দিক্-ঘেঁসা অর্থ করেন না—সর্ব্ববাদী-সম্মত অর্থ করেন;—ইহারই নাম কি শ্রুতির প্রত্যাখ্যান!!!!

আমি ব্রাহ্মসমাজের দোহাই দিয়া ভারতীতে দ্বৈতাদ্বৈতের প্রস্তাব লিখি নাই—আমি সম্পূর্ণরূপে আমার আপনার ঝুঁকিতে তাহা লিখিয়াছি,—সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ আমার প্রকাশিত মতামতের জন্য কোন অংশেই দায়ী নহে—তাহার জন্য আমি নিজেই কেবল দায়ী। কিন্তু শ্রীমান্ মোহিনীমোহন যদি পরের মতামতের বোঝা আমার স্কন্ধে চাপাইয়া আমাকে তাহার জন্য দায়ী করিতে চা'ন—তবে আমি স্পষ্টই বলিতেছি যে, আমি তাহার জন্য কোন অংশেই দায়ী নহি; যথা;—তিনি লিখিয়াছেন "পূজনীয় লেখক মহোদয় এই আভাস-চৈতন্যকে মুখ্য চৈতন্য বলিয়া মানিয়া লইয়া দেখাইয়াছেন যে, যদি উপাধি অর্থাৎ বিষয় না থাকে, তবে উপহিত চৈতন্য থাকিতে পারে না;" আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমার অভিপ্রায় আমি অতীব স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা এই;—চৈতন্যের উপর "উপহিত" "অনুপহিত" "আভাস" প্রভৃতি যে-কেন বিশেষণ চাপাও না—তাহা চৈতন্য—তাহা অচৈতন্য নহে—এইটি ক্রমাগত মনে রাখা কর্ত্তব্য; চতুষ্কোণের উপর যে-কেন বিশেষণ চাপাও না (যেমন সমচতুষ্কোণ—দীর্ঘ চতুষ্কোণ—তির্য্যক্ চতুষ্কোণ—ইত্যাদি)—কিন্তু তাহা চতুষ্কোণ তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া চতুষ্কোণের উপর ত্রিকোণ বিশেষণ চাপাইতে পার না; কোন চতুষ্কোণকে সমচতুষ্কোণ বলিতে পার, কোন চতুষ্কোণকে তির্য্যক্ চতুষ্কোণ বলিতে পার, কোন চতুষ্কোণকে ঋজু চতুষ্কোণ বলিতে পার,—কিন্তু কোন চতুষ্কোণ-

কেই ত্রিকোণ চতুষ্কোণ বলিতে পার না; কারণ তাহা হইলে বিশেষণ এবং বিশেষ্যের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বিরোধ উপস্থিত হইবে। যে কোন চতুষ্কোণ হউক-না-কেন তাহারই চারিটি কোণ থাকা চাই—এ যেমন, তেমনি যে-কোন জ্ঞান হউক-না-কেন তাহারই—আপনাকে এবং অন্যকে জানা চাই; আপনাকে এবং অন্যকে জানে না—এরূপ জ্ঞান, আর, চারি-কোণ নাই—এরূপ চতুষ্কোণ, এ দুয়ের কোন অর্থই কাহারো বোধ-গম্য হইতে পারে না,—তবুও যদি গায়ের জোরে কেহ বলেন "আমার তাহা বোধ-গম্য হয়" তবে সে কথার কোন উত্তর নাই। এখন "অনুপহিত জ্ঞান" এই কথাটির দুইরূপ অর্থ হইতে পারে—এক অর্থ এই যে, তাহা দেহাদি উপাধিতে আবদ্ধ নহে,—এই অর্থে ঈশ্বরের জ্ঞান অনুপহিত জ্ঞান—ইহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু যদি "অনুপহিত" শব্দের অর্থ এইরূপ হয় যে, অহম্বৃত্তি এবং ইদম্বৃত্তি-বর্জ্জিত (সহজ ভাষায়—আপনাকে এবং অন্যকে জানা-বর্জ্জিত), তবে সেরূপ অর্থে অনুপহিত জ্ঞান বলাও যা—আর ত্রিকোণ চতুষ্কোণ বলাও তা—দুয়ের মধ্যে লেশ-মাত্রও প্রভেদ-নাই; চারিকোণ বর্জ্জিত চতুষ্কোণ, আর, আপনাকে এবং অন্যকে জানা-বর্জ্জিত জ্ঞান—যদি কেহ উপলব্ধি করিয়া থাকেন—তবে তাঁহার বিরুদ্ধে আমি কোন কথা বলিতে চাই না; আমি কেবল এই মাত্র বলিয়াই তাঁহার নিকট হইতে মানে মানে বিদায় গ্রহণ করিতে চাই যে, উহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত।

শ্রীমান্ মোহিনীমোহন বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনেক-গুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন;—বৈষ্ণবদিগের শাস্ত্রেও দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ একাধারে বর্ত্তমান; তাহার মধ্য হইতে অদ্বৈত-ঘেঁসা শ্লোক-গুলি বাছিয়া বাছিয়া উদ্ধৃত করিলেই যে, বৈষ্ণবেরা অদ্বৈতবাদী হইয়া গেলেন—অথবা বৈষ্ণব শাস্ত্র অদ্বৈত-বাদ হইয়া গেল—ইহা অতীব দুরান্বয়। প্রকৃত বৈষ্ণব শাস্ত্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের মতের যে কত বিরোধ তাহা নিম্ন-লিখিত একটি-মাত্র কথাতেই সপ্রমাণ হইবে;—শঙ্করাচার্য্যের চরম লক্ষ্য নির্ব্বাণ-মুক্তি; বৈষ্ণবদিগের চরম লক্ষ্য ভক্তি;—এমন কি—ভক্ত বৈষ্ণবেরা মুক্তিকে ভক্তির সহিত তুলনা-যোগ্যই মনে করেন না। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই প্রবাদ-টি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ যে, "চিনি হইয়া কোন ফল নাই, পিপীলিকা হওয়াই কাজের কথা;" অর্থাৎ ভগবানের ভক্ত হইয়া তাঁহার রসাস্বাদন করাই চরম সিদ্ধি এবং পরম পুরুষার্থ,—ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া কিছুই নহে। পিপীলিকার সহিত দৈন্য-গুণ-সম্পন্ন ভক্তের এবং মত্ত-হস্তীর সহিত দাম্ভিক তার্কিকের উপমা দিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিম্ন-লিখিত গীতটি আমার এই কথার পোষকতা করিতেছে;—

"গোলে-মালে মিসা'য়ে আঁছে;—
তা'র গোল ছেড়ে মাল লওরে বেছে।
শুনেচি বৈষ্ণবের করণ, বালির সঙ্গে চিনির মিলন, তা জানে দু-এক জন।

(ও—তা) মত্ত হস্তী টের পে'লে না—চেঁউটি (অর্থাৎ পিঁপড়া) মরম জেনেছে ॥"
কিন্তু আমার লিখিত প্রস্তাবের সম্বন্ধে এ সকল নানা-সম্প্রদায়ের নানা মতামত নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক—এজন্য এখানে তাহার বেশী উল্লেখ করা অনর্থক বাক্য-ব্যয়।

মোহিনীমোহন এই যে একটি কথা বলিয়াছেন যে, "ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের বিষয়ী অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয় চৈতন্যাভাসকে মুখ্য আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই—ইহা সহজেই দেখা যায়। অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর জীব ও যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর ঈশ্বরের ভেদ কথন স্থলে অদ্বৈত মুখ্য আত্মা গ্রহণ করিলে প্রকৃতের হানি ও অপ্রকৃতের কল্পনা করা হয়" ইহাতে তিনি নিজেই অপ্রকৃতের কল্পনায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মোহিনীমোহন যুষ্মৎপ্রত্যয়ের ঠিক উল্টা অর্থ বুঝিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যের সুপ্রসিদ্ধ টীকায় এইরূপ লিখিত আছে;—"চিদাত্মা তাবদস্মৎপ্রত্যয়-যোগ্যঃ" চিদাত্মা (চিদাভাস নহে—চৈতন্যাভাস নহে—সাক্ষাৎ চিদাত্মা) অস্মৎপ্রত্যয়ের যোগ্য; কেন? না প্রথমতঃ 'তৎপ্রযুক্ত সংশয়াদি নিবৃত্তি ফলভাক্ত্বাৎ" অর্থাৎ যেহেতু সাধক চিদাত্মার প্রসাদাৎ সংশয়াদির নিবৃত্তি-রূপ ফলের ভাগী হয়, দ্বিতীয়তঃ "ন তাবদয়ং একান্তেনাবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ ইতি ভাষ্যোক্তেশ্চ" যেহেতু ভাষ্যেতেই কথিত হইয়াছে যে, চিদাত্মা একান্তই যে অবিষয় (অর্থাৎ বিষয় নহে) তাহা নহে, যেহেতু তাহা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়। ইহার পরেই অহঙ্কার (যাহা সাক্ষাৎ চিদাত্মা নহে—কিন্তু চিদাত্মার আভাস মাত্র—চৈতন্যাভ্যাস) তাহার সম্বন্ধে টীকাকার বলিতেছেন "যদ্যপ্যহঙ্কারাদিরপি তদ্যোগ্য স্তথাপি চিদাত্মনঃ সকাশাদত্যন্তভেদ সিদ্ধ্যর্থ্যং যুষ্মৎপ্রত্যয় যোগ্য ইত্যুচ্যতে"—অহঙ্কারাদি যদিও অস্মৎপ্রত্যয়ের যোগ্য (অর্থাৎ শরীরাদিতে যদিও আমরা আত্মাভিমান করি) তথাপি অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর চিদাত্মা হইতে অহঙ্কারাদির ভিন্নতা সিদ্ধ করিবার জন্য অহঙ্কারাদিকে যুষ্মৎপ্রত্যয়ের যোগ্য বলা হইতেছে। এই দেখ,—অহংকার (বা চৈতন্যাভাস) যুষ্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ধরা হইতেছে, ও সাক্ষাৎ চিদাত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ধরা হইতেছে। এইরূপ যেখানে অহঙ্কারাদিই যুষ্মৎ প্রত্যয়-গোচর—মোহিনীমোহন সেখানে বলিতেছেন "যুষ্মৎ প্রত্যয় গোচর ঈশ্বর" ও যেখানে সাক্ষাৎ চিদাত্মা অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর—মোহিনীমোহন সেখানে বলিতেছেন "অস্মৎপ্রত্যয়ের গোচর চৈতন্যাভাস।" দুঃখের বিষয় এই যে স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ তাঁহার কৃত শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদে—যুষ্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় ঈশ্বর—এইরূপ ভুল করিয়া বসিয়াছেন; এজন্য মোহিনীমোহনকে দোষ দিতে পারা যায় না। আসল কথা এই যে বর্ত্তমান প্রকরণে অস্মদ্-যুষ্মদের প্রভেদ জীবেশ্বরের প্রভেদ নহে—কিন্তু আত্মানাত্মার প্রভেদ; আত্মাই প্রকৃত পক্ষে "আমি" এইরূপ প্রত্যয়ের (অস্মৎ প্রত্যয়ের) বিষয়, আর, আত্মা ছাড়া আর যাহা কিছু সমস্তই "তুমি" এইরূপ প্রত্যয়ের (যুষ্মৎ প্রত্যয়ের) বিষয়। টীকাতে তো এইরূপ পাওয়া গেল, এখন মূল ভাষ্য কিরূপ বলেন—দেখা

যা'ক্। মোহিনীমোহন বলিতেছেন যে, অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়কে "মুখ্য আত্মা গ্রহণ করিলে প্রকৃতের হানি ও অপ্রকৃতের কল্পনা করা হয়;" কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং কি বলিতেছেন—দেখা যা'ক্;—

যেখানে বলা উচিত যে "আমার দেহ স্থূল," সেখানে লোকে বলে "আমি স্থূল" ইহাতে করিয়া "দেহই আমি" এই ভ্রমটি অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়; এইরূপ ভ্রম বশতঃ একটার ধর্ম্ম (যেমন দেহের ধর্ম্ম) আর একটাতে (যেমন আত্মাতে) আরোপ করা'র নাম—অধ্যাস। এই অধ্যাস উপলক্ষে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "আহ কোঽয় মধ্যাসো নামেতি" কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন অধ্যাস পদার্থটা কি? ইহার উত্তর এই যে, অধ্যাস আর কিছু নয়—"স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" এক বস্তুতে স্মৃতি-নিহিত পূর্ব্বদৃষ্ট আর-এক বস্তুর অবভাস; সে কেমন? না "তথাচ লোকে অনুভবঃ শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বৎ ইতি" লোকে এইরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকে যে, শুক্তিকা রজতের ন্যায় প্রকাশ হইতেছে, (এখানে শুক্তিকাতে পূর্ব্ব-দৃষ্ট রজতের অবভাস হইতেছে), একচন্দ্র দুই চন্দ্রের ন্যায় দেখাইতেছে (এখানে জল-স্থিত প্রতিবিম্ব-চন্দ্রে পূর্ব্বদৃষ্ট আকাশস্থিত চন্দ্রের অবভাস হইতেছে)। এইখানেই শঙ্করা-চার্য্য এই তর্কটি উত্থাপন করিয়াছেন "কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়ে অধ্যাসো বিষয় ধর্ম্মানাং? সর্ব্বোহি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তর মধ্যস্যতি" অবিষয় যে (অর্থাৎ বিষয় নহে এমন যে) প্রত্যক্ আত্মা তাহাতে বিষয় ধর্ম্মের অধ্যাস আবার কিরূপ? সকলেই তো সম্মুখ-স্থিত বিষয়ে বিষয়ান্তর অধ্যাস করে—(আত্মা কি সম্মুখ স্থিত বিষয়?); "যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনো বিষয়ত্বং ব্রবীষি? "যুষ্মৎ প্রত্যয়-বহির্ভূত (অর্থাৎ শুদ্ধ কেবল অস্মৎ প্রত্যয়ের গোচর) প্রত্যক্ আত্মাকে (অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্মাকে) তুমি বিষয় বলিতেছ?" "উচ্যতে" বলিতেছি শুন, "ন তাবদয়ং একান্তেনা বিষয়ঃ অস্মৎ প্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যাগাত্ম প্রসিদ্ধেঃ" প্রত্যক্ আত্মা একান্তই যে, অবিষয় (অর্থাৎ বিষয় নহে), তাহা নহে; যেহেতু সর্ব্বত্রই ইহা প্রসিদ্ধ যে প্রত্যক্ আত্মা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় এবং তাহা অপরোক্ষ। এই দেখ—শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং অপরোক্ষ আত্মাকে (চৈতন্যাভাসকে নহে—কিন্তু সাক্ষাৎ আত্মাকে) অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। মোহিনীমোহন বলিতেছেন যে, অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়কে "মুখ্য আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রকৃতের হানি ও অপ্রকৃতের কল্পনা করা হয়;" শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "অপরোক্ষ আত্মাই—সাক্ষাৎ আত্মাই—অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়";—আমিও আমার পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহাই বলিয়াছি; ইহাতে যদি প্রকৃতের হানি ও অপ্রকৃতের কল্পনা হইয়া থাকে, তবে সে দোষ আমার নহে—সে দোষ স্বয়ং শঙ্করা-চার্য্যের! মূল ভাষ্যে তো এইরূপ পাওয়া গেল, এখন, যুক্তিতে কিরূপ পাওয়া যায়—দেখা যা'ক্।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই পাঠকের সহজ বুদ্ধিতে ইহা জলের মত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, শাঙ্কর দর্শনের উপরি-উক্ত প্রকরণে মোহিনীমোহনের "চৈতন্যা-ভাস" প্রভৃতি শব্দ-ঘটা কোন ক্রমেই সংলগ্ন হয় না; কেননা অগ্রে আত্মাতে অনাত্মার ধর্ম্ম অধ্যস্ত (কিনা আরোপিত) হইলে তবে তো আত্মা আভাস-চৈতন্যরূপে দেখা দিবে; অগ্রে অধ্যাস—পরে (সেই অধ্যাসের গুণে) আভাস-চৈতন্যের উৎপত্তি। শাঙ্করভাষ্যের উপরি-উক্ত স্থলে, অধ্যাসের সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার উপরে (আভাস-চৈতন্যের মূল পত্তন-ভূমির উপরে) বিচার চলিতেছে। আসল আত্মার উপর অনাত্মার ধর্ম্ম অধ্যাস করা হইলে (অর্থাৎ চাপানো হইলে) তবেই তাহা নকল আত্মা (চৈতন্যাভাস) হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং আভাস-চৈতন্যে (নকল আত্মাতে) অনাত্মার ধর্ম্ম আধ্যাস করা, আর, তেলা মাথায় তেল দেওয়া—উভয়ই সমান। অতএব শাঙ্কর দর্শনের উপরি উক্ত স্থলে—যেখানে আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাসের বিচার চলিতেছে, সেখানে অপরোক্ষ আত্মা—আসল আত্মা—ব্যতীত "আভাস-চৈতন্য" প্রভৃতি নকল আত্মার কথা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। অতএব ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই যে, আসল আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, তাহা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়, আর, নকল আত্মা যত কিছু—সমস্তই তিনি যুষ্মৎ প্রত্যয়ের দলে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শ্রীমান্ মোহিনীমোহন যদি আমার প্রস্তাবের নিগূঢ় অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখেন, তবে তিনি আমার সহিত বিবাদের কোন কারণ দেখিবেন না। কেননা, আমিও এক হিসাবে অদ্বৈতবাদী (যথা ঐশী শক্তি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন—ইহাতে আমার তিলমাত্রও সংশয় নাই;—আমার দ্বৈতবাদ শুদ্ধ কেবল এই যে, ঈশ্বরের কালিক প্রতিরূপ ঈশ্বরের কালাতীত স্বরূপ হইতে ভিন্ন); তিনিও এক হিসাবে দ্বৈতবাদী (যথা তিনি বলিয়াছেন "পরমেশ্বর অনন্তরূপে সগুণ ও নির্গুণ এ উভয়ই); গভীরে তলাইয়া দেখিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পরমেশ্বরের কালিক প্রতিরূপ তাঁহার কালাতীত স্বরূপের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ—এ কথা আমাদের উভয়েরই শিরোধার্য্য—উভয়েই আমরা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী—এইখানেই সমস্ত বিবাদের পরিসমাপ্তি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলঙ্ক।

১৫

নিভ নিভ মলিন-জ্যোৎস্নাদীপ্ত কুয়াশার অন্ধকারের মধ্যে একটা আর্ত্তনাদ উঠিয়া হারাইয়া গেল, গুহ সেই হারান স্বর অনুসরণ করিয়া ধাবিত হইলেন। রাস্তার যেস্থল

হইতে ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল—সেই স্থলে আসিয়া কাহাকেও দেখিলেন না, পথের এদিক ওদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বত্যপথ, কোথায় উঁচু, কোথায় নীচু, কোথায় বিস্তৃত প্রান্তর, কোথায় ঘন তরু শ্রেণীর মধ্যে পাহাড়ের পাষাণ দেয়ালের মধ্যে আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ স্থান, যাহা দেখিতে নিকটে মনে হয়, ছুটিয়াও সেখানে অগ্রসর হওয়া যায় না, চীৎকার করিয়াও কাহারো সাড়া মিলে না, কেবল নিজের প্রতিধ্বনি দ্বিগুণ বেগে কাণে আসিয়া লাগে। এই অবস্থায় যুবক দ্রুতপদে আকুলহৃদয়ে পাহাড়ের এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অবশেষে ফিরিয়া ঘুরিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থলের নিকটে আসিয়া ছোট ছোট গাছড়ার জঙ্গলের মধ্যে একটি যেন অস্পষ্ট মনুষ্য কায়া দেখিতে পাইলেন, তাহা জঙ্গলের অন্ধকারে এত মিশাইয়া পড়িয়াছে, যে ইহার নিকট দিয়া পূর্ব্বে যাতায়াত করিয়াছেন,তবু ইহা নজরে পড়ে নাই। গুহা নিকটে আসিয়া দেখিবামাত্র সত্যই একটি রক্তমাখা মনুষ্যদেহ দৃষ্টিপথে পড়িল। সেই অস্ফুট চন্দ্রালোকেও গুহা মন্দালিকের অজ্ঞান মূর্ত্তি চিনিতে পারিলেন, আহত স্থান হইতে রক্ত উথলিয়া উঠিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত করিয়াছিল। তীব্র যাতনায় আহত হইয়া গুহা করুণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, কাতরভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন—সাড়া পাইলেন না। তবু তখনো জীবন আছে বলিয়া মনে হইল—শীঘ্র যদি রক্তের উচ্ছাস বন্ধ করা যায় ত এখনো হয়ত বাঁচিতে পারেন। গুহা সব্যাগ্রে নিজের পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ ছিড়িয়া যতদূর পারিলেন রক্ত মুছাইয়া, চর্ব্বিত দুর্ব্বাঘাস দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন, তাহার পর রাস্তার পারে যে পুষ্করিণী তলে দাঁড়াইয়া তিনি তীর ছুড়িয়াছিলেন, তীর বেগে সেইখানে ছুটিয়া চলিলেন। উঠিবার সময় ভীলরাজের নিকটে একটি তীর পতিত দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন তাহা ভীলপুত্রের তীর, গুহা শিহরিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। গুহার তীরে যে মন্দালিক আহত হয়েন নাই, এই চিন্তায় তাঁহার পীড়িত ক্লিষ্ট হৃদয়েও শান্তির উদয় হইল—উথলিত হৃদয়ে অন্তরের সহিত বারবার করিয়া মনে মনে গুহা মহাদেবকে প্রণাম করিলেন।

১৬

মন্দালিক গুহাদের বাড়ী গিয়া সেখানে তাহার দেখা পাইলেন না, তিনি সেখানে পৌঁছিবার আগেই গুহা গৃহের বাহির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনিও সেখান হইতে ফিরিলেন। ফিরিবার সময় দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যপথে না গিয়া উল্লিখিত বিজন পথ দিয়াই তিনি গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ প্রতিদ্বন্দীদিগের মধ্যস্থলে আসিয়া বাণাহত হইয়া, পার্শ্বের জঙ্গলে পড়িয়া গেলেন। পাঠকগণ এখন বুঝিয়াছেন, তালগাছ তাঁহার চীৎকার ধ্বনি শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহার সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন সব কথা তাহার মনে নাই। এই নির্জ্জন স্থানে একাকী আপনাকে

পড়িয়া দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল, ক্রমে অল্পে অল্পে গুহার সহিত দ্বন্দযুদ্ধের কথা মনে পড়িল, ভাবিল বাণাহত হইয়া এইখানে পড়িয়া আছে—উঠিয়া কোথায় আঘাত লাগিয়াছে—অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু যখন দেখিল তাহার সর্ব্বশরীর অক্ষত তখন আরো বিস্মিত হইয়া মনঃসংযম পূর্ব্বক আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ সেই করুণ চীৎকার ধ্বনি তাহার কর্ণে যেন ধ্বনিত হইল, সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল, আর সে দাঁড়াইল না, উন্মত্তের মত দ্রুত পদে চারিদিক অন্বেষণ করিতে করিতে সেই জঙ্গলে উপনীত হইয়া যখন রক্তাক্তদেহ, নীরব, দৃষ্টিহীন, অজ্ঞান পিতাকে ভূপতিত দেখিতে পাইল, তখন সমস্ত বিশ্বসংসার তাহার চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ডবেগে যেন ঘুরিয়া উঠিল। সেই ঘূর্ণপাকের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া একটা জীবন্ত পাষাণ মূর্ত্তি—সবলে মর্ম্মে মর্ম্মে আলোড়িত বিদারিত হইতে লাগিল, তাহার জ্ঞান আছে অথচ সে অজ্ঞান, তাহার জীবন আছে, অথচ সে মৃত, তাহার অনুভবের ক্ষমতা আছে—অথচ সে বলহীন পাষাণের ন্যায় যন্ত্রনা-কাতর হইয়া কাঁদিয়া বিদীর্ণ কণ্ঠে "বাবাডারে" বলিয়া ডাকিয়া যখন অজ্ঞান মন্দালিকের গলা জড়াইয়া ধরিল—তখন সে কাতরতায় আকাশ পাতাল যেন বিগলিত হইয়া পড়িল—কিন্তু মন্দালিক যেমন অবিচলিত, যেমন নিস্তব্ধ, তেমনি রহিলেন, পুত্র আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া পিতার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিল না; তিনি আজ অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত। সহসা মন্দালিকের নিকটস্থ ভূমিন্যস্ততীর শোকোন্মত্ত পুত্রের চক্ষে পড়িল,—সে তীর তাহারি তীর—আপনার হাতে আপনার পিতাকে সে তবে বধ করিয়াছে! আর সে পারিল না,তাহার দীর্ণ বিদীর্ণ হৃদয়ভূমি সবেগউত্থিত আগ্নেয় বিপ্লবে চূর্ণ বিচূর্ণ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া দূর দূরান্তরে যেন ছুটিয়া পড়িতে লাগিল—অনন্ত যাতনা ভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, অনন্ত যাতনায় উন্মাদ হইয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া পাহাড়-শিখর হইতে নিম্নে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সহসা নিম্নোত্থিত মৃদু কোলাহলে একবার চারিদিক যেন ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, সহসা গাছে গাছে পাখীগুলি একবার জাগিয়া উঠিয়া যেন শোকগীতি গাহিয়া উঠিল, তাহার পর আবার চারিদিক পূর্ব্বের নিস্তব্ধতায় মগ্ন হইয়া গেল।

ভীল পুত্র যখন পিতার নিকটে আসিয়াছিল, গুহা তখন সেখানে ছিলেন না, তিনি উষ্ণীষ ভিজাইয়া ফিরিয়া আসিয়া আর তালগাছকে দেখিতে পাইলেন না, অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল অবসান হইয়া গিয়াছে।

* * * *

মন্দালিককে বাঁচাইবার জন্য গুহা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, ক্ষীণ চাঁদ নিভিয়া গেলে, শ্যামদল মধ্যস্থ লোহিত শতদলের ন্যায় কুয়াসার মধ্য দিয়া অরুণ-রেখা-রঞ্জিত পূর্ব্বগগণ যখন ফুটিয়া উঠিল, তখনো গুহা তাহার শুশ্রূষা করিতে ক্ষান্ত হইলেন না, তখনো আর্দ্র উষ্ণীষ জল নিঙড়িয়া মন্দালিকের মুখে দিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন প্রথম সূর্য্যালোক মন্দালিকের মৃত মুখের উপর পড়িল, তখন

গুহার চমক ভাঙ্গিল, ধীরে ধীরে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আর্দ্র উষ্ণীষ ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া হতাশ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—এক দিন আগে মন্দালিক তাঁহাকে কত স্নেহের কথা বলিয়াছেন—আজ তিনি নীরব,—এক দিন আগে তিনি কি ছিলেন, আজ তাঁহার কি দশা! একটা তীব্র অনুতাপের ভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল, তিনিই কি অনেকাংশে এই মৃত্যুর কারণ নহেন? তিনিই কি তালগাছকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে উত্তেজিত করেন নাই? যদি উত্তেজিত করিলেন তবে থামাইতে পারিলেন না কেন? থামাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য—কিন্তু সে কি সেরূপ চেষ্টা! তেমন চেষ্টা করিলে কি তাহাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইতে থামাইতে পারিতেন না? না পারিতেন—নাই পারিতেন—তেমন চেষ্টা করিলেন না কেন? তালগাছের কথায় ধনুক উঠাইবার পরিবর্ত্তে কেন তাহা তাহার সম্মুখে ভূমে ফেলিয়া দিলেন না—শূন্য হস্ত হইয়া কেন তাহাকে বলিলেন না—"নিরস্ত্র আত্ম চেষ্টায় অক্ষম ব্যক্তিকে মারিতে হয় মার—আমি ধনুক উঠাইব না" তাহা হইলে কি আর সে তীর নিক্ষেপ করিতে পারিত? তাহা হইলে কি আর পুত্র হইয়া সে পিতার হন্তারক হইতে পারিত? গুহা আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায় হায়! কি করিলাম, তাহাকে উত্তেজিত করিলাম আর থামাইতে পারিলাম না? থামাইতে ইচ্ছা করিলাম—অথচ চেষ্টা করিলাম না, ধনুক উঠাইয়া ধরিলাম—কেন তাহার পদতলে ভূমে ফেলিয়া দিলাম না? গুহা শিহরিয়া পিতৃ-হন্তারক তীরের দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন–চমকিয়া উঠিলেন,—অন্ধকারে যাহা দেখিতে পান নাই, প্রভাতালোকে তাহা সুস্পষ্ট দেখিলেন—দেখিলেন তীর রক্তহীন,—কম্পিত হস্তে তাহা হাতে উঠাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন, সম্প্রতি দেহবিদ্ধ করিবার লক্ষণ তাহাতে কিছুই দেখিলেন না। সংশয়ে গুহার মন পূর্ণ হইল, সংশয় ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল, গুহা উঠিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন,—অদূরে আর একটি সূর্য্যালোক ঝলসিত তীর দেখিতে পাইলেন, নিকটে গিয়া দেখিলেন তাহা রক্তাক্ত,—নিজের তীর গুহা চিনিতে পারিলেন। কার হাতে মন্দালিক মরিয়াছেন, আর সংশয় রহিল না। হায় হায়! কি করিলেন, নিজের হাতে নিজের পিতৃসম বন্ধুকে তিনি হত্যা করিলেন! গুহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

উপসংহার।

গুহা যে মন্দালিককে মারিয়াছেন, তাহা রাষ্ট্র হইতে বাকী রহিল না, কিন্তু মন্দালিকের ন্যায় পিতৃতুল্য স্নেহশীল বন্ধুকে কেন যে তিনি মারিলেন, তাহার কারণ ভীলেরা ভাবিয়া পাইল না, চিরকালই তাহার কারণ অজ্ঞাতের গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়া গেল। কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গুহা আবগড়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত তাঁহার এই কলঙ্কের কথা ঘোষণা করিতেছে।

গুহাই মিবার রাজবংশের আদি পুরুষ, ইঁহার নাম হইতেই মিবার বংশীয়গণ পরে "গুহলোট" এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। ভীলের রক্তফোটা পরিয়া গুহা রাজ পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই হইতে রাজ্যাভিষেক কালে বন পুত্রের (ভীলের) কনিষ্ঠ অঙ্গুলির রক্তফোটা গ্রহণ করা মিবার রাজদিগের একটি পদ্ধতি হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা রক্তফোটা পরায়—তাহারা মিবার রাজদিগের নিকট জায়গীর পাইয়া থাকে। *

সমাপ্ত।

হেঁয়ালি নাট্য।†

(নবীন ও নবীনের কাকা।)

কাকা। আজ কাল তোমার কেমন পড়াশুনা হচ্ছে নবীন?

নবীন। খুবই ভাল।

কাকা। তোমার মতে ত বরাবরই খুবই ভাল, সে কথা কে জিজ্ঞাসা করছে?

নবীন। তবে কি জিজ্ঞাসা করছেন?

কাকা। মাষ্টার তোমায় কি বলেন? তিনি কি সন্তুষ্ট!

নবীন। আজ্ঞে খুবই।

কাকা। সবই খুব! Superlative ছাড়া দেখছি তোমার কথা নেই।

নবীব। আজ্ঞে ঠিক উল্ট, Superlative হলে হোত খুব তম, আমি Positiveএর একটুও এদিক ওদিক করিনি।

কাকা। বটে, একেবারে গোল্লায় গেছ! কাকার সঙ্গে এয়ারকি! খুবতম একবার পেতে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?

(নবীনের মাতার প্রবেশ)

মা। কি হয়েছে ঠাকুর পো? মার মূর্ত্তি যে?

---

* "কলঙ্ক" শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু এই নামটি সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় ইহা ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইবে।

† গত অগ্রহায়ণ মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "যাহা"।

অগ্রহায়ণ মাসের ভারতী ও বালকে যে দুইটি ধাঁধাঁ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রেরক তাহার উত্তর আমাদিগের নিকট পাঠান নাই—কিন্তু আমরা উহার উত্তর এইরূপ ভাঙ্গিয়াছি;—প্রথমটির উত্তর "তরবার"—দ্বিতীয়টির উত্তর "র" অক্ষর। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার দাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গুহ ইহাঁরাও এই উত্তর দিয়াছেন। ভাং সং।

কাকা। কি আর হবে, তোমারি কারখানা—ছেলেটাকে একেবারে গোল্লায় দিয়েছ ?

মা। "তোমার ঐ এক কথা! কেন গা ওর আমার পড়াশুনায় যেমন মন—তোমাদের তেমন হলে বাঁচতুম। রাত দিন বই হাতে করেই বাছা আছে।"

কাকা। আর কারো নজরেতো তা পড়ে না।

মা। হ্যাদ্ দেখ ঠাকুর পো—নজর নজর কোরো না—তাহলে কালই আমি বাপের বাড়ী চলে যাব। আমি কি একলা ওর পড়াশুনার কথা বলি—কেন মাষ্টার কি বলেছে শোন নি কি ? হ্যা বাবা বল তো রে আর একবার—তোর কাকাকে একবার শুনিয়ে দেতরে।

নবীন। তা উনি শোনেন কই ?

মা। না শুনবে না! বল বাবা তুই বল দেখি—কেমন শুনবে না দেখি ?

কাকা। আমি ত সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলুম ?

মা। "বেশ করছিলে—ভাল করছিলে—তা করবে না—বল বাবা আমার বল তুই"।

নবীন। "আমি ত আগেই তা বলতে গিয়েছিলুম—"

মা। তাত বেশই করিছিলি—আবার বল মানিক আমার—

নবীন। "সে দিন আমি স্কুলে একটা রচনা লিখেছিলুম"—

মা। শোন ঠাকুর পো বাবা আমার একটা ল—ল লচনা—

নবীন। "অ্যাঃ থামনা একটু—"

মা। "না বাবা,—হ্যাঁ হ্যাঁ থামছি বাবা—তার পর বল ধন তুই।

কাকা। তুমি দেখছি বলতে দেবে না।

মা। "সে কি কথা—কেন দেব না—বল যাদু ম্যাষ্টার লচনা দেখে—"

কাকা। কি বল্লে বলে যাও—

মা। হ্যা বাবা বলে যা—

নবীন। "তুমি একটু না থামলে আমি বলব না"—

মা। "বলবি বই কি—বাবা আমার—বল, বাবারে—আমি আর কিছু বলব না"—

নবীন। বল্লেন—"সব ছেলেরা যদি তোমার মত হ'ত—"

মা। শুনলে ঠাকুর পো—যদি আমার বাবার মত হোত—

কাকা। "আঃ ওকে বলতে দাওনা।"

মা। বল বাবা বল, তাহলে কি হোত সোনাধন ?

কাকা। (রাগিয়া) হবে আর কি ? তাহলে মাষ্টারদের অন্ন জুটত না—

নবীন। ঠিক কথা কাকা। মাষ্টারও তাই বলছিলেন, বলছিলেন—"সবছেলেরা যদি তোমার মত হোত, তাহলে কালই স্কুল উঠিয়ে দিতুম।"

মা। শোন ঠাকুর পো শোন—চাঁদের আমার—

কাঁকা। "বটে"

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ—আমার মত যদি সবাই শেখে—"তাহলে শেখাবার জন্য নূতন কিছুত আর থাকে না।"

মা। "তবু যে তোর কাকার মন ওঠে না—বাবা! বাছারে আমার সাটের বাছা—তুই কি আমার বাঁচবি রে"—

বীর কাহিনী।

ফরাসী বীরত্ব।

আমরা বীর কাহিনীর প্রথমেই একবার দেখিয়াছি গলেরা (পুরাতন ফরাসীসেরা) রোমকে কিরূপ বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল। এবার দেখিব তাহারা রোমের সর্ব্ব প্রধান বীরের হস্ত হইতে দেশ রক্ষার নিমিত্ত কিরূপ যত্ন, কিরূপ সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল। ৫২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জুলিয়স সীজর গল পরাজয় করিয়া ব্রটন অধিকার করিতে গমন করিলেন। গলদের কয়েক জন নেতা ও তাঁহার প্রধান বিরোধীকে সীজর অত্যন্ত নিষ্ঠুর রূপে প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। সেই অপমানে এবং এই অধীনতা-জনিত অত্যাচারে গলদের বীর-হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছিল। সীজর চলিয়া যাইলে তাহাদের অধিনেতাগণ একত্রিত হইয়া এই শপথ করিলেন যে যদি কখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তবে প্রাণান্তেও কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। একদিন প্রাতঃকালে অরলীনস নগরবাসী গলগণের রোমান অত্যাচার অসহ্য হইল—সেইখানেই বিবাদের সূত্রপাত হইল। গলেরা স্থানীয় সমুদয় রোমানদের হত্যা করিল। তখন টেলিফোনও ছিল না, টেলিগ্রাফও ছিল না, কিন্তু তবুও লোকদের চীৎকার স্বরে এক শৈলশিখর হইতে আর এক শৈলশিখর—সেখান হইতে আর এক শৈলশিখর—এইরূপ করিয়া সন্ধ্যাবেলার মধ্যেই এই সংবাদ ১৬০ মাইল দূরস্থ আর্ভাণ নগরে পৌঁছিল। নদীর গতি রোধ করা সুকঠিন, যখন অত্যাচার পীড়িত অধীনজাতি দলিত-হৃদয়ে নববল ধরিয়া একবার সবেগে অগ্রসর হয়, তাহাও রোধ করা সুকঠিন। এই স্থানে ভারসিন্জিটোরিক্স নামক একজন যুবক বাস করিতেন। এ অধীনতা এ অত্যাচার তাঁহার বড়ই দুর্ব্বহ বোধ হইত। বিদ্রোহের সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি অন্যান্য গলদের সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে রোমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃব্য আর্ভাণের অধিনায়ক রোমানদের

ক্রোধের ভয়ে তাঁহাকে প্রধান নগর জারগোভিয়া হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন, কিন্তু তিনি একদল উত্তেজিত-হৃদয় যুবকবৃন্দের সহিত জাতীয় অধিনায়ক স্বরূপ বলপূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য জাতিরা তাঁহার সহিত আসিয়া সম্মিলিত হইল। সীজর সংবাদ পাইলেন যে লয়ার নদীর নিকটবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত। তিনি সেই দারুণ শীতে, অনন্ত তুষার মণ্ডিত সেবেনা মরু অতিক্রম করিয়া হঠাৎ একদিন আর্ভেনি আসিয়া পৌছিলেন। আ৮ ।নবাসীরা চমকিত ও বিস্মিত হইল—তাহাদের স্থির বিশ্বাস ছিল সেবেনার তুষাররাশি অনতিক্রম্য—শীতকাল আর্ভা ণের সুদৃঢ় রক্ষক। সীজর শীঘ্রই প্রায় অধিকাংশ স্থান পুনরধিকার করিলেন, অবশিষ্ট স্থানও নিশ্চয়ই সহজে অধিকার কারতেন, কিন্তু এই সময় ভারসিন্‌জিটোরিক্স তাঁহার প্রধান সহযোগীবর্গকে ডাকিয়া ব.লিলেন যে যদি তাঁহারা দেশ রক্ষা করিতে চাহেন, তবে নগরস্থ সমুদয় অট্টালিকাদি ধ্বংশ করা এবং নগরস্থ পশুগণকে নগর হইতে দূর করিয়া দেওয়াই নগর রক্ষার একমাত্র উপায়। মরুময় প্রদেশ অধিকার করিয়া রোমানদে. লাভ কি এবং খাদ্যহীন দেশে তাহারা কি রূপেই বা অবস্থান করিবে? নিজেদের বাসস্থান গৃহাদি ধ্বংশ করিতে কষ্ট হয় সত্য, কিন্তু যখন স্ত্রী পুত্র সমেত কারাবদ্ধ হইতে হইবে, যখন এ গৃহে অন্য বাস করিবে, তখন কি তাহা আরও কষ্টকর হইবে না?

সকলে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল, সেই দিনই ২০টী নগর ভষ্মসাৎ করা হইল। ক্রমে ভষ্মকারীরা আভিকরম জেলার অন্তঃপাতী বুর্জস নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানেই অধিবাসীগণ নতজানু হইয়া ভারসিনজিটোরিক্সের নিকট প্রার্থনা করিল যে দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এই নগরটী যেন ধ্বংশ করা না হয়, বিশেষতঃ একটী ক্ষুদ্র প্রবেশ দ্বার ব্যতীত নগরের চতুঃপার্শ্ব খাল ও নদী বেষ্টিত সুতরাং তাহা শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করাও সুকঠিন নহে। ভারসিনজিটোরিক্স নিজের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। বুর্জস ধ্বংশ করা হইল না। সীজর এইস্থান বেষ্টন করিলেন কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ শীত ও ক্ষুধাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল। তাহাদের প্রধান খাদ্য রুটী একবারেই নাই, অনেক দূর হইতে পশু আনিয়া আহারের সংস্থান করিতে হয়, তাহাও ভারসিনজিটোরিক্স যখনই সুবিধা পাইতেন, পথে লুণ্ঠন করিয়া লইতেন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেন। কিন্তু অধ্যবসায়ী রোমানগণ সহজে পরাঙ্মুখ হইবার নহে। গলদের নগরবেষ্টিত প্রাচীর অত্যন্ত সুদৃঢ়। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উভয় দিকে দুই ফিট অন্তর সাজান বড় বড় গাছের গুঁড়ির চার কোণা ঘর, তাহার অনেক দূর উপর পর্য্যন্ত মাটী ঢালা, তাহার উপর আবার ঐরূপ কাঠ, আবার মাটি, এইরূপে বহু স্তর বিন্যস্ত উচ্চ প্রাচীর। তাহার পর প্রাচীরের বহিঃ পৃষ্ঠা বড় বড় পাথর রাশিতে মণ্ডিত।

তখন দুই প্রকার উপায়ে প্রাচীর ভগ্ন করা হইত—এক গোলাগুলি নিক্ষেপ করিয়া, আর এক ভেড়ার মাথার আকৃতিতে নির্ম্মিত একপ্রকার মুদ্গর দ্বারা আঘাত করিয়া। কিন্তু ইহার কোন উপায়েই গল প্রাচীর নষ্ট হইবার নহে, মাটী থাকায় গোলাগুলি ব্যর্থ হইয়া যাইত, কাঠ থাকায় মুদ্গরে তাহা ভাঙ্গিতে পারিত না। রোমানেরা প্রাচীর ভগ্ন বিষয়ে নিরাশ হইয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নগরে প্রবেশ করিবার মানসে প্রাচীরের সম্মুখে একটী স্তূপ রচনা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারাও যত উচ্চ স্তূপ নির্ম্মাণ করে, নগর মধ্যস্থিত গলেরা প্রাচীরের স্তর আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এইরূপে ২৫ দিন পর্য্যন্ত নগরবাসীগণ নগর রক্ষা করিল, কিন্তু আর পারিল না, রোমানেরা নগরে প্রবেশ করিয়া সমুদয় অধিবাসীগণকে হত্যা করিল। কেবল ৮০০ লোক পলায়ন পূর্ব্বক নগর বহিস্থ ভারসিনজিটোরিস্কের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। ভারসিনজিটোরিস্ক জানিতেন যে বুর্জস নিশ্চয়ই শত্রু হস্তে পতিত হইবে। প্রতিদিন কেবল সংবাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন মাত্র, এক্ষণে এ সংবাদে বিশেষ হতাশ হইলেন না। আগত লোকদিগকে খাদ্য বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া সকলকে লইয়া নিজ বাসস্থান আর্ভাণে প্রত্যাগমন করিলেন। এইখানে কিছুদিন উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু এই সময় অন্য আর এক প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় সীজর সেই বিদ্রোহ দমনে চলিয়া গেলেন। আর্ভাণ আপাততঃ কিছুদিনের জন্য স্বাধীনতার মুখ দেখিয়া বাঁচিল। কিন্তু অধ্যবসায়ী রোমানদের হস্ত হইতে কাহারও বেশীদিনের জন্য পরিত্রাণ নাই—এই অধ্যবসায় গুণেই রোম ভুবনবিজয়ী। আবার ক্রমাগত উপর্য্যুপরি আক্রমণে গলেরা অবশেষে পার্ব্বত্য দুর্গ এলিসিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। সীজর দুর্গ বেষ্টন করিতে মনস্থ করিলেন। গলদের পলায়নের পথ একবারে রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি দুর্গের চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত করিলেন। প্রাচীর নির্ম্মাণ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভারসিনজিটোরিস্কের সহিত আর একবার যুদ্ধ হইল। প্রথমতঃ ভারসিনজিটোরিস্কের জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু অবশেষে তিনি পরাজিত ও তাঁহার অনেক সৈন্য আহত হইল। আহত অকর্ম্মণ্য লোক দুর্গে রাখা নিষ্প্রয়োজন, তাহাদিগকে বিপদের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া দেশে প্রেরণ করাই ভাল বিবেচনা করিয়া ভারসিনজিটোরিস্ক তাহাদিগকে স্বদেশে যাইতে অনুমতি দিলেন।

অন্ধকার রাত্রে রোমানদের অলক্ষিতে তাহারা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গেল, ভারসিনজিটোরিস্ক তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে তাহারা অন্যান্য প্রদেশবাসী গলদের নিকট যাইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে তাঁহার সাহায্যার্থে আসিতে অনুরোধ করে, নহিলে তাঁহার নিকট ৩০ দিনের অধিক আর খাদ্য দ্রব্য নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। সীজর প্রাচীরের পার্শ্বে দুইটী গভীর পরিখা খনন করাইলেন। একটী জলপূর্ণ—আর একটী বর্ষা ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্র

অস্ত্র নিহিত; উভয়ের মধ্যস্থিত স্থানে নানারূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র বিক্ষিপ্ত। এ বাধা অতিক্রম করে কাহার সাধ্য? দুর্গবাসীদিগকে এইরূপে বদ্ধ করিয়া সীজর দুর্গের কিয়দ্দূরে আর এক প্রস্থ পরিখা খনন করাইলেন। অন্য স্থানবাসী গলেরা যদি দুর্গস্থ গলদের সাহায্যার্থে আসিতে চাহে, তবে ইহা দ্বারা সে পথও বন্ধ করা হইবে। ভারসিনজিটোরিক্সের প্রার্থনানুসারে তাঁহার আত্মীয় ভারগেলিনস অন্যান্য গলদের সহিত তাঁহার সাহায্যর্থে আসিলেন। ভারসিনজিটোরিক্স তাঁহাদিগকে দুর্গ হইতে দেখিতে পাইয়া বন্ধুদের নিকট যাইবার জন্য অন্যান্য দুর্গবাসীগণকে লইয়া সীজরের খনিত পরিখা মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হায়! অল্প ক্ষমতা বা অল্পক্ষণের কি তাহা কর্ম্ম? এদিকে ভারগেলিনস পরিখা অতিক্রম করিয়া দুর্গাভিমুখে আসিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় সৈন্য সহ সীজর আসিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। উভয় দলে যুদ্ধ বাধিল, গলেরা পরাজিত ও ভারগেলিনস ও অন্যান্য কতিপয় গল বন্দী হইলেন। দুর্গের আহার দ্রব্য ইতিপূর্ব্বেই ফুরাইয়া গিয়াছিল, দুর্গবাসীদিগের আর আশা নাই, আর রক্ষা নাই—কিন্তু দুর্গবাসীদিগের নেতা এখনও এক উপায়ে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। তাহাদের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারেন। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে ভারসিনজিটোরিক্স তাঁহার সঙ্গীগণকে বলিলেন যে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্যই যুদ্ধ করিয়াছেন, নিজের কোন স্বার্থের জন্য নহে। সে স্বাধীনতা যখন উদ্ধার হইল না, তিনি দেশবাসীগণের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। তবে দেশবাসীরা কি রূপে তাহা গ্রহণ করিতে চাহেন? তাঁহারা নিজে তাঁহাকে বধ করিয়া সীজরের কোপ শান্তি করিতে চাহেন বা তাঁহাকে সীজরের নিকট জীবিত উৎসর্গ করিতে চাহেন? হায়! যে তাহাদেরই স্বাধীনতা উদ্ধারের নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে ওরূপে উৎসর্গ করা বড় কঠিন। কিন্তু তাহা ভিন্ন আর উপায়ও নাই—সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু অপেক্ষা একজনের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সীজারের নিকট প্রস্তাব আসিল যে যদি ভারসিনজিটোরিক্সকে লইয়া তিনি অন্যান্য গলদের নিরাপদে অব্যাহতি প্রদান করেন, তবে গলেরা ভারসিনজিটোরিক্সকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। সীজর এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সমুদয় দুর্গবাসী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, প্রথমতঃ ভারসিনজিটোরিক্স বন্দীরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইলেন। তৎপরে অন্যান্য গলেরা অস্ত্র সমর্পণ পূর্ব্বক অবনত মস্তকে চলিয়া গেল। ভারসিনজিটোরিক্সকে রোমে কারাবদ্ধ রাখিয়া সীজর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি ছয় বৎসর কারারুদ্ধ রহিলেন। কারাগারে থাকিয়া আপনার—রোমের প্রত্যেক বন্দীরই অদৃষ্টফল শেষ হত্যা দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সে শেষ দিন একদিন আসিল।

দিগ্বিজয়ী সীজর রোমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রোমের বিজয় দ্বার তাঁহার

জন্য উন্মোচিত হইয়াছে। রোমের গৃহে গৃহে পতাকা সুশোভিত, গৃহের দ্বারে দ্বারে সুচারু বেশ ভূষা ও পুষ্প শোভিত গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত। রাজ পথে জয়োৎসব। প্রথম উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ চলিয়া গেলেন। তাহার পর এক দল বাদ্যকর। তাহার পর জয়চিহ্ন সকল আনীত হইল, রাইন ও রোন নদীর দেবতা এবং স্বর্ণময় সমুদ্রের স্বর্ণ গঠিত মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল। চিত্র দ্বারা সেবেনার অনন্ত তুষার আর্ভাণের তুঙ্গ শৈলমালা ইত্যাদি বিজিত প্রদেশের অনেক মনোহর দৃশ্য প্রদর্শিত হইল। আভিকরণের দুর্গ ও প্রাচীরের মৃণ্ময় অনুরূপ, গলদেশীয় নূতন উদ্ভিদ, ইত্যাদি অনেক দ্রব্য একে একে প্রদর্শিত হইল, একদল লোক সুমধুর বাঁশী বাজাইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর বলিদানের নিমিত্ত সজ্জিত সুবর্ণ-পুষ্প-শোভিত-শৃঙ্গ একটী শ্বেত বৃষ ও বিজিত দেশস্থ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি নানাবিধ নূতন জন্তু আনীত হইল। তাহার পর বিজিত জাতির জাতীয় পতাকা। আজ আবার এই সুদীর্ঘ কালের পর ভারসিনজিটোরিক্স ও ভারগেলিনস তাঁহাদের জাতীয় পতাকা দেখিতেছেন, আজ আবার নিজবেশে নিজ বর্ম্ম পরিয়া নিজ জাতি পরিবৃত হইয়া জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়াইয়াছেন। যে এক দিন এই বেশে এই পতাকার নীচে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে দাঁড়াইয়াছিল, আজ হস্তপদাবদ্ধ সে রোমের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য দণ্ডায়মান! হায় অদৃষ্ট! তোমার বিচিত্র গতি কে জানে? ঐ যে সর্ব্বশেষে চারিটি শ্বেতাশ্ব-বাহিত-সুবর্ণময় রথে চড়িয়া বিজয়মাল্যে মস্তক ভূষিত করিয়া উৎসবের নায়ক সীজর আসিতেছেন, একজন ক্রীতদাস তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ মুকুট ধরিয়া আছে, কিন্তু রোমান পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার কানে বলিতেছে "মনে রাখিও তুমিও মানুষ"—হায়! তখন তিনি কি মনে করিয়াছিলেন অদৃষ্টের বিচিত্র গতিতে এ কথাও একদিন সফল হইবে? তখন কি তিনি জানিতেন তাহার পশ্চাতে ঐ যে মাল্যভূষিত মস্তক মানব সমুদ্র চলিয়াছে, তাহার মধ্যে তাঁহার পার্শ্বস্থিত তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় একজনই তাঁহার হন্তারক!

বিজয়ী বীর উৎসবের মধ্য দিয়া রাজধানী চলিয়া যাইলেন—ভারসিনজিটোরিক্স সঙ্গীগণসহ অন্ধকার কারাগৃহে আনীত ও তথায় নিহত হইলেন। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে প্রকৃত বীর কে? সুবর্ণ রথ-আসীন সীজর—কি হস্তপদাবদ্ধ বন্দী ভারসিন্‌জিটোরিক্স? একজন রাজ্য লালসায় সহস্র সহস্র নগর ধ্বংস করিয়াছেন, সহস্র সহস্র মানবের প্রাণ নষ্ট করিয়াছেন—আর একজন দেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন, দেশবাসীগণের জন্য অকাতরে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। প্রকৃত বীর কে?

স্থানাভাব প্রযুক্ত এবার মূল্য প্রাপ্তি ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা গেল না।

গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতী ও বালকে যে দুইটি সমালোচনা বাহির হয়, শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চৌধুরী তাহার প্রথমটির সমালোচক—কিন্তু ভ্রমবশতঃ তাঁহার নামটি সেই সমালোচনার নীচে ছাপা না হইয়া দ্বিতীয়টির নীচে ছাপা হইয়া গিয়ছে।

ভাং সং।

শ্রীপঞ্চমী।

আঁধারেতে দিশেহারা
সুনীল আকাশ সিন্ধু
অনন্তের পানে চাহি রয়েছে পড়িয়া—
সে মহা আঁধার হ'তে
রূপের বিমল আলো
ফুটিতেছে একটু করিয়া।
অতল জলধি হ'তে
যেন গো কমলা রাণী
উঠিছেন জগত মাঝার—
পূরবে অরুণ-রেখা
ধীরে ধীরে ফুটিতেছে,
তিলে তিলে খসিছে আঁধার।
ঘুমন্ত বিশ্বের প্রাণে
নব প্রাণ ফুটে উঠে,
পাখীগুলি গেয়ে ওঠে গান—
তরুণ-অরুণ স্পর্শে
হরষে কমল-কলি
মেলিতেছে অফুট-নয়ান।
কোথা মা ভারতি রাণি
এস দেবি বীণা-পাণি,
কমলেতে হও অধিষ্ঠান—
শ্রীপঞ্চমী দিনে আজ
আহ্বান করিছে তোমা'
শত শত ভারত-সন্তান।
বহু দিন পরে আজি
উষার আভাস টুকু
দেখা যায় আঁধারের শিরে—
হরষ-পুলকে ভরা
হৃদয়-কমলগুলি
প্রেম-বায়ে খেলা করে ধীরে।

তোমার প্রসাদে মর্ত্তা
ফুটিছে নবীন যুগে
প্রতিভার অফুট-আলোক,
ভারতের ঘুমঘোর
যেতেছে ভাঙ্গিয়া আজ,
ভুলিবে বুঝি সে দুখ-শোক।
বরষ গিয়েছে শত,
চলে গেছে যুগ কত,
আস নাই ভারত ভিতরে—
ফোটেনি সুহাসি তব,
বাজেনি মধুর বীণা
কত দিন ভারতের ঘরে।
দীন হীন ছেলেগুলি
মৃতপ্রায় বুকে তুলি
ছিল পড়ে দুখিনী আঁধারে,
শুথান কাননে তার,
ছিল না কুসুম-রাজি—
কি দিয়ে সে পূজিবে তোমারে?
ভারত-অসাড়-প্রাণে
জেগেছে নূতন প্রাণ
ভায়ে ভায়ে মিলিয়াছি আজ—
গলায় একতা-হার,
প্রেমের বারতা মুখে
প্রাণে জাগে "জাতীয় সমাজ"
শত হৃদি-দলে মিলে
ফুটিয়াছে শতদল,
আসন পেতেছি তোমা তরে—
ডাকিতেছি শত কণ্ঠে,
বীণাখানি হাতে লয়ে
এস পুনঃ বহু দিন পরে।

মোহিনী-বীণাটী লয়ে,
আগেকার মত করে
বাজাও গো দেবি আরবার—
উথলি সাগর জল,
কাঁপায়ে হিমাদ্রি-প্রাণ,
বিমানেতে উঠুক ঝঙ্কার।
আশার কিরণে রাঙা
নব প্রতিভার আজ
দেখা যায় যে ক্ষীণ আভাস—
ধীরে ধীরে তুমি দেবি
ফুটায়ে তোলোগো তারে,
পূর্ণ রবি হউক বিকাশ।
"জাতীয় সমাজ" তীর্থে—
ভায়ে ভায়ে মিলি আজ
মহা ব্রত করেছি গ্রহণ,
শ্মশানে ফুটেছে ফুল—
চরণ পরশে তব
পূর্ণ কর এ মহা মিলন।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

—•—

বন্দনা গান।

অমল কমল পরে
চরণ-কমল রাখি—
কোথা মা কমলাননা
ভারতী কমল-আঁখি,
স্বর্ণ-বীণা ল'য়ে করে
আয় গো মানস-সরে,
হৃদয়-কমল পরে
বারেক দাঁড়াও দেখি।
কোথা গো কমলাননা
(শারদে কমল আঁখি)
(ওমা) লয়ে নব ফুল-রাজি,
সাজায়ে কুসুম সাজি
আসিছে বসন্ত নব
তোমারে পূজিতে রাণী।
এ দীনা তনয়া তোর,
কি দিবে—কি আছে মোর?
(মাগো,) মলিন কুসুম-ডোর,
কিসে পূজি পা দুখানি?
নাহি মিষ্ট স্বর তান
কি গাব বন্দনা গান,
দিব উচ্ছাসিত প্রাণ,
ইহা কি লবি জননী?
ললিতে ঝঙ্কারি তান,
শুনাগো আশ্বাস-গান—
জাগাও মুমূর্ষু প্রাণ
দিয়ে জ্ঞান সঞ্জীবনী।
(হায়) ভারত আঁধার ঘোর,
নয়ন কিরণে তোর
যদি মা ফুটিয়া উঠে
ফুটিবে হৃদয় শত—
প্রেমের মলয়-বায়,
আবার এ বনে হায়
বহিবে, গাহিবে পাখী
নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে কত!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

—

একমেবাদ্বিতীয়ং।

(কার্ত্তিক মাসের পর)

মনুষ্য-চিত্তের প্রীতিভাব প্রধানতঃ দুই প্রকারের দেখা যায়; চিত্তের প্রীতির্ভাব দুই প্রকারের হওয়ায় সমাজে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রচলিত হইয়াছে।

আমি যাঁহাকে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝি, তাঁহার অদর্শানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করিবার অভিলাষে তাঁহাকে যে ভক্তি করি, সেই ভক্তি অদ্বৈতভাবের ভক্তি। দয়াবান্‌কে ভক্তি করি বলিয়া যখন নিজে দয়াবান্ হইতে ইচ্ছা উপস্থিত হয়,তখন সেই ভক্তিকে অদ্বৈত ভাবের ভক্তি বলা যায়। এইরূপ স্থলে "দয়াবান্" এই কথাটিতেই আমার ভক্তি সংস্থাপিত থাকে, এবং আমিই সেই "দয়াবান্" হইতে চাই—এই সংবেগ অন্তরে উপস্থিত হয়।

কিন্তু দয়াবান্‌কে দয়াবান্ জানিয়া তাঁহার নিকট হইতে দয়া পাইবার অভিলাষে তাঁহাকে যে ভাল বাসি, তাহা দ্বৈতভাবের ভক্তি। এই স্থলে ভক্তির আধারের যে নাম, ভক্ত সেই নামে অভিহিত হইতে ইচ্ছুক নহেন; ভক্তির আধারের নাম "দয়াবান্", ভক্তের নাম "দয়াপ্রার্থী"। অদ্বৈতভাবের ভক্তিতে ভক্ত ভক্তির আধারের উপাধি এবং নিজের উপাধি এক করিতে চাহেন, কিন্তু দ্বৈতভাবের ভক্তিতে ভক্ত ভক্তির পাত্রের নামে নিজে অভিহিত হইতে ইচ্ছা করেন না।

তুমি এক জন মহৎ লোক; যে যে গুণ আছে বলিয়া তুমি মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছ, আমাকে সেই সেই গুণে ভূষিত করিবার জন্য তুমি আমাকে যে স্নেহ করিবে, তাহা অদ্বৈত ভাবের স্নেহ। মনে কর তুমি স্বাধীন পুরুষ, তোমার মনের স্বাধীনতা আছে বলিয়া তোমার মাহাত্ম্য। তুমি যদি আমাকে স্বাধীন করিবার অভিলাষে আমাকে স্নেহ কর, তবেই তাহা অদ্বৈতভাবের স্নেহ। কিন্তু তুমি স্বাধীন অথচ আমাকে স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা তোমার নাই, আমি তোমার অনুগত বলিয়া তুমি আমাকে স্নেহ কর, তোমার অধীন হইয়া থাকি, এই জন্যই তুমি আমাকে স্নেহ কর; এইরূপ স্নেহ দ্বৈতভাবের স্নেহ। তোমার "স্বাধীন" নাম এবং আমার "পরাধীন" নাম, এই দুইএর প্রভেদ দূর করিবার জন্য যে ভালবাসা—তাহাই অদ্বৈত ভাবের স্নেহ; কিন্তু যেখানে এই প্রভেদ দূর করিবার অভিলাষ নাই অথচ ভালবাসা আছে, তাহা দ্বৈতভাবের ভালবাসা।

আমি বাঙ্গালী, তুমিও বাঙ্গালী; তোমার উপাধি এবং আমার উপাধি সমান হওয়ায় আমি তোমাকে যে ভালবাসি, তাহা অদ্বৈত ভাবের প্রণয়। আমি বাঙ্গালী—হীনবল প্রজা, আর তুমি ইংরেজ—প্রতাপশালী রাজা, অথচ তোমায় আমায় ভালবাসা আছে, আমি প্রতাপশালী রাজা হই—এ ইচ্ছা আমারও নাই, তোমারও নাই; কিন্তু তথাপি আমি তোমার প্রতাপে মুগ্ধ, সেই জন্য তুমি আমায় ভালবাস; এরূপ ভালবাসা দ্বৈতভাবের ভালবাসা।

আমিও যাঁহার পুত্র,তুমিও তাঁহার পুত্র,এই জন্য তোমায় আমায় যে ভালবাসা—তাহা অদ্বৈত ভাবের ভালবাসা। ভ্রাতৃভাব অদ্বৈত ভাবের প্রীতি।

আমি পুরুষ এবং তুমি স্ত্রী ;এই জন্য তোমায় আমায় যে ভালবাসা—তাহা দ্বৈতভাবের ভালবাসা। দাম্পত্য প্রণয়ের ভাব দ্বৈতভাব। স্ত্রী ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান দূর হইলেই দাম্পত্য প্রণয়ের ভাব অন্তর হইতে দূর হইয়া যায়।

পিথাগোরসের দর্শন মতে "এক" এই কথাটিতে চিত্তের যে ভাব বুঝায়, তাহাই "অদ্বৈত ভাব" এবং "দুই" এই কথাটিতে চিত্তের যে ভাব বুঝায়, তাহাই' "দ্বৈতভাব"।

চিত্তে যখন দ্বৈতভাব প্রবল থাকে,তখন মনুষ্য "আমি" ছাড়া আর এক জনকে খুঁজিয়া বেড়ায় ; তখন চিত্তে মিথুন-ভাবাত্মক বৃত্তি প্রকাশ পায়—অর্থাৎ বৃত্তি যুগপৎ অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী হইয়া চিত্তে উদয় হয়। যেমন এক খণ্ড লৌহ চুম্বক প্রস্তরের নিকটে রাখিলে সেই লৌহটিতে মিথুন-ভাবাত্মক ম্যাগনেটিজম্ শক্তির প্রকাশ পায়, সেইরূপ সুখভোগ কামনা থাকায়, মনুষ্য চিত্তে মিথুনভাবাত্মক দ্বৈতভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তখন চিত্তের এক প্রান্ত আত্মাভিমুখী ও অপর প্রান্ত বাহ্য বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে। মানুষ তখন নিজেকেও ভালবাসে এবং সুখপ্রদ বাহ্য বিষয়কেও ভালবাসে।

ভোক্তা ও উপভোগ্য এই দুইটি জ্ঞানের একটি জ্ঞান আর একটি ছাড়া থাকিতে পারে না। ভোক্তা না থাকিলে উপভোগ্য কথার অর্থ নাই, এবং উপভোগ্য পদার্থ না থাকিলে ভোক্তা থাকিতে পারে না। ভোক্তা কথাটি এবং উপভোগ্য কথাটি একটি জ্ঞানের দুটি প্রান্ত স্বরূপ। চিত্তে দ্বৈতভাবের প্রীতি যখন দেখা যায়, তখন মানুষ নিজেকে প্রীতি-সুখের ভোক্তা জ্ঞান করেন, এবং সেই জন্যই "আমি" ছাড়া আর এক জনকে উপ-ভোগ্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কবি রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন যে "চিনি হতে চাই না মা চিনি খেতে চাই" এবং ইহা হইতেই দ্বৈতবাদীদের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। দ্বৈতভাবে ভক্ত আপনাকে প্রীতিসুখের ভোক্তা জ্ঞান করেন; সুতরাং তাঁহার আরাধ্য পদার্থকে উপভোগ্য পদার্থ স্বরূপ দেখিতেই ভাল বাসেন। আরাধ্য পদার্থকে ভাবনা করিয়া যে প্রীতি সুখ পাওয়া যায়, সেই সুখ ভোগের জন্যই দ্বৈতবাদী আরাধ্য পদার্থকে দ্বৈতভাবে ভক্তি করেন। দ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম-প্রীতি সকাম, কেননা দ্বৈতবাদী যদি নিজের মনের ভিতর ভাল করিয়া অন্বেষণ করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে তিনি নিজেকে সুখভোক্তা জ্ঞান করেন,এবং সেই সুখ ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে তাঁহার অভিলাষ না থাকাতেই তিনি জীবের জীব নাম ঘুচাইতে কখন ইচ্ছা করেন না। যতদিন আমি সুখ দুঃখ ভোক্তা, ততদিনই আমার জীব উপাধি থাকিবে ; কেন না যিনি সুখ দুঃখ ভোগ করেন, তাঁহারই নাম জীব। যাঁহার ব্রহ্ম প্রীতি নিষ্কাম, তিনিই অদ্বৈতবাদী।

দ্বৈতভাবের ভালবাসা এবং অদ্বৈতভাবের ভালবাসার মধ্যে যেরূপ প্রভেদ আছে,

তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। মনে কর দুই জন লোকে বেড়াইতে বেড়াইতে, একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখিতে পাইল; সেই পদ্মটির শোভায় ও সৎগন্ধে উভয়েরই মনে বড়ই একটা তৃপ্তি উপস্থিত হইল; উভয়েই সেই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পদ্মটিকে দেখিতে লাগিল; সেই পদ্মটিকে দেখিতে দেখিতে একজন বলিল "দেখ ভাই এই পদ্মের সৎগন্ধ এরূপ মনোরম যে, দিবারাত্রি এই পদ্মের গন্ধ আঘ্রাণ করিতেই ইচ্ছা হয়"। অন্য জন বলিল যে "এই পদ্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি ঐ পদ্মের সঙ্গে মিশাইয়া যাই; ঐ পদ্মটি যেমন সরোবরে ফুটিয়া যেমন হাসিতেছে, ঐ রকম ফুটিয়া পদ্মফুল হইয়া থাকিতেই আমার ইচ্ছা হয়"। এই দুই জনের মধ্যে প্রথম জন পদ্মটিকে দ্বৈতভাবে ভাল বাসিয়াছেন, অন্য জনের ভালবাসা ভাবকে অদ্বৈত-ভাবের ভালবাসা বলা যায়। এক জন পদ্মের সৌন্দর্য্যে তাঁহার অহং জ্ঞানটি মিশাইয়া দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু অন্য জন নিজের অহংজ্ঞান বজায় রাখিয়া পদ্মের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেই ইচ্ছা করেন। যে প্রীতিতে অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন দিবার আগ্রহতা জন্মে, তাহাই অদ্বৈতভাবের প্রীতি; যেখানে নিজের পৃথক নাম বজায় রাখিতে অভিলাষ থাকে, তাহাই দ্বৈতভাবের প্রীতি। দ্বৈতভাবের প্রীতিতে মনুষ্যের মনে সুখভোগ বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে; সেই জন্যই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীগণ দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে এত তর্ক বিতণ্ডা করিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী বলেন যে "ব্রহ্মনাম" রূপ অগ্নিতে নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম নাম সমস্তই আহুতি প্রদান করাই ব্রহ্মোপাসনা; তন্মধ্যে নিজের "জীব" নামটি অর্থাৎ "সুখ দুঃখ ভোক্তা" এই নামটি আহুতি প্রদান করাই ব্রহ্মোপাসনার পূর্ণাহুতি। দ্বৈতবাদীও ব্রহ্মাগ্নিতে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম আহুতি দিয়া উপাসনা করেন, কিন্তু পূর্ণাহুতিটি দিতে চান না। যাঁহারা দ্বৈতভাবের ভক্তি-রসে সিক্ত হইয়া আনন্দ উপ-ভোগ করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে আপনা হইতে পৃথক্ ভাবিয়া, ব্রহ্মকৃপা প্রার্থনা করিয়া উপাসনা করিতেই ভাল বাসেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মাগ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিবার জন্যই ব্রহ্ম নাম ভাল বাসেন।

যাঁহারা ব্রহ্মকে দ্বৈতভাবে ভক্তি করিতে ভালবাসেন, এবং যাঁহারা অদ্বৈতভাবে ভক্তি করিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের উভয়ের উপাসনা পদ্ধতি বিভিন্নরূপ হওয়াতেই মনুষ্য-সমাজে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইয়া একটি বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে।

দ্বৈতভাবের ভালবাসা এবং অদ্বৈতভাবের ভালবাসা আলোচনা করিয়া আমি ইহাই বুঝিয়াছি যে, দ্বৈতভাবের ভালবাসা হইতেই সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং অদ্বৈত-ভাবের ভালবাসা হইতেই এই সংসার-চক্রের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে একটি আকর্ষণ সম্বন্ধ আছে, জীবের সহিত ব্রহ্মের সেইরূপ একটি আকর্ষণ সম্বন্ধ আছে। দুটি দ্রব্য পরস্পর পরস্পর-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর মিশিয়া এক হইয়া যাইবার চেষ্টা করে; জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া এক হইয়া

যাইবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেছে। সূর্য্য পৃথিবীকে তাহার নিজের দিকে অনবরতঃ টানিতেছে, কিন্তু পৃথিবী তথাপি সূর্য্যের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে না কেন, ইহা বুঝিলেই জীব কেন যে ব্রহ্মপদে লীন হইতে পারে না—অর্থাৎ জীব নাম ও ব্রহ্ম নামে কেন যে পৃথক অর্থ রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। সূর্য্য পৃথিবীকে তাহার সহিত মিশাইবার জন্য অনবরতঃ টানিতেছে ও পৃথিবীও সে দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য আর এক দিকে যাইবার চেষ্টা আছে, এবং সেই জন্য পৃথিবী সূর্য্যের সহিত মিশিতে পাইতেছে না, সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। আদি শক্তি ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবও সেইরূপ অহরহঃ আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু জীব সেই আদি শক্তির সহিত মিশিতে যায় না, নিজের সুখানুযায়ী অন্য দিকে চলিতে যায়, এবং সেই জন্যই জীব সংসার-চক্র-পথে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। জীব আদি শক্তিকে জানিয়াই হউক, বা না জানিয়াই হউক ভক্তি করিতেছে (কেননা যতদিন জীব ব্রহ্ম শক্তিতে না মিশে, ততদিন সেই আদি শক্তি কর্ত্তৃক সে আকৃষ্ট হইবেই হইবে) কিন্তু ঐ ভক্তি দ্বৈতভাবের ভক্তি; জীব সেই আদি শক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকিতেই ভাল বাসে, এবং সেই জন্য সেই ব্রহ্ম পদার্থে মিশিয়া এক হইয়া যাইতে চায় না; ব্রহ্ম পদার্থে মিশাইয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন লক্ষ্য থাকায় সেই লক্ষ্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে, এবং সেই জন্য পৃথিবীর ন্যায় ঘুরিয়া মরে। পৃথিবীর কেন্দ্রবিমুখ গতি যদি কোন রকমে বন্ধ করা যায়, তবে পৃথিবী সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অল্প দিনেই যেমন সূর্য্যের সহিত মিশিতে পারে, সেইরূপ জীব যদি ব্রহ্ম পদার্থে মিশিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য লক্ষ্যাভিমুখে গমনে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবে অল্পদিনেই ব্রহ্মাকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মপদে মিশিতে সক্ষম হয়।

কি চেতন জগতে, কি জড় জগতে—আকর্ষণের নিয়ম সর্ব্বত্রই এক প্রকার; চেতন জাতীয় আকর্ষণের নামই ভালবাসা, স্নেহ, প্রণয় ও ভক্তি। যদি একটি দ্রব্য অন্য দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, এবং যদি এই আকর্ষণী শক্তির অন্য কোন প্রতিকূল শক্তি না থাকে, তবে ঐ আকর্ষণী শক্তির বশে উহারা পরস্পর মিশিয়া এক হইবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে এবং শেষে মিশিয়া এক হইয়া যায়। চেতন জগতে যে প্রীতিশক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রীতির বশে একটি চেতন জীব আর একটির সহিত মিশিয়া এক হইতে চায়। মিশিয়া এক হইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে একটি মন যখন আর একটি মনের দিকে অগ্রসর হইতে চায়, তখনই মনে প্রীতির উদয় হইয়াছে বলা যায়; কিন্তু সাধারণতঃ আমরা প্রীতি শক্তির কার্য্য যেরূপ দেখিতে পাই, তাহাতে একটি মন যে ভালবাসার বশে অন্যটির সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে—এরূপ ত দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে কি এ সংসারে প্রীতি নাই? প্রীতি আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবের মনে প্রীতির প্রতিকূল অপর একটি শক্তি নিয়ত বিরাজ করিতেছে, সেই জন্যই জীব ভাল-

বাসিয়াও ভালবাসার আধার পদার্থের সহিত মিশিয়া এক হইতে পারে না। প্রীতির প্রতিকূল শক্তির নাম কাম—অর্থাৎ স্বার্থ-সুখাভিলাষ। এই দুটি শক্তির বশে জীব ভালবাসার আধার পদার্থের চারি দিকে ঘুরিতে থাকে। পৃথিবীর কেন্দ্র বিমুখ গতি—আর জীবের স্বার্থসুখে প্রবৃত্তি একই রকমের বলিয়া তুলনা করা যাইতে পারে।

সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ঈশ্বরে ভক্তি রাখিবে, এই কথাটির অর্থ—ঈশ্বরকে অদ্বৈতভাবে ভক্তি করিবে। মনের যত রকম বাঁধন আছে, সমস্ত কাটিয়া ফেলিয়া মনকে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলেই মন ঈশ্বরাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হইবে এবং শেষে ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া যাইবে। কিন্তু যিনি দ্বৈতভাবে ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে ভাল বাসেন, তিনি সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিতে গিয়াও একটি কামনা ত্যাগ করিতে পারেন না। ঈশ্বরে ভক্তি সংস্থাপন করিয়া ঈশ্বর ধ্যানে নিজের যে সুখ বোধ হয়, দ্বৈতবাদী সেই সুখ-কামনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না; নিজের একটি পৃথক অস্তিত্ব (Separate existence) রক্ষা করিবার অভিলাষ দ্বৈতবাদীর মনে থাকিয়া যায়, এক কথায় দ্বৈতবাদী অহংকারশূন্য হইতে পারেন না। বিশ্বরূপ ঈশ্বর ছাড়া আমার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে—এই জ্ঞানই অহঙ্কার, এবং এই অহঙ্কার নিবন্ধনই মনুষ্যের সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হয়। নিষ্কাম ঈশ্বর-প্রীতি অভ্যাসকেই যিনি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা বলিতে চান, তিনিই অদ্বৈতবাদী। যাঁহার কোন কামনাই নাই, নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখিতেও তিনি উৎসুক নহেন। যিনি ঈশ্বর প্রীতির স্রোতে আপনাকে একেবারে ঢালিয়া দিয়াছেন, তিনি সেই স্রোতের বশে অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রে গিয়া মিলাইয়া যাইবেন। কিন্তু যিনি ঈশ্বর-প্রীতিরূপ নদীতে বাস করিতেই অভিলাষ করেন, তাঁহাকে কোন না কোন আবর্ত্ত মধ্যে বাস করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রীতিরূপ নদীতে ছয়টি প্রধান আবর্ত্ত আছে; এই ছয়টি আবর্ত্ত পার হইয়া ব্রহ্ম সমুদ্রে যাইতে হয়। সাংখ্য যোগীগণ এই ছয়টি আবর্ত্তকে ষট্‌চক্র বলিয়া বর্ণনা করেন, এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্ম সমুদ্রে মিশিতে পারিলেই জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

দুটি মনে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়াই প্রীতি চর্চ্চার চরম ফল; দুটি মনে মিশিয়া এক হইয়া গেলে প্রীতির বেগ আর থাকে না; অদ্বৈতবাদী বলেন যে, যেরূপ ভক্তির ফলে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ জ্ঞান থাকে না, তাহাই প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তি। কিন্তু যেরূপ ভক্তি নিবন্ধন জীব ঈশ্বর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও ভেদ জ্ঞান দূর করিতে চান না, সেই ভক্তি ঈশ্বরে অনন্যা ভক্তি নহে; এই শ্রেণীর ভক্ত জন যদি আপনার অন্তর সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারেন যে তাঁহার মনের গতি কেবলমাত্র ঈশ্বরাভিমুখী হয় নাই; নিজের সুখ ভোগ বাসনার বীজ তখনও তাঁহার অন্তরে রহিয়াছে। মানুষ মাত্রেরই সুখ ভোগ বাসনা এত প্রবল যে নিস্বার্থ প্রীতিরসের আস্বাদন কিরূপ, তাহা আমরা বড় একটা বুঝি না; অদ্বৈত ভাবের প্রীতি আমাদের সংসারে বড় বেগবতী

হইতে পায় না, এবং সেই জন্যই অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈতভাবের ভক্তি কিরূপ পদার্থ—তাহা আমরা সাধারণে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই জন্যই দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদীকে ভক্তি-শূন্য বলিয়া তাঁহার সহিত বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হন।

আজকাল মনুষ্য সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে অদ্বৈতভাবের প্রণয়ের মধুরতা আমরা সাধারণে বড় একটা উপলব্ধি করিতে পারি না। ইহার প্রমাণস্বরূপ এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কাব্য জগতে নায়ক নায়িকার প্রণয়ের মাধুর্য্য বর্ণনারই ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভ্রাতৃভাবের মাধুর্য্য-প্রকাশক কাব্য অত্যন্ত বিরল।

"Great or good or kind or fair
I will ne'er the more despair;
If she love me, this believe
I will die e're she shall grieve
If she slight me when I woo,
I can scorn and let her go;
For if she be not for me
What care I for whom she be?"

G. Wither.

এই কবিতাতে দ্বৈতভাবের ভাল বাসা বেশ বর্ণিত আছে; এইরূপ ভালবাসায় "সে আমার তাই আমি তার।" এরূপ ভালবাসায় আত্মবিসর্জ্জন হইতে পারে না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে সকল ভক্ত সাধকের সহিত ঈশ্বরের নায়ক নায়িকা ভাবকেই প্রীতির শ্রেষ্ঠভাব বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রকৃত স্বার্থ বিসর্জ্জনের পথে যাইতেছেন বলিয়া বোধ হয় না।

আর এক দল বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা ঈশ্বরকে নায়করূপে এবং প্রকৃতিকে নায়িকারূপে ভাবনা করেন এবং আপনাকে এই নায়ক নায়িকার বিহারের দ্রষ্টা স্বরূপ ভাবনা করেন; ইঁহাদের ব্রহ্মভক্তি দ্বৈতভাবের ভক্তি নহে। ইঁহাদের উপাসনা প্রণালী হইতে ইহা বুঝা যায় যে, সাধক ঈশ্বর * ও প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র—এই সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে—কেবল মাত্র দ্রষ্টা স্বরূপ থাকিতে চেষ্টা করিয়া ব্রহ্ম সারূপ্য লাভ করিতেই যত্নশীল। কবি জয়দেব এই ধরণের উপাসক। দ্বৈতভাবের প্রণয়ী একা থাকিতে পারেন না, আর একজন প্রণয়ী খুজেন এবং তাহাকে ভালবাসিয়া প্রেমের প্রতিদান খুঁজেন। কিন্তু অদ্বৈতভাবে ভাবুক জন একা থাকিয়া, আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন

---

* ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই দুইটি কথায় ভিন্ন অর্থ বুঝায়। অনেক স্থলে ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই দুইটি কথা সুবিধার জন্য এক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে ঈশ্বর কথাটি উহার প্রকৃত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রচার ২য় খণ্ড "ব্রহ্ম ও ঈশ্বর" প্রবন্ধ দেখ।

এবং যেখানে দ্বৈতভাবের স্রোত বহিতেছে দেখেন, সেই স্রোতে নির্লিপ্ত থাকিতে সতত সচেষ্ট থাকেন।

"ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান" ॥

রবীন্দ্রনাথ।

যে জগতে এইরূপ প্রেমের আদান প্রদান, সেখানে মনুষ্যচিত্ত যে সহজেই প্রেমের আদান প্রদানে উন্মত্ত হইবে, ইহাই সম্ভব। দ্বৈতভাবের প্রণয়ের মাদকতা শক্তি নিবন্ধন সাধারণে অদ্বৈতভাবের রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; সেই জন্যই অদ্বৈত-বাদ লোকের মনে লাগে না; সেই জন্যই একমেবাদ্বিতীয়ং কথাটির ভিন্ন ভিন্নরূপ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। যে ফুলটি ভালবাসি, সেই ফুলটি দিয়াই ইষ্টদেবতার পূজা করিতে প্রবৃত্তি হয়—সেইরূপ যে জাতীয় প্রীতিভাবকে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রীতিভাব অবলম্বনে ইষ্টদেবতাকে পূজা করিতেই প্রবৃত্তি হয়, সেই জন্যই দ্বৈত-প্রীতিরসে মুগ্ধ জন "ব্রহ্ম নামে" দ্বৈতভক্তি স্থাপন করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু দ্বৈত-প্রীতিরসে যাঁহাদের বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে, তাঁহারা "ব্রহ্মনামে" অদ্বৈত ভক্তি সংস্থাপন করিয়া সকল কামনা, সকল সুখ দুঃখ, জ্ঞান বিসর্জ্জন করিতে সতত সচেষ্ট থাকেন।

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে" ॥　　গীতা ২। ৫৫

হে পার্থ যিনি সকল মনোগত কামনা ত্যাগ করিয়া আপনি আপনাকে লইয়াই তুষ্ট থাকেন, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়।

এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকই যথার্থ অদ্বৈতজ্ঞানী।

আমি ছাড়া জগতে আর যা কিছু পদার্থ আছে, সবই আমার কাছে বাহ্য বিষয়। আমার নিজের অস্তিত্বকে ইংরাজীতে "subjective existence" বলে, এবং আমি ছাড়া আর যা কিছু পদার্থের অস্তিত্ব বোধ করি, তাহাদের অস্তিত্বকে "objective existence" বলে। হিন্দু দার্শনিকগণ মতে ব্রহ্মের objective existerce নাই, কিন্তু ব্রহ্মকে "আমি" ছাড়া অন্য পদার্থ ভাবিলে ব্রহ্মকে বাহ্য পদার্থস্বরূপ দেখা হইল। সাংখ্য যোগীগণের মতে পুরুষের অস্তিত্ব subjective এবং প্রকৃতির অস্তিত্ব objective। যাঁহারা উপাস্য পদার্থকে আপনা হইতে পৃথকভাবে ভাবেন, তাঁহাদের প্রীতির স্রোত ব্রহ্ম-সমুদ্রে মিশিতে পায় না; তাঁহাদের প্রীতি-স্রোত প্রকৃতি-সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়। যাঁহারা দ্বৈতভাবে পূজা করেন—জানিয়াই হউক, বা না জানিয়াই হউক—তাঁহারা প্রকৃতির উপাসক। যিনি যে ভাবে পূজা করেন, তিনি সেই ভাবের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে প্রাপ্ত হন। প্রকৃতি

দেবী দ্বৈতভাবের অধিষ্ঠাত্রী; এই জন্য পিথাগোরসের দর্শন শাস্ত্রে "দুই" এই সংখ্যাটিতে প্রকৃতিকে বুঝায়। সুতরাং দ্বৈতভাবে উপাসনা করিলে পরম পুরুষের উপাসনা করা হয় না, উহা প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির উপাসনা।

প্রকৃতি মিথুনাত্মক এবং এই মিথুনাত্মক প্রকৃতি হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; পরম পুরুষ এই মিথুনের বিহারের দ্রষ্টা মাত্র।

তস্মৈ সহোবাচ প্রজাকামোবৈ প্রজাপতিঃ স তপোতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সমিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি"।

প্রশ্নোপনিষৎ

ঋষি তাঁহাকে বলিলেন, সেই প্রজাপতি প্রজা কামনা করিয়া তপস্যা করিলেন; এই তপস্যা হইতে মিথুন উৎপন্ন হইল। এই মিথুন অর্থাৎ রয়ি ও প্রাণ—অন্ন ও অত্তা (যিনি অন্ন ভোগ করেন) এই উভয়ে আমার নানাবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে।

(এখানে অন্ন অর্থে সকল উপভোগ্য পদার্থ বুঝিতে হইবে)

এই মিথুন হইতেই সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি আপনাকে এই মিথুনের একজন বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি সংকল্পত্যাগী হইতে কখনই সমর্থ হইবেন না। সংসার চক্র তাঁহার পক্ষে নিবৃত্ত হইবে না। কিন্তু যিনি আপনাকে এই মিথুন হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝেন, প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান তাঁহারই অন্তরে উদয় হইয়াছে, এবং তিনিই দ্বৈতপ্রীতিরসে অনাসক্ত। অদ্বৈতভাবে চিত্ত স্থির রাখা বড় শক্ত কথা; শক্ত হইলেও যাহা শ্রেয়ঃ, সেই বিষয়ে সকলের সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

অন্যচ্ছ্রেয়োন্যদুতৈব প্রেয়স্ত উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তের্থাদ্যউ প্রেয়ো বৃণীতে ॥১

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্য মেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোভি প্রেয় যো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥

কঠোপনিষৎ ২য় বল্লী।

শ্রেয় অন্য আর প্রেয় অন্য। এ উভয়েই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পুরুষকে আবদ্ধ করে, ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন,তাঁহার মঙ্গল হয়, আর যিনি প্রেয়কে স্বীকার করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হন।

শ্রেয় আর প্রেয় ইহারা মনুষ্যকে অধিকার করে; ধীর ব্যক্তি তাহাদিগকে বুঝিয়া পৃথক্ করেন। ধীর ব্যক্তি প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন; আর মন্দ ব্যক্তি যোগক্ষেম নিমিত্তই প্রেয়কে গ্রহণ করেন।

চিত্তের দ্বৈত ভাব প্রেয়, কিন্তু অদ্বৈতভাব শ্রেয়। সুতরাং সেই অদ্বৈতভাব অভ্যাস করিবার জন্য ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে ব্রহ্মে অদ্বৈত ভক্তি সংস্থাপন করিতে যত্নশীল হওয়াই

কর্ত্তব্য। 'ব্রহ্ম' নির্গুণ সুখ দুঃখ রহিত; সেই ব্রহ্মনামে ভক্তি সংস্থাপন করিয়া নিজে নির্গুণ এবং সুখ দুঃখ রহিত হইতে যত্নশীল হওয়াই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

বোম্বাই সহর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(ইতিহাস-পরিশিষ্ট)

মহাদাজীর মৃত্যুর অনতিকাল পরে পেশওয়া ও নিজামের মধ্যে চৌথ লইয়া যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম। নিজাম আলি ব্রিটিস সিংহকে স্বপক্ষে টানিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। তখনকার বড় লাটসাহেব সর জন শোর এ বিবাদে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। শীঘ্রই যুদ্ধারম্ভ হইল। মহারাষ্ট্রীয় মহা মহা বীরেরা পেশওয়ার পতাকাতলে এই শেষ বারের বার সম্মিলিত হইলেন। মহাদাজীর উত্তরাধিকারী দৌলতরাও সিন্দে তথা তুকাজী হোলকর পুণাতেই ছিলেন। নাগপুর রাজা ভোঁসলাও তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া জুটিলেন। গোবিন্দ রাও গাইকওয়াড় গুজরাট হইতে ফৌজ পাঠাইলেন। রাস্তে ও পটবর্দ্ধন, মালেগাম ও বিঞ্চুর পতি, পন্ত প্রতিনিধি, পন্ত সচিব, নিম্বালকর, পাটনকর, ঘাটগে, ডফলে, থোরাত, পওয়ার প্রভৃতি বড় বড় শূর সরদার জায়গীরদার স্বস্ব দলবল লইয়া রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। অশ্ব পদাতিক সর্ব্বসমেত প্রায় দেড়লক্ষ সেনা একত্রিত। পরশুরাম ভাউ সেনাপতি। আহমদনগর জিলার অন্তর্গত খর্ডায় যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে বড় একটা রক্তপাতের প্রসঙ্গ আসে নাই। যেমন গর্জ্জন, তেমন বর্ষণ নয়। কোন পক্ষের বিশেষ রণ চাতুরীও প্রকাশ পায় নাই। নিজামের অকারণ ভীরুতা ও ভয়ে পলায়ন বশতঃ মহারাষ্ট্রীরা সুলভ মূল্যে জয় ক্রয়ে সমর্থ হইল। বিলাসী নবাব তাঁহার জনানা সমাগমে রণস্থলে সমাগত। বেগম-প্রধানা রণ-বিভীষিকা দর্শনে মূর্চ্ছাপন্না, প্রাণনাথের শরণাপন্না; নবাব প্রিয়াকে সামলাইবেন, না যুদ্ধ করিবেন—কি করেন, ভাবিয়া পান না। শেষে পলায়নই সাব্যস্ত হইল। তাঁহার সেনানী বেচারা অপ্রস্তুত! মহারাষ্ট্রীগণ অবসর পাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইল। মহারাষ্ট্রীদের বীরত্ব প্রকাশ যেমনই হউক,

খর্ডায় নবাবী যুদ্ধ ১৭৯৩

তাহারা এই যুদ্ধে নিজাম সরকার হইতে দৌলতাবাদ প্রভৃতি ভূমিখণ্ড ও বিস্তর নগদ টাকা মিলিয়া বিলক্ষণ এক কামড় আদায় করিয়া লইল। নানার গৌরবের আর সীমা রহিল না। কোন বিদেশী রাজার সাহায্য বিনা অমন প্রবল শত্রুর পরাভব! ধন্য নানার নয় কৌশল! তাঁহার সৌভাগ্য-শশী স্বচ্ছ গগনে পূর্ণ কলায় প্রকাশিত। দৌলতরাও সিন্দিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন—তুকাজী হোলকার তাঁহার বাধ্য—রঘুজী ভোঁসলা ও অপরাপর ব্রাহ্মণ সরদারগণ তাঁহার অনুরক্ত। পেশওয়ার রাজ্যে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব গৌরব সঞ্চারের সকলি অনুকূল। এই সমস্ত শুভ লক্ষণ সত্তেও কোথা হইতে আচম্বিতে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া নানার আশা ভরসা বন্যায় ভাসাইয়া দিল;—তাঁহার জীবন স্রোত—ভারতের ইতিহাস স্রোত—চকিতের মধ্যে উল্টাইয়া ফেলিল।

পেশওয়ার আত্মহত্যা যে অনর্থ ঘটনার কথা সূচিত হইল, তাহা মাধবরাও পেশওয়ার আত্ম-হত্যা। তাঁহার বয়স যদিও বিংশতি বৎসর, তথাপি নানা তাঁহার সঙ্গে নাবালকের মত ব্যবহার করিতেন, তাঁহাকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিতেন না। এই অধীনতা-যন্ত্রণাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর নিদানভূত। মহাদাজী সিন্দের প্রতি নানার কটু ব্যবহারে পেশওয়ার মনে যে অসন্তোষের বীজ রোপিত হয়, সিন্দের মৃত্যুর পর অন্য কারণে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। তাহার বৃত্তান্ত এই—নানার ষড়চক্রে রাঘোবার তিন পুত্র কয়েদ ছিলেন, তাহাদের মধ্যে বাজিরাও একজন। এই বাজিরাও শাস্ত্রালাপ, শাস্ত্র নৈপুণ্য, রূপে গুণে বিখ্যাত, বাহিরের চাকচিক্যে লোকের মন ভুলান বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মাধবরাও সর্ব্বদাই তাঁহার গুণানুবাদ শুনিতে পাইতেন। কিসে তাঁহার কারামুক্তি হয়, তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়, পেশওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা। নানার মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি জানেন রাঘোবাই যত অনর্থের মূল—তাঁহার পুত্রদের দিয়া দেশের কল্যাণ কখনই হইবার নহে। তাঁহার পুত্রদের প্রশ্রয় দানে রাজ্যের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তিনি এই ধূয়া ধরিয়া পেশওয়াকে কত উপদেশ দেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। পেশওয়াকে যতই বুঝাইবার চেষ্টা করেন, ভ্রাতার প্রতি অনু-রাগ তাঁহার ততই আরো বৃদ্ধি হয়। বাজীরাও অবসর বুঝিয়া পেশওয়াকে চরের হাত দিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান। এই রূপে গোপনে তাঁহাদের পত্র ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। এক পত্রে বাজীরাও লেখেন "আমরা দু জনেই বন্দী—তুমি পুণায়, আমি জুনরে; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন—ভালবাসার উপর পরের কোন অধিকার নাই। পরস্পরের প্রতি আমাদের অনুরাগ যেন অটল থাকে। আমরা যদি আমাদের পিতৃ পিতামহের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া চলি, সময়ে আমরাও কৃতী হইব"। নানা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন—বাজীরায়ের বন্ধন দ্বিগুণিত করি-লেন—মাধবরাওকে নানা প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাধবরাও রাগ

করিয়া ঘরে বন্ধ হইয়া রহিলেন। দশারার দিন দস্তুরমত দরবার হইল। পেশওয়া যদিও সে উৎসবে বাধ্য হইয়া যোগ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের কষ্ট নিবারণ হইল না। তিনি জীবনের প্রতি আস্থাশূন্য উদাস হইয়া দশারা উৎসবের দু দিন পরে প্রাসাদের ছাতের উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনায় পুণায় হুলুস্থূল বাধিয়া গেল। রাজসিংহাসনে কে বসিবে, এই এক বিষম সমস্যা। রাঘোবার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজিরাও তাহার ন্যায্য অধিকারী, কিন্তু মন্ত্রীবর্গের মধ্যে আর এক প্রস্তাব উঠিল। তাঁহাদের মন্ত্রণা এই যে, মৃত মাধবরায়ের পত্নী যশোদাবাই বাজিরায়ের কনিষ্ঠ বিমনাজীকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন, এবং বিমনাজীকে পেশওয়া পদে অভিষিক্ত করা হয়। নানাও এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন—তাহা কার্য্যেও পরিণত হইল। এদিকে আবার দৌলতরাও সিন্দে বাজিরায়ের পক্ষ গ্রহণ করায় নানা বলবানের পক্ষ সমর্থন মানসে ফিরিয়া সেই দিকেই যোগ দিলেন। এইরূপ অশেষ উৎপাতের হস্ত এড়াইয়া অবশেষে ৪ঠা ডিসম্বর ১৭৯৬ এ বাজিরাও পেশওয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। অতঃপর দৌলতরাও সিন্দে বলপূর্ব্বক উজীর পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার কোপে পড়িয়া নানা ফর্ণবীস নগর দুর্গে বন্দীকৃত হন, বাজিরাও অনেক টাকা ঘুস দিয়া সিন্দের হস্ত হইতে তাঁহার মুক্তিসাধন করেন—ইত্যাদি অনেক ফাঁড়া কাটাইয়া নানা পরিশেষে প্রধান পদে নিযুক্ত হইলেন। বাজিরাও পেশওয়া—নানা ফর্ণবীস তাঁহার উজীর।

শেষ পেশওয়া বাজিরাও
১৭৯৬—১৮১৭

১৭৯৮এর মে মাসে লর্ড মর্ণিংটন (ভাবী ওয়েলেসলী) চতুর্থ গবর্ণর জেনেরল ভারতে সমাগত হন। আসিয়াই তিনি ন্যায় সত্যের দোহাই দিয়া অমৃত মধুর বাক্যে পেশওয়াকে পত্র লেখেন, কিন্তু ইংরাজদের মধুর বচনে রাজাদের তখন আস্থা নাই। ওয়েলেসলীর আগমনকালে ব্রিটিস রাজ্য ঘোর শঙ্কটে পরিবৃত। টিপু, নিজাম, সিন্দে সকলেই ফরাসিস মন্ত্রণার বশবর্ত্তী। ফরাসিস রণপণ্ডিতেরা তাঁহাদের সৈন্য সংগঠনে নিযুক্ত। এই সকল রাজা মিলিত হইয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে বিষম বিভ্রাট। গবর্ণর জেনেরল প্রথম হইতেই তাহার নিরাকরণে মনোনিবেশ করিলেন। ফরাসিসদের বিদায় দিয়া তৎপদে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ, ইংরাজ সৈন্য-বল নিযুক্ত করা, এই তাঁহার প্রথম চেষ্টা। নিজাম সহজে নতগ্রীব হইলেন। নানার পরামর্শে পেশওয়া সতর্ক ছিলেন, তিনি এখনো পর্য্যন্ত ফাঁদে পা বাড়াইতে সম্মত হইলেন না।

এই সময় টিপুর সহিত ইংরাজদের শেষ যুদ্ধ। রাজাদের ভিতরে ভিতরে টিপুর দিকে বিলক্ষণ টান, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু করিতে সাহস করিতেছেন না। পেশওয়া ও সিন্দের মধ্যে এ বিষয়ের কিংকর্ত্তব্য পরামর্শ চলিতেছে—এমন সময় শ্রীরঙ্গপট্টনের পতন

বার্ত্তা সমুপাগত। বাজিরাও বাহ্যিক বড়ই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। তিনি যদিও এ যুদ্ধে বিশেষ কোন সহায়তা করেন নাই, তথাপি সৈন্য পোষণ সন্ধিযুগে বদ্ধ করিবার আশয়ে গবর্ণর জেনেরল তাঁহাকে বিজিত প্রদেশের ভাগ দিতে সম্মতি প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু পেশওয়া কিছুতেই ধরা দিলেন না। প্রধান অন্তরায় নানা ফর্ণবীসের দূর দর্শিতা। নানার মৃত্যু ঘটনায় ইংরাজদের চিরবাঞ্ছিত মনস্কাম সিদ্ধ হইল।

নানা ফর্ণবীস মৃত্যু—১৮০০ } পুণা দরবারে নানা ফর্ণবীস একমাত্র পরিণামদর্শী বিচক্ষণ পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পেশওয়া রাজ্যের জীবন, বল, গৌরব যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সকলি বিনষ্ট হইল। নানা দীর্ঘাকৃতি, কৃশাঙ্গ, লক্ষ্যভেদী-উজ্জ্বল-তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, শ্যাম বর্ণ পুরুষ ছিলেন। ইংরাজদের প্রতাপও সত্য নিষ্ঠার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু অমন প্রবল শক্রকে বক্ষে স্থান দিলে বিষম বিপাকের আশঙ্কা বিবেচনায় তিনি ইংরাজদিগকে সাধ্যমত দূরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগে প্রথম মাধবরাও প্রণীত রাজ্য-ব্যবস্থা সংরক্ষণে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, শেষাশেষি নানা কারণে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ সহরে ঘাসীরাম কোতওয়ালের অত্যাচার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কোতওয়ালের দৌরাত্ম্যে লোকেরা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবর্গ এরূপ উদ্বেজিত হইয়াছিল যে, বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া পুরবাসীগণ স্বহস্তে প্রস্তর প্রহারে তাহার প্রাণদণ্ড করে। বাজিরায়ের আমলে নানা ফর্ণবীস রাজ্যের হিত কামনায় পেশওয়াকে স্বার্থ নিরপেক্ষ সৎপরামর্শ দানে সঙ্কুচিত ছিলেন না। কিন্তু রাজা যখন অব্যবস্থিত, ব্যসনাসক্ত, হীনমতি—তখন মন্ত্রী আর কত পারিয়া উঠিবেন?

নানার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে ভয়ঙ্কর অরাজকতা প্রসূত হইল। পেশওয়ার শাসন নির্জীব অন্তঃসার-শূন্য, চতুর্দ্দিকেই বিপ্লব, যে যেখানে পারে, সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা সাধিয়া লইতে তৎপর। ১৮০১এ আর এক নূতন বীর সমরক্ষেত্রে

যশবন্ত হোলকর ১৮০১—২ } অভ্যুদিত হইলেন—যশবন্ত হোলকর। সিন্দিয়া এতদিন হোলকরকে বশে রাখিয়াছিলেন, যশবন্তরাও সহসা স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে সমুত্থানপূর্ব্বক সিন্দের বিরুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। যশবন্তের রণকাহিনী বর্ণন করিবার পূর্ব্বে এই স্থলে ক্ষণেকের জন্য তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি।

হোলকর বংশ } হোলকর বংশ আসলে ধনগর গয়লা-জাতীয় মহারাট্টা। পুণা সন্নিহিত নীরা নদী তীরবর্ত্তী হোল গ্রামে তাঁহাদের আদিম নিবাস ও সেই গ্রাম হইতে তাঁহাদের কুলনামের উৎপত্তি। হোলকর বংশের মুখ-উজ্জ্বলকারী মহ্লার রাও ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্য-

মহলার রাও ১৬৯৩—১৭৬৯ } কালে থান দেশে তাঁহার মামার মেষপালকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন মধ্যাহ্ণে মাঠের মধ্যে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় এক বৃহৎ অজগর সর্প তাঁহার মুখের উপর আতপত্র-রূপে ফণা ধরিয়া থাকে। এই শুভ লক্ষণ দৃষ্টে উৎসাহিত হইয়া তিনি অন্য চাকুরীর চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি একজন মহারাষ্ট্রী সরদারের নিকট ঘোড়সওয়ারের কর্ম্ম পান। এই সময় হইতে তাঁহার ভাগ্য ফিরিল। ১৭২৪ এ বাজিরাও পেশওয়ার অধীনে ৫০০ অশ্বের অশ্বপতি। ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ ও বিস্তর ভূমি-সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। ১৭৩২ এ তিনি পেশওয়ার প্রধান সেনাপতিরূপে মালবের মোগল প্রতিনিধিকে যুদ্ধে পরাভব করেন। ১৭৫০ এ মালব বিজয়ানন্তর সিন্দে ও হোলকর তাহা আধাআধি ভাগ করিয়া লন, তাহাতে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা মুনাফার প্রদেশে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। এইরূপে তাঁহার রাজ্য ও বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ইন্দোর তাঁহার রাজধানী হইয়া দাঁড়াইল। পাণিপতের যুদ্ধে যে অল্প কয়েকজন মহারাষ্ট্রী বীর ভালএ ভালএ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, মহ্লাররাও তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি ঐ যুদ্ধে বড় একটা যোগ দেন নাই—তাহার কারণ এইরূপ রাষ্ট্র যে, এই যুদ্ধে তিনি যেরূপ পরামর্শ দেন, মহারাষ্ট্রী সেনাপতি সদাশিব ভাউ "গয়লার কথা কে মানে?" এই বলিয়া সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার পরামর্শ এই—পাঠানদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদের বিবিধ উপায়ে হায়রাণ করা—বল অপেক্ষা কৌশলে তাহাদের দমন করা—পলায়নচ্ছলে অরিদল আকর্ষণ করিয়া অবসর বুঝিয়া তাহাদের উপর হল্লা করা; "ত্বরায় অনার্থশঙ্কা বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি" এই তাঁহার উপদেশ। এই সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সেনাপতি তাড়াতাড়ি রণে মাতিয়া গেলেন—শীঘ্রই তাহার বিষম ফলভোগও করিলেন। পাণিপতের যুদ্ধের পর মহ্লাররাও মধ্য-হিন্দুস্থানে নিজরাজ্যের ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলাবন্ধনে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করেন—তাঁহার তাহাতে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। কেননা মহ্লাররাও উদারচেতা, বিনয়ী, অথচ দৃঢ়মতি, অশেষ গুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। রণে যেরূপ সাহস ও বীরত্ব, রাজ্য-শাসনেও তাঁহার সেইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহ্লার রায়ের পুত্র খণ্ডেরাও পিতার আগেই মরণ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পৌত্র মালীরাও তাঁহার উত্তরাধিকারী। মালীরাও নির্ব্বুদ্ধি ক্ষিপ্তপ্রায় ছিলেন, অধিক কাল রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। মালীরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা খ্যাতনামা অহল্যা বাই রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তুকাজীরাও তাঁহার সেনাপতি। উভয়ে মিলিয়া অশেষ ক্ষমতা

অহল্যাবাই ১৭৬৫—৯৫ } ও দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তুকাজীর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে সাতপুরা শ্রেণীর দক্ষিণস্থ সমস্ত

প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন—তাহার উত্তরস্থ প্রদেশ সমূহের তত্ত্বাবধান করা—করদ রাজ্য সকল হইতে কর গ্রহণ করা—এ সকল অহল্যাবাই করিতেন। যখন তুকাজী উত্তর হিন্দুস্থান পরিদর্শনার্থে গমন করিতেন, তখন মালব, নিমার প্রভৃতি প্রদেশের সমগ্র কার্য্যভার রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পিত—সমুদায় দাক্ষিণাত্যে তাঁহার শাসন বিস্তৃত। রাজকোষ তাঁহার হস্তাধীন—রাজ্যের আয় ব্যয় হিসাব নিয়ম পূর্ব্বক রক্ষিত হইত। কোন গুরুতর রাজকার্য্য উপস্থিত হইলে তুকাজী রাজ্ঞীর পরামর্শ ভিন্ন কার্য্য করিতেন না এবং পর রাজ্যে যে সকল কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ করিতে হইত,তাহা অহল্যাবাই স্বয়ং করিতেন। তাঁহার অনুপম নয়কৌশলে পররাজ্যের সহিত মিত্রতা গ্রন্থির কোন শৈথিল্য ঘটে নাই। এ দিকে আবার স্বরাজ্যে প্রজাদের সুখশান্তি বর্দ্ধনেও তাঁহার অশেষ যত্ন। এক দিকে অতিরিক্ত করভার হইতে রায়ৎদের অব্যাহতি—অন্য দিকে জমিদারদের বিবিধ স্বত্ত রক্ষা, এই দুই দিক রক্ষা করিয়া চলিতেন। রাজ্ঞী যেরূপ প্রজাবৎসলা, সতত প্রজাহিত-নিরতা—প্রজারাও তাঁহাকে নীতিপ্রজ্ঞা মূর্ত্তিমতী জননী সমান জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তিনি অর্থী প্রত্যর্থীদিগকে আদালত, পঞ্চায়ৎ অথবা মন্ত্রীবর্গের বিচারে সঁপিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না, অক্রোধ কলুষিত সদা-হৃষ্টচিত্ত এই দয়াবতী রাজ্ঞী যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ্য দরবারে ন্যায় বিতরণ করিতেন—যাহার যে কোন আবেদন, তাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধানে তৎপর ছিলেন—শক্তের ভক্ত হইয়া দুর্ব্বলের প্রতি অন্যায় পীড়ন অনুমোদন করিতেন না—স্ত্রীজন চিত্ততোষী তোষামোদেও তাঁহাকে ন্যায় মার্গ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। এই রূপবতী, গুণবতী, ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজ্ঞী মহারাষ্ট্র দেশকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ১৭৯৫ অব্দে ষষ্ঠি বৎসর বয়সে সংসার যাত্রা হইতে অপসৃত হন। সেনাপতি তুকাজীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন কিন্তু কি করেন—সে বয়সে বড়, তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না—এই হেতু তাঁহাকে মহ্লার রায়ের পুত্র ও উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করিয়া যান। প্রথম মহারাষ্ট্রী সমরে তুকাজী হোলকর ও মহাদাজী সিন্দে উভয়ে মিলিয়া একমনে কার্য্য করেন। শেষাশেষি তাঁহাদের পরস্পর মনান্তর ও বৈরভাব সংঘটন হয়। মহাদাজীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তুকাজী পরলোক গত হয়েন।

তুকাজীর চারি পুত্র। কাশীরাও ও মহ্লাররাও দুই ঔরসজাত—যশবন্ত ও বিঠোজী দুই দাসী পুত্র। কাশীরাও মহ্লার রাও দুই ভাইয়ের রাজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি—জ্যেষ্ঠের সহায় দৌলত রাও সিন্দে—কনিষ্ঠের পক্ষে নানা ফর্ণবীস। একবার দুই ভাইয়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যে দিনে দুই ভ্রাতা তাহাদের পরস্পর বিরোধানল নির্ব্বাপনোদ্দেশে সৌহার্দ্দবন্ধন শপথ গ্রহণ করিলেন,তার পর দিনেই মহ্লাররাও সিন্দিয়ার সৈন্য হস্তে নিহত হন। যশবন্তরাও মহ্লার রায়ের পক্ষ ছিলেন, তিনি এই গোলযোগে পলায়ন করিয়া নাগপুর রাজার শরণাপন্ন হইলেন। সেখানে শরণ লাভ দূরে থাকুক,

তাঁহার ভাগ্যে কারা লাভ ঘটিল—দেড় বৎসর পরে বহু কষ্টে পলায়নে মুক্তি লাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র খণ্ডেরাওএর নামে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে মহারাষ্ট্রা, রাজপুত, পাঠান, ভিল, পিণ্ডারী প্রভৃতি ফৌজ একত্রিত করিয়া তিনি তাহাদের দলপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে ইউরোপীয় নেতৃগণের সাহায্যে এই ফৌজ হইতে রণদক্ষ শিক্ষিত সৈন্য দল প্রস্তুত করিয়া লইলেন। আমীর খাঁ নামক জনৈক মুসলমান সরদারকে সহায় পাইয়া তাঁহার বল পুষ্ট হইল; দুই জনে মিলিয়া সিন্দিয়ার রাজ্যে ঘোরতর লুটপাট অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই প্রবল রিপু দমন উদ্দেশে সিন্দিয়া পুণা হইতে স্বরাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মালবে সিন্দে হোলকরের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম, বিস্তর শোণিতপাত হয়। চপলা রণলক্ষ্মী কখন সিন্দিয়ার পক্ষে, কখনো বা হোলকরের পক্ষে, কখন্ কাহার প্রতি প্রসন্ন কিছুই স্থিরতা নাই। উহার এক যুদ্ধে সিন্দিয়ার রাজধানী উজ্জয়িনী হোলকরের হস্তগত হয়। ইন্দোরের নিকট অপর যুদ্ধে হোলকর আবার সিন্দিয়া কর্তৃক পরাভূত হইয়া মহা বিপদে পড়েন। পরিশেষে অশেষ বিপদ-জাল অতিক্রম করিয়া যশবন্তরাও পুণা-গগণে ধূমকেতুর ন্যায় সহসা সসৈন্য আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পুণা আক্রমণের এক বিশেষ কারণ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভ্রাতা বিঠোজী কোন এক বিদ্রোহাচরণে ধরা পড়িয়া দণ্ডনীয় হন, বাজিরাও তাঁহার প্রাণদণ্ড আদেশ করেন। প্রাণদণ্ড সাধারণ নয়—তাহার উপর যতদূর অপমান, যতদূর নিষ্ঠুর নির্যাতন সম্ভবে, তাহা আচরিত হইল। গজপদে শৃঙ্খল বদ্ধ বিঠোজী রাজপথ দিয়া টানা হিঁছড়া হইয়া চলিয়াছেন, বাজিরাও প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে সেই তামাসা দেখিতেছেন। তাঁর হঠাৎ কেন এরূপ খেয়াল হইল কে জানে? সিন্দের তুষ্টিসাধন যদি তাঁর অভিপ্রায় হয়, তাহা সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু কি এক দুরন্ত কাল ভুজঙ্গকে খোঁটাইয়া উত্তেজিত করা হইল, তাহা তখন তিনি ভাবেন নাই। সিন্দিয়ার রাজ্য লুণ্ঠন স্থগিত রাখিয়া যশবন্তরাও পুণার দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহার গতি রোধ সাধন মানসে পেশওয়া ও সিন্দে উত্তরে আলিবেল ঘাটে সৈন্য প্রেরণ করিলেন; তিনি আর একদিক্ দিয়া ঘুরিয়া সৈন্যহস্ত এড়াইয়া পুণার দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে ২৩ এ অক্টোবরে আসিয়া তাম্বু গাড়িলেন। দুই দিন পরে দুই সৈন্যের সংঘটন। ঘোরতর সংগ্রামের পর যশবন্ত জয়ী হইলেন। সিন্দিয়া কামান ও অন্যান্য জিনিস পত্র ফেলিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। পুণার পথ উন্মুক্ত। পরদিন ব্রিটিস রেজিডেণ্ট কর্ণেল ক্লোজ সাহেব হোলকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান—গিয়া দেখেন কর্দমাক্ত ক্ষত বিক্ষত শরীর অন্ধবীর * এক ক্ষুদ্র তাম্বুতে শয়ান—যেন শরশয্যাগত ভীষ্মদেব ভূতলে অবতীর্ণ হই-

(হোলকরের পুণা আক্রমণ—১৮০২)

* ইতি পূর্ব্বে ঘটনাক্রমে বন্দুক ছুটিয়া যাওয়াতে তিনি এক চক্ষু হারাইয়াছিলেন।

য়াছেন। হোলকর কর্ণেল সাহেবকে পুণায় থাকিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন—তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিতে ঔৎসুক্য দেখাইলেন, কিন্তু তিনি সে অনুরোধ না মানিয়া কয়েক দিবসের মধ্যে পুণা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। হোলকর তখন স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির পূর্ণ অবকাশ পাইলেন। প্রথমে তিনি বাজিরায়ের ভ্রাতা অমৃতরাওকে মসনদে বসাইয়া দিন কতক ধৈর্য্য ধরিয়া থামিয়া থাকেন, ক্রমে নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পৌরজন-ধন-রত্ন-শোষী নিদারুণ নগর লুণ্ঠনে তাঁহার অর্থ লালসা ও প্রতিশোধ পিপাসা দুই একত্রে প্রশমিত করিলেন।

বাজিরাও হোলকরের বিজয় বার্ত্তা শুনিয়া অবধি ভয়ে আকুল। তিনি বিঠোজীর প্রতি যে ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরে বিঁধিতেছিল। এখন হোলকরের পালা। যশবন্তরাও ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ তুলিতে উদ্যত। বাজিরাও প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিলেন। পুণা হইতে সিংহগড়—সিংহগড় হইতে রায়গড়—রায়গড় হইতে রত্নগিরি সমীপস্থ সুবর্ণ দুর্গ—পরিশেষে ৬ই ডিসেম্বরে ব্রিটিস পোতে বাসীনে উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজ চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। মাসের শেষ দিনে বাসীন সন্ধি।

বাসীন সন্ধি
৩১ ডিসেম্বর, ১৮০২

এই সন্ধি যোগে পেশওয়ার স্বাধীন রাজ্য বিলুপ্ত হইল। সন্ধির মর্ম্ম এই—ইংরাজেরা পেশওয়াকে পৈতৃক সিংহাসনে বসাইয়া দিবেন—পেশওয়া স্বীয় রাজধানীতে ব্রিটিস সৈন্য পোষণ করিবেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়শীল ভূমি সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিবেন। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন সন্ধি বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এইরূপে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া বাজিরাও পুণায় প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার মসনদ প্রাপ্তি স্মরণার্থে ১৯ তোপধ্বনি ধ্বনিত হইল। প্রকৃত পক্ষে এ তাঁহার সম্মানার্থে নহে—ইহা ইংরাজদের রাজ্যলাভ-সূচক জয়ধ্বনি।

সিন্দে, হোলকর ও আর আর মহারাষ্ট্রী সরদারগণ সকলেই স্তম্ভিত। ব্রিটিস অনুগ্রহে পেশওয়ার সিংহাসন প্রাপ্তি সকলেরই মনঃশল্যের কারণ হইল। সিন্দিয়া, হোলকর প্রভৃতি বীরগণ তখনো ইংরাজ-লৌহ-হস্তের গুরুভার অনুভব করেন নাই, তাই তাঁহারা সাহস করিয়া যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিলেন। সিন্দে হোলকর একে একে পরাস্ত হইলেন। তাঁহাদের দমন করিতে ইংরাজদের অধিক সময় লাগে নাই। জেনেরল ওয়েলেসলি

দ্বিতীয়
মহারাষ্ট্রী যুদ্ধ
১৮০৩—৪

দক্ষিণে আসাই ও আড়গামে—জেনেরল লেক উত্তরে লসওয়ারী ও দিল্লীতে সমবেত মহারাষ্ট্রা দলবল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ১৮০৪ এ ভরতপুর সন্নিহিত ডিগের রণক্ষেত্রে হোলকরের বিষদন্ত উৎপাটিত হইল। এই সকল যুদ্ধে ইংরাজদের অশেষ রাজ্য লাভ—ফরাসিসদের প্রভুত্ব নাশ—ইংরাজ পদতলে দিল্লীশ্বরের অবলুণ্ঠন—দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রী যুদ্ধের এই পরিণাম। এখন তৃতীয় ও শেষ যুদ্ধের বিবরণ বলি শুন।

বাজিরাও সিংহাসন ফিরিয়া পাইয়া যে বিশেষ কিছু লোভনীয় সামগ্রী লাভ করিলেন, তাহা নহে। তাঁহার রাজ্যের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। কায়দা নাই, কানুন নাই, কোন প্রকার শাসন নাই—লুণ্ঠনে উদরপূরণ কর, নতুবা শুকাইয়া মর, প্রজাদের এই অবস্থা। পুণার আশপাশ পল্লীগ্রাম সকল দস্যু তস্করের আবাস—রাজপুরুষেরা তাহাদের লুঠের ভাগী প্রশ্রয়দাতা। পেশওয়ার নিজের রাজ্য শাসনের ক্ষমতা নাই। পুণা দরবারে অপর কোন যোগ্য শাসনকর্ত্তার নাম গন্ধ নাই। বাজিরাও অত্যন্ত বিলাস-প্রিয় ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ছিলেন। তাঁহার নিজের আমোদ প্রমোদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই তাঁহার রাজত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য। নিলামে যে ব্যক্তি সকলের বেশী ডাকিবে, তাহার হস্তেই পেশওয়া তাঁহার পরগণা সকল সঁপিয়া দিতেন—এইরূপে এককোটী বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। এই সকল জমিদারদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী অধিকার—প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া অর্থ সঞ্চয়েই সে অধিকার খাটান তাহাদের কাজ। পুণার আদালত নাম মাত্র, যাহার পয়সা—তাহার জয়। এদিকে বাজিরাও আবার ধর্ম্মানুষ্ঠানের এমন ভড়ং করিতেন যে, লোকের মাঝে সাধু বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ব্রাহ্মণ ভোজন—ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা ও ভূমি দান—পুণায় সহস্র সহস্র আম্র বৃক্ষ রোপণ—তীর্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি উপায়ে তিনি দুর্ব্বাসন-জনিত অপযশ মোচনে উদ্যুক্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, নারায়ণরাও পেশয়া-হত্যা যে তাঁহার পিতা মাতার মহাপাতক, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অথবা প্রেত-শান্তি উদ্দেশে উক্ত রূপ দান ধ্যান পুণ্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। সে যাহা হউক, এই সমস্ত সাধনে রাজ্য রক্ষা হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে ত্রিম্বকজী ডাঙ্গলিয়া নামক এক ব্যক্তি আবার তাঁহার মোসাহেব ও কুমন্ত্রী আসিয়া জুটিল। এ ব্যক্তি প্রথমে সামান্য চরের কাজে নিযুক্ত ছিল। ক্রমে তোষামোদ পটুত্ব গুণে বাজিরায়ের প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া দাঁড়াইল। সে জাঁক করিয়া বলিত প্রভুর তুষ্টি সাধনে আমি গোহত্যা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। ত্রিম্বকজীর উপর পেশওয়ার অগাধ নির্ভর—অপার অনুগ্রহ। যেমন রাজা—তার উপযুক্ত মন্ত্রী। তাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যাহাতে ঈর্ষার উদ্রেক হয়, তাহার এমন কোন গুণ নাই, বিপক্ষতাচরণে রুষ্ট হইয়া যে দংশন করে, এরূপ তাহার সামর্থ্যও নাই সুতবাং যেমনটি চাই, বাজিরাও তেমনি ভৃত্য পাইলেন। ১৮১৯ অব্দে ত্রিম্বকজী পেশওয়া ও ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কার্য্যকর্ত্তারূপে নিয়োজিত হইলেন। এই সময়ে পেশওয়া ও গাইকওয়াড় সরকারের মধ্যে রাজত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত। বাসীন সন্ধি অনুসারে ঈদৃশ বিবাদ কল্লে ইংরাজদের মধ্যস্থ মানিবার কথা। বাজিরাও গাইকওয়াড়ের উপর চৌথ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পুরাতন দাবী করিয়া পাঠান। গাইকওয়াড়ের তরফ হইতে গঙ্গাধর শাস্ত্রী এই বিবাদ ভঞ্জন কার্য্যে পুণায় আগমন করেন কিন্তু পেশওয়ার দরবারের উপর লোকের এমনি অবিশ্বাস যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে

গঙ্গাধর শাস্ত্রী ১৮১৫

হইল। শাস্ত্রীর আগমন পেশওয়ার মনঃপূত হয় নাই—তিনি শেষে নানান্ আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া শাস্ত্রীর প্রতি স্বীয় অসন্তোষ নিদর্শক-অভদ্রতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শাস্ত্রী আসিয়া দেখেন গতিক বড় ভাল নয়। পেশওয়ার যেরূপ রুষ্ট ভাব, তাহাতে নিজ কার্য্য সিদ্ধি দুর্ঘট বিবেচনায় স্থির করিলেন তাঁহার বরদায় ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প এবং তিনি উপস্থিত বিষয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতা প্রার্থনা করিলেন। এই প্রস্তাবে বাজিরায়ের কার্য্য-প্রণালী ফিরিয়া গেল—তিনি আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যেমন ব্রাহ্মণের প্রতি হতাদর, এখন তেমনি ভণ্ডতপস্বী ব্যাঘ্রের ন্যায় ভাল মানুষি-ভান করিতে লাগিলেন। অশেষ আদর ও যত্ন দেখাইয়া—এমন কি, শাস্ত্রীর সহিত কুটুম্বিতা পর্য্যন্ত বন্ধন করিয়া বাজিরাও তাঁহার বশীকরণে সচেষ্ট হইলেন। সে যত্ন, সে আদর মৌখিক মাত্র—ভিতরে ভিতরে তাঁহার বধোপায় প্রবর্ত্তিত হইল। বাজিরায়ের নিমন্ত্রণে শাস্ত্রী মহাশয় পণ্ডরপুর তীর্থে গমন করেন। ১৪ই জুলাই দুজনের একত্রে পান ভোজন হয়। সন্ধ্যার সময় শাস্ত্রী বিঠোবা মন্দিরে পেশওয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পেশওয়ার মধুরালাপে প্রীত হইয়া বিদায় লইয়া যেমন মন্দিরের বাহির হইবেন অমনি জল্লাদের খড়্গাঘাতে ব্রাহ্মণের অপঘাত। কি ভয়ানক অমানুষিক কাণ্ড! এই অঘোর কৃত্যের মূল প্রবর্ত্তক নরাধম ত্রিম্বকজী। পেশওয়াও যে নিতান্ত নির্দ্দোষী ছিলেন, তাহা নহে—তাঁহাকে সত্বর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইল। বাজিরায়ের রাজ্যে শমন-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

রেজিডেণ্ট এল্‌ফিনিষ্টন } সুবিচক্ষণ এল্‌ফিনিষ্টন সাহেব তখন পুণায় ব্রিটিস কার্য্যকর্ত্তা। ত্রিম্বকজী এই হত্যাকাণ্ডের মূল প্রবর্ত্তক সপ্রমাণ হওয়াতে এলফিনিষ্টন তাহাকে পেশওয়ার নিকট হইতে চাহিয়া পাঠান। বাজিরাও প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করেন, পরে যখন "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখান হইল, তখন অগত্যা প্রিয়তম ত্রিম্বকজীকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ত্রিম্বকজী থানার দুর্গে রুদ্ধ থাকেন—তাঁহার উপর ইউরোপীয় সান্ত্রীদের চৌকী পাহারা। কতক দিন পরে তিনি ইউরোপীয় গার্ডদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক পাহাড় পর্ব্বতে অদৃশ্যভাবে ফিরিতে লাগিলেন। বাজিরাও তাঁহাকে গোপনে প্রশ্রয় দিতে ত্রুটি করেন নাই।

বাজিরাও এইক্ষণে ইংরাজদের তাড়াইবার নানান্ পন্থা দেখিতে লাগিলেন। সিন্দে, হোলকার, নাগপুর রাজা, পিণ্ডারী দল এই সকল লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র জারী হইল। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল এবং কুলি ভীল প্রভৃতি বন্যজাতিদের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ উদ্দেশে ত্রিম্বকজীকে অর্থ সাহায্য প্রেরণ করা হইল।

এলফিনিষ্টন সাহেব চর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতেছেন। বাজিরাও এইরূপ আচরণে নিজের কত হানি করিতেছেন—রাজ্যকে কি ঘোর শঙ্কটে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যাদি তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। তাহাতে যখন কোন ফল হইল না তখন পেশওয়াকে স্পষ্ট বলা হইল "যদি ত্রিম্বকজীকে দেশ বহিষ্কৃত না কর, তাহা হইলে ইংরাজদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যুদ্ধ বাধিবে। এই করারের বন্ধকস্বরূপ দুর্গত্রয় আমাদের হস্তে না দিলে পুণা এখনি সৈন্য বেষ্টিত হইবে।" এদিকে বড়লাট সাহেবের হুকুম আসিল "এরূপ কঠোর সন্ধি বন্ধনে বাজিরাওকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলা হয় যে তাঁহার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের শক্তি না থাকে,।" এই আদেশক্রমে পুণার সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। তাঁহার স্বাধীনতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমূলে নির্ম্মূল।

পুণার সন্ধি ১৮১৭ } বাজিরাও এই লৌহ শৃঙ্খল গলে পরিয়া পণ্ডরপুরে তীর্থ করিতে চলিলেন।

এই সময়ে (১৮১৬—১৮) পিণ্ডারী দস্যু দমনে সমস্ত ব্রিটিস বল নিয়োজিত হয়।

পিণ্ডারী যুদ্ধ ১৮১৬—১৮ } পিণ্ডারীগণ দেশের অরাজকতার সুযোগ পাইয়া দলে দলে দেশ-লুণ্ঠন, প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়া দেয়। হেষ্টিংস্ সাহেব লক্ষাধিক সেনা ৩০০ কামান লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইলেন। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারিদিক হইতে ব্রিটিস সৈন্য এই দস্যুদল শীকারে নিষ্ক্রান্ত হইল। পিণ্ডারী-গণ মধ্যহিন্দুস্থানের পাহাড়, পর্ব্বত, অরণ্য, দেশ দেশান্তরে তাড়িত ধাবিত হইল। তাহাদের দলপতি চিতু রাজপুতানা হইতে গুজরাট, গুজরাট হইতে মালওয়া এইরূপে পলাইয়া বেড়ায়। তাহার সহচরেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিল—কতিপয় মাস সে মাল-ওয়ায় একাকী বনে বনে ভ্রমণ করত পরিশেষে সাতপুরাচলে ব্যাঘ্রমুখে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব পায়। ক্রমে অন্যান্য দলপতিগণও একে একে কেহ ধৃত, কেহ হত হয়—তাহাদের দল বল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় ও ইংরাজ বলে এদেশ এই প্রবল দস্যুদলের উৎপাত হইতে মুক্তি লাভ করে।

এলফিনিষ্টন সাহেব বাজিরাওকে পরামর্শ দেন—যদি ইংরাজদের প্রসন্নতা চাও তাহা হইলে এই পিণ্ডারী যুদ্ধে তাহাদের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ কর। বাজিরাও "মুখে মধু হৃদে ক্ষুর," যখন সর জন ম্যালকম পুণায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁহাকে মিষ্ট ভাষায় এমনি জল বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি ভাবিলেন ইনি ত আমাদেরই দলের লোক। কিন্তু এলফিনিষ্টন সাহেব বাজিরাওকে বিলক্ষণ চিনিতেন, তিনি সহজে ভুলিবার পাত্র নন। বাজিরাও যে মতলবে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বম্বে হইতে একদল ইউরোপীয় ফৌজ আনাইয়া পুণার ক্রোশ দুই দূরে খিড়কী ক্ষেত্রে আড্ডা গাড়িলেন। ৫ই নবেম্বর যুদ্ধারম্ভ। ইংরাজ-

খিড়কীর যুদ্ধ নবেম্বর ১৮১৭ } দের সৈন্য বল সবশুদ্ধ ২৮০০ পদাতিক, তন্মধ্যে ৮০০ ইউরোপীয় সেনা। মহারাষ্ট্রীদের ১৮০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক ৮০০০। পুণা হইতে খিড়কীর পথ পর্য্যন্ত সেনায় সেনায় ছায়িত। পূরোৎপীড় প্রবাহিনীর ন্যায় অপূর্ব্ব দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল। বাপু গোখলা মহারাষ্ট্রী সেনাপতি। তিনি সৈন্যদলের মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণপূর্ব্বক উৎসাহ বাক্যে সকলকে উত্তেজিত করিতেছেন—মধ্যে মধ্যে অশ্বগণের হেষা রবে দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিছু পরেই যুদ্ধ বাধিল। গোখলা একদল সিপাহীর প্রতিলক্ষ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ৬০০০ বাছা বাছা অশ্ব চালনা করিলেন—সওয়ারেরা মহা রোখে হল্লা করিয়া চলিল—সেই সঙ্গে নয় মুখী কামান ব্যাটরি হইতে গুলি গোলা বর্ষিত হইল। এই অশ্ব-চাল চালনে আশানুরূপ ফলোদয় হইল না, বরং উল্টোৎপত্তি হইল। যে চালে মহারাষ্ট্রী সেনাপতি কিস্তিমাৎ করিবার মতলব করিয়াছিলেন, তাহাতে নিজেই বাজী হারিলেন। দুই সৈন্যের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তের মতন ছিল, কতকজন সওয়ার প্রথম ঝোঁকে তাহার মধ্যে পড়িল, কতক বা গুলী খাইয়া ধরাশায়ী হইল—অবশিষ্ট সওয়ারেরা পিছু হটিয়া গেল। সওয়ারদের পরাভবে মহারাষ্ট্রীরা এমন দমিয়া গেল যে আর কেহই এগোইতে সাহস করিল না। সন্ধ্যার মধ্যে এই বিপুল সৈন্যের সশরীরে অন্তর্ধান। ইংরাজেরা রিপু-শূন্য সমরক্ষেত্র অধিকার করিয়া রহিল। এই রণে ইংরাজদের সামান্য ক্ষতি, মহারাষ্ট্রীদের ৫০০ লোক মারা পড়ে। এরূপ "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" কেহ কখন দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। পর্ব্বতের প্রসব বেদনায় মূষিকের উৎপত্তি। পেশওয়া সেনামণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া পার্ব্বতী মন্দির হইতে খিড়কীর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। সূর্য্যোদয়ে তাঁহার সৈন্যদলের উৎসাহ কোলাহলে আকাশ পূর্ণ—সূর্য্যাস্তের মধ্যে সে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না।

প্রভাতে গণিয়া সেনা হরষে বিহ্বল,
ভানু যবে অস্তাচলে কোথায় সে দল!

বাজিরায়ের গ্রহ মন্দ। ইংরাজদের প্রসাদে তিনি সিংহাসন লাভ করিলেন—ইংরাজদের মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন। ১৫ নবেম্বরে ব্রিটিশ সৈন্যের পুণা অধিকার, তখন হইতে মহারাষ্ট্র রাজ্য ইংরাজদের করতল ন্যস্ত হইল। নববর্ষারম্ভে পুণার অনতিদূর কোরেগামে আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজবলের দ্বিতীয় বার পরিচয় পাইয়া বাজিরাও সেই যে স্বদেশ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইলেন, আর ফিরিলেন না। দেশ দেশান্তরে তাড়িত হইয়া অবশেষে তিনি সর জন ম্যালকমের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং অতঃপর উদার পেন্সন ভোগে কানপুর সন্নিহিত বিথূরে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথের প্রপৌত্রের এই শেষ দশা। সিপাহী

বিদ্রোহের সূত্রধার দুরাচার নানা সাহেব এই বাজিরায়ের পোষ্যপুত্র। শত বর্ষায়ত পেশওয়া বংশ তাঁহাতেই বিলীন হইল।

এইরূপে অল্পে অল্পে ইংরাজেরা পশ্চিম ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইলেন। বোম্বাই তাহার রাজধানী। বোম্বাই যে কি অমূল্য রত্ন, তাহা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ভাবি গৌরব তাঁহাদের কল্পনাপটে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। যখন মোগল, মহারাষ্ট্রা, পোর্ত্তুগীস লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে রত থাকিয়া আপনাদের অধঃপাতের সোপান প্রস্তুত করিতেছিল, তখন হইতে ইংরাজেরা ঐ রত্ন অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শেষে তাঁহাদেরই জিত—আর সকলের হার। ইংরাজদের এইরূপ প্রাধান্য লাভের কারণ কি? আলোচিত ঘটনাসূত্রই তাহা একপ্রকার নির্দ্দেশ করিতেছে। দেখিবে গৃহবিচ্ছেদই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। ইংরাজেরা আমাদের নিজের হাতিয়ার লইয়াই আমাদের উপর জয়যুক্ত হইলেন। আমাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য থাকিলে বিদেশী রাজা এদেশে তিলার্দ্ধ স্থান পাইতেন না—বিদেশীয় বল বিশ কোটী প্রজাপুঞ্জের এক ফুৎকারে উড়িয়া যাইত। ভারতে ইংরাজ আগমনের কিছু পরেই মোগল রাজ্য পতনোন্মুখ—তাহার আনুসঙ্গিক অরাজকতা হইতে ইংরাজেরা স্বরাজ্য স্থাপনের সন্ধি পাইলেন। সে সন্ধি তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র নন। এই বিপুল রাজবিপ্লবের মধ্যে তাঁহারা অবাধে রাজ্য পত্তন করিয়া লইলেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী রিপুদল একে একে পরাস্ত হইল—কেহ বা অদূরদর্শিতা বশতঃ হাল ছাড়িয়া দিল, কেহ বা ইংরাজ বলে বিদলিত হইয়া পরাভব স্বীকার করিল। দৈব বলে, বাহুবলে, গভীর নয়কৌশলে ইংরাজদের সে রাজ্য ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া বিস্তার লাভ করিল, দেখিতে দেখিতে ভারতের একসীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত অরি-বিরহিত, সুশাসন-পরিরক্ষিত, শান্তি-ফলপ্রদ একছত্র ব্রিটিস সাম্রাজ্য সমুদিত হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমাদের লোকদের পরস্পর জাতিবৈর—তদুপরি পরিপক্ব ইংরাজী রাজনীতি, এই উভয় সূত্রে ইংরাজদের ঐশ্বর্য্যলাভ। সে নীতির সার মর্ম্ম এই—শত্রুদল বিচ্ছিন্ন করিয়া একের সাহায্যে অপরকে জয় কর, অনন্তর অবসর বুঝিয়া বন্ধুটিকেও পদতলে আনিয়া দলিত কর।

ইংরাজ রাজ্য

ইংরাজ রাজ্য স্থাপন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার নাই। ১৮১৯ অব্দে মহারাষ্ট্রা সমরে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ মহাত্মা এলফিনিষ্টন সাহেব বোম্বাই গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এ দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সময় হইতে বোম্বায়ের সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয়। পথ, ঘাট, গৃহ নির্ম্মাণ, শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, বিদ্যা শিক্ষার নব-প্রণালী উদ্ভাবন, আইন-সংস্করণ ইত্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হেতু তাঁহার

লর্ড এলফিনিষ্টন
বোম্বাই গবর্ণর
১৮১৯

শাসন বোম্বাইবাসীদিগের বিশেষ আদরণীয়। তিনিই নব্য বম্বের সূত্রপাত করিয়া যান—সর বার্টল্ ফ্রেয়রের আমলে বোম্বাই সহর উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে। *

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাব্য জগৎ।

(কবি বার্ণস)

গীত-বেদনাই গীতের ছন্দ, গীতের ভাষা। যে চক্ষু কখন আর্দ্র হয় নাই, যে হৃদয় কখন বেদনায় কাতর হইয়া ভাঙা ভাঙা কথা উচ্চারণ করে নাই—যাহা সে চক্ষু দেখিয়াছে, সে হৃদয় ভাবিয়াছে তাহাতে কবিতা নাই। গীত বেদনার আর এক নাম প্রতিভা—যাহার বলে লোকে শিক্ষক হয়, যাহার তেজে লোকে শিক্ষা করে। আর যখন তাহা মানব-হৃদয় অধিকার করে,সেখানে রাজত্ব স্থাপন করে, তখন সেই বেদনাকাতর হৃদয় কবির, তাহার গান—কাব্য। বার্ণসের কবিতা পড়িলে যেখানে সেখানে এই গীত বেদনা দেখিতে পাই, বিদ্ধ হৃদয়ে আর্দ্র চক্ষে কৃষান যুবকের বেদনা-কাতর গান শুনি। কালিডোনিয়ার বন্ধুর কর্কশ প্রকৃতির চক্ষেও জল দেখি, পর্ব্বত সঙ্কুল প্রদেশের নিভৃত প্রচ্ছন্ন গুহালীনা নির্ঝরিণীকে কাঁদিতে দেখি, আর সেই উপত্যকার উপলখণ্ডের পাশে যে দুই একটি ফুল ফোটে, তাহাতে যেন মরু ভূমির হৃদয়ের রক্ত দেখিতে পাই।

সেই কালিডোনিয়ার কবি বার্ণস যে সর্ব্ব প্রধান তাহার কারণ তিনি কৃষক পুত্র, নিজেও কৃষক। পৃথিবীতে যদি কেহ কবির জীবন প্রত্যহ যাপন করে সে কৃষক যুবা। শ্যামল ক্ষেত্র, নীল আকাশ, সুবর্ণ শস্য শিখা, স্বচ্ছ জল, আর সেই বিস্তীর্ণ, ক্রীড়াশীল পবিত্র বায়ু যাহা দেবভূমির প্রান্ত হইতে পৃথিবীর হৃদয়ের উপর দিয়া বহিয়া যায়, উষার ম্লানমুখ, প্রভাতের রক্ত হাসি, মধ্যাহ্নের গরিমা, সায়াহ্নের নিব নিব আলো আর আকাশের কোণে শুক্র তারা, যাহার জীবন প্রত্যেক দিন এই দেব সংসর্গ উপভোগ করে সে যে কবি হইবে, সে যে প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ ভাবে এক হইয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? এ সুখের চিত্রের সহিত দুঃখের চিত্রও আছে। আকাশে মেঘ হয়, সূর্য্য রৌদ্র্য মূর্ত্তি ধারণ করে, শস্য শিখায় সোনার হাসি মিলাইয়া যায়, জল পঙ্কিল

* Grant Duff's History of the Mahrattas, Selections from state papers Bombay, Bombay Gazetteer Poona Vol. 18, Part 2, Keene's Sketch of the History of Hindustan ইত্যাদি গ্রন্থ সকল অবলম্বন করিয়া বোম্বায়ের ইতিহাস ভাগ সঙ্কলিত হইল।

হয়। এই সুখ দুঃখ মাখা জীবন—এই আলোকে আঁধার মাখা আকাশ যে হাসি কান্না জড়ান ভাষায় প্রকাশ পাইবে, তাহাতে কুসুমের জীবনে যে শক্তির পরিচয় পাই—সেই শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। বার্ণস নিজে বলিয়াছেন যে যখন তিনি অতি শিশু তখন তাঁহার মনে কেমন একরকম enthusiastic idiot piety ছিল। যে মমতা, অনুরাগ, বেদনা, কাতরতা (একটা কথা দিয়া পায়েটি Piety বুঝাইতে পারি না) তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল, তাহার অবোধের (idiot) নিতান্ত শিশুর বিচার শূন্য হৃদয়ের। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহা নিশ্চল, মৃত ভাবে ছিল তাহা নহে—সেই "অবোধ বেদনা" উচ্ছ্বাসময়। শিশু বার্ণসের হৃদয়ে যে উচ্ছ্বাসময় অবোধ বেদনা দেখিতে, তাহাই তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থার কবিতায় দেখি। বার্ণস চিরদিন সেই অবোধ, সংসারের জ্ঞান শূন্য কৃষক কবি।

কৃষকের হৃদয় তাঁহার কবিতার প্রত্যেক ছত্রে দেখা যায়—প্রকৃতির উপাসক, কি সংসারের একজন জীব—যে ভাবেই তাঁহাকে দেখি না কেন সেই বলীয়ান, জগতোপেক্ষী হৃদয় দেখিতে পাই। "মানুষই খাঁটি সোনা—সব রকম অবস্থাতেই, যা হোক তা হোক মানুষ চিরদিনই মানুষ।" "যে খাঁটি মানুষ, সে যতই গরীব হোক না কেন সে মানুষের মধ্যে রাজা"

"সে দিন আসিবেই আসিবে, যখন মানুষে মানুষে সারা পৃথিবীতে ভাই ভাই হয়ে যাবে—যা হোক তা হোক সে সম্পর্ক ঘুচিবে না।"

"সংসারী টাকা কড়ির জন্য হাঁপাহাঁপি কোরে থাকে, সময় একটা কানা কড়িও তাহার কপালে জোটে না। আবার যখন কিছু মেলে তখন প্রাণপণে হাত মুঠো কোরে বসে থাকে—তাহারা সুখ কাহাকে বলে জানে না।

"সাঁঝের আধারে আমার বুকের কাছে বালিকাটি আমার যদি বসে থাকে—আমি আর কিছুই চাহিনে। পৃথিবী অধঃপাতে যাউক না কেন—তাহার চিন্তা, তাহার জীবন এবং তাহার যাতনা আমার নিকট মোটেই পঁহুছে না।"

বার্ণস পড়িতে পড়িতে কাহার না মনে হয় যে পাখী যেমন স্বভাবতঃ গান গায়, নদী যেমন স্বভাবতঃ কুল কুল স্বরে বহিয়া যায়, বাতাস যেমন আপন মনে আকাশ ব্যাপিয়া থাকে, বার্ণস তেমনই ভাবে গান, তাঁহার হৃদয়ের স্রোত তেমনই ভাবে বহে, তাঁহার প্রাণের ঔদার্য্য তেমনই ভাবে পৃথিবীতে প্রশস্ত। আমি পূর্ব্বেই গীত বেদনার কথা বলিয়াছি। একটি ইংরাজী প্রবাদ আছে যে Night-in-gale পাখী কাঁটার উপর বুক না রাখিলে গাহিতে পারে না। Shelly ও সেই এক কথা অন্য ভাষায় বলিয়াছেন "আমাদের মধুর গানগুলি বেদনা ভরা"। তাহা সাংসারিক ক্লেশ না হইতে পারে কিন্তু যাহা মানসিক উদ্বেগ পরিপূর্ণ তাহা কি বেদনা নহে? কিন্তু এই দ্বিবিধ ক্লেশ যাহার তাহার হৃদয়ের ভাব যে কি তাহা বার্ণস পড়িলে বুঝিতে পারিবে। বার্ণেসের এই একটি স্বপ্ন। এটি তাঁহার জীবনের স্বপ্ন।

"একদিন রাত্রিতে নদীর কোলের কাছে লুকাইয়া ছিলাম। আমার চারিদিকে ফুল, আমার পায়ের কাছে জল স্রোত, আমার মাথার উপর, আমার গায়ের উপর গাছ, গাছের পাতা। কারুকার্য্য করা আলোক আঁধার আমাকে আবৃত করিয়াছিল।"

"আমার বালিকাটি ধীরে ধীরে মাধুর্য্য, কোমলতা কামনা সঙ্গে লইয়া আসিতেছিল। প্রত্যেক সুন্দর ভাবের সহিত আতঙ্ক (Alarm)। তাহা পূর্ণভাবে সুন্দর বলিয়াই হৃদয় কেমন আপনি কাঁপিয়া ওঠে।"

"গোলাপ ফুলের পাশে বসে কেমন মধুর ভাবে বালিকা গাহিতে লাগিল। প্রতিধ্বনি কত আনন্দের সহিত পর্ব্বতের লুকান হৃদয়ের ভিতর, উপত্যকার উদার প্রাণের ভিতর তাহা লইয়া যাইতে লাগিল। শেষে নিদ্রার আবেশে বালিকা ঢুলিয়া পড়িল। তখনও প্রণয় দেবতা তাহার কাছে তখনও কৌমার্য্য তাহার সখী।"

"গোলাপের অরুণ হাসি, নলিনীর শুভ্র ভাতি তাহার বর্ণের সহিত তুলনার অযোগ্য। নিদ্রার আবেশে তাহার নিকট কম্পিত, সিহরিত প্রাণে পঁহুছিলাম—একটি মাত্র চুম্বনের জন্য। তৃষ্ণাকুলিত নেত্রে রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি নিকটে আসিলাম।"

বালিকা জাগিয়া উঠিল—তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন, তাহার ভাষা কর্কশ, কঠোর। "এই কি তুমি আমাকে সম্মান কর—যাও এখনই আমাকে ছাড়িয়া যাও।"

"বৃদ্ধ-বেদনা কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল—সঙ্গে তার রুদ্রকাল। নদীর স্রোত জমিয়া গেল। যুবতী কুসুমকলিকাগুলি শুকাইয়া গেল।"

"অপদেবতা তখন চারিদিক হইতে জুটিল। বালিকার কৌমার্য্য কোথা গেল। তাহার যুবতী ভাব জীর্ণ হইল। আমি শুষ্ক কণ্ঠে বলিলাম "এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।" কিছু বলিতে না বলিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।"

বার্ণসের কিছু বলিতে না বলিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি বলিতেন মৃত্যুই এই জীবনস্বপ্নের শেষে জাগ্রত অবস্থা!

"Twas then a blast of Janwar win,
Blew handsel in on Robin.

পৌষের শীতে, একদিন খুব ঝড় বৃষ্টি, চারিদিকে বরফ, ঘরের ভিতর খুব ধোঁওয়া—মাটির ঘরের একটি কোনে বার্ণসের জন্ম—অন্য কোনগুলিতে বাড়ীর অন্য লোক আর দুই একটি গরু বাছুর। যখন বার্ণস মোটে দশ দিনের তখন সেই মাটির ঘর পড়িয়া যায়। মাতার আর শিশুটির অন্য স্থানে আশ্রয় লইতে হয়। যে জীবন এরূপ অবস্থাতে আরম্ভ একইরূপ তাহার অবসান।

দীন দরিদ্র আর্ত্ত বার্ণস ক্ষুধাকাতর হইয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত কবির গানে যে তিক্ত, কটু, তীব্র ভাষা ও ভাব দেখিতে পাই—শুধুই, পৃথিবী অধঃপাতে যাক না

কেন আমি যদি এক মুহূর্ত্ত সুখ পাই সর্ব্বস্ব বেচিয়া যদি এক তিল আনন্দ পাই, সেই তিল আনন্দের জন্য, সে মুহূর্ত্তের সুখের জন্য—যায় যাক্ সবই যাবে, সবই দেব; আর তার পর মুহূর্ত্ত ক্ষুধাকাতর হইলেও, শুষ্ক কণ্ঠ হইলেও সুখের স্মৃতি টুকু লইয়া বাঁচিয়া থাকিব। এই যে ভাব—এই যে অসাংসারিক কথা বার্ণসের মুখ দিয়া বাহির হইত, তাহার হৃদয়ে জাগ্রত ছিল তাহার কারণ তিনি কৃষক কবি—উদার আকাশের নীচে তাহার বিহার ভূমি।

"জীবনের বন্যাস্রোত অনন্ত কালের জন্য শান্তির আশা পর্য্যন্ত অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে"—

বার্ণস একথা নিজের জীবন লক্ষ্য করিয়া বলেন নাই—স্কটলাণ্ডের ইতিহাস পড়িয়া, ওয়ালেসের বীরকাহিনী পড়িয়া বলিয়াছিলেন। সে জাতীয়তার স্রোত—সে জাতীয় জীবনের কথা।

নিজে যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, নিজের যে শক্তি ছিল, তাহারই বলে বার্ণস কবি হইয়াছিলেন।

"ষোল বৎসর বয়সে কবিতা লেখার পাপ আমার প্রথম। নিতান্ত দাসের জীবন আমার। সন্ন্যাসীর আঁধার শান্তি আমাদিগের জীবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আমাদের দেশের নিয়মানুসারে একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক এইরূপে দুইয়ে দুইয়ে মাঠ ভরিয়া আমরা ধান কাটি।

"আমার কপালে একদিন যখন আমার বয়স ষোল বৎসর মাত্র—একটি বালিকা আমার সহিত কাজে জুটিয়া গেল। স্কচ্ ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা দিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে পারি না। She was a bonnie sweet sonsie lassie। তাহার কথা শুনিলে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত—সেই বিস্তৃত আকাশের নীচে বায়ুর হিল্লোলে যেমন বীণার তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে। সে বড়ই সুন্দর গাহিতে পারিত। তাহাকে ভাল বাসিব না কি করিয়া। আমার প্রথম কবিতা তাহার গানের ভাব, তাহার ছন্দ, তারই নাচনার তাল। বালিকা আমাকে বলিয়াছিল যে সেই গানটি আমাদিগের গ্রামের একজন জমিদার যুবকের লিখিত। আমি ভাবিলাম কৃষক আমি কেন ওরূপ গান লিখিতে পারিব না—তাহার পরই গান লিখিলাম।"

অনেক কারণে—ক্ষুধা, অশ্রদ্ধা আশ্রয়শূন্যতা—অনেক কারণে বার্ণ্স ক্রমশঃ তাঁহার জীবনের পূর্ণ পবিত্রতা হারাইয়াছিলেন। কিন্তু যেমন মানুষ একটি আধটি পাপের পর পূর্ণ ভাবে মানুষ হয়—সে পাপটি না করিলে যেমন তাহার জীবন অসম্পূর্ণ থাকে, সেই রূপ কবি বার্ণসের কলঙ্কের কথা, তাঁহার পাপের কথা, তাঁহার ধর্ম্মবিরোধী ভাষা, তাঁহার সমাজবিবাদী আচার ব্যবহার যদি না হইত, তাঁহার কবি জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত না। তুমি ইহা না স্বীকার করিতে পার কিন্তু একটু সহানুভূতি, মমতা

স্নেহের সহিত বার্ণসের জীবনের সবকথা পড়িও, তখন আমি যাহা বলিলাম তাহা নিতান্ত অমূলক অসত্য মনে হইবে না।

"আমার হাতের কলমটি পর্য্যন্ত কেমন স্বতঃই জানে আমার মন কিরূপ, আমার চলিবার পথ কি, আমার গানের বিষয় কি। বিজ্ঞানের গম্ভীর সেবক অহঙ্কারের দাস, ধনব্যগ্র উন্মাদ বলিতে পারে যে সেগুলি পাপের কথা, যে তাহা কলঙ্কের ভাষা কিন্তু দীন দরিদ্র কৃষক বালক বালিকাদিগের জীবনের বল সেগুলি। তাহাদিগের প্রাণের আকুল আশা আনন্দের পূর্ণ বিকাশ সেই লুকান মিলনে, সেই অশ্রুময় বিরহে।

"তুমি কি কুসুম দেবীকে কুসুমের অপেক্ষা কোমল সৌন্দর্য্য ভরা মুখখানি লইয়া কুসুম চয়ণ করিতে দেখিয়াছ—তুমি দেখ নাই।"

Vive l'amour ! Vive la bagatelle—

প্রণয়ের জয় হউক জগৎ অধঃপাতে যাক্।

রামপ্রসাদের ভাষায় মন খেলরে ডাণ্ডাগুলি। বার্ণসের প্রায়ই ঐ কথাগুলি বলিতেন।

সকলেই জানেন যে দিনকতকের মধ্যে বার্ণস জগদ্বিখ্যাত হইলেন। সমাজের কর্ত্তা, যাঁহারা রাজা রাণী, তাঁহারা পর্য্যন্ত বার্ণসের আদর করিতে লাগিলেন। কৃষক কবি সমাজে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইলেন। কিন্তু "স্বভাব চাষাড়ে" যাবে কোথা। মধ্যে মধ্যে সমাজের আচার ব্যবহার কঠিন কর্কশ তাঁহার পক্ষে অসহনীয় দাসত্ব বলিয়া মনে হইত। আর অমনি বার্ণস সহরের ধনীর গৃহ ছাড়িয়া রাস্তার দীনের সহিত এক চুমুক মদ এক ছিলুম তামাক খাইয়া তাহাদের সুখ দুঃখের কথা, নিজের চাস বাসের কথা কহিয়া সুখ পাইতেন।

ক্রমশঃ সমাজের আদর কমিয়া যাইতে লাগিল। বার্ণসের পুজি পাটা ফুরাইয়া গেল। দেশ ছাড়িয়া আমেরিকায় যাইবার জন্য বার্ণস খেপিয়া উঠিলেন। তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। কৃষক বার্ণস আবার আইয়ার নদীর ধারে ফিরিয়া আসিলেন। আবার জগৎ সেই পুরাতন চক্ষে দেখেতে লাগিলেন।

"আমি একদিন সুপ্রাতে একটি ছোট ফুল নীহার মাখা দেখিয়াছিলাম। নীহার বিন্দুর ভারে তাহার কোমল বৃন্তটি কেমন নোয়াইয়া পড়িয়াছিল। একদিনের জন্য তাহার প্রাতঃ গরিমা, তাহার নম্র সৌন্দর্য্য একদিনের জন্য আকাশ সৌরভময় করিয়াছিল।

"আমি সেই দিনই একটি পাখী কোথা গাছের ভিতর লুকাইয়া গাহিতেছিল শুনিলাম। তাহার বুকের নীচে কাঁটা, তাহার পাখার উপর শীত বায়ু, কিন্তু তবুও সে বনভূমির আনন্দ বাড়াইয়া গাহিতেছিল। নীহার সিক্ত পল্লবগুলির কাণে উষার আগমন বার্ত্তা দিতেছিল।

জিনি, তুই আমার আদরের পরিত্যক্ত কন্যা, তোর প্রাতঃরশ্মি মাখিয়া আমি তোরই কাছে থাকিব। আমার সাঁঝের আধার যেন তুই আলোকিত করিস।"

"এমন শিশির মাখা ফুল নাই, যাহা নিভৃত নির্ঝরের ধারে ফুটিয়া থাকে—এমন লুকান পাখী লুকাইয়া গাহিতে পারে না যাহাতে আমার "জিনি"কে মনে পড়ে না।—"

এ গান গুলিতে যে স্নেহ, তাহার কি সীমা আছে—তাহা কি তুমি আমি আয়ত্ত করিতে পারি ?

Cotter's Saturday Night—"কুটীরবাসীর শনিবার রাত্রি" পড়িয়াছ ? তাহাতে যে গভীর ধর্ম্মভাব আছে তাহা কি কোন হেয় কলঙ্কিত হৃদয়ের সম্ভব। কৃষক পিতা—পুরোহিতের মত ধর্ম্মপুস্তক হস্তে ধর্ম্ম কথা পড়িতেছেন। চারিদিকে ছেলে মেয়ে ভাই বোন। এই চিত্র সুবিখ্যাত Holy Familyইর (দেব পরিবার) অপেক্ষা সুন্দর—কারণ ইহা মানুষের ছবি—খ্রীষ্ট দেবসন্তান, কুমারী মেরী দেবতার মাতা।

বার্ণস পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে হইবে কবি কি বলিতেছেন। কিন্তু যেন মনে থাকে যে তাঁহার পৌষের শীতের রাত্রিতে জন্ম, তাঁহার জীবনের অবসান পৌষের শীতে, বরফের স্তূপে মাঠের মধ্যে। তখন বুঝিতে পারিবে যে কবি বার্ণস দেবরাজ্যের কি না, তাহার গীতবেদনাতে দেবতার মাহাত্ম্য আছে কি না।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

পঞ্জাব ভ্রমণ।

৪

পেশোয়ার পথে।

কার্ত্তিক মাসে রজনী প্রভাতে আমি একদিন লাহোরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছি। মুখ হাত ধুইতেছি এমন সময় আমি অস্পষ্ট শুনিলাম কে যেন আমায় নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। আমার সহসা বিশ্বাস হইল না—স্বপ্নের মত মনে হইল। কে আমায় এ দূর দেশে নাম ধরিয়া ডাকিবে ? তথাপি জামা টামা কিছু না পরিয়াই একটা র‍্যাপার জড়াইয়া দপ্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিয়াই দেখি আমার একজন অতি সম্মানিত বন্ধু শ্রী—দাস একখানি চৌকির উপর বসিয়া আছেন। তিনি রাত্রে লাহোর পৌঁছিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তখন ছুটি—তিনি ছুটির সময়টা পঞ্জাব দেখিয়া বেড়াইবেন সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছেন। বেড়ানটা আমার বন্ধুর একটা রোগের

মধ্যে। হাইকোর্ট বৎসরে যে দুমাস বন্ধ থাকে, তিনি প্রতি বৎসরই সে দুমাস কাল বেড়িয়া বেড়ান। কখনো বা সিংহলে, কখনো বা মান্দ্রাজে, কখনো বা বোম্বাই অঞ্চলে, কখনো বা পাহাড়ে। এবার পঞ্জাব দেখিতে বাহির হইয়াছেন। আমাকে আর তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় দিলেন না; বলিলেন—"গাড়ী দাঁড়াইয়া, চল আমাকে লাহোর দেখাও।" আমরা দুজনে মিলিয়া লাহোর দেখিলাম। পেশোয়ার পর্য্যন্ত তিনি যাইবেন, আর আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন—কোন মতেই ছাড়িবেন না। আমি যাঁহার চাকুরি করিতাম, আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহার নিকট হইতে আমার জন্য ছুটি লইলেন। পরদিন আমারা পেশোয়ারের দিকে রওয়ানা হইলাম। যখন রেলের গাড়ীতে উঠি, তখন বেলা ১১টা। পেশোয়ার যাইতে রেলওয়ে গুজরানওয়ালা, গুজরাট, ঝিলম, রাউয়ালপিণ্ডি ও আটক্ এই কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া যায়। গুজরানওয়ালা লাহোর হইতে ৪২ মাইল উত্তর পশ্চিমে। রণজিৎ সিংহের পিতা ও পিতামহের গুজরানওয়ালা রাজধানী ছিল। রাজধানী বলাতে কেহ মনে করিবেন না রণজিৎসিংহের পিতা বা পিতামহ রাজা ছিলেন। তাঁহারা অতি বড় শিখ মিসিলপতি বা সর্দ্দার ছিলেন। গুজরানওয়ালা তাঁহাদিগের প্রধান নগরী ছিল। এক অর্থে "রাজধানী"ও বলা যাইতে পারে—কেননা, শিখ মিসিল সকল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল—যুদ্ধাদির সময়ে একত্র হইত। মিসিলপতিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাই ছিলেন বটে। গুজরানওয়ালা রণজিৎসিংহের জন্মস্থান। রণজিৎসিংহের পিতা মহাসিংহের এখানে এক সমাধিমন্দির আছে। এই সমাধিমন্দিরের গুম্বেজের নীচে রণজিৎসিংহের ভস্মাংশও আছে। বিখ্যাত শিখ-বীর হরি সিং নীলায়াও গুজরানওয়ালা নিবাসী ছিলেন। তাঁহার কেল্লাকে এখন দন্তহীন করিয়া রাখা হইয়াছে। এই কেল্লায় একটি অতি মনোহর প্রাচীন উদ্যান আছে। গুজরানওয়ালায় একটি সরোবর আছে যাহাকে শিখরা পবিত্র জ্ঞানে অত্যন্ত সম্মান করে। গুজরানওয়ালার নিকটে এমিনাবাদ নামে একটি ক্ষুদ্র সহর আছে; সেখানেও শিখদিগের একটি পুণ্য সরোবর আছে। এমিনাবাদই মোগলদের সময়ে এ প্রদেশের প্রধান সহর ও বাণিজ্য স্থান ছিল। মোগল শাসনকর্ত্তা এখানেই বাস করিতেন। যে দুই পুষ্করিণীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদিগের তীরে বৎসর বৎসর মেলা হয়। গুরু নানক নাকি এমিনাবাদের পুষ্করিণীর তীরে একদা বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই জেলায় চুহারকন্না নামে একটি গ্রাম আছে; কথিত আছে গুরু নানক সেখানে পিতৃদত্ত টাকা কড়ি, যাহা তিনি পুত্রকে ব্যবসা আরম্ভ করিবার জন্য দিয়াছিলেন, বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

গুজরানওয়ালা হইতে ৩০ মাইল দূরে শেকোপুরী নগরী। সাজিহানের পুত্র দারা শেকোর নাম হইতে এই সহরের নাম। জিহাঙ্গীরের নির্ম্মিত একটা মস্ত দুর্গ এখানে আছে। রণজিৎ সিংহের এক প্রেয়সী রাণী রাজকোঁর নাকাই এই দুর্গে বাস করিতেন।

লাহোর দরবারে ডোগ্রাদলের বিপক্ষ ছিলেন বলিয়া রাণী রাজকোঁর রণজিৎসিংহের অনুগ্রহ হারাইয়াছিলেন। শুনা যায় রণজিৎসিংহ রাণীর প্রাণ বধ করান। গুজরানওয়ালা জেলায় টাকী বা অসারুর নামক স্থানে অসংখ্য ও বহুবিস্তীর্ণ হর্ম্ম্যাদির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। জেনেরাল কনিঙ্গহাম্ বলেন চৈনিক পরিব্রাজকেরা যে সেকিয়া (Tse-kia) নগরীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, টাকী সেই সেকিয়া। টাকী বা সেকিয়া এক বহুবিস্তৃত রাজ্যের রাজধানী ছিল—সমস্ত পঞ্চনদ সিন্ধু হইতে বিপাসা পর্য্যন্ত এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হোয়েনসাঙ্গ অসারুর দুই মাইল উত্তর পূর্ব্বে একটি অশোকের স্তূপের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ঠিক সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি অশোক-স্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরানওয়ালার আটাশ মাইল উত্তর পশ্চিমে চিনাব বা চন্দ্রভাগা তীরে রামনগর। এই নগরের সম্মুখেই লর্ড গাফ শিখদিগের সঙ্গে এক মহাযুদ্ধে পরাজিত হন। লর্ড গাফ চাহিয়াছিলেন যে শিখ সেনানায়ক শেরসিংহ ও তাহার শিখ সেনাকে তিনি চিনাবের পরপারে তাড়াইয়া দেন। যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন—বহু সৈন্য মরিল—অবশেষে রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইতে হইল। এই যুদ্ধটা ২২শে নবেম্বর ১৮৪৮ সালে হইয়াছিল। ১৩ই জানুয়ারি ১৮৪৯ সালে ইংরেজেরা আর একবার শেরসিংহের হস্তে পরাজিত হন,—আমি চিলীয়ানওয়ালার যুদ্ধের কথা বলিতেছি।

গুজরানওয়ালা ও গুজরাটের মধ্যপথে উজীরাবাদ। সহরটি সুন্দর। রণজিৎসিংহের একজন ইতালীয় সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরেল আভিটেবল (Avitable) এই সহরটি পুননির্ম্মিত করেন। কবে প্রথম নির্ম্মিত হয়, বলিতে পারি না। আভিটেবলের নির্ম্মিত প্রাসাদ আজও দাঁড়াইয়া আছে। তাহার প্রাচীরের গায়ে শিখগুরুদিগের ছবি ফ্রেস্কো (Fresco) চিত্রনে চিত্রিত রহিয়াছে। উজীরাবাদ ছাড়াইলেই চিনাবের উপর রেলওয়ের সেতু। এত বড় সেতু নাকি পৃথিবীতে আর নাই। ইহা দৈর্ঘ্যে পৌনে দুই মাইল। ইহার নির্ম্মাণে ৫০ লক্ষের উপর টাকা ব্যয় হইয়াছিল। জম্মু যাত্রীরা উজীরাবাদে নামিয়া সিয়ালকোটের রাস্তায় যান। সিয়ালকোট উজীরাবাদ হইতে ২৮ মাইল উত্তর পূর্ব্বে। ইহা পুরাকালে রাজা রসালুর রাজধানী ছিল। রাজা রসালুর বীরত্ব সম্বন্ধে যে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উপকথা আছে বলা যায় না। তিনি পঞ্জাবের কিঙ্গ আর্থর (King Arthur)। ১৮৫৭ সালে এখানকার দেশীয় সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া সিয়ালকোটের প্রাচীন দুর্গ সালোয়ান আক্রমণ করে। রাজা তেজসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি সুন্দর মন্দির এখানে আছে। তবে সিয়ালকোটের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ স্থান বাবা বা গুরু নানকের মন্দির। বহুসংখ্যক শিখ এই মন্দির দেখিবার জন্য সিয়ালকোটে আসে। এখানে বৎসর বৎসর একটা বড় রকমের মেলা হয়। সিয়ালকোটে অনেক কাগজ তৈয়ার হয়। আর এখানকার কোফ্তগরি শিল্প অতি

প্রসিদ্ধ। সিয়ালকোটের ২২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে জম্মু। জম্মু, যদিও যাহাকে আমরা কাশ্মীর বলি তাহার বাহিরে, কাশ্মীরের রাজধানী বটে। কাশ্মীরের মহারাজা প্রায় সমস্ত বৎসরই জম্মুতে কাটান। জম্মু তাভী নদীর তীরে অবস্থিত। দুর্গ ও প্রাসাদ তাভীর তীরে—দেখিতে বড় সুন্দর। জম্মু একদা একটি রাজপুত রাজ্যের রাজধানী ছিল। আশে পাশে অনেক দালান কোঠার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

উজীরাবাদের পরে গুজরাট। গুজরাটে শিখদিগের সর্ব্বনাশ হয়। এখানে লর্ড্ গফ শিখ-সিংহ শেরসিংহকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পরেই পঞ্জাব ইংরেজের হাতে আসে। এই যুদ্ধেই শিখ-রাজ্য ও শিখ-স্বাধীনতা ধ্বংস হয়। পঞ্জাবে চুহাসাহী বলিয়া এক শ্রেণীর ফকীর আছে। তাহাদিগকে দেখিলে অত্যন্ত ঘৃণা ও দয়ার উদ্রেক হয়। ইহাদিগের মাথা একেবারে চ্যাপটা, আর নাক মুখ অতিশয় সরু—দেখিতে অতি ঘৃণাজনক ও কদাকার। ইহারা একেবারে মানসিক শক্তিহীন (Idiot)। ইহারা যে এরকম বীভৎসরূপ বা নির্ম্মস্তিষ্ক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, এমন নয়—এই গুজরাট জেলায় চুহাসাহী ফকীর তৈয়ার করা হয়। যাহাদিগকে এই ফকীর শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে, তাহাদিগকে শৈশবে এই অপরূপ রূপ করা হয়। মাথা চাপিয়া চাপিয়া চ্যাপটা করা হয়; নাক মুখ টানিয়া টানিয়া সরু করা হয়। মাথা ও মুখ এই বিকৃত গঠন পাইতে পাইতে মস্তিষ্ক একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহারা মুসলমান পবিত্রাত্মা পীর সা দৌলার ফকীর। ইহাদিগের মুখ চুহা বা ইন্দুরের মত অনেকটা দেখিতে হয় বলিয়া ইহারা চুহাসাহী আখ্যা পাইয়াছে। ধর্ম্মের নামে কত বীভৎস, কত নিষ্ঠুর কার্য্যই পৃথিবীতে হইতেছে। ধর্ম্ম! তোমার তত্ত্ব সত্য সত্যই গুহায় নিহিত রহিয়াছে। গুজরাটে এক রকম অতি সুন্দর চামড়া (Leather) প্রস্তুত হয়—প্রায় বৈলাতিক চামড়ার সমতুল্য। গুজরাট ও সিয়ালকোট. কোক্তগরি নামক সুন্দর শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ইস্পাতের (Steel) জিনিসের উপরে প্রথমে ইস্পাতের সূঁচ দিয়া লতা পাতা আঁকা হয়। সূঁচ যে রেখা অঙ্কিত করে, তাহা এতটা গভীর হয় যে তাহাতে সূক্ষ্ম স্বর্ণ তার বসান যায়। স্বর্ণ-তার সূঁচের আঁকা লতা পাতাগুলির গায়ে পিটাইয়া বসান হয়। তার পর লতা পাতাঙ্কিত ইস্পাতের জিনিস আগুনে উত্তপ্ত করা হয়। পুনরায় আবার স্বর্ণ-তার পিটাইয়া ভাল করিয়া বসান হয়। এক রকম সাদা সচ্ছিদ্র পাথর দিয়া তার পর ইস্পাত পৃষ্ঠকে ঘসিয়া উজ্জ্বল করা হয়। এই কোক্তগরি কাজ অতি সুন্দর। এই কাজ পেয়ালা, চিরুণী, ব্রুচ, বালা প্রভৃতির উপর করা হয়। যখন পঞ্জাব স্বাধীন ছিল, তখন এই কাজ তরবারি, বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতির উপরে করা হইত।

গুজরাটের পর বার মাইল দূরে লালামূসা ষ্টেশন। এখান হইতে একটি শাখা লাইন পিণ্ড্ দাদনখাঁ গিয়াছে। পিণ্ড্ দাদনখাঁর সন্নিকটে সুবিস্তৃত লবণের খনি (Salt mines)। যে পর্ব্বতশ্রেণী হইতে লবণরাশি পাওয়া যায়, তাহার উচ্চতা

৩৫০০ ফুট। ঝিলম বা বিতস্তার উত্তর তীরে এই পর্ব্বত শ্রেণী। এক এক স্থানে এক একটা শৃঙ্গ একেবারে যেন ৫০০। ৬০০ ফুট লাফাইয়া উঠিয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীতে অনেক স্রোতস্বতী আছে, কিন্তু তাহাদের জল এত লবণাক্ত যে যেখান দিয়া তাহারা বহিয়া গিয়াছে, সেখানে শস্যাদির উপকার না হইয়া অপকার হইয়াছে। এই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে একটি উচ্চ উর্ব্বর ভূমি আছে। তাহার মধ্যস্থলে কালাকাহার নামে একটি রমণীয় হ্রদ। এই পর্ব্বতশ্রেণীতে লবণ শিলাকারে (Solid rock) পাওয়া যায়, পৃথিবীতে এত বড় লবণ খনি নাকি আর নাই। এক সময়ে পিণ্ড্দাদনখাঁ জেলায় বহু লোকের বসতি ছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নগর, দুর্গ ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। দারাপুরের জাঁজুয়াদের সুবিস্তৃত নগর, গুরজকের প্রকাণ্ড প্রাচীর আজও দাঁড়াইয়া আছে। বাঘামওয়ালার মন্দির ও দুর্গ, সুলভি ও চেহুয়ার মনোহর উদ্যান, কুশক ও দুলুরের প্রাচীন দুর্গ এক একটা উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গোপরে দাঁড়াইয়া। জাঁজুয়াদের শেষ সুলতানকে এই কুশক দুর্গেই রণজিৎ সিংহ পরাজিত করেন। ছয় মাস কাল তিনি এই দুর্গ বেষ্টন করিয়া ছিলেন—জলাভাব হইলে সুলতান আত্মসমর্পণ করেন। লালামুসা হইতে ২১ মাইল দূরে বিখ্যাত চিলীয়ানওয়ালার যুদ্ধক্ষেত্র। চিলীয়ানওয়ালারই নিকটে সেকেন্দার সাহা রজনীর অন্ধকার আবরণে ঝিলম পার হইয়া পুরুরাজের (Porus) সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। ইহারই নিকটে বিজয়-স্মৃতি রক্ষার্থে সেকেন্দরসাহা নিকীয়া নামে নগরী সংস্থাপন করেন। নিকীয়া এখন মঙ্গ নামে খ্যাত। মিয়ানীর যুদ্ধক্ষেত্র পিণ্ড্দাদনখাঁর অতি নিকটে—ঝিলমের পরপারে। স্যার্ চার্ল্স্ নেপিয়র্ এখানে ১৮৪৩ সালে তাল-পুর বংশীয় সিন্ধুদেশের মীর রস্তম ও আলীমুরাদকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধেই সিন্ধু দেশের স্বাধীনতা লোপ পায়। পিণ্ড্দাদন খাঁ হইতে ১৬ মাইল দূরে পর্ব্বত শ্রেণীর উত্তরে কটাসের পুণ্যস্রোত। কটাস এক অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ। কথিত আছে, পাগল শিবঠাকুর সতী মৃত্যুতে এখানে এমনি কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার চোখের জলে আজমীরে পুষ্কর ও কটাসে কটাক্ষ সরোবরের সৃষ্টি হয়। প্রতি বৎসর এখানে সহস্র সহস্র লোক পুণ্য সঞ্চয় করিতে আসে। পর্ব্বত শ্রেণীর পাদদেশে বিখ্যাত সাত ঘড়া বা সপ্তমন্দির। লোককথা এই যে পাণ্ডব ভ্রাতারা এই মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গ যে সিংহপুর রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কটাস তাহারই রাজধানী ছিল। কটাস হইতে এক মাইল দূরে সৈদানা সাহের মন্দির—এখানে লক্ষাধিক মুসলমান মেলাতে একত্রিত হয়। কটাস হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কয়েকটি অতি প্রাচীন মন্দির আছে। তাহাদিগের বয়স অন্যূন দু হাজার বৎসর হইবে। এই মন্দিরগুলিতে অমিশ্র আয়োনিক বা গ্রীকো ইণ্ডীয়ান স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। লবণ পর্ব্বতশ্রেণীতে যোগাটিলা বলিয়া একটি

প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ইহা অতি পবিত্র স্থান। হিন্দু সন্যাসীরা নানা দেশ হইতে এখানে আসে।

সন্ধ্যার সময় আমাদের গাড়ী ঝিলম ষ্টেশনে পৌছিল। এটা ডিনারের জায়গা। আমরা এখানে যথাবিধি অথবা যথা-অবিধি—কেন না হিন্দুর পক্ষে রেলওয়ে হোটেলে খাওয়া বিশেষ বিধি-সম্মত নয়—উদরের সেবা করিলাম। ঝিলমের নিকটে সেকেন্দর সাহা তাঁহার যুদ্ধ জাহাজ বা নৌশ্রেণী রচনা করেন। জালালপুরের নিকটে পর্ব্বত গায়ে একটা খোদা রাস্তা আছে—লোক বলে সেটা সেকেন্দর সাহা তাঁহার সেনার জন্যে পথ করিবার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন। সেকেন্দর সাহার বিখ্যাত অশ্ব বুকেফেলসের সমাধিও নাকি জালালপুরের নিকটেই হইয়াছিল। এখানে সেকেন্দর একটি নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম বুকেফেলাস রাখেন।

ঝিলম হইতে রাউয়ালপিণ্ডির পথে রাত কাটাইলাম। পর দিন বেলা দশটার সময় রাউয়ালপিণ্ডি পৌছিলাম। রাউলপিণ্ডি হইতে মারি পাহাড়ে যাইতে হয়—মারি এখান হইতে ২০ মাইল। কাশ্মীরে যাইবারও এখান হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ। ঘক্কর জাতীয় রাউয়াল খাঁ রাউলপিণ্ডি সংস্থাপন করেন। জেনেরেল কনিংহাম বলেন খৃষ্টের পূর্ব্বে ভট্টিজাতির রাজধানী গাজিপুর এখানেই সংস্থিত ছিল। এখানে একটি বৌদ্ধ স্তূপ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া জেলখানা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাউয়ালপিণ্ডির নাম ফতেপুর বাওরি ছিল। রাউয়ালপিণ্ডি এখন খুব বড় সেনানিবেশ। তক্ষক বংশীয়েরা এই জেলার আদিম নিবাসী। সেকেন্দর সাহের সময়ে তক্ষশীলা (Taxila) মস্ত বড় সহর ছিল। সেকেন্দর সাহা চলিয়া গেলে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর পরে তক্ষকেরা মগধ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। পঞ্জাবের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত তখন মগধ সম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। অশোক এই বিদ্রোহ দমন করেন। এই জেলায় বৌদ্ধ মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। আমরা রাউয়ালপিণ্ডিতে একটা হোটেলে ছিলাম। রাউয়ালপিণ্ডিতে আমার লাহোরের পরিচিত একজন অতি প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত————মজুমদার বাস করিতেন। তাঁহাকে খুজিয়া বাহির করিলাম। ইনি অতি আশ্চর্য্য লোক। ইহার ধর্ম্মোৎসাহ, সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা অসামান্য। রাউয়ালপিণ্ডিতে যা কিছু ভাল কাজ—সকলেরই প্রাণ ইনি। এখানে একটি লোকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি এখন আমার একজন অতি প্রিয় বন্ধু। তাঁহার হৃদয় স্ত্রীলোকের মত কোমল, মন শিশুর মত সরল ও প্রাণ কবিতা ও স্বপ্নে ডোবা। তাঁহাকে কেহ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না।

আমরা রাউয়ালপিণ্ডী হইতে রাত ৯ টার সময় রওয়ানা হইলাম। আমরা পেশোয়ার যাইব। আটক পর্য্যন্ত রেল আছে, তার পরে আর রেল নাই। আটক হইতে পেশোয়ার ৪৫ মাইল। এই ৪৫ মাইল রাত্রিতে ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে হইবে।

আটকে সিন্ধু পার হইলেই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আফগান ভূমিতে প্রবেশ করিলাম। পেশোয়ার ইংরেজের অধিকারে আসিয়াছে বলিয়া আর ম্যাপ্‌কর্ত্তাগণ উত্তর পশ্চিম কোণে লাল রেখাটা পেশোয়ার ছাড়াইয়া টানিয়াছেন বলিয়া পেশোয়ার ভারতবর্ষে। আসলে পেশোয়ারের সঙ্গে ভারতবর্ষের কিছুই মিলে না। সিন্ধু পার হইলেই ভারত ছাড়া হইলাম। সিন্ধু পার হইলেই যে দিকে চাবে পাঠান দেখিবে, যে দিকে শুনিবে পষ্টু শুনিবে। এই আফগান প্রদেশ দিয়া রাত্রিতে ঘোড়ায় গাড়ীতে যাইতে হইবে। আমাদের গাড়ীতে একটা সাহেব ছিল। সে আমাদিগকে ভয়ে অস্থির করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কবে তাহাকে ডাকাতে ধরিয়াছিল, কবে তাহাকে ডাকাত লুটিয়া নিয়াছিল, কল্পিত বা সত্য সে সব কাহিনী আমাদিগকে শুনাইতে লাগিল। কিন্তু আমরা তেমন লোক নয়। ভয় পাইয়া কি বীর বাঙ্গালীর নাম হাসইব? আমরা নির্ভয়ে আটক অভিমুখে চলিলাম। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সাহেবটার সঙ্গে অনেক-গুলি—৫।৭ হাজার টাকা ছিল, আর সঙ্গে একটা বন্দুক ছিল। এ সব দেখিয়াও যে সে রাত্রিতেই আটক হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে পেশোয়ার যাত্রার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করি নাই, তার জন্যে কি আমরা একটা V. C. পাইতে পারি না? আমরা আটক চলিলাম। কালাকা সরাই নামে পথে একটা ষ্টেশন আছে। ইহার সন্নিকটে তক্ষশীলা নগরীর ভগ্নাবশেষ। তাহার বর্ত্তমান নাম সাহডেরি। রেলওয়ে ষ্টেশনের এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে প্রকাণ্ড নগরীর ভগ্নাবশেষ। ৫৫টা বৌদ্ধ স্তূপের চিহ্ন আজও দেখা যায়। সেকেন্দর সাহা তক্ষশীলায় তাঁহার সেনা লইয়া তিন দিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন—তক্ষশীলাপতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালাকা সরাই হইতে ৩ মাইল দূরে জেনেরল নিকল্‌সনের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্ম্মিত একটি জলাশয় আছে। নিকল্‌সন্ ১৮৫৭ সালে দিল্লীর যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি একজন মহাবীর ও অতি মহাজন ছিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহাকে এত ভালবাসিত যে তাহারা তাঁহাকে "নিকলসিংহ" বলিয়া ডাকিত। নিকল্‌সনের জীবদ্দশায়ই তাঁহার একদল উপাসক জন্ম গ্রহণ করে। নিকল্‌সন জনকতক উপাসককে চাবুক মারিয়া তাঁহার উপাসনা রোগ মুক্ত করিতে চেষ্টা পান। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সৈন্যেরা অনেকে দিল্লীতে তাঁহার সমাধি দেখিতে আসে। নিকল্‌সনের মৃত্যুর জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিয়া পঞ্জাবে কত গ্রাম্য-গীতি রচিত হইয়াছে। কালাকা সরাই ছাড়াইলে হাসান আবদাল্ ষ্টেশন। বিখ্যাত মুসলমান পীর হাসান আবদালের এখানে মন্দির আছে বলিয়া ইহার নাম হাসান আব-দাল। শিখরা ইহাকে পাঞ্জা সাহেব বলে। হাসান আবদালে শিখদের ধর্ম্মশালায় যে পুকুর আছে, গুরু নানক নাকি তাহার তীরে আপনার হাতের পাঁচ আঙ্গুলের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন—তাই পাঞ্জা সাহেব নাম। হাসান আবদালের চতুর্দ্দিকেই বিলুপ্ত নগরের ভগ্নাবশেষ। আয়র্লণ্ডের প্রেমের কবি টমাস মূরর হাসান আবদাল দিল্লীর

সম্রাটদিগের কাশ্মীর পথে বিশ্রাম স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে জিহাঙ্গীর তাঁহার প্রেয়সী মহিষী অতুল্যরূপসী (অনুপ্রাসটা পাঠক মাপ করিবেন) ভুবনালোক (নূরজিহান) কে লইয়া বেড়াইতেন—এখানে প্রণয়পীড়িতা লালারুখ বুখানার সিংহাসন ছাড়িয়াও ফরমেরোজের প্রণয় পাইলে অনন্ত সুখে জীবন কাটাইতে পারিত। হাসান আবদাল হইতে দুই মাইল দূরে ওহা নামক গ্রাম। মূয়র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র উদ্যানে এখানে আকবরের প্রেয়সী মহিষীর সমাধিমন্দির আছে। রাত একটার সময় আমরা আটকে পৌঁছিলাম। আটক সিন্ধুর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। আটকের সম্মুখেই কাবুল নদী আসিয়া সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে। সম্মিলন স্থানের নীচে কমালীয়া আর জালালীয়া নামে দুটা প্রকাণ্ড শৈল সরু হইয়া নদীগর্ভে আসিয়া যেন নাক বাড়াইয়া রহিয়াছে। পীর রোশান নামে এক জন মুসলমান ধর্ম্মসংস্কারক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক নূতন মুসলমান সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। কোরাণকে তিনি অভ্রান্ত ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলিয়া মানিতেন না। একমাত্র ঈশ্বর আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নাই, তাঁহার কোন বাহ্যিক পূজার প্রয়োজন নাই, এই তাঁহার ধর্ম্মমত। তাঁহার জালালউদ্দীন ও কমালউদ্দীন নামে দুই পুত্র ছিল। তাহাদিগের নামে শৈল দুটার নাম হইয়াছে। এই শৈল দুটায় আঘাত লাগিয়া, আর তাহাদের আশে পাশে যে ভয়ানক ঘূর্ণা জল আছে, তাহাতে পড়িয়া অনেক নৌকা ও প্রাণী নষ্ট হয়। পীর রোশানের মতে সেরূপ বহু লোকের আত্মা নষ্ট হইত মনে করিয়া গোঁড়া মুসলমানেরা এই শৈল দুটার তাঁহার দুই পুত্রের নামে নাম রাখিয়াছে। আটকে একটি সুবিস্তৃত দুর্গ আছে। আকবর বাদশাহা ১৫৮৩ সালে উহা নির্ম্মাণ করেন। আটকে সিন্ধু হিমালয়-কন্দর হইতে ভারতক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। দুই তীরে পাহাড়—মনে হয় সমস্তই পাহাড় ছিল, সিন্ধু তাহা ভেদ করিয়া রাস্তা করিয়া বাহির হইয়াছেন। সিন্ধুতীরে পাহাড়ের শিরে আটকের দুর্গ। দুর্গে দাঁড়াইয়া সিন্ধুর দৃশ্য দেখিতে বড় সুন্দর। পাহাড় ভেদ করিয়া সিন্ধু তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে। এ আমাদের দেশী নদী নয়—সমভূমিতে হেলিতে দুলিতে, হাসিতে খেলিতে খেলিতে বহিতেছে না। পর্ব্বত-শৃঙ্গ-লঙ্ঘিনী, পর্ব্বত-হৃদয়-বিদারিণীর যে রকম গতি, সিন্ধুর এখানে সে রকম গতি। জল তীরবেগে ফেনিয়া, ঘনিয়া, গর্জ্জিয়া চলিয়াছে। আমরা যখন সিন্ধু নৌসেতুর উপর দিয়া পার হই, তখন চাঁদের আলোতে সিন্ধু উন্মাদিনীর মত ছুটিতেছে।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীম কোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্ব সংখ্যায়, হেষ্টিংসের নন্দকুমারের রাজনৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে মতামত আমরা গুপ্তমন্ত্রণা সভার মন্তব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি। মন্তব্যটি সভার গোপনীয় কার্য্যস্থলে লিখিত ও একমাত্র Official Record বলিয়া ইহার গুরুত্ব ও দায়িত্ব অতিশয় অধিক। সুতরাং ইহা হইতে এই প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে—হেষ্টিংসের মতে নন্দকুমার (তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার পূর্ব্বে) এক জন বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি গুরুদাসের নবাব সরকারে নিয়োগ সম্বন্ধে তর্ক স্থলে আরও বলিয়াছেন "নন্দকুমার তাঁহার ভুতপূর্ব্ব প্রভুর কার্য্য-গুলি যে প্রকার দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সহিত করিয়া আসিয়াছেন, সেই সকল কার্য্য করিতে তাঁহার যেমন নিষ্কলঙ্ক সুখ্যাতি লাভ হইয়াছে, অন্য প্রভুর দ্বারা নিয়োজিত হইলে তিনি যে সেই বিশ্বাসের অপচয় করিবেন না—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নবাব সরকারে তিনি যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, কোম্পানীর কার্য্যেও যে ঠিক্ তদ্রূপ দেখাইবেন, এ সম্বন্ধে আমি কোন দ্বিধামত করি না।" যাহা হউক এ সমস্ত ঘটনা হইতে নির্ব্বিবাদে প্রমাণ হয় যে, হেষ্টিংস নন্দকুমারকে সেই সময়ে একজন বিশুদ্ধ প্রকৃতির উচ্চদরের রাজ পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

হেষ্টিংস যে সময়ে নন্দকুমারের চরিত্রের উৎকর্ষতা প্রমাণ করিয়া উল্লিখিত মন্তব্য লেখেন, সেই সময়ে সবেমাত্র মহম্মদ রেজাখাঁর বিচার আরম্ভ হইয়াছে। এ কার্য্যে নন্দকুমারের সাহায্যের কি প্রকার আবশ্যকতা হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে বহুকাল ব্যাপী বিচারের পর হেষ্টিংস মহম্মদ-রেজাখাঁর অপরাধগুলি সম্যকরূপে প্রমাণ করিতে না পারিয়াই হউক, বা অন্য কোন গূঢ় কারণেই হউক—তাঁহাকে অব্যাহতি দেন। এই সময়ে মার্চ্চমাসে তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে যে পত্র লেখেন, তাহার একস্থলে লিখিয়াছিলেন—"নন্দকুমারের চরিত্র অতি কলুষিত ও কালিমাময়। দয়া, কৃতজ্ঞতা দ্বারাও এই ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাইতে পারে না।" ইহার পর মহম্মদ রেজাখাঁর অভিযোগের এক সুবিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া তিনি ডাইরেক্টারদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই রিপোর্টে মহম্মদ রেজাখাঁর বিচারের সমস্ত কাহিনী, ও নন্দকুমারের দোষে তাঁহার (রেজাখাঁর) অপরাধ-প্রমাণ ব্যর্থতা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠান হইল। নন্দকুমারের দোষেই যে মহম্মদ রেজাখাঁর অপরাধ প্রমাণ হইল না ও তিনি নিজে যে এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন—এই প্রকার নানা কথায় তাঁহার নানাবিধ দোষ কীর্ত্তন করিয়া হেষ্টিংস উপরওয়ালাদিগের নিকট বাহাদুরি লইলেন।

মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসের এই প্রকার কপট ব্যবহারে যে মর্ম্মান্তিক পীড়া পাইলেন, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি নিজে মনে মনে বেশ জানিতেন—মহম্মদ রেজাখাঁর অপরাধ প্রমাণ বিষয়ে তাঁহার পক্ষে কোন ত্রুটি হয় নাই। যে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে তাঁহার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইবে, যে কার্য্য দ্বারা তাঁহার চির-সঞ্চিত উচ্চ আশা সাফল্য লাভ করিবে, যে কার্য্য দ্বারা তিনি প্রতিদ্বন্দীকে পরাভূত করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতে পারিলে দেশের লোকে তাঁহাকে পাইয়া অতিশয় সুখী হইবে, এক কথায় যে কার্য্যের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখ, দুঃখ, উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি সমস্তই নির্ভর করিতেছিল, সে কার্য্যে যে তিনি ইচ্ছা করিয়া শৈথিল্য প্রদর্শন করিবেন—ইহা আমাদের কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। যাহাই হউক মহারাজা নন্দকুমার কার্য্য শেষে হেষ্টিংসের এই প্রকার কপট ও অমানুষিক ব্যবহারে অতিশয় ব্যথিত হইলেন—নিরাশার সহিত প্রতিহিংসা আসিয়া তাঁহার মনঃক্ষেত্রে দেখা দিল। নন্দকুমারের আশা সফল করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পূরণ করা দূরে থাক্, হেষ্টিংস সময় পাইয়া—এই কার্য্যের সমস্ত দোষ ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন—পুরস্কার দূরে রহিল, সুখ্যাতি দূরে রহিল—হেষ্টিংস তাঁহার দোষের কথা চারিদিকে রটাইতে লাগিলেন। মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসের এই প্রকার নীচ ব্যবহারের ও কপটাচরণের প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখন প্রকৃত সুযোগ না ঘটাতে তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এ সুযোগ যে পরে ঘটিয়াছিল, পাঠক তাহা নিম্নে দেখিতে পাইবেন।

হেষ্টিংস এই সময়ে নন্দকুমারকে "অকৃতজ্ঞ" "দুশ্চরিত্র" ইত্যাদি নানা শব্দে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি নন্দকুমারের সম্বন্ধে মহম্মদ রেজাখাঁর বিচারের পর যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়? নন্দকুমারের নিকট হেষ্টিংস তাঁহার শাসন কালের প্রথম হইতে এই সময় পর্য্যন্ত নানাবিধ দুরূহ বিষয়ে সহায়তা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া তাঁহার সহিত যথেষ্ট অভদ্র ব্যবহার করিলেন—ইহাই কি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন? ইহাই কি সচ্চরিত্রের কার্য্য? এই প্রকার ব্যবহারেই কি হেষ্টিংস সাহেব আপনাকে কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত এসমস্ত কথা ভাল করিয়া বুঝিতে সাহস হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনি নন্দকুমারকে এই সময় হইতে "কাল সর্প" "অকৃতজ্ঞ" "দুশ্চরিত্র" প্রভৃতি নানাবিধ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন—কিন্তু নন্দকুমার যে কোন্ সময়ে তাঁহার সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহসী হন নাই। কেবল কলুষিত মনোবৃত্তিদিগের উত্তেজনায়, গায়ের জ্বালা মিটাইবার জন্য তিনি এই প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। হেষ্টিংসের ১৭৭২ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের মন্তব্যের কথা এই সময়ে

ভাবিলে তাঁহাকেই মিথ্যাবাদী, চঞ্চল প্রকৃতি, ও ক্ষীণমনা বলিয়া সন্দেহ করিতে আমাদের মন অগ্রসর হয়।

এস্থলে একটা কথা উঠিতে পারে—হেষ্টিংস নন্দকুমারের পুত্র কুমার গুরুদাসকে নবাব সরকারের দেওয়ানী প্রদান করিয়া ত তাঁহার কৃতজ্ঞতা-ঋণ হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইয়াছেন—এই ঘটনা ধরিলে ত হেষ্টিংসকে অকৃতজ্ঞ ও কপট ব্যবহারী বলিয়া দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। একথার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, হেষ্টিংস যে সময়ে গুরুদাসকে নবাব সরকারে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মহম্মদ রেজাখাঁর বিচার সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। মহারাজা নন্দকুমার তখন সবেমাত্র হেষ্টিং-সের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সুতরাং অভীপ্সিত কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে গুরুদাসকে নবাব সরকারে নিযুক্ত করিয়া নন্দকুমারকে পুরস্কৃত করা এ সময়ে নিতান্ত অসম্ভব। কার্য্য শেষ না হইলে কোন বিজ্ঞলোকে দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহার পারিশ্র-মিক বা পুরস্কার দিয়া থাকে ? অন্য কোন লোকের পক্ষে এই প্রকার সম্ভব হইলেও হেষ্টিংসের ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের পক্ষে যে এ প্রকার কার্য্য নিতান্ত অসম্ভব, ইহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তবে গুরুদাসের নবাব সরকারে নিয়োগের প্রকৃত কারণ কি ? ইহার দুই তিনটী কারণ আছে। প্রথমটী এই—নবাবের সেই নাবাল-কাবস্থায় নিজামতের কার্য্যের বড়ই বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠিয়া ছিল। বিশেষতঃ মহম্মদ রেজাখাঁ বন্দী হইয়া পর্য্যন্ত নিজামতের সকল কার্য্যেই অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। হেষ্টিংস এই বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য নিজামতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। এই কারণেই মণিবেগমকে নবাবের রক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু মণিবেগম কিছু দুরূহ রাজকার্য্য চালাইতে পারিবেন না—সুতরাং কুমার গুরুদাসকে নিজামতের দেওয়ানী দেওয়া হইল। মহম্মদ রেজাখাঁ, রাজা সেতাব রায় ও মহারাজা নন্দকুমার ভিন্ন সেই সময়ে দেশের মধ্যে আর কেহই এই কার্য্যের উপযুক্ত ছিলেন না। ইঁহাদের তিনজনকে লইয়াই তখন কাজ চলিতেছিল, সুতরাং এ তিন জনকে সে সময়ে নিজামতের কার্য্যে নিযুক্ত করা অসম্ভব—এই জন্য কুমার গুরুদাসকে নিযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত হইল। গুরুদাসের নিয়োগে প্রকারান্তরে নন্দকুমারেরই সহায়তা লাভ হইবে, ইহাই হেষ্টিংসের ধারণা হইল। ইহা ভিন্ন এ কার্য্যের আর একটী কারণ ছিল, * তাহা মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার অভিযোগ-পত্রেই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি

* হেষ্টিংসের নিম্ন লিখিত পত্রখানি দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে তিনি কাজে কথায় কত দূর মিল রাখিতেন ও নন্দকুমারের সহিত কতদূর কুব্যবহার করিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি নন্দকুমারকে বাহিরে সুখ্যাতি করিতেছেন—সেই মুহূর্ত্তেই বা তাহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মনোমধ্যে সেই বাহ্যিক ভাবের বিপরীত ভাব বর্ত্তমান। তিনি

উৎকোচ গ্রহণের কথা সত্য বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে তাহাও কুমার গুরুদাসের নিয়োগের একটী অন্যতম কারণ বলিতে হইবে। যাহা হউক এই নিয়োগ কার্য্য-সময়ে কৌন্সিলের সদস্যগণ নন্দকুমারের পুত্রের নিয়োগ সম্বন্ধে হেষ্টিংসের সহিত যথেষ্ট প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে হেষ্টিংস তাহা আদৌ গ্রাহ্য না করিয়া নন্দকুমারকে অতিশয় প্রশংসা করিয়া এক দীর্ঘ মন্তব্য লেখেন। এ মন্তব্যের কথা অনেকবার বলা হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গুরুদাসের নিয়োগ সময়ে হেষ্টিংস যে কোন প্রকার উৎকোচ লইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়। মহারাজার অভিযোগ পত্র হইতে এমন কি হেষ্টিংসের নিজপত্র হইতেই ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। গুরুদাসের নিয়োগের পর তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু Duprè কে বিলাতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিতেছেন, গুরুদাসের নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার গোপনীয় উদ্দেশ্য ছিল।

প্রকাশ্যরূপে রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার যে কি গুপ্ত উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, ইহা ত আমরা বুঝিতে পারিলাম না। রাজকার্য্য সম্বন্ধে বা রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে সমস্ত গোপনীয় কথা তিনি মন্ত্রণাসভায় প্রকাশ করিয়া বলিতে বিশেষ বাধ্য, কিন্তু তাহাও করেন নাই। হেষ্টিংসের এই পত্র দেখিয়া আমাদের মনে স্বতঃই এক সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, তিনি উৎকোচ লইয়া কুমার গুরুদাসকে নিজামতের নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কুমার গুরুদাসও রাজ সরকারে নিয়োজিত হইলেন, হেষ্টিংসও ডবল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে সংযত করিয়া কোম্পানীর রাজত্বের একছত্রা অধি-পতি হইলেন। মহম্মদ রেজাখাঁর বিচার শেষ হইলে তিনি অব্যাহতি পাইলেন। রাজা সেতাব রায়কে পূর্ব্বেই প্রমাণাদি লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। † ইহার পর নন্দ-

---

গুরুদাসের নিয়োগ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এই কথা বুঝাইবার জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"The appointment of Rajah Gurdas was not so well approved of his father who did us many ill offices in the time of Mirjaffer; and when I was in Bengal before, I rejected every offer of reconciliation with him. I still dislike him although I countenance and employ him. *I had secret motives in addition to these which I have assigned for the promotion of his son. I can not relate them but the latter are alone in my judgment, sufficient to justify my choice.* The arguments which were urged against the proposal have great force."

Vide—Hastings to Joshias Duprè—Dated, Fort William 16th Jan. 1773.

† রাজা সেতাব রায়কে ধরিতে Court of Directorদিগের আদেশ ছিল না। তত্রাচ হেষ্টিংস তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় আনান। রাজা সেতাব রায়ও

কুমারের আয়াসসাধ্য কার্য্যের পরিণাম ও পুরস্কার কি প্রকার হইল,তাহা আমারা উপরেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার কিয়ৎকাল পরে Regulating Acts বিধিবদ্ধ হইল ও তাহার স্বত্বানুসারে কৌন্সিলের নূতন সভ্যগণ কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন। এই সময় হইতে কলিকাতার কার্য্য-স্রোত বিভিন্ন মুখে ফিরিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহম্মদ রেজাখাঁর অভিযোগের পর মহারাজা নন্দকুমারকে প্রতিজ্ঞামতে পুরস্কৃত না করিয়া ও তাঁহার বিরুদ্ধে শ্লেষপূর্ণ পত্রাদি ডিরেক্টর সভায় পাঠাইয়া হেষ্টিংস অতিশয় গর্হিত ও অকপট ব্যবহার করিয়াছেন। মহারাজা নন্দকুমারকে এই কার্য্যে ব্রতী করিবার সময় হেষ্টিংস তাঁহাকে যে যথেষ্ট আশা দিয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। কার্য্যসিদ্ধি হউক আর না হউক, বাঙ্গলার নায়েব দেওয়ানি মহম্মদ রেজাখাঁর অবর্ত্তমানে তাহাকে দেওয়া হইবে, এ প্রকার আভাসও দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন হেষ্টিংস ডবল গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিলেন, তখন হইতেই নন্দকুমারের সন্দেহ জন্মিল। পরে রেজাখাঁর বিচার শেষ হইলে যখন নন্দকুমার তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া প্রতারিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলেন, তখন গবর্ণরের উপর তাঁহার মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মিল। হেষ্টিংসও কার্য্য উদ্ধার হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া নন্দকুমারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। এই সকল ঘটনা দেখিয়া মহারাজা নন্দকুমারের অভিযোগ পত্রের প্রথমাংশ আমাদের সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ইহার একস্থলে তিনি উল্লেখ করিতেছেন—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হেষ্টিংস আমার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তিনি আর কোন বিষয়েই আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন না। এই সময়ে আমার প্রতি সদ্ভাব পরিত্যাগ করিয়া তিনি শত্রুতাচরণ আরম্ভ করিলেন"। *

যাহা হউক যে সময়ে মহারাজ নন্দকুমার নিরাশার ভীষণ দংশনে এই প্রকার ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, যে সময়ে হেষ্টিংসের কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার বাসনা

মহারাজা নন্দকুমারের ন্যায় একজন প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন। হেষ্টিংসের এই ব্যবহারে তিনি আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করিলেন। সম্মানের সহিত বেকসুর খোলসা পাইলেও তাঁহার মর্ম্মপীড়ার অবসান হইল না। ইহা হইতে তাঁহার কঠিন পীড়া উপস্থিত হইল ও সেই পীড়ার যন্ত্রণায় তিনি দেহত্যাগ করিলেন। হেষ্টিংস তখন দয়া দেখাইবার জন্য তাঁহার পুত্র রাজা কল্যাণ সিংহকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

* "Mr Hastings until he had informed himself from me of the affairs of this country remained excessively well pleased with me. When he had this knowledge from me, he no longer consulted me; instead of my patron, he became my enemy and acted as such.

Rep. Select Committee. App. XIII.

তাঁহার মনে প্রদীপ্তরূপে জ্বলিতেছিল, সেই সময়ে কৌন্সিলের মেম্বরেরা কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন (১৭৭৪ অক্টোবরে)। কলিকাতায় তখন রোহিল্লা যুদ্ধ, রেজাখাঁ ও সেতাব রায়ের বিচার লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। এই হুলস্থূলের সময়ে, এই ঘোরতর আন্দোলনের সময়ে কৌন্সিলের মেম্বরগণ কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহারা চাঁদ-পাল ঘাটে উঠিয়াই যে হেষ্টিংসের ব্যবহারে বিরক্ত হন, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। হেষ্টিংসের উদ্ধত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহারাও ক্ষুণ্ণ ও ক্রোধপূর্ণ মনে কৌন্সিলে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই রোহিল্লা যুদ্ধের কথা লইয়া বিচার চলিল। সে সমস্ত কথা এস্থলে উল্লেখ অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

কৌন্সিলে যখন রোহিল্লা যুদ্ধ ও অন্যান্য রাজ কার্য্য সম্বন্ধে এই প্রকার আন্দোলন ও সমালোচনা চলিতে লাগিল, সেই সময়ে মহারাজা নন্দকুমার অভিযোগগুলি দাখিল করিবার উপযুক্ত অবসর পাইলেন।

১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ১১ই মার্চ্চ তিনি কৌন্সিলের সম্মুখে অভিযোগগুলি পেশ করেন। কি কি কারণে বাধ্য হইয়া এই অভিযোগগুলি কলিকাতা মন্ত্রী সভার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। কারণগুলি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় তিনি অন্য কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া কেবল আত্মরক্ষার্থে এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে অন্য কোন প্রকার কুঅভিসন্ধি বা বিরুদ্ধ বাসনা ছিল না। কৌন্সিলের সম্মুখে তিনি যে সমস্ত অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, কৌন্সিল তাহা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া হেষ্টিংস সভ্যগণের কার্য্যপ্রণালী নানাবিধ তীব্র কথায় সমা-লোচনা করিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের মতে নন্দকুমারের ন্যায় লোকের নিকট হইতে অভিযোগ পত্র গ্রহণ করিয়া কৌন্সিলের সভ্যগণ অতিশয় অন্যায় ও বিধি বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। এই কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের পদগৌরব নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আশ্চ-র্য্যের বিষয় এই ভবিষ্যতে পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণ মহারাজা নন্দকুমারের এই অভিযোগ পত্রের বৈধতা স্বীকার করিয়াছিলেন ও তাঁহার এই অভিযোগপত্র সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ যোগ্য বিবেচনা করিয়া হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে ইহাও একটী নূতন অপরাধ গণ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, পার্লামেণ্ট মহাসভা যে বিষয়ের গুরুত্ব সহজে উপলব্ধি করিয়া এই অভিযোগ পত্রোল্লিখিত ঘটনাগুলি তাঁহাদের গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, কলিকাতা কৌন্সিল সেইগুলি গ্রহণ করিয়া মনোযোগ প্রদর্শন করাতে হেষ্টিংস তাঁহাদের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে আমরা দেখাইব কি কি কারণে বাধ্য হইয়া নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি উপস্থিত করেন।

নিয়ামক বিধির নিয়মানুসারে কৌন্সিলের সভ্যগণ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তৎকালে কোন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী দেশে পদার্পণ করিলেই তাঁহার সহিত দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হইত। মহারাজ নন্দকুমার কৌন্সিলের নূতন সাহেবদিগের সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছায় তাঁহাদের কলিকাতায় আসিবার এক সপ্তাহ পরেই গবর্ণরের সহিত দেখা করিতে গেলেন। হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি নূতন মন্ত্রী সভার সভ্যগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে হেষ্টিংস বলিলেন—"আমি সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি আপনি আমার শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। আপনি কেন সেই নূতন বন্ধুর সাহায্যে কৌন্সিলের মেম্বরগণের সহিত পরিচিত হউন না?" সর্ব্বশেষে গবর্ণর তাঁহাকে শাসাইয়া বলিলেন "আমি এখন হইতে আত্মরক্ষার্থে চেষ্টিত হইলাম, ইহাতে আপনারই সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা"। এতদুত্তরে মহারাজা নন্দকুমার উত্তর করিলেন—"আপনি আমার পরমশত্রু গ্রেহাম সাহেবের কথায় আদতে কর্ণপাত করিবেন না।" ইহার পর কিয়দ্দিবস আর কোন কথাই হইল না। ইতিমধ্যে হেষ্টিংস ইলিয়াট সাহেবকে দিয়া কৌন্সিলের সদস্যগণের সহিত নন্দকুমারের পরিচয় করাইয়া দেন। মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ববৎ নন্দকুমার গবর্ণরের বাটীতে বা বাগানে যাইতেন ও তাঁহাদের নানা প্রসঙ্গে কথোপকথন হইত। অক্টোবর মাসে মেম্বরগণ কলিকাতায় আইসেন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি (২৯ পৌষ) একদিন নন্দকুমার গবর্ণরের বাটীতে গেলেন। দেখিলেন গবর্ণর গ্রেহাম সাহেবের সহিত কোন বিষয় কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন। কার্য্য শেষ হইলে গ্রেহাম সাহেব চলিয়া গেলেন। মহারাজা নন্দকুমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গবর্ণর বলিলেন—"আপনি গোপনে আমার শত্রুগণের সহিত মিশিয়া আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, ইহা আমি নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিয়াছি। এই সময় হইতে আমি এখানে, এমন কি বিলাতে পর্য্যন্ত আপনার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে ছাড়িব না। আপনি আজ হইতে আমার নিকট আর আসিবেন না। আপনার ক্ষমতায় যতদূর পারেন, আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন।" * হেষ্টিংসের মুখ হইতে এ প্রকার কথা বাহির হইবে, ইহা নন্দকুমার স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি মনে করিলেন—গবর্ণর হয়তঃ তাঁহার শত্রুগণের গ্লানিতে উত্তেজিত হইয়া রাগের মাথায় তাঁহাকে এই সকল কটু কথা বলিয়াছেন।

---

* "I am certain that you are acting the part of an enemy towards me; I shall hereafter be your enemy here and shall not cease to be such even in Europe. You must not come near me from this day—go and do me the utmost evil in your power."

Vide—Par. History of England pp. 333,334.

গবর্ণরের মন হইতে ভ্রমাপনোদন জন্য নন্দকুমার অনেক চেষ্টা করিলেন ও তৎপরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

বিশেষ বিবেচনা দ্বারা নন্দকুমার স্থির করিলেন—গবর্ণর যে তাঁহাকে বৃথা ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। রাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদস্থ ক্ষমতাবান্ কর্ম্মচারীর মুখ হইতে নির্গত এই সকল কথা যে অর্থ শূন্য ও নিষ্ফল হইবে, ইহা তিনি কোন ক্রমেই ভাবিতে পারিলেন না। কিন্তু আত্মরক্ষার্থে এই সময় হইতে বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহারই দুই চারি দিবস পরে ঘটনা স্রোত ভিন্ন দিকে ফিরিল। নন্দকুমার উৎসুক নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। গবর্ণরের বাটীতে প্রতিদিন রাত্রে, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার আলিপুরের বাগান বাটীতে, একটী গুপ্ত মন্ত্রণা সমিতি বসিল। মোহনপ্রসাদ ও জগৎচাঁদ নিভৃতে, অলক্ষ্য ভাবে গবর্ণরের বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এ সকল কথা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল। গবর্ণরের ন্যায় উচ্চপদস্থ শাসন কর্ত্তার সহিত সামান্য প্রাণী মোহনপ্রসাদ ও জগৎচাঁদের * কিসের মন্ত্রণা হইত—ইহা কেহই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তীক্ষ্ণদর্শী নন্দকুমার অবিলম্বেই সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন। তিনি স্থির নিশ্চয় করিলেন—তাঁহার ধ্বংশ সাধন করিতেই গবর্ণর এই দুই জন সামান্য লোকের সহায়তা প্রার্থী হইয়াছেন। তিনি আরও শুনিলেন যে—মোহনপ্রসাদ গবর্ণরের নিকট হইতে প্রতি সাক্ষাৎ সময়েই সম্মান চিহ্ন স্বরূপ পান ও আতর পাইয়া থাকেন। মোহনপ্রসাদকে গবর্ণর সাহেব কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে দুশ্চরিত্র বলিয়া বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন—তাহাকে আজ আবার সুচরিত্র বোধে, পান ও আতর দিয়া কেন যে সম্মান করা হইতেছে,তাহা তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমানের বুঝিতে বাকী রহিল না। জগৎচাঁদ তাঁহার নিজের জামাতা ও অন্নভুক্,তাঁহারই অন্নে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট—তাঁহারই সহায়তায় দশজনের নিকট পরিচিত—সেই জগৎচাঁদ যখন গবর্ণরের নিভৃতকক্ষে প্রায়ই গোপনে গমনাগমন করে, তখন অবশ্যই যে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে মন্ত্রণা হইতেছে, তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি চক্রান্তের মূলে কুঠারাঘাত দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে

* জগৎচাঁদের সহিত হেষ্টিংসের যে শেষে খুব মাখামাখি হইয়াছিল ও তাঁহার নিকট হইতে তিনি যে সমস্ত গুহ্য কথা বাহির করিয়া লইতেন, তাহা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি হইতে বেশ বোধ হয়।

"Sometime ago, I was told that Nundkumar has sent his son a draft of a letter to be written by the Nabob to the Board—requiring to be put in full charge of his own affairs and to be freed from the opressive guardianship of Muny Begum. Jogut Chand had before told me—that the general asked him—what was the Nobob's age: Vide—Hasting's letter to Graham, dated F. W. 25th March. 1775.

কটিবদ্ধ হইলেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে তিনি হেষ্টিংসের নামে অভিযোগগুলি লইয়া কৌন্সিলের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। এই প্রকার উপায়াবলম্বন ভিন্ন তাঁহার আত্মগৌরব রক্ষার যে অন্য কোন পথ ছিল, ইহা আমরা দেখিতে পাই না। *

আশ্চর্য্যের বিষয় এই মহারাজা নন্দকুমারের এই সন্দেহই শেষে প্রকৃত সত্যে পরিণত হইয়াছিল। ইহার কয়েক মাস পরেই তাঁহার নামে সুপ্রীমকোর্টে "চক্রান্ত" ও "জাল" অভিযোগে দুইটী মোকর্দ্দামা উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে শেষেরটী অর্থাৎ প্রধানটীতে, মোহনপ্রসাদই নন্দকুমারের নামে অভিযোগ আনিয়াছিলেন। এই ঘটনা দেখিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হয়—নন্দকুমারের ধ্বংশের জন্য হেষ্টিংস এই সকল নীচ প্রকৃতির লোক লইয়া চক্রান্তে ব্যস্ত ছিলেন। মোহনপ্রসাদকে গবর্ণরের বাটীতে যাতায়াত করিতে দেখিয়া নন্দকুমারের বিশেষ সন্দেহ হইয়াছিল। সুতরাং অভিযোগ-পত্রে মোহনপ্রসাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভাবী অনিষ্টের কথা বলিয়াছিলেন। মোহন-প্রসাদ সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা যদি নন্দকুমার জাল মোকর্দ্দামার সময়ে বলিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমাদের তাহাতে সন্দেহ হইতে পারিত। কিন্তু মোকর্দ্দামার রুজু হইবার চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে যখন আমরা এ সম্বন্ধে সন্দেহজনক কথা মহারাজা নন্দকুমারের মুখ হইতে ভবিষ্যৎ বাণীর মত শুনিতে পাই, আর পরে সেই সন্দেহই যখন কঠোর সত্যে পরিণত দেখিতে পাই, তখনই আমরা মহারাজা নন্দকুমারের কথার গুরুত্ব, তাঁহার তীক্ষ্ণ দর্শিতা ও প্রতিভার প্রাধান্য স্বীকার করিতে অগ্রসর হই। যদি মোহনপ্রসাদ ও জগৎচাঁদের সহিত এই সময়ে গবর্ণরের এই অস্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতার কথা একেবারে অমূলক হইত,তাহা হইলে হেষ্টিংস ও তাঁহার বন্ধুগণ অনায়াসেই ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিতেন। কিন্তু যখন তাঁহারা তদ্রূপ করিতে সমর্থ হন নাই, বা আদৌ কোন চেষ্টা করেন নাই, তখনই বোধ হইতেছে যে নন্দকুমারের কথা সম্পূর্ণ সমূলক। নন্দকুমারকে যে তিনি বাটীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—একথাও তিনি Conspiracyর মোকর্দ্দামার জোবানবন্দী দিবার সময় নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছিলেন। যে কথাগুলি বলিয়া তিনি নন্দকুমারকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কেবল সেই গুলিই সাহস করিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই—গোলমাল করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে বেশ প্রমাণ হইবে যে হেষ্টিংস হইতে মহারাজ নন্দকুমারের ভয়ের অনেক কারণ ছিল। হেষ্টিং-সের উপর অনেক দিন হইতেই তাঁহার অভক্তি সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহার কপটতা-

---

* এই আবেদন পত্রের একস্থলে নন্দকুমার লিখিতেছেন—

"I esteem my honor dearer than my life and I am not insensible of the injury my character may suffer from the discoveries I am about to make but greater disgrace attend my silence and I am left without a choice." Par. Hist. P. 334.

চরণে তিনি এক সময়ে মর্ম্মান্তিক পীড়া পাইয়াছিলেন, সুতরাং কেবল আত্মসম্মান রক্ষার্থে ও পূর্ব্ব সঞ্চিত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি এই রাজনৈতিক সমরক্ষেত্রে একাকী অবতীর্ণ হইলেন।

হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে এই অভিযোগগুলি আনিয়া মহারাজ নন্দকুমার যে কতদূর সাহসের ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আর বিশেষ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। সেই সময়ে গবর্ণর সাহেবই দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তাঁহার সেই প্রলয়ঙ্করী ক্ষমতার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়া মহারাজা যে মানসিক বলের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ কার্য্য দ্বারা যে তিনি ক্ষুধার্ত্ত কেশরীর মুখ মধ্যে অঙ্গুলি নিবিষ্ট করিয়া দিতেছেন—প্রজ্বলিত দিগন্তব্যাপী অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিতে যাইতেছেন, ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তুচ্ছ জীবনের মায়ায় কখন কর্ত্তব্য ভুলিবার লোক ছিলেন না। সম্মান তাঁহার পক্ষে প্রথম স্পৃহনীয়। যে জীবন তিনি এতাদন সম্মানের ও গৌরবের সহিত যাপন করিয়া আসিয়াছেন, সেই জীবন—সম্মান বিচ্যুত হইয়া একাকী থাকিবে—ইহা তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে। নন্দকুমার স্থির নিশ্চয় করিলেন—অকূলে ত আত্মসমর্পণ করিয়াছি, জলন্ত হুতাশনে প্রবেশ ত করিয়াছি, তবে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি না কেন যদি কোন প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহাদের ধ্বংশময় আলিঙ্গন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। মনে মনে ভাবিলেন যদি হেষ্টিংসকে এই সমরক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, তবে আমার গৌরব ও সম্মান শত গুণে বর্দ্ধিত হইবে ও বহুকাল পর্য্যন্ত অক্ষত থাকিবে ও চিরসঞ্চিত আশা সাফল্য লাভ করিবে।

মহারাজা নন্দকুমার যথন সাহসে ভর করিয়া হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে তাঁহার নিজের কোম্পানীর ও প্রজাগণের স্বপক্ষে সুতীক্ষ্ণ অভিযোগগুলি লইয়া উপস্থিত হইলেন, তথন দেশের ছোট বড় সকলেই আশ্চর্য্য ও ভীত হইল। সকলেই বুঝিল গবর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ও ধ্বংশ পথ সরল করা একই পদার্থ। এ পর্য্যন্ত কত অত্যাচার, অরাজকতা, স্বেচ্ছাচার তাহাদের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—মুখ বুজিয়া কত সহিষ্ণুতার সহিত তাহারা তাহাদের ন্যায্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে—কতবার তাহারা ক্ষমতাপন্ন শাসনকর্ত্তা ও প্রবিন্সিয়াল কৌন্সিলের কার্য্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে গিয়া বিকল মনোরথ. হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—কতবার যে কত লোকে এই প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া তাহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে—তাহা তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। যদিও এই কার্য্যে সিদ্ধলাভ করিলে মহারাজা নন্দকুমারের কেন—সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই স্বার্থসিদ্ধি হইবে, তিনি এই কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিলে তাহারা ভবিষ্যত অত্যাচার ও অরাজকতা হইতে মুক্ত হইবে, যদিও তাহারা মহারাজ নন্দকুমারের কার্য্যদক্ষতা ও প্রতিভা-

প্রখরতার কথা অবগত ছিল, তথাপি এ কার্য্যের সফলতায় সন্দেহ করিতে লাগিল। কিন্তু মনে মনে তাঁহার সিদ্ধিকামনা করিতে ছাড়িল না।

নন্দকুমারও এই ভয়ানক কার্য্যের কঠোর দায়িত্ব বেশ উপলব্ধি করিলেন। যে রাজ্যে সামান্য ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ করিয়া কেহ সহজে পার পায় নাই, তিনি সেই রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এইরূপ করিতে অগ্রসর হইতেছেন, ইহাতে তাঁহার কতদূর বিপদের সম্ভাবনা, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। তাঁহার এই কার্য্যে একা গবর্ণর কেন—সমস্ত উচ্চপদস্থ ইংরাজই তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠিবেন। তখনকার কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় উৎকোচলোভী ছিলেন। নন্দকুমারের পথাবলম্বী হইয়া অন্য সকলে এইরূপ করিতে সাহসী হইলে তাহাদের জাতীয় সম্মান ও পদগৌরব নষ্ট হইবে—তাহাদের প্রতিপত্তি লোপ হইবে, সুতরাং এ কার্য্যে তাহারাও গবর্ণরের ন্যায় তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিবে। এইরূপ কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করুন আর নাই করুন, ইহা করিতে অগ্রসর হইলেই যে গবর্ণরের সহিত তাঁহার দুরপণেয় শত্রুতা ও আজীবন বিচ্ছেদ ঘটিবে, ইহাও তিনি বেশ জানিতেন। এ সকল জানিয়া শুনিয়া নিজ দায়িত্ব ও ভাবী বিপদ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও যখন সাহসী হইয়া তিনি এই প্রকার অভিযোগ আনিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন যে তাঁহার অভিযোগের কারণগুলি সমূলক ও সদ্যুক্তি প্রণোদিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। নন্দকুমারের অভিযোগ-পত্রখানি আদ্যোপান্ত আমরা পুর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অভিযোগ-পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িলেই বোধ হয়—ইহার ভিতর যাহা কিছু উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই সত্য ও সমূলক। এই অভিযোগ পত্রের মধ্যে যে অংশটীতে উৎকোচের কথা আছে, তাহা আরও সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়। এই অভিযোগ পত্রে কি কারণে—কোন তারিখে—কাহার মারফতে—কয় দফায়, কি প্রকারে টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। প্রত্যেক তোড়াতে কি প্রকারের মুদ্রা কত দেওয়া হইয়াছিল ও তাহা কোথায় পাঠান হইয়াছিল, তাহারও বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এই অভিযোগ-পত্রখানি যে প্রকার প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে ও মুদ্রাদি আদান প্রদানের কথা যে প্রকার সূক্ষ্মতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সহজেই বোধ হয় জমা খরচের খাতা বা অন্য কোন লিখিত বিবরণ হইতে এরূপে সংবদ্ধ করিয়া নকল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পত্রোল্লিখিত ঘটনা সমস্ত যে কেবল স্মরণ শক্তির সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, ইহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। অবশ্যই এ সম্বন্ধে কোন প্রকার লিখিত হিসাবাদি ছিল, তাহা হইতেই ইহা সঙ্কলিত হওয়াই সম্ভব। এই অভিযোগ-পত্রে নয় জন ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে—ইহাদের মারফতে, বা জ্ঞাতসারে টাকাগুলির আদান প্রদান হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে গবর্ণরের খানসামা বালকৃষ্ণ ও জগন্নাথ, শিবরাম, সদানন্দ, নরসিংহ, চৈতন্য-

নাথ, কুমার গুরুদাস, ও মনিবেগম তখনও বর্ত্তমান ছিলেন। * অভিযোগোক্ত কথাগুলি যদি মিথ্যা ঘটনাই হইত, তবে এই সকল লোককে একত্রিত করিয়া সাফাই সাক্ষী দেওয়াইলেই হেষ্টিংস সম্পূর্ণরূপে দোষ মুক্ত হইতেন ও নন্দকুমার মিথ্যাবাদী হইয়া পড়িতেন; কিন্তু যখন তাহা হয় নাই, হেষ্টিংস যখন এই সহজ উপায়াবলম্বনে নিজ চরিত্র রক্ষা করিতে অশক্ত হইয়াছিলেন—তখন আমাদের নিশ্চয়ই প্রতীতি হয়—নন্দকুমারের এই অভিযোগ পত্র কোন অংশেই মিথ্যা নহে।

উল্লিখিত অভিযোগগুলি ১১ই মার্চ্চ নন্দকুমার কৌন্সিলের সমক্ষে উপস্থিত করেন। ১৩ই মার্চ্চ বোর্ডে লিখিয়া পাঠান ঐ পত্রোক্ত অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রমাণ করাইবার জন্য তিনি নিজে বোর্ডে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত আছেন। এ প্রকার কার্য্য দ্বারা নন্দকুমার একপক্ষে যতদূর সাহসিকতা দেখাইয়া অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—অন্য পক্ষে হেষ্টিংস এইগুলি মিথ্যা প্রমাণ করাইতে সাহস অবলম্বন না করিয়া যথেষ্ট কাপুরুষতা দেখাইয়া লোকের মনে বিরুদ্ধ সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিলেন। এই প্রকার অপবাদ উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারীর পক্ষে—বিশেষতঃ ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কোম্পানীর কর্ম্মচারীর পক্ষে—নিতান্তই অসহনীয় ও সম্মান-হানিকর। সর্ব্বোচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইয়া সাধারণ কার্য্যে লোক্ নিয়োগ করিবার সময় উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন—এ অপরাধ তাহার পক্ষে বৃশ্চিক দংশন অপেক্ষাও যন্ত্রণাদায়ক। কি দোষী কি নির্দ্দোষী যে প্রকার লোকই হউক না কেন, এ প্রকার অভিযোগ দেখিলে সেই ব্যক্তি স্বপক্ষে প্রমাণাদি সংগ্রহ দ্বারা নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু হেষ্টিংস ইহার কিছুই করেন নাই। আত্ম চরিত্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করা দূরে থাক্, যাহাতে আরও তাঁহার কার্য্য কলাপের উপর লোকের সন্দেহ জন্মে, তিনি তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রকার স্থলে অভিযোক্তা তাঁহার সংগৃহীত প্রমাণগুলি দ্বারা যখন অভিযোগোক্ত বিষয়গুলি প্রমাণ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইগুলি মিথ্যা বা অমূলক হইলে সেই সময়ে হেষ্টিংস অনায়াসেই তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন। নন্দকুমারের অপেক্ষা দেশের লোকে অধিকাংশই তাঁহাকে ভয় করিত, নন্দকুমারের অপেক্ষা অনেক লোকে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থী হইতে চেষ্টা করিত। কিন্তু প্রকৃত দোষী হইলে আত্মরক্ষার চেষ্টা যেমন বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়ায়—হেষ্টিংসও এই কার্য্য ক্ষেত্রে সেই বিশ্বাসে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া বিফল প্রযত্ন হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

---

* এই সমস্ত সাক্ষীদিগের অধিকাংশই কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। কেবল শিবরাম এই সময়ে চন্দননগরে ও নরসিংহ মুরশীদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহাদিগকে এই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আনানও যে অসম্ভব ব্যাপার, তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না।

যমুনা।

(সত্য ঘটনা হইতে গৃহীত)

১

শীতের প্রভাত, অন্ধকার কুয়াসার মাঝে মাঝে উষার আভাষ ফুটিয়া উঠিতেছে, উত্তরের হিম বাতাস বহিতেছে, কিন্তু আমাদের বাড়ী আজ ব্রাহ্মণ ভোজন—সকালেই ঘরের বাহির না হইলে নয়—আমি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রত্যূষে উঠিয়া কলসী কক্ষে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম, নদীর ধারে আসিয়া দেখিলাম একটি গাছের তলায় একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া বসিল, আমাদের এ ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে আমরা মেয়েরা সকলকে সকলে চিনি, দেখিলাম মেয়েটি এ গাঁয়ের নয়, একটু অবাক হইলাম, অমন রূপবতী যুবতী মেয়েটি একাকী এখানে কেও? তাহার শীতে বিবর্ণ, অবসন্ন, শ্রান্ত ভাবাপন্ন মুখখানি দেখিয়া প্রাণ কেমন কাঁদিয়া উঠিল, কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁ গা তুমি কে গা, কোথা হইতে আসিয়াছ? মেয়েটি বিষণ্ণ নেত্র তুলিয়া আস্তে আস্তে উত্তর করিল—"আমি একজন যাত্রী গো, আর চলিতে পারিলাম না, এইখানেই তাই পড়িয়া আছি—"

"তুমি যুবতী একা যাত্রী! বাড়ীর লোকেরা তোমাকে এরূপে একা ছাড়িয়া দিয়াছে!"

যুবতী চক্ষু নত করিয়া বলিল—"বাড়ীর লোক আমার কেহ নাই—" তাহার বিষণ্ণ স্বর আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল—বলিলাম—"কেহ নাই তোমার! তবে কোথায় যাইবে তুমি?"

যুবতী বলিল—"যদি স্থান পাই, এইখানেই থাকিব, আমাকে কেহ এখানে দাসী রাখিবেন?"

আমার চোখে জল আসিল—আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও মুখ ফুটিল না—বুঝিলাম অভাগিনী বিধবা ভদ্র কন্যা, সংসারের মোহাবর্ত্তে পড়িয়া আশ্রয় হারাইয়াছে, বলিলাম—"আজ হইতে আমি তোর দিদি হইলাম—আমার সঙ্গে চল"

গঙ্গাস্নান করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসিলাম।

২

অল্প দিনের মধ্যেই যমুনা আমাদের নিতান্ত আপনার হইয়া পড়িল, এমন কোন কথা নাই যাহা তাহাকে না বলিয়া আমাদের দুই বোয়ের মনের তৃপ্তি হয়, এমন কোন আমোদ প্রমোদ কাজ কর্ম্ম নাই যাহা তাহাকে ছাড়িয়া করিতে মন উঠে। ক্রিয়া কর্ম্মে, অসুখে বিসুখে, হর্ষ উল্লাসে যমুনা আমাদের সঙ্গিনী, সুখে দুঃখে সে আমাদের

আপনার। কিন্তু আমরা তাহাকে যত আপনার ভাবি—সে কি আমাদের তত ভাবে?

আমাদের স্নেহে তাহার ত কই সে স্থির বিষণ্ণ ভাব ঘুচে না, আমাদের কাছে সেত কখনো তাহার হৃদয়ের কথা খুলে না। এতদিন আসিয়াছে আমরা তাহার জীবন ইতিহাস কিছুই জানিলাম না, এই মাত্র জানি—জাতিতে সে আমাদের এক জাতি, সে কায়স্থ কন্যা। বাপের বাড়ী তাহার মেদিনীপুর জেলায়। বাপ মা এখন কেহই নাই, তাহার দাঁড়াইবারও স্থান নাই।

"কেন শ্বশুরালয়?"

সে কথায় সে উত্তর করিতে চাহে না, এ সম্বন্ধে বেশী পীড়াপীড়ি করিলেই তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসে—সে সেখান হইতে চলিয়া যায়।

আমাদের সহিত যমুনার এরূপ লুকাচুরী ভাব কেন? একি আমাদের প্রতি তাহার ভালবাসার অভাব? বুঝি তাহা নহে, আমাদের সুখে দুঃখে তাহার সে আন্তরিক মমতা মৌখিক হইতে পারে না। বুঝি বা তাহার জীবনে এরূপ লজ্জার কথা আছে—যাহা প্রকাশ করিতে তাহার বুক ফাটিয়া যায়—যাহা প্রকাশ করিয়া কাহারো মমতা প্রত্যাশা করিতেও সে সাহসী নহে। এই ভাবিয়া আমরাও আর তাহার জীবনের কথা তুলি না,—তবে মাঝে মাঝে এখনো কৌতূহল জন্মে, তাহার এখনকার নিঃস্বার্থ পবিত্র জীবন কখনো মলিন ভাবে ঢাকিয়াছিল—ইহা সকল সময় মনে করিতে পারি না, সময় সময় একেবারে তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়,—তাই মাঝে মাঝে যমুনার এই লুকাচুরীতে এই অবিশ্বাসের ভাবে বড় ব্যথিত হইয়া পড়ি।

এখনো বৎসর পূর্ণ হয় নাই, যমুনা শীতকালে আসিয়াছিল—এখন বর্ষা আসিয়াছে। আজ সকাল হইতে মেঘ করিয়া আছে - চারিদিক একটা আঁধার বিষণ্ণ ভাবে আচ্ছন্ন,—আমরা দুই জনে বিকালে গঙ্গায় গা ধুইতে আসিয়াছি। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে—আকাশের মেঘ গাঢ়তর হইয়া গঙ্গার জল যেন আরো কাল করিয়া তুলিল—দেখিতে দেখিতে জলে নামিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল—আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"যমুনা শীঘ্র ওঠ— আয় না"—যমুনা আমার দিকে মুখ ফিরাইল,—চমকিয়া উঠিলাম— কি ঘোর বিষণ্ণতা! বাহিরের আঁধার যেন তাহার হৃদয়ের অর্দ্ধ বিকাশ মাত্র। আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"দিদি তুমি ঘরে যাও—আমি আর একটু থাকি" আমি আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম "যমুনা আমরা কি তোর এতই পর?" সে আমার কথা বুঝিল, জলপূর্ণ নেত্রে কহিল "দিদি আর ত আমার আপনার অন্য কেহ নাই!"

"তবে যমুনা তোর এই বিশ্বাসের অভাব কেন? আমাদের কাছে মনের ব্যথা লুকাস কেন?"

যমুনা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া কহিল "ভগবান জানেন কেন লুকাই। কিন্তু আর

আর লুকাইব না, যদি এই অভাগিনীর জীবন শুনিতে এতই সাধ, তবে শোন দিদি।”

আমরা সিঁড়িতে উঠিয়া বসিলাম, চৌদিকে অন্ধকার, পদতলে নদী, মাথার উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, দুইজনে চারিদিক ভুলিয়া দুই জনের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম, যমুনা গল্প করিতে লাগিল, আমি নীরবে শুনিতে লাগিলাম।

৩

“সে দিনও ঠিক এই রকম একটি দিন, সকাল হইতে মেঘ করিয়া সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। আমি আমাদের কুটীরে আমার রুগ্ন মাতার কাছে বসিয়া আছি। আমার বয়স ১২ বৎসর, কিন্তু এখনো বিবাহ হয় নাই। আমার বয়স যখন ৫ বৎসর তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়। পিতা ধনবান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দু এক জন দুষ্ট লোকে তাঁহার ঋণের দাবী দিয়া আমাদের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লয়। সংসারে আমাদের আপনার লোক কেহ নাই, উদ্যোগ করিয়া, যত্ন করিয়া আমার বিবাহ দিবার কেহ নাই, মা একা স্ত্রীলোক! দরিদ্র কায়স্থ কন্যার বিবাহ সহজে হয় না। তাই এতদিন আমার বিবাহ হয় নাই। মা সে জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, মনের অসুখে শরীর অসুখ দিন দিন তাঁহার বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি যাহাকে পান কেবল ঐ কথা বলেন, একটি সুপাত্র স্থির করিতে অনুরোধ করেন, ঐ এক কথাই তাঁহার মনে জাগিতেছে, তাহা ছাড়া যেন তাঁহার মনে আর কোন কথা নাই। সে দিন সন্ধ্যাবেলাও ঐ কথা হইতেছিল, মা গেলে আমার কি দশা হইবে আমাকে বুকে ধরিয়া মা তাহাই বলিতেছিলেন, বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, ঘরের মধ্যে আমাদের দু জনের অশ্রুধারা বহিতেছিল। এমন সময় আমাদের কুটীরের দ্বারে ঘা পড়িল। মা বলিলেন “হারার মা এল বুঝি দরজাটা খুলে দে” হারার মা আমাদের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশিনী আমাদের ঘর সংসারের কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়। আমি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। হারার মা নহে, একজন আর্দ্র-কলেবর অপরিচিত পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি বলিলেন “আমাকে আজিকার মত এখানে একটু আশ্রয় দিবেন কি? এই বৃষ্টিতে আর বাড়ী যাইতে পারিতেছি না”। মা তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন “আহা তা ভিজবে কেন বাছা, রাতটা এইখানেই থাক”।

পথিক সে রাত্রের জন্য আমাদের অতিথি হইলেন।

আমাদের ৪ খানি ঘর। একটি রান্নাঘর একটি গোয়াল, আর দুইখানি ভাল ঘর, তাহারি একখানি পথিকের শয়নের জন্য প্রস্তুত হইল, আমাদের যথাসাধ্য অতিথি সৎকার করিলাম। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে শুনিলাম পথিক পীড়িত। সে দিনও আর তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া হইল না। ক্রমে এক রাত্রির পরিবর্ত্তে এক সপ্তাহ, এক

সপ্তাহের পর এক মাস প্রায় কাটিয়া গেল, পীড়িত পথিক আমাদের গৃহে অতিথি হইয়া রহিলেন।”

বলিতে বলিতে সহসা যমুনার বিষণ্ণ মুখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি প্রকাশ পাইল, বুঝি বা তাহা অন্ধকার জীবনে সুখ-স্মৃতির দীপ্তি। যমুনা একটুখানি থামিয়া সজল নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল “দিদি সে দিনের পর বাঁচিয়া রহিলাম কেন? প্রতিদিন অন্য কাজ কর্ম্মের মধ্যে ছুটিয়া যখন পথিককে দেখিতে আসিতাম, প্রতিদিন তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া, তাঁহার মুখে আরোগ্যের লাবণ্য সঞ্চার দেখিয়া হৃদয়ে যে আনন্দ উথলিয়া উঠিত, সেই আনন্দ না হারাইতে হারাইতে মরিয়া গেলাম না কেন?

প্রতিদিন তাঁহার কাছে আসিয়া তাহার সতৃষ্ণ নয়নে যে নীরব ঔৎসুক্য দেখিতে পাইতাম, যে ঔৎসুক্যে—কিছু না বুঝিয়াও মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁহার ভালবাসা অনুভব করিতাম, যে ভালবাসা তাঁহার দেবত্ব বিভাসিত করিত, সেই প্রেমে সেই দেবত্বে বিশ্বাস থাকিতে থাকিতে কেন মরিয়া গেলাম না?”

যমুনা থামিল, একটা অসহ্য কষ্টে যেন তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বিদ্যুৎ ঝলসিতে লাগিল, নদী উথলিতে লাগিল, আমরা দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

যমুনা আবার আরম্ভ করিল “পথিক আরোগ্য হইলেন, তাঁহার যাওয়ার আর কোন বাধা নাই, প্রতিদিন শুনিতেছি দুই চারি দিনের মধ্যে যাইবেন কিন্তু সে দুই চার দিন আর ফুরাইতেছে না। এক দিন আমি অন্য ঘরে কাজ করিতেছি, পাশের ঘরে মা পথিকের সহিত গল্প করিতেছিলেন—হঠাৎ এই কথাগুলি কাণে গেল—শুনিলাম পথিক বলিতেছেন “আমার কথাটা একটু বিবেচনা করিবেন, আপনাদের ন্যায় আমিও সদ্বংশজাত কায়স্থ, আমার অর্থ আছে, আপনার কন্যাকেও আমি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি—”

এই সময় আমার সই কুসুম আসিয়া আমাকে ডাকিল, আর কিছু শোনা হইল না, কি জানি কুসুম যদি ঘরের মধ্যে আসিয়া সব শুনিয়া ফেলে—তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া কুসুমের কাছে আসিলাম।

সেই দিন কুসুমদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম পথিকের সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত রাত সে দিন ঘুম হইল না, বিবাহ কি তখন ঠিক বুঝিতাম না, এইটুক বুঝিলাম পথিক আমাদের ফেলিয়া আর চলিয়া যাইবেন না, পথিক আমাদের আপনার হইবেন, এই মিলনের আনন্দের মধ্যে কেমন একটা বিচ্ছেদের ভাব তাড়াইতে পারিলাম না, কে জানে কেন সুখে দুঃখে আকুল হইয়া সমস্ত রাত জাগিয়া কাটাইলাম। কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। মা যেন আমাকে বিবাহিত দেখিবার জন্যই

জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল, স্বামীর প্রেম পাইয়া স্নেহময়ী মাতার অসীম স্নেহ হারাইলাম।

*　　　*　　　*　　　*

আমি শ্বশুর বাড়ী যাইব। স্বামী প্রথমে একাকী একবার বাড়ী যাইতে চাহেন, কিন্তু আমি তাহাতে নিতান্ত আপত্তি করাতে আমাকে একেবারেই সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

নব বধূর স্বামীর গৃহে যাইতে কত না আহ্লাদ, শাশুড়ি বধূ দেখিয়া কত না আহ্লাদিত হইবেন, তাঁহার স্নেহে মাতার স্নেহ লাভ করিব, ছোট ছোট ননদ দেবরেরা হাসিমুখে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে, আমার ভাই বোন নাই, তাহাদের ভাই বোন পাইব। গুরু জনের আশীর্ব্বাদের মধ্যে, পরিজনবর্গের আনন্দের মধ্যে প্রেমময় স্বামীর সহিত নূতন সংসারে প্রবেশ করিব, প্রাণে কত আহ্লাদ, মনে কত সুখের ছবি। সারাপথ পালকীর মধ্যে এই কথাই মনে জাগিতেছে, পাল্কী থামিলে স্বামীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া অধীর হইয়া উঠিতেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন পাল্কী নামিতেছে তখন হঠাৎ কেমন একটা ক্ষণস্থায়ী নিরাশার মধ্যে এতক্ষণকার আশা নিভিয়া পড়িতেছে; স্বামীর মুখে যেন আমার হৃদয়ের আমোদ প্রতিফলিত দেখিতেছি না—তাঁহাকে যেন এক একবার অস্বাভাবিক গম্ভীর বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপ আশায় নিরাশায় সুখে দুঃখে আট দিন পথে পথে কাটিল, পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম বিকালের মধ্যে বাড়ী পৌছিব, উৎসুক্যে মন পূর্ণ হইয়া রহিল। বিকালে গ্রামের নিকটে পাল্কী থামিল। স্বামী সেইখান হইতে তাঁহার আমার দুইটি পাল্কীই বিদায় করিয়া দিলেন, বলিলেন বাড়ী অতি নিকটে, সন্ধ্যা হইলে দুই জনে বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে গিয়া পৌছিব। নব বধূ বেড়াইতে বেড়াইতে গৃহে যাইবে কেমন নূতন রকম বোধ হইল, বড় লজ্জা হইতে লাগিল, কেমন একটা অশোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, দু একটা আপত্তির কথা কি বলিতে গেলাম, স্বামী হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

শীতকালের বিকাল, দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের আলো সন্ধ্যার আঁধার এক হইয়া আসে, অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিক একটা মলিন আলোকে ডুবিয়া পড়িতে লাগিল, একটি নির্জ্জন পথে স্বামীর অনুসরণ করিয়া সন্ধ্যার কিছু আগে একটা গাছ পালাময় ক্ষুদ্র জঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলাম, সহসা একটা অন্ধকার যেন বাহিরের আলোক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, হঠাৎ যেন হৃদয় কেমন কাঁপিয়া উঠিল, স্বামী বলিলেন, "ঐ দেখ আমাদের বাড়ী,"

কম্পিত হৃদয়ে মুখ তুলিয়া চাহিলাম; একটি ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী নজরে পড়িল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবা মাত্র স্বামী বলিলেন—"তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি আসিতেছি," তিনি দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন,

অপরিচিত অন্ধকার স্থানে, একটা অজানিত অন্ধকার হৃদয়ে ধরিয়া একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, একটু পরে প্রদীপ হস্তে একজন রমণী আমার দিকে আগুয়ান হইলেন, ভাবিলাম এইবার শাশুড়ি ঠাকরুণ আমাকে লইতে আসিয়াছেন, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ভাল করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিলাম। রমণী নিকটে আসিয়া বলিলেন—"এই বুঝি নতুন দাসী, তা দাসীর আবার এত ঘোমটা কেন" ?

কি শুনিলাম কিছু বুঝিলাম না—কেবল একটা বজ্রের ধ্বনি মাথার মধ্যে ঝন ঝন করিয়া উঠিয়া মর্ম্মভেদ করিয়া চলিয়া গেল—বাড়ী ঘর চৌদিকে প্রবল বেগে ঘুরিয়া উঠিল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

৪

মানুষ যাহা চায় বুঝি তাহা পায় না, যাহা পায় বুঝি তাহা চায় না, আমি জ্ঞান চাহি নাই, তবু জ্ঞান জন্মিল, দেখিলাম একটি অপরিচিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মলিন শয্যার উপর একাকী পড়িয়া আছি। প্রাণ ছটফট করিয়া উঠিল, আকুল হইয়া চৌদিকে চাহিয়া দেখিলাম, যাহাকে দেখিতে প্রাণ কাতর তাহার দেখা পাইলাম না, উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলাম, মাথা ঘুরিতে লাগিল, কাঁদিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। কিছু পরে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া আমার কাছে বসিল, আমাকে জাগন্ত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিল,—জানিতে যাহা বাকী ছিল সব জানিলাম। জানিলাম সেই দিন হইতে তিন চার দিন আমি পীড়িত। জানিলাম—তাহার ন্যায় এ গৃহে আমিও দাসী, তাহা ছাড়া অন্য অধিকার আমার নাই। স্বামী জাতিতে বৈদ্য আমি কায়স্থ, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ বিবাহই নহে। প্রথম রাত্রে যে রমণী আমাকে দাসী বলিয়াছিলেন—তিনিই স্বামীর পরিণীতা পত্নী। সব শুনিলাম, সব বুঝিলাম, মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিলাম, তবু মৃত্যু হইল না, তবু আরোগ্য লাভ করিলাম, ক্রমে উঠিবার হাঁটিবার সামর্থ্য জন্মিল, আমি চলিয়া যাইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম।

এক দিন দুপুর বেলায় বাড়ীর সকলে যখন বিশ্রাম লাভ করিতেছে—আমি একাকী গৃহের বাহির হইয়া গেলাম, জঙ্গল পার হইয়া মুক্তমাঠে আসিয়া পড়িয়া একটি আম গাছের তলায় বসিলাম, আর চলিতে তখনও বল নাই। চারিদিক নিঃঝুম নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে দুর তরু মধ্য হইতে ঘুঘু ডাকিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিয়া আবার থামিয়া পড়িতেছে, আমি যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি তাহাতেই হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে,—আমার চারিদিক কি শূন্য কি অন্ধকার ! আমার আর কিছু নাই, আমার আর কেহ নাই, এই অসীম সংসারে আমি একাকী ! ওগো পৃথিবীতে আর কেহ কাহাকে কি বিশ্বাস করিবে না—ভাল বাসিবে না ! পৃথিবীতে কি সকলেই এইরূপ প্রতারক ! সকল পুরুষেই কি এইরূপ বিশ্বাসঘাতক

বালিকাকে প্রতারণা করিয়া, তাহার জীবন কলঙ্কিত করিয়াই সুখ অনুভব করে? সংসারের এই কি নিয়ম?

অদূরে কাহাকে দেখিতে পাইলাম! সেই রাতের পর এই প্রথম দেখা, সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া উঠিল। এই কি সেই? করুণাময় স্বামী ভাবিয়া যাহার পদতলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছি? এই কি সেই? দেবতা ভাবিয়া যাহাকে দিবানিশি পূজা করিয়াছি? সেই দেবতা আমার আজ প্রতারক? সেই করুণাময় স্বামী আজ আমার প্রাণ হন্তা-রক!

স্বামী আমার নিকটে অগ্রসর হইলেন, বলিলেন "যমুনা, আমাকে মাপ কর, আমি তোমাকে অন্যত্র লইয়া যাইব। তোমাকে এখানে আনিয়া অন্যায় করিয়াছি, সেই দিন হইতে তোমার সহিত দেখারও একবার সুবিধা হয় নাই"।

সর্ব্বাঙ্গে হুহু করিয়া আগুণ জ্বলিয়া উঠিল, এইখানে আনিয়া অন্যায় করিয়াছেন—আর কিছু অন্যায় নহে! স্বামী আমার স্কন্ধে হাত দিতে যাইতেছিলেন, বিদ্যুতের মত সরিয়া দাঁড়াইয়া গর্ব্বিত তীব্র স্বরে বলিলাম "আমাকে স্পর্শ করিও না, তুমি আমার স্বামী, কিন্তু আমি জানি আমি তোমার পত্নী নহি—আমাকে স্পর্শ করিও না"—স্বামী থমকিয়া দাঁড়াইলেন—আমি রুদ্ধশ্বাসে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম, কিছুপরে ফিরিয়া দেখিলাম—স্বামী আমার অনুসরণ করেন নাই।

তাহার পর এইখানে আসিয়া পড়িয়াছি।

*　　　*　　　*　　　*

যমুনার কথা শেষ হইয়াছে, বৃষ্টিও প্রায় থামিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মত আকাশ এখনো মেঘান্ধ, মেঘান্ধ হৃদয়ে সেই মেঘান্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া আমরা দুজনে নিস্তব্ধে বসিয়া আছি, এই সময় ও পাড়ার কালিন্দি কলসী কক্ষে ঘাটে জল লইতে আসিল—আমাদের দেখিয়া বলিল—"কি গো তোরা দুজনে চুপচাপ করে ভাবছিস কি?"—আমি তখন উঠিলাম, যমুনাকে বলিলাম "ঘরে আয়"।

দুজনে নদী তীর হইতে দুই এক পা আসিয়াছি আমাদের ঝি আসিয়া বলিল—"মাঠাকরুণ যমুনা দির দেশের একজন লোক এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চায়" "যমুনার দেশের লোক?" যমুনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমরা গৃহাভিমুখী হইলাম, বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া দাসী অদূরের একটি বৃক্ষতলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল—যমুনার মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল, সে বদ্ধ-পদ হইয়া দাঁড়াইল।—বৃক্ষতল হইতে একজন পুরুষ আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমি সরিয়া গেলাম—পুরুষ যমুনার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—ছিন্ন শাখার ন্যায় সহসা যমুনা তাহার পদতলে পড়িয়া গেল।　*　*　*　*　*　*

সে পুরুষ আর কেহ নহে যমুনার স্বামী। যমুনার সন্ধান পাইয়া তিনি তাহাকে লইতে

আসিয়াছিলেন। যমুনার রূপের ঘোর এখনো বুঝি তাঁহার হৃদয়ে কিছু লাগিয়াছিল। যমুনা প্রথমে তাঁহার সহিত যাইতে কোনমতে সম্মত হইল না,—কিন্তু তাহার স্বামী মহা জেদ করিয়া বলিলেন যে যমুনা তাহার সঙ্গে না গেলে তিনি এখান হইতে কখনই যাইবেন না। দুই চার দিন চলিয়া গেল—সত্যই তিনি চলিয়া গেলেন না—তখন সে যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু যাইবার আগে স্বামীকে এই অঙ্গীকার করাইয়া লইল—যে তিনি তাহাকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া দিবেন—এবং তাহাকে পরস্ত্রী ভাবে দেখিবেন।

৫

যমুনা অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনো তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না,—যেখানে সেখানে তাহার স্মৃতি ছড়ান দেখিতে পাই, যে সে কথায় তাহার কথা আসিয়া পড়ে—সুখে দুঃখে আমাদের সে সঙ্গিনী ছিল, সুখে দুঃখে তাহাকে মনে পড়িয়া যায়। আমার ছোট ছেলেটির কয়দিন হইতে অসুখ করিয়াছে, নিকটে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে করিতে ক্রমাগত এখন যমুনার কথাই মনে পড়িতেছে, সে গোপালকে বড় ভালবাসিত, তাহার কোলে কোলেই গোপাল মানুষ হইয়াছে—যমুনা এখন এখানে থাকিলে কত যত্নই ইহাকে করিত। হঠাৎ এ চিন্তায় বাধা পড়িল—খোকার দাসী বলিল—

"মা খোকার অসুখ ত এখনো সারছে না,—তা শুনছি শ্মশানে একজন সন্ন্যাসিনী এসেছে, অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্র জানে—তার কাছে একবার গেলে হয় না?"—

কথাটা মনে লাগিল, আমি সেই বিকালেই দাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর নিকট গমন করিলাম।

নদীতীরে শ্মশানে শবকুটীর, সে কুটীরে শ্মশান হইতে বিষণ্ণ গম্ভীর এলোকেশী সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি, হৃদয় স্তম্ভিত হইল—ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণত হইতে গেলাম। কিন্তু ভূমিষ্ঠ না হইতে হইতে সন্ন্যাসিনী হাত ধরিয়া উঠাইলেন—অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিলাম—সেই রুক্ষজটাযুক্ত কেশপাশ-প্রচ্ছন্ন মলিন গম্ভীর অপরিচিত মুখশ্রীর মধ্যে পরিচিত কি যেন লুকান মনে হইতে লাগিল, কাহাকে যেন চিনি চিনি কাহাকে যেন এইরূপ দেখিয়াছি অথচ তাহাকে মনে করিতে পারিতেছি না,—আমার সে আকুলতা দেখিয়া সন্ন্যাসিনীর অধর প্রান্তে হাসির রেখা পড়িল—আমি বলিয়া উঠিলাম "যমুনা!" যমুনার চক্ষুদিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, আমি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, আবার তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছিল—বলিলাম "যমুনা তোর এ কি বেশ!" যমুনার নেত্র অশ্রুহীন, সে কোন উত্তর করিল না—একটু কেবল হাসিল। অত-দুঃখে লোকে হাসিতে পারে আশ্চর্য্য

হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম—"যমুনা আবার ফিরিয়া আসিলি কেন"? যমুনা বলিল "দিদি ভাঙ্গা জিনিস কি যোড়া লাগে? শুনিলাম অন্যের নিকট স্বামী আমাকে"—" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন—তাই চলিয়া আসিয়াছি"। কথাগুলি সে হাসিয়া বলিতে চেষ্টা করিল—সে হাসিতে মর্ম্ম বিদ্ধ হইল, বুঝিলাম সে কি কষ্টের হাসি, বুঝিলাম—অশ্রুতে সে কষ্টের সান্ত্বনা নাই, তাই এ হাসির উপেক্ষা। যমুনা বুঝি আমার কষ্ট বুঝিল, বলিল—"দিদি মানুষের জন্য মানুষের কি কষ্ট হয়?—মিথ্যা কথা—সব কষ্ট আপনার জন্য"—আর কথা কহিলাম না,—স্তব্ধ হইয়া গেলাম, বুঝিলাম যমুনা সে যমুনা নহে।

কিছু পরে আমি বলিলাম "যমুনা আমাদের বাড়ী চল না" যমুনা উত্তর করিল "দিদি শ্মশানই আমার আপনার ঘর, এ ঘর আর ছাড়িব না" অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই তাহাকে বাড়ী আনিতে পারিলাম না, তাহার দগ্ধ হৃদয় লইয়া জীবন্তে সে শ্মশানবাসী হইল। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাকে একবার করিয়া দেখিতে যাইতাম, একদিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কুটীর দ্বারে আসিতেই কতক-গুলা শৃগাল কুকুর আমার মুখপানে চাহিয়া একবার চীৎকার করিয়া উঠিয়া কিছুদূরে সরিয়া গেল, আমার হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল, রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম—অভাগিনীর মৃত দেহ ভূমিতে লুটাইতেছে, শিহরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আমাদের বিশ্বাস, কোন গ্রাহক এই হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর দিতে পারিবেন না। তাহার কারণ কি বলুন দেখি?

হেঁয়ালি নাট্য।*

(রাম, শ্যাম, মাধব, দামোদর ও চিন্তামণি কুণ্ডু অত্যন্ত ক্ষুণ্নমনে লেখনী হস্তে উপবিষ্ট—সত্যশরণ বাবুর প্রবেশ।)

সত্য। কি হে ব্যাপারটা কি? এত গম্ভীর এত বিষণ্ণ যে? তোমাদের কাগজে বুঝি রসিকতা করবার আবশ্যক হয়েচে!

রাম। না।

সত্য। তবে ত আর কোন ন্যায্য কারণ দেখা যাচ্চে না। তবে বুঝি আর্য্যশাস্ত্র না পড়ে আর্য্য শাস্ত্র সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিখ্‌তে হবে?

---

* গত পৌষমাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "কেমন"। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সান্যাল, শ্রীযুক্ত অনন্তলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ পুণ্ডরীক ইঁহারা ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

চিন্তামণি। না।

সত্য। এবারকার কাগজে কোন্ ভদ্রলোককে গাল দিতে হবে ভেবে পাচ্চ না বুঝি?

দামোদর। তাও না।

সত্য। আর্য্যশাস্ত্রও না, গালও না, রসিকতাও না—তবে বুঝি দেশের একটা বিশেষ কিছু সৌভাগ্যের কারণ ঘটেছে, নইলে তোমাদের মুখ এত শুক্‌নো দেখ্‌তুম না।

সকলে গম্ভীরস্বরে। কন্‌গ্রেস্!

সত্য। কনগ্রেস—তা হয়েছে কি!

দামোদর ও চিন্তামণি। কন্‌গ্রেস্ হল এবং ভাঙ্গল, দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় লোক এল এবং গেল, আমরা রাম শ্যাম মাধব দামোদর ও চিন্তামণি এই ক'টিতে মিলে কলম হাতে করে বসে আছি, আমাদের দিকে কেউ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে না!

সত্য। হায় হায়!

দামু বসু এবং শ্যাম পাল। আমরা আর্য্য, আমরা ঠনঠনের চটি পরি, আমরা কেউবা বোস কেউ বা সাহা কেউবা কুণ্ডু কেউ বা পরামাণিক, অথচ আমাদের কেউ কিছু বল্লে না!

সত্য। আহা!

রামচন্দ্র ঢেঁকি ও মাধব পর্ব্বত। আমরা কাগজে লিখে রামমণি মুখুয্যে ও নীলকমল চক্রবর্ত্তীকে জাতে ঠেলেচি, আমাদের দিকে কেউ তাকালে না!

দামোদর এবং চিন্তামণি। আমরা বিজ্ঞান না পড়ে প্রমাণ করে দিয়েছি যে টিকি রাখ্‌লে আর্য্য মস্তিষ্কের মধ্যে Magnetic current প্রবেশ হবার সুযোগ হয়—আমাদের দুজনের কারো প্রতি কেউ মনোযোগ প্রকাশ করলে না!

সত্য। বুঝ্‌লুম তা তোমরা কি করতে চাও?

দামু। আমরা কিছু বল্‌ব।

চিন্তা। আমরা লিখ্‌ব।

রাম। কন্‌গ্রেস্ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলা আবশ্যক।

দামু। দেশে এত বড় একটা কাণ্ড হল, বড় বড় লোক এল এবং গেল, আমরা রাম শ্যাম মাধব দামু এবং চিন্তামণি কুণ্ডু ১৭ নম্বর পাঁচু মিস্ত্রির গলিতে বরাবর কলম ধরে বসে রইলুম অথচ একটি কথা বল্‌লুম না এ হতেই পারে না।

সত্য। তা কি বল্‌বে?

চিন্তা। আমরা গাল দেব।

সত্য। কেন, ভাল জিনিষকে ভাল বল্‌তে দোষ কি?

দামু। আমাদের যে অভ্যেস নেই। তা হলে যে আমাদের সাতাশ হাজার তিন শ পঁচানব্বই জন পাঠক একেবারে হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।* সে কাজ নেই।

সত্য। তা বটে। তা তোমরা কি বলে গাল দেবে?

চিন্তা। আমরা বল্‌ব, এ কন্‌গ্রেস্‌ কন্‌গ্রেসই নয়।

সত্য। কারণ কি?

দামু। কারণ এ কন্‌গ্রেসে রাম শ্যাম মাধব দামোদর এবং চিন্তামণি কুণ্ডুকে আহ্বান করা হয় নি।

সত্য। তাতে ব্যাঘাত কি হয়েচে?

চিন্তা। সেই জন্যে কন্‌গ্রেসে আর আর সকল বিষয়ে কথা হয়েচে, কেবল নারদের ঢেঁকি, ভরদ্বাজমুণির কাণ্ডজ্ঞান এবং আর্য্য তাড়িৎশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নি।

দামু! সেই জন্যে, আমি ভদ্র ঘরের মেয়েদের গাল দিয়ে যে একটা প্রহসন লিখেচি সেটা কন্‌গ্রেসে অভিনয় করার প্রস্তাব কেউ উথাপিত করে নি।

মাধব। সেই জন্যে নৃত্যকালী গাঙ্গুলিকে জাতিচ্যুত করা উচিত কি না, এ সম্বন্ধে মাধব পর্ব্বতের মত ও ব্যবস্থা কন্‌গ্রেসে সমালোচিত হতে পারে নি!

রাম। সেই জন্যে "ভীত স্তম্ভিত বিস্মিত সচকিত" প্রভৃতি সাতাশ হাজার গ্রাহক-নাচানে শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা হয় নি।

সত্য। বিদেশের লোকে তোমাদের বাঙ্গলা বক্তৃতা যে বুঝ্‌ত না, তারাত তোমাদের আর্য্য কাগজের গ্রাহক নয়।

শ্যাম। নেই বা বুঝ্‌লে! আমরা রাম শ্যাম মাধব, এবং দামু এবং চিন্তে—আমরা ত পরস্পরের ভাষা বুঝ্‌তুম!

মাধব। আমাদের আরো বল্‌বার কথা আছে।

সত্য। কি বল দেখি?

মাধব। আমরা অত্যন্ত গরীব।

সত্য। সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

মাধব। গরীবের জন্যে আমাদের প্রাণ কাঁদে।

সত্য। সে আরো অসম্ভব। অনাহারে যারা মরে যাচ্চে—তাদের ভিক্ষের ধন ফাঁকি দিয়ে একখানা কোটাবাড়ি ও একখানা প্রমাণসই ভুঁড়ির বনেদ গেঁথেচ, তোমাদের প্রাণ গরীবের জন্যে কাঁদে!

মাধব। তা আমরা লিখ্‌ব, কন্‌গ্রেসে বড় বড় অনেক কথা সমালোচিত হয়েছে, কিন্তু ছোট কথা, গরীবের কথা কিছু বলা হয় নি। ছোট কথা গরীবের কথার জন্য আমাদের প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল।

দামু। ঠিক বলেছ ভাই—তোমার মাথায় বড্ড যুগিয়েছে। এ কথাটা কাগজে লিখ্‌লে ভারি ভাল শোনাবে। অত্যন্ত করুণরসের সঞ্চার হবে। আমরা লিখ্‌ব "আমরা গরীব—বড় বড় কথা শুনে আমাদের কোন লাভ নেই। ছোট কথা গরীবের কথার

জন্যে আমাদের প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল।" শুনে আমাদের সাতাশ হাজার তিন শ পঁচানব্বই জন গ্রাহক অনর্গল অশ্রুপাত করতে থাকবে।

মাধব। এবং কাগজের আগাম চাঁদা পাঠিয়ে দেবে।

চিন্তা। আমরা লিখ্‌ব—দাদাভাই নওরোজি বম্বে থেকে এলেন, কলুর ঘানির কঁ্যাচ্‌-কঁ্যাচ্‌ শব্দ সম্বন্ধে কিছুই বল্লেন না। অথচ রেপ্রেজেণ্টেটিব গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে অনেক কথা হল।

রাম। শুন্‌লুম, সুব্রহ্মণ্য আয়ার মান্দ্রাজ থেকে এসেছেন, তিনি আমাদের দেশের ঢেঁকির কথাটা পাড়লেন কই! সিবিল সর্ব্বিস্‌ যখন ছিল না তখনো গরীবের ঢেঁকি ছিল, সিবিল সর্ব্বিস্‌ যখন হল তখনো গরীবের ঢেঁকি চল্‌চে—এমন যে পুরাতন গরীবের ঢেঁকি সে সম্বন্ধে একটি কথাও উঠ্‌ল না অথচ সিবিল্‌ সর্ব্বিসের সম্বন্ধে কত কথাই শোনা গেল!

দামু। এর থেকে প্রমাণ হচ্চে যে কন্‌গ্রেসে ছোট কথা গরীবের কথা উত্থাপিত হয় নি—ঢেঁকির কথা ঘানির কথা ওঠে নি অথচ আশ্চর্য্য এই যে সিবিল সর্ব্বিসের কথা উঠেছিল!

চিন্তা। এর থেকে আরো প্রমাণ হচ্চে যে সমস্ত ভারতবর্ষে ছোট কথা গরীবের কথা কেউ ভাবে না। কেবল পাঁচু মিস্ত্রির গলিতে পাঁচ জন লোকের প্রাণ গরীবের জন্যে আকুল।

রাম। সেই পাঁচ জন লোক হচ্চে শ্রীযুক্ত রাম শ্যাম মাধব এবং দামোদর এবং চিন্তামণি।

শ্যাম। পাঁচুমিস্ত্রির গলির সেই পাঁচটি লোককেই কন্‌গ্রেস্‌ থেকে ছেঁটে দেওয়া হয়েচে—এই জন্যে ঢেঁকি এবং ঘানি ছাড়া কন্‌গ্রেসে আর সকল কথাই উঠেছিল।

মাধব। এই জন্যে পাঁচুমিস্ত্রির গলির উক্ত পাঁচ জন লোক কন্‌গ্রেস্‌ সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন।

সত্য। এবং তার পর দিন প্রভাতে ডেলিগেট্‌গণ ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে যে যার বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌বেন।

আচ্ছা বাপু, জিজ্ঞাসা করি, এক্‌টা কোন বড় অনুষ্ঠান হইলেই তোমরা কেন দাঁত খিঁচিয়ে মর?

দামু। পাছে কেউ মনে করে পাঁচুমিস্ত্রির গলির আমরা পাঁচজন কেউ নই!

সত্য। যজ্ঞের ভোজের সময় ব্রাহ্মণেরা যখন খেতে বসে তখন কাকগুলো কেবল ঢেলা[illegible] এবং পাশের তেঁতুলগাছে বসে চেঁচিয়ে মরে—তোমাদেরও সেই দশা। আচ্ছা তোমরা যে এত করে কোকিয়ে মর তোমাদের কথা কেউ শোনে?

চিন্তা। শোনে না ত কি! সাতাশ হাজার তিন শ পঁচানব্বই জন গ্রাহক আমরা যা বলি তাই শোনে এবং ডুটো করে পয়সা দেয়!

সত্য। (বিষণ্ণ মুখে) তা বটে। পোড়া দেশের পোড়া অদৃষ্ট!

(প্রস্থান)

একজন ভিক্ষুকের প্রবেশ।

ভিক্ষুক। জয় হোক্ বাবা, সমস্ত দিন উপবাসী আছি—কিছু ভিক্ষে দাও।

মাধব। আমরা যে ভাই গরীব, গরীবের জন্যে আমাদের প্রাণ কাঁদে!

ভিক্ষুক। আহা কি মিষ্টি কথা! তা বাবা, কিছু ভিক্ষে—

দামু। কোথায় পাব ভাই, আমরা যে গরীব! গরীবের জন্যে কেবল আমাদের প্রাণ কাঁদে!

ভিক্ষুক। (চতুর্দ্দিকের গৃহসজ্জা নিরীক্ষণ করিয়া) কেবল প্রাণ কাঁদে আর কিছু হয় না?

চিন্তা। কিছু না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি।   (প্রস্থান)

হরকালীর প্রবেশ।

হর। সেই যে বাড়ি বন্ধক নিয়ে পঁচিশ হাজার টাকা ধার দেবেন বলেছিলেন—সেইটে স্থির করবার জন্যে এসেচি।

দামু। অতি উত্তম প্রস্তাব। কলম রাখ এইটে চুকিয়ে দিয়ে তার পরে কন্‌গ্রেস নিয়ে পড়ব।

(চক্ষু মুছিয়া) আহা আমরা গরীব, তাই গরীবের জন্যে প্রাণ কাঁদে!

——০:০——

প্রতিবাদ।

গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতী ও বালকে সমালোচনা শীর্ষক প্রবন্ধে সাধক সঙ্গীত হইতে রামপ্রসাদের যে জীবনী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সমালোচক সাধক সঙ্গীতের সমালোচনা করিতে যাইয়া যে ভাবে রামপ্রসাদের জীবনী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমাদের এই প্রতীতি হইতেছে যে রামপ্রসাদের ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে উক্ত জীবনীতে যে সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে, তাঁহারও সেই সকল অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ সায় আছে। এই জন্য ও পাছে সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সম্বন্ধে জনসাধারণ ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিপোষণ করেন, এই ভয়ে এবং সত্যের অনুরোধে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। নতু সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে আমরা কখনই প্রবৃত্ত হইতাম না।

প্রথমতঃ। জীবনাখ্যায়ক একস্থলে লিখিয়াছেন, "হিন্দুশাস্ত্রে সালোক্য, সামীপ্য, সাযোজ্য, নির্ব্বাণ এই চারি প্রকার মুক্তির উল্লেখ আছে, রামপ্রসাদ ইহার কোন প্রকার মুক্তিরই কামনা করিতেন না"। কিন্তু এই কথা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক। রামপ্রসাদের একটী সঙ্গীতে—

"প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার ও রাঙা চরণে মিশি॥"

এবং অপর একটিতে—

"মৃত্যুঞ্জয়ের উপযুক্ত সেবায় হবে আশুমুক্ত।
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে ॥"

এই দুইটি কথা দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা এই অনুমিত হইতে পারে যে, তিনি সাযুজ্য অথবা নির্ব্বাণ এই দুই প্রকার মুক্তির একতর অথবা উভয়ই মানিতেন। কিন্তু আবার তাঁহার অন্য এক সঙ্গীতে দেখিতে পাই "নির্ব্বাণে কি আছে ফল" এবং আর এক স্থলে "সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি ফল বল না ?" ইহা দ্বারা বুঝা যায় তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি মানিতেন না ; কিন্তু সাযুজ্য মানিতেন কি না—স্পষ্ট বুঝা গেল না। পুনশ্চ এক স্থানে বলিয়াছেন "ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি"। ইহা দ্বারা আমরা এই বুঝি যে তিনি সালোক্য অথবা সামীপ্য মুক্তিই মানিতেন ও অন্তরের সহিত আকাঙ্ক্ষা করিতেন, এবং তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালীন সঙ্গীত চতুষ্টয়ের অন্যতরে বলিয়াছেন "যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে।" এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে তিনি বাস্তবিকই নির্ব্বাণ মুক্তি মানিতেন। মুক্তি সম্বন্ধে প্রসাদের এই মত বৈষম্যে তাঁহার সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রতিভাত হইতেছে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তদীয় উক্তিনিচয়ের মধ্যে বস্তুগত্যা কোন বিরোধ ভাব নাই। পূর্ব্বে নির্ব্বাণ মুক্তিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে নাই, অথবা তিনি তাহা চাহিতেন না। কিন্তু অন্তিমকালে—মৃত্যুর প্রাক্কালে—সেই বিশ্বাসই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

দ্বিতীয়তঃ। জীবনাখ্যায়ক লিখিয়াছেন যে রামপ্রসাদ "তীর্থ পর্য্যটন অনাবশ্যক মনে করিতেন।" আমাদের মতে তাঁহার এই কথাও ঠিক নয়। আমরা এই কথা অবশ্য স্বীকার করি যে রামপ্রসাদের কোন কোন সঙ্গীত দ্বারা দেখা যায় যে, তিনি কাশী এবং অন্যান্য তীর্থে যাওয়া অনাবশ্যক মনে করিতেন, এবং ভালবাসিতেন না। কিন্তু আবার কোন কোন সঙ্গীত দ্বারা (১) দেখা যায়, তিনি কাশী না যাইতে পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার মৃত দেহ গঙ্গাজলে পরিত্যক্ত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন (২)। কোন কোন সঙ্গীতে তিনি কাশীকে মোক্ষধাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার মন যে কাশীর দিকে ধায়, তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন (৩)। আবার কোন কোন সঙ্গীত দ্বারা কাশী যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, (৪) এবং বলিয়াছেন "বারাণসীর জলে স্থলে মোলে পরে মোক্ষ পাব" এবং ত্রিবেণীর ঘাটে বসিলে অন্তর শীতল হইবে।

---

(১) "এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী।" ইত্যাদি বলিয়া দুঃখ প্রকাশ। "আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম বারাণসী।" ইত্যাদি বলিয়া খেদ।

(২) "যেন অন্তিমকালে, দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে।"
"তনু অন্তকালে আমায় টেনে ফেলো গঙ্গাজলে ॥"

(৩) "কাশী মোক্ষধাম"। "তবু মন ধায় কাশী রব কেমনে।"

(৪) "মন চলরে বারাণসী"। "আমি কবে কাশীবাসী হব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে মোলে পরে মোক্ষ পাব।"

এখন দেখা যাইতেছে রামপ্রসাদ নিজেই তীর্থ পর্য্যটন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মত কি একে অন্যের বিরোধী? আমাদের বিবেচনায় তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ ভাব নাই। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন মতে তাঁহার সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রতিফলিত হইতেছে; অথবা প্রকৃত সিদ্ধ হিন্দু ভক্ত ও বিশ্বাসীর পক্ষে তীর্থ পর্য্যটন করা না করা উভয়ই সমান, কিন্তু করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই, কারণ তীর্থে সাধু সঙ্গ হয়, এবং সাধুসঙ্গে আধ্যাত্মিকতার প্রভূত উন্নতি সাধন হয় (৫)। প্রসাদ বাস্তবিক তীর্থের মাহাত্ম্য বিশ্বাস করিতেন, ইহা তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্‌কালীন কার্য্য দ্বারাই সম্যক্ উপলব্ধি হয়। যিনি মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কালী পূজা করতঃ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সৎজ্ঞানে অর্দ্ধ নাভি গঙ্গাজলে নামিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি যে তীর্থের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন না—এ কথা কে বলিবে?

তৃতীয়তঃ। রামপ্রসাদ "পৌত্তলিক" ছিলেন, "মৃত্তিকা নির্ম্মিত কালীর সাধনা করিতেন," এই কথা জীবনাখ্যায়ক অস্বীকার করিয়াছেন, অথচ তিনিই অন্যত্র লিখিয়াছেন "রামপ্রসাদ পূর্ব্বেই আপনার মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি কালীপূজা করেন, পর দিন কালী বিসর্জ্জনের সময় সকলের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন"। এই কথা ঠিক যে প্রসাদের শক্তি মৃৎ-মূর্ত্তিতে আবদ্ধ নহেন। মৃৎপ্রতিমা প্রসাদের উপাস্যা নহে। তাঁহার উপস্যা তদধিষ্ঠাত্রী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতা। সেই দেবতার সীমা নাই; তিনি নিরাকারা, সর্ব্বব্যাপিনী। কিন্তু তবুও দেখা যাইতেছে প্রসাদ মনুষ্যনির্ম্মিত মৃৎমূর্ত্তি চিহ্ন ঈশ্বরারাধনায় ব্যবহার করিতেন। ইহা কি পৌত্তলিকতা নয়?

চতুর্থতঃ। জীবনাখ্যায়ক বলেন প্রসাদ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি "চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি" এই কথা দ্বারা প্রসাদের দ্বৈত বাদই প্রতিপন্ন হয়, কারণ তাহাতে স্বতন্ত্র জীবাত্মার স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু আবার দেখিতেছি তিনি পাপ পুণ্য মানিতেন না—"ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য মান্য করে সব খোয়ালে"—সুতরাং তিনি অদ্বৈতবাদী, (৬) কারণ পাপপুণ্য না মানার মধ্যে "তত্ত্বমসি" ভাব নিহিত আছে। তবে তিনি দ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী? আমাদের বোধ হয় দ্বৈত এবং অদ্বৈত এই দুয়ের মিশ্রিত ভাবটিই তাঁহার উপলব্ধি হয়। এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার মত বৈষম্য দ্বারা সুধু ইহাই বুঝা যায়। ভগবান শিব এই মিশ্রিত ভাবটিকেই যথার্থ তত্ত্ব বলিয়াছেন—"...তত্ত্বং... দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতম্"——কুলার্ণবতন্ত্রম্, ৫, ১, ১১০। দক্ষ প্রজাপতিও এইরূপই বলিয়াছেন :—

দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈবচ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্॥"

পঞ্চমতঃ। জীবনাখ্যায়ক এক স্থলে লিখিয়াছেন "প্রত্যেক ধার্ম্মিকেরই প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে; রামপ্রসাদেরও তাহাই হইয়াছিল, যথা;—"জেনেছি শ্রীনাথের বাণী" "পাগল বেটার কথায় মজে" ইত্যাদি। রামপ্রসাদ প্রত্যাদেশ পাইতেন, এই কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু "জেনেছি শ্রীনাথের বাণী" প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার প্রত্যাদেশ পাওয়া কিরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রসাদ-

---

(৫) "ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ"—বনপর্ব্বান, ১, ২৫। রামপ্রসাদও সাধুসঙ্গের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—"আমি সাধুসঙ্গে নানা রঙ্গে দূর করিব মনের ব্যথা"।

(৬) "মা বিরাজে ঘরে ঘরে। জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে॥" এই সঙ্গীত দ্বারাও প্রসাদের অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয়।

প্রসঙ্গকার স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র ঘোষেরও এই ভুল হইয়াছিল, বর্ত্তমান জীবনাখ্যায়কেরও তাহা ঘটিয়াছে। রামপ্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি কালীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইতেন, এইরূপ প্রমাণ করিতে পারিলে সঙ্গত এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত বটে, কিন্তু কালীভক্ত প্রসাদ শিবের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইতেন, এই কথাটা আমাদের নিকট বড় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। "শ্রীনাথের বাণী" অর্থাৎ শিববাক্য অর্থে তন্ত্রকে বুঝায়; সুতরাং উদ্ধৃত পদদ্বয় দ্বারা প্রসাদের প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি না বুঝিয়া তাঁহার তন্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসই বুঝিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ। জীবনাখ্যায়ক প্রবন্ধের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন "দ্বিজ শব্দ পরবর্ত্তী যোজনা মাত্র। রামপ্রসাদের অনেক গান এইরূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে।" "দ্বিজশব্দ পরবর্ত্তী যোজনা" এই কথা বলার কোন প্রমাণ নাই। আর দ্বিজ শব্দ পরবর্ত্তী যোজনা হইলেও তাহা দ্বারা প্রসাদের সঙ্গীত বিকৃত হইল কিরূপে—তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই দ্বিজ শব্দ লইয়া অনেক দিন হইতেই মত ভেদ চলিয়াছে। কেহ বলেন রামপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, সুতরাং উপনয়নে তাঁহার অধিকার ছিল, সেই জন্য তিনি নিজকে দ্বিজ বলিতেন। আমাদের মতে দ্বিজ শব্দের বিশেষ সার্থকতা আছে। কালীসিদ্ধির অর্থাৎ ব্রহ্মলাভের পূর্ব্বে রামপ্রসাদ দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজাত্মা হয়েন (৭)। এই জন্য তিনি স্বয়ংই আত্মপ্রত্যয় হইতে ভণিতিতে দ্বিজ শব্দ ব্যবহার করিতেন, অথবা ঐ অর্থে অন্য লোকে তাঁহার নামের পূর্ব্বে দ্বিজ শব্দ যোজনা করিয়া দিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে ১২৯২ সনের ফাল্গুন মাসের নবজীবনে রামপ্রসাদের সাধনা, সাধন প্রণালী, এবং ধর্ম্মমতের সমালোচনা করিয়া আমি যে একটি প্রবন্ধ লিখি, এই প্রস্তাবে সেই প্রবন্ধ হইতে অনেক কথা গ্রহণ করিয়াছি; সেই জন্য পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন। যদি কোন পাঠক মহাশয়ের রামপ্রসাদের ধর্ম্মজীবনের বিস্তৃত সমালোচনা পাঠ করিবার ইচ্ছা হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া উক্ত নবজীবন পাঠ করিলে বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়। *

---

(৭) "ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন সত্যেন চ দমেন চ।
ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি যৎপরং দ্বিজসত্তমঃ॥"
—বনপর্ব্বণি, ২০৯, ১৩৮৯৫।

পুনশ্চ—Verily, Verily, I say unto thee, Except a man be born again, he can not see the kingdom of God——John III. 3.

* সকল কথার কিম্বা প্রতিবাদের উত্তর দিতে হইবে এরূপ কোন একটা বাঁধা নিয়ম নাই। আমরাও এই প্রবন্ধের উত্তর দিব না। তবে একটী কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, মতভেদ এ জগতে পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে। অদ্বৈতবাদ পরিপোষক জগৎপূজ্যগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেও দ্বৈতবাদীগণ তাহাদের পক্ষে টানিয়া লইয়াছিলেন। ভক্তি রত্নাকর শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে অদ্বৈতবাদ পরিপোষণোপযোগী প্রমাণ সংগ্রহকরা যাইতে পারে। সেইরূপ রামপ্রসাদের সঙ্গীত ভাণ্ডার হইতেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্ব স্ব মত পোষণোপযোগী প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র সিংহ।
সাধক সঙ্গীত সম্পাদক ও প্রকাশক।

মূল্য প্রাপ্তি।

নাম	স্থান	মূল্য
বাবু প্রসাদ দাস মল্লিক	যোড়াসাঁকো	৩৲
ডাব্লিউ, সী, বনার্জ্জি এস্কয়ার	হাইকোর্ট	৩৲
বাবু হীরালাল রক্ষিত	গোয়াবাগান	৩৲
„ প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বেরিলী	৩।৵০
„ কামিনীকুমার সেনগুপ্ত	বরিশাল	৪।৵০
„ অক্ষয়কুমার মিত্র	কুচবিহার	৩।৵০
„ দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ	মাণিকতলাষ্ট্রীট	৩৲
„ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	কলিকাতা	২৲
„ গোপালচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	১৲
„ প্রাণনাথ দত্ত চৌধুরী	ঐ	৩৲
„ গোপালকৃষ্ণ কর	ঐ	২৲
„ কৈলাসচন্দ্র মুখো:	উত্তরপাড়া	৩।৵০
„ বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	হাওড়া	॥০
„ শ্রীরঙ্গ বিহারী	মজঃফরপুর	৩।৵০
„ জ্ঞানচন্দ্র রায়	গুলগঞ্জ	৩।৵০
„ মধুসূদন বন্দ্যো:	গোপালপুর	৩।৵০
„ মন্মথনাথ মুখো:	বাঁশবাড়ীয়া	৩।৵০
„ বলাইচাঁদ পাইন	যোড়াসাঁকো	৩৲
এম্, গুপ্ত এস্কয়ার	মেছুবাজারষ্ট্রীট	৩৲
বাবু তারিণীচরণ ঘোষ	কাটোয়ার	৩।৵০
মহারাজা গিরিজানাথ রায়	বা: দিনা:	৩।৵০
বাবু ব্রজলাল রায়	হরিণা ফুলবাড়ী	২৲
বাদ্‌শা রিডিংরুম সম্পাদক	টাঙ্গাইল	১৷৵০
শ্রীযুক্ত ধেনকেনালের রাজা	কটক	১০৲
পি, সী, সেন এস্কয়ার	মুলমিন	৩।৵০
বাবু ভুবনমোহন সেন	আমিনপুর	৪৲
„ ক্ষীরোদবিহারী সেন রায়	বেনা:	৩।৵০
„ কৃষ্ণচন্দ্র গুহ	টাঙ্গাইল	৩।৵০
„ দুর্গাতারণ চক্রবর্ত্তী	সেয়াখালা	২।৵০
„ জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস	জয়মন্তপ	৩৲
„ রজনীকৃষ্ণ বসু	ভাদ্রড়া	৩।৵০
„ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	পাবনা	৩।৵০
„ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যো:	নূতন বাজার	৩৲
„ পঞ্চানন বন্দ্যোধ্যায়	ব্রহ্মপুর	৪৵০
„ চন্দ্রনাথ দাস	হবিগঞ্জ	৩।৵০
„ সতীশচন্দ্র বন্দ্যো:	সুলিপুকুর	১।৵০
„ মুন্সী রকুবউদ্দিন	কেমাকষ্ট্রীট	২॥০
„ মতিলাল কর	এলাহাবাদ	২।৵০

নাম	স্থান	মূল্য
শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী বসু	মজুঃ দাইন্যা	১৲
বাবু রাজকুমার রায়	জামালপুর	৩।৵০
„ সূর্য্যকুমার দাস	দক্ষিণ ব্যাঁটরা	৩।৵০
„ মাধবচন্দ্র রায়	জলপাইগুড়ি	৩।৵০
শ্রীমতী মায়াসুন্দরী দেবী	সিমলা	৩৲
বাবু নর[illegible] ভট্টাচার্য্য	বেচুচাটুর্য্যেরষ্ট্রীট	১॥০
বাবু তারকনাথ ভট্টাচার্য্য	হরিপুর	৩।৵০
„ কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	ঢাকা	৩।৵০
„ নবকিশোর দে	ইটালি	৩৲
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৲
„ গিরীশচন্দ্র বন্দ্যো:	ভবানীপুর	৸০
„ আশুতোষ চৌধুরী	শিবপুর	২।০
„ ক্ষেত্রমোহন ধর	সিমলা	১॥০
শ্রীমতী কৃষ্ণমানিনী দেবী	শ্যামবাজার	৩৲
বাবু তারকনাথ ঘোষ	যোড়াসাঁকো	২৲
„ সত্যেন্দ্রনাথ পাইন	জানবাজার	৩৲
„ নীলাম্বর দাস	ঢাকা	৵০
„ রজনীকান্ত চট্টো:	কেমাকষ্ট্রীট	১৲
„ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপা:	ভবানীপুর	২৲
„ প্রিয়নাথ মিত্র	ডফষ্ট্রীট	৩৲
„ রাধিকামোহন কর্ম্ম:	বোয়ালিয়া	৩।৵০
„ রাখালদাস হালদার	রাঁচি	৩।৵০
„ কালীপদ রায়	তালতলা	২৲
„ রাখালদাস মজুমদার	গড়পার	৩।৵০
„ রামগোপাল বিদ্যান্ত	লক্ষ্ণৌ	৩।৵০
„ রামচন্দ্র মজুমদার	ঢাকা	৩।৵০
মিসেস জি, রায়	এলাহবাদ	৩।৵০
বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	সিমলা	১৲
„ গুরুচরণ সেন	তিল্লি	৪৲
„ রামকালী চৌধুরী	বেনারস	৩।৵০
„ নরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	কলিকাতা	২৲
„ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	সিমলা	৩৲
শ্রীমতী কুমুদিনী কাস্তগিরি	কলিকাতা	১৲
বাবু পশুপতিনাথ বসু	বাগবাজার	৩৲
কুমার রমণীকান্ত রায়	ঘোড়ামারা	৩।৵০
বাবু শ্যামলাল পাল	মৃজাপুর	১॥০
„ প্যারীমোহন রায়	বাদুড়বাগান	৩৲
„ জানকীনাথ রায়	শোভাবাজারষ্ট্রীট	৩৲

বাবু কেদারনাথ বসু — হাতিবাগান — ৩৲
,, কুঞ্জবিহারী দত্ত — বিড়নষ্ট্রীট — ২৲
,, নরেন্দ্রনাথ দে — বহুবাজার — ২৲
,, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোঃ — ভবানীপুর — ১৲
শ্রীমতী নলিনীসুন্দরী দেবী — ঐ — ১৷৷০
বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র — শ্যামপুকুর — ৩৲
,, মহেন্দ্রনাথ রায় — রামকৃষ্ণপুর — ৩৲
,, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — ঐ — ৩৲
,, গোপালদাস সেন — চোরবাগান — ৩৲
,, ক্ষেত্রমোহন মুখোঃ — চাঁপাতলা — ১৲
,, নন্দলাল দে — কলিকাতা — ২৲
,, যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী — গাঙ্গাধরদী — ২৲
,, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — নিমতলা — ৩৲
,, নগেন্দ্রনাথ দাস — লনসিং — ৩৷৶০
,, কেদারনাথ মজুমঃ — শিকদারঃ গলি — ৩৲
কুমার দেবীপ্রসাদ রায় — আমপোস্তা — ৩৲
বাবু কালীচরণ সিংহ — খিদিরপুর — ৩৷৶০
,, পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী — রাণাঘাট — ৩৷৶০
,, রম্যাকৃষ্ণ সরকার — ধোপাডাঙ্গা — ৩৷৶০
কুমার নীলকৃষ্ণ দেববাহাঃ — শোভাবাজার — ৩৲
বাবু বেণীমাধব সেন — তুলাপটী — ৩৲
,, কুঞ্জবিহারী বসু — গ্রেষ্ট্রীট — ৩৲
,, রাজকুমার মল্লিক — যোড়াসাঁকো — ১৲
রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় — জয়দেবপুর — ৩৷৶০
বাবু লালবিহারী দে — ভাগলপুর — ৩৷৶০
,, হেমচন্দ্র ঘোষ — বাঙ্গালব্যাঙ্ক — ১৲
,, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় — বাগবাজার — ৩৲
,, সারদাকান্ত মিত্র — শ্যামবাজার — ৩৲
,, রসিকলাল মিত্র — শোভাবাজার — ৩৲
,, ভুবনমোহন রায় — লক্ষ্ণৌ — ৫৲
,, হরকালী ঘোষ — বিডনষ্ট্রীট — ৩৲
,, অম্বিকাচরণ মুখোপাঃ — শ্যামপুকুর — ১৷৷০
,, রাজকুমার সেন — শিবপুর — ৩৷৶০
,, নৃসিংহচন্দ্র মিত্র — কলিকাতা — ১৲
,, গোষ্ঠবিহারী দাস — হাইকোর্ট — ২৲
,, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র — জয়দেবপুর — ২৲
কুমার গিরীন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাঃ — শোভাবাঃ — ৩৲

বাবু রাধিকাপ্রসাদ সেন — পুটিয়া — ১৷৶০
শ্রীমতী সৌদামিনী মজুমদার — পাবনা — ৫৷৶০
বাবু জগৎদুর্ল্লভ মজুমদার — ফরিদপুর — ৩৷৶০
শ্রীমতী মনোমোহিনী কর — আহাম্মদপুর — ৩৷৶০
বাবু শশীভূষণ দত্ত — শ্রীহট্ট — ৩৷৶০
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী বসু — খিদিরপুর — ১৷৶০
বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় — মাগুরা — ৫৲
,, শরচ্চন্দ্র ধর — সিলং — ১৷৶০
,, গণেশচন্দ্র মিত্র — আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট — ৩৲
,, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর — যোড়াসাঁকো — ৩৲
,, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত — নসাপুর — ৩৷৶০
,, কেদারনাথ মিত্র — নন্দনবাগান — ৩৲
,, অঘোরনাথ দত্ত — শ্যামপুকুর — ১৲
,, নীলকমল বসাক — চড়কডাঙ্গা — ১৲
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — দরজিপাড়া — ৩৲
,, মহেশচন্দ্র চৌধুরী — ভবানীপুর — ৩৲
,, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র — ঐ — ৩৲
,, কুলদাকিঙ্কর রায় — ঐ — ১৷৷০
ডাক্তার রাখাল দাস ঘোষ — বহুবাজার — ১৲
রাজা সচ্চিদানন্দ বাহুবলেন্দ্র — ময়নাগড় — ১০৲
বাবু শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস — কুমিল্লা — ৩৷৶০
মহারাজা সূর্য্যকুমার রায় — লক্ষ্মীকোল — ৬৸০
মিসেস এম্ এন্ ঘোষ — শ্রীহট্ট — ৩৷৶০
বাবু ভবানীচরণ দত্ত — হাইকোর্ট — ৩৲
,, রামধন মুখোপাধ্যায় — গোরখপুর — ৩৷৶০
ডাক্তার বিহারীলাল ঘোষ — বোরলা — ১৷৶০
বাবু গোকুলনাথ চট্টোপাঃ — যোড়াসাঁকো — ৩৲
,, হরকুমার সরকার — বোয়ালিয়া — ৩৷৶০
,, রামানন্দ পাল — দরজিপাড়া — ২৲
,, আশুতোষ মুখোপাঃ — জুনিয়াদহ — ৩৷৶০
,, বামাপদ বসু — রামকৃষ্ণপুর — ৩৲
শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী দাসী — মৃজাপুর — ১৲
বাবু শ্রীগোপাল মল্লিক — পটলডাঙ্গা — ৩৲
,, সুরেশচন্দ্র ঘোষ — ভবানীপুর — ৩৲
,, ভুবনমোহন চট্টোপাঃ — হাটখোলা — ৩৲
,, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাঃ — চাঁপাতলা — ১৲
,, প্রবোধচন্দ্র মল্লিক — ওয়েলিংটনষ্ট্রীট — ৫৲

ক্রমশঃ।

পঞ্জাব ভ্রমণ।

৫

পেশোয়ার।

আটক হইতে আমরা রাত একটা কি দেড়টার সময় ঘোড়ার গাড়ীতে পেশোয়ার রওয়ানা হই। আটক সম্বন্ধে যা কিছু বলিবার, আমি মাঘ মাসের ভারতীতে বলিয়াছি। রাত একটার সময় কি করিয়া আমরা আটকের দুর্গাদি দেখিয়াছিলাম, ভাবিয়া বোধ হয় পাঠক মহাশয় কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া থাকিবেন। আসল কথা আটক আমরা সে রাত্রে দেখি নাই। পেশোয়ার হইতে ফিরিবার সময় দিনের বেলায় দেখিয়াছিলাম। আটকের ১৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে সিন্ধুর দক্ষিণ তীরে ওহিন্দ্ বা হুন্দ্ নামে একটি গ্রাম আছে। পণ্ডিতেরা বলেন এই স্থানেই এক সময়ে সেকেন্দর সাহা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত এম্বোলীমা নগরী বিরাজ করিত। যখন গজনীর মামুদ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে কাবুলের ছচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজাদিগকে তাড়াইয়া দেন, তখন তাঁহারা এই এম্বোলীমায় আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। মোগলদিগের সময়েও এম্বোলীমা অতি সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। মোগলেরা এম্বোলীমাকে করাজঙ্গ নাম দেয়। ওহিন্দের ৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে লাহোর বা সালাতুরার ভগ্নাবশেষ। পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর আর এ লাহোর কিন্তু এক নয়। নওগ্রাম রাণীগাট্ নামে একটি স্থান ওহিন্দের ১৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে। এখানে একটা প্রকাণ্ড দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। গ্রীকেরা ইহাকেই এয়োরনস্ দুর্গ নামে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এয়োর্নস্ দুর্গ এক হাজার ফুট্ উচ্চ একটা পাহাড়-শিরে নির্ম্মিত। পাহাড়ের গায়ে খোদা একটি বই রাস্তা দুর্গে উঠিবার নাই। যখন সেকেন্দর সাহা নিকটস্থ বাজার বা বাজারীয়া নগর আক্রমণ করেন, তখন গভীর রাত্রে বাজারীয়ার স্ত্রী পুরুষ পলাইয়া যাইয়া এয়োর্নস্ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাজারীয়া এখন একটি বড় রকমের গ্রাম মাত্র।

আটকে সিন্ধু পার হইলেই তীরদেশে খয়রাবাদ গ্রাম। খয়রাবাদের নিকটে পাহাড়ের উপরে রাজা হোদীর দুর্গ। এখান হইতে পেশোয়ারের রাস্তা বহু দূর পর্য্যন্ত কাবুল নদীর তীরে তীরে গিয়াছে। কাবুল নদীরই তীরে কাবুল নগর স্থিত—পাঠক অবগত আছেন। কাবুলেরও উপর হইতে এই কাবুল নদী আসিয়া খয়রাবাদে আটকের সম্মুখে সিন্ধুতে পড়িয়াছে। কাবুল নদীর দক্ষিণ তীরে সরাই নামে একটি আফগান সহর আছে। ইহাকে অকোরাও কহে। খট্টক জাতীয় মালিক অকোরের নাম হইতে ইহার নাম অকোর হইয়াছে। এই বংশেই খট্টক বংশীয় বিখ্যাত যোদ্ধা ও কবি

খুশ্‌শল খাঁ জন্ম গ্রহণ করেন। অকোরার নিকটে বুরি গ্রামে তাঁহার সমাধি মন্দির। অকোরায় একটি দুর্গ আছে, তাহা সাদা পাথরে কাঁদায় গাঁথা। পেশোয়ার পথে আটক হইতে ১১ মাইল আগে নৌসারা নামে একটি গ্রাম বা ক্ষুদ্র সহর। এখানে কতকগুলি সৈন্য থাকে—সেনানিবেশ আছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ এখানে আফগানদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

বেলা ৯½ টার সময় আমরা পেশোয়ারে পৌঁছিলাম। পেশোয়ার প্রদেশের হিন্দু নাম গান্ধার। পেশোয়ার খাইবার গজের মুখে। খাইবার গজ ভারতের শত্রু প্রবেশ দ্বার। যে কোন লোকস্রোত অন্নের আশায়, যে কোন দস্যুরাজ অর্থ বা রাজ্যলোভে ভারতবর্ষে আসিয়াছে, সেই খাইবার হইয়া পেশোয়ারে প্রবেশ করিয়াছে। খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের সেনা খাইবারের সম্মুখে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে যে আর্য্য জাতিরাই পেশোয়ার প্রদেশের অধিবাসী ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। গ্রীক ইতিহাসলেখকেরা পুষ্কলাবত নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সোয়াট্ নদীর বাম তীরে অবস্থিত হস্‌বত নগরই নাকি সে প্রাচীন পুষ্কলাবত। হস্বৎ নগরের চতুর্দ্দিকে ১৫ মাইল জুড়িয়া প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষ। পেশোয়ার বহু শতাব্দী লাহোরের হিন্দু রাজাদিগের অধিকারে ছিল। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে আফগানেরা আসিয়া পেশোয়ারকে উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করে। যখন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাঠান সাম্রাজ্য দিল্লীতে স্থাপিত হয়, তখন পেশোয়ারও সেই সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। গজনীর মামুদ যখন একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন লাহোরের রাজা অনঙ্গপাল পেশোয়ার ক্ষেত্রে মামুদকে যুদ্ধ দেন। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত মামুদ ও অনঙ্গপালের সৈন্য সম্মুখীন হইয়া থাকে। তার পর অনঙ্গপালের এক দল ঘক্কর জাতীয় সৈন্য মুসলমান সেনা আক্রমণ করে। যুদ্ধে অনঙ্গপালেরই জয় হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু রাজাকে দুর্ভাগ্য চিরকালই যুদ্ধক্ষেত্রে অনুসরণ করে। অনঙ্গপালের হাতী ভয় পাইয়া ছুটিল—সৈন্যেরা ভয় পাইল, অমঙ্গল গণিল—মুসলমানেরা যুদ্ধ জিতিল—হিন্দুরা বিশ হাজার যুদ্ধে মরিল। যুদ্ধের পর সন্ধি পত্র হইল। অনঙ্গপাল যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, সে সন্ধি পত্র মত সব চলিল। তাঁহার মৃত্যুর পর পঞ্জাব মামুদের হইল। মামুদ যতবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, পেশোয়ারই প্রত্যেকবার তাঁহার ভারতাক্রমণের সেনানিবেশ ছিল। মুসলমান শাসনে পেশোয়ারের সে শ্রী রহিল না। জেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি দস্যুরাজেরা অসভ্য বর্ব্বর জাতীয় লোকে পেশোয়ার প্রদেশ পূর্ণ করে। পেশোয়ার ক্রমে অনুর্ব্বর ও জন শূন্য হইতে লাগিল। অসভ্য পাঠান যাহারা পেশোয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা পরের অধীন থাকা মোটেই পসন্দ করিত না। মোগল সম্রাটদের তাহারা গ্রাহ্য করিত না। ঔরঙ্গজীব আপন পুত্র সুলতানকে পেশোয়ার জয় করিবার জন্য সসৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরাজিত

হইয়া ফিরিয়া যান। এই যুদ্ধের সময়েই সেই বিখ্যাত পাঠান কবি কুশ্‌শল খাঁ যাঁহার নাম আমি উল্লেখ করিয়াছি, আগুন ঢালিয়া, জাতীয় সঙ্গীত লিখিয়া, গ্রামে গ্রামে গাইয়া, পেশোয়ারী পাঠানদিগকে ঔরঙ্গজীবের সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমাদিগের কবিরা কি কখনো তেমন জ্বলন্ত কবিতা লিখিতে পারিবেন বা তেমন জ্বলন্ত গান গাইতে পারিবেন? কুশ্‌শল খাঁ কেবল কবি ছিলেন না—কেবল তান ধরিয়াই তাঁহার সুখ হইত না। ইয়োরোপে, রাজস্থানে কবি (ভাট) জন্মিয়াছেন যাঁহারা যুদ্ধ করিতেন, গাইতে গাইতে যুদ্ধ করিতেন, যুদ্ধ করিতে করিতে গাইতেন। কুশ্‌শল খাঁও সেই শ্রেণীর কবি। তিনি বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। অকোরার নিকটে মোগল সৈন্যদিগকে এক মহা যুদ্ধে পরাজিত করেন। কুশ্‌শল খাঁ একখানি ইতিহাসও লিখিয়া গিয়াছেন। এ প্রদেশে সমস্ত আফগানিস্থানে কুশ্‌শল খাঁর গান না গায় এমন স্ত্রী পুরুষ নাই। পেশোয়ারে জন্মিলেও আফগানিস্থানের কুশ্‌শল খাঁই জাতীয় কবি। নাদীর সাহের আক্রমণের সময়ে নাসির খাঁ নামে একজন মোগল পেশোয়ারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দিল্লী হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া নাসির খাঁ নাদীর সাহের হাতে পেশোয়ার সমর্পণ করেন। এখানে এ কথাটা বলা যাইতে পারে যে নাদীর সার সেনা খাইবার পথে ভারতে প্রবেশ করে নাই। খাইবারের আফ্রিদী ও সিনোয়ারী নামক পার্ব্বত্য জাতিরা নাদীর সাহাকে খাইবারে প্রবেশ করিতে দেয় না। নাদীর তেরা প্রদেশ দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। নাদীর সিন্ধুর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভূত করেন, আর নাসির খাঁকে কাবুল ও পেশোয়ারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। নাদীরের মৃত্যুর পরে দুরাণী বংশীয় আমেদ সাহা কাবুল হইতে নাসির খাঁকে তাড়ান, হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাব ও কাশ্মীর অধিকার করেন। এই সময়ে পেশোয়ার ধনে ও ঐশ্বর্য্যে খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গ ১৭৭৩ হইতে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পেশোয়ারকেই আপন বাসস্থান করিয়াছিলেন। রণজিৎসিংহ নৌশাহরাতে কাবুলের আমীর নাজিম খাঁকে পরাজিত করিয়া পেশোয়ার আপন পঞ্জাব রাজ্যে যুক্ত করেন। বারকজাই সর্দ্দারেরা পেশোয়ার শাসন করিত। বৎসরে একবার রাজস্ব আদায় করিবার জন্য লাহোর হইতে পেশোয়ারে এক শিখ সেনা প্রেরিত হইত। সে সেনা এমনি অত্যাচার করিত যে, ঘর দরজা ছাড়িয়া লোকে বনে জঙ্গলে যাইয়া লুকাইত। রণজিৎ সিংহ পেশোয়ারের রাজ প্রাসাদ বালা হিসার ধ্বংস করেন। ১৮৩৮ হইতে ১৮৪২ সাল পর্য্যন্ত জেনেরেল এভিটেবিল শিখদিগের পেশোয়ার-গভর্ণর ছিলেন। ১৮৪৮ সালে পেশোয়ার রণজিৎ সিংহের অন্যান্য অংশের সহিত ইংরেজ রাজ্য ভুক্ত হয়।

পেশোয়ার খাইবার মুখ হইতে ১৩ মাইল। পেশোয়ারের লোক সংখ্যা ৬০ হাজার—অধিকাংশ মুসলমান, অবশিষ্ট শিখ আর হিন্দু। পেশোয়ার মৃত্তিকা প্রাচীরে বেষ্টিত—তাহাতে ১৬টা প্রবেশ দ্বার। উত্তরদিকে প্রাচীর বাহিরে বালা হিসার দুর্গ। ইহার প্রাচীর

৬০ হাত উচ্চ—সূর্য্যতাপে-শুষ্ক-ইটে নির্ম্মিত। এই বালা হিসারে সা সুজা মণ্ট্ ষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিনষ্টোনের মিশন্ অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। শিখরা বালা হিসারকে দুর্গরূপে ব্যবহার করিত। এখন এক দল দেশীয় ও এক দল বৈলাতিক পদাতিক সৈন্য এখানে আছে। বালা হিসার এখন পেশোয়ারের অস্ত্রাগার। পেশোয়ারের বাড়ী ঘর সাধারণতঃ মাটীর অথবা ছোট ছোট ইটের তৈয়ারি। ইট এদেশে কাঠের ফ্রেম তৈয়ার করিয়া তাহার মধ্যে পোরে। সহরের মধ্যস্থলে গোরক্ষত্রী নামে একটা স্থান। গোরক্ষত্রী মানে—ক্ষত্রীয়ের গোর স্থান। কখনো বোধ হয় এখানে অনেক ক্ষত্রীয় বধ হইয়া থাকিবে। বাবর তাঁহার দৈনিক বহিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে গোরক্ষত্রীতে অনেক হিন্দু যোগী আসিত। এখন গোরক্ষত্রীতে ইংরেজের তহসিল আফিস। পেশোয়ারের ছাউনি বা সেনানিবেশ খুব বিস্তৃত। এখানে অনেক সৈন্য থাকে। এখানে আলীমর্দ্দনের বাগ, উজীরী বাগ, আর সাহী বাগ নামে তিনটি উদ্যান আছে। পেশোয়ারে দেখিবার তেমন কিছুই নাই। তবে নগরটি বড় সুন্দর সংস্থিত। চতুর্দ্দিকে আড়ু ও আঙ্গুর বন, আর সুফেদ কোর সাদা তুষারাবৃত শৃঙ্গ শ্রেণী সর্ব্বদা দৃশ্যমান। মধ্য আসিয়ার সহিত পেশোয়ারের বাণিজ্য অনেক। কাঁচা রেশম ও শুষ্ক ও তাজা ফল পেশোয়ার আমদানি করে, আর ইংরেজি কাপড়, রেশম, নীল, চিনি, মসলা মধ্য-আসিয়ায় রপ্তানি করে। বোখারা হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য তার আসে, সে তার কাশ্মীরে যায়। পেশোয়ার লুঙ্গী (পাঠানী বা পঞ্জাবী পাগড়ী বাঁধিবার কাপড়), নস্য আর মৃৎবাসনের (Pottery) জন্য বিখ্যাত। রুশীয় ফর্ (Furs) আর কাবুলী চোগাও এখানে অনেক আমদানি ও বিক্রয় হয়। পেশোয়ার ভারতবাসীর দেখিবার উপযুক্ত স্থান। ভারতবর্ষে পেশোয়ারই একমাত্র বৈদেশিক নগর। পেশোয়ারে যেখানে যাও, পষ্টু শুনিবে—পাঠান ও মধ্যআসিয়ার লোক দেখিবে। পেশোয়ার দেখিলে আমরা অনেকটা আফগান বা মধ্য আসিয়িক নগরের মূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারি।

খাইবারের মুখে যমরূদ দুর্গ। গত আফগান যুদ্ধের পর হইতে এ দুর্গে কতকগুলি ব্রিটিশ সৈন্য আছে। একজন ইংরেজ পোলিটিকেল অফিসারও এখন এখানে থাকেন। শিখরা ১৮৩৭ সালে এই দুর্গ আফগানদিগের হাত হইতে কাড়িয়া লয়। মহাবীর হরি সিং এখানেই প্রাণ হারান। ইয়োরোপীয়দিগের জমরূদের পশ্চিমে যাইবার হুকুম নাই। দেশীয়েরা কাবুলে যাইতে চাহিলে জমরূদের পোলিটিকেল অফিসরের নিকট হইতে পাস লয়। পেশোয়ার ও জমরূদের মধ্য পথে হরি সিঙ্গ-কি-বুরুজ। গত আফগান যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত এই বুরুজই ইংরেজ রাজ্যের সীমা ছিল। ডিস্‌রেলী সাহেব তার পর খাইবার কাড়িয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক সীমা (Scientific frontier) নির্ণয় করেন। কাবুল নদীর বাম তীরে মিশনি, শুবকদার ও আবোজে কেল্লাতে ইংরেজ সৈন্য আছে।

আমরা সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া পেশোয়ার দেখিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের ডাক বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিলাম। ঘোরা ফেরার পর ডিনর কি অনির্ব্বচনীয় প্রিয় জিনিস সকলেই জানেন। আমরা উদরপূর্ত্তি করিয়া রাত ৯টার সময় আটক রওয়ানা হইলাম। রাত ৩টার সময় আসিয়া আমরা আটকের ডাক বাঙ্গলায় পৌঁছিলাম। একটা ঘরে রাত কাটাইলাম। পরদিন সকালে আটক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। আমাদের ডাক বাঙ্গলা একটি পাহাড়ের উপরে—যে দিকে যাও পাহাড় হইতে নাবিয়া যাইতে হয়। আটকের বর্ণনা উপরে করিয়াছি, এখানে আর পুনরুক্তি করিব না। ১২টার সময় রেলে উঠিলাম, সন্ধ্যার সময় রাউয়ালপিণ্ডি পৌঁছিলাম। আমাদের বন্ধুরা আসিয়া আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে দেখা করিলেন। থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু আমরা অনুরোধ রক্ষা করিলাম না। নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বরের মত রেলে বসিয়া দৌড়িয়া চলিলাম। পরদিন বেলা ১২টার সময় লাহোরে পৌঁছিলাম।

আগামী বারে মুলতান যাত্রা করিব।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

স্মৃতি।

১

সুখ স্বপ্ন সম ছিল এক কাল
ধরণী উজল করি—
মরমে মরমে ফুটিতরে ফুল
হৃদয়ে পড়িত ঝরি।

২

ভাবেতে জড়ায়ে আবেশ তনুটি
পরাণ রহিত ভোর—
কল্পনার কুঁড়ি উঠিতরে ফুটি
বাঁধিত ফুলের ডোর।

৩

সন্ধ্যা আসি ধীরে জাগাইত হৃদে
বিষাদ কাহিনী কত—
উষা আসি ধীরে ফুটাইত হৃদে
শুভ্র ফুল শত শত।

৪

তটিনীর সাথে মিলাইয়া হিয়া
নির্ঝর ছাড়িত তান—
প্রকৃতির কোলে রাখি শ্রান্ত কায়া
হৃদয় গাহিত গান।

৫

মেঘের গায়েতে আঁকিতাম ধীরে
সুখের মোহন ছবি—
আঁধার ফুটিয়ে দেখা দিত ধীরে
আশার উজল রবি।

৬

দুঃখে হেরিতাম সুখের আভাস
মরণে নূতন প্রাণ—
শ্মশানে বহিত ফুলের বাতাস
হৃদয়ে উঠিত গান।

৭

যাছিল সবই গিয়াছে চলিয়া
হৃদয় গাহেনা গীতি—
কবির হৃদয় অধীর করিয়া
ভাসিছে কেবল স্মৃতি।

৮

হৃদয়ের আশা প্রাণের তিয়াষা
সকলি ছায়ার কায়—
দুদণ্ডের তরে বাঁধি রাখি বাসা
কে কোথা মিলায়ে যায়।

৯

দুঃখেতে হয়রে সুখ অবসান
হরষেতে অশ্রু বারি—
থামিয়া পড়ে যে মরমের গান
ডুবে যায় হৃদি-তরি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিয়ার ও প্যারী।

(ফরাসিস উপন্যাস হইতে।)

১

আমাদের পল্লীর এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড প্যায়রা গাছ ছিল—বসন্তকালে তাহা ফুলে ফুলে ভরিয়া যাইত। গ্রামের অপর প্রান্তে আমাদের জমিদারের বাড়ী—প্যারী নামে তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল।

সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইল।

২

প্যারীর বয়স তখন ১৬ বৎসর। ষোড়শী বালার গালে কত গোলাপ ফুল ফুটিয়া থাকিত। সেই ফুটন্ত প্যায়রা গাছের তলায় আমাদের কত গল্প—কত হাস্য আমোদ কোর্টসিপ চলিত। আমি একদিন তাহাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"মেরি-প্যারি! কবে আমাকে বিবাহে বরণ কর্‌বি বল দেখি?"

৩

বালা হাসিতে পূর্ণ। তাহার কুন্তল বায়ুর সঙ্গে খেলিতেছে—বিম্বাধরের মধ্য দিয়া শুভ্র দন্ত শোভা পাইতেছে। বাহু-লতায় ডালের উপর ভর দিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল—"যদি তোমাকে যুদ্ধের জন্য মহারাজ তলব না করেন, তবে এই বৎসরের শেষেই আমাদের বিবাহ স্থির—কেমন?"

৪

তার পর যুদ্ধের সময় আসিল। লটরি করিয়া সেনা নির্ব্বাচিত হইবে। আমি মেরীর নিকট কত মানত করিলাম যেন এই যুদ্ধে আমার প্যারী হইতে বিযুক্ত না

হই। ধন্য মেরী রাণী—ধন্য! লটরিতে আমার নাম উঠিল না কিন্তু হরিষে বিষাদ উপস্থিত! শুনিলাম সৈন্য তালিকায় আমার বাল্য সখা লুই—তার নাম পড়িয়াছে।

দেখিলাম লুই বিষণ্ণ বদন। "মা! আমায় তোকে ছেড়ে যেতে হবে—তোর এই বৃদ্ধ বয়সে কে তোকে দেখবে" এই বলিয়া সখা বিলাপ করিতেছে।

৫

সখা শান্ত হও। আমার মা বাপ কেহই নাই। আমি তাহাকে বলিলাম "তোর হইয়া আমি যুদ্ধে যাব।" আমার কথায় তখন সে বিশ্বাসই করে না। তাহাই স্থির হইল। সেই প্যায়রা গাছ তলায় প্যারী অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার কাছ থেকে বিদায় লইল। আহা! তার চখের জল এর আগে কখন দেখি নাই—আমার মনে হল হাসির চেয়েও তার চখের জল মিষ্টি।

আমাকে বলিল—"সাধু পিয়ার, সাধু! যাও—আমি এতে তোমাকে বাধা দিতে চাই না কিন্তু শীঘ্র ফিরে এস—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।"

৬

সমর ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। চল—যুদ্ধে চল। আমরা W—পর্য্যন্ত গিয়া কুচ করিলাম। ঐ দেখ শত্রুদল দেখা যাইতেছে। শত শত কামান একমুখে শব্দ করিয়া উঠিল। ধূমে গগন আচ্ছন্ন—রক্তে ধরা প্লাবিত হইল।

আমি সভয়ে একবার পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম।

৭

পশ্চাতে ফ্রান্স—সেই আমাদের গ্রাম—সেই প্যায়রাগাছ, এখন তাহা ফলভারে অবনত। আমি চক্ষু মুদিত করিলাম। অন্তর্দৃষ্টিতে প্যারীর মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মহারাজের জয়! চল—সম্মুখে চল—ঘোরতর সম্মুখ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমার বীরত্ব দেখিয়া সম্রাট সন্তুষ্ট হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নাম কি? আমি বলিলাম মহারাজ! আমার নাম পিয়ার! পিয়ার, এই তোমাকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলাম।

৮

ব্রিগেডিয়র—কি আনন্দ! কি ভয়—কে বলে যুদ্ধে আছে ভয়! আমি শবরাশির উপর দিয়া উৎসাহের সহিত চলিলাম। মহারাজের আজ্ঞায় আমি এক শবের মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিলাম। সম্রাটের জয় হউক! এইরূপ মস্কো পর্য্যন্ত যাত্রা করিতে হইবে! কিন্তু ততদূরে যাইতে হইল না। অনতিকাল পরেই আর একদল শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধে জয় লাভ হইল। সম্রাট আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সম্মান চিহ্ন স্বরূপ ক্রস উপহার দিলেন।

৯

যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। আবার স্বদেশে ফিরিয়া যাইব—শীঘ্রই আমাদের বিবাহের

বাদ্য বাজিবে। কি আনন্দ! অনেকটা পথ অতিক্রম করিতে হইল কিন্তু আশার বলে তাহা কেমন সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল। ঐ দেখা যাইতেছে—ঐ আমাদের গ্রাম। দূর হইতে যেন ঘণ্টার শব্দ শুনা যাইতেছে!

১০

ঘণ্টা বাজিতেছে কিন্তু সে পেয়ারা গাছ কোথায়? ফুল ফুটিবার সময় হইয়াছে—কিন্তু কৈ, সে ফুল ত দেখা যায় না। আমার সে সাধের গাছ কে কাটিয়া ফেলিয়াছে। তাহার শাখাবলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে।

১১

ভাই ও বাজনা কিসের জন্য? কাপ্তেন সাহেব, গ্রামে বিবাহের উৎসব। বিবাহ! ঠিক বটে। সত্য বলিয়াছে, বর কন্যা হাত ধরাধরি করিয়া গিরজায় সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে। কন্যা কে? আমার সেই প্রেয়সী রূপসী চির হাসি রাশি প্যারী, বর আমার সেই বাল্য সখা লুই!

১২

লোকে বর কন্যার রূপ গুণের কত কি প্রশংসা করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পিয়ার কোথায়? পিয়ার কে? হায়! তাহারা আমাকে চিনিতে পারিল না।

১৩

আমি জানু পাতিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। প্যারীর জন্য--লুইর জন্য প্রার্থনা করিলাম। তারা ভাল থাকুক—সুখে থাকুক—আমার ভালবাসার লোকের মধ্যে তারা দুটিই যা আছে। আমি একটী শীর্ণ ফুল কুড়াইয়া লইলাম ও অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

১৪

এই যে পিয়ার! তুমি কোথা থেকে। আজ্ঞা হাজির মহারাজ! কি বর চাও? তোমার সাধ যা—তাহাই সিদ্ধ হইবে। কোন শ্রীমন্তের ঘরের সুন্দরী বিবাহ করিতে চাও ত বল আমি এখনি বলিয়া দিতেছি।

পিয়ার তাহার বক্ষ হইতে সেই শুষ্ক ফুলটি টানিয়া লইয়া দেখাইল। মহারাজ! আমার হৃদয়ও এইরূপ, তাহার বসন্ত ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আমার এই ইচ্ছা রণক্ষেত্রে বীরের মত দেহ ত্যাগ করি।

১৫

তাহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ২২ বৎসর বয়সে যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হয় ও সেই গ্রামের এক প্রান্তে একজন কর্ণেলের যে গোর দেখা যায়, তাহা এই অভাগা বীর পিয়ারের গোর। তাহার উপর এক বিন্দু অশ্রুপাত কর।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এক হাতে তালি বাজে কি ?

গত মাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বাবু "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শিরস্ক প্রবন্ধে প্রীতির যেরূপ নূতন প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া উপরের ঐ প্রশ্নটি আমার মনে উদিত হইল। তাহাও কি কখনও সম্ভবে? এক হাতে কখনও কি তালি বাজে? পঞ্চ-পাণ্ডব অভিন্ন হৃদয়, তথাপি যুধিষ্ঠির যিনি—তিনি যুধিষ্ঠিরই; ভীম যিনি—তিনি ভীমই; যুধিষ্ঠিরও ভীম নহেন—ভীমও যুধিষ্ঠির নহেন; পাঁচ ভাইয়ের সকলেই পাণ্ডব—এইখানে সকলেরই অদ্বৈত ভাব,—আবার, যুধিষ্ঠিরও ভীম নহেন—ভীমও যুধিষ্ঠির নহেন—এইখানে উভয়ের দ্বৈতভাব। এইরূপ দ্বৈতভাব এবং অদ্বৈত-ভাব দুইই যেখানে বর্ত্তমান—সেই খানেই ভ্রাতৃস্নেহ সম্ভবে; কিন্তু মূলেই যেখানে দ্বৈত-ভাব নাই, সেখানে ভ্রাতৃস্নেহ কিরূপ? যদি যুধিষ্ঠির ভিন্ন অন্য পাণ্ডব না থাকিত, তবে সেই অদ্বৈত পাণ্ডবের ভ্রাতৃস্নেহ কোথায় থাকিত? আম্র-বৃক্ষের প্রত্যেক পত্রই আম্র-পত্র—এ যেমন অদ্বৈত ভাব,—আম্র-বৃক্ষের প্রত্যেক পত্রই আর আর সহোদর পত্র হইতে বিভিন্ন—এ তেমনি দ্বৈত-ভাব; এইরূপ, কি জড় জগতে—কি চিৎ-জগতে—সর্ব্বত্রই দ্বৈত এবং অদ্বৈত একসঙ্গে এপিট ওপিট ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কৃষ্ণধন বাবু জড়জগতের আকর্ষণের সহিত চিৎ-জগতের প্রীতির উপমা দিয়াছেন,—উত্তম; কিন্তু বিকর্ষণ ব্যতিরেকে কখনও কি আকর্ষণ সম্ভবে? যদি প্রকৃতির নিয়ম উল্টাইয়া গিয়া জড়-পরমাণুগণের মধ্যে শুদ্ধ কেবল আকর্ষণেরই একাধিপত্য হইয়া উঠে, তবে সমস্ত জড় জগতের সমস্ত ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়া সমস্ত পরমাণু একটি মাত্র বিন্দুতে (জ্যামিতিক বিন্দুতে) সঙ্কুচিত হইয়া যায়—শূন্যে-নিঃশেষিত হইয়া যায়—কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,—যে আকর্ষণ করিবে এবং যে আকৃষ্ট হইবে—উভয়ের কেহই অবশিষ্ট থাকে না; আকর্ষণ তবে দাঁড়ায় কোথায়? বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ এ দুয়ের মধ্যে এরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে, বিকর্ষণ থাকিলে আকর্ষণ থাকে—বিকর্ষণ না থাকিলে আকর্ষণও থাকে না। বিকর্ষণ দ্বারা পরমাণুগণের ব্যবধান রক্ষিত হইলে তবেই আকর্ষণ তাহাদের মধ্যে কার্য্য করিতে পথ পায়। চিৎজগতেও অবিকল এইরূপ;—বিকর্ষণ দ্বারা পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা স্বতন্ত্র হওয়াতেই উভয়ের মধ্যে প্রীতির আকর্ষণ কার্য্য করিতে পথ পায়। যেখানে প্রীতির নাম-গন্ধও নাই—যেখানে শুদ্ধ কেবল খাদ্যখাদক সম্বন্ধেরই প্রাদুর্ভাব—সেইখানেই কেবল এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জঠরানলের আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া দুর্ব্বল পক্ষ প্রবল-পক্ষের অভ্যন্তরে একেবারেই বিলীন হইয়া যায়। মৃগের প্রতি ব্যাঘ্রের আকর্ষণ আত্যন্তিক প্রবল, সে আকর্ষণের চক্রে পড়িলে মৃগ ব্যাঘ্রের শরীরাভ্যন্তরে তন্ময়ীভূত হইয়া যায়; এই অবস্থাতেই

উভয়ের দ্বৈতভাব অদ্বৈত-ভাবে পরিণত হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে, এরূপ দ্বৈত-গ্রাসী আকর্ষণের সহিত প্রীতির আকর্ষণের আকাশ পাতাল প্রভেদ। উদরের আকর্ষণ স্বতন্ত্র এবং হৃদয়ের আকর্ষণ স্বতন্ত্র। উদর আপনার প্রিয় বস্তুর স্বাতন্ত্র্য লোপ করিতে চায়—হৃদয় আপনার প্রিয় বস্তুর স্বাতন্ত্র্য প্রাণপণে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। উদর বলে এই যে, আমি যাহা ভালবাসি তাহা আমাতে তন্ময়ীভূত হইয়া যাক্; হৃদয় বলে এই যে আমি যাহাকে ভালবাসি তাহার স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত থাকুক্ ও সে আমাকে স্বাধীন ভাবে ভাল বাসুক। ভালবাসা নামাই দুই পক্ষে ভর করিয়া অবস্থিতি করে। এক-তরফা ভালবাসা আর এক পা খোঁড়া শরীর নিতান্তই অঙ্গহীন। এই জন্য বড় বড় কবিরা যেখানে ভাল বাসার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়াছেন, সেইখানেই দুই তরফা ভালবাসার অবতারণা করিয়াছেন। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার—রোমিও এবং জুলিয়েটের—চক্ষের মিলন মাত্রেই উভয়ের ভালবাসা পরস্পরের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া উঠিল! অগ্রে মাতাপিতা সন্তানকে ভালবাসে তাহার পর সন্তান সেই ভালবাসার প্রত্যুত্তর দেয়। পরমাত্মা জীবাত্মাকে ভালবাসিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছেন—তাই জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভালবাসিতে সমর্থ হইতেছে,—নচেৎ কে কাহাকে ভালবাসিবে? জীবাত্মা পরমাত্মারই ভালবাসার প্রত্যুত্তর দিতেছে। দুই পক্ষের পরস্পরাভিমুখী স্বাধীন ইচ্ছাই প্রীতির সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ। মৃগের প্রতি যেরূপ ব্যাঘ্রের আকর্ষণ—জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার আকর্ষণ সেরূপ নহে; পরমাত্মার আকর্ষণ উদরের আকর্ষণ নহে তাহা হৃদয়ের আকর্ষণ; সে আকর্ষণের মর্ম্মগত ভাব এই যে, জীবাত্মা স্বাধীন-ভাবে বাঁচিয়া থাকুক্—ও প্রীতির উত্তরে প্রীতি প্রদান করুক্;—কেন না—পরাধীনের আবার প্রীতি কিরূপ? যিনিই প্রীতি করিয়াছেন—তিনিই জানেন যে, প্রীতি কখনই এক পক্ষে ভর করিয়া সুস্থির থাকিতে পারে না—এক হাতে কখনই তালি বাজে না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাব্য জগৎ।

আঁদ্রে শ্লেনিয়ে।

এবার একজন অপরিচিত কবির জীবন কাহিনী বলিব। ইংলণ্ড আর আমাদের বিদেশ মনে হয় না—ইংরাজ কবি আমাদেরই কবি মনে হয়। ইংরাজী ইতিহাস আমাদিগের ইতিহাসের উপসংহার মাত্র। আমরা ইংরাজী শিক্ষার গুণে কিংবা দোষে যাহাই বল না কেন—কাব্য গ্রন্থ ইংরাজী রকম করিয়া পড়ি এবং যাহা ইংরাজের

বিদেশ—আমাদিগেরও তাহা বিদেশ, এবং যে কবি শ্বেতদ্বীপের নহেন, তাঁহার খোঁজ খবর আমরা কিছুই জানি না। একটু লজ্জার এবং দুঃখের কথা। আমরা এতই ইং-রাজ ভক্ত হইয়া উঠিয়াছি যে মধ্যে মধ্যে অন্য দেশের কবির ও কাব্যের কথা বলা আবশ্যক। বিশেষ একজন কবির কথা যাহার জীবন স্বাধীনতার যুদ্ধে শেষ হইয়াছে, যাহার মনে এমন একটি চিন্তাও উদয় হয় নাই যাহা পূর্ণ ভাবে জাতীয় নহে, যাহার কবিতার পবিত্র ভাব সেই জাতীয়তার ফল, যাহার হৃদয়ের উদারতা, প্রণয়ের অসীম বিস্তার, আশার অনন্ত ব্যাপ্তি সেই স্বাধীন কামনা হইতে উত্তেজিত এবং পোষিত, তাহার জীবনের কথা আমাদিগের জানা উচিত, জানিয়া হৃদয়ে পুষিয়া রাখা উচিত, আর আমাদের ছোট ভাই বোন, ছেলে মেয়েদের নিকট উপকথার ছলে বলা উচিত। যতদিন না আমরা কবির ভাব এবং জাতীয়তা এক মনে করিতে পারিব, তত দিন আমাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

"তোমরা দ্বিজ! তোমরা অনেকদিনের এবং আজ কালকারও! কত বর্ষে শুষ্ক তরুবরে নূতন পল্লব বাহির হইয়াছে! তোমরা চিতা ভস্ম হইতে, সমাধি স্থানের ধূলি কণা হইতে নূতন জীবন পাইয়াছ। এস আমাদিগকে আলো ধরিয়া পথ দেখাও। প্যারিস হাত বাড়াইয়া দিতেছে। তোমরাই আমাদের প্রীতির সন্তান। একটি জাতির পিতা তোমরা, তোমরাই বিধিদাতা, তোমরাই জগতের জীবের বিধি নিশ্চিত হস্তে নিরূপিত করিয়া দিয়াছ। তোমাদেরই প্রথম স্বাধীন অধিকার, প্রকৃতির সহিত এক দিনেই তোমাদিগের জন্ম, তোমরা অনন্তের সহচর। সবই শাসন করিয়াছ, কোন রূপ দাসত্ব তোমরা পুরাকালে বহন কর নাই। জগতের মঙ্গল সাধক তোমরা আমা-দিগকে নূতন শিক্ষা দাও!" মনে কি হয় না যে আঁদ্রে সেনিয়ে ভারতীয় আর্য্য সন্তা-নের উল্লেখ করিয়া ঐ কথা কয়েকটি বলিয়াছেন। "তোমরা দ্বিজ" (deux fois nè) "তোমরা বহু দিনের এবং আজ কালেরও"—কথা কয়েকটি শুনিলে হৃদয়ে কি আঘাত লাগে না—হৃদয়ের ভিতর পূর্ব্ব গৌরবের কথা জাগিয়া ওঠে না? তখন এই বিদেশী কবি বিদেশের লোককে আপনার বলিতে ইচ্ছা হয় না? আমাদের নিজের কবি, আপনার দেশের কথা এই বিশ্বাসে হৃদয় মুগ্ধ হয়।

আঁদ্রে সেনিয়ে জীবিতাবস্থায় একটি কবিতাও প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার অকাল মৃত্যুর ২৫ বৎসর পর এক জন বন্ধু কবিতাগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় না ছাপাইবার কারণ ছিল। তিনি বলিতেন "কবিতা নিজের হৃদয়ের গান, নিজের প্রাণের উচ্ছ্বাস, ফ্রান্স এখন জাতীয় ভাব পরিপূর্ণ। সে জাতীয় ভাব বাধা মানি-তেছে না—তাহা এতই দুর্দ্দান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহার তেজে দাবানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে। সে তেজের সহিত আমার হৃদয়ের তেজ, আমার হৃদয়ের গভীর উৎসাহ যোগ দিব না—শেষে স্বাধীনতার নামে ঘোর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা যাহা ভাবি,

যাহা গাই, তাহা লুকাইয়া ভাবিব, লুকাইয়া গাহিব—যে আমাকে আপনার মত ভালবাসে তাহাকে শুনাইব। সমগ্র জাতি এখন উদ্বেগ পরিপূর্ণ। আমার প্রণয়ের কথা তাহাদিগের ভাল লাগিবে কি করিয়া? যে কবিতাগুলি নিতান্ত আমার—তাহা আমারই থাকিবে। যে গুলি জাতীয় তাহার আবশ্যক নাই। যে গুলি প্রাণের কথা, মর্ম্মের বেদনাভরা, বিপ্লবপরিপূর্ণ জাতীয়-হৃদয়ে তাহার স্থান নাই। আমার কবিতা প্রকাশ করিব না। যদি বাঁচিয়া থাকি, যদি জগৎ শান্তি পরিপূর্ণ হয়—যখন স্বাধীনতাতে শান্তি দেখিব, তখন ছাপাইলে ছাপাইতে পারি। এখন এই উদ্বেগ দমন করিতে গৃহের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া পুরাতন গ্রীক কবিতার ধরণে কবিতা লিখিব তাহাদিগের দেব রাজ্যের কথা, দেব দেবীর, প্রণয়ের কথা ভাবিব। ফ্রান্সের কথা ভাবিতে গা সিহরিয়া উঠে, হৃদয় উথলিয়া ওঠে—ধমনীতে রক্ত এতই দ্রুত প্রবাহিত হয়, যে হাতে কলম লইয়া কবিতা লিখি কি করিয়া। যে হস্তে তরবারি ধরা উচিত সে হস্তে কলম লই কি করিয়া? সুন্দর গ্রীসের, সুন্দরতর কাব্যজগৎ দেখিব—এ হৃদয়ের গান কাহাকেও শুনাইব না।"

আমি আঁদ্রে সেনিয়ের নিজের কথা দেই নাই, নিজের মনে যাহা ভাবিয়াছি, তাঁহার কবিতা হইতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি।

আঁদ্রে সেনিয়ে যখন নিজের গান গাহিতেন তখন তিনি গ্রীক। তাঁহার মাতা এক জন প্রসিদ্ধ গ্রীক সুন্দরী ছিলেন—তাহাতেই বালক কবির গ্রীসের প্রতি এত অনুরাগ।

"আয় বীণা আয় তোর সুন্দর যৌবনের ভাব লইয়া আয়। তোর কোমল শৈশবের কণ্ঠা লইয়া আয়, গ্রীসের গান গাহিবি আয়। আমি নিতান্ত একা, আয় আমার কাছে। আমার চিন্তা অনুভব করিবি, আমার নীরব চিন্তার উত্তর দিবি আয়"

(৯৫—৯৬পৃঃ)

"কবিতা রচনা এক কথা, কবিতা ভাবা বিভিন্ন। একা হৃদয়ই কবি। কবিকে হৃদয় লিখিতে বলে—হাত কোন রকমে লেখে। হাত লিখিবে কি করিয়া? লিখিবার পূর্ব্বে কত সহস্র চিন্তা এখান হইতে দূর আকাশ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে—হাতবাড়াইয়া তাহা পাইবে কি করিয়া? হাত শুধু চাপিয়া ধরিয়া চিন্তা কুসুমের রাগ হানি করে।"

(১১০ পৃঃ)

"লতা দিয়া হাত বাঁধিব, জগৎ ভুলিব, জগৎ আমাকে ভুলিবে। আর আকাশ হাসিবে, পৃথিবীর কুসুম হাসিবে। কোকিলের বিষাদভরা গান শুনিব, নদীর সর্প গতি দেখিব, আর প্রত্যেক কুসুমের পাশে বন দেবী খুঁজিয়া পাইব। ভালবাসিয়া একা দূরে জীবন কাটাইব"

কিন্তু জীবন স্রোত ত বাধা মানে না। লতা দিয়া তাহা জড়াইয়া রাখা যায় না। পর্ব্বতের গুহা হইতে সে লাফাইয়া পড়ে, ধরিতে ধরিতে কতদূর আসিয়া পড়ে। পৃথি-

বীর ভিতর দিয়া, সংসার সাগরের পঙ্কিল জলে মিশিয়া যায়, সে সাগরের স্বাধীন জলে মিলিতে চাহে।"

(১১৯ পৃঃ)

অঁাদ্রে সেনিয়ের কবি বলিয়া খ্যাতি তাঁহার মৃত্যুর পর। কিন্তু সে খ্যাতি অমর। তিনি যদি জীবনাবস্থায় কবিতা প্রকাশ করিতেন, ফ্রান্সে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। তাঁহার নাম সকলের মুখে শুনিতে পাইতেন। চিরদিনের জন্য ফরাসী সাহিত্যে দেবতা বলিয়া খ্যাত হইতেন। অঁাদ্রে সেনিয়ে যে কবিতা লিখিতেন, তাহা জনকতক বন্ধুকে শুনাইতেন মাত্র। কবিতাগুলি ছাপাইবার তাঁহার যে ইচ্ছা ছিল না, তাহা নহে। একখানি খাতাতে তিনি এই কয়েকটি ছত্র লিখিয়া যান। "বন্ধুদিগের প্রশংসা সত্ত্বেই আমি এই কবিতাগুলি ছাপাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে কবিতা শুনিয়া ভাল বলেন,সাধারণ পাঠক সে ভাবে পড়িবেন কি না জানি না—তাহাতেই আশঙ্কা হয়"। সাধারণ পাঠক কি ভাবে তাহা দেখিয়াছেন, তাহা বলিবার অবশ্যক নাই। সেনিয়ের কবিতাগুলি মোহপরিপূর্ণ। তাহা পড়িলে মাদকতা জন্মে। কিন্তু কবির জীবন কাহিনী এখন পর্য্যন্ত কিছুই বলি নাই।

অঁাদ্রে সেনিয়ে ১৭৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষার বিষয় আর কিছুই জানি না—শুদ্ধ মাত্র যে তিনি যাহা পাইতেন, তাহা পড়িতেন এবং পাঠে স্বপ্ন-মুগ্ধ হইতেন। অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই শরীরের বল, মনের তেজে তিনি যুদ্ধ বিদ্যা শিখিবেন, জীবন বীরের করিবেন, ফ্রান্সের গৌরব বাড়াইবেন—ইহাই তাঁহার আশা ছিল। কিন্তু দিন কতক পরেই দেখিলেন যে যোদ্ধা আজ কাল শুদ্ধ নামে মাত্র বীর। তাঁহার সে জীবন ভাল লাগিল না। মাস ছয় পরেই সৈন্য শ্রেণী ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, যাহা কিছু জানা আবশ্যক যাহা কিছু জানা যাইতে পারে শিখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। আশা হইল কালে বিদ্বান বলিয়া জগতে পরিচিত হইবেন। পড়িতে পড়িতে ভয়ানক পীড়া হইল। সুইটজারল্যাণ্ড যাইতে বাধ্য হইলেন। সেখানকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার মনে এতই নূতন চিন্তা উদয় হইত যে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বিষয় কোন কবিতা সেখানে বসিয়া লিখিতে পারেন নাই। কালে যখন তাহার নূতনত্ব চলিয়া গেল, তাঁহার উপস্থিত মানসিক উদ্বেগ কমিয়া গেল, যখন যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা স্মৃতিতে পরিণত হইল, তখন তাঁহার বিষয় কবিতা লিখিতে সক্ষম হইলেন।

"হৃদয়ের রাণী তুই ফ্রান্স! স্রোতময়ী পবিত্র নদী সলিল বিধৌত তোর চরণ যুগল প্রণাম করি। অনেক দিন পরে, কত বিদেশ ঘুরিয়া আবার তোরই কাছে ফিরিয়া আসিয়াছি। তোর নদীর কুল কুলু সঙ্গীত, কতবার নদীদেবীদিগের গান ভাবিয়া শুনিতে আসিয়াছি, আর কতবার যখন বিদেশে বিস্তৃত হ্রদ দেখিতাম তখন তোরই

কথা ভাবিয়াছি। অনেক দেশ দেখিয়াছি বটে, অনেক কথা অনেক স্থানে ভাবিয়াছি বটে, কিন্তু তোর নদীর ধার ছাড়া কবিতা ভাবিতে পারি না, কবিতা মনে উদয় হয় না। আর যখন কবিতা লিখি তোরই কোলে লুকাইয়া লিখি।"

লুছ্যারেণ হ্রদ যে একবার দেখিয়াছে, সে কখন ভুলিতে পারে না। কিন্তু কবি আঁদ্রে সেনিয়ে খানিকটা না ভুলিলে কবিতা লিখিতে পারেন নাই। আমাদের সহিত তাঁহার এই প্রভেদ। পরে ইংলণ্ডে গিয়া সুইট্‌ঝারলণ্ডের অতুল সৌন্দর্য্য খানিকটা ভুলিলেন। তখন তাঁহার মন কবিতা লিখিবার উপযোগী হইল। যখন নিয়মিত কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন গ্রীক কবিতার অনুকরণে লিখিতেন। সে অভ্যাস কখন যায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অনুকরণ বোধ হয় না। তাহাতে নিজের ভাবের নূতনত্ব প্রত্যেক ছত্রে প্রকাশ পায়।

১৭৮৯ খৃঃঅব্দে ফ্রান্সে আগুন লাগিয়া উঠিল। উদার প্রাণের আশা বাড়িয়া উঠিল। আঁদ্রে সেনিয়ে হৃদয়ে যেন নূতন বল পাইলেন। যদি তিনি স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র না হইতেন তাহা হইলে কি কবি নামের উপযোগী হইতেন। কবিতা লেখা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। স্বাধীনতার জন্য অগ্নিময় গদ্য লিখিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে নীরব নিভৃত জীবন তাঁহার এত আদরের তাহা অকাতরে সাধারণের জন্য বলি দিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা পক্ষপাতী বলিয়া তিনি অরাজকতার বিরুদ্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ধনী হইলেই সে পাপী, সে স্বাধীনতা বিরোধী হইবে ইহা সত্য নহে, এই কথা তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন। যে আগুন জ্বালিয়া দেওয়া এত সহজ সেই আগুন "পাবক"—"দাহক" নহে এই কথা আঁদ্রে সেনিয়ে বলিতেন বলিয়া তাঁহার রক্তশোষণের জন্য উন্মাদ পিশাচ ব্যগ্র হইয়া উঠিল—সেই যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যে দৈত্য দানব সমাবৃত হইয়াছিল আঁদ্রে সেনিয়ের জীবনাকাশ তাহারাই আঁধার করিয়া দিল। তাঁহার ভ্রাতা সেই আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দিনকতক তাঁহাদিগেরই দলে মিশিয়া আঁদ্রে ভাইকে রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু যে দল শেষকালে ইতিহাসে Jacobins নামে খ্যাত হইল সেই দল হইতে আঁদ্রে সেনিয়ে সরিয়া আসিলেন। ফ্রান্সে বীরত্বের অভাব নাই কিন্তু বিপ্লবের সময় স্থিরবুদ্ধির অভাব আছে। আঁদ্রে সেনিয়ে নিজের গৌরবের কথা ভাবিলেন না, নিজের বিপদের কথা মনে স্থান দিলেন না। নিজেকে বিপ্লব ক্ষেত্র হইতে ক্রমে দূরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। দল ছাড়িয়া, জনসমাজ হইতে দূরে গিয়া নিজে যাহা স্বাধীন ভাবে স্থির করিতেন, অসঙ্কোচে তাহাই বলিতে লাগিলেন। এই নির্ভীকতা, এই স্বাধীন হৃদয়, এই খ্যাতির আশা শূন্য প্রাণ সেই বিপ্লবের মধ্যে সেই জাতীয়-দাবানল-তপ্ত আত্মার উৎসাহের উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া নিজের উপর বিশ্বাসে ভর করিয়া যুবক কবি, দেবতা, আঁদ্রে সেনিয়ে জ্বরগ্রস্থ মানবকে সত্য কি অসত্য কি, স্বাধীনতা

কি, অরাজকতা কি, তাহাই দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। এই বিদেশী কবিকে কি প্রণাম করা যায় না? তাহার কবিতা কি পড়িবার চেষ্টা করা উচিত নহে?

অনেকে বোধ হয় জানে না যখন ষোড়শ লুইয়ের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইল রাজা বিদ্রোহীদিগকে এক পত্র লেখেন। সে পত্রের প্রত্যেক অক্ষরে রাজার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, রাজ পদবীর গৌরব দেখিতে পাই, তাহাতে কোনরূপ উদ্বেগ দেখিতে পাই না, ভয় দেখিতে পাই না, কোন আশঙ্কা নাই—শুদ্ধ মাত্র রাজা প্রজাকে বলিতেছেন "আমার কিছু বলিবার আছে। তোমবা প্রজা, যাহারা আমার উপর প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছে তাহারই আমার প্রজা; আমার কথা শুন, আমার সহিত ভাব তাহা উচিত হইয়াছে কি না"। সেই পত্রের লেখক আঁদ্রে সেনিয়ে যুবক— আঁদ্রে সেনিয়ে। যুবক কবি আঁদ্রে সেনিয়ে সেই সময় রাজার পাশে দাঁড়াইতে সাহসী হইলেন, তাঁহার হইয়া তাঁহার নামে পত্র লিখিলেন। উন্মত্ত ফ্রান্স তখন রাজ রক্ত লোলুপ। নির্ভীক আত্মা আঁদ্রে সেনিয়ে সাহসে ভর করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজার পাশে বসিয়া রাজার গৌরব রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। বড়ই নির্ব্বোধের কাজ সেই স্রোতে বাধা দেওয়া, বড়ই মূর্খের কাজ সে আগুন হাত দিয়া সরাইয়া দিবার চেষ্টা। রাজার রক্ত পান করিয়া ফ্রান্স তৃপ্ত হইল না। সহস্র সহস্র নর নারীকে বধ করিয়া তাহাদিগের রক্তপিপাসা মিটিল না। আঁদ্রে সেনিয়ে ক্ষোভ পূর্ণ হৃদয়ে পারিস নগর ছাড়িয়া গেলেন। আবার কাল ক্রমে, ঘটনা ক্রমে পারিসে ফিরিয়া আসিতে হইল।

শেষ দৃশ্য—কারাগৃহ, আঁদ্রে সেনিয়ে কারারুদ্ধ, জাতীয় স্বাধীনতার বিপক্ষ বলিয়া, রাজা লুইয়ের সহায় বলিয়া কারারুদ্ধ। কিন্তু অন্ধকার কারাগৃহে কবি নিজের কবিতাগুলি গুছাইয়া দিন যাপন করিতেন—মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন। বাহিরের বিপ্লবের সহিত সব সম্বন্ধ যেন চলিয়া গিয়াছে বাহিরের ঝড় যেন তাঁহাকে একেবারে পঁহুছিতে পারিতেছে না—একা নির্জ্জনে কাব্য লইয়া দিনাতিপাত করিতেন।

একদিন হঠাৎ বিচারের জন্য আনীত হইলেন। সে বিচার নাম মাত্র। ন্যায়ের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। বিচার নাম দিয়া, অকারণে "সাধারণের শত্রু" উপাধি দিয়া, পুরুষ স্ত্রীলোকের বধের ব্যবস্থা হইত। আঁদ্রে সেনিয়েকে যখন বিচারের জন্য আনা হইল, তখন তিনি নিজের পক্ষে একটি কথাও কহিলেন না, একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না—কাহাকে উত্তর দিবেন, কাহাকে কথা বলিবেন? তাঁহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইল।

বেলা আটটার সময় প্রাতে, অন্য অনেক সহযাত্রীর সহিত একত্রে গিলোটিনের রথ চড়িয়া যেখানে নরবলি হইত সেইখানে আসিলেন। হঠাৎ দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এ কে? আঁদ্রে সেনিয়ের অনেক দিনের পর হৃদয়ের বন্ধু প্রসিদ্ধ চিত্রকর রুসে পার্শ্বে দণ্ডায়মান! অনেক দিন দেখা হয় নাই। মৃত্যুর দ্বারে এক মুহূর্ত্তে দুই জন বন্ধু উপ-

স্থিত, একজন কবি, আর একজন্ চিত্রকর। এ পূর্ণ পবিত্র সম্মিলন জীবনে কবার ঘটে। ইতিহাসে কবার ঘটিয়াছে! দুই জনে কবিতা, সাহিত্য, গ্রীসের গৌরব, স্বভাবের সৌন্দর্য্য কত কথা বলিতে বলিতে গিলোটিনের খড়্গের নীচে গলা পাতিয়া দিলেন—"সন্ধ্যা না হইতেই আমার জীবনের গোলাপ শুকাইবে কি?" যৌবনের প্রারম্ভেই যে ভয় হইয়াছিল, শেষে তাহাই সত্য হইল—"জীবন গোলাপ" শুকাইয়া গেল।

শৈশবে বিলয় কি সুন্দর। শক্রকে কলঙ্ক শূন্য জীবন উপহার দেওয়া গৌরবের কথা। দেব পদে স্বপ্ন পূর্ণ শিশু-প্রাণ উপহার দেওয়ার অপেক্ষা আর কি অধিকতর পুণ্যের কথা আছে? আজ একটি দেব শিশুর পবিত্র জীবনের কথা বলিলাম। কাব্য জগতে এরূপ দেব কাহিনী বড় কম।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

কিরণের মৃত্যু।

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ লোয়ে ধীরে ধীরে ঢোলে,
পড়েছে অলস রবি পশ্চিমের কোলে,
না পেয়ে দেখিতে তারে, কিরণ তাহার,
আকুল ব্যাকুল্ হয়ে খোঁজে চারিধার।
হেথায় হোথায় ক'রে ফেরে সোনামুখী,
বকুলের কোলে গিয়ে মারে উঁকি ঝুকি।
ঝিকি মিকি করে গিয়ে নারিকেল শিরে—
না পেয়ে সেথায়—দূর দূরান্তরে ফিরে।
মেঘের বুকেতে শেষে লুটায় কাঁদিয়া,
উজ্জ্বল মেঘের মুখ ম্লান সে লাগিয়া।

প্রফুল্ল বিহগগুলি ব্যথিত পরাণ
অধীরে রবিরে ডাকে গেয়ে গেয়ে গান—
আকাশে আকাশে খোঁজে সাড়া নাহি পায়,
আকুল হৃদয় নিয়ে ফিরে চলে যায়।
আশ্রয় গিয়েছে চলে বৃন্ত তার ভাঙ্গা—
নিরাশা জাগিছে প্রাণে কেঁদে আঁখি রাঙ্গা।
বিষণ্ণ কিরণগুলি ধীরে—অতি ধীরে—
মরে যায়—ডুবে যায়—নয়নের নীরে।
প্রকৃতি তাহার শোকে রজনীর পাশে—
মূরছি পড়িয়া যায় অন্ধকার বাসে।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

বীরকাহিনী।

ফরাসী-বীরত্ব।

আমরা আগে যে গলদের দেখিয়াছি এখন আর তাহারা সে লগ নাই—চারি শত বৎসরের রোমান অধীনতার গুণে সে অসভ্য স্বাধীন হৃদয় গলগণ এক্ষণে সভ্য হইয়াছে—নির্জ্জীব প্রাণে অধীনতা শৃঙ্খল আর কষ্টকর বোধ হয় না। এখন তাহারা রোমানদের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। এখন ছেলেদের রোমান নাম রাখা হয়, নগরের রোমান নাম, রাস্তার রোমান নাম, রোমের দ্রব্যে নগর পূর্ণ, নগরবাসীগণের রোমীয় পরিচ্ছদ, লাটিন ভাষা এখন গলদের ভাষা। তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা এই একশত বৎসরেই ইংরাজ হইতে শিখিয়াছি।

৪৩৮ খৃষ্টাব্দে মধ্য ও পূর্ব্ব য়ুরোপবাসী অসভ্য ফ্রাঙ্ক জাতিরা এই সভ্য গলদিগকে আক্রমণ করিল। প্রাচীর বেষ্টিত স্থান গুলি তাহারা অধিকার করিতে সক্ষম হইল না, অন্য স্থান গুলির দ্রব্যাদি হরণ করিয়া নগরগুলি ভস্মসাৎ করিয়া নগরস্থ দৃঢ়কায় সবল লোকদিগকে দাসত্বে নিযুক্ত করিল, দুর্ব্বল অসহায় ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিল। এই অরাজকের সময়—ফ্রান্সের এই বিপদের সময় নান্টের (পুরাতন পারিসের নাম) নগরবাসী একজন কৃষকের গৃহে একটী বালিকা জন্মগ্রহণ করিল। বালিকার নাম জেনভিয়েব। জেনভিয়েবের বয়স যখন ৭ বৎসর য়ুরোপের বিখ্যাত ধর্ম্মযাজকদ্বয় জারমেনাস্ এবং লিউপস একবার নান্টের নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেখিবার নিমিত্ত সমুদয় পারিসবাসী উৎসুক হৃদয়ে উপাসনালয়ে আসিল। সেইখানে জারমেনাস জেনভিয়েবের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব দেখিয়া মোহিত হইলেন, তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কথোপকথন করিয়া যাইবার কালে একটী ক্রস্ মূর্ত্তি অঙ্কিত তাম্রমেডেল উপহার দিয়া গেলেন। সেই অবধি জেনভিয়েবের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তাহার বিশ্বাস হইল ঈশ্বরের কাজ করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। বালিকা সমস্ত দিন পিতার মেষ চরাইত, সন্ধ্যাবেলা ঘরে বসিয়া মেষলোমের সূতা কাটিত কিন্তু কাজের মধ্যেও কখন ঈশ্বরের নাম ভুলিত না। জেনভিয়েবের পিতা মাতার মৃত্যু হইলে বালিকা তাহার ধর্ম্ম মাতার সহিত বাস করিত। দরিদ্রদিগের সাহায্য প্রভৃতি নানা প্রকার পরোপকার করিয়া পবিত্র ভাবে জীবন কাটাইত। এই সময় দুর্দ্দান্ত হনস্ জাতির অধীশ্বর এটিলিয়া ফ্রান্সাভিমুখে আসিতেছেন শুনিয়া গলরা ভয়ে শশব্যস্ত হইল। হন্‌সের তুলনায় ফ্রাঙ্করা সিংহের তুলনায় মেষশাবক। এটিলিয়ার নামে সমুদয় ইউরোপ কম্পিত। গলরা তাহাদের মূল্যবান বস্তু সকল সঙ্গে লইয়া নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। জেনভিয়েব আসিয়া তাহাদের পথের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, জ্বলন্ত ভাষায় বলিতে

লাগিলেন—বিপদের সময় নগর পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে—দেশকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। যদি এখনও তাহারা পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করে, দেশ রক্ষার চেষ্টা করে, তবে ঈশ্বরানুগ্রহে নিশ্চয়ই সফল হইবে। এই কথা শুনিয়া ক্রোধোন্মত্ত গলরা জেনভিয়েবকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু এই সময় সেণ্ট জারমেনসের নিকট হইতে উপঢৌকন লইয়া একজন দূত জেনিভয়েবের নিকট উপস্থিত হইল। গলরা জারমেনসকে অত্যন্ত ভক্তি করিত, জেনভিয়েবের প্রতি তাঁহার এইরূপ সম্মান দেখিয়া তাহাদেরও জেনভিয়েবের প্রতি ভক্তি হইল। জেনভিয়েবের কথা মত তাহারা গৃহে ফিরিয়া যাইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। অনেক কারণবশতঃ সৌভাগ্য ক্রমে হন্‌সদের ফ্রান্সে আসা ঘটিল না, এটিলিয়ার তাহার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইল, য়ুরোপ রক্ষা পাইল। কিন্তু এক বিপদ এড়াইয়া ফ্রান্স আর এক বিপদের হাতে পড়িল। হন্সদের পরিবর্ত্তে অগণ্য ফ্রাঙ্ক আসিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিল। গলরা নগরে আবদ্ধ হইয়া পড়িল কিন্তু নগরে খাদ্য দ্রব্য নাই, বাহির হইতে খাদ্য না আনিতে পারিলে প্রাণরক্ষার উপায় নাই। বাহিরে অগণ্য শত্রু। নগরবাসীগণ উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। জেনভিয়েব তাহাদের দেশে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন এবার তাহাদের প্রাণরক্ষা করিলেন। তিনি নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া একাকী নির্ভয়ে শত্রু মধ্যদিয়া নৌকা বাহিয়া বাহির হইয়া গেলেন, পুনরায় খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। গল ও ফ্রাঙ্ক উভয় দলেরই বিশ্বাস হইল তিনি সামান্য মানবী নহেন, বিশেষ রূপে দেবানুগৃহীত। কেহ তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করিল না। একদিন জেনভিয়েব স্থানান্তরে আছেন এমন সময় সংবাদ পাইলেন পারিস শত্রু-হস্তগত, অনেক প্রধান লোক বন্দী হইয়াছেন। আরও শুনিলেন ফ্রাঙ্করাজ হিপারিক তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। বীর রমণী তাহাদের রক্ষা করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন, অগণ্য শত্রুদের মধ্য দিয়া নির্ভয়ে ফ্রাঙ্ক রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। ফ্রাঙ্কেরা জানিত না তিনি কে, একজন সাধারণ রমণী ভাবিয়া পথে তাঁহাকে কেহ কোন বাধা দেয় নাই। ফ্রাঙ্করাজ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার দেশহিতৈষিতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া এত দুর মোহিত হইলেন যে তাঁহার অনুরোধে সমুদয় পারিসবাসীকে অব্যাহতি দিলেন কাহারও একটী কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শিত হইল না।

সৌভাগ্য ক্রমে জেনভিয়েবের প্রাণ বিসর্জ্জনের আবশ্যক হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার যে ইহাতে বীরত্বের কিছু কম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা নহে। জেনভিয়েবের পর জীবনও পূর্ব্বের ন্যায় পবিত্র ধর্ম্ম ও শান্তিভাবে পূর্ণ।

আর একজন ফরাসী কৃষক বালিকাও ইহার অনেক দিন পরে এইরূপ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন—দেশের জন্য অকাতরে প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া শত্রু সম্মুখে

উপস্থিত হইয়াছিলেন? কিন্তু হায়! অসভ্য ফ্রাঙ্করাজ হিপারিক জেনভিয়েবের দেশানুরাগে মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই কৃষক বালিকা তাঁহার শত্রুদের নিকট সেরূপ ব্যবহার পান নাই, ইংরাজেরা তাঁহাকে সকলের সম্মুখে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া বধ করেন। আর বেশী বলিবার দরকার নাই—আমরা কাহার কথা বলিতেছি পাঠকগণ তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছেন। আমারা নিজের দেশের ইতিহাস জানি না কিন্তু ইংরাজী ইতিহাস ছেলেবেলা হইতেই পড়িয়াছি—ইংলণ্ডের ইতিহাস আমাদের কণ্ঠস্থ। 'মেড অব অরলীন্‌স,—জোয়ান অব আর্কের কথা সকলেই জানেন। সেই জন্য আমরা তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াই সংক্ষেপে তাঁহার ইতিহাস শেষ করিব। ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ হেনরীর রাজত্ব কালে ইংরাজেরা ফ্রান্সের যুবরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ফ্রান্স অধিকার করিবার মানসে ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে অরলীনস আক্রমণ করিলেন। অচিরে অরলীন্স তাঁহাদের হস্তগত হইত,কিন্তু এই সময় ডম্রেমী নগরবাসী একটী কৃষক বালিকা যুবরাজ চার্লসের নিকট আসিয়া তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিতে নিষেধ করিল, বলিল ঈশ্বর ফ্রান্স রক্ষার্থে তাহাকে আদেশ করিয়াছেন ঈশ্বরানুগ্রহে সে যুবরাজকে রাজা করিবে ফ্রান্স রক্ষা করিবে। জোয়ান অব আর্কের ছেলেবেলা হইতেই বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বরের কোন বিশেষ কার্য্য করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। যখন ফ্রান্সের এইরূপ বিপদ দেখিল তাহার স্থির বিশ্বাস হইল ফ্রান্সকে রক্ষা করা, চার্লসকে রাজা করাই সেই উদ্দেশ্য। জোয়ান পুরুষের বেশে অস্ত্র সজ্জায় অশ্ব আরোহণ করিয়া একদল ফরাসীদের নেতা হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রণক্ষেত্রে অসিহস্ত বীররমণী শত শত শত্রু নিহত করিয়া অবারিত গতিতে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া ফরাসীদের বল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, ইংরাজেরা ভীত ও পরাজিত হইলেন। চার্লস রাজা হইলেন। জোয়ান স্বহস্তে তাঁহাকে মুকুট ভূষিত করিলেন। জেনভিয়েবের ন্যায় জোয়ানকেও বিশেষ দেবানুগৃহীত বলিয়া সকলের বিশ্বাসছিল। একদিন ফ্রান্সের অন্তর্গত বরগেণ্ডি প্রদেশবাসীরা সুবিধা পাইয়া জোয়ানকে বন্দী করিয়া ইংরাজদের নিকট বিক্রয় করিল। চার্লস বা কেহই তাঁহার সাহায্যার্থে আসিলেন না।

ইংরাজেরা তাঁহাকে "ডাইনী" সিদ্ধান্ত করিয়া অগ্নিতে জীবিত দগ্ধ করিলেন। জোয়ানের দেশ হিতৈষিতার, রাজভক্তির পুরস্কার বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতা। জোয়ান মরিলেন কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া গেলেন, সেই তাঁহার পুরস্কার।

শাক্যসিংহের উদ্যান-যাত্রা।

বোধিসত্ত্বের চিত্ত দিন দিন বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজভোগ তাঁহার বিষতুল্য বোধ হইতে লাগিল। রাজা শুদ্ধোদন যে দিন কুমারের সন্ন্যাস স্বপ্ন দেখিয়া কাতর হইয়াছিলেন, সেই দিন অবধি তাঁহার চিত্ত কুমারের গৃহবাস সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দিহান হওয়ায় তিনি সর্ব্ব শাক্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখিও কুমার যেন বহিরুদ্যানে গমন না করে। আমার কুমার যাহাতে গৃহবাসী হয়, রাজধর্ম্মে অনুরক্ত হয়, ভোগসুখে ভুলিয়া থাকে, তোমরা সতত সাবধান থাকিয়া তাহারই যত্ন করিবে। তাহা হইলে আমার পরম হিত হইবে।

একদা সিদ্ধার্থ প্রাতঃ-প্রবুদ্ধ হইয়া সারথিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সারথি! রথ যোজনা কর, আমি উদ্যান দর্শনে গমন করিব। সারথি তদ্বৃত্তান্ত রাজগোচর করিলে রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন, কুমারকে আমি উদ্যান যাত্রায় যাইতে দেই না, ইহা ভাল হইতেছে না। কুমার যদি স্ত্রীগণের সহিত সুভূমি দর্শনার্থ উদ্যান ভূমে গমন করে, তাহা হইলে তাহার আনন্দ অনুভূত হইবে, তাহাতে নিষ্ক্রম চিন্তা দূর হইলেও হইতে পারে।

এইরূপ চিন্তার পর রাজা সারথিকে বলিলেন, সারথি! কুমার অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে উদ্যান যাত্রা করিবেন, তন্নিমিত্ত নগর সমলঙ্কৃত হউক।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পুত্রস্নেহে সমাকৃষ্ট হইয়া নগর মধ্যে ঘণ্টা ঘোষণা করিলেন। "অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে কুমার সিদ্ধার্থ উদ্যান দর্শনে গমন করিবেন, সমস্ত শাক্যকুল সাবধান হউন। যেন কোন প্রতিকূল দর্শন না হয়।"

নির্দ্দিষ্ট দিবস আগত হইলে নগর সমলঙ্কৃত হইল। উদ্যান ভূমি ধ্বজ পতাকাদির দ্বারা শোভিত হইল। পথ সকল সিক্ত ও কুসুমবিকীর্ণ হইল। স্থানে স্থানে পূর্ণকুম্ভ ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইল এবং তোরণ বহিস্তোরণ প্রভৃতি পত্র পুষ্প বিতানে মণ্ডিত হইল। সৈন্য সকল সুসজ্জিত এবং সমস্ত রাজপরিবার অনুগমনে উদ্যুক্ত। শাক্য নগর আজ্ উৎসবময়—কেন না কুমার আজ্ উদ্যান যাত্রায় গমন করিবেন। নির্দ্দিষ্ট সময় আগত হইলে সারথি আক্রীড়া রথ আনয়ন করিল এবং কুমার সিদ্ধার্থ তাহাতে আরোহণ করিলেন। সারথি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা মাত্র অশ্ব পরিচালন আরম্ভ করিল, দেখিতে দেখিতে কুমার নগরের পূর্ব্ব দ্বার অতিক্রম করিলেন।

পথে পাছে কোন প্রতিকূল দর্শন হয়, এ নিমিত্ত রাজা শুদ্ধোদন পূর্ব্ব হইতেই নগর বাসীদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন, পরন্তু তত সতর্কতার মধ্যেও অবশ্যম্ভাবী প্রতিকূল দর্শন অনিবার্য্যরূপে উপস্থিত হইল। কোথা হইতে এক গলিতাঙ্গ বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে

অবতীর্ণ হইল। * অন্যান্য যাত্রীগণ অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে, সারথি বুদ্ধদেবকে লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে বুদ্ধের নয়নাগ্রে ঐ গলিতকায় বৃদ্ধ উদিত হইল। বুদ্ধদেব দেখিতেছেন——

"জীর্ণোবৃদ্ধো মহল্লকো ধমনীসন্তত‌গাত্রঃ
খণ্ডদন্তো বীনী নিচিত কায়ঃ পলিতকেশঃ
কুব্জো গোপানসী বক্রো বিভগ্নো দণ্ডপরায়ণঃ
আতুরো গত যৌবনঃ খুরখুরাবসক্তকণ্ঠঃ পুরতঃ
প্রাস্তায়েন কায়েন দণ্ডমবষ্টভ্য প্রবেধয়মানঃ
সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গৈঃ পুরতো মার্গস্যোপদর্শিতোঽভূৎ।"

[ললিত বি, ১৪ অ,।

এক জীর্ণ দেহ পুরুষ—তাহার সর্ব্বাঙ্গে সিরাজাল—দন্ত নাই, পড়িয়া গিয়াছে—শরীরের সমস্ত মাংস ও চর্ম্ম লোল, ঝুলিয়া পড়িয়াছে—কেশ সকল সাদা—মুখ খোদল—অঙ্গ সন্ধি যেন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে—যষ্টি অবলম্বন করিয়া হাঁটিতেছে—কুব্জ ও রুগ্ন—খক খক করিয়া কাসিতেছে, আর কুঁজো শরীর যষ্টিধারণ করিয়া অতি কষ্টে দেহভার বহন করিতেছে ও হাঁপাইতেছে বা কাঁপিতেছে।

এ ব্যক্তি কে, বোধিসত্ত্ব তাহা জানেন, জানিয়াও তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কিং সারথে! পুরুষ দুর্ব্বল অল্প স্থাম
উচ্ছুষ্ক মাংস রুধির ত্বচ স্নায়ুনদ্ধঃ।
শ্বেত শিরো বিরল দন্ত কৃশাঙ্গ রূপ
আলম্ব্য দণ্ড ব্রজতেঽ সুখং স্খলন্তঃ।"

সারথি, এ এত দুর্ব্বল কেন? অল্প বল অল্প বীর্য্য কেন? ইহার রক্তমাংস ও চর্ম্মে শুকাইয়া গিয়াছে কেন? মস্তক শ্বেত বর্ণ, দন্ত বিগলিত, অঙ্গ কৃশ, যষ্টির আশ্রয় লইয়া কেন এত কষ্টে গমন করিতেছে?

সারথি বলিল,—

"এষ হি দেব পুরুষো জরয়াভিভূতঃ
ক্ষীণেন্দ্রিয়ঃ সুদুঃখিতা বলবীর্য্যহীনো।
বন্ধু জনেন পরিভূত অনাথভূতঃ
কার্য্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনে চ দারু॥"

* বৌদ্ধেরা বলে এবং "ললিত বিস্তর" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঐ বৃদ্ধ প্রকৃত নহে, উহা বোধিসত্ত্বের প্রভাব বা দেবমায়া। বুদ্ধদেবের ইচ্ছানুসারে দেবগণ ঐরূপ মায়ামূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তদীয় নেত্রপথে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উহাই প্রব্রজ্যা করণের উপলক্ষ, এই অভিপ্রায়ে বুদ্ধ না কি ঐ মায়া চিন্তা করিয়াছিলেন।

কুমার! এই পুরুষ বৃদ্ধ হইয়াছে, জরা প্রভাবে জীর্ণ ও অভিভূত হইয়াছে, ইহার ইন্দ্রিয়গণ এখন নিস্তেজ ও ক্ষীণ, এ এখন বলবীর্য্য বিহীন ও অত্যন্ত দুঃখিত। এ এখন বন্ধু জন স্ত্রী পুত্র পরিবার কর্তৃক পরিভূত—তিরস্কৃত, সুতরাং অনাথ, যেমন বনস্থ জীর্ণ কাষ্ঠ অকর্ম্মণ্য, এও এখন তদ্রূপ অকর্ম্মণ্য।

বোধিসত্ব পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কুলধর্ম্ম এষ অচমস্য হিতং ভণাহি
অথচাপি সর্ব্ব জগতোঽস্য ইয়ংহ্যবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথ ভূত মেতৎ
শ্রুত্বা তথার্থমিহে যোনি সঞ্চিন্তয়িষ্যে॥"

সারথি! শীঘ্র বল, ঐরূপ হওয়া কি উহার কুলধর্ম্ম? অথবা সকল জগতের ঐরূপ অবস্থা? সত্য কথা শীঘ্র বল, শুনিয়া আমি অনুরূপ যোনির (উৎপত্তি স্থানের) বিষয় ভাবিব।

সারথি প্রত্যুত্তর করিল,—

"নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ
সর্ব্বে জগস্য জর যৌবন বর্ষয়াতি।
তুভ্যংপি মাতৃ পিতৃ বান্ধব জ্ঞাতি সঙ্ঘো
জরয়া অমুক্তং নহি অন্যগতি র্জগস্য॥"

কুমার! উহা উহার কুলধর্ম্ম নহে, দেশধর্ম্ম নহে, তোমার রাজ্যের ধর্ম্মও নহে। সকল জগতের ঐরূপ অবস্থা হয়—জরা জায়মান মাত্রেরই যৌবন নষ্ট করিয়া থাকে। তুমিও উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না এবং তোমার পিতা মাতা বন্ধু কেহই জরা মুক্ত নহে। জগতের গতিই ঐরূপ, অন্য গতি নাই।

শুনিয়া বোধিসত্ব বলিলেন,—

"ধিক্ সারথে! অবুধ বাল জনস্য বুদ্ধিঃ
যদ যৌবনেন মদত্তজরাং ন পশ্যো।
আবর্ত্তয়াশ্বিহরথং পুনরহং প্রচেক্ষ্যে
কি মহ্য ক্রীড়রতিভির্জরয়াশ্রিতস্য॥"

সারথি! অবোধ মুর্খ জনের বুদ্ধিকে ধিক! যেহেতু তাহা জরা না দেখিয়াই মাতিয়া উঠে। শীঘ্র রথ ফিরাও, ক্রীড়া সুখে আমার প্রয়োজন নাই। আমি পুনর্ব্বার পুরপ্রবেশ করিব। জরাগ্রস্থের আবার ক্রীড়া কি?

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পুরুষ দেখিয়া কুমার সিদ্ধার্থের চিত্ত বৈরাগ্য অধিক উদ্দীপ্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ তিনি সমাধি অবলম্বন করিয়া আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন এবং সারথিকে বলিলেন, রথ ফিরাও, আমি ক্রীড়া সুখ চাহি না। সে দিন আর তাঁহার উদ্যানে যাওয়া হইল না, প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া পুর প্রবেশ করিলেন।

কতিপয় অহ অতীত হইলে, পুনর্ব্বার রাজ আজ্ঞায় কুমারের উদ্যান যাত্রা বিহিত হইল। পুনর্ব্বার কুমার মহা সমারোহে আক্রীড় রথে আরোহণ পূর্ব্বক শাক্য মহা-নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া উদ্যানাভিমুখে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং পথি মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিকূল নেত্রগোচর হইল। দেখিলেন,—এক ব্যাধিগ্রস্ত মনুষ্য—তাহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত—শরীর বিবর্ণ জরাপ্রভাবে অভিভূত—দেহ বলহীন—সকল শরীরে আপনার বিষ্ঠামূত্রে ম্রক্ষিত—দুঃখে নিমগ্ন—উত্থান শক্তি নাই—অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। বুদ্ধদেব জানেন, তথাপি তিনি এই মৃতকল্প মনুষ্যকে দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কিং সারথে! পুরুষ রূপ বিবর্ণ গাত্রঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি বিকলো গুরু প্রশ্বসন্তঃ।
সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক উদরাকুল প্রাপ্ত কৃচ্ছ্র
মূত্রে পুরীষ স্বকি তিষ্ঠতি কুৎস নীরে?"

সারথি! একি! এ পুরুষকে? রূপহীন ও বিবর্ণ গাত্র এ পুরুষ কে? ইহার ইন্দ্রিয় সকল এত বিকল কেন? কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে কেন? ইহার অঙ্গ সকল শুষ্ক কেন? এত ব্যাকুল এত কষ্টদশা প্রাপ্ত কেন? কেন এ কুৎসিত বিষ্ঠা মূত্রে অনুলিপ্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে?

সারথি বলিল,—

"এষোহি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানো
ব্যাধী ভয়ং উপগতো মরণান্তপ্রাপ্তঃ।
আরোগ্যতেজহিতৎ বলবির্য্যহীনো
অত্রাণ বী প্ররারণো হ্যপরায়ণশ্চ।"

হে দেব! এব্যক্তি অত্যন্ত গ্লানিযুক্ত—ব্যাধিভয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মৃত্যু নিকট। এ পুরুষ আরোগ্য তেজ (কান্তি) রহিত ও বলহীন হইয়াছে। ইহার আর ত্রাণ নাই এবং এ শীঘ্রই অনাশ্রয় হইবে।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন,—

"আরোগ্যতা চ ভবতে যথ স্বপ্ন ক্রীড়া
ব্যাধির্ভয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ঘোররূপং।
কো নাম বিজ্ঞপুরুষো ইম দৃষ্ট বস্থাং
ক্রীড়া রতিঞ্চ জনয়েৎ শুভ সংজ্ঞিতাং বা?"

অরোগিতা স্বপ্ন ক্রীড়ার ন্যায় মিথ্যা। এরূপ ব্যাধি ভয় ও এরূপ ঘোর দুরবস্থা দেখিয়া, জানিয়া শুনিয়া কোন্ অভিজ্ঞ পুরুষ ক্রীড়াকে ভাল বলিতে পারে, সুখ মনে করিতে পারে এবং ক্রীড়ায় রতি বা আসক্তি জন্মাইতে পারে?

সারথি! রথ ফিরাও—আমি উদ্যান ক্রীড়ায় যাইব না।

এইরূপ সে দিনও ভগবান্ বোধিসত্ত্ব প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরপি পুর প্রবেশ করিলেন। পুনরপি কতিপয় অহ অতীত হইলে পুনর্ব্বার নগর যাত্রা অনুষ্ঠিত হইল। সে দিন ভগবান্ বোধিসত্ত্ব নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, হইবা মাত্র সে দিন অধিকতর অনিষ্ট দর্শন হইল। দেখিলেন, সম্মুখভাগে রোরুদ্যমান জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক এক শব-দেহ বাহিত হইতেছে। জ্ঞাততত্ত্ব শাক্য রাজা তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত থাকিয়াও সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কিং সারথে! পুরুষ মঞ্চোপরি গৃহিতো
উদ্ধৃত কেশ নখ পাংশু শীরে ক্ষিপন্তি।
পরিচারয়িত্ব বিহরন্তর স্তারয়ন্তো
নানা বিলাপ বচনানি উদীরয়ন্তঃ?"

সারথি! ও কি? কেন ঐ সকল পুরুষ এক নিস্পন্দ পুরুষকে খাটের উপর রাখিয়া লইয়া যাইতেছে? কেনই বা উহারা রোদন করিতেছে, কেশ লুঞ্চন করিতেছে, মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে, বক্ষে করাঘাত করিতেছে,এবং নানা প্রকার বিলাপ বাক্য বলিতেছে?

সারথি প্রত্যুত্তর করিল,——

"এযোহি দেব পুরুষো মৃত্যু জম্বুদ্বীপে
নহি ভূয় মাতৃ পিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্র দারাং।
অপহায় ভোগ গৃহ মাতৃ পিতৃ মিত্র জ্ঞাতি সংঙ্ঘং
পরলোকে প্রাপ্তু নহি দ্রক্ষতি ভূয় জ্ঞাতিং।"

রাজন! এ পুরুষ মৃত হইয়াছে, এ আর পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র দেখিবে না। এ ব্যক্তি ভোগ, গৃহ, পিতা, মাতা, বন্ধু ও জ্ঞাতিগণ পরিত্যাগ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, পুনর্ব্বার এ জ্ঞাতিগণ দেখিতে পাইবে না।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন,—

"ধিক্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্য ধিক্ বিবিধ ব্যাধি পরাহতেন।
ধিক্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন
ধিক পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গঃ।"

"যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যুঃ
তথপিচ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্দং ধরন্তো
কিং পুন জর ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবদ্ধাঃ
সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং।"

যাহা জরায় অভিদ্রুত হয়—গলিয়া যায়, তাদৃক্ যৌবনকে ধিক্! যাহা নানা প্রকার ব্যাধিতে পরাহত—তাদৃশ আরোগ্যকেও ধিক্! যাহা চিরস্থায়ী নহে—ক্ষণ-ভঙ্গুর—তাদৃশ জীবনকে ও ধিক্! এবং পণ্ডিতগণের অভিজ্ঞগণের রতি প্রসঙ্গকেও ধিক্!

যদি জরা না হয়, ব্যাধি না হয়, মৃত্যু না হয়, তথাপি মহান্ কষ্ট—মহাদুঃখ—জীব কেন না পঞ্চস্কন্ধ ধারী। * যখন জরা ব্যাধি না হইলেও দুঃখ—তখন আর জরা-ব্যাধি-গ্রস্তের ত কথাই নাই। সারথি! রথ ফিরাও—আমি আর উন্মত্ততার পথে যাইব না। আমি প্রতিনিবর্ত্ত হইয়া উত্তমরূপে মুক্তি চিন্তা করি।

এইরূপে সে দিনও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার একদিন পুর নির্যানকালে পথিমধ্যে এক প্রশান্ত ভিক্ষুমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, † দেখিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কিং সারথে! পুরুষ শান্ত প্রশান্তচিত্তো
নোৎক্ষিপ্তচক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী
কাষায়বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী
পাত্র গৃহীত্ব ন চ উদ্ধত উন্নতো বা।"

সারথি! ঐ শান্ত ও শান্ত-চিত্ত পুরুষকে? উঁহার চক্ষু উৎক্ষিপ্ত হইতেছে না—— ও সমদৃষ্টি যুক্ত এবং চারিহস্ত মাত্র দেখিয়া গমন করিতেছেন, উনি কে? পরিধান কাষায় বস্ত্র, চর্য্যায় সুপ্রশান্ত, হস্তে একটী জলপাত্র মাত্র, উদ্ধত ও উন্নত নহেন—উনিকে?

সারথি বলিল,——

"এষোহি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষু নামা
অপহার কামরতয়ঃ সুবিনীত চারি।
প্রব্রজ্য প্রাপ্তঃ সমমাতন ন এষ মাগো
সংরাগদ্বেষ বিগতো তিষ্ঠতি পিণ্ডচর্য্যা।"

হে যুবরাজ! ঐ পুরুষ ভিক্ষু, উনি কাম ও রতি পরিত্যাগ করিয়া বিনীত-চারী হইয়াছেন। সন্যাস বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া আত্মার সমত্ব ইচ্ছা করিতেছেন। উঁহার রাগ ও দ্বেষ কিছুই নাই, উনি কেবল মাত্র পিণ্ডচর্য্যায় অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ গ্রাস মাত্র আহার ইচ্ছা করেন, অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এবার বোধিসত্ত্ব প্রফুল্ল মুখে বলিলেন,—

"সাধু সুভাষিত মিদং মম রোচতে চ
প্রব্রজ্য নাম বিদুভিঃ সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতঞ্চ যত্র
সুখ জীবিতং সুমধুর মমৃতং ফলঞ্চ।"

---

* এই পঞ্চ স্কন্ধ ও তদনুগত দুঃখ বুদ্ধের ধর্ম্ম নির্ণয় প্রস্তাবে বলা যাইবে।
† বৌদ্ধেরা বলে, এ মূর্ত্তিও মায়া মূর্ত্তি।

সাধু সারথি! সাধু! উত্তম কথাই বলিয়াছ। ইহাতেই আমার রুচি, ইহাই প্রশংস্য। বিদ্যান্ পুরুষেরা প্রব্রজ্যাকে নিরন্তর প্রশংসা করিয়াছেন। যাহাতে আত্ম-হিত পরহিত উভয়ই আছে, যে জীবন সুখ জীবন, যাহার ফল সুমধুর ও অমৃত (অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয়,) সেই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্যাস অভিজ্ঞগণের সর্ব্বদা প্রশংস্য। রথ ফিরাও—আমিও এই পথ আশ্রয় করিব।

শাক্যসিংহ আজ নিতান্ত বিষণ্ণ—পুরনির্যান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিরন্তরিত বৈরাগ্য-ভার বহনের সঙ্কল্প ধারণ করিলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত খেদ প্রাপ্ত হইলেন, পুরমধ্যে ক্রমে হাহাকার কারিত, সন্তাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যাহাতে পুর-বহির্গত হইতে না পারেন, পুনরপি তাহার দৃঢ় উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি রাজ-পুরুষদিগকে পুররক্ষার্থ ও পুত্ররক্ষার্থ আদেশ প্রদান করিলেন, করিলে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

"ভূয়স্যা মাত্রয়া বোধিসত্বস্য পরিরক্ষণার্থং
প্রাকারান্ মাপয়তে স্ম। পরিখাঃ খানয়তি স্ম।
দ্বারানি চ গাঢ়ানি কারয়তি স্ম। আরক্ষান্
স্থাপয়তি স্ম। শূরাং খোদরয়তি স্ম। চতুর্ষু
নগর দ্বারেষু চ পুরো মহাসেনা ব্যূহান্ স্থাপয়তি স্ম।
বোধি সত্বস্য পরিরক্ষণার্থং। য এনং রাত্রিন্দিবং
রক্ষন্তি স্ম। যা বোধি সত্বোঽভিনিক্রমিষ্যতীতি।
অন্তঃপুরে আজ্ঞাং দদাতি স্ম মাস্ম কদাচিৎ
সঙ্গীতিং বিচ্ছেৎস্যথ। স্ত্রী মায়াশ্চোপদর্শয়ত
নিবধ্নীত কুমারং যথানুরক্তচিত্তো ন নির্গচ্ছেৎ প্রব্রজ্যায়ৈ।"

বোধিসত্ত্বের রক্ষার্থ প্রাকার সকল উচ্চ হইতে উচ্চতর করা হইল। পরিখা সকল খানিত হইল, দ্বার সকল দৃঢ় করা হইল, রক্ষি পুরুষ স্থাপিত হইল, নগর দ্বারে সেনা-ব্যূহ স্থাপিত হইল—তাহারা দিবা রাত্র অতন্দ্রিত হইয়া বোধিসত্ত্বের রক্ষার্থ জাগরিত থাকিল। অন্তঃপুরমধ্যে আজ্ঞা প্রচার হইল যে, ক্ষণকালের নিমিত্তেও যেন সঙ্গীত-বিচ্ছেদ না হয় এবং স্ত্রীমায়া প্রদর্শিত হউক। কুমার যাহাতে স্ত্রীমায়ায় বদ্ধ হইয়া নিবিষ্ট চিত্ত থাকে, প্রব্রজ্যার নিমিত্ত বহির্গমন না করে, সতত তাহারই চেষ্টা করা হউক।

কথিত আছে যে, ঐ দিন শাক্য-মহানগর কুমারের নিষ্ক্রম-শঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল এবং সর্ব্বশাক্যগণ মিলিত হইয়া দিবা রাত্র অতন্দ্রিত চিত্তে, ভীত, ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে অতিবাহন করিয়াছিল।

শ্রী রামদাস সেন।

ধীরে-ধীরে।

কাছে এসে, আধ পথে কি ভাবিয়ে ফিরে যায়,
মরমে উঠিয়ে সাধ, প্রকাশিতে মরে যায়।
বলি বলি করি কথা, রজনী হইল ভোর,
চেয়ে চেয়ে—চেয়ে পথ, চোখে এল ঘুম ঘোর।
বাতাসের সাড়া পেলে—চমকি দূরেতে যায়,
মনে কি বুঝেনা মন—আপনা চেনেনা হায়!
ফুটেছে মল্লিকা নব, ছুটেছে দক্ষিণা বায়
প্রকৃতি কুন্তল মাজি, কুসুমে সাজায় কায়।
কোকিল কুহরে কুহু পরাণে প্রেমের ঘোর,
বসন্তের অনুরাগে শীতের যামিনী ভোর।
তবে—চরণের শত বাধা ফেল ফেল খুলে দূরে,
আঁখিতে রাখিয়া আঁখি, দেখ সারানিশি ভরে।
যে কথা রয়েছে ঢাকা, বলগেয়ে মৃদুগান,
হৃদয় দুয়ার খুলে প্রাণে তুলে লও প্রাণ।
আশার স্বপনে থেকে, বহিয়ে যে গেল বেলা
কখন খেলিবে আর সাধের প্রাণের খেলা?
দিগন্ত আঁধার করে আসিছে তামসী নিশি
এই বেলা ধীরে ধীরে পরাণেতে যাও মিশি।

শ্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

রফে বাট-পাড়।

যশহর জেলার অন্তঃপাতী প্রসন্নসলিলা-স্রোতস্বতী চিত্রার তীরবর্ত্তী "তারাশী মাগুরা" নামক কোন এক সামান্য পল্লীতে এই সুবিখ্যাত দস্যু জন্ম গ্রহণ করে। এই স্থানে অদ্যাপি রফি মামুদের বাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, নড়াইল মহকুমা হইতে এই স্থান অনুমান প্রায় ৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ দীঘাপতিয়ার যশহর-জমিদারী কাছারি বুনাগাতি হইতে ১৷৹ দেড় ক্রোশ দক্ষিণে। নিবিড় জঙ্গলময় স্থান এখনও চতুর্দ্দিকে পরিখা পরিবেষ্টিত, আমরা এক সময় পরীক্ষাচ্ছলে পরিখার মধ্যস্থ জল

মাপিয়া দেখিয়াছিলাম চৈত্র মাসে ও উহাতে ৭।৮ হাত জল বর্ত্তমান থাকে। জঙ্গল ভেদ করিয়া অতি কষ্টে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইলাম উহার মধ্যে এখন ও উচ্চ উচ্চ ভিটা আছে, দেখিলে বোধ হয় যেন বহু সংখ্যক গৃহ একদিনে বিনষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে স্তূপাকার ইষ্টকও দৃষ্ট হইল। এই মাগুরার নিকটবর্ত্তী লোকে কহিয়া থাকে, এখনও ঐ বাটীর মধ্যে রাত্রে লোকে লাঠি খেলা করে—তাহাদের কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই স্থানের দস্যু-ভীতি এত প্রবল যে এই বর্ত্তমান ইংরেজ শাসনেও লোকে রাত্রিকালে এইস্থানে যাইতে ভয় করে। ইহার তিন দিকে বিস্তৃত মাঠ, তবে আজকাল "জহরপুর, ধেড়েঘাটা" প্রভৃতি কয়েকটী সামান্য গ্রাম বসিয়াছে। এই বাটীর অন্যূন ১॥ ক্রোশ পশ্চিমে "আগড়া" গ্রামে রফি মামুদের বংশাবলি অদ্যাপি বাস করিতেছে, ইহারা এখন ও এতদ্দেশে খুব গণ্য-মান্য-মুশলমান। শুনিয়াছি এই গ্রামের "রমজান খাঁ" নামক জনৈক লাঠিয়াল ওরফে দস্যু, নড়াইল-জমিদার-বংশের আদিপুরুষ মহাত্মা "কালীশঙ্কর" রায়ের দক্ষিণ হস্ত ছিল। যৎকালে কালীশঙ্কর "চাকলা ভূষণার" নায়েব ছিলেন তখন একদিন বিখ্যাত রফি মামুদ তাঁহার কাছারি বাটীতে ডাকাইতি করিতে যায়, কিন্তু কৃত কার্য্য হইতে পারে না। প্রবাদ আছে কালীশঙ্করের পাচক ব্রাহ্মণ একদিন মামুদপুরে পিত্তলের একটী ঘড়া পাইয়াছিল, উহাতে ৫০০ শত মুদ্রা ছিল। দেশে এই কথা লক্ষাধিক মুদ্রা বলিয়া প্রচারিত হইল। এই জন্য দস্যু-দল কাছারি আক্রমণ করিলে এক জন লাঠিয়াল তাহার বিপক্ষতা করিয়া প্রবেশ করিতে দেয় নাই, বহু ক্ষণ যুদ্ধের পর রফি মামুদ স্বয়ং উপস্থিত হইল, তথাপি কালীশঙ্করকে পরাস্থ করিতে পারিল না, তখন দস্যুপতি সন্তুষ্ট হইয়া কালীশঙ্করের বশ্যতা স্বীকার করিল এবং উপঢৌকন স্বরূপে বিখ্যাত "রমজান খাঁকে" (তাহার পুত্রকে) দিয়া গেল। এই ব্যক্তির লাঠির উপর ভর করিয়া কালীশঙ্কর "ছাপ্পান্ন মৌজা" অধিকার করিয়াছিলেন।

এদিকে রফি মামুদ সর্ব্বদা দস্যুতা অবলম্বন করিয়া জীবন কাটাইত। যশহর, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, বারাসাত প্রভৃতি প্রদেশ ইহার দস্যুতার তলে অবস্থিতি করিত। তৎকালে দেশ একরূপ অরাজক ছিল, ইংরেজগণ তখনও দেশে শান্তি বিস্তার করিতে পারেন নাই। সর্ব্বত্রই চোর ডাকাইতের উপদ্রব ছিল। সেই হইতেই অনেকানেক বিখ্যাত দস্যুর নাম আমরা বঙ্গের অনেক স্থানে শুনিতে পাই। রংপুরের স্বনাম-খ্যাত "দেবী চৌধুরাণী" ও "ভবাণী পাঠক", নদীয়ার "বিশ্বনাথ বাবু", বারাসাতের "ক্ষেমি বাট পাড়নী", বাখরগঞ্জের "হকি তুল্যা", যশহরের "রফি মামুদ", একই সময়ের লোক। ইহাদের অনেকের সঙ্গে অনেকের মিল ছিল। জন-প্রবাদের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় বিশ্বনাথ বাবু ও ক্ষেমি বাটপাড়নী রংপুরে দেবী চৌধুরাণী ও ভবানী পাঠক নামে অভিহিত, সত্য মিথ্যা জানি না, আর পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবু তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। হাণ্টার সাহেবও সে বিষয় অনভিজ্ঞ। তবে শুনিয়াছি বিশ্বনাথ বাবু ক্ষেমি

বাট পাড়নী ও রফি মামুদ এক দল ভুক্ত। এক জন উপন্যাস লেখক রফি মামুদের নাম অনেক পুরাতন কালের গল্প মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক রফি মামুদ ইংরেজ শাসনের অল্প পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত ছিল। বঙ্গের ঐতিহাসিক সত্য অনেকাংশে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অধুনা অনেকাংশ জন প্রবাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাহাই সত্য বলিয়া অনুমানিত হয়। এই রফি মামুদের বৃত্তান্ত অনেক স্থলে জন-প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইল এবং কতক অংশ আধুনিক প্রমাণ সিদ্ধ। যে সময় যশহর প্রভৃতি পূর্ব্ব অঞ্চলে ইংরাজ রাজ্য-শাসন-প্রণালী বিস্তার করিল সেই সময় এই দস্যুদল-অধিপতি-গুলি কেহ তাড়িত, কেহ প্রাণে দণ্ডিত, কেহ পলায়িত হইয়াছিল। শুনা যায় "আসান্নগরের" মাঠে বিশ্বনাথ বাবুর কাশি হয় এবং এতদ বিষয়ে অনেক শ্লোক আছে, যথা * * * * "ওরে রফি দেখে যা * * * * কি দশা যে হ'লো আশা নগরের মাঠে আশা ফুরাইল।

বিষ্ণু বাবুর প্রাণ গেল হাপসে পড়িয়া,
ক্ষেমি ঠাকুরাণী পলাইল ফিরিঙ্গি দেখিয়া,

ওরে রফি দেখে যা" * * * * * ইত্যাদি প্রকার শ্লোক এখনও প্রাচীনদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি বর্ত্তমান কৃষ্ণগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসনের দুই ক্রোশ পশ্চিমে যে মাঠ আছে উঁহার নাম আশান্নগর। পূর্ব্ব অঞ্চলে লোকে গল্পচ্ছলে কহিয়া থাকে বিশ্বনাথ বাবু একদিন দস্যু-শ্রেষ্ঠ রফি মামুদকে বর্ত্তমান "বাগের হাট" মহকুমার নিকটবর্ত্তী হাউলি পরগণায় "খাঞ্জানীর" বাটী লুঠ করিতে পাঠাইয়াছিল। তখন বাথরগঞ্জের "হকিতুল্যা" তাহার গতিরোধ করে, কারণ তাহার অধিকৃত দস্যু রাজ্য অন্যে অধিকার কেন করিবে—এই তার মর্ম্ম; ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে তৎকালিক দস্যুরা এক এক জনে এক এক প্রদেশের কর্ত্তা ছিল। তাহারা সাধারণতঃ কৃপণের ধন লুণ্ঠন করিত। পত্র দ্বারা অগ্রে গৃহ স্বামীকে জানাইয়া তবে তাহার বাটীতে ডাকাইতি করিত—প্রকৃত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া দস্যুতা করিত। অকারণে কাহাকেও প্রাণে মারিত না—কিন্তু একটু ঔদ্ধত্য ভাব প্রকাশ করিলে মশালের আগুণে পর্য্যন্ত শরীর পুড়াইত। রফি মামুদ ডাকাইতি করিত বটে, কিন্তু তাহার এই ঘোর কঠিন হৃদয় মধ্যে সদতা প্রভৃতি উচ্চ প্রকৃতি ছিল। শুনিয়াছি এক দিন এক জন ব্রাহ্মণ, কন্যা-ভার গ্রস্থ হইয়া ভিক্ষা করিয়া কতকগুলি অর্থ সংগ্রহ করে, পরে বাটী আসিতে পথে রাত্র হয়, সেই সময় লোকে ব্রাহ্মণকে কহিল "ঠাকুর সাবধান, রফে বাট-পাড় যেন ডাকাইতি করিয়া না লয়" ব্রাহ্মণ ভয়ে ভয়ে যাইতেছিলেন। কিন্তু "যে যত ভয় করে তাহার ততই ভয় হয়" এই কথা যথার্থ প্রমানিত হইল। "যেখানে বাঘের ভয় সেই খানে রাত্র হয়" ব্রাহ্মণের ভাগ্যে তাহাই হইল। আসিতে আসিতে তিনি রফি মামুদের বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রফি জিজ্ঞাসা

করিল "কোথা যাইবে" ? রফির নাম করিয়া ব্রাহ্মণ বাপান্ত করিয়া গালি দিল। রফি তখন কহিল ভয় নাই "আমার সঙ্গে আইস, আমি রফি মামুদ"। অমনি ব্রাহ্মণের শরীর শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু রফি মামুদ তাহাকে রাত্রে নিরাপদে রাখিয়া আরো শতাধিক মুদ্রা দিয়া বিদায় করিয়া দিল। এইরূপ উচ্চ অন্তঃকরণের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। রফি মামুদ প্রভৃতি দস্যুগণ অরাজকতার সময় দেশের ধন লুঠ করিয়াছে বটে, কিন্তু কৃপণের ধন লইয়া দরিদ্রকে বিতরণ করিয়াছে, জমিদারের লোকে প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করিলে তাহাদের শাসন করিয়াছে, তখন তাহারাই দেশের কর্ত্তা ছিল। এই জন্য এই সকল দস্যুদিগের নাম ইতিহাসে উঠিবার যোগ্য। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে লাঠিই প্রধান অস্ত্র ছিল তাহারি বলে দেশ শাসিত হইত, কিন্তু কালে সেই লাঠি বিলাসীর হাতের শোভার বস্তু হইয়াছে। দেশের সে অবস্থা নাই, সে সমস্ত লোকও নাই, সে ভাবও নাই। এখন দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে বটে, কিন্তু সেই ঘোর অশান্তির সময়ও বঙ্গদেশে সুখ ছিল দেশের সম্পত্তি দেশে থাকিত। হায় আর কি ঘরের টাকা ঘরে থাকিবে! দস্যুরাও এখন আমাদের স্মরণীয় বাঙ্গালীর মধ্যে গণ্য হইয়াছে, কেননা আত্মীয় আর পর এই প্রভেদ। রফি মামুদ দস্যু বটে কিন্তু তবুও তাহার নাম করিলে এই দুর্ব্বল-হৃদয়ে কেমন এক প্রকার অননুভবনীয় আমোদ উপস্থিত হয়।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

সহজে গান অভ্যাস।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগশ্রী—চৌতাল।

ধন্য সেই সাধু সেই জ্ঞানী যে শুদ্ধ বুদ্ধ সত্যে ধ্যায়ে নিয়ত।
কত তার আনন্দ তাঁরে পাইয়ে অন্তরে॥

রাগশ্রী—চৌতাল।

৭ ০ ১ ০ ২ ৩ ৪
সা০রি০—স্‌রি—পা০মা০পা—০পা০। পা——ম্‌পা—পা—ম্‌পা——। পা০মা০—
ধ ন্য সে ই সা ধু সে

০ ১ ০ ২ ৩ ৪ ০
ধ—নী—ধ০মা০পা—। ধ০মা০গা—মা—গা—রি—০সা০। সা০রি০—স্‌রি—পা০মা০
ই জ্ঞা নী যে শু দ্ধ বু

১ ০ ২ ৩ ৪ ০ ০ ১ ০
ধা—মা—। গা——রি—গা—রি—সা—। সা——ন্‌সা—রি—পা—ম্‌পা। গা—
ন্ধ স ত্যে ধ্যা য়ে নি

২ ৩ ৪ ০ ১ ০ ২
রি——সা—ন্‌সা—সা—। সা॰রি॰—স্‌রি—পা॰মা॰পা—॰পা॰। পা——ম্‌পা॰—পা—
য় ত ধ ন্য সে ই সা ধু

৩ ৪ ০ ১ ০ ২ ৩
ম্‌পা——। পা॰পা॰॰মা॰ধ॰পা॰সা—ন্‌সা—।—রি॰সা॰—ন্‌সা—সা—ন্‌সা—সা—।
ক ত তাঁ র আ ন ন্দ

৪ ০ ১ ০ ২ ৩ ৪
ন্‌সা—সা॰নী॰—সা—রি—স্‌রি—। সা—নীসা—রি—নী—ধ—মাপা—। রি——
তাঁ রে পা

০ ১ ০ ২ ৩ ৪
সা—ন্‌সা—রি—নী—। ধ—মাপা—পা॰মা॰ধ॰পা॰প্‌সা—ন্‌সা—। পা॰মা॰ধ॰ম॰

০ ১ ০ ২ ৩
গা—রি—পা—মাপা—। গা—রি——সা—নীসা—সা—॥
ই ইয়ে অ ন্ত রে।

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

——*——

কুড়ানো।

একজন বাঙ্গালী আর একজনকে সগর্ব্বে বলিতেছিল "জান ভাই, আমাকে একদিন একটা লোক কেশববাবু বলে ভ্রম করেছিল—" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "তবেত ভারী! আমাকে এক দিন একজন কি বলেছিল জান?"

প্রথম। কি কি?

দ্বিতীয়। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একজন এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বল্লে—হা হরি—তুমি যে—"।

একজন ইংরাজ ও একজন আমেরিকান—বাজি রাখিয়া গল্প করিতে বসিল—কে কত গল্প সাজাইয়া বলিতে পারে।

আমেরিকান তাহার গল্প শেষ করিলে ইংরাজ বলিতে আরম্ভ করিলেন—"জান ভাই আমি আমেরিকা গিয়া সেখানকার অসভ্য-জাতি কর্ত্তৃক একদিন আক্রান্ত হইয়াছিলাম।

আমি দেখিলাম আমার সম্মুখে সাত্ত সহস্র শস্ত্রধারী অসভ্য, হুহুঙ্কারে বিদ্যুৎ বেগে আমার উপর আসিয়া পড়িতেছে, আর আমার পশ্চাতে, কুলকিনারা বিহীন—সমুদ্র তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে--দেখিলাম সম্মুখেও মৃত্যু, পশ্চাতেও মৃত্যু—কি করিব ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলাম—”

আমেরিকান। (সৌৎসুক্যে) তাপর কি করলে তবে? কি করলে!

ইংরাজ। “কেন একজন বীর ব্রিটিসের ন্যায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিলাম।

আমেরিকান হার মানিল।

দোতালার একটি ঘরে দুমদুম করিয়া মহা শব্দ হইতে ছিল, তাহার নীচের ঘরে যিনি বসিয়াছিলেন তিনি ব্যাপার কি দেখিতে উপরে ছুটিয়া গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একজন লোক মত্ত অবস্থায় দেয়ালে একটা করিয়া লাইন কাটিতেছে,আর হাঁচড় পাঁচড় করিয়া তাহার উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছে ও পড়িয়া যাইতেছে। আগন্তুক আসিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ব্যাপারখানা কি?” সে এড়ানস্বরে বলিল—“একজন আমাকে বলেছে যে মাটীর উপর সোজা একটা লাইন কেটে তার উপর দিয়ে যদি কেউ সোজা চলে যেতে পারে—তাহলে সে মাতাল হয়নি—আমি তাই পরীক্ষা করে দেখছি।”

সম্প্রতি জর্ম্মানীতে এক মেলা হয়, তথায় ঐদেশীয় একটি বাবু নূতন নূতন ফেশনের পোষাক পরিয়া, স্বর্ণমণ্ডিত একগাছি ছড়ি হস্তে বেড়াইতেছিলেন। এক ভিক্ষুক এক লাঠির উপর ভর দিয়া অতি কষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা যাচ্ঞা করিল। বাবুটি দয়াশীল, পকেট হইতে একটি রৌপ্য-মুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে দান করিলেন। তৎক্ষণাৎ, “মশাই কল্লেন কি, ও কি খোঁড়া? ও আদত জোচ্চোর, আপনার ছড়িগাছটা দিনত আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি” বলিয়া নিকটবর্ত্তী জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার হাত হইতে সেই ছড়ি গাছটি লইয়া ঐ ভিক্ষুককে মারিতে উদ্যত হইলেন। যে ইতি পূর্ব্বে প্রায় নড়িতে পারিতেছিল না—সে ঐ ভদ্র লোকটির কথা শুনিয়াই দৌড় মারিল, তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিলেন। গোলমাল হইয়া উঠিল, বাবুটির নিকট বিস্তর লোক আসিয়া জুটিল। কিন্তু ঐ ভিক্ষুককে মারিবার জন্য ভদ্রলোকরূপী যে লোক বাবুটির হস্ত হইতে স্বর্ণমণ্ডিত ছড়িগাছটি গ্রহণ করে সে আর ফিরিল না। বাবুটি মাথা হেঁট করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীম-কোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহারাজা নন্দকুমারের অভিযোগ পত্র কৌন্সিলে ফ্রান্সিস্ সাহেব পেশ্ করিলে—হেষ্টিংস সেই সময়ে তৎসম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন—তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি ক্রোধোন্মত্ত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন—"ফ্রান্সিস্ সাহেবকে দিয়া এই পত্র পাঠাইবার চেষ্টা করাতে নন্দকুমার অতিশয় ঔদ্ধত্য ও প্রগল্‌ভতা দোষে দূষিত হইয়াছেন। ফ্রান্সিস্ সাহেবের পক্ষেও এই কার্য্য অসম্মান সূচক—তিনি রাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী হইয়া, প্রধান মন্ত্রী-সভার সদস্য হইয়া কি প্রকারে এই প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আত্মপদোচিত-সম্মান কলুষিত করিলেন? নিজে এই অভিযোগ পত্র হাতে করিয়া না আনিয়া যদি কোন হরকরা দ্বারা বোর্ডে এই কাগজ পাঠান হইত, তাহা হইলেই প্রকৃত আইনমতে কার্য্য হইত।" ফ্রান্সিস্ এতদুত্তরে যাহা বলিলেন, তাহাতে হেষ্টিংসের আপত্তি খণ্ডন হইল—তিনি বলিলেন "নন্দকুমার ধনে, মানে, বংশগৌরবে, ও পদগৌরবে দেশের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার নিকট হইতে এই প্রকার অভিযোগ পত্র গ্রহণ করাতে কোন দোষই হইতে পারে না।" এ আপত্তি খণ্ডন হইলে মন্সন সাহেব নন্দকুমারকে তাঁহার প্রার্থনা মতে যখন সেই স্থানে উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন হেষ্টিংসের ক্রোধ-বহ্নি গভীর গর্জ্জনে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বালকের ন্যায় কর্ত্তব্য বুদ্ধি হীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইল—বিকল চিত্তে সেই সময়ে যাহা বলিলেন ও করিলেন—তাহাতে তাঁহার দোষ প্রমাণের পথ আপনাআপনি সরল হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন—"মন্সন সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই আমি বলিয়া রাখিতেছি—এই মন্ত্রী সভার সম্মুখে আমি অপরাধীর ন্যায় কখনই বসিতে পারিব না ও নন্দকুমার আমার অভিযোক্তারূপে এইস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইবে—ইহাও আমি সহ্য করিব না। আমি জানি—কি করিলে আমার পদোচিত-সম্মান অক্ষত থাকিবে। এই বোর্ডের সদস্যগণ যে আমার অপরাধের বিচার করিতে সক্ষম * ও আমি যে তাঁহাদের সম্মুখে অপরাধীর

---

* কৌন্সিলের মেম্বরগণের বিচারকরূপে উপবিষ্ট হইতে ক্ষমতা ছিল না বটে, তত্রাচ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়া যথার্থতা অনুসন্ধান করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল; কিন্তু হেষ্টিংস ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। ডাইরেক্টারদিগের নিম্নলিখিত উপদেশটি পড়িলে আমাদের বোধ হয় হেষ্টিংসের কার্য্যে অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের বিলক্ষণ ছিল। হেষ্টিংসের নামে না হইয়া যদি কৌন্সিলের কোন সদস্যের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত হইত, তাহা হইলেও হেষ্টিংস প্রভৃতি তাহাতে অনুসন্ধায়করূপে উপবিষ্ট হইতে পারিতেন। আদেশটি এই "They (The Govt: and Council) are directed immediately to cause the strictest enquiry to be made into all oppressions which might

ন্যায় উপবিষ্ট হইতে বাধ্য—ইহা আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করি না।" ইহার পর তিনি কৌন্সিলের সভ্যগণকে এই কার্য্যে লিপ্ত থাকার জন্য কটু ভৎর্সনা করিলেন—তাঁহারা এই অভিযোগ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া যে একটি মানহানিকর-ব্যাপারে (Libel) হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—তাহাও বলিলেন। এই সময়ে তাঁহার মস্তিষ্ক ও মনোবৃত্তি সমস্ত আর ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল—সুতরাং এবারে তিনি নন্দকুমারের উপর গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"এই রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী ও আপনাদিগের উর্দ্ধতম পদবীর লোক হইয়া আমি এই হতভাগ্য দুরাচারের সম্মুখে অপরাধী বেশে দণ্ডায়মান হইব—ইহা কি আপনাদের ইচ্ছা ? এ লোক কে তাহা কি আবার প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে ? এই নন্দকুমার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্য হইতে সাক্ষ্য সংগ্রহ † করিয়া আমার চরিত্র ও কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—আমি কি এই সমস্ত নীচ প্রকৃতি লোকের সমক্ষে আমার চরিত্র সাফাই করিবার জন্য এই স্থানে বসিয়া বসিয়া জোবানবন্দী শুনিব—ইহা কি আপনাদের ইচ্ছা ? আপনারা যদি আমায় অপরাধী প্রমাণ করাইতে এত দূর ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তবে একটি সমিতি সংগঠন করিয়া কার্য্যারম্ভ করুন—নন্দকুমারকে এইস্থলে আনিয়া আমাকে অপরাধীরূপে বসাইয়া বিচার করিতে আপনাদের কোন ক্ষমতাই নাই। আমাকে অপমানিত করা ভিন্ন ইহার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না।"

এই কথাগুলির অর্থ সোজা কথায় বুঝিতে গেলে এই বুঝায়—যে হেষ্টিংসের ন্যায় উচ্চকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রকার অপরাধ কখন প্রযুজ্য হইতে পারে না ও নন্দকুমারের ন্যায় নীচ লোকে তাঁহার ন্যায় উচ্চকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ

---

have been committed either against the Natives or Europeans, and in the all abuses that might prevail in the collection of Revenues or any part of the Civil Government of the presidency, and to commit to the Directors all informations which they might be able to obtain relative there to, or *any dissipation or embezzlement of Company's money.*"

Vide—35 Art of Instructions given to the Governor in Council by the Directors of the Hon'ble East India Company.

† হেষ্টিংস বলিয়াছেন নিম্নশ্রেণীর লোক হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে—একথা সম্পূর্ণ-অমূলক। আমরা যদি ভুল না বুঝিয়া থাকি, তবে নিম্ন লিখিত কয়েক ব্যক্তি নন্দকুমারের পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। (১) বর্দ্ধমানের রাণী (রাজা ত্রিলোকচন্দ্রের বিধবা পত্নী) (২) রাধা চরণ (নবাবের কর্ম্মচারী) (৩) মিঃগ্রাণ্ট (সিবিলিয়ান) (৪) মিঃফাউক (সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী) (৫) কমলউদ্দিন। (৬) নরসিং ও কান্তবাবু (৭) গবর্ণরের খানসামা ও নন্দকুমারের ও জগৎ চাঁদের নিজ ভৃত্যগণ। ধরিতে গেলে ইহাদের প্রথম চারিজন কি মোহনপ্রসাদ অপেক্ষা নীচ ?

আনিতে পারে না। হেষ্টিংস নন্দকুমারের সম্বন্ধে উল্লিখিত কটু কাটব্য প্রয়োগ করিলে যখন সভ্যগণ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এই নন্দকুমারকেই তিনি পূর্ব্বে উপযুক্ত বোধে বিশ্বস্ত রাজকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বোধে বরাবরই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, আজ সেই ব্যক্তি তাঁহার নিকট নীচ হইয়া পড়িল—ইহা কি প্রকারে সম্ভব? ইহার উত্তরে হেষ্টিংস বলিলেন—নন্দকুমারকে নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোন হাত থাকিলে তিনি এরূপ কার্য্য করিতেন না; ডাইরেক্টারদিগের আদেশ অনুসারেই তিনি এইরূপ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ডাইরেক্টারেরা যে ব্যক্তির প্রতি কোন দুরূহ ও গোপনীয় কার্য্যের জন্য বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, হেষ্টিংস তাঁহাদের নিযুক্ত কর্ম্মচারী হইয়া সেই ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপনে দ্বিধা করিতেন। এই প্রকার কার্য্য দ্বারা যে নন্দকুমারের কৃতিত্ব লোপ হইয়া গেল, তাহা নহে। ডাইরেক্টারদিগের আজ্ঞানুসারে হেষ্টিংস নন্দকুমারকে মহম্মদরেজাখাঁর দোষোদ্ঘাটন কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় কখন কি নন্দকুমারকে উচ্চ রাজকর্ম্মে নিয়োগ করেন নাই? মহারাজা নন্দকুমারকে যে সময়ে বাঙ্গালার নবাবের প্রধান মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল—যে সময়ে তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে নিজামতের নায়েবী প্রদান করিয়া নন্দকুমারের হস্তেই প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল—যে সময়ে তিনি নন্দকুমারের চরিত্রের উৎকর্ষতা দেখাইবার জন্য এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া তাঁহাকে মহৎ চরিত্র দিয়াছিলেন, সে সময়েও কি ডাইরেক্টারেরা তাঁহাকে সেইরূপ করিবার জন্য উপদেশ পাঠাইয়াছিলেন? এই সকল কার্য্য কি তিনি স্বেছায় ও নিজের ঝুঁকিতে করেন নাই? যে নন্দকুমার কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার নিকট অতিশয় বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছিলেন, আজ যে কি কারণে সহসা তিনি "দুরাচার" "হতভাগ্য" হইয়া উঠিলেন, ইহা অনুমান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই সময়ে শুনিতে পাই ডাইরেক্টারেরাও নাকি নন্দকুমারকে এই উচ্চ রাজকার্য্যের সমস্ত ক্ষমতা দিয়া নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা থাকিলে তিনি কোন না কোন ভীষণ চক্রান্ত করিয়া বসিবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান ভয়। কিন্তু হেষ্টিংস এ সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার সহযোগীগণের আপত্তিতে মনোযোগ না দিয়া যখন স্বেচ্ছায়, স্বাধীন ভাবে, নন্দকুমারকে এই উচ্চ ও স্পৃহনীয় রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি নন্দকুমারকে "নীচ প্রকৃতি" ও "হতভাগ্য" ভাবিয়াছিলেন? * নন্দকুমার যদি তাঁহার বিরুদ্ধে এই

---

* বাগ্মী এড্‌মণ্ড্ বার্ক হেষ্টিংসের নন্দকুমার সম্বন্ধে এই প্রকার রূঢ় বাক্য প্রয়োগের কথা লইয়া কি বলিয়াছেন—দেখুন।

"If therefore Rajah Nundkumer was a man, who (if it not degrading

অভিযোগগুলি উপস্থিত না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় হেষ্টিংসের দ্বারা এই প্রকার নীচ ভাষায় কখন সম্বোধিত হইতেন না।

হেষ্টিংস সাহেব মহারাজ নন্দকুমারের বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জোবানবন্দী দেওয়ার সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। নন্দকুমার যেমন এক দিকে বিশিষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা গবর্ণরের উৎকোচ লওয়ার যথার্থতা প্রমাণ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন—হেষ্টিংসও অন্যপক্ষে ঠিক বিপরীত ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। এ সময়ে সাহসীর ন্যায়—প্রকৃত বীরের ন্যায়—পদগৌরব ও আত্মসম্মান রক্ষার একমাত্র উপায় অবলম্বন করিয়া প্রতিযোগীকে কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান না করিয়া তিনি যথেষ্ট কাপুরুষতা দেখাইয়াছেন। যখন অভিযোগগুলি প্রথম কৌন্সিলে আনা হইয়াছিল—তখন তিনি বিনা আপত্তিতে তাহা গৃহীত ও পঠিত হইতে দিয়াছিলেন—এমন কি কৌতূহল ও উৎকণ্ঠার সহিত তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণও করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন অভিযোগগুলি বড় উপেক্ষণীয় নহে ও অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রমাণের জন্য স্বয়ং অভিযোক্তা প্রমাণাদি লইয়া কৌন্সিলের সম্মুখে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত, তখন তিনি সেই অভিযোগ প্রমাণের পথে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ন্যায্য উপায়ে সহায়তা না লইয়া—বীরের ন্যায় আত্মসম্মান রক্ষার উপায় না করিয়া—কাপুরুষের ন্যায় নীচ মার্গের অনুসরণ করিলেন। এই সময়ে মন্তব্যের ভিতর ও বাকবিতণ্ডা স্থলে হেষ্টিংস সাহেব "আত্মসম্মান" (Self-respect) ও "পদগৌরব" (Dignity) এই দুইটা কথা লইয়া বিষম গোলযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে—তাঁহার ন্যায় লোকে দোষী হইলেও নন্দকুমারের ন্যায় লোকে অভিযোগ আনিতে ও কৌন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণের সেই দোষের বিচার বা সমূলকতা অনুসন্ধানে ক্ষমতা নাই। কিন্তু বিলাতে তাঁহার প্রভুগণ ঠিক ইহার বিপরীতই আজ্ঞা দিয়াছিলেন। সেই আজ্ঞা ও উপদেশের বলে কৌন্সিলের মেম্বরেরা তাঁহার নামে আনীত অভিযোগগুলির বিচার ও অনুসন্ধান করিতে যে সম্পূর্ণ সক্ষম—তাহা পাঠক পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। ভবিষ্যতেও ডাইরেক্টারেরা এ সম্বন্ধে কৌন্সিলের মেম্বরগণের কার্য্য-কলাপ সম্পূর্ণরূপে ন্যায় সঙ্গত

---

your Lordships to say) was equal in rank, according to the idea of his country to any Peer in this House, as sacred as a Bishop,—of as much gravity and authority as a judge—and who was the Prime Minister of a country in which he lived, with what face can Mr. Hastings call this man a "wretch" and say that he will not suffer him to be brought before him.

Vide—Burke's speeches in the Impeachment of W. Hastings before the House of Lords. Vol. XIII.

বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। * আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাঁহার নিয়োগ কর্ত্তারা কৌন্সিলের সদস্যগণের তৎকালীন কার্য্য সম্বন্ধে বৈধতা স্বীকার করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন—কিন্তু গবর্ণর সাহেব নিজে ইঁহাদের কার্য্যপ্রণালী অবৈধ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবিয়া ইঁহাদিগকে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অভিযোক্তাকেও যথেষ্ট কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতেও কি হেষ্টিংসের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে বাকি থাকে!

হেষ্টিংস সাহেব এই তর্কস্থলে "আত্মসম্মান" ও "পদগৌরব" রক্ষা সম্বন্ধে যে অত্যাশ্চর্য্য যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই বোধ হয় সেই সময়ে তাঁহার মনের ভিতর বালকের চপলতা বিরাজ করিতেছিল ও চিত্তের বিকৃতি হইয়াছিল। তাঁহার মতে "আত্মসম্মান" "পদগৌরব" অপেক্ষা গুরুত্বহীন। আত্মসম্মান রক্ষায় ততদূর ব্যস্ত না হইলেও চলে—কিন্তু "পদগৌরব" রক্ষা নিতান্ত আবশ্যকীয়। তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে সকলের সমক্ষে কতকগুলি অভিযোগ আনীত হইল, এইরূপ কার্য্যে তাঁহার আত্মসম্মান যথেষ্ট আহত হইল—কিন্তু তিনি আহত-সম্মান রক্ষার্থে উদ্যোগী না হইয়া "পদগৌরব" রক্ষার্থে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি পদগৌরবের অর্থও যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাও সম্পূর্ণ কুযুক্তি পরিপুষ্ট। আত্মসম্মানের সহিত পদগৌরবের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে এবং সময়ে সময়ে পদগৌরব অপেক্ষা আত্মসম্মান শ্লাঘনীয় হইয়া পড়ে, তাহা বুঝিয়াও তিনি তদ্রূপ কার্য্য করেন নাই। যে অবস্থার লোক হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে এই প্রকার কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলেই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসমক্ষে অভিযোক্তাকে ডাকিয়া তাহার অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রমাণ করিতে বলিয়া থাকে, কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব তদ্রূপ করিতে সাহসী হন নাই। মনের অগোচর পাপ নাই—তিনি অভিযোগগুলির সমূলকতা বা অমূলকতার বিষয় মনে মনে বেশ জানিতেন সুতরাং স্বার্থ রক্ষার্থে ও আত্মরক্ষার্থে সেই বিশ্বাসেই কার্য্য করিয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে গেলে—এই স্থলে তিনি আত্মরক্ষা ভিন্ন আত্মসম্মান ও পদগৌরব রক্ষার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

হেষ্টিংস সাহেব যুক্তির মুখে পরাজিত হইয়া—পদোচিত ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার দ্বারা সহসা এই প্রকারে সভা ভঙ্গ করিয়া প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সুবিধা হইল না। বারওয়েল সাহেব হেষ্টিংসের প্রিয়বন্ধু ও সম-প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন, অনেক দিন পর্য্যন্ত কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে গবর্ণরের

* "That the powers and instructions vested in and given to General Clavering and other gentlemen in the council, were such as fully authorised them in every inquiry that seems to have been their object," (Burke's speeches before the Impeachment Committee.)

ন্যায় তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধেও লোকে কাণাঘুসা করিত, সুতরাং হেষ্টিংস সাহেব সভা ভঙ্গ করিয়া যে অন্যায় কার্য্য করিলেন—তিনি তাহার সমর্থন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। কৌন্সিলের অন্যান্য সভ্যগণ কিন্তু গবর্ণরের এই প্রকার কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইলেন না। তাঁহারা বিলাত হইতে ডাইরেক্টার দিগের নিকট হইতে যে প্রকার উপদেশ ও ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই ন্যায্য ক্ষমতার বলে তাঁহারা জেনারেল ক্লেভারিং সাহেবকে আপনাদের মধ্য হইতে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া সভার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিলেন। সভার সম্মুখে নন্দকুমারকে ডাকিয়া আনা হইল। মন্সন সাহেব দ্বিভাষীর সাহায্যে তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের জোবানবন্দী শেষ হইল এবং তাঁহার দাখিলি প্রমাণাদিতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়া বোর্ডের সদস্যগণ তৎ-সমুদায় দস্তুরমত লিপিবদ্ধ করিলেন। নন্দকুমার গবর্ণর সাহেবকে যে উৎকোচ দিয়াছিলেন—তাহা ব্যতীত মণিবেগমের প্রদত্ত উৎকোচাদির যথার্থতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য কৌন্সিলের পরামর্শ ক্রমে একটী সমিতি গঠিত হইল। Goring সাহেব সেই সমিতির অধ্যক্ষ হইয়া মুরশিদাবাদে এই বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের জন্য গমন করিলেন। এই পর্য্যন্ত কৌন্সিলের সদস্যগণ ধীরে সুস্থে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই প্রকার ভাবে সহিষ্ণুতাবলম্বনে সমস্ত কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই মহারাজ নন্দকুমারের আনীত অভিযোগগুলির প্রত্যেক অংশই পরিশেষে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা অসহিষ্ণুতা ও চপলতা অবলম্বনে কার্য্য-স্রোত বিভিন্ন দিকে ফিরাইয়া দিলেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরেই মহারাজ নন্দকুমার চক্রান্ত-অপরাধে হেষ্টিংসের দ্বারায় প্রকারান্তরে অভিযুক্ত হইলেন। হেষ্টিংস সাহেব এত দিন গোপনে গোপনে যে চক্রান্তের মূলে জল সেচন করিতেছিলেন, তাহা এই সময়ে ফলবতী হইল।

মুরসীদাবাদে মণিবেগমের নিকট হইতে যে সমস্ত অর্থ উৎকোচস্বরূপ গবর্ণর সাহেব লইয়াছিলেন, * তৎসলগ্ন কোন অত্যাবশ্যকীয় বিষয় প্রমাণ করাইবার জন্য কৌন্সিল

---

* মহারাজ নন্দকুমারের কথিত সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মধ্যে—দেড়লক্ষ টাকা উৎ-কোচগ্রহণের কথা হেষ্টিংস সাহেব নিজমুখেই পার্লামেণ্টে স্বীকার করিয়াছিলেন। House of Lords এর সম্মুখে তিনি বলিয়াছিলেন—"I will not pretend to deny, I never did deny that I accepted the usual entertainments (Ziafat) which were then usually given to the visitor by the visited."

Vide—The Trial of Moharaja Nundkumer, or the Narrature of a Judicial Murder. by H. Beveridge Esq. C. S.

হেষ্টিংস উপরোক্ত বিশ্বাসে কাজ করিলেও আমারা দেখাইব তিনি ডাইরেক্টারদের নিকট যে প্রতিজ্ঞাপত্র (Covenant) স্বাক্ষর করিয়াছিলেন,তাহার স্বত্য লঙ্ঘন করিয়াছেন।

গবর্ণরের বেনিয়ান, কৃষ্ণকান্ত বাবু ও তাঁহার সদরমেট বাবু কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়কে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। ইহাদের অনুপস্থিত হওয়ার সহিত হেষ্টিংসের বিশেষ স্বার্থ জড়িত ছিল। কান্ত বাবু হেষ্টিংসের বেনিয়ান সুতরাং তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। * গবর্ণরের সমস্ত গোপনীয় কার্য্যেই তাঁহার হাত ছিল। কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার সদরমেট, সুতরাং এই দুই ব্যক্তি কৌন্সিলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অবর্ত্তমানে জেরার মুখে সকল কথা খুলিয়া বলিলে তাঁহার যথেষ্ট অনিষ্ট হইবে—এই ভয়েই তিনি তাহাদিগকে কোনমতেই বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে দিলেন না। স্বার্থ রক্ষার জন্য—নিজের কলুষিত চরিত্র গোপন করিবার জন্য—তিনি রাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইয়া এই প্রকার সর্ব্বাংশে অন্যায় উপায় অবলম্বন করিলেন। পরের অধিবেশনে যখন কৃষ্ণচরণ ও কান্ত বাবুকে শাস্তি দিবার জন্য বোর্ড

---

* কান্ত বাবু হেষ্টিংসের কতদূর প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহা নিম্ন লিখিত পত্রাংশ হইতে প্রমাণিত হইবে। রাণী ভবানীর বাহারবন্দ পরগণার জমীদারী হেষ্টিংস সাহেব অন্যায়রূপে রাণীর সরকার হইতে কাড়িয়া লইয়া কান্ত বাবুকে বেনামীতে প্রদান করেন; অভিযোগ পত্রে পাঠক একথা শুনিয়াছেন। প্রজারা নূতন অধিকারী কান্তবাবুকে প্রথমতঃ খাজনা প্রদান করিতে অস্বীকার করাতে হেষ্টিংস সেই সময়ে রঙ্গপুরের কালেক্টার Goodlawকে নিম্নলিখিত পত্র দিয়াছিলেন। পত্রখানি অতিশয় নূতন ধরণের বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "Kanto Babu, my Dewan, having obtained my permission to visit the Pergona of Baharbund which is his Zamindari, the Ryots of which have proved very refractory in paying their rents—I request that you will afford him your protection and support in collecting the same—enforcing his authority or that of his agent or agents whom he may leave in the management. In the meantime as this is the season of heavy collection, and as he expects as the natural consequence of his endeavours to realise them, and to reduce the Ryots to their duty that they will appeal and complain to you—he requests and it is reasonable that you will suspend any inquiry therein until the month Baishak at which time his business will suffer little from it."

Vide—Hasting's letter to Mr. Goodlaw the collector of Rungpur, dated 19th Feb. 1783 in the Art Warren Hastings in Lower Bengal. P. 303.

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রকার প্রকৃতির লোকের হস্তে সেই সময়ে দেশের শাসন ভার দেওয়া হইয়াছিল। অথবা যখন ইহার শাসনকালের জ্বলন্ত কীর্ত্তিস্বরূপ মহারাজ চেৎসিংহের সর্ব্বনাশ, নির্দ্দোষী রোহিল্লাদের অকারণ উচ্ছেদ ও নিরপরাধিনী অসহায়া বেগমদিগের ধনাপহরণের কথা মনে হয়, তখন এপ্রকার কার্য্য অতিশয় সামান্য বলিয়া বোধ হয়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আজ কালকার বাজারে কোন জমীদার কি এই প্রকার ধরণের অনুরোধ পত্র পাইতে পারেন?

প্রস্তাব করিলেন—সেই সময়ে হেষ্টিংস বলিলেন—"I know that they received the summons sent them by Mr. Summer in the name of the Board, and the answers which were sent, being shewn me, I forbade their attendance." বোর্ডের সম্মুখে যেরূপে স্পর্দ্ধা করিয়া হেষ্টিংস সাহেব এই প্রকার অসঙ্গতভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় এই যে, পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার নামে অভিযোগ সময়ে যখন এই সমস্ত কথা লইয়া ঘোরতর আলোচনা হইয়াছিল—তখন তিনি এই প্রকার সাহস ও আস্ফালন দেখাইতে পারেন নাই। যাহা হউক অন্যায়রূপে সভা ভঙ্গ করিয়া প্রস্থান করাতে লোকের মনে যে বিরুদ্ধ সন্দেহ উৎপাদিত হইয়াছিল—কান্ত বাবু ও কৃষ্ণ বাবুকে কলিকাতা বোর্ডের সমক্ষে উপস্থিত হইতে না দেওয়াতে লোকের সেই সন্দেহ সম্পূর্ণ প্রকার বৃদ্ধি পাইল। বস্তুতঃ এই সময়ে হেষ্টিংসের ব্যবহার দেখিয়াই বোধ হয় যে, তিনি সম্পূর্ণরূপেই অপরাধী ছিলেন। নচেৎ এই প্রকারে চঞ্চলভাবে জলনিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় যে সে উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন না! হেষ্টিংস আত্ম-সম্মানের যে প্রকার ভ্রমাত্মক অর্থ বুঝিয়াছিলেন—তাঁহার সুবিজ্ঞ সহযোগী জেনারেল ক্লেভারিং ঠিক তাহার বিপরীতই বুঝিয়াছিলেন। এই সময়ে হেষ্টিংস যেমন সিবিল-গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহার সহযোগী ক্লেভারিংও তেমনি মিলিটারি-গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বোচ্চ-কর্ম্মচারী ছিলেন। ক্লেভারিং তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য যাহা কিছু বলিয়াছিলেন—তাহা অতিশয় সারগর্ভ ও সুযুক্তি-প্রণোদিত—এতদনুসারে কার্য্য করিলে হেষ্টিংসেরই সম্মান শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত—কিন্তু তিনি তদ্রূপ করিতে সাহসী হন নাই। নির্দ্দোষী হইলে তিনি যে অবশ্য এইরূপ করিতে কোন প্রকার দ্বিধা করিতেন না, তাহার আর সন্দেহ নাই। জেনারেল সাহেব হেষ্টিংসের পদগৌরব সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য যখন তাঁহাকে বলিলেন—"গবর্ণর সাহেব আমাদের এই মন্ত্রী সভার প্রধান সদস্য—আমরা তাঁহার নিম্নপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তাঁহার বিরুদ্ধে এই দূষণীয় অভিযোগগুলি উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার নামের সহিত—আমাদের পদগৌরব কলঙ্কিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা কিছু বিচারকরূপে উপবিষ্ট হইতে চাহি না—গবর্ণর সাহেব নিজেই কেন মহারাজ নন্দকুমারকে বোর্ডের সমক্ষে আহ্বান করিয়া তাঁহার অভিযোগগুলির যথার্থতা প্রমাণ করিতে বলুন না কেন? এ প্রকারে অভিযোগ শুনিয়া সমূলকতা প্রমাণ করিতে নন্দকুমার অপারক হইলে—কেবল যে গবর্ণরের চরিত্র মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় নির্দ্দোষ হইবে এরূপ নহে—আমাদেরও তাহাতে গৌরব বৃদ্ধি হইবে। নন্দকুমারকে এই স্থলে আনিবার কথা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে—এইরূপ কার্য্য দ্বারা এ সম্বন্ধে সমস্ত গোলযোগ একবারেই মিটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এখন তাহাকে উপস্থিত হইতে না দিলে গবর্ণর সাহেব স্বয়ং হয়ত আমাদের পরে দোষ দিতে পারেন—যে নন্দকুমারকে তাঁহার সমক্ষে

উপস্থিত হইয়া তাহার অভিযোগগুলির সমূলকতা প্রমাণ করিতে না দিয়া, স্বীয় চরিত্রের উৎকর্ষতা দেখাইবার একমাত্র অবসর হইতে আমরা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছি। ভবিষ্যতে এই প্রকারে অভিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা বর্ত্তমানে আমরা নন্দকুমারকে আনিয়া পথ সরল করিতে ইচ্ছা করি। * যদি নন্দকুমারের ও বর্দ্ধমানের মহারাণীর

* নন্দকুমারের অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সময়েই যে কেবল হেষ্টিংস দুই তিন বার সভা ভঙ্গ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে—বর্দ্ধমানের মহারাণী মহারাজা ত্রিলোকচন্দ্রের বিধবা মহিষী তাঁহার ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের নামে যে অভিযোগ আনেন, তাহার বিচারের সময়েও হেষ্টিংস সাহেব এই প্রকারে সভা ভঙ্গ করিয়া প্রমাণ সম্বন্ধে বাধা দিয়াছিলেন। তিনি একস্থলে লিখিতেছেন—

"On the 10th instant an English letter containing an English Account was brought to the Board, in the name of Rani of Burdwan, charging me personally with having received the sum of 15000 Rs. as a present from Brojo kissore Ray. I objected in like manner—and again declared the meeting dissolved and left them. Mr. Barwell did the same"

Hastings letter—dated 26th March 1775 (Secret Deptt.)

মহারাজ নন্দকুমারের অভিযোগের পূর্ব্বে ও পরে, হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অন্য দুই একটী প্রধান অভিযোগ আসিয়াছিল—ইহার মধ্যে হুগলীর ফৌজদারের ও বর্দ্ধমানের রাণীর অভিযোগই প্রধান। বর্দ্ধমানের মহারাজ্ঞী ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে কৌন্সিলের সমক্ষে সর্ব্ব প্রথমে হেষ্টিংসের প্রিয় মিত্র Graham সাহেবের নামে নালিশ করেন। রাণী এই সময়ে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় আসিয়া অভিযোগগুলির সমূলকতা প্রমাণ করাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হেষ্টিংস স্বীয় বন্ধুর রক্ষার্থে বারওয়েলের সহিত যুক্তি করিয়া রাণীর কলিকাতায় আসার পথ বন্ধ করেন। ইতিমধ্যে গ্রেহাম সাহেব হেষ্টিংসের কৃপায় অর্দ্ধ জয়ী হইয়া তাঁহার নামে আনীত অভিযোগগুলির এক লম্বা চৌড়া উত্তর দেন। বলা বাহুল্য অভিযোক্তা রাজ্ঞী বর্দ্ধমানে আটক রহিলেন। গ্রেহাম বলিলেন রাণীর অভিযোগ মিথ্যা—অতএব ইহা এইরূপ প্রমাণ হইয়া গেলে পাছে তিনি গাঢাকা দেন, তজ্জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত জামিন (?) দিতে হইবে। রাজকুমারকে রাণীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া আনার জন্য তাঁহার নামে আর একটী অভিযোগ হইয়াছিল। হেষ্টিংসের প্রিয় বন্ধু ইম্পির সহায়তায় সেটিও গোলমাল হইয়া যায়। ইহার পর গ্রেহাম বিলাতে পলায়ন করেন।

ইহার পর ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে বর্দ্ধমানের মহারাণীর অভিযোগের পুনর্ব্বিচার আরম্ভ হয়। নন্দকুমারের অভিযোগ আনিবার ২।১ দিবস পূর্ব্বে এই অভিযোগ আনা হয়। এবারে গ্রেহাম সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নহে—স্বয়ং হেষ্টিংস ও তাঁহার বেনিয়ান কান্ত বাবু ও সদর মেট কৃষ্ণ বাবুর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ জন্য অভিযোগ আনা হইল। বোর্ডের সম্মুখে ব্রজকিশোর রায় (বর্দ্ধমান রাজ সংসারের দেওয়ান) আসিয়া (১৪ই মার্চ্চ) খাতা পত্র দেখাইয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, তিনি কান্ত বাবুকে ৫০০০৲ ও কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ৫০০৲ টাকা উৎকোচরূপে দিয়াছেন · কিন্তু ব্রজকিশোর প্রধান দেয় অর্থের (যাহা "Exhibit D" রূপে চিহ্নিত ছিল) বিষয়ে অস্বী-

অভিযোগগুলি সম্যক যুক্তি-যুক্ত ও সমূলক বলিয়া বোধ না হয়, তবে আমি সর্ব্ব প্রথমে জগৎ সমক্ষে প্রচার করিব—যে গবর্ণর সাহেব আমাদের মন্ত্রণা-সভার ও রাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী ও নন্দকুমার বিদ্বেষবশতঃ নীচ-মনোবৃত্তি চালিত হইয়া এই অভিযোগ আনিয়াছেন।" এই প্রকার যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়াও হেষ্টিংস তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। যে যুক্তি বালকেরও বোধগম্য—তাহা তাঁহার ঘূর্ণায়মাণ মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। কর্ণেল মন্সন এই প্রকারভাবে আরও বুঝাইলেন, তথাপিও তিনি সাহস করিয়া নন্দকুমারকে সম্মুখে আনিতে দিতে সাহস করিলেন না। নন্দকুমারের মুর্ত্তি তাঁহার নিকট কৃতান্ত-মূর্ত্তির মত বোধ হইল। যখন অন্যান্য সভ্যগণ মহারাজ নন্দকুমারকে সভাগৃহে আনিবার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলেন, তখন হেষ্টিংসের হৃদয়ের মধ্যে ভীষণ ঝটিকা বহিল—তাঁহার বিপুল মস্তিষ্ক বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইল—তিনি যুক্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায়, বালকের ন্যায় স্বেচ্ছামার্গ অবলম্বন করিলেন। প্রস্তাব সমর্থিত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইলেই, নন্দকুমার বোর্ডের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার দোষগুলি প্রমাণ করাইয়া দিবেন—সুতরাং কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি সহসা সভা ভঙ্গ করিয়া সবেগে কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। * এই সময়ে তাঁহার হৃৎপিণ্ড যে প্রকার

কার করিলেন। ইহাতে লিখিত ছিল "১৫০০০৲ হাজার টাকা হেষ্টিংস সাহেবকে দেওয়া হইল"। ব্রজকিশোর হেষ্টিংসের সম্মুখে ভয়েই হউক বা অন্য কারণেই হউক একথা অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজ মুহুরী দয়ারাম বোড়াল বলিলেন "এই পনর হাজার টাকার কথা আমার নিজ হাতের লেখা—আমি দেওয়ানের আদেশে ঐ রূপ লিখিয়াছি"। ইহার পরে হেষ্টিংস গোলযোগ দেখিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দেন। এবারে ত নন্দকুমারের মত "miscreant" ব্যক্তি অভিযোগ আনে নাই, তবে তিনি সাহস অবলম্বন করিয়া মন্ত্রী সভায় বসিতে পারিলেন না কেন ?

* হেষ্টিংস সাহেবের এই প্রকার অন্যায়রূপে সভা ভঙ্গ করার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়া তৎকালীন কোম্পানির কাউন্সেল চার্লস সেয়ার সাহেব কি প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন—দেখুন। Sayer সাহেব হেষ্টিংসের পক্ষের লোক ছিলেন—তিনি আবশ্যক মতে এসম্বন্ধে নিম্ন লিখিত মত প্রদান করেন।

"The meeting of the Council depends on the pleasure of the Governor and I think the duration of it must do so too; but it was as great a crime to dissolve the council upon base and sinister motives, as it would be to assume; the power of dissolving if he had it not. I believe he (Hastings) is the first Governor that ever dissolved a Council inquiring into his behaviour when he was innocent. Before he could summon three Councils and dissolve them—he had time fully to consider what would be

অসম্ভাবিত-ভাবে নিষ্পেষিত হইয়াছিল—বোধ হয় বহু বেগমের ধনাপহরণ ও নির্দ্দোষী রোহিল্লাদের উপর অকারণ অত্যাচারের সমর্থন সময়ে তাহার একাংশও হয় নাই।

হেষ্টিংস সাহেব যে প্রকৃত পক্ষে Dignity শব্দের ভ্রমাত্মক অর্থ বুঝিয়াছিলেন ও সেই বিশ্বাসে কার্য্য করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার সেই সময়ের ব্যবহার হইতে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হয়। কান্ত বাবু ও কৃষ্ণ বাবুকে বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইতে না দিয়া তিনি যে কেবল সদস্যগণের অবমাননা করিলেন, তাহা নহে—সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ডাই-রেক্টার সভা, এমন কি ইংলণ্ডাধিপ পর্য্যন্তও প্রকারান্তরে অপমানিত হইলেন। ভবিষ্যতে এই প্রকার অন্যায় ব্যবহারের জন্য হেষ্টিংসকে যে যথেষ্ট পরিতাপ করিতে হইয়াছিল—তাহা তাঁহার বিরুদ্ধে মহাভিযোগের Impeachment এর সমস্ত বিবরণ হইতেই বিশেষ রূপে জানা যায়। একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বেশ্ উপলব্ধি হয় যে, অপরাধী ব্যক্তির ন্যায় হেষ্টিংস পদে পদে সঙ্কুচিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন—সাহস করিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন নাই। এই সময়ে তিনি মনের উত্তেজিত অবস্থার দোষ ঢাকি-বার জন্য যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহাতে যুক্তির ও তীক্ষ্ণ দর্শিতার লেশমাত্র নাই—ভূয়োদর্শন নাই, কেবল অবিমৃষ্যকারিতা ও মানসিক চঞ্চলতা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই সময়ে অনেক বিষয়ে তাঁহার কাজে ও কথায় মিল হয় নাই—ভাল বুঝিয়া যে কাজ করিয়াছেন, সেই কাজই মন্দের দিকে গিয়াছে—সদসৎ বিবেচনা পরি-লুপ্ত হইয়াছে—আত্মম্ভরিতা, ও প্রগল্ভতা. তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছে। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী পদোচিত গুরুত্ব হারাইয়া অসম্মানের কার্য্যকে প্রকৃত সম্মানকর ভাবিয়া—সত্যকে মিথ্যা করিয়া—অভিযোক্তাকে ও সহোযোগী সদস্য-দিগকে গালি দিয়া ও দোষানুসন্ধানের প্রত্যেক উদ্দেশ্যে ও কার্য্যে বাধা দিয়া—তিনিই যে প্রকৃত অপরাধী—ইহাই লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছেন।*† কেবলমাত্র

---

the result of such conduct, to convince every body beyond a doubt of his conscious guilt."

Vide—Charles Sayer's opinion—dated 7th January 1776.

ইহার পর হেষ্টিংসের উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে আর ও কি প্রমাণ চাই?

† বলা বাহুল্য মহারাজা নন্দকুমারের আনীত অভিযোগগুলির প্রমাণ সম্বন্ধে হেষ্টিংস অত দূর বাধা দিয়াছিলেন বটে—কিন্তু সেইগুলি একবারে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করি-তেও সাহসী হন নাই। অভিযোগগুলির অপ্রাকৃতত্ব প্রমাণ করান দূরে থাক্—যখন তিনি সেইগুলিকে "অমূলক" বলিতেও সাহস করেন নাই, তখন তাঁহার চরিত্রের উপর আমাদের বিরুদ্ধ সন্দেহ জন্মে। এই সময়ে হেষ্টিংসের সহযোগীরা তাঁহার বিরুদ্ধে অভি-যোগগুলি সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া বিলাতে Directorদের নিকট পাঠান। হেষ্টিংসও নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়া ডাইরেক্‌দের এক সুদীর্ঘ পত্র লিখেন। তাহাতে এই অভিযোগের কথাগুলি অমূলক বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাক্—সেই স্থলে গোলমাল করিয়া পাঁচ কথায় কাটাইয়া দিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছিলেন—"Those (meaning those Proccedings of

মহারাজ নন্দকুমারের আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে নহে, বর্দ্ধমানের রাণী—মহারাজা ত্রিলোক চাঁদের বিধবা মহিষী—তাঁহার ও তাঁহার কর্ম্মচারীর নামে উৎকোচ লওয়ার জন্য যে অভিযোগ আনেন, তাহাতেও তিনি এইরূপ প্রগল্‌ভতা, স্থির বুদ্ধির অভাব ও সকল বিষয়ে বিশৃঙ্খলতা দেখাইয়াছিলেন। হুগলীর ফৌজদার খাঁজাহাম খাঁর আনীত অভিযোগের সময় এতদূর হুলস্থূল উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতেও হেষ্টিংসের কার্য্যকলাপ পূর্ণমাত্রায় সন্দেহ-পরিপূর্ণ। এক কথায় এই তিনটী অভিযোগের অনুসন্ধান কার্য্যে প্রাণপণে বাধা দিয়া তিনি নিজ চরিত্রের নির্দ্দোষিতা ও উৎকর্ষতা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ বিলক্ষণরূপে জন্মাইয়া দিয়াছেন।

হেষ্টিংসের পূর্ব্বোক্ত সন্দেহজনক ও দোষপূর্ণ কার্য্য কলাপ হইতেই পাঠক বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তিনি প্রকাশ্য রাজকার্য্যে রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ উপলক্ষে মহারাজ নন্দকুমার ও মণিবেগমের নিকট হইতে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষের উপর টাকা উৎকোচস্বরূপ গ্রহণ করেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংসের অবস্থা যে প্রকার ছিল, তাহার সহিত তুলনায় তাহার দুই তিন বৎসর পরে তাঁহার অবস্থা অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। স্বনামে ও বেনামে, তিনি নানা প্রকারে ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কৌন্সিলের সদস্যেরা এই কথার উল্লেখ করিয়া ডাইরেক্টারদের এক পত্র লিখিয়াছিলেন। হেষ্টিংস সেই পত্রোল্লিখিত বিষয়ের অযথার্থতা প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহার ১৬ই মে তারিখের পত্রে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসন্তোষকর। কৌন্সিলের সাহেবেরা যখন লিখিলেন "হেষ্টিংস সাহেব বাঙ্গলার গবর্ণর হইয়া নানাবিধ অসঙ্গত উপায়ে

---

the Board and of the majority) relating to the allegations of Rajah Nundkumer, have been committed to the hands of your Attorney for the purpose of commencing a suit at Law against me, in the name of the Company for the recovery of the sums, said to have been received by me from Many Begum in the year 1772. *I reserve my defence for the same channel not choosing to give my adversaries, an advantage by anticipating it, not to bespeak your premature judgement on a cause thus depending.*" Vide—Hastings to the Directors. 25th March. 1775. আর এক স্থলে তিনি লিখিতেছেন (১৬ই মের পত্র) "Foiled in all their repeated attacks upon me, my adversaries have recourse to charge of rapacity a charge of all others most foreign to my nature." হেষ্টিংস সাহেব যখন সাহস করিয়া এতদূর বলিতে পারিয়াছিলেন—তখন যদি আর একটু সাহসাবলম্বনে বলিতেন—"এই অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা—আমি অভিযোক্তাকে এই স্থলে উপস্থিত হইয়া তাহার অভিযোগগুলি প্রমাণ করিতে বলিতেছি—" তাহা হইলে কেহই সাহস করিয়া তাঁহাকে অপরাধী বিবেচনা করিতে পারিত না। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধ ব্যবহার করাতেই লোকের মনে সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করিয়াছেন—ইহার অনেক প্রমাণ আমরা পাইয়াছি” ইত্যাদি—তখন হেষ্টিংস সাহেব তাহার একটা সাফাই জবাব দিতে পারেন নাই। তিনি ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিলেন “যদি কখন সুযোগ হয় বা প্রয়োজন হয়, তবে ডাইরেক্টারদের আমি দেখাইব যে ক্লেভারিং প্রভৃতি সদস্যগণ আমার বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে”। যাহা হউক আমরা এক্ষণে প্রমাণ করিব যে তিনি এই প্রকারে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রের স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়াছেন ও তজ্জন্য ধর্ম্মে পতিত হইয়াছেন।

কোম্পানির রাজত্বের প্রথম বিকাশ সময়ে যে কোন উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী এদেশে আসিতেন বা এদেশ হইতে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের এক এক খানি করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইত। বোম্বে, মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় এই প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরের প্রধান স্থল ছিল। বাঙ্গলায় ক্লাইব সাহেব মেয়র কোর্ট হইতে তৎকালীন প্রতিজ্ঞাপত্রগুলি সহী করাইয়া লইয়া কর্ম্মচারীদিগকে নানা স্থানে নিযুক্ত করিতেন। ফোর্ট উইলিয়মের “মেয়রকোর্ট” হইতে যে covenant স্বাক্ষরিত হইত, তাহাই বাঙ্গলায় এবং অন্য প্রেসিডেন্সিতে বদ্‌লী হইলে তথায় কার্য্যকারী বলিয়া বিবেচিত হইত। অন্যান্য প্রেসিডেন্সির সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ক্লাইব, বেরিলষ্ট, প্রভৃতি গবর্ণরগণ এই মেয়র কোর্টে শপথ লইয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে যখন মান্দ্রাজে নিযুক্ত হন, সেই সময়ে তথায় এই প্রকার এক সুদীর্ঘ প্রতিজ্ঞাপত্র বা covenant এ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি বাঙ্গলার গবর্ণরী করিতে আইসেন। বলা বাহুল্য যে এই তিন বৎসরের মধ্যে এই প্রতিজ্ঞাপত্রের মেয়াদ অতীত হয় নাই। ইহার পর ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে Regulating Acts বিধিবদ্ধ হইলে তিনি আর একটী প্রতিজ্ঞাপত্রে সহী করেন। হেষ্টিংসের পক্ষ সমর্থকেরা বলেন যে ১৭৬৯ খৃঃ অব্দের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াও যদি হেষ্টিংস উৎকোচাদি লইয়া থাকেন, তাহা ততদূর দোষণীয় নহে। কিন্তু অন্য পক্ষ এমন কি স্বয়ং হেষ্টিংসের নিয়োগ-কর্ত্তারা পর্য্যন্ত বলেন যে, হেষ্টিংস সাহেব ১৭৬৯ সালের প্রতিজ্ঞাপত্রের স্বত্বানুযায়ী কোম্পানীর নিকট সর্ব্বপ্রকার দায়িত্বে বিশেষ আবদ্ধ। এ সম্বন্ধে বড় বড় ব্যবসায়জীবিদের মত লওয়া হইয়াছিল; আমরা পর পৃষ্ঠায় তৎকালীন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ একজন বিলাতি বারিষ্টার এই সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিলাম। নিম্নে ১৭৬৯ সালের হেষ্টিংসের স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্রের যে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই পাঠক দেখিতে পাইবেন—এইরূপ কার্য্য দ্বারা তিনি প্রকৃত পক্ষে প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন দোষে দোষী হইয়াছিলেন কি না? *

* Part of the covenant signed by Mr. Hastings in 1769 at Madras—"The governor was among other things to covenant that he would not

কান্তবাবু ও কৃষ্ণবাবুর পরীক্ষার পর কৌন্সিলের সভ্যগণ গবর্ণর সাহেবর নিকট এক-খানি Rosolution লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। এই রেজোলিউসনে লেখা হইল—"মহারাজ নন্দকুমারের আনীত অভিযোগের সমস্ত অংশ আলোচনা করিয়া ও তৎসম্বন্ধে প্রমাণাদি সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়াতে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে—যে হেষ্টিংস সাহেব কোম্পা-নীর তহবিল হইতে উল্লিখিত অভিযোগোক্ত অর্থগুলি উৎকোচরূপে গ্রহণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরাধী, অতএব আমাদের ইচ্ছা যে ঐ সমস্ত কোম্পানির প্রাপ্য টাকা তিনি তাঁহাদের তহবিলে পুনঃ প্রদান করেন।" বলা বাহুল্য হেষ্টিংস এই প্রস্তাব আদৌ গ্রহণার্হ বিবেচনা করিলেন না—রোষ ভরে সেক্রেটারীকে ফিরাইয়া দিলেন।

কৌন্সিলের সভ্যেরা এই সময়ে যে প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন—তাহাতে যে ভূয়োদর্শন, ও সহিষ্ণুতার অভাব ছিল—তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সময়ে ইহারা একটু বুঝিয়া চলিতে পারিলে ও কিয়ৎকাল পরে সুপ্রীমকোর্টে এই মোকর্দ্দামা পাঠাইলে হয়ত সেইখানেই হেষ্টিংসের উৎকোচ গ্রহণের কথা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইত। কিন্তু তাঁহারা আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার জন্য কৌন্সিলের সমস্ত কাগজ পত্র ও নন্দকুমারের জোবানবন্দী ও দলিলাদি—কোম্পানির এটর্ণির নিকট তৎক্ষণাৎ পাঠাইলেন। † উপযুক্ত উকীল দিয়া সুপ্রীম-

---

upon any account or pretence whatever, directly or indirectly, accept, take or receive, or permit to be taken, accepted or received by any person for his use, or in trust for him any Jewels, Effects, Money or other Reward, Gratuity, Donation, Present, or thing whatsoever, either specially given, paid, or deposited, agreed or stipulated for—or secured by Bond, Bill, Note, Obligation, Promise or Assurance of any kind, or by other means or device whatsoever of—or from any King, Prince, Vezier, Monsubdur, Nabob Dewan, Fouzdar, Zamindar, or any other persons natural born subjects of the East Indies, China, Persia &c of what degree, nomination or quality whatsoever, or from any Agent, Servant, or Counsel or any of them, exceeding the value or amount (4000Rs) specified in the covenants with the said Company or that no other Emmolument or Advantage whatsoever should in any wise howsoever, directly or indirectly arise or accrue unto him." আর এক স্থলে লেখা আছে "He is to get. 25000 a year and that he should enjoy our principal houses, with its plate and furniture, both in town and country rent free"

† নন্দকুমারের আনীত অভিযোগের সহায়তায় কোম্পানীর অর্থোদ্ধারের জন্য হেষ্টিংস সাহেবের নামে সুপ্রীমকোর্টে যে নালিস চলিতে পারে, তৎসম্বন্ধে বড় বড় বিলাতী উকীলের পরামর্শ লওয়া হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে Solicitor Genl. Wedderburn সাহেব ও Sergeant Adair ও Sayer সাহেবের মতই প্রধান। Sayer সাহেবের Opinionটী

কোর্টের সহায়তায় এই টাকা আদায় করাই তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যে এক বিষম বাধা পড়িল। এই সময়ে হেষ্টিংসের সমস্ত চক্রান্ত প্রায় শেষ-সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল—তিনি যোগাড় করিয়া আত্মরক্ষার জন্য সহসা এই অভিযোগের প্রধান সাক্ষ্য ও পরিচালক মহারাজ নন্দকুমারকে"চক্রান্ত অপরাধে"সুপ্রীম্ কোর্টে অভিযুক্ত করাইলেন। ইহার পরেই জাল অপরাধ আসিয়া জুটিল—সুতরাং কার্য্য-স্রোত বিভিন্ন দিকে অনিবারিত বেগে ফিরিল ও হেষ্টিংসের অপরাধও প্রমাণ হইবার সুযোগ ঘটিল না। উৎকোচ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতেই পাঠক বেশ বুঝিয়াছেন—হেষ্টিংস প্রকৃত পক্ষে অপরাধী ছিলেন কিনা? উৎকোচের কথা ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে আমরা মহারাজ নন্দকুমারের আনীত অন্য অভিযোগগুলির সমালোচনা করিব। রাণী ভবানীর সরকার হইতে খারিজ করিয়া বাহারবন্দ পরগণা হেষ্টিংস সাহেব যে কান্তবাবুকে প্রদান করেন, তাহা মূল অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে হেষ্টিংস ডাইরেক্টারদের যে উত্তর পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন "রাণী ভবানী স্ত্রীলোকমাত্র, তাঁহার জমীদারীতে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল—তত্ত্বাবধারণার্থে ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থে কান্ত বাবুর হস্তে তাহা অর্পিত হইয়াছে ইত্যাদি"—এই উত্তর যে কতদূর যুক্তি সঙ্গত, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। রাণী ভবানীর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীলোককে তিনি জমীদারীর শাসন করিতে অসমর্থ বলিয়াছিলেন, কিন্তু মনিবেগমের ন্যায় স্বল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোককে * বাঙ্গলার নবাব নাজিমের স্বর্ব্বস্ব ভারার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই সম্বন্ধে হেষ্টিংসের নামে পার্লামেণ্ট মহা সভায় যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল,তাহাতে নিঃসন্দেহরূপে তিনি দোষী প্রমাণিত হইয়াছিলেন।

পালকীর ও অন্যান্য রাজোপহারের সম্বন্ধে মহারাজা নন্দকুমার যে অভিযোগ আনিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে হেষ্টিংস সাহেব বলিয়াছেন—"I am ashamed to reply to so futile an accusation"। মোটকথা পালকীখানি তিনি ফিরাইয়া দেন নাই। এই অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি যে প্রকার উত্তর দিয়াছেন—অন্যান্য অভিযোগ সম্বন্ধে যদি ইহাপেক্ষা একটু সাহসের সহিত উত্তর দিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধহয় তাঁহার

সংক্ষিপ্ত বলিয়া তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—"As I am satisfied (with proofs) a discovery will not be injurious to his defence or integrity. It is my advice that a Bill be filed in the Supreme Court of Calcutta at the suit of the Company against Mr. Hastings—which he will be obliged to answer. The circumstance may put an end to all contest in Bengal and be of great use to the Company." এই সেয়ার সাহেব হেষ্টিংসের পক্ষের লোক।

* মণিবেগম অতিশয় রূপসী ছিলেন। প্রথমাবস্থায় তিনি নবাবের নর্ত্তকী ছিলেন—পরে নবাব তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বেগমশ্রেণী ভুক্ত করেন।

চরিত্র চিরকালের জন্য নিষ্কলঙ্কিত থাকিত। তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শাসনকর্ত্তা যে এই সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই—ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়।

হেষ্টিংসের নামে নন্দকুমারের আনীত অভিযোগগুলির আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া সমালোচনা করিলাম—মহারাজ নন্দকুমারের ও হেষ্টিংস সাহেবের প্রকৃত চরিত্র ইহাতে কতদূর প্রস্ফুটিত হইল—তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। এক্ষণে আমরা মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির বিবরণ প্রদান করিব। বলা বাহুল্য এই অভিযোগগুলি সুপ্রীম-কোর্টে করা হইয়াছিল, কৌন্সিলের সহিত ইহার সংশ্রব ছিল না।

ক্রমশঃ।

মিটিল না তৃষা।

আশা নিয়ে কেন মানুষ জন্মিল,
পূরিবে না যদি আশা ?
ভালবাসা কেন হৃদয় ভরিল,
মিটিবে না যদি তৃষা ?
প্রাণ যারে চায়, যদি না পাইবে,
দেখায় কেন রে তারে ?
হেরিলে যাহারে মরণে জীবন,
নাহি কেন পায় তারে ?

তৃষা এ জীবনে মিটিল না !
অমৃতের স্রোত সম্মুখে পাইনু,
বিন্দুমাত্র পিয়ে পাগল হইনু,
স্রোত বহে গেল, রহিল না !
এবে ভ্রমি সদা মরুভূ-মাঝারে,
সে স্রোত স্মরিয়া তৃষা আরো বাড়ে,
বল হে বিধাতঃ বল জন্মান্তরে
পাব কি ডুবিতে সে অমৃতসরে ?
তৃষা যে আমার মিটিল না !

এত শক্তি ধাতা কেন প্রেমে দিলে,
নিরাশাই যদি কপালে লিখিলে ?
বিস্মৃতি বা কেন দিলে না ?
এযে হিয়া চিতা সদা বহ্নিমান,
নিবে যেতো, শান্তি পাইত পরাণ,
তৃষা তারে আর দহিত না।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

কাহিনী।

পৃথিবীর মহা কোলাহলের এক প্রান্তে একটী ভগ্নকুটীর— প্রাচীন ইতিহাসের ছায়ার মত অতীতের একটী ভগ্নাবশেষ। তাহার জীর্ণ শীর্ণ দেহখানি জড়াইয়া প্রতিদিন শত সহস্র আশালতা বর্দ্ধিত হইতেছে—তাহার মুমূর্ষু প্রাণের শেষ বাসনাগুলিকে মরমের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহার যৌবনের বিলাসিতা এখন শুধু স্মৃতির কোমল বাঁশীর স্বরে আধো আধো জাগিয়া রহিয়াছে—শেষাবস্থার পারমার্থিক ভাবের খানিকটা ছায়া তাহার মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। তাহার দেয়ালে একটু সেওলা কবিত্বের মাধুরীর মত একটুখানি ঘুমন্ত স্বপনের ছায়া। আর তাহার ম্রিয়মাণ মুখখানির উপরে মরণের চির-আনন্দময়ী প্রতিমার একটুকু ক্ষীণ হাসি।

এই ক্ষীণ হাসির ছায়ায় ছায়ায় বহুদিন হইতে একটী ক্ষুদ্র প্রাণ বর্দ্ধিত হইতেছে—ঝড় বৃষ্টি রৌদ্রের দুর্দ্দান্ত অত্যাচারের মধ্য দিয়া ক্ষীণ আশার মত প্রতিমুহূর্ত্তে অল্প অল্প করিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে। ছলনার সুতীব্র কটাক্ষের মত তাহার মরমের চারিদিকে সহস্র কণ্টক বৃক্ষ—তাহার ক্ষীণ মরমের অন্ত্যেষ্টি সৎকারের জন্য সহস্র প্রসারিত বাহু। এই সকল কণ্টক বৃক্ষের মধ্য হইতে কোন প্রকারে সে সূর্য্যালোক দেখিতে পাইয়াছিল—মনুষ্যের ছলনাময়ী ভালবাসার মধ্য দিয়া মরমের ভালবাসার দুঃখময়ী ছায়া দেখিয়া নীরবে এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল।

ফুল ঝরিয়া পড়ে—জীবন ফুরাইয়া যায়—কাহিনী ঘুমাইয়া থাকে। ঘুমন্ত কাহিনীথ সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠে—দুই চারিটা গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাসের মধ্য দিয়া এক একবার দেখা দেয়। সংসারের অনন্ত সুখের মধ্যে কাহিনীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে একটুকু দুঃখের ছবি ফুটিয়া উঠে—অনন্ত সুখের কষ্ট যেন ধীরে ধীরে খানিকটা মুছিয়া যায়। প্রাণে শুধু কল্পনার এক আধটু খেলাধূলা লাগিয়া থাকে।

কাহিনী অনন্ত—দুঃখময় জগতের ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত। সেখানেই কাহিনীর শেষ। শেষ! অনন্তের সীমা! না, কাহিনীর শেষ আছে—তবে মানুষে তাহার শেষ পায় না। তাহার শেষ সুখে—তাহার সীমা দুঃখের শেষ পর্য্যন্ত। সুখের কাহিনী নাই। সুখের বৈঠকী গল্প আছে—মোসাহেবের খোষামোদ আছে। দুঃখের শুধু কাহিনী—গঙ্গা তরঙ্গের স্নেহমাখা গীতগুলির মৃদু কল্লোল—লাজুক উষার রক্তিম রাগের কোমল চুম্বন—সাঁঝের আকাশের স্নিগ্ধতার স্বপন-ঝরান বায়—মৃতপ্রায় রজনীর শেষ আশা।

দুঃখের জগতের সেই ক্ষুদ্র প্রাণটীর পরে দুএকটী কাহিনী ঝরিয়া পড়িয়াছে—সন্ধ্যার খানিকটা বিস্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। সেখানে বসিয়া 'বউ কথা কও' ম্রিয়মাণ ভাবে ভাঙ্গা গলায় অতীতের একটু স্মৃতি ফুটাইয়া দিতেছে—সংসারের বিলাসিতার মধ্যে

ঔদাস্যের মাধুরীটুকু প্রকাশ করিতেছে। পাপিয়ার উন্মত্ত প্রাণ সেই ক্ষুদ্র প্রাণের ছায়ার পানে চাহিয়া গান বন্ধ করিতেছে—সহানুভূতির স্বরে আপনার জীবন-কাহিনী বলিয়া উড়িয়া যাইতেছে।

ক্ষুদ্র প্রাণ সেইই ক্ষুদ্র। মরণের পথে ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইতেছে—প্রতি মুহূর্ত্তে অল্প অল্প করিয়া ক্ষয় পাইতেছে। সংসারের শত সহস্র হিংসা তাহার পানে তির্য্যক্ কটাক্ষপাত করিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিতেছে—বলিতেছে "শীঘ্র সরিয়া পড়—অন্ত্যেষ্টি সৎকারের সুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না"। ক্ষীণ প্রাণ তাহাতে অরাজি নহে, কিন্তু ভগবান্ তাহাতে অসম্মত। হিংসা তাঁহার নামে শিহরিয়া উঠে, মুহূর্ত্তের জন্য সরিয়া যায়—মরিয়া যায় না—অন্ততঃ যাইতে চাহে না। ক্ষীণের পানে হিংসার প্রখর দৃষ্টি।

এখনও সে সেই ক্ষুদ্র—হিংসার প্রখর লক্ষ্য। হিংসা এক মনে দিন গণিতেছে—দিন বুঝি পাইতেছে না। কুহকিনী আশার বলে বলীয়ান্ হইয়া হিংসার কায় প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছে। মায়াবিনী হিংসা মনুষ্যের সন্তানের মনুষ্যত্ব হজম করিয়া ফেলিতেছে। মানব সন্তান তাহার পদলেহনে জীবন উৎসর্গ করিতেছে।

সেই প্রাচীন কুটীরের এখানে সেখানে জীবনের খানিক খানিক ইতিহাস—মরণের শুভ্র হাসি। তাহার বটের "শ্যামল স্নেহে" মরণ, তাহার পুকুরের জলে মরণের ছায়া, তাহার কাঁটাবনে মরণের সৌরভ। একটী ক্ষুদ্র মাছরাঙ্গা বটের ছায়ায় প্রতিপালিত। তাহার জীবনের একটুকু হাসি সেই ক্ষীণ প্রাণটীর উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছে—শুকতারার নিভ নিভ কাহিনীর স্বপ্নময়ী রাগিণীতে ক্ষীণ প্রাণ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সে এখনও সেইই, কিন্তু না, ঠিক সেই নহে। সে ঐ যে আপনাকে খুঁজিতেছে—দুর্ব্বল বলিয়া পাইতেছে না। তাহার মরম ছিন্ন তন্ত্রী। মরণের সুরে এত দিন এক একবার তাহার মরম বাজিয়া উঠিত, এখন আর তাহা বাজে না। ছিন্ন তারে সে এক একবার ঝঙ্কার দেয়—জীবনের সমস্ত বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া যায়। সেই ক্ষীণ প্রাণ যখন প্রথমে মর্ত্ত্যের ছায়ায় দেখা দেয়, তখন চারিদিকে কত হাহাকার, কত মূর্ত্তিমান্ আশার নৈরাশ্য, কত তৃষিত চাতকের তৃষিত হিয়ার কাতরতা। সে হাহাকার থামিয়া গিয়াছে, নিরাশার স্থানে নূতন নূতন পেঁচময়ী আশা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তৃষিত হিয়াকে প্রবোধ দিবার জন্য নূতন নূতন সান্ত্বনা আমদানি হইয়াছে। ঘটনার পর ঘটনা, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত—চাটুকারের আমদানি রপ্তানির মত আসিয়াছে—গিয়াছে। যে ঘটনায় যাহার স্বার্থ ছিল, তাহারই নিকট সে ঘটনা রহিয়া গিয়াছে, যাহার কোনও স্বার্থ ছিল না, তাহার নিকট তাহার হিসাব নাই।

রোগ শোক মৃত্যুর মধ্য দিয়া পৃথিবী কতবার ঘুরিয়া গেল, কত হতভাগার মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার শ্যামল ছায়া পড়িয়া অশ্রু আকারে হতভাগ্যের আশাগুলি

ঝরাইয়া দিল, অবশেষে মৃত্যুর প্রসারিত ক্রোড়ে আনন্দের উৎসে স্নাত হইয়া হতভাগা সেইখানেই আশ্রয় লইল। সংসারের উপর দিয়া এইরূপ সাত সহস্র বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল মানব দেহের হাড়ে হাড়ে সেই সকল বিপ্লবের আংশিক ছায়া পড়িয়াছে। ধ্বংসশীল জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বংসের উপর কত নূতন নূতন জগৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র প্রাণ আপনার ক্ষীণত্বের মধ্য দিয়া কোন প্রকারে জীবনের প্রবাহ রক্ষা করিতেছে, তাহার ধ্বংসের উপর অনেক নূতন আশার উৎপত্তি হইতে পারিত; কিন্তু সে এখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নাই, মরণের একটানা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সাগরে উপস্থিত হয় নাই।

সে ক্ষুদ্র নিতান্তই ক্ষীণ। তাহার ধন নাই 'আমার' বলিবার কিছুই নাই। কোনও জিনিষে তাহার অধিকার নাই, সুতরাং সে সংসারে নিতান্তই গরিব। সে যাহা খায়—তাহা তাহার নিজের নহে, সংসারে সে একজন ভিখারী। তাহার একমাত্র ভিক্ষা—প্রেম। ঈশ্বরের নিকট হইতে মনুষ্য প্রেম পাইতেছে, সে প্রেম জগতে বিতরণ করুক্। ভিখারী মনুষ্যের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে "আমাকে একটু প্রেম দাও তোমাদের যে প্রেম আছে, তাহার কণামাত্র প্রেম ভিখারীকে ভিক্ষা দাও"। ভিখারী বড় গরিব, ভগবানের নিকট হইতে সে যে প্রেম পাইয়াছে, তাহা বুঝি শুধু নিজের জন্য সে তুলিয়া রাখিয়াছে, তাই আজ পথে পথে প্রেম ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। প্রেম জগতে বিতরণ করিতে সে বুঝি শিখে নাই, তাই আজ সে নিজের প্রেম খুঁজিয়া পাইতেছে না, যাহাদিগকে সে প্রেম বিতরণ করে নাই, তাহাদেরই দুয়ারে প্রেম ভিক্ষা চাহিতেছে।

কিন্তু না—ঐ দেখ তাহাকে কে প্রেম দিতেছে, তাহার রৌদ্র-তপ্ত মুখের উপরে ঐ দেখ মনুষ্যের প্রেম ফুটিয়া উঠিতেছে। এ ভিক্ষা তাহাকে কে দিল? যাহাদের দুয়ারে সে প্রতিদিন প্রেমের জন্য হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিত, তাহাদেরই বুঝি কেহ উহার নিকট ঋণী ছিল, এক্ষণে ঋণ পরিশোধ করিল? না,—যাঁহার নিকট সে চিরদিনই ঋণী, মানবের মধ্যে যাঁহার নিকট সে চিরদিন ভিক্ষা না করিয়াও প্রেম পাইয়াছে, তাঁহারই নিকট প্রেম পাইল।

সেই প্রাচীন কুটীর—অশান্তির মধ্যে সেখানে কেমন একটী শান্তি! সেখানে ঐ যে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, তাই সেথায় এখনও জীবন আছে। উষার মাধুরীর মত তাহার বৃদ্ধ নারিকেল গাছগুলি এখনও কেমন সজীব। তাহাদের হৃদয়ে ঔদাস্যের ছায়া পড়িয়াছে, পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর শুভ্র রেখাগুলি জন্মের মত লীন হইয়া গিয়াছে। সংসারের সকল বস্তুই বুঝি এইরূপে লীন হইয়া যায়—এইরূপেই বুঝি আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়? না—আত্মা কখনও পরমাত্মায় লীন হইয়া যায় না, ঈশ্বর হইতে পারে না। সংসারের সহস্র অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হওয়ার নামই

মুক্তি। আমাদের আত্মা অনন্ত কাল ঈশ্বরের অধীন থাকিবে, তাহাই তাহার আনন্দ। ভগবানের নামে সকল অশান্তির নিবৃত্তি হয়। আমরা তাঁহার নাম লইয়া আমাদের আশার বন্ধনে প্রাণের বন্ধনে জরাজীর্ণ কুটীরটীকে রক্ষা করিতে পারিব—এরূপ সম্ভাবনা আছে। সেই ক্ষুদ্র প্রাণ সেই কুটীরের প্রেমের ছায়ায় ছায়ায় ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, মরণের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। সে এই যে এতদিন ধরিয়া অল্প স্বল্প প্রেম পাইয়াছে, তাহারই খানিকটা কুটীরের প্রেমে মিলাইয়া যাইবে। শান্তি সেই প্রেমের মিলনের পুণ্য ভূমি হইবে।

* * * *

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। নববর্ষের নূতন আশা লইয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগগুলি স্ফীতবক্ষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে, আপন আপন রক্ত-পিপাসা মিটাইবার জন্য রণদেবীর পদতলে কোটী কোটী নরবলি দিয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে। পৃথিবীর এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের এক প্রান্তে একটী ভগ্ন আশা দাসত্বের লৌহনিগড়ে বদ্ধ হইয়া মরমের অশ্রুজল মরমেই মুছিয়া ফেলিতেছে। পাশব-বলের অধীনে তাহার দেহ জর্জ্জরিত। সে এখন নিজের রক্ষার ভার নিজের স্কন্ধে লইতে কুণ্ঠিত।

এই ভগ্ন আশার মৃতপ্রায় রাগিণীতে সেই ক্ষুদ্র প্রাণের একটুকু ঘুমন্ত ছায়া। পক্ষপাতময় সংসারের স্বার্থপরতার জটিল গোলক ধাঁধায় পড়িয়া ক্ষুদ্র প্রাণের শেষ আশাগুলি ঝরঝর—শুধু কি যেন একটা অদৃশ্য শক্তি সেই আশাগুলিকে ঝরিতে দেয় না। শৈশবের উপকথাগুলি ধীরে ধীরে সেই প্রাণের গায়ে লাগিয়া যায় "সাত ভাই চম্পা" "সুও রাণী দুও রাণী" "চিল মা" প্রভৃতি মিলিয়া তাহার আশাগুলিকে ধরিয়া রাখে। শৈশব-স্বপনের ভূতের নাচন মেঘের মত সেই প্রাণের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। ঠাকুরমার প্রেমপূর্ণ মুখখানি স্মৃতিতে ধীরে ধীরে যেন ফুটিয়া উঠে। নীরবে মরম হইতে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।

নীরবে অতীতের স্মৃতিতে প্রাণ ছাইয়া ফেলে, অতীতের গান, অতীতের কথা, অতীতের সুখ দুঃখ প্রাণে মিলাইয়া যায়। মনে পড়ে সেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি আধো আধো ভাঙ্গা গলায় আপনার মনে কত কথাই কহিত, কত গানই গাহিত। তাহাদের অলজ্জ হাসি, তাহাদের অপূর্ণ বাসনা, তাহাদের স্বাভাবিক সরলতা কি সুন্দর! হায়! তাহাদের মধ্যেও আবার মৃত্যু, তাহাদের শ্যামল প্রাণের উপরেও মৃত্যুর আধিপত্য। তাহারা বুঝি এ জগতের উপযুক্ত নয়, জীবন-সংগ্রামের মহাকোলাহলের সহিত যোঝাযুঝি করিবার যোগ্য নয়। তাহারা নন্দনের—তাহারা স্বপনের—মরণের। মরণের আনন্দ উপভোগ করিবার তাহারাই যোগ্য। বিষয়-বাসনা তাহাদিগকে জীবনের দাস করিয়া তুলে নাই। তাহারা মরণের। মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য তাহা-

দিগের সরল ভাবই একমাত্র পথ। মরণ জীবনের সারটুকু, আমরা যাহাকে বলি অনন্ত জীবন। আর আমাদের এই যে অসাড় ভাব—সংসারের দাসত্ব—ইহাই মৃত্যু। শিশু প্রাণে যেন ইহার ছায়া না পড়ে।

সেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, ম্রিয়মাণ ভাবে সময় সময় প্রাণে কেমন মাধুরী ঢালিত। তাহাদের একটী বুঝি কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে, ছোট ভাইটীর করুণ আঁখি দুটীতে আপনার ছায়াটুকু রাখিয়া সংসারের গহন বন হইতে গৃহ পানে ছুটিয়াছে। তাই কি? না পথহারা হইয়া ভাইটীকে পাইবার আশায় ছুটিতে ছুটিতে কোন্ অজানা দেশে গিয়া পড়িয়াছে। বিধাতা! তোমার এ কবিত্ব বুঝিয়া উঠা যায় না--জগৎ-সমস্যা মনুষ্যে পূরণ করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। মনুষ্য বুঝি এই সমস্যা পূরণ করিতেই আসিয়াছে, অনন্তকাল ধরিয়া এই সমস্যাই পূরণ করিবে। পারিবে কি? কে জানে!

ছেলেবেলা হইতে ভাই বোনে কেমন খেলা করিয়া বেড়াইত, স্নেহের ভাইটীকে প্রাণের চুম্বনে চুম্বনে ছাইয়া ফেলিয়া মেয়েটী কেমন একটু চাপা হাসি হাসিত, ভাঙ্গা গলায় ছোট ভাইটী দিদির কাণে কাণে কত কথাই বলিত। আজ আর দিদি নাই, শূন্য সংসারে আজ সে একেলা—তাহাকে প্রাণের চুম্বন দিবার বুঝি আর কেহ রহিল না। হিংসার কুটিল ভ্রূকুটী প্রতিনিমেষে ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে, তাহার সরল প্রাণে রাজ্য বিস্তারের সুবিধা পাইতেছে না।

দূরে—আরও দূরে। তখন সে ক্ষুদ্র প্রাণ পৃথিবীতে আসে নাই। কল্পনায় যেন খানিক খানিক তখনকার বিস্মৃতি জাগিয়া উঠে। আজিকার এই ক্ষুদ্র প্রাণের উপরে সেই জাগ্রত বিস্মৃতিগুলি ফুটিয়া উঠিতেছে। পতিব্রতা সীতা দেবীর ম্লান-মুখ স্বামীর কঠোর আজ্ঞার মধ্য দিয়া যেন বাহির হইতেছে। শকুন্তলার বন-ফুলের মালার গন্ধে ক্ষুদ্র প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে।

নীরবে সেই প্রাচীন কুটীরের ছায়ায় এতদিন সেই প্রাণে বর্দ্ধিত হইতেছিল, জীবন-সংগ্রামের মহা আড়ম্বরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল। এখনও সে সেইরূপ দাঁড়াইয়া আছে, এখনও ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আকাশকুসুম-কল্পনা শুকাইয়া আসিয়াছে। এত দিন কি এক মহা স্বপ্নে ভোর হইয়া সে জলের আশায় মরুভূমে ঘুরিতে ছিল। এখন সে সব চলিয়া গিয়াছে। এখন সে সংসারের ছলনাময়ী মায়া যেন কতকটা বুঝিয়াছে।

জীবনের মহা নাটকের একটী ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্কও শেষ হইল না। সমস্তটাই বাকি। একটুখানি মাত্র অভিনয় হইয়াছে। যবনিকা এখন পড়িবার সময় নয়—অনেক দেরি। কিন্তু ঐ কাহারা তাড়াতাড়ি করিতেছে, এইখানেই যবনিকা ফেলিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে। একটুকু অপেক্ষা কর, একটুকু—একটুকু। আর না।

সজোরে যবনিকা পড়িয়া গেল, তাড়াতাড়িতে সমস্তটা পড়িল না, খানিক দূর আসিয়া আট্‌কাইয়া গেল।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হেঁয়ালিনাট্য।*

তিনকড়ি, নেপাল, ভোলা এবং নীলমণি হাসিয়া কুটিকুটি।

ধীরাজ বাবুর প্রবেশ।

ধীরাজ। এত হাস্‌চ কেন? ক্ষেপ্‌লে নাকি!

তিনকড়ি। (দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) দেখ্‌চেন না রসিকরাজ বাবু আস্‌চেন।

ধীরাজ। তা ত দেখ্‌চি একটি বাবু আস্‌চেন, কিন্তু তাতে হাস্‌বার কি কারণ হয়েচে?

নেপাল। উনি ভারি মজার লোক!

ভোলা। ভা-আ-রি মজার লোক!

নীল। ব-ড্‌ড মজার লোক!

তিন। তবে ওঁর একটা গল্প বলি—শুনুন। সে দিন আমরা এই কটিতে মিলে হাস্‌তে হাস্‌তে রসিক বাবুর সঙ্গে সঙ্গে আস্‌চি, চোরবাগানের মোড়ের কাছে—হা হা হা।

নীল। হো হো হো—

ভোলা। হী হী হী।

তিনকড়ি। বুঝেচেন, চোরবাগানের—হা হা।

নেপাল। রোসো ভাই, আমি কাপড় সাম্‌লে নিই। হাস্‌তে হাস্‌তে বিল্‌কুল্‌ আল্‌গা হয়ে এসেচে।

তিনকড়ি। বুঝেচেন ধীরাজ বাবু, আমাদের এই চোরবাগানের মোড়ের কাছে—সে কি আর বলব! সে ভারি মজা।

ধীরাজ। আচ্ছা, পরে বোলো। আমি এখন আসি।

ভোলা। না না শুনে যান্‌ না। সে ভারি মজা! বলনা ভাই, গল্পটা শেষ কর না।

তিনকড়ি। বুঝেচেন ধীরাজ বাবু—

ধীরাজ। না বল্‌লে কি করে বুঝব বাপু?

---

* গত মাসের হেঁয়ালি নাট্যের কোন উত্তর নাই।

তিন। বলি শুনুন। মোড়ের কাছে এক বেটা গরুর গাড়ির গাড়োয়ান—হা হা হা—(ভোলার প্রতি) কি হে কি নিয়ে যাচ্ছিল ?

ভোলা। পাথুরে কয়লা।

তিনকড়ি। হাঁ—পাথুরে কয়লাই বটে। রসিক বাবু তাকে দেখে—হা হা হা হা। (সকলে মিলিয়া হাস্য)।

তিনকড়ি। রসিক বাবু তাকে দেখে—(নেপালের প্রতি) কি হে কি বল্লেন ?

নেপাল। হা হা হা। সে ভারি মজার কথা (ভোলার প্রতি) কিন্তু কি কথাটা বল দেখি।

ভোলা। মনে পড়চে না কিন্তু সে ভারি মজা! বুঝেচেন ধীরাজ বাবু—সে ভারি মজা!

নীল। একটু একটু মনে পড়চে এই পাথুরে কয়লা নিয়ে কি একটা বলেছিলেন।

নেপাল। আহা কি বল হে! পাথুরে কয়লা নিয়ে আবার কি বল্‌বেন! বোধ করি আমাদের দেশের ভগ্নীদের লক্ষ্য করে কিছু বলেছিলেন, তিনি তা ছাড়া আর কোন বিষয়ে কথা কন না।

ভোলা। কিন্তু আমার মনে হচ্চে তিনি গরু দুটোর সঙ্গে আর কার সঙ্গে তুলনা দিয়ে কি একটা বলেছিলেন।

তিন। তাও হতে পারে। যাই হোক্ সে ভারি মজা! (সকলে মিলিয়া হাস্য)।

রসিক বাবুর প্রবেশ।

রসিক। কিহে এখেনে যে এত হস ধাতুর আমদানী।

নীল। হস ধাতুই বটে, হা হা হা!

তিন। (ধীরাজ বাবুর প্রতি) একবার কথাটা শুনুন! হস ধাতু—হা হা হা।

ভোলা। ধীরাজ বাবু শুন্‌চেন! কেমন চমৎকার বল্লেন! হসধাতু—আবার আমদানী ?

নীল। ধীরাজ বাবু—

ধী। আমি বুঝেছি।

নেপাল। ধীরাজ বাবু—

ধী। তোমরা আর অধিক কষ্ট পেয়োনা। আমি এক রকম বুঝেছি।

রসিক। ভেগ্নীদের কোন নতুন খবর পেয়েছ!

নী, নে, ভো, এবং তি। হী হী হো হো হাহা।

ধী। ভেগ্নী কি।

তি। আর সকলে ভগ্নী বলে কিন্তু রসিক বাবু বলেন ভেগ্নি! হাহাহা!

ধী। কেন, উনি কি বাঙ্গলা জানেন না?

তি। আপনি এর মজাটা বুঝ্‌চেন না! ভগ্নীত সবাই বলে কিন্তু ভেগ্নী! হাহাহা!

নে। ধীরাজ বাবু—শুন্‌চেন্! ভেগ্নী! এমন কথা আর কোথাও শুনেচেন!

ভো। ধীরাজ বাবু—কথাটা বেঁকিয়ে বলে কি মজাই হয়েছে! ভগ্নী ত যে ইচ্ছে সেই বল্‌তে পারে কিন্তু রসিক বাবু ছাড়া ভেগ্নী শব্দ কারু মাথায় যোগায়! বলত ভাই তিনকড়ি, ভেগ্নী কথা কখনও তোমার মাথায় যোগাত!

তি। না ভাই। বরাবর ভগ্নীই বলে আস্‌চি এবং লিখে আস্‌চি!

রসিক। বুঝেছ ভোলা আজ এক কাণ্ড হয়ে গেছে। ভেগ্নী সভার সভ্যি এবং সভাপেত্নী—

তি, ভো, নে এবং নী। হো হো হী হী হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ।

দামোদর এবং চিন্তামণির প্রবেশ।

দা ও চি। (সাগ্রহে) কি কি কি হল, কি কথাটা হল!

তিন। রসিক বাবু বল্‌ছিলেন, "ভেগ্নী সভার সভ্যি এবং সভাপেত্নী" হাহা হো হো।

দা। এ ভারি মজা! এটা আপনাকে লিখ্‌তে হচ্চে! আমাদের কাগজে লিখুন্। যারা দুটো করে পয়সা দেয় তারা ভারি হাস্‌বে।

চি। রসিক বাবু এটা লিখে ফেলুন। ভগ্নীরা ভারি জব্দ হবে।

তিন। ধীরাজ বাবু বুঝেচেন?

ভোলা। 'পেত্নী কেন বল্লেন বুঝেচেন!' যেমন ভেগ্নী তেমনি পেত্নী! হা হা হা।

নেপাল। ওর মজাটা বোঝেন নি ধীরাজ বাবু! আসল কথাটা হচ্চে পত্নী কিন্তু রসিক বাবু—

ধীরাজ। দোহাই তোমাদের আমাকে আর বেশি বুঝিও না! যতটা আবশ্যক তার চেয়ে অধিক বুঝেছি।

ভো। কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে রসিক বাবু বল্‌চেন সেইটে বুঝ্‌তে পারেন নি বলে ধীরাজ বাবু হাস্‌চেন না।

ধী। সেইটে বুঝ্‌তে পেরেচি বলেই হাস্‌চিনে বাপু। কেন না আমি ও ভদ্রলোক, আমারও ভগ্নী স্ত্রী কন্যা আছে।

রসিক। (দামোদরের প্রতি) তোমরা বল্‌চ যখন তখন লিখ্‌ব। কিন্তু এ সব চণ্ডমুণ্ড বধের পালা, একেবারে সা রে গা মা পা ধা নি, তেরেকেটে মেরেকেটে ছাড়া আর কথা নেই, ঠিক ঘাস ডিঙ্গিয়ে ঘোড়া খাওয়া আর কি! বুঝেছ!

সকলে একবাক্যে। বুঝেচি বই কি! (হাহা হোহো)

তিন। বুঝেচেন ধীরাজ বাবু?

ধী। না বাবু কিছু বুঝি নি।

নে। ধীরাজ বাবু বুঝেচেন ত?

ধী। না বাপু, কি কথাগুলো বল্লে বুঝ্লুম না।

তিন। কথা নেই বুঝ্লেন, ওর মজাটাত বুঝেচেন? কথাত আমরাও বুঝি নি।

দামোদর ও চিন্তা। বুঝেচেন রসিক বাবু, ও কথাগুলোও লিখ্তে হবে। ওতে লোকে আরো বেশি হাসবে।

রসিকবাবু। (ধীরাজ বাবুর প্রতি) আপনার মুখে হাসি নেই যে! হাস্‌লে কোন হানি আছে কি?

ধী। তা রাগ করিবেন না, আমি হাস্‌বার চেষ্টা করচি।

চি। আপনি বুঝি ভ্রাতাদের কেউ হবেন?

রসিক। ভ্রাতাও হতে পারেন, ভর্ত্তাও হতে পারেন।

দা, চি, তি, নে, ভো, নী। (হাতে তালি দিয়া) বাহবা বাহবা, কি মজা! হাহা হোহো হিহি।

দা। এটাও লিখ্‌বেন। ভারি মজা হবে। (ধীরাজের প্রস্থানোদ্যম)

নী। (ধীরাজকে ধরিয়া)। মশায় যান কোথায়?

ধী। বুকে টার্পিন তেল মালিষ করতে যাই, রসিক বাবু বড্ড বলেচেন! (প্রস্থান।)

চি। ভারি জব্দ। লোক সমাজে ও আর মুখ দেখাতে পারবে না। খুব পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়েচেন!

রসিক। পাঁচ কথা আর শোনালুম কই। আড়াই খানার বেশি কথাই কইনি!

(লোক সমাগম। অত্যন্ত ভিড়। রসিক বাবুকে ঘিরিয়া সকলের অবিশ্রাম হাস্য।)

দামোদর ও চিন্তামণি। ওকথাটাও লিখ্তে হবে! ওটা টুকে রাখুন, বুঝেচেন রসিক বাবু।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাবিত্রী। সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক অধিবেশনের কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। লাইব্রেরী সংস্থাপন নিশ্চয়ই একটি হিতানুষ্ঠান এবং বৎসরের মধ্যে একদিন সেখানে লেখা পড়া যাঁহারা জানেন এবং সমাজের বিষয় ভাবেন, এমন কতিপয় দেশীয় লোক একত্রিত করাতে অনেক উপকার হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু যে পদ্ধতিটি ছয় বৎসর মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে একটি কীর্ত্তি বলিতে সহসা সাহস হয় না। কিন্তু আশা করা যাইতে পারে যে কালে তাহা একটি কীর্ত্তিতে পরিণত হইবে। দত্ত পরিবার সুশিক্ষিত, সুখ্যাত। তাঁহাদিগের এই নূতন শুভ অনুষ্ঠানটি স্থায়ী হইলে সাহিত্যের অনেক সাহায্য হইতে পারে।

"সাবিত্রী" নাম দিয়া কতিপয় প্রবন্ধ যাহা সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক অধিবেশনের সময় পঠিত হইয়াছে, তাহা গোবিন্দ বাবু একত্র করিয়া ছাপাইয়াছেন। সেগুলি পাঠ্য এবং মধ্যে মধ্যে তাহাতে গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দ বাবুর সুচারু সম্পাদন কার্য্য সাহিত্য সমাজের ধন্যবাদোপযোগী। সাবিত্রীর লেখকগণ সকলেই সুপরিচিত। আমরা প্রবন্ধগুলি পড়িয়া অনেক কথা ভাবিয়াছি, অনেক নূতন চিন্তা অনুসরণ করিয়া নূতন ভাব দেখিতে পাইয়াছি এবং সেই জন্য দীর্ঘ সমালোচনা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

প্রথম প্রস্তাব পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের—বিষয় "বাঙ্গলা সাহিত্য"। দুঃখের কথা যে তাহাতে নূতন বড় কিছুই পাইলাম না। দুই চারি কথায় সাহিত্যের ইতিহাস দেওয়া কঠিন কিন্তু সাহিত্যের উন্নতির কিংবা অবনতির মূল কারণগুলি এবং ইতিহাস বোধ হয় অনেকেই দিতে পারেন। শাস্ত্রী মহাশয় পণ্ডিত। তাঁহার নিকট আমরা একটু অধিক আশা করি। ১৮০০ সালের প্রথমেই ভারতবর্ষে কোথা কি হইতেছিল, তাহার সবিস্তার উল্লেখের কোন প্রয়োজন দেখিলাম না। তাঁহার কাছে যে দুই একটি নূতন কথা জানিলাম, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই।

"সে সময়ের (অর্থাৎ ১৮০০ সালের) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন"। প্রমাণ জন কতক পণ্ডিতের নাম, কিন্তু তাহা কি যথেষ্ট? আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস আছে যে কোনরূপ রচনা কল্পনা না করিতে পারিলে চলে না। ইতিহাস যদি স্বপ্ন-মূলক হয়, কবিতার দশা কি হইবে? আমার মনে হয় যে উপরের কথাটি কল্পনা-মূলক। পরে আবার শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হাস্যজনক। "তাঁহারা (ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা) ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ ছিলেন—তাঁহাদিগের সাহস ও অকুতোভয়ছিল"। গৌরবের কথা কিন্তু সাহসের যে সূক্ষ্ম কারণটি দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত

ভেতো রকম। "তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা ৬০। ৭০ জন ছাত্র থাকিত।" ধর্ম্ম বল নহে, মনের বল নহে,সামাজিক বল নহে,সূক্ষ্ম কারণটি শারীরিক বল—৬০।৭০ ছাত্রের শারীরিক বল। দুই এক ছত্র পরেই আবার দেখিতে পাই যে "সাহিত্যের উন্নতি তাহাদিগের ব্যবসায় ছিল না।" সে যাহা হউক এ কয়েকটি কথার অর্থ কি? "তাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী, সাহিত্য ব্যবসায়ী ছিলেন না"। আজ কালকার সাহিত্য দেখিলে মনে হয় বটে যে তাহার সহিত বিদ্যার কোনই সম্পর্ক নাই কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে কথাগুলির স্বার্থকতা দেখিতে ইচ্ছা করে। বীমস্ সাহেব কি একজন এতই বড় লোক যে বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার মতের উল্লেখ আবশ্যক? বড়ই লজ্জার কথা। আর এক কথা—বাঙ্গলা লেখকদিগের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রাজনারায়ণ বসু, রামদাস সেন, প্রভৃতির নাম করেন নাই কেন? তাঁহারা কবিতা কিম্বা উপন্যাস লেখেন না বলিয়া কি? ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে শাস্ত্রী মহাশয়ের বোধ হয় একটা বিশ্বাস আছে যে, বিদ্যা এবং সাহিত্য খানিকটা বিবাদী।

দ্বিতীয় প্রস্তাব, "আমাদের অভাব" লেখক শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু। অনেক কথা আছে, কিন্তু নূতন কিছুই নাই, কিংবা পুরাতন কথা নূতন ভাবেও নাই।

পরের দুইটি প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের। "হিন্দু পত্নী" এবং "হিন্দু বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য" পড়িয়া কল্পনার বৈচিত্র্য, কবিত্ব শক্তি, ভাষার সৌন্দর্য্য এবং তর্ক করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এত বল, এত প্রতিভা অসত্য প্রচারে নষ্ট হইয়াছে। স্বীকার করি যে "হিন্দু পত্নীর" সামাজিক অবস্থা অতি উন্নত ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার সবই সত্য স্বীকার করি না—এমন কি তাহার অধিকাংশ অসত্য বলিতে বাধ্য হইতে হয়। হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অতি সুন্দর, অতি উচ্চ দরের—ইহা বলিতে অনেক বাজে কথা আছে। যে কয়েকটি শ্লোক মনু হইতে উদ্ধৃত, তাহার উপর অত কথা সাজাইয়া বলা তাঁহার ভাল দেখায় না। যিনি মনু পড়িয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া সেই শ্লোকগুলিকে বাছিয়া লইয়া সত্য রক্ষা করিয়া হিন্দু রমণীকে অতদুর উচ্চ পদবী দিতে পারেন। আবার যিনি সংস্কৃত ছাড়া অন্য দেশের ভাষা এবং অন্য জাতীয় ইতিহাস জানেন, তিনি কেমন করিয়াই হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি দেখিয়া পৃথিবীতে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে নূতন রকমের এবং অদ্বিতীয় বলিতে পারেন। জানিয়া শুনিয়া বলিলে সত্যের অবহেলা করা হয়—সত্যের অবমাননা করা হয়। হিন্দু পদ্ধতিকে উন্নত করিতে গিয়া নিজকে অবনত করিতে হয়। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লাটীনদিগের নিয়মাদি জানেন কি না—জানি না, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সহিত তাহাদিগের কোনই প্রভেদ নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

দান ও গ্রহণ পদ্ধতি রোমে একই রকম ছিল। হিন্দু বিবাহে যেমন হোম একটি প্রধান ক্রিয়া, রোমেও সেইরূপ।

(ডাইজেষ্ট অব জাষ্টিনিয়ান বিধি ৬৬ : ১ দেখ)

কাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে, সে বিষয় হিন্দু এবং রোমান নিয়ম প্রায়ই এক। সম্প্রদান একবার মাত্র।

সকৃদংশোনি পততি
সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি
ত্রীণ্যেতানিস্বতাং সকৃৎ

(মনু, ৯অ—৪৭)

অংশ একবার, কন্যাদান একবার, দানবাক্য একবার, সাধুদিগের এই তিন কার্য্য একবার।

রোমান আইন (বিধি ১৩: ১, অধ্যায় ৩)

"যদি কেহ কন্যা একবার সম্প্রদান করিয়া অন্যকে বিবাহ দেন, তাহাকে বিধিমত শাস্তি দেওয়া যাইবে।"

"কন্যাকর্ত্তা কন্যাটিকে বরকে দান করেন" হিন্দু এবং রোমান নিয়ম। "সে দানের গুণে কন্যা বরের ভার্য্যা হন না, বরের সম্পত্তি হন মাত্র।" এ কথা রোমানদিগের পক্ষেও সম্পূর্ণ সত্য—এমন কি ইংরাজী আইনেরও সেই এক কথা। চন্দ্রনাথ বাবুর তাহা জানা উচিত ছিল।

"বাগ্দানই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি স্বামিত্বের কারণ"। রোমেও তাহাই। (আইন : ২ : ১৩২)

মনুতে পুরুষ অর্থে—জায়া, আত্মা, অপত্য। রোমে (Pater) (পেটর অর্থাৎ পিতৃ) যাহা সংস্কৃত শাস্ত্রে পুরুষ তাহা অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী, অপত্য। সংক্ষেপে রোমে "পিতা" এবং আর্য্যাবর্ত্তে "পুরুষ" উভয়েরই অর্থ এক—অর্থাৎ পরিবার।

যদি সব বিষয়েই হিন্দু এবং রোমান বিবাহ পদ্ধতি এক হইল, তাহা হইলে চন্দ্রনাথ বাবুর হিন্দুদিগের অদ্বিতীয়ত্ব টুকু ঘুচিয়া গেল, তাহাদিগের পদ্ধতির মাহাত্ম্যের অংশী জুটিয়া গেল, অনেক বক্তৃতা ব্যর্থ হইল।

স্থানাভাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা সুদীর্ঘ সমালোচনা করিতে পারিতেছি না, শুদ্ধ এই জিজ্ঞাসা করি যে লেখক

১ম। কোন সময়ের হিন্দুদিগের সামাজিক অবস্থার কথা বলিতেছেন?

২য়। হিন্দু অর্থে ব্রাহ্মণ কি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কোন সম্প্রদায় বিশেষের কথা?

৩য়। এই হিন্দুরা ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে কতদিন কি ভাবে ছিলেন ?

৪র্থ। তাঁহাদিগের রাজ্যতন্ত্র এবং সামাজিক নিয়ম বিষয়ে কেমন করিয়া জানা যায় ?

৫ম। হিন্দু অর্থাৎ হিন্দু পতি বহু বিবাহ কারতে পারগ কি না ?

৬ষ্ঠ। ।৲দু স্ত্রী এবং শূদ্র বিধ-কারকদিগের চক্ষে এক কি না ?

৭ম। হিন্দু স্ত্রীর যতদূর শপথ করিতে হয় হিন্দু পতীর তাহা হয় কি না ?

৮ম। হিন্দুধর্ম্ম নিজের জন্য না সমাজের জন্য। যদি নিজের জন্য হয়, তাহা হইলে বিবাহ পদ্ধতি দ্বারা কেমন করিয়া পরোপকারের কথা সপ্রমাণ হয় ?

৯ম। হিন্দু স্ত্রী পরিত্যজ্য কি না? য দূর বুঝি এবং যতদূর জানি, তাহাতে প্রথম চারিটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর অসম্ভব—অর্থাৎ যে হিন্দু সমাজের কথা আজ কাল এত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার এব সাময়িক অস্তিত্ব বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। নিজের পাঁচটি প্রশ্নের সত্য উত্তর চন্দ্রবাবুর হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যার বিপরীত।

"অকালকুষ্মাণ্ড" ও "হাতে কলমে" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লেখা। প্রথমটি সাহিত্যে সত্য ভাব ও সত্য কথার অভাবের উপর লিখিত। দ্বিতীয়টি "জাতীয়ত্বের" মিথ্যা কতটুকু, তাহার উপর ৩.. সমালোচনা। লেখা অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী, তাহা বলা আবশ্যক নাই; কিন্তু তাহাতে এত অধিক উপস্থিত সভ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথা আছে যে, তাহার স্থায়ী ভাব কম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যাঁহারা প্রবন্ধ পাঠ কালে উপস্থিত, তাহা ভিন্ন অন্য অনেক লোকে রবীন্দ্র বাবুর লেখা পড়িতে ইচ্ছুক, সেই জন্যই তাঁহাকে স্থায়ী ধরণে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিতে ইচ্ছা হয়।

"সোনার কাটি—রূপার কাটি" এবং "সোনায় সোহাগা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লেখা। বিলাত ফেরতকে অন্যায় খানিকটা গালি দিয়াছেন। তবে মনে থাকা উচিত যে, কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাত ফেরত দশীয় লোক খানিকটা বিলাতী ছিলেন। এখন ইলবার্ট বিলের পরে অনেকেই ও..বার দেশীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সে যাহা হউক শ্রদ্ধেয় লেখকের মুখে গালি শো.. পায় না।

"হিন্দু বিধবার আব.. বিবাহ হওয়া উ... কি না ?" এই প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়-চন্দ্র সরকার মহাশয়ের।

পণ্ডিতবর আচার্য্য ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উত্তর হিন্দু বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত, অতএব হিন্দু সমাজে অসবর্ণদিগের কথা বলিতেছি না, তাঁহার কথা অনেক লোকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু সরকার মহাশয়ের কথার মূল্য তাহার পার্শ্বে বড়ই কম।

শেষ চারিটি প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে এবং এক জন মহিলা। শেষ তিনটি বেশ হইয়াছে।

সাবিত্রী অনেকেই পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ

নাই। আজ কাল সামাজিক চিন্তা যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগের পুস্তকখানি পড়া নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

বিষাদ সিন্ধু। মহরম পর্ব্ব। মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত।—প্রায় এক হাজার বৎসর হইতে চলিল, মুসলমানগণ আসিয়া বঙ্গে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এত দীর্ঘকালেও বঙ্গবাসী হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম ইতিহাস কাহিনী সম্যক অবগত নহেন; যা জানেন তা ভাসা ভাসা উপরি উপরি মাত্র। যদি মুসলমানগণ বঙ্গ সাহিত্যের অনুরাগী হইয়া তাঁহাদের ইতিহাসাদি খাঁটি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কেবল উক্ত অভাব দূর করিতে পারেন, এমন নহে—এই সূত্রে উভয় জাতির মধ্যে ক্রমে একটা সখ্যতা স্থাপন হইতে পারে। তাই বিষাদ সিন্ধু পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গলা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট, নায়ক নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাঙ্গলা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

লেখক বিষাদ সিন্ধুর দ্বিতীয় ভাগ লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা আগ্রহসহকারে তাহার আপেক্ষায় রহিলাম। আশা করি এইরূপে তিনি তাঁহাদের ধর্ম্ম ইতিহাস সম্বন্ধীয় নানা কাহিনী ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিবেন।

ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী। দ্বিতীয় ভাগ। অর্থাৎ দাম্পত্য প্রণয়, গৌরাঙ্গ এবং কৃষ্ণ বিষয়ক গ্রাম্য গীতি, কীর্ত্তন, রহস্য ও বিবিধ বিষয়ক গান সংগ্রহ। শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

এই পুস্তক খানিতে পুরাতন ও আধুনিক কিছু কম সাত শ গান আছে। গানগুলি সবই প্রায় বাছা বাছা। এইরূপ নানা ভাবের উৎকৃষ্ট বিক্ষিপ্ত সঙ্গীত একত্র প্রকাশ করিয়া সংগ্রহকার যে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

বইখানি সম্বন্ধে একটি কেবল আমাদের কথা আছে। সংগ্রহকার ইহাতে একটু অনুসন্ধানের অভাব দেখাইয়াছেন। আমাদের জানা অনেকগুলি গান—এমন কি যাহা ইতিপূর্ব্বেই রচয়িতার নাম পর্য্যন্ত বক্ষে ধরিয়া পুস্তকাকারে বাহির হইয়া গিয়াছে—তাহাও অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ অবস্থায়—এবং অজ্ঞাত লেখক নাম পাইয়া সঙ্গীত মুক্তাবলীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সংগ্রহকার সেই গানগুলি লোকের মুখে আধা খ্যাচড়া শুনিয়া পুস্তকে সন্নিবেশ করিবার পরিবর্ত্তে যদি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের এরূপ বিকৃত দশা হইত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটা আমরা তুলিয়া দিই।

সঙ্গীত মুক্তাবলীতে—

বলি গো সজনী যেও না যেও না তার কাছে।
সখি যেও না যেও না।
সুখে সে রয়েছে সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোল না।
সে যদি আমায় ভাল না বাসে,
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না।

সংগ্রহকার বলিয়াছেন ইহার লেখক অজ্ঞাত। অথচ আসল গানটি রবিচ্ছায়াতে ছাপা হইয়া গিয়াছে, গানটি এই।—

খট—একতালা।

বলি গো সজনি যেওনা যেও না,
তার কাছে আর যেও না যেও না—
সুখে সে রয়েছে, সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোলোনা বোলোনা।
আমারে যখন ভাল সে না বাসে—
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি কাজ কি কাজ কি সজনি
মোর তরে তারে দিও না বেদনা।

সঙ্গীত মুক্তাবলীতে—

এ সুখ বসন্তে সই কেনেলো এমন আপনহারা বিবশা আহা মরি,
কুন্তল আলু থালু এলায়ে কপোলে পড়ি।
হাসে চন্দ্র ঘুমন্ত জোছনা, হাসি ঢালে
মল্লিকা সুরভি রাশি রে। বোলে পাপিয়া
পিউ পিউ রবে, কুজে কোয়েলা কুহু কুহু রবে কুঞ্জে কুঞ্জে।
আয় কুঞ্জে ফুটন্ত মল্লিকা তুলি গাঁথি,
দুজনে মিলিয়ে গানে গানে পোহাইব সুখ রজনীরে।

অশ্রুমতীতে আছে—

এ সুখ বসন্তে সই, কেনেলো এমন আপন হারা, বিবশা আহা মরি,
কুন্তল আলু থালু এলায়ে কপোলে পরি।
হাসে চন্দ্র ঘুমন্ত জোছনা হাসি, ঢালে মল্লিকা
সুরভি রাশিরে, বোলে পাপিয়া পিউ পিউ,

কুঞ্জে কোয়েলিয়া কুহু কুহু রবে, কুঞ্জে কুঞ্জে।
যদি হাসে চাঁদ মধুর হাসিরে, মলিন কেন হেরি
ও মুখ শশীরে, যদি গাহে পাখী, তবে কেন সখি নীরবে রহিবি হায় !
আয় কুঞ্জে ফুটন্ত মালতী তুলি,
গাঁথি মালিকা দুজনে মিলিয়ে
গানে গানে পোহাইব সজনি রজনীরে।

সঙ্গীত মুক্তাবলীতে—

চন্দ্র শূন্য তারা শূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
দুরভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে।
ভয়ানক সুগভীর, বিষাদের এ তিমির
আশারো বিজলি রেখা উজলে না এই হিয়ে।
হৃদয়ের দেবতারে, পূজিনু জনম ধরে,
মর্ম্মভেদী যাতনায় অশ্রুজল দিয়ে।

গানটি বসন্ত উৎসবে আছে। ইহার শেষের দু-লাইন সঙ্গীত মুক্তাবলী একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে, তাহা এই—

দিয়াছি হৃদয় প্রাণ, সকলি ত বলিদান,
একটু মমতা তবু পাইনু না ফিরিয়ে।

পুস্তক খানিতে কোন কোন দীর্ঘ গানের অস্তিত্ব আবার মোট দুলাইনেই লয় পাইয়াছে; সে সব এখানে উঠাইয়া আর আমরা সমালোচনা অধিক দীর্ঘ করিতে চাহি না।

পুস্তক খানির দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সংগ্রহকার যদি এই সমালোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে ইহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পঞ্জাব ভ্রমণ।

৬

মূলতান পথে।

মূলতান লাহোর হইতে পশ্চিম দক্ষিণে একশ ক্রোশ। ২৬ মাইল পথ রেলে চলিলে রায়্‌য়িণ্ড্‌ ষ্টেশন। ইহার ১৬ মাইল দক্ষিণে কসুর নগর। লোক প্রবাদ—কসুর রামের পুত্র কুশ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। লাহোর সম্বন্ধে প্রবাদ—লাহোর লও বা লব কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। কসুরে প্রাচীন দালানাদির ভগ্নাবশেষের অন্ত নাই। এককালে বোধ হয় এখানে বহু লোকের বসতি ছিল। বারটা দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কসুরের চতুর্দ্দিকেই যেমন মসজিদ, সমাধি মন্দির ও আর আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়—প্রাচীন কসুরের বেষ্টন ৪।৫ মাইলের কম ছিল না। টাকী হইতে চীনাপটীর পথে হোয়েন্‌সঙ্গ এক মহানগরীতে এক মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। জেনেরাল কনিংহম্‌ কসুরকেই সেই মহানগরী মনে করেন। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে এখানে অনেক পাঠান বাস করিতেছে। তাহার পূর্ব্বে রাজপুতেরা এখানে বাস করিত। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে শিখেরা পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া কসুর অধিকার করে। কসুরের পাঠান আর শিখদিগের মধ্যে বহু বর্ষ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ লইয়া অনেক গ্রাম্য-কবিতা ও গান আছে।

কসুরের ১৪ মাইল দক্ষিণে ফিরোজপুর। এখানে কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য থাকে। পঞ্জাবে নাকি ইংরেজের এত বড় অস্ত্রাগার (arsenal) আর নাই। ফিরোজপুর বিশেষ প্রাচীন নগর নয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ফিরোজ সা টোগ্‌লক্‌ ইহা স্থাপন করেন। মুসলমানদের সময়ে ফিরোজপুর মস্ত বড় সহর ছিল। এখানকার প্রাচীন দুর্গে ইংরেজেরা তাঁহাদের কমিশ্যারিয়েট্‌ বিভাগ সংস্থাপন করিয়াছেন। আইন আক্‌বরিতে লেখা আছে শতদ্রু ফিরোজপুরের পূর্ব্ব দিক দিয়া বহিয়া যাইত। এখন শতদ্রু ফিরোজপুরের পশ্চিমদিক দিয়া বহিয়া যাইতেছে। শতদ্রু-সমরে (Sutlej campaign—ক্যাম্পেনের একটা ভাল বাঙ্গালা কথা পাইলাম না—আমার জ্ঞানে বাঙ্গলায় War, campaign, battle, action সকলই সমর বা যুদ্ধ) যে সব ইংরেজ মরেন, তাঁহাদিগের একটি স্মৃতি-গির্জ্জা (Memorial church) এখানে আছে। বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়াছিল। পরে পুননির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮৪৮ সালে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ফিরোজপুরে ১৫ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধাভিনয় করেন। মহারাজা রণজিৎ সিংহ আমন্ত্রিত হইয়া সে যুদ্ধাভিনয় দেখিয়াছিলেন।

প্রথম শিখ সমরের যুদ্ধক্ষেত্রগুলি সকলই ফিরোজপুরের নিকটে। ফিরোজপুরের ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে মুদ্‌কি। প্রথম শিখ সমরের মুদ্‌কিই প্রথম যুদ্ধ। ১৮৪৫ সালে ১৮ই ডিসেম্বর এ যুদ্ধ হয়। গবর্ণর জেনেরেল সার্ হেনরি হার্ডিঞ্জ আর সেনাপতি সার্ হিয়ু গর্ফ সেনাপতিত্ব করেন। এ যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে ৫০ জন সেনা নায়ক (officer) ও ৮।৯ শ সৈন্য নিহত হয়। গবর্ণর জেনেরেলের দেহ-রক্ষকগণ প্রায় সকলেই হত হইয়াছিল। ফিরোজপুরের ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে ফিরোজ সার যুদ্ধ ক্ষেত্র। ২১ শে ও ২২ শে ডিসেম্বর অর্থাৎ মুদ্‌কির যুদ্ধের দু দিন পর এখানে আবার ইংরেজ ও শিখে যুদ্ধ হয়। এখানে ইংরেজেরা ২০০০ সৈন্য হারান। শতাধিক সেনানায়ক হত ও আহত হয়। শিখদিগের নাকি ৮০০০ সৈন্য নষ্ট হয়। তুলি সিংহের হস্তে—সত্য মিথ্যা জগদীশ্বর জানেন। গবর্ণর জেনেরেল নাকি যুদ্ধের পূর্ব্বক্ষণে "জিত'ব না হয় মর'ব" সঙ্কল্প করিয়া আপন পুত্রের হাতে বুকের উপর হইতে ঘড়ি ও নক্ষত্র (Star) খুলিয়া দেন। প্রসিয়ার প্রিন্স ওয়াল্ডিমার ও আরো জন কতক জর্ম্মান এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। ফিরোজপুরের ২৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে শতদ্রু তীরে প্রথম শিখ সমরের তৃতীয় ও শেষ যুদ্ধ ক্ষেত্র। আমি সোব্রায়োনের যুদ্ধ ক্ষেত্রের উল্লেখ করিতেছি। ১০ই ফেব্রুয়ারি (১৮৪৬ সাল) এখানে যুদ্ধ হয়—শিখেরা পরাজিত হয়। সোব্রায়োনের যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। প্রত্যূষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়—দ্বিপ্রহরে শেষ হয়। শতদ্রু-বক্ষে যে নৌ-সেতু ছিল, কথিত আছে শিখ সর্দ্দার তেজ সিংহ তাহা পলায়নের আশা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। শিখেরা এ যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত নায়কাভাবে, ইংরেজ কামানের বলে অবশেষে তাহারা পরাজিত হয়। এমনি তাহারা বীরত্ব দেখাইয়াছিল যে, যখন কোন আশা রহিল না, তখনও কেহ রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল না, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। একজন ইংরেজ সেনানায়ক যিনি সে যুদ্ধে ছিলেন, বলিয়া গিয়াছেন যে ইংরেজ সৈন্য সোব্রায়োন ক্ষেত্রে ভয়ানক নৃশংসতা করিয়াছিল। ১৩।১৪ হাজার শিখ বীর এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে। ব্রিটিশ সৈন্য শতদ্রু পার হইয়া লাহোর অধিকার করে।

রায়ুয়িণ্ড ছাড়াইলে চাঙ্গামাঙ্গা নামে একটা ষ্টেশন আছে। নামটা অদ্ভুত বলিয়াই তাহার উল্লেখ করিলাম। তবে এখানে এ কথাটা বলা যাইতে পারে যে পঞ্জাবী ভাষায় 'চাঙ্গা' মানে ভাল, উৎকৃষ্ট। লাহোর হইতে মূলতান পথে ৮০ মাইল দুরে ওকারা ষ্টেশন। এখান হইতে ষোল মাইল দক্ষিণে শতদ্রু-তীরে দীপালপুর। মোগলদিগের সময় দীপালপুর এই জেলার প্রধান নগর ছিল। পাঠানদিগের সময়ে দীপালপুর অতি সুরক্ষিত (fortified) ছিল। লোক কথা এই যে শ্রীচাঁদ নামে কোন ব্যক্তি দীপালপুর রচনা করেন। রাণী কোকিলন ও রাজা হোদীর প্রেম-কাহিনী এখানে মিরাসী বা ভাটেরা গাইয়া বেড়ায়। তৈমূরের আক্রমণের সময়ে

মুলতানের পরে দীপালপুরের সমান নগর আর এ প্রদেশে ছিল না। তখন নাকি দীপালপুরে ৮৪ টা বুরুজ, ৮৪টা মস্‌জিদ ও ৮৪টা পাতকুয়ো ছিল। ৮৪টা পাতকুয়ো একটা সহরে থাকা যে কি আশ্চর্য্যের বিষয়—বুঝিতে পারিলাম না। এখন দীপালপুর একটি ক্ষুদ্র সহর। ফিরোজসা টোগ্‌লক্ দীপালপুরকে বড় ভাল বাসিতেন—অনেক সময় দীপালপুরে আসিয়া বাস করিতেন। তিনি দীপালপুরে একটি মস্‌জিদ ও জলপ্রণালী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাবর লাহোর অধিকার করিয়া দীপালপুর আক্রমণ করেন। তখন দীপালপুর সুবিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এখানে বাবা লালা যশ্ রায়ের মন্দির নামে একটি মন্দির আছে। ক্ষত্রিয়েরা লালা যশ রায়কে দেবতার মত সম্মান করে। জেনেরেল কনিংহমের মতে টোলেমির উল্লিখিত দৈদাল নগর আর দীপালপুর অভিন্ন। রাজা দেব পাল ইহার সংস্থাপনা করেন। যে সব প্রাচীন মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, দীপালপুর ইন্ডোসিকীয়দিগের সময়েও সুপরিচিত ছিল।

দীপালপুরের ৩০।৪০ মাইল পূর্ব্বে মুক্তাসর (মুক্তিসর) নামে শিখদিগের একটা তীর্থ স্থান। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে গুরু হরগোবিন্দ দিল্লীশ্বরের সেনার সঙ্গে এক যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। তাঁহার স্মরণার্থে এখানে জানুয়ারি মাসে শিখদিগের একটা মহা ধর্ম্মোৎসব হয়। একটি সরোবর আছে, তাহাতে যাত্রীরা স্নান করিয়া মুক্ত হয়। এই সরোবর নির্ম্মাণ রণজিৎ সিংহ আরম্ভ করেন; পাটীয়ালার মহারাজা কতক নির্ম্মাণ করেন; ইংরেজ তাহা সমাপ্ত করিয়াছেন। সরোবর খণন না বলিয়া নির্ম্মাণ বলিলাম বলিয়া যেন কেহ আমার উপর রাগ না করেন। পঞ্জাবে লোক সরোবর নির্ম্মাণই করে বটে।

ওকারার ৮ মাইল আগে পাকপট্টন রোড ষ্টেশন। পাকপট্টন নগর এখান হইতে ২৩ মাইল দূরে। শতদ্রু এক সময়ে এই নগরের পাদদেশ চুম্বন করিয়া বহিত—এখন শতদ্রু ১০ মাইল দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। মধ্য আসিয়া হইতে ডেরাইস্‌মাইলখাঁ ও ডেরাগাজীখাঁ হইয়া যে দুই প্রধান বর্ত্ম ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা আসিয়া পাকপট্টনে মিলিত হইয়াছে। এখানেই শতদ্রু পার হইবার প্রধান স্থান। মামুদ ও তৈমূর এখানে শতদ্রু পার হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবন্‌বাতুতাও এখানেই পার হইয়াছিলেন। তৈমূর মূলতান অধিকার করিয়া পাকপট্টন অধিকার করেন। তৈমূর নৃশংস ও লুণ্ঠনপ্রিয় হইলেও পাকপত্তনকে ধ্বংস বা লুণ্ঠন করেন নাই। এখানে বাবা ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ নামে একজন অতি বিখ্যাত ফকীর ছিলেন—তাঁহারই স্মৃতির অপমান করিবেন না বলিয়া পাকপট্টনের প্রতি কৃপা করেন। "শক্করগঞ্জ" কথাটা শুনিয়া পাঠক বোধ হয় কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ফকীর জী নাকি মাটীকে যখন ইচ্ছা তখনই শর্করায় পরিণত করিতেন—তাই তাঁহার উপাধি শক্করগঞ্জ। আর এই

বাবা ফরীদ নাকি তাঁহার সময়ের ঠগদিগের মহাপ্রভু ছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষের ঠগদিগের উপর ইঁহার প্রভুত্ব ছিল। ঠগদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা অদ্ভুত ঘটনা ঘটাইতেন। অনেক লোকে মনে করে তাঁহার ক্ষমতা দিল্লীশ্বরেরও অধিক ছিল। দক্ষিণ পঞ্জাববাসীদিগকে তিনিই মুসলমান করেন। তাঁহার অনেক অলৌকিক কার্য্যের কথা শুনা যায়। বাবাজীর সম্মানার্থে প্রতিবৎসর মহরমের সময়ে একটা মেলা হয়। বাবাজীর মন্দিরে প্রবেশ করিবার একটি অনুচ্চ ও অপ্রশস্ত দ্বার আছে, তাহার নাম স্বর্গ-দ্বার। মহরমের সময় একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহারা এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারে, তাহাদের স্বর্গের টিকেট একেবারে কেনা হইয়া যায়। প্রবেশের সময় ভিড়ে অনেকের প্রাণ হানি হইতে শুনা গিয়াছে। তাহারা টিকেট পায় কি না, কেহ বলিতে পারে না। বাবাজীর চতুর্ব্বিংশতিতম বংশধর এখন বাবাজীর মন্দিরে রাজত্ব করিতেছেন।

লাহোর ও মূলতানের মধ্য পথে মণ্টগমেরি। এখানে সাহীয়াল নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। সার রবার্ট মণ্টগমেরির নামে ইহার নাম মণ্টগমেরি হইয়াছে। মণ্টগ-মেরি এখন একটা জেলার প্রধান নগর; যদিও এখনো অতি ক্ষুদ্র নগর। মণ্টগমেরি হইতে মূলতানের দিকে যতই যাওয়া যায়, ততই দেশটা মরুভূমির মত। যে মহা মরুভূ পূর্ব্বে যোধপুর ও বিকানীর হইতে পশ্চিমে সিন্ধু ও শতদ্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এই প্রদেশ তাহারই পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। মণ্টগমেরি হইতে দশ মাইল দূরে ইরাবতীর প্রাচীন তীরে (ইরাবতী এখন দূরে সরিয়া পড়িয়াছে) বভন্নীর উচ্চ ভগ্ন দুর্গ। ইহা কাহার নির্ম্মিত—কেহ জানে না। বহু শতাব্দী গত হইল ওয়ালী বভন্নী নামে একজন মুসলমান ইহার মেরামত ও অংশতঃ পুনর্নির্ম্মাণ করেন—তাই নাম বভন্নী কেল্লা। ইহারই নিকটে একজন গাজীর গোরস্থান আছে। গাজী বলিতে ধর্ম্মার্থে যে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেয়, তাহাকে বুঝায়। এই সমাধিস্থানকে নওগজা সমাধিস্থান কহে। মূলতানেও এরূপ নওগজা সমাধিক্ষেত্র আছে। নওগজা বলিবার মানে এই যে, লোকের বিশ্বাস এই সব গাজীরা এক এক জন নয় গজ লম্বা ছিলেন।

হরপ্পা ষ্টেশন মণ্টগমেরি হইতে ১৩ মাইল। হরপ্পা ষ্টেশনের নিকটে রাভীর পশ্চিম তীরে প্রাচীন হরপ্পা নগরীর ভগ্নাবশেষ। হরপ্পা অতি সুবিস্তৃত নগরী ছিল। এখন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। জেনেরেল কনিংহাম অনুমান করেন চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েনসঙ্গ পোফাটোলো নামে যে নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন, হরপ্পা সেই পোফা-টোলো। হরপ্পা তখন অসংখ্য লোকের বসতিস্থান ছিল। হরপ্পা কখন বা কিরূপে বিনষ্ট হয়, জানা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন সেকেন্দর শাহা মালীদিগের যে সব নগর আক্রমণ করেন, হরপ্পা তাহারই মধ্যে এক মালী নগর। তাঁহার সেনাপতি মালী নগরগুলি সমস্তই ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন। কেহ অনুমান করেন আরব সেনা-

পতি মহম্মদ কাশীম যখন অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিন্ধু দেশ ও পঞ্চনদ আক্রমণ করেন, তখন হরপ্পার বিনাশ হয়।

হরপ্পা ছাড়াইলে ১১ মাইল আগে চিচাওয়াট্‌নি নামে একটা ষ্টেশন। এখান হইতে ঝঙ্গে যাইতে হয়—ঝঙ্গ এখান হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে ৫৬ মাইল দূরে। মাল খাঁ নামক এক জন সিয়াল বংশীয় রাজপুত কর্ত্তৃক পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঝঙ্গ নগর সংস্থাপিত হয়। সিয়াল বংশীয় রাজপুতেরা মুসলমান ছিলেন—ইহাঁরা বহুকাল ঝঙ্গে রাজত্ব করেন। রণজিৎ সিংহের হাতে ইঁহাদিগের রাজত্ব যায়। ঝঙ্গ জিলায় হীর ও রঞ্জা নামে দুই বীর বন্ধুর বীরত্ব ও সৌহার্দ্দের কাহিনী লইয়া অনেক গ্রাম্য-গীতি ও কবিতা আছে। ঝঙ্গ জেলা অনুর্ব্বর—চাষ বাস বড় একটা নাই। বাসিন্দারাও জেলার কোন অংশের বাসিন্দা নয়, ইহারা অধিকাংশই পশুপাল—গো মেষ চরানই এদের জীবিকা বা ব্যবসায়। গো মেষ লইয়া আজ এখানে, কাল ওখানে করিয়া বেড়ায়। ইংরেজিতে প্যাস্‌টরেল নমাড্‌ জাতি বলিলেই এই ঝঙ্গের পশুপালদের চরিত্র, আচার ব্যবহার সব বর্ণন হইত।

ঝঙ্গ নগর হইতে ৫২ মাইল দূরে চিনীয়ট নামে নগর। চিনীয়ট অতি প্রাচীন নগর। লোকপ্রবাদ এই যে চন্দন নামে এক রাজকুমারী ছিলেন। তাঁহার শীকারের বড় সখ ছিল—তিনি পুরুষের কাপড় পরিয়া শীকারে বাহির হইতেন। একদা তিনি শীকারান্বেষণে যাইতে যাইতে চন্দ্রভাগা-তীরে একটি অতি রমণীয় স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি এই চন্দনট বা চিনীয়ট নগর নির্ম্মাণ করেন। চিনীয়টের আশে পাশে ছোট ছোট পাহাড় আছে। রাণী চন্দনের সময়ে নাকি পশ্চিম দিকের পাহাড়ের পদ চুম্বন করিয়া চন্দ্রভাগা বহিয়া যাইত। এই পাহাড়ের উপরে শাহা জমালের বিখ্যাত মন্দির। চিনীয়ট হইতে ২০ মাইল দূরে কেরাণা পাহাড়। এখানে শাহাবরহামের সমাধি মন্দির, এবং নবাব সাদুল্লা খাঁ তাহীমের মসজিদ দেখিবার উপযুক্ত বটে। শাহাবরহামের সমাধি মন্দির বিভিন্ন রঙ্গের মার্ব্বলে নির্ম্মিত। নবাব সাদুল্লা খাঁর মসজিদ অতি চমৎকার সুন্দর। চিনীয়টের রাজমিস্ত্রীরা তাহাদের শিল্প নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত। রণজিৎ সিংহ তাঁহার অমৃতসরের সুবর্ণ মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্যে এখান হইতে কারীগর লইয়া যান। শাজিহানও অনেক কারীগর এখান হইতে তাজ নির্ম্মাণের জন্যে লইয়া যান।

চিচাওয়াট্‌নির ১৪ মাইল উত্তরে কোট্‌ কমালীয়া নগর। এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা খরাল ও কাঠীয়া জাতীয়। কাঠীয়ারা সেকেন্দর সাহের সমসাময়িক কাঠীয়ানদের বংশীয় হইবে, কেহ কেহ মনে করেন। মালীদিগের বিরুদ্ধে সমর যাত্রা করিয়া সেকেন্দর শাহা সর্ব্ব প্রথমে কোট্‌ কমালীয়া আক্রমণ ও অধিকার করেন। এখানকার দুর্গ আক্রমণ করিবার সময়েই নাকি সেকেন্দর শাহা আহত হন ও আঘাতে

ক্রোধান্ধ হইয়া কোট্ কমালীয়ার দুর্গাশ্রিতদিগের একটি পর্য্যন্ত প্রাণে বধ করিয়া উদ্দীপ্ত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন।

ঝঙ্গ ও গুজরানওয়ালা জেলার সম্মিলন স্থানে সঙ্গটাওয়ালাটিবা নামে একটা পাহাড়ী জায়গা আছে। সেখানে একটা প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন এখানেই ব্রাহ্মণদিগের 'সকল' বৌদ্ধদিগের 'সগল' ও গ্রীক ইতিহাস-লেখকগণের 'সঙ্গল' নগর ছিল। লোক কথা—রাজা কুশ এখানে এক দিন প্রেয়সী পত্নী প্রভাবতীকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় সাতটা রাজা বহু সৈন্য লইয়া প্রভাবতী হরণোদ্দেশ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করে। কুশ নির্ভয়ে হস্তী চালাইয়া এই অগণিত সেনার সম্মুখীন হইলেন; হইয়া কি করিলেন?—কেন একটা বিকট চীৎকার করিলেন, ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল, রাজা সাতটা উর্দ্ধশ্বাসে পালাইল! সেকেন্দর শাহা সকল বা সঙ্গটাওয়ালা অধিকার করেন। হোয়েনসঙ্গ যখন সকলে উপস্থিত হন, তখন সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটা আশ্রম আর দুটা স্তূপ ছিল—একটা অশোকের নির্ম্মিত।

চিচোয়াটনী ছাড়াইলে ২।১টা ষ্টেশনের পর ছন্নু ষ্টেশন। এখান হইতে ১০ মাইল উত্তর পশ্চিমে ইরাবতী তীরে তুলম্বা গ্রাম। তুলম্বা এক সময়ে সুবিস্তৃত নগর ছিল। তুলম্বা যে অতি প্রাচীন সহর, জেনেরেল কানিংহমের মতে তুলম্বার ভগ্ন দুর্গের ইটই তাহার প্রমাণ। এই ইটগুলি অতি বড় বড়। এ রকম ইট মূলতানের অতি পুরাতন হর্ম্ম্যাদির ভগ্নাবশেষে দেখা যায়। তুলম্বার ২০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে আটারীর ভগ্ন দুর্গ। সেকেন্দর শাহা এ প্রদেশে যে "ব্রাহ্মণদের মহানগরী" অধিকার করিয়াছিলেন, পুরাতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন সে নগরী এখানেই সংস্থিত ছিল। তুলম্বার ২৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে শরকোট নামক স্থান। এখানেও বহু বিস্তৃত নগরের ভগ্নাবশেষ। এখানে সুবিস্তৃত ও অতি উচ্চ একটা মৃৎপিণ্ড বা স্তূপ আছে—চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত; ৬।৭ মাইল দূর হইতে দেখা যায়। জেনেরেল কানিংহম শরকোটকেও মালী নগরী সমূহের এক নগর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

বসন্ত সঙ্গীত।

ফুটিল ফুল, অলি আকুল,
কোকিল কুল কুহরে;
মলয় বায়, পরশি যায়,
লতিকা-কায় শিহরে।
মুকুল মুঞ্জে, ভ্রমরা গুঞ্জে,
কুসুম কুঞ্জে ফুটিল,
হরিত শাখী, গাইছে পাখী,
কলিকা আঁখি খুলিল।
নূতন গান, নবীন তান,
উথলে প্রাণ সজনী,
মধুর হাসি, সুরভি-রাশি,
বিশদ শশী-যামিনী।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

কাফ্রি জাতির বিবাহ-পদ্ধতি।

কাফ্রি জাতিদিগের মধ্যে বহু বিবাহ অত্যন্ত প্রচলিত। প্রায় সকলেরই একাধিক পত্নী আছে। অধিক পত্নী থাকা এদেশে একটী সম্মানের চিহ্ন। কাফ্রিদিগকে গরুর বিনিময়ে পত্নী ক্রয় করিতে হয়—গরুই কাফ্রিদিগের প্রধান ধনের চিহ্ন। যাহার যত গরু আছে, সে তত ধনবান, সুতরাং ধনের পরিমাণ অনুসারে পত্নীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়। রাজার পত্নীর সংখ্যা নাই। ধনবান নহিলে অধিক বিবাহ করা অসম্ভব। কন্যার রূপ গুণ অনুসারে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। সচরাচর একটী কন্যার মূল্য স্বরূপ ১০।১২টী গরু প্রদত্ত হয়। কন্যা যদি বিশেষ সুন্দরী হয়েন, তবে স্থল বিশেষে সৌভাগ্যবান পিতা ৫০টী গরুও লাভ করিয়া থাকেন। কাফ্রি কন্যারা এইরূপে ক্রীত পত্নী হওয়াতে কোন অপমান মনে করে না, বরং নিজেকে মূল্যবান বলিয়া গর্ব্বিতা হয়। যাহার স্বামী যত অধিক মূল্য প্রদান করে, লোক সমাজে তাহার গর্ব্ব তত অধিক। কন্যার পিতা কন্যার সম্বন্ধ স্থির ও মূল্য নির্দ্ধারণ করেন। কখনও কখনও অর্থ লোভী পিতা কন্যাকে কিছু না বলিয়াই তাহার বিবাহ দেন, কিন্তু সাধারণতঃ কন্যার সম্মতি অনুসারে বিবাহ হইয়া থাকে। যখন কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে থাকে, তখন পিতার অনুমতি অনুসারে পরিবারস্থ অন্য সকলে কন্যার নিকটে সর্ব্বদা বরের গুণ কীর্ত্তন করে। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে—বর পিতার যাচিত গো সংখ্যা প্রদানে সম্মত হইলে, বরকে কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করাইবার বন্দোবস্ত হয়। কন্যার সম্মতি ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিবসে বর যথাসাধ্য সুচারু বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া কন্যালয়ে উপস্থিত হয়েন। কন্যাকর্ত্তা বরকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের সহিত আলাপ করাইয়া দেন। কিছুক্ষণ পরে কন্যা আগমন করেন, কিন্তু তিনি গৃহে প্রবেশ করেন না—গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে বরের প্রতি চাহিয়া থাকেন। তার পর কন্যার ইচ্ছানুসারে কন্যার ভ্রাতা বরকে কন্যার সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করিতে বলেন। বর প্রথমতঃ লজ্জার ভাণ করেন কিন্তু কন্যার মাতার উত্তেজনায় ও ভগিনীদের বিদ্রূপ বাক্যে অবশেষে উঠিয়া দাঁড়ান। কন্যা খানিকক্ষণ বরের সম্মুখ ভাগ দেখিয়া পুনরায় ভ্রাতার দ্বারায় বরকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইতে বলেন। এইরূপে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বরকে পুনরায় বসিবার নিমিত্ত অনুমতি দিয়া কন্যা সেখান হইতে চলিয়া যান। কৌতূহল-উদ্দীপ্ত পরিবারবর্গও কন্যার মত জানিবার নিমিত্ত তাহার অনুসরণ করে ও মত জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কন্যা এত অল্প সময়ে সহসা উত্তর প্রদান করেন না, তিনি এখনও বরকে চলিতে দেখেন নাই—বরের হাঁটা না দেখিলে কোন মত দিবেন না। তার পর দিন সকালবেলা বেচারী বর আবার আসিয়া সমুদয় লোকের সম্মুখে তাঁহার চলন-সৌষ্ঠব প্রদর্শন করেন। চারিদিকে লোকে

তাঁহার প্রশংসা করে। তার পর কন্যার মত জিজ্ঞাসা করা হয়। কন্যার পসন্দ হইলে বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে কন্যা ও কন্যা যাত্রীরা বরের বাটীতে উপস্থিত হয়েন। যাইবার পূর্ব্বে কন্যাকে নানা প্রকার বেশ ভূষায় সজ্জিত করা হয়। কন্যার সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করা হয়, কেবল মাঝখানে এক গোছা চুল থাকে। এ চুলগুলিও ছোট ছোট। মোম প্রভৃতি দ্রব্যের সাহায্যে শূকরের লোমের মত সোজা সোজা দাঁড়ান ভাবে এই চুলগুলি রাখা হয়, তাহার চারিপাশের মস্তক লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। কন্যার গায়ে নানা প্রকার চর্ব্বি মাখান হয়। চর্ব্বি ঘসিয়া ঘসিয়া কাফ্রিরা গা এত উজ্জ্বল করে যে, ঠিক বার্ণিস করা কাল চামড়ার মত দেখায়। এইরূপ দেখিতে হইলে তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। তাহার পর সঙ্গতি অনুসারে কন্যাকে অলঙ্কারে ভূষিত করা হয়। কাফ্রি-দের অলঙ্কার পুঁতি। যার যত টাকা আছে. সে তত পুঁতি কেনে। যে নিতান্ত দরিদ্র সে গাছের ফলের মালা গাঁথিয়া পরে। বস্ত্র প্রায় থাকে না, কোমরে একটা ছোট চামড়ার কৌপীন মাত্র পরিধান করে। কন্যা যাত্রীরা সকলে যথাসাধ্য এইরূপ সজ্জা করিয়া নাচের অনুকরণে চলিতে চলিতে বরের বাটীতে উপস্থিত হয়। পুরুষেরা অস্ত্র সজ্জিত হইয়া যায়। প্রথম বরের কন্যার মাতাকে একটী বৃষ উপহার দিতে হয়। এই বৃষটী তৎক্ষণাৎ নিহত ও খাদ্যে পরিণত হয়। তার পর বর কন্যার পিতাকে একটী বৃষ উপহার দেন। এই বৃষটী লইয়া ইহারা অনেকক্ষণ মজার খেলা করে। এই বৃষকে 'অমকুইলসো' বলে। প্রথমতঃ পুরুষ বর যাত্রীরা "দাও আমাদের অমকুই লসো—আমরা চাই অমকুইলসো" বলিয়া গান গাহিতে গাহিতে বরের গৃহদ্বারে উপ-স্থিত হয়। কন্যা-কর্ত্তা তখন বরের নিকট গরু চাহেন—বর ঘরের ভিতর হইতে উত্তর করেন "আমার গরু নাই" পিতা বলেন "তবে কন্যা লইয়া চলিলাম।" বর খানিক-ক্ষণ ঘরে লুকাইয়া থাকেন, অনন্তর স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে অনুরোধ করে, বর তখন অন্য দ্বার দ্বারা গৃহ হইতে পলাইবার চেষ্টা করার ভাণ করেন কিন্তু মেয়েদের হাতে ধরা পড়িয়া হাসিয়া গরু বাহির করেন। এবার কন্যার ভগিনীরা বরকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা বলেন "এ বিশ্রী গরু আমরা লইব না, ভাল গরু দাও", বর বলেন "আর ভাল গরু নাই।" কিছুক্ষণ এইরূপ কৃত্রিম ঝগড়ার পর কন্যার পিতা গরুটী গ্রহণ করেন—গোলযোগ মিটিয়া যায়। কন্যা বরের বাটীর সম্মুখে আগমন করেন। এই বার নাচের পালা। প্রথমতঃ বর এবং তাঁহার আত্মীয় বন্ধুরা মাটীতে উপবেশন করেন, কন্যাযাত্রীরা তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করেন। তাঁহাদের নৃত্য সমাপ্ত হইলে তাঁহারা উপবেশন করেন এবং বর পক্ষীয়েরা তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করেন। উভয় দলেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গান গাওয়া হইয়া থাকে। বর পক্ষীয়দের গানের মর্ম্ম কন্যাকে কর্কশ কথা বলা; তাঁহারা বলেন—কন্যা দেখিতে কি কুৎসিৎ। বরের কি আশ্চর্য্য দয়া যে এই কন্যাকে বিবাহ করিতেছেন এবং তাহার জন্য এত

অধিক মূল্য প্রদান করিয়াছেন—ইত্যাদি। কন্যা পাছে গর্ব্বিতা হয়, তাই এরূপ বলা হইয়া থাকে; কিন্তু কন্যাপক্ষীয়েরাও চুপ করিবার লোক নহে, তাহারা কন্যার পিতা মাতাকে বলে তাঁহাদের কন্যা রত্ন বিশেষ, তাহার রূপ গুণ অতুল্য; একন্যা এত অল্প মূল্যে এরূপ বরকে দেওয়া নিতান্তই শোচনীয়! তাহার স্বামী তাহার যোগ্য নহে। এজন্য বরের বিশেষ লজ্জিত হওয়া উচিত ইত্যাদি। উভয় দলই জানেন উভয়ে রঙ্গ করিতেছেন। কেহই কাহারও কথা বিশ্বাস করেন না। উভয় পক্ষীয় লোকদের নাচ হইয়া গেলে বরের সম্মুখে কন্যা নৃত্য আরম্ভ করেন। নৃত্য করিতে করিতে কন্যা কখনও বরের চুল ধরিয়া টানেন, কখনও বরের মুখে পদধূলি নিক্ষেপ করেন, এইরূপে বেচারী বরের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া কন্যা প্রতিপন্ন করেন যে এখনও তিনি স্বাধীন, বরের তাঁহার উপর কোন হাত নাই। এই নৃত্য শেষ হইয়া গেলে বর আর একটী বৃষ উপহার প্রদান করেন। এতক্ষণ বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই, এতক্ষণও কন্যার পিতা ইচ্ছা করিলে বিবাহ না দিয়া কন্যা ফিরাইয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু এই বৃষ গ্রহণ করিবার পরেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল—কন্যা বরের স্ত্রী হইল। এই বৃষকে 'কন্যার বৃষ' বলে। কন্যার বৃষটীও তৎক্ষণাৎ খাদ্যে পরিণত করা হয়। বৃষ উপহার দিয়া বর কন্যার হাত ধরিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করেন। এইবার কন্যার পিতা কন্যাকে একটী বৃষ উপহার দেন। তার পর সকলে পান ভোজনাদি করিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। এইরূপে কাফ্রি জাতিদিগের অদ্ভুত বিবাহ প্রথা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

জীবনের লীলা ফুরালো।

শিশির জড়িত যথা লূতা-জাল,
ক্ষণ শোভাময় চারু শিশুকাল
কোলে কোলে-সুখে কাটিল!
জগতের স্নেহে ভব-রাজ্য ভরি
বাজিতে লাগিল মোহন বাঁশরী,
শিশুর পরাণ ভুলিল!
বর্ষ চারি পাঁচ হেরি স্বপ্নবৎ
জীবময় এই অপূর্ব্ব জগৎ,
শৈশবের ঘোর ভাঙিল।—
জীবনের উষা ফুরালো।

সুখ দুঃখ ময় বাল্যকাল যায়
হেসে খেলে কেঁদে—আশার শাখায়
তরুণ-মুকুল ফুটিল।
ভব অঙ্গে ঢালি কল্পনা-কুহেলি
সঙ্গীগণে মেলি কত খেলা খেলি,
কাঁচে মণি-শোভা ধরিল!
খেলি কত রঙ্গে যার তার সঙ্গে,
ভাবি সম ভাব শার্দ্দূল কুরঙ্গে,
বিশ্বাসে হৃদয় ভরিল।

দিবস রজনী যত যায় আসে
জগতের চিত্র তত প্রাণে ভাসে,
নব রসে প্রাণ তিতিল।
এই বন্ধুভাব, এই ভালবাসা,
আবার কলহ—ফিরে মিষ্ট ভাষা,
বিষাদ বিরাগ ঘুচিল!
যা দেখি নয়নে করি তারি মত,
রন্ধন খেলন পূজা বার ব্রত—
ধুলাঘরে ভরি নিখিল!
ভবরাজ্য যেন কত মনোহর!
অভ্রময় এই জগত সুন্দর
নয়ন পরাণ ধাঁধিল!
জননী সহায়—প্রাণে নাহি ভয়!
অঞ্চলে লুকায়ে যমে করি জয়,
অভয়ে নেহারি অখিল!
এ সুখের কাল ক'দিনের তরে
কিশোর জীবনে মেঘ রৌদ্র ক'রে
শরতের মত ফুরালো!
জীবন-প্রবাহ বহিল।
দেখা দিল এবে তরুণ যৌবন,
যুবার নয়নে অমরা-কানন
হ'য়ে ধরাতল সাজিল!
ভবরাজ্যময় আশার বাগান
ফুটিল কতই—প্রফুল্ল পরাণ
জীবনের তরু হাসিল;
নব নব ফুল, নব নব পাতা,
ফুটে ডালে ডালে নব নব প্রথা,
জগৎ সৌরভে ভরিল;—
জীবন-প্রবাহ ছুটিল।

প্রণয় স্বপনে আশার ছলনে
গেলো কিছুকাল মুদ্রিত নয়নে,
ইন্দ্রজাল ক্রমে ছাড়িল;
শীত গ্রীষ্মতাপ বরিষা প্রখর
দেখা দিল ক্রমে জীবন ভিতর—
সুধাতে গরল মিশিল!
প্রণয়ের ফুল, প্রেম-নিদর্শন,
দিনে দিনে শুষ্ক—দিনে অদর্শন,
কৌটা-পুট হ'তে সরিল!
কত আশা-লতা আশার মঞ্জরি
দিবস রজনী পড়ে ঝরি ঝরি,—
শুষ্ক-অশ্রুবিন্দু রহিল!
যৌবনের লীলা ফুরালো।
শেষে প্রৌঢ়কালে নীরস জীবন,
ঝঞ্ঝা বায়ু ঘাত, ঘন বরিষণ,—
রবি-ছবি মেঘে ডুবিল!
নিজরূপে ধরা দিল দরশন,
চারিদিকে মাঠ বিকট ভীষণ,
জীবন-আলেয়া নিবিল!
ভব-রাজ্যময় ছায়ার পুতলি
হাসিতে কাঁদিতে নিরখি কেবলি,—
স্মৃতি-রশ্মি খালি রহিল!
ছিল যে পরাণী অসুর সমান,
বিশ্ব পূরে যার শুনে আশা-গান,
বামনের বেশ ধরিল;—
জীবনের লীলা ফুরালো!

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীর কাহিনী।

ফরাসী বীরত্ব।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে "মেড অব্ অরলীন্স্" ভিন্ন আরও একটী ফরাসী বীরত্বের কাহিনী আছে। তাহাও আমাদের পরিচিত সুতরাং সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিয়াই আমরা "ক্যালে অধিকার" কাহিনী শেষ করিব।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ ষষ্ঠ ফিলিপকে ক্রেসি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ক্যালে আক্রমণার্থে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। এডওয়ার্ড ক্যালে পৌঁছিয়া ক্যালে-রক্ষক সার জিয়ান ডি ভিনের নিকট এক জন দূত প্রেরণ করিলেন। দূত যাইয়া সার জিয়ান ডি ভিনকে এডওয়ার্ডের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিতে বলিল। সার জিয়ান বলিলেন—তিনি ফরাসীরাজের ভৃত্য, তাঁহার অনুজ্ঞায় ক্যালে রক্ষা করিতেছেন—ফরাসী রাজের অনুমতি ভিন্ন তিনি কাহারও হস্তে নগর সমর্পণ করিবেন না। এই উত্তর পাইয়া এডওয়ার্ড নিজ বলে ক্যালে অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। ক্যালের চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত। সে সময়ে কামানের চলন ছিল না, সুতরাং সে প্রাচীর ভগ্ন করাও সহজ কর্ম্ম নহে, ইংরাজেরা যুদ্ধের কোন উদ্যোগ করিল না। ক্যালের বাহিরে প্রাচীরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এইখানে তাহারা ছোট ছোট বাড়ী রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করিয়া বাজার হাট বসাইয়া আপনাদের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিল। যেখান হইতে যাহা দ্রব্যাদি আসিত, এই বাজারে আনীত হইত—নগরের মধ্যে ইংরাজেরা কোন দ্রব্য যাইতে দিত না। এই সকল দেখিয়া নগরাধ্যক্ষ সার জিয়ান ডি ভিন বুঝিলেন যে এডওয়ার্ড ক্যালে আক্রমণ করিয়া বৃথা পরিশ্রম নষ্ট করিবেন না, এইরূপে নগর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য প্রবেশ করিবার পথ রোধ করিয়া নগরবাসীগণকে অনাহারে ক্লিষ্ট করিয়া নগর অধিকার করিবেন। সার জিয়ান ডি ভিন এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের এক উপায় দেখিতে পাইলেন। ফরাসীরাজ নিশ্চয়ই আসিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবেন—তিনি সেই আশা করিতে লাগিলেন। যাহাই হউক কর্ত্তব্য সাধন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। এ দিকে নগরের খাদ্য দ্রব্য প্রায় ফুরাইয়া আসিল, নগরে ক্ষুধিত লোকেরা হাহাকার করিতে লাগিল, তখন অনন্যোপায় হইয়া সার জিয়ান ডি ভিন একদিন ১৭০০ লোককে নগর বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। নগরে রাখিয়া আর কি করিবেন, নগরে থাকিলে নিশ্চয়ই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, ববং শত্রুরা যদি দয়া করিয়া প্রাণনষ্ট না করে, তবে তাহারা আর কোথায় যাইয়া কোনরূপে প্রাণধারণের উপায় করিতে পারিবে। ১৭০০ ক্ষুধিত বালক বালিকা নর নারী কাঁদিতে কাঁদিতে নগর বাহিরে শত্রু সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ইংরাজেরা তাহাদিগকে এরূপ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা কারণ বলিলে এডওয়ার্ড দয়া-পরবশ হইয়া তাহাদিগকে সকলকে উত্তমরূপে আহার করাইয়া কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যথেচ্ছা স্থানে যাইতে অনুমতি দিলেন। তাহারা শত্রুকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ইহার কিছু দিন পরে এক দিন অবশিষ্ট নগর বাসীরা সানন্দে দেখিল নগর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সৈন্যসহ ফরাসীরাজ উপস্থিত হইয়াছেন। উদ্ধারের আশায় ক্ষুৎপীড়িত লোকেরা আহ্লাদে মগ্ন হইল - কিন্তু এ আনন্দ বেশী দিন রহিল না। ফরাসীরাজের নগরে প্রবেশ করিবার দুইটী পথ ছিল। এক জল পথে, আর একটী স্থল পথে, কিন্তু তাহাতেও একটি সেতু পার হইতে হয়। ইংরাজেরা জল পথে ও সেতুর উপর উভয় স্থানেই সৈন্য রাখিয়া দিয়াছেন, যুদ্ধ না করিয়া যাইবার পথ নাই—সেখানে যুদ্ধ করাও ফরাসীদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। ফরাসীরাজ এডওয়ার্ডকে বলিলেন—নগর হইতে বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ কর। এডওয়ার্ডস বলিলেন তিনি একমাস বসিয়া সময় নষ্ট করিয়াছেন, এখন শত্রুর কথায় বাহির হইয়া গিয়া যুদ্ধ করিবেন না, যদি ফরাসী রাজের ইচ্ছা হয়—এই খানে আসিয়া যুদ্ধ করুন। ফরাসীরাজ আর কোন উত্তর না করিয়া, নগরবাসীদিগের উদ্ধারের উপায় না করিয়া, বিশ্বাসী অনুগত প্রজাদিগকে বিপদে ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। মারান এবং মেষ্ট্রিল নামক দুই জন নাবিকের অসাধারণ সাহসে ও নির্ভীকতাতে নগরবাসীরা এত দিন কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা ইংরাজদের মধ্য দিয়া রাত্রে জলপথে নগরে খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিত। অনেক বার ইংরাজের হস্তে ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিল তত্রাচ তাহাতেও তাহারা ভীত হয় নাই। কিন্তু আজ কয়েক দিন ধরিয়া তাহাদের পথ এরূপ সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ করা হইয়াছে যে, তাহারা খাদ্যদ্রব্য আনিতে পারে নাই। ফিলিপও কোন উপায় না করিয়া চলিয়া গেলেন। নিরাশ-হৃদয়, আহার-হীন নগরবাসীরা অগত্যা নগর সমর্পণ করিতে মনস্থ করিল। সার জিয়ান ডি ভিন নগর প্রাকার হইতে শত্রুদের সহিত কথোপকথন করিবার মানস প্রকাশ করিলেন। এডওয়ার্ড, লর্ড ব্যাসেট ও সার ওয়াল্টার মনী নামক দুই জন নাইটকে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। নগরাধ্যক্ষ বলিলেন যদি এডওয়ার্ড নগরবাসীদিগকে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিতে দেন, তবে তিনি এডওয়ার্ডের হস্তে নগর সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

সার ওয়াল্টার মনী বলিলেন—নগরবাসীরা দুর্গ সমর্পণ করিতে এত বিলম্ব করাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি কোনরূপ অঙ্গীকার প্রদান করিবেন না। নগরবাসীদিগের প্রতি তাঁহার যাহা ইচ্ছা ব্যবহার করিবেন। সার জিয়ান বলিলেন রাজাকে বলিবেন যে আমরা সকলেই মনুষ্য—সকলেরই সাহস আছে। আমরা কর্ত্তব্য পালনের জন্য, প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য এতদিন নগর সমর্পণ করি নাই। আমাদের নগরে যুদ্ধক্ষম লোক অতি অল্প, সেই জন্য তোমাদের হস্তে নগর সমর্পণ করা ভিন্ন

আহার হীন নগরবাসীগণকে রক্ষার অন্য কোন উপায় নাই, কিন্তু তিনি যে আবাল বৃদ্ধ বনিতার উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিবেন, আমরা মনুষ্য হইয়া এ বাক্যে সম্মত হইয়া নগর সমর্পণ করিতে পারি না। আমি প্রার্থনা করিতেছি—দয়া করিয়া রাজার নিকট যাইয়া নগরবাসীগণকে নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কৃতি প্রদান করিবার অনুরোধ কর। আমার বিশ্বাস দয়ালু-হৃদয় রাজা এ কথায় কর্ণপাত করিবেন।

তাঁহারা যাইয়া রাজাকে এ কথা বলিলেন, সভাস্থ সকলে রাজাকে দয়া করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্রুদ্ধ রাজা প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, অবশেষে অনেক অনুরোধের পর বলিলেন "যদি নগরের প্রধান ছয় জন লোক অনাবৃত পদে, অনাবৃত মস্তকে (ইউরোপে অত্যন্ত অপমানের চিহ্ন) গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়া নগরের চাবি হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে তিনি অন্যান্য নগরবাসীগণকে নিষ্কৃতি প্রদান করিবেন। এই ছয় জন লোকের প্রতি তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিবেন।"

সার ওয়াল্টার মনী সার জিয়ান ডি ভিনকে এই কথা বলিলে তিনি বলিলেন—একটু অপেক্ষা করুন, আমি খানিক পরে ইহার উত্তর দিব। সার জিয়ান ডি ভিন সেখান হইতে যাইয়া নগর মধ্যস্থ বাজারে সমুদয় নগরবাসীগণকে সমবেত করিয়া রাজার এই আদেশ শুনাইলেন। চারিদিকের ক্রন্দনের মধ্য হইতে একজনের স্বর শুনা গেল। নগরের প্রধান ধনী জমীদার ইউসটাস সেণ্ট ডি পিয়ার উঠিয়া বলিলেন—"রক্ষার কোনরূপ উপায় থাকিতে এতগুলি লোক অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমার বিশ্বাস নিজ-প্রাণের পরিবর্ত্তেও ইহাদের প্রাণ রক্ষা করিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন। এই ছয় জনের মধ্যে আমাকে প্রথম উৎসর্গ করিলাম।" তাঁহার কথা শেষ হইলে চারিদিক হইতে নগরবাসীগণ তাঁহার পদে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। জিয়ান ডিয়ার, জ্যাকোয়েন, উইসাণ্ট ও তাঁহার ভ্রাতা এবং অন্য দুই জন এই ছয় জন লোক ক্রমে ক্রমে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিলেন। সকলেই বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও ধনবান। সার জিয়ান ডি ভিন এই জয় জনকে লইয়া সার ওয়াল্টার মনীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যেন তাহাদের প্রতি রাজার দয়া উদ্রেকের চেষ্টা করেন। সার ওয়াল্টার মনী তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাদিগকে লইয়া এডওয়ার্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে নত জানু হইয়া প্রার্থনা করিল "মহারাজ আপনার আদেশক্রমে অন্যান্য নগরবাসীগণের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, আমাদের উপর দয়া প্রকাশ করুন।" সভাস্থ সমুদয় লোক এক বাক্যে রাজাকে তাহাদিগের প্রতি দয়া করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। রাজা আদেশ করিলেন—তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে।

সার ওয়াণ্টার মনী প্রভৃতি আরও অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহার আদেশ স্থির রাখিলেন। হত্যাকারী আনীত হইল। এই সময় রাণী ফিলিপা উঠিয়া বন্দীদিগের সহিত নত জানু হইয়া রাজার সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মহারাজ, আমি বিপদে সম্পদে তোমার অনুসরণ করিয়া স্ত্রীর ধর্ম্ম পালন করিয়াছি, কিন্তু কখনও তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করি নাই। আজ আমি প্রার্থনা করিতেছি—ঈশ্বরের অনুরোধে, দয়ার অনুরোধে, আমার অনুরোধে এই লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।" রাজা কিছুক্ষণ কোন কথাই বলিলেন না, নীরবে রাণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন "রাণি আমি তোমার কথা কখন অবহেলা করিতে পারি না, এই ছয় জন লোককে আমি তোমাকে দান করিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা কর।"

রাণী সানন্দে তাহাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া আহার করাইয়া নব বস্ত্রে সজ্জিত করিয়া এবং অর্থ উপহার দিয়া বিদায় করিলেন। যে ছয় জন বীর-হৃদয় দেশের জন্য, দেশবাসীদের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন, রাণীর কৃপায় তাঁহারা প্রাণলাভ করিলেন।

ফরাসী ইতিহাসে আরও অনেক বীর-কাহিনী আছে। জাতীয় বিপ্লবের সময়ে অনেকে দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন, কিন্তু সে কথা বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়—তাহাদিগের কাহিনীতেই একখানি পুস্তক হয়, সেই জন্য সে কথা আর আমরা বলিব না।

এইখানেই ফরাসী বীরত্ব শেষ করিলাম।

কৃষাণ কবি বার্ণ্‌স্‌।

আমার বন্ধু বাবু আশুতোষ চৌধুরী যদি বার্ণ্‌সের কবিতা ও জীবনের কথা পাড়িয়াছেন, আমিও সে সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলিব। বার্ণ্‌স্‌ ও তাঁহার কবিতা আশু বাবু ভালবাসেন; কিন্তু তাঁহার লেখাটা পড়িলে মনে হয় তিনি যেন সে ভালবাসার জন্য লোক সমাজের নিকট কতকটা সঙ্কুচিত ও লজ্জিত আছেন। যতটা প্রশংসা আশু বাবু বার্ণ্‌স্‌কে করিতে চাহিতেছেন, লোকে কি বলিবে ভাবিয়া যেন ততটা করিতেছেন না। তিনি যেন মনে করিতেছেন—সমস্ত পৃথিবী বার্ণ্‌স্‌কে অতি দুরাচার ও তাঁহার কবিতাকে অতি হেয় অপকৃষ্ট বলিয়া জানে। সে দিন আর এখন নাই, বার্ণ্‌সের মৃত্যুর পরেই তাঁহার যে সকল জীবন-বিবরণ প্রকাশ হয়, তাহাতে এ ভাবটা ছিল বটে, আর তখন থাকার কারণও ছিল। একজন কৃষক সন্তান, যাহার জীবন কৃষিকার্য্যেই অতিবাহিত হইয়াছে, যে কালেজ দূরে যাউক, কোন উচ্চশ্রেণীর স্কুলেও

বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে নাই, যাহার কবিতা হল চালনা সময়ে চিত্ত-পটে লিখিত হইত, তাহাকে কোন্ ভদ্র (Respectable) ব্যক্তি একেবারে মহাজন বা মহাকবি বলিয়া পূজা দিতে পারে? মনে মনে ইচ্ছা—পূজা দিই; কিন্তু বাধ বাধ ঠেকে—যদি ভদ্র ব্যক্তিরা আমায় ঠাট্টা করে! এই জন্যেই ডাক্তার ক্লারি ও মিষ্টার ওয়াকর তাঁহাদের বার্ণ্সের জীবন চরিতে এতটা মুরুব্বিগিরি করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, অথবা বলিতে ভরসা পান নাই—বার্ণস কত বড়, আর তাঁহারা কত ছোট। এখন আর সঙ্কুচিত হইয়া বার্ণ্সের রাজত্ব স্বীকার করিবার কারণ নাই। কে আছে এখন যে ইংরেজি জানে অথচ বার্ণ্সের কবিতা পড়ে না, পড়িয়া কাঁদে না হাসে না, বার্ণ্সকে গীত-গুরু বলিয়া মানে না? বার্ণ্স ইংরেজ গীতি-কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইংরেজ গীতি-কবি বলিতে স্কচ্ ও আইরিষ গীতি-কবিও বুঝিতে হইবে। বার্ণসের যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্গীত, তাহাদিগের তুল্য সঙ্গীত ইংরেজিতে অতি বিরল। যে বিষয়ে তিনি কবিতা লিখিতেন, সে বিষয়েই তাঁহার কবিতা অতুলন হইত। তাঁহার প্রেমের গীতগুলি কামনায় দীপ্ত; তাঁহার হাসি ঠাট্টার কবিতাগুলি হাসি ঠাট্টা মূর্ত্তিমান; তাঁহার নিরাশার গানগুলি অন্ধকারে হৃদয় ছাইয়া ফেলে। তিনি বিদ্রূপেও অতি ভয়ানক ছিলেন, "Holy Willie's Prayer" "The Holy Fair" যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁহার কবিতা বিদ্রূপে কি ভয়ানক শক্তিশালিনী ছিল। তবে কাহাকেও ব্যথা দিয়া বিদ্রূপ করার তাঁহার অভ্যাস ছিল না। ৩। ৪ টাই এ রকমের কবিতা আছে। আর "Holy Willie's Prayer" যে বিড়াল তপস্বীর কুকীর্ত্তির উপরে বিদ্রূপ, তিনি ও রকম বিদ্রূপের উপযুক্তই ছিলেন বটে। বিশুদ্ধ হাসি ঠাট্টা বার্ণসের কেমন আসিত, তাঁহার "Halloween" "Address to the De'il" "The jolly beggars" প্রভৃতি কবিতা পড়িলে জানা যায়। বার্ণসের হাসির কবিতা একটা অবিশ্রান্ত হাসি। "Tam'o shanter" পড়িতে পড়িতে প্রত্যেক ছত্রে হাসিতে পাঁজরা যেন ফাটিয়া যায়। De'il বা devilকে সম্বোধন করিয়া অনেকেই কবিতা লিখিয়াছেন; কিন্তু সকলই—অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত কবিতা দ্বারা সয়তানের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু বার্ণ্স তাঁহাকে লইয়া যে কি মজা করিয়াছেন, তাহা কে বর্ণনা করিবে। বার্ণ্স দুরাচারের যে দুরাচার তাহাকেও একেবারে মনুষ্যত্ব-শূন্য বা দয়ার অপাত্র মনে করিতেন না। সয়তানকে সম্বোধন করিতে গিয়াও তিনি বলিতেছেন—

Hear me, auld hangie, for a wee,
An' let poor damned bodies be;
I'm sure sma' pleasure it can gi'e,
E'en to a de'il,

To skelp an' scaud poor dogs like me;
An' hear us squeel!

বার্ণসের মন এমন উদার যে সয়তানেরও যে নির্দ্দোষ ও দুঃখীকে কষ্ট দিয়া সুখ হয়, ইহা তিনি মনে করিতে চাহেন না "Address to the de'il" এর শেষ ছত্র কটা এই।—

"But fare you weel, auld Nickie-ben!
Oh, wad ye tak' a thought and men'!
Ye aiblins might—I dinna ken—
Still ha'e a stake—
I'm wae to think upo' yon den,
Ev'n for your sake!"

সয়তানের জন্যেও বার্ণসের প্রাণে বেদনা। শেষ কথা বার্ণস তাকে এই বলিলেন— "তোমার ভাল হোক। আহা, তুমি যদি একবার একটু বোসে ভাবতে, আর চরিত্রটা শোধরাতে, তোমারও আমার মনে হয় পরিত্রাণের একটা Stake বা chance হোতো! তোমার কি হবে, মনে করে আমার বড়ই দুঃখ হচ্চে!"

বার্ণসের একটা অসাধারণ ক্ষমতা এই ছিল তিনি যখন যে ভাবের কবিতা লিখিতেন, সে ভাবটাই যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার ভাষায় প্রকাশ পাইত। হাসির কবিতায়, বা বিদ্রূপের কবিতায়, বা প্রেমের কবিতায় তিনি যেখানে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার কবিতা পড়িলে মনে হয় সে ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা সে সে স্থানে একেবারেই ব্যবহৃত হইতে পারিত না—সে ভাষা ভিন্ন সে ভাব অন্য ভাষায় প্রকাশিতই হইতে পারিত না। তাঁহার কবিতায় এমন একটি ছত্র নাই যাহা বুঝিতে কাহাকে কষ্ট হয়—সুখের কথা বা দুঃখের কথা, হাসির কথা বা কান্নার কথা, রাগের কথা, বিদ্রূপের কথা—হৃদয়ের কথা, হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাষায় ছন্দে গাথা হইয়া বাহির হইয়াছে। কষ্ট কল্পনার কথা বা ভাষা কোথাও নাই। এখনকার কবিদের মধ্যে অর্থশূন্য অস্পষ্ট বা অপরিস্ফুট কবিতা লিখিবার একটা রোগ জন্মিয়াছে। যত অপরিস্ফুট, যত অনিশ্চিতার্থ কবিতা লিখিতে পার, ততই তুমি উচ্চদরের কবি। যত অস্পষ্ট (vague, ও অনিশ্চিত (indefinite) তোমার কবিতার মানে, তত তাহার গাম্ভীর্য্য (profoundness)! এই রোগের জন্মদাতা শেলী। শেলী অতি বড় কবি; কিন্তু তাঁহার পূজকেরা যদি সরলভাবে বলিত, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইত যে শেলীর অর্দ্ধেক কবিতার কোন মানে নাই, অথবা কাহারও বোধগম্য মানে নাই, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ছাড়াইয়াছেন। ব্রাউনিঙ্গের কবিতার মানে কে বুঝিতে পারে? পারিবেই বা কি করিয়া? লেখকের চোখের সম্মুখেই কোন মানে থাকিত না, কবিতায়

মানে হইবে কি করিয়া।" তা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না তাঁহার কোন কবিতার কোন স্থানেরই মানে নাই। বার্ণ্সের ভাষা যে তাহার ভাব ও অর্থের এরূপ অনুগামিনী হইত, তাহার কারণ তাঁহার সম্পূর্ণ সারল্য (absolute sincerity) হৃদয়ে যে ভাবে আন্দোলিত হইত, সে ভাবটি প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, আর সে ভাবটির যে স্বাভাবিক ভাষা, তাহাতেই তিনি তাহা প্রকাশ করিতেন। একটা উৎকট কল্পনা বা একটা অনর্থ, অস্ফুট গাম্ভীর্য্যে তাহাকে কখনও জড়াইবার চেষ্টা করিতেন না। আমার কথার প্রমাণার্থে আমি দুচারটি কবিতা বা গান উদ্ধৃত না করিয়া পারি না। মেরি মরিসনকে উদ্দেশ করিয়া বার্ণ্স গাইতেছেন—

OH Mary, at thy window be,
It is the wish'd, the trysted hour !
Those smiles an' glances let me see,
That make the miser's treasure poor :
How blythely wad I bide the stoure,
A weary slave frae sun to sun,
Could I the rich reward secure,
The lovely Mary Morison.

Yestreen when to the trembling string,
The dance gaed thro' the lighted ha',
To thee my fancy took its wing,
I sat, but neither heard nor saw.
Tho' this was fair, an' that was braw,
An' yon the toast of a' the town,
I sigh'd, an' said, amang them a',
"Ye are na Mary Morison.

Oh Mary, canst thou wreck his peace,
Wha for thy sake wad gladly die ?
Or canst thou break that heart of his,
whase only faut is loving thee ?
If love for love thou wilt na gi'e,
At least be pity on me shown ;

A thought ungentle canna be
    The thought o' Mary Morison.

এক অভাগিনী যে সত্য সত্যই তাহার প্রেমিকের (Lover) বিশ্বাসঘাতকতায় ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করে, তাহার হইয়া বার্ণস্ এই অপূর্ব্ব গান গাইয়াছেন ;—

Ye flowery banks o' bonnie Doon,
    How can ye bloom sae fair !
How can ye chant, ye little birds,
    An' I sae fu' o' care !

Thou'll break my heart, thou bonnie bird,
    That sings upon the bough ;
Thou minds me o' the happy days
    When my fause luve was true.

Thou' ll break my heart, thou bonnie bird
    That sings beside thy mate ;
For sae I sat, an' sae I sang
    An' wistna o' my f[illegible]

Aft ha'e I rov'd by bonnie Doon
    To see the woodbine twine,
An' ilka bird sang o' it's lu[illegible]
    And sae did I o' mine.

Wi' lightsome heart I pu'd a rose,
    Frae aff its thorny tree ;
An' my fause luver staw the rose,
    But left the thorn wi' me.

বার্ণস তাঁহার প্রণয়িনীর নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছেন ;

AE fond kiss, and then we sever ;
Ae fareweel, alas ! for ever !
Deep in heart-wrung tears I'll pledge thee,
Warring sighs and groans I'll wage thee.

Who shall say that fortune grieves him,
While the star of hope she leaves him ?
Me, nae cheerfu' twinkle lights me ;
Dark despair around benights me.

I'll ne'er blame my partial fancy,
Naething could resist my Nancy ;
But to see her was to love her ;
Love but her, and love for ever.
Had we never lov'd sae kindly,
Had we never lov'd so blindly,
Never met—or never parted,
We had ne'er been broken-hearted.

Fare thee weel thou first and fairest ;
Fare thee weel, thou best and dearest !
Thine be ilka joy and treasure,
Peace, enjoyment, love, and pleasure !
Ae fond kiss, and then we sever ;
Ae farewell, alas ! for ever !
Deep in heart-wrung tears I'll pledge thee,
Warring sighs and groans I'll wage thee !

তিনটিমাত্র গান আমি উদ্ধৃত করিয়াছি, সে তিনটিই প্রেমের গান। এরকম রত্ন আরো অনেক আছে।

"To Mary, in heaven," "Highland Mary," "My Nannie, O" "The poor and honest lodger," "Logan brads" "John Anderson, my jo," "The blue eyed lassie," ইত্যাদি আরো কত শত অতুল্য প্রেম-সঙ্গীত আছে। শেষের গীত দুটি আমি নীচে দিতেছি। তাহারা যে আর গীতগুলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি তাহাদিগের জন্য এখানে স্থান করিতেছি, তাহা নয়। তাহারা প্রেম সঙ্গীত হইলেও আর আর প্রেম সঙ্গীত হইতে ভিন্ন রকমের, "John Anderson, my jo" যে শ্রেণীর প্রেম সঙ্গীত, সে শ্রেণীর প্রেম সঙ্গীত বোধ হয় কবিতার-সংসারে আর একটিও

নাই। তবে তাহার আগে আমি Blue eyed lassieকে পাঠকের সম্মুখে খাড়া করিব।

I Gaed a waefu' gate yestreen,
    A gate, I fear, I'll dearly rue;
I gat my death frae twa sweet een,
    Twa lovely een o' bonnie blue.
Twas not her golden ringlets bright;
    Her lips like roses wat wi' dew,
Her heaving bosom, lily-white—
    It was her een sae bonnie blue.

She talk'd, she smil'd, my heart she wil'd;
    She charm'd my soul—I wist na how;
An' aye the stound, the deadly wound,
    Cam' frae her een sae bonnie blue.
But spare to speak, and spare to speed;
    She'll aiblins listen to my vow:
Should she refuse, I'll lay my dead
    To her twa een sae bonnie blue.

এখন আমি "John Anderson my jo" এখানে দিতেছি। বার্দ্ধক্যে স্ত্রীর যৌবনের কথা, প্রণয়ের কথা মনে পড়িয়াছে; স্ত্রী স্বামীকে বলিতেছেন—

John Anderson, my jo, John,
    When we were first acquent,
Your locks were like the raven,
    Your bonnie brow was brent;
But now your brow is beld, John,
    Your locks are like the snaw;
But blessings on your frosty pow,
    John Anderson, my jo.

John Anderson, my jo, John,
    We clamb the hill thegither,

An' mony a canty day, John,
We've had wi' ane anither ;
Now we maun totter down, John,
But hand in hand we'll go,
An' sleep thegither at the foot,
John Anderson, my jo.

পাঠক বলুন "John Anderson, my jo, John"—এর মত প্রেমের গান আর কোন কবি গাইয়াছেন কি না। কবিকুলের রাজা যাঁহারা, তাঁহারাও প্রেমের গান গাইতে যুবক প্রণয়ী ও যুবতী প্রণয়িণীর প্রেমের গানই গাইয়াছেন—যেন এ পৃথিবীতে মানুষের হৃদয় যৌবনেই কেবল প্রেম আকাঙ্ক্ষা করে—প্রেমের তরঙ্গ যেন মানুষের হৃদয়ে যৌবন গত হইলে আর ক্রীড়া করে না! বার্ণ্‌সের মনুষ্য হৃদয়ের অভিজ্ঞতা এরূপ অসম্পূর্ণ ছিল না। তিনি জানিতেন প্রেমই মনুষ্য হৃদয়ের ভিত্তি—প্রেমের স্রোত বার্দ্ধক্যে উত্তাল উন্মত্ত হইয়া না বহিলেও বহিতে থাকে—নীরবে মধুরে বহিতে থাকে। যৌবনের সে উন্মাদ প্রেম স্মরণ করিয়া কোন্ দম্পতী না বার্দ্ধক্যে দুঃখের অশ্রু ও সুখের হাসি সম্মিলিত করিয়াছেন ?

"Blue eyed Lassie" কবিতাটিই বা কি সরল, সুন্দর, স্বাভাবিক ও মধুর।

I gat my death frae twa sweet een
Twa lovely een o' bonnie blue.

যখন বার্ণ্‌স বলিতেছেন—

She talk'd, she smil'd, my heart she wil'd,
She charm'd my soul—I wist na how ;

তখন আমরা যেন দেখিতে পাইতেছি আমাদের চোখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি বার তের বৎসরের দুষ্ট মেয়ে একটি লাজুক ছেলেকে জ্বালাতন করিতেছে—মৃদু হাসিয়া কাছে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে, কাছে আসিলে খিল্‌খিল্ করিয়া উচ্চে হাসিয়া লাফাইয়া সরিয়া যাইতেছে।

প্রণয়ে ডুবাইয়া মহাপাতকী প্রণয়িণীকে পরিত্যাগ করিয়াছে। অভাগিনীর প্রাণে যে ভীষণ ব্যথা, তাহার কি ভাষায় অভিব্যক্তি আছে। মনুষ্যের ভাষায় নাই—বার্ণসের মত মহামনুষ্যেরাই কেবল সে গভীর দুঃখও ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন। তাহার দৃষ্টান্ত বার্ণ্‌সের উদ্ধৃত "Banks o' bonnie Doon"। একেবারে ভাঙ্গা হৃদয়ের ব্যথা এমনি চিত্রিত হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে পাঠকের প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়—পাঠক যেন দেখিতে পায় অভাগিনীর হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি একটি একটি করিয়া ছিঁড়িতেছে।

বিচ্ছেদে পৃথিবী দুঃখময়। কে কবে ভালবাসার জনকে পাইয়াছে ? প্রেমের প্রথম

স্বপ্ন কাহার কবে পূর্ণ হইয়াছে? সে বিচ্ছেদের সময় যখন আসে, প্রাণ যাহার প্রেমে ভরা, যাঁহার জন্যে হৃদয়ে বেদনা সমুদ্র সমান, যখন তাঁহার নিকট চিরবিদায় লইবার সময় আসে, তখন প্রাণে যে ব্যথা তাহা কে ব্যক্ত করিতে পারে? বার্ণ্‌স তাহা কি ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনেক গানে দেখিতে পাওয়া যায়। এ শ্রেণীর একটি গান মাত্র আমি তুলিয়াছি।

"Ae fond kiss, and then we sever,"

এ গীতের তুলনা নাই। মনুষ্য জীবনের যে প্রেমের দুঃখান্ত নাটক প্রত্যহ অভিনীত হইতেছে, সে নাটক আমরা এই চারিটি ছত্রে পড়িতে পাই।

Had we never loved so kindly,
Had we never loved so blindly,
Never met, or never parted,
We had ne'er been broken-hearted.

ক্রমশঃ

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

জ্যোৎস্না রাতে।

আজি এ জোছনা রাতে,
মধুর বসন্ত বাতে,
কবেকার কথা পড়ে মনে!
সাদা মেঘ ভেসে যায়,
চাঁদ খানি হেসে চায়,
ঢল ঢল মধুর স্বপনে!
সমুখে তটিনী বয়,
উপকূল বালুময়,
চারিদিকে রজত-তুফাণ!
শুভ্রতার নাহি তুল,
জলে স্থলে সব ভুল
ম্লান কেন দু একটি প্রাণ?

ওপারে দিগন্ত কায়
এঁকেছে তরুর ছায়,
শুভ্রতা হোতায় কাল-কায়া।
ও যেন গো জোছনার
আঁধার হৃদয়-ভার,
হায় এ কি! জগতের মায়া?
আঁধারেতে টিপ টিপ—
করে দু একটি দীপ;
আকাশে অগণ্য তারা ভায়।
বিমানের শুভ্র-কায়া,
তরুর জলদ ছায়া
তটিনীর হৃদয় দোলায়।

প্রবাহিত হৃদি মাঝে
বিশ্বের মহিমা রাজে,
গরবিনী উথলিত কায়,
আনন্দে আপনা ভুলে
সহস্র তরঙ্গ তুলে
নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায়।
একাকিনী কূলে কূলে
মেয়ে দুটি এলোচুলে
আন মনে কোন্ গান গায় ?
দাঁড় বহা রেখে ফেলে,
চমকি যুবক জেলে
মুগ্ধ আঁখি একদিটে চায়!
বনান্তে বিরহী পাখী
কুহু কুহু উঠে ডাকি,
স্তব্ধ নিশা সঙ্গীত আকুল।
কাঁটার বেদনা ভুলে
সুখের নিশ্বাস তোলে
অভাগিনী বাবলার ফুল।

সুবাস মাখান গান
পরশি পরশি প্রাণ
কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়;
কোন অনন্তের তীরে—
হারাধন খুঁজি' ফিরে—
কে জানে কেন রে নাহি পায়!
কেমনে পাবে রে ফের
এ পার যে অনন্তের,—
অন্য পারে সে রতন ভায়।
আলোটুকু দূরে দূরে
নয়নের পথে ঘুরে—
ধরিতে স্বপন ভেঙ্গে যায়।
এই সেই মধু যামি
ছিনু দোঁহে—একা আমি!
'একা তুমি' দশ দিশি গায়!
তাই এ জোছনা রাতে,
মধুর বসন্ত বাতে
নয়ন আপনি ভেসে যায়।

কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট।

বুদ্ধিগম্য বিষয় বুঝিতে না পারিলে লোকে লজ্জিত হয়! হয় বুঝিয়াছি বলিয়া ভাণ করে, না হয় বুঝিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পায়। কিন্তু ভাবগম্য সাহিত্য বুঝিতে না পারিলে অধিকাংশ লোক সাহিত্যকেই দোষী করে। কবিতা বুঝিতে না পারিলে কবির প্রতিই লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহাতে আত্মাভিমান কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। ইহা অধিকাংশ লোকে মনে করে না যে, যেমন গভীর তত্ত্ব আছে তেমনি গভীর ভাবও আছে। সকলে সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, সকলে সকল ভাবও বুঝিতে পারে না। ইহাতে প্রমাণ হয় লোকের যেমন বুদ্ধির তারতম্য আছে তেমনি ভাবুকতারও তারতম্য আছে।

মুস্কিল এই, যে, তত্ত্ব অনেক করিয়া বুঝাইলে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সাহিত্যে যতটুকু নিতান্ত আবশ্যক তাহার বেশী বলিবার যো নাই। তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে নহিলে সে বিফল, সাহিত্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে ব্যর্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পার ত তুমি চলিয়া যাও, তোমার পরবর্ত্তী পথিক আসিয়া হয়ত বুঝিতে পারিবে; দৈবাৎ যদি সমজদারের চক্ষে না পড়িল, তবে অজ্ঞাতসারে ফুলের মত ফুটিয়া হয়ত ঝরিয়া যাইবে কিন্তু তাই বলিয়া বড় অক্ষরের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং গায়ে পড়িয়া ভাষ্য দ্বারা আপনার ব্যাখ্যা করিবে না।

একটা হাসির কথা বলিলাম তুমি যদি না হাস তবে তৎক্ষণাৎ হার মানিতে হয়, দীর্ঘ ব্যাখ্যা করিয়া হাস্য প্রমাণ করিতে পারি না। করুণ উক্তি শুনিয়া যদি না কাঁদ তবে গলা টিপিয়া ধরিয়া কাঁদাইতে হয় আর কোন উপায় নাই। কপালকুণ্ডলার শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া তবু যদি ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা কর "তার পরে" তবে দামোদর বাবুর নিকটে তোমাকে জিম্মা করিয়া দিয়া হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। সাহিত্য এইরূপ নিতান্ত নাচার। তাহার নিজের মধ্যে নিজের আনন্দ যদি না থাকিত, যদি কেবলি তাহাকে পথিকের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত তবে অধিকাংশ স্থলে সে মারা পড়িত।

জ্ঞানদাস গাহিতেছেন—"হাসি মিশা বাঁশি বায়।" হাসির সহিত মিশিয়া বাঁশি বাজিতেছে। ইহার অর্থ করা যায় না বলিয়াই ইহার মধ্যে গভীর সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বাঁশির স্বরের সহিত হাসি মিশিতে পারে এমন যুক্তিহীন কথা কে বলিতে পারে? বাঁশির স্বরের মধ্যে হাসিটুকুর অপূর্ব্ব আস্বাদ যে পাইয়াছে সেই পারে। ফুলের মধ্যে মধুর সন্ধান মধুকরই পাইয়াছে, কিন্তু বাছুর আসিয়া তাহার দীর্ঘ জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমগ্র ফুলটা, তাহার পাপড়ি তাহার বৃন্ত তাহার আশপাশের গোটা পাঁচ ছয় পাতাসুদ্ধ মুখের মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া চিবাইয়া গলাধঃকরণ করে এবং সানন্দ মনে হাম্বারব করিতে থাকে তখন তাহাকে তর্ক করিয়া মধুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেয় এমন কে আছে।

কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না কেবল লক্ষ্য করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই এক মাত্র ভাষা। এই প্রকার ভাষাকে কেহ বলেন "ধুঁয়া কেহ বলেন ছায়া, কেহ বলেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা, এবং কিছু দিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে "কাব্যি" নাম দিয়াছেন। ইহাতে কবি অথবা নবজীবনের সম্পাদক কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উভয়েরই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে।

ভবভূতি লিখিয়াছেন "স তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ।" সে তাহার কি-জানি-কি যে যাহার প্রিয়জন। যদি কেবল মাত্র ভাষার দিক দিয়া দেখ, তবে ইহা ধুঁয়া নয়ত কি, ছায়া নয়ত কি! ইহা কেবল অস্পষ্টতা, কুয়াশা। ইহাতে কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া দেখিবার ক্ষমতা যদি থাকে ত দেখিবে ভাবের অস্পষ্টতা নাই। তুমি যদি বলিতে "প্রিয়জন অত্যন্ত আনন্দের সামগ্রী" তবে ভাষা স্পষ্ট হইত সন্দেহ নাই, তবে ইহাকে ছায়া অথবা ধুঁয়া, অথবা কাব্যি বলিবার সম্ভাবনা থাকিত না, কিন্তু ভাব এত স্পষ্ট হইত না। ভাবের আবেগে ভাষায় এক প্রকার বিহ্বলতা জন্মে ইহা সহজ সত্য, কাব্যে তাহার ব্যতিক্রম হইলে কাব্যের ব্যাঘাত হয়।

সীতার স্পর্শসুখে আকুল রাম বলিয়াছেন "সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।" কি জানি ইহা সুখ না দুঃখ! এমন ছায়ার মত ধুঁয়ার মত কথা কহিবার তাৎপর্য্য কি? যাহা হয় একটা স্পষ্ট করিয়া বলিলেই হইত। স্পষ্ট কথা অধিকাংশ স্থলে অত্যাবশ্যক ইহা নবজীবন সম্পাদকের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিতে হয়, তথাপি এস্থলে আমরা স্পষ্ট কথা শুনিতে চাহি না। যদি কেবল রথচক্র আঁকিতে চাও তবে তাহার প্রত্যেক অর স্পষ্ট আঁকিয়া দিতে হইবে, কিন্তু যখন তাহার ঘূর্ণ্যগতি আঁকিতে হইবে, তাহার বেগ আঁকিতে হইবে তখন অরগুলিকে ধুঁয়ার মত করিয়া দিতে হইবে, ইহার অন্য উপায় নাই। সে সময়ে যদি হঠাৎ আবদার করিয়া বস আমি ধুঁয়া দেখিতে চাহি না আমি অরগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে চাই, তবে চিত্রকরকে হার মানিতে হয়। ভবভূতি ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়াই বলিয়াছেন "সুখমিতি বা দুঃখ মিতি বা।" নহিলে স্পষ্টকথায় সুখকে সুখ বলাই ভাল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বলরামদাস লিখিয়াছেন—

"আধ চরণে আধ চলনি,
আধ মধুর হাস।"

ইহাতে যে কেবল ভাষার অস্পষ্টতা তাহা নহে—অর্থের দোষ। 'আধ চরণ" অর্থ কি? কেবল পায়ের আধখানা অংশ? বাকি আধখানা না চলিলে সে আধখানা চলে কি উপায়ে? একেত আধখানি চলনি, আধখানি হাসি, তাহাতে আবার আধ খানা চরণ; এগুলো পূরা করিয়া না দিলে এ কবিতা হয় ত অনেকের কাছে অসম্পূর্ণ ঠেকিতে পারে। কিন্তু যে যা বলে বলুক—উপরিউদ্ধৃত দুটি পদে পরিবর্ত্তন চলে না। "আধ চরণে আধ চলনি" বলিলে ভাবুকের মনে যে একপ্রকার চলন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিলে সেরূপ সম্ভবে না।

অত্যন্ত স্পষ্ট কবিতা নহিলে যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা স্পষ্ট কবিতার একটি নমুনা দিয়াছেন। তাঁহাদের ভূমিকাসমেত উদ্ধৃত করি। "বাঙ্গলার মঙ্গল

কাব্যগুলিও জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা। কবিকঙ্কণের দারিদ্র্য দুঃখবর্ণনা—যে কখন দুঃখের মুখ দেখে নাই তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

দুঃখকর অবধান, দুঃখকর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।”

এই দুটি পদের ভাষ্য করিয়া লেখক বলিয়াছেন—‘ইহাই সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা; সার্থক প্রতিভা।” পড়িয়া সহসা মনে হয় একথাগুলা হয় গোঁড়ামি, না হয় তর্কের মুখে অত্যুক্তি। আমানি খাবার গর্ত্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্যনৈপুণ্য থাকিতেও পারে কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়। দুটো ছত্র কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই। ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয়, তবে “তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে” সে ত আরও কবিত্ব। ইহার ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য করিতে গেলে হয়ত ভাষ্যকারের করুণরস উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেও পারে, কিন্তু তৎসত্বেও সকলেই স্বীকার করিবেন ইহা কাব্যও নহে, কাব্যিও নহে, যাহার নামকরণের ক্ষমতা আছে তিনি ইহার আর কোন নাম দিন। যিনি ভঙ্গী করিয়া কথা কহেন, তিনি না হয় ইহাকে কাব্য বলুন, শুনিয়া দৈবাৎ কাহারও হাসি পাইতেও পারে!

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই। চিত্রেও যেমন কাব্যে তেমনি, দূর অস্পষ্ট নিকট স্পষ্ট, বেগ অস্পষ্ট অচলতা স্পষ্ট, মিশ্রন অস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। আগাগোড়া সমস্তই স্পষ্ট সমস্তই পরিষ্কার সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে থাকিতে পারে কিন্তু প্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই। অতএব ভাবুকেরা স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট লইয়া বিবাদ করেন না, তাঁহারা কাব্য রসের প্রতি মনোযোগ করেন। “আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান” ইহা স্পষ্ট বটে কিন্তু কাব্য নহে। কিন্তু বিদ্যাপতির

সখি, এ ভরাবাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর—

স্পষ্টও বটে কাব্যও বটে। ইহা কেবল বর্ণনা বা কথার কথা মাত্র নহে, কেবল একটুকু পরিষ্কার উক্তি নহে, ইহার মধ্য হইতে গোপনে বিরহিনীর নিশ্বাস নিশ্বসিত হইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতেছে।

শিশু কাল হৈতে বঁধুর সহিতে
পরাণে পরাণে লেহা।

ইহা শুনিবামাত্র হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে—স্পষ্ট কথা বলিয়া যে, তাহা নহে; কাব্য বলিয়া। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহাও কি সকলের কাছে স্পষ্ট? এমন কি অনেকে

নাই যাঁহারা বলিবেন, "আচ্ছা বুঝিলাম, ভরা বাদল, ভাদ্র মাস, এবং শূন্য গৃহ, কিন্তু ইহাতে কবিতা কোথায়? ইহাতে হইল কি!" ইহাকে আরও স্পষ্ট না করিলে হয়ত অনেক সমালোচকের "কর্ণে কেবল ঝীম ঝীম রব" করিবে এবং "শিরায় শিরায় রীণ্ রীণ্" করিতে থাকিবে। ইহাকে ফেনাইয়া ফুলাইয়া তুলিয়া ইহার মধ্যে ধড়্‌ফড়্ ছট্‌ফট্ বিষ ছুরি এবং দড়ি কলসী না লাগাইলে অনেকের কাছে হয়ত ইহা যথেষ্ট পরিস্ফুট, যথেষ্ট স্পষ্ট হইবে না; হয়ত ধুঁয়া এবং ছায়া এবং "কাব্যি" বলিয়া ঠেকিবে। এত নিরতিশয় স্পষ্ট যাঁহাদের আবশ্যক তঁাহাদের পক্ষে কেবল পাঁচালি ব্যবস্থা; যাহারা কাব্যের সৌরভ ও মধু উপভোগে অক্ষম তাঁহারা বাবরণের "জ্বলন্ত" চুল্লিতে হাকডাক ঝালমসলা ও খরতর ভাষার ঘণ্ট পাকাইয়া খাইবেন।

যাহারা মনোবৃত্তির সম্যক অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল অংশ জগতের সঙ্গে মেলে না। এই জন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির [illegible] যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত, যাহা বুঝা যায় না অথচ বুঝা যায়। তাহাকে ছায়ার মত অনুভব করি অথচ প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই সর্ব্বত্রব্যাপী অসীম অতিজগতের রহস্য কাব্যে যখন কোন কবি প্রকাশ [illegible] করিতে চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার ভাষা সহজেই রহস্যময় হইয়া উঠে [illegible] সে [illegible] কেবলি ধুঁয়া এবং ছায়া দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়া যায়, [illegible] অসীমের সমুদ্র [illegible] বন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করে!

পুনর্ব্বার বলিতেছি বুদ্ধিমানের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ন্যায় প্রকৃতিতে যে সমস্তই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার তাহা নহে। সমালোচকেরা যাহাই মনে করুন প্রকৃতি অতিবৃহৎ, অতিমহৎ, সর্ব্বত্র আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। ইহাতে নিকটের অপেক্ষা দূর, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ, প্রামাণ্যের অপেক্ষা অপ্রামাণ্যই অধিক। অতএব যদি কোন প্রকৃত কবির কাব্যে ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় তবে বুদ্ধিমান সমালোচক যেন ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে তাহা এই অসীম প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময়ী রহস্যচ্ছায়া।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হেঁয়ালি নাট্য।*

অচ্যুত, অপূর্ব্ব, উমেশ, কার্ত্তিক ও খগেন্দ্র বাবু আসীন।

অচ্যুত। গুরুদেব এখনো এলেন না। কি করা যায়!

কার্ত্তিক। আমি ভারি বিপদে পড়েছি, গুরুদেব ছাড়া কেউ তার মীমাংসা কর্ত্তে পারবে না। আমার নাম কার্ত্তিক—আমার শ্যালার নাম কীর্ত্তি, এখন আর্য্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে আমার স্ত্রী আমার শ্যালাকে কীর্ত্তি বলে ডাকতে পারে কি না—এটা স্থির করে না দিলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বাস করাই দায় হয়েচে। তার উপরে আবার আমাদের গয়লা বেটার নাম কৃত্তিবাস—এখন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হবে যে কৃত্তিবাস গোয়ালাকে যদি আমার স্ত্রী বাসুদেব বলে ডাকেন তা হলে কোন আধ্যাত্মিক নিয়মের কোন ব্যাঘাত হয় কি না। কেবল তাই নয়—আমাদের বাড়িতে কার্ত্তিক পূজা হয়—আমার স্ত্রী সে সময়ে কার্ত্তিককে নাত্তিক বলে থাকেন—এপ্রকার নাম খারাপ করবার দরুণ দেবতার এবং তাঁর মা দুর্গার কোন অসন্তোষের কারণ ঘটে কি না এও জিজ্ঞাস্য।

অপূর্ব্ব। আমারও অত্যন্ত ভাবনার কারণ পড়েচে। আমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথ দেবকে কুল দিয়ে এসেছিলেম এখন এই গর্ম্মির দিনে কুলগুলো বাদ দিয়ে যদি কেবল মাত্র কুলের ঝোলটুকু খাই তাতে জগন্নাথদেবের কোন আপত্তি আছে কি না! এটি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

অচ্যুত। আমি সে দিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে, আমাদের শাস্ত্রমতে ভোক্তা শ্রেষ্ঠ না ভোজ্য শ্রেষ্ঠ, অন্ন শ্রেষ্ঠ না অন্নপায়ী শ্রেষ্ঠ! এই অতিশয় কঠিন প্রশ্নের তিনি এমনি এক গভীর উত্তর দিয়েছিলেন যে তখন যদিচ আমরা সকলেই জলের মত বুঝেছিলেম, কিন্তু এখন আমাদের কারো একটি কথাও মনে পড়চে না।

উমেশ। আমার যতদূর মনে আছে আমার বোধ হয় তিনি বলেছিলেন অন্নও শ্রেষ্ঠ নয়, অন্নপায়ীও শ্রেষ্ঠ নয় কিন্তু আরেকটা কি শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সেইটি যে কি মনে পড়চে না।

অপূর্ব্ব। না না, তিনি বলেছিলেন অন্নও শ্রেষ্ঠ, অন্নপায়ীও শ্রেষ্ঠ কিন্তু অন্নই বা কেন শ্রেষ্ঠ, অন্নপায়ীই বা কেন শ্রেষ্ঠ,সেটা তখন বুঝেছিলুম কিন্তু এখন বুঝতে পারচিনে।

কার্ত্তিক। আমার মনে হচ্চে—তিনি অন্ন কিম্বা অন্নপায়ী সম্বন্ধে কোন কথা বলে-

---

* গত ফাল্গুন মাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "হানি"। শ্রীযুক্ত অনন্তলাল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মোহন দাস ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছেন।

নই নি—তিনি এমন একটা কথা বলেছিলেন যা অন্ন সম্বন্ধেও খাটে না, অন্নপায়ী সম্বন্ধেও খাটে না—সেটা কেবল মাত্র শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেই প্রয়োগ হতে পারে।

খগেন্দ্র। অন্ন এবং অন্নপায়ীর মধ্যে যে কে শ্রেষ্ঠ, আমার সহজ বুদ্ধিতে পূর্ব্বে তা এক প্রকার বুঝেছিলুম কিন্তু গুরুদেবের কথা শুনে আমি এই বুঝ্‌লুম যে পূর্ব্বে আমি কিছুই বুঝিনি এবং গুরুদেব যা বল্লেন, তাও কিছুই বুঝ্‌লুম না।

অচ্যুত। যাহোক্ সেও পরম লাভ!

(বদন চন্দ্রের ছুটিয়া গৃহে প্রবেশ।)

বদন। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) গুরু কোথায় গেলেন? আমাদের শিরোমণি মশায় কোথায়? বল না হে কোথায় গেলেন তিনি?

অচ্যুত, অপূর্ব্ব, উমেশ, কার্ত্তিক, ও খগেন্দ্র বাবু। কেন? কেন?

বদন। হঠাৎ কাল রাত্রে আমার মনে এক প্রশ্ন উদয় হল, তিনি ছাড়া তার মীমাংসা কে করে দেয়! কাল থেকে আমি আহার নিদ্রা প্রায় এক রকম ত্যাগ করেছি। কি হবে ভেবে পাচ্চিনে।

কার্ত্তিক। তাইত অবস্থা বড় খারাপ দেখ্‌চি। বিষয়টা কি বল দেখি।

বদন। বিষয়টা কি জান? কাল হঠাৎ মশারা ঝাড়তে ঝাড়তে আমার মনে এক তর্ক উপস্থিত হয়েচে যে এত দেশ থাক্‌তে জটায়ু কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে মারা পড়্‌ল? (অত্যন্ত চিন্তান্বিত) জটায়ু যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে মারা পড়ল তার অর্থ কি, তার কারণ কি, এবং তার তাৎপর্য্যই বা কি! এর মধ্যে যদি কোন রূপক থাকে, তবে তাই বা কি? যদি কোন অর্থ না থাকে তাই বা কেন? যদি কারণ থাকে তবে তা দৈব কারণ না ভৌতিক কারণ, না কোনরূপ সুগভীর আধ্যাত্মিক্ কারণ?

কার্ত্তিক। বিষয়টা শক্ত বটে। আগে শিরোমণি মশায় আসুন!

অচ্যুত। ধন্য, আমাদের মধ্যে বদন বাবুই ধন্য—তাঁর মনে এমন সকল মহৎ গভীর এবং অবশ্যমীমাংস্য প্রশ্নের উদয় হয়!

খগেন্দ্র। (ভয়ে ভয়ে) ঠিক বল্‌তে পারিনে কিন্তু আমার বোধ হয়, জটায়ুর মৃত্যুর এক মাত্র কারণ হচ্চে, যুদ্ধের সময় রাবণ তাকে এমন গুরুতর অস্ত্রাঘাত করেছিল যে সেই অস্ত্রাঘাতের প্রভাবে তার আর অধিক দিন বেঁচে থাক্‌বার তেমন সুবিধে হল না।

বদন। আরে রাম, ওকি একটা উত্তর হল না কি! ওত সকলেই জানে।

কার্ত্তিক। ও ত আমিও বল্‌তে পারতুম।

অচ্যুত। তা নয় ত কি!

অপূর্ব্ব। ও রকম উত্তরে কি মন সন্তুষ্ট হয়?

উমেশ। ও ত ইস্কুলের ছেলের মত উত্তর হল।

বদন। ও রকম বাজে উত্তর চাইনে—আমি একটা প্রকৃত উত্তর চাই—এক্‌টা শাস্ত্রসঙ্গত শাস্ত্রসম্মত উত্তর চাই।

(বদন পুনশ্চ চিন্তান্বিত—এবং খগেন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ।)

অচ্যুত। (শশব্যস্ত হইয়া) ঐ যে আমাদের গুরু আস্‌চেন!

উমেশ। ঐ যে শিরোমণি মশায়!

কার্ত্তিক ও অপূর্ব্ব। আহা আমাদের গুরুদেব!

বদন। (সহসা সচকিত) অ্যাঁ গুরুদেব আসচেন্—আঃ বাচ্‌লুম শুনে আমার মনের আর্দ্ধেক সংশয় দূর হয়ে গেল!

শিরোমণি মশায়ের প্রবেশ।

সকলের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।

শিরোমণি। স্বস্তি—স্বস্তি।

বদন। গুরুদেব কাল রাত্রে মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে আমার মনে এক্‌টি অত্যন্ত দুরূহ প্রশ্নের উদয় হয়েচে। মীমাংসার জন্য শ্রীচরণ সন্নিধানে এসেছি।

গুরু। প্রকাশ করে বল।

বদন। বিহগরাজ জটায়ু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে কেন নিহত হলেন? (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) আমাদের খগেন্দ্র বাবু (খগেন্দ্র বাবু অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত) বল্‌ছিলেন অস্ত্রাঘাতই তার কারণ!

গুরু। বটে! হাঃ হাঃ—আধুনিক নব্যতন্ত্র কালেজের ছেলের মতই উত্তর হয়েচে! শাস্ত্র চর্চ্চা ছেড়ে বিজ্ঞান পড়ার ফলই এই। প্রশ্ন হল জটায়ুর মৃত্যু হল কেন উত্তর—হল অস্ত্রাঘাতে! এ কেমন হল জান, কাশিধামে বৃষ্টি হল আর খড়দহে আমার গোলার ধান শুকিয়ে গেল! হাঃ হাঃ হাঃ। (সকলে মিলিয়া হাস্য)

অপূর্ব্ব। ঠিক তাই বটে! আজ্ঞে আজ কাল এই রকমই হয়েচে—বুঝেচেন শিরোমণি মশায়?

অচ্যুত। শাস্ত্র চর্চ্চার অভাবে কোন বিষয়ের প্রকৃত উত্তর কেউ জান্‌তে চায় না—

উমেশ। এবং জান্‌তে চাইলেও পাওয়া যায় না!

গুরু। আচ্ছা, বাপু খগেন্দ্র, তুমি ত অনেক বিজ্ঞান শিখেছ এবং ইংরাজি পড়েছ তুমিই বল দেখি—অস্ত্রাঘাতেই বা জটায়ুর মৃত্যু হল কেন, রক্তপিত্ত রোগেই বা না মল কেন—রাবণের সঙ্গেই বা তার যুদ্ধ হল কেন, আফ্‌জুল্ খাঁর সঙ্গেই বা তার যুদ্ধ না হল কেন—অত কথায় কাজ কি জটায়ু না মরে না হয় রাবণই মর্‌ত তাতে ব্যাঘাত হল্ কেন?

(বদন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাবিত)

অচ্যুত ও অপূর্ব্ব। (অত্যন্ত চিন্তাশীলতার সহিত) তাইত! এত দেশ থাকতে জটায়ু মরে কেন!

উমেশ। কি হে খগেন্দ্র—একটা জবাব দাও না! তোমাদের রস্কো সাহেব কি লেখেন!

কার্ত্তিক। তোমাদের টিন্ড্যাল সাহেব কি বলেন শুনি—আফ্‌জুল্ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ না হয়ে রাবণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ হয় কেন?

অচ্যুত। রক্তপিত্ত রোগে না মরে অস্ত্রাঘাতেই বা জটায়ু মরতে গেল কেন? এম্‌নিই কি তার দায় পড়েছিল। তোমাদের হক্‌স্‌লি সাহেব এ বিষয়ের কি মীমাংসা করেন শুনিই না!

গুরু। বল ত বাপু! দেখি তোমাদের কালেজের বিদ্যেতে কি দাঁড়ায়?

খগেন্দ্র। (নিতান্ত আধমরা হইয়া) গুরুদেব,আমি মূঢ়মতি আমি না বুঝে এক্‌টা কথা বলে ফেলেছি! শেষ কালে প্রশ্নটা যে এতই শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, সেটা আমি হঠাৎ ঠাহর কর্ত্তে পারিনি! আমাকে মাপ করুন। এক্ষণে আপনার মুখ হতে এর একটা প্রকৃত উত্তর শোন্‌বার জন্যে আমরা সকলে উন্মুখ হয়ে আছি। আমাদের বাসনা পূর্ণ করুন!

গুরু। এক কথায় ত বলা যায় না! তোমরা বল্‌চ, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু মল কেন? এক কথায় এর উত্তর দিই কি করে!

সকলে। তা ত বটেই! তা ত বটেই!

গুরু। প্রথমে দেখ্‌তে হবে "রাবণেরই" সঙ্গে যুদ্ধ হয় কেন? তার পরে দেখ্‌তে হবে রাবণের সঙ্গে "যুদ্ধই" বা হয় কেন! তার পরে দেখ্‌তে হবে—রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে "জটায়ুই" বা মরে কেন—তার পরে সব শেষে দেখ্‌তে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু "মরেই" বা কেন? কথাটি সামান্য কিন্তু একটি প্রশ্নের ভিতরে কতগুলো প্রশ্ন বাস করে একবার ভেবে দেখ! একটি সারমেয় শিশুর গাত্রে সহস্র কীটশাবক যেরূপ বাস করে এও সেইরূপ!

(বদন হাল ছাড়িয়া দিয়া সুগভীর চিন্তাসাগরে নিমজ্জমান।)

অচ্যুত। (খগেন্দ্রকে ঠেলিয়া) শুন্‌চ খগেন্দ্র বাবু?

অপূর্ব্ব। কি খগেন্দ্র বাবু, মুখে যে কথাটি নেই?

উমেশ। বলি ও খগেন্দ্র বাবু—ওর মধ্যে এক্‌টা কথার জবাব দাওনা!

কার্ত্তিক। খগেন্দ্র সাহেব এ সময়ে তোমার কেমিষ্ট্রির বইখানা গেল কোথায় হে! ভায়া ওসব ছাড়—দেখ্‌চত ওতে কোন উত্তরই পাওয়া যায় না! এখন্ কিছুদিন শাস্ত্রালোচনা কর।

(খগেন্দ্র আরক্ত মুখচ্ছবি এবং ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।)

গুরু। তবে একে একে সকল কটার উত্তর দিই—তোমরা অবহিত হয়ে শ্রবণ কর। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্চে "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে" নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে?'

বদন। (গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আঃ বাচলুম। এ ছাড়া আর কোন উত্তর হতেই পারে না।

গুরু। যদি বল "নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে" একথার অর্থ কি, তাৎপর্য্য কি, তা হলে সরল করে বুঝিয়ে বলি—নিয়তত্বই হচ্চে নিয়তির গুণ, এবং নিয়তের গুণই হচ্চে নিয়তি তা যদি হয় তা হলে নিয়ত কালবর্ত্তী যে নিয়তি তাকে পুনশ্চ নিয়ত নিয়ন্ত্রিত কর্ত্তে পারে এমন দ্বিতীয় নিয়তির সম্ভাবনা কুতঃ! কারণ কি না নিত্য যাহা তাহাই নিয়ত এবং তাহাই নিয়তি এবং তাহাই নিয়ন্তা অতএব রাবণেরই সঙ্গে যে জটায়ুর যুদ্ধ হবে এতে আর বিচিত্র কি!

সকলে মিলিয়া। এতে আর বিচিত্র কি!

বদন। অহো, এতে আর বিচিত্র কি!

গুরু। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিই। দ্বিতীয় প্রশ্নটি আরো কঠিন--কারণ কি না—

বদন। তবে থাক্ শিরোমণি মশায়—অগ্রে প্রথম প্রশ্নের উত্তরটি ভালরূপ জীর্ণ করি, তার পরে কাল দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা কর্বেন।

অচ্যুত। কিন্তু কি চমৎকার উত্তর!

অপূর্ব্ব। কি সরল মীমাংসা!

কার্ত্তিক। কি পরিষ্কার ভাব!

উমেশ। কি গভীর শাস্ত্রজ্ঞান!

বদন। (শিরোমণি মহাশয়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া) গুরুদেব আপনার অবর্ত্তমানে আমাদের কি দশা হবে!

(শিষ্যগণ শোক সম্বরণে অক্ষম।)

মহারাজা নন্দকুমার ও সুপ্রীম কোর্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(চক্রান্ত অপরাধ)

মহারাজা নন্দকুমারের নামে সুপ্রীম কোর্টে দুইটি অভিযোগ উপস্থিত হয়, একথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমটি "চক্রান্ত অপরাধ" বলিয়া সাধারণে জানিত। কমলউদ্দিন আলি খাঁ নামক এক মুসলমান (প্রকারান্তরে স্বয়ং হেষ্টিংস সাহেব) এই মোকর্দ্দামায় বাদী। মহারাজ নন্দকুমার, রায় রাধা চরণ, জোসেফ্ ফাউক সাহেব, ফ্রান্সিস্ ফাউক সাহেব এই মোকর্দ্দামায় প্রতিবাদী। এই চক্রান্ত মোকর্দ্দামার বিস্তারিতরূপে সমালোচনা করিতে আমাদের ততদূর ইচ্ছা নাই, কেননা মহারাজ নন্দকুমার ইহাতে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইয়াছিলেন। তবে প্রকৃত ঘটনাটি কি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

২০ এ এপ্রেল তারিখে এই অভিযোগের সমূলকতা অনুসন্ধান করিবার জন্য সুপ্রীম-কোর্ট প্রথম অধিবেশন করেন। ইহার পূর্ব্ব দিবসে (অর্থাৎ ১৯ এপ্রেল ১৭৭৫) যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—উপরোক্ত কমল উদ্দিন বেলা প্রায় নয় ঘটিকার সময় উর্দ্ধশ্বাসে হাঁফাইতে হাঁফাইতে গবর্ণর সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনে হিজলীর নূন গোলার ইজারদার ছিল। সামান্য অবস্থা হইতে মহারাজা নন্দকুমারের অনুকম্পায় ও সহায়তায় এই ব্যক্তি যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করে—তাঁহারই অনুগ্রহে নবাব জাফর আলির দরবার হইতে "আলি খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হয়। কমল নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছে—"মহারাজ নন্দকুমার আমাকে বাল্যাবস্থা হইতেই পালন করিয়া আসিয়াছেন—পরে মধ্যে তাঁহার সহিত অবনিবনাও হওয়াতে আমি তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করি।"

যাহা হউক এই কমল উদ্দিন গবর্ণরের বাটীতে এই প্রকার ভাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলে যে, "মহারাজ নন্দকুমার, রায় রাধাচরণ ও ফাউক সাহেবদ্বয় তাঁহার (গবর্ণরের) বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন, তথায় আমাকে সেই বিষয়ে লিপ্ত করিবার জন্য জবরদস্তিতে আমার নিকট হইতে দুই খানি আরজী লিখাইয়া লইয়াছেন ও তাহাতে আমার স্বাক্ষর করাইবার জন্য আমাকে অবরুদ্ধ করিয়া বল প্রয়োগও করিয়াছেন। আমি এই মাত্র তাঁহাদিগের হাত ছাড়াইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। দোহাই লাট সাহেব—আমি কিছুই জানি না, দোহাই কোম্পানী আমি এই বিষয়ের বিচার প্রার্থনা করি।" কমল উদ্দিন আলি খাঁ সাহেব এই প্রকারে করুণার ভাষায় তাহার কাহিনী শেষ করিল। গবর্ণর সাহেব তাহাতে গলিয়া গেলেন। তিনি কমল উদ্দিনকে বলিলেন "আমার নিকট এক্ষণে এ বিষয়ের কোন বিচার হইতে পারে না।

তুমি বোধ হয় জান—কোম্পানী সুবিচার দিবার জন্য এক "বড়'আদালত" (Supreme Court) স্থাপন করিয়াছেন, সেইস্থলে তুমি বিচার প্রার্থী হইলে তোমার আশা পূর্ণ হইবে।" হেষ্টিংস সাহেব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে এই প্রকার ঘটনা ঘটিবে, এ অভিনয়ের জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, সুতরাং কমলকে তাহার সমস্ত অভিযোগের সহিত একখানি অনুরোধ লিপি দিয়া তাঁহার প্রিয় সহাধ্যায়ী ও বন্ধু স্যর ইলাইজা ইম্পি সাহেবের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। একটি কথা বলিয়া রাখি—এই সময়েই কৌন্সিলে নন্দকুমার কর্ত্তৃক গবর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল ও এ সম্বন্ধে ভয়ানক হুলস্থূল চলিতেছিল।

কমল উদ্দিন খাঁ এই প্রকারে বিচার প্রার্থনায় নাছোড়বান্দা হইয়া ইম্পি সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইল। তখন অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে, সে দিন সুতরাং কিছুই করা হইল না। ইম্পি সাহেব আদ্যোপান্ত অভিযোগটি স্থির কর্ণে শুনিলেন ও সেই দিবস সন্ধ্যার পরে, তাঁহার সহযোগী ভ্রাতাদিগকে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইতে লিখিলেন। সন্ধ্যার পর সহযোগী ভ্রাতারা উপস্থিত হইলে—প্রধান বিচারপতি কমলের অভিযোগ গ্রহণার্হ বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহাদের সকলের সম্মতি অনুসারে সেই দিবস রাত্রেই কয়েকখানি 'আদালতের সহীমোহর সম্বলিত পত্র লিখিয়া গবর্ণর সাহেব—মহারাজ নন্দকুমার, রায় রাধাচরণ, রাজা রাজবল্লভ, ভানসিটার্ট, বারওয়েল ও জোজেফ্ ফাউক প্রভৃতিকে পর দিবস প্রাতে তাঁহাদের আলয়ে উপস্থিত হইতে লিখিলেন। পর দিবসে তাঁহারা তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলে জোবানবন্দী লওয়া হইল। ইহার পরে সুপ্রীমকোর্টে প্রকৃতরূপে মোকর্দ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। সুপ্রীমকোর্টে কমল যে জোবানবন্দী দিয়াছিল, তাহা বিশেষ কৌতূহলকর বলিয়া আমরা তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম হইতেই পাঠককে চক্রান্ত অপরাধের মূল ঘটনাটি দেখাইব। কমল উদ্দিন * সুপ্রীমকোর্টের সম্মুখে বলিতেছে—"আমি চৈত্র মাসে আমার পুত্রের বিবা-

* কমল উদ্দিন কি প্রকার সত্যবাদী, তাহা নিম্ন লিখিত কারণগুলি হইতেই প্রমাণ হইবে। প্রথম কারণ এই—স্বয়ং হেষ্টিংস প্রথমে তাহার উপর আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু Col. Macleanকে বিলাতে লিখিতেছেন—"Mr. Graham knows the character of Kamaluddin—I do not: but do not suppose that he is possessed of a preternatural spirit of constancy or of integriy. I can hardly expect therefore that he will hold out to the next Assizes." (Hastings to Messrs. Graham and Maclean, Dated F. W. 29th April.) দ্বিতীয় কারণ এই—তাহার অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল। তৃতীয় কারণ এই—উদার-চেতা, স্বাধীন প্রকৃতি স্বয়ং জেনারেল সাহেব তাহাকে, "infamous creature" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চতুর্থতঃ—এই চক্রান্ত অভিযোগ ইহার পূর্ব্ব বৎসরের ডিসেম্বরে এই কমল উদ্দিন কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষ প্রমাণাভাবে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

হের জন্য মহারাজের নিকট তিন হাজার টাকা কর্জ্জ করিতে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে মহারাজ নন্দকুমার আমায় বলিলেন "কমল! তুমি কি শুনিয়াছ যে আমি প্রকাশ্যভাবে গবর্ণরের বিরুদ্ধে "বরামদের" অভিযোগ আনিয়াছি"। আমি উত্তর করিলাম—"হাঁ মহারাজ তাহার কতক কতক অবগত হইয়াছি বটে"। তিনি বলিলেন "গ্রেহাম সাহেবের সহিত আমার ভয়ানক শত্রুতা, ইহার পর গবর্ণরও আমার শত্রু হইয়া উঠিলেন, তিনি একদিন বিনা কারণে উত্তেজিত হইয়া (গ্রেহামের মন্ত্রণায়?) আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিলেন ও আমার যথাসাধ্য অনিষ্ট করিবেন বলিয়াও ভয় দেখাইলেন। আমি নিরুপায় হইয়া ফাউক সাহেবের মন্ত্রণায় ও কর্ত্তব্য বোধে, অন্য উপায় না দেখিয়া তাঁহার (গবর্ণরের) বিরুদ্ধে "বরামদ" দাখিল করিলাম। আমার নিজের নিকট হইতে বা মণিবেগমের নিকট হইতে গবর্ণর যে সমস্ত টাকা লইয়াছিলেন, তাহার কথা এই বরামদে উল্লিখিত আছে। আমার বিশ্বাস এ সম্বন্ধে আমি গবর্ণরকে সম্যক দোষী প্রমাণ করাইয়াছি—তুমি কি বল?" আমি উত্তর করিলাম "মহারাজ এ সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ভালই করিয়াছেন। কিন্তু একটা কথা এই—জগতের লোকে পরে বলিবে যে মহারাজ নন্দকুমারের ন্যায় এক জন বড় লোকে এই সামান্য অর্থের জন্য এই প্রকার অভিযোগ আনিয়াছিলেন। ইহা বড়ই লজ্জার কথা।" মহারাজা ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"সে কথা যাক্ কমল—তোমার টাকার জন্য একখানি খত সহী করিয়া দাও, আমি টাকা দিতেছি।" আমি প্রতিজ্ঞাপত্র সহী করিলাম ও টাকা লইয়া চলিয়া আসিলাম।"

"ইহার কিয়দ্দিবস পরে, খালসার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব বলিয়া ভয় দেখাইবার জন্য আমি দুই খানি আরজী লিখিয়া মহারাজ নন্দকুমারের কাছে পাঠাইয়া দিলাম। রাধাচরণের হাতে আরজী দুই খানি দিয়া তাহার মর্ম্ম মহারাজকে বুঝাইয়া দিতে বলিলাম। রাধাচরণকে আরও সেই সময়ে বলিলাম—"আপনি এই আরজী দুখানি এক্ষণে রাখিয়া দিন, ইহাতে যাহা লিখিয়াছি তাহার মধ্যে মিথ্যা কথা অনেক আছে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে ভয় দেখাইবার জন্য এইরূপ করিয়াছি। যদি ভবিষ্যতে আবশ্যক হয়, তবে সত্য ঘটনাপূর্ণ আরজী লিখিয়া দিব ও কার্য্য শেষ হইলে মহারাজ নন্দকুমারকে ৪০০০৲ টাকা ও আপনাকে ২০০০৲ টাকা উপহার স্বরূপ প্রদান করিব।" এই কথা বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ১২টী সোনার মোহর নজর দিলাম। ইহার পর বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।"

"তাহার পরদিন পুনরায় মহারাজার বাটীতে গেলাম—তিনি দেওয়ান খানায় বসিয়াছিলেন—আমায় দেখিয়া বলিলেন "কমল কাল রাধাচরণের নিকট তুমি দুই-খানি আরজী রাখিয়া গিয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি, তুমি কেন একেবারে সেই আরজী কৌন্সিলে পেশ্ কর না? আমি জেনারেল সাহেবকে তোমার জন্য অনুরোধ

করিব। ইহাতে বিনা ক্লেশে তুমি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট হইতে টাকা কড়ি বুঝিয়া পাইবে। আমিও গঙ্গাগোবিন্দকে ডাকিয়া এবিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিব। আর একটা কথা—রাধাচরণের সঙ্গে গিয়া তুমি ফাউক সাহেবের সহিত পুনঃ সম্মিলিত হওনা কেন? তাঁহার সহিত তোমার পূর্ব্ব মনোমালিন্য দূর হইয়া গেলে তিনিই হয়ত জেনারেল ফ্রান্সিস্ ও কর্ণেল সাহেবকে তোমার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন! তিনি তোমাকে পুর্ণিয়ার পূর্ব্ব কথিত চাকরীও করিয়া দিতে পারেন।” আমি বলিলাম, “আপনার সহিত গিয়া আমি তাঁহার নিকট পুনঃর্ম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করি। যাহা হউক আজ আমি যাইতে পারিব না, কাল রাধাচরণ বাবুর সহিত ফাউক সাহেবের বাটীতে যাইব।” তৎপর দিনে আমি কথামত রায় রাধাচরণের সহিত ফাউক সাহেবের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

“আমি তাহার পর দিন রায় রাধাচরণের সহিত ফাউক সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দ্বিতলের বারাণ্ডায় ফাউক সাহেব কৌচের উপর শয়ন করিয়া কি পুস্তক পড়িতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বসিতে বলিলেন, আমিও প্রথামত তাঁহার নিকট নজর ধরিলাম, তিনি তাহা একবার মাত্র স্পর্শ করিলেন। ইহার পর রাধাচরণের সহিত তিনি কাম্‌রার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ফাউক সাহেব আতর, গোলাব জল ও পান দিলেন—এবং বলিলেন “কমল আমি মহারাজার মুখে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছি, মহারাজা তোমাকে যাহা করিতে বলেন, তাহা করিলে তোমারই ভাল হইবে। আমি তাহা হইলে তোমাকে পুর্ণিয়ার চাকরী করিয়া দিব ও অন্যান্য বিষয়ে তোমার আরও সুবিধা করিয়া দিব।” আমি সে দিন একথার কোন প্রকার উত্তর না দিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। আমার কাজ কর্ম্ম এই সময়ে বড় মন্দ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আমি ইহার পর দুই দিন আর বাটীর বাহির হইলাম না। তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যাকালে মহারাজার বাটীতে গেলাম। আমি বলিলাম “কল্য আমার কোন বিশেষ কাজের জন্য হুগলী যাইতে হইবে, আমি তজ্জন্য অদ্য মহারাজের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।” মহারাজা বলিলেন “তুমি গত অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে যে আরজী গবর্ণরের সরকারে দাখিল করিয়াছিলে, তাহা আমায় দিয়া যাও।” আমি বাটীতে ফিরিয়া গিয়া যতদূর মনে ছিল সেই আরজীর একখানি খসড়া করাইলাম, সেই খসড়ার উপর আমার মোহর করিয়া তাহা মহারাজাকে দিয়া গেলাম। ইহার পর আমি হুগলী হইতে ফিরিয়া আসিলাম, কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম—সদর উদ্দিন আমার হইয়া গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সহিত সমস্ত গোলমাল মিটাইয়া রাখিয়াছে। আমি মহারাজা নন্দকুমারের নিকটে গিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত কথা বলিলাম ও আমার আরজী দুই খানি ফেরত চাহিলাম। তিনি এতদুত্তরে বলিলেন—“তোমার সহিত টাকার সম্বন্ধে যে প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তদনুযায়ী কার্য্য

করিলে আরজী ফিরাইয়া দিব।” আমি বলিলাম “গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য টাকার এক কপর্দ্দকও পাই নাই, পাইলে আপনাকে প্রতিজ্ঞামত অর্থ প্রদান করিব।” আমি আরও বলিলাম—“যদি ইহাতে আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে আমি রসীদ বা খত লিখিয়া ইহার যথার্থতা দেখাইতেছি।” মহারাজা এই সময়ে বলিলেন—“সে আরজী আমার নিকটে এক্ষণে নাই—রাধাচরণ আমার অজ্ঞাতসারে তাহা ফাউক সাহেবকে দেখিতে দিয়াছে।” আমি বলিলাম “আমি আপনাকেই আরজী দেখিতে দিয়াছিলাম—ফাউক সাহেবের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।”

আমি ক্ষুব্ধ চিত্তে এই সমস্ত কথা বলিলে মহারাজা আমায় বলিলেন—“কমল ইহাতে দুঃখিত হইও না। ফাউক সাহেবের নিকট তোমার আরজী থাকাতে কোন ক্ষতি নাই। তুমি একটী কাজ কর না কেন—তাহা হইলে আরজী ফিরাইয়া দিব—ফাউক সাহেবের বিরুদ্ধে গবর্ণরের মন্ত্রণাক্রমে যে আরজী খানি তুমি লিখিয়াছিলে, তাহার সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়া দাওনা কেন “আমি গবর্ণরের ও গ্রেহাম সাহেবের উত্তেজনায় এই প্রকার আরজী লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এরূপ করিলে ফাউক সাহেবও তোমার উপর যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইবেন ও তোমাকে পুর্ণিয়ার কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন।” আমি তখন কিছু না বলিয়া অনন্যোপায় হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আবার মধ্যাহ্নে গিয়া মহারাজার সহিত দেখা করিয়া একখানি লিখিত আরজী তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া দরখাস্ত পড়িতে পড়িতে উপরে গেলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। তিনি বলিলেন—এখানি ভাল হয় নাই, পুনরায় লিখিতে হইবে। অদ্য সন্ধ্যাকালে তুমি আমার বাটীতে তোমার মুন্সীকে লইয়া আসিও। আমি রোষ ভরে সেই আরজী খানি ছিন্ন করিয়া চলিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার সময় নিজের মুন্সী লইয়া গেলাম। মহারাজের মুন্সী দোমান সিংও সেই স্থানে আসিল। একখানি খসড়া আরজী হইলে তাহা মহারাজাকে দেখান হইল। তিনি আদ্যোপান্ত পড়িয়া তাহার দুই এক স্থান নিজ হস্তে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। এই সময়ে হঠাৎ আমার উদরের মধ্যে বেদনা উপস্থিত হইল, আমি বলিলাম, “আমার বড় অসুখ করিতেছে, আর বসিতে পারি না—আপনি পরে আরজী আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন।” আমি বাটী চলিয়া আসিলাম। রাত্রি একপ্রহরের সময় আমার মুন্সী ও মহারাজার ভৃত্য সেখ ইয়ার মহম্মদ আমার বাটীতে আসিল। ইয়ার মহম্মদ বলিল, মহারাজা নন্দকুমার এই দরখাস্তে শীলমোহর করিবার জন্য তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন। আমি ইয়ার মহম্মদকে বলিলাম, তোমার মহারাজার সহিত আমার এমন কোন লেখা পড়া নাই যে আমাকে এই আরজী সহী করিতে হইবে, আমি এরূপ করিব না। ইয়ার মহম্মদ একথা শুনিয়া চলিয়া গেল। পরদিন আমি ফাউক সাহেবের বাটীতে গেলাম। দেখিলাম রায় রাধাচরণ ফাউক সাহেবের পুত্র ফ্রান্সিস্ সাহেবের ঘরে বসিয়া আছেন। আমি গিয়া কাছে

বসিলাম। রায় রাধাচরণ বড় ফাউক সাহেবের ঘরে উঠিয়া গেলেন। এক ঘণ্টা পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমি যে ঘরে ছিলাম, সেই ঘরে আসিলেন। এমন সময়ে অক্রুর মান্না আসিয়া আমায় বলিল বড় ফাউক সাহেব তোমায় ডাকিতেছেন। আমি তাহার সঙ্গে গেলাম।

সাহেব বিছানায় শুইয়াছিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে এক কেদারায় উপবেশন করিলাম। ফাউক সাহেব আমাকে প্রথমে নানাবিধ মিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিলেন। তৎপরে আরজীখানি বালিসের নিম্ন হইতে বাহির করিয়া তাহা শীল করিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিলেন। এই সময়ে ফাউক সাহেবের দুই জন ফিরিঙ্গি খানসামা, ও বাঙ্গালী ভৃত্য সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। আমি বলিলাম, মহারাজার সহিত আমার এমন কোন বন্দোবস্ত হয় নাই যে, তাহাতে বাধ্য হইয়া আমায় শীল করিতে হইবে? ফাউক সাহেব রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দরখাস্তে যে "গরীব পরওয়ার আদালত গুস্তার" কথাগুলি লেখা আছে, কাহার উদ্দেশে ঐগুলি লিখিত হইয়াছে"? ফাউক সাহেব ভয়ানক রাগিয়াছেন দেখিয়া আমি গলায় কাপড় দিয়া অনুনয়ে সাহেবকে বলিলাম—"ধর্ম্মাবতার আমি গরীব লোক, আমাকে এই প্রকারে নষ্ট করিলে আপনার কি ইষ্ট লাভ হইবে? আরজীতে যাহা লেখা আছে তাহা সমস্ত মিথ্যা, আমি উহাতে শীল সংযোগ করিতে পারিব না।" ফাউক সাহেব এই সময়ে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে একখানি বই তুলিয়া লইলেন * ও আমাকে "কুত্তাকা বাচ্ছা" ইত্যাদি নানাবিধ অশ্রাব্য গালাগালি দিতে লাগিলেন। আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া আরজী সহী করিতে স্বীকৃত হইলাম। সাহেব ধীরে ধীরে বই খানি রাখিয়া দিলেন। এই সময়ে আমার শরীর ভয়ে কাঁপিতেছিল। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে আরজী সহী করিলাম। সাহেব বলিলেন, এই সমস্ত লোককে সাক্ষীরূপে স্বাক্ষর করিতে দাও। আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না। আর একখানি ফর্দ্দ বাহির করিয়া তিনি বলিলেন ইহাতে সহী কর। সেই ফর্দ্দে লেখাছিল "আমি বারওয়েল সাহেবকে তিন বৎসরের মধ্যে ৪৫০০০ টাকা, গবর্ণরকে উপহার স্বরূপ ১৫০‍০০ টাকা, হঁসিয়া জঙ্গকে (ভান্ সিটার্ট সাহেবের পার্সী নাম) ১২০০০, রাজা রাজবল্লভকে ৭০০০, ও কান্ত বাবুকে ৫০০০ টাকা দিয়াছি।" তিনি দফায় দফায় টাকাগুলি পড়িয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—অমুককে অমুক টাকা দিয়াছ কি না? আমি "হঁা" দিয়া গেলাম ও ফর্দ্দে সহী করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিলাম। সিঁড়ির নীচে সমসের বেগের সহিত আমার দেখা হইল। সমসের বলিল তুমি কাঁপিতেছ কেন? আমি বলিলাম ফাউক সাহেব আমার উপর অন্যায় জবরদস্তি করিয়া এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন।

* বইখানির নাম "Churchill's Voyages."

এই সময়ে স্বয় রাধাচরণ ও ছোট ফাউক সিঁড়ির বারান্দার উপর হাসিতে হাসিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলাম, আপনার পিতা বলপূর্ব্বক যে আরজী গুলি আমায় জবরদস্তিতে সহী করাইয়াছেন, তাহা আমায় প্রত্যর্পণ করুন, নচেৎ আমি কৌন্সিলের সমক্ষে এজন্য নালিশ করিব। ফাউক সাহেব আমায় দাঁড়াইতে বলিয়া পিতার কাছে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া একতাড়া কাগজ দেখাইয়া বলিলেন ইহার ভিতর তোমার সমস্ত আরজী আছে, কাল সকালে এখানে আসিও, মহারাজা এখানে ঐ সময়ে আসিবেন—তখন তাঁহার ও তোমার ইচ্ছামত আরজী ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আমি নিরুপায় হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সদর উদ্দিনের বাটীতে গিয়া তাহাকে এই সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলাম। তাহার পর সদর উদ্দিনকে বলিলাম যদ্যপি ফাউক সাহেব আমাকে এই সমস্ত আরজী ফিরাইয়া না দেন, তবে কল্য তুমি ভান্‌সিটার্ট ও বারওয়েল সাহেবকে এই সকল কথা জানাইও। আমি সন্ধ্যার সময় মহারাজা নন্দকুমারের বাটীতে গেলাম। মহারাজা তখন কোন গোপনীয় কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। বাহিরে আসিয়া দেওয়ানখানায় বসিলে আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলাম। তিনি ফাউক সাহেবের এই প্রকার ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন—এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে ফাউক সাহেবের বাটীতে গেলাম। উপরে না উঠিয়া সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম মহারাজা ও রাধাচরণ নীচে নামিয়া আসিয়া পাল্কীতে প্রবেশ করিলেন। আমি মহারাজাকে বলিলাম আপনি আমার উপায় কি করিলেন? তিনি বলিলেন অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম—ফাউক সাহেব কোন মতেই আমার কথা শুনিলেন না। মহারাজা পাল্কীতে উঠিয়া প্রস্থান করিলে আমি নিরাশ হইয়া, ভয়াকুলচিত্তে, "দোহাই কোম্পানীর আমি কিছুই জানি না, ফাউক সাহেব, মহারাজা ও রাধাচরণ এই প্রকার জবরদস্তিতে আমার নিকট হইতে এই প্রকার "বরামদ" † লিখাইয়া লইয়াছেন।" এই কথা বলিতে বলিতেও যন্ত্রণার চোটে পায়জামা ছিঁড়িয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে দৌড়াইয়া আসিলাম। ইয়ার মহম্মদ ও নীলু সিং আসিয়া আমার হাত ধরিল। আমি জোর করিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পাল্কীতে উঠিলাম। রাজা রাজবল্লভের তোষাখানার কাছ বরাবর আসিয়া দেখি যে তখনও আমার লোকেরা ফাউক সাহেবের ও মহারাজার লোকের সহিত বচসা করিতে করিতে ছুটিতেছে। আমি গবর্ণরের বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলাম, পরে গরিব পরওয়ার আদালতে গিয়া বিচারকদের সম্মুখে নিয়মিতরূপে অভিযোগ করিলাম"। চক্রান্তটি কি—পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহা যে কতদূর সত্য ও সারগর্ভ তাহা বিচারেই

† বড় লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগের নাম "বরামদ"

প্রকাশ পাইয়াছে। মহারাজ নন্দকুমার, ফাউক ও রায় রাধাচরণ সকলেই এই মোকর্দ্দামায় নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হন—ও কমল উদ্দিন মিথ্যাবাদী হইয়া পড়ে ও এইখানেই এই মোকর্দ্দামার শেষ হয়।

জাল অপরাধ।

১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ৬ই মে তারিখে মহারাজ নন্দকুমার—মোহন প্রসাদ, কমলউদ্দিন, ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির সাক্ষ্যের জোরে জালকারী বলিয়া সহসা ধৃত ও কারা নিক্ষিপ্ত হয়েন। চক্রান্ত মোকর্দ্দামায় কমলউদ্দিন যেমন সহসা গিয়া প্রথমে গবর্ণরকে, ও তৎপরে সুপ্রীম কোর্টের জজেদের তাহার অভিযোগ বৃত্তান্ত জানাইয়াছিল, এ মোকর্দ্দামায় মোহনপ্রসাদও তদ্রূপ করিয়াছিল। জজ লিমেষ্টার এই সময়ে Justice of the Peaceএর কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহার নিকটেই মোহনপ্রসাদ প্রথমে বিচার প্রার্থী হয়। ইনি এবং হাইড সাহেবই চিফ জষ্টিসের সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাজা নন্দকুমারের জাল অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে সহসা কারাবদ্ধ করিতে হুকুম প্রদান করেন। *

বাল্য কাল হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি মহারাজ নন্দকুমার জাল অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু সেই রহস্যময় জাল অপরাধটি যে কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১৭৬৯ খৃঃঅব্দে বালাকী দাস শেঠ নামক কলিকাতার ও মুরশীদাবাদের একজন সুপ্রসিদ্ধ বণিক ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মরিবার পূর্ব্বে বালাকী স্বীয় স্ত্রী, কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পদ্মমোহন দাস নামক এক নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়ের উপর সমর্পণ করিয়া মহারাজা নন্দকুমারকে অনুরোধ করেন, "আমার অবর্ত্তমানে আপনি আমার স্ত্রী কন্যাদিগের সংবাদাদি লইবেন ও আমায় যেমন বরাবর অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, ইহাদিগকেও তদ্রূপ করিবেন।" বালাকী একখানি উইল করিয়া গেলেন; এই উইলের স্বত্বানুযায়ী গঙ্গাবিষ্ণু ও তাঁহার ভ্রাতা হিঙ্গুলাল ট্রষ্টী বা তত্ত্বাবধারকরূপে নিযুক্ত হইলেন। পদ্মমোহন দাস এই উইলের বলে বিষয়ের সহিত সংলিপ্ত সমস্ত অনাদায়ী 'টাকা আদায় করিবার ভার পাইলেন। উইলের সত্ব রহিল—তিনি যতটাকা এইরূপে আদায় করিবেন, তাহার উপর বিবেচনানুসারে কমিশন পাইবেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বালাকীর অন্যান্য সমস্ত কাজকর্ম্মের ভার পাইলেন। সম্পত্তির অব-

* জাল মোকর্দ্দামায় যে সমস্ত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া জজেরা. মহারাজাকে অভিযোগার্হ বিবেচনা করিয়া কারাবদ্ধ করিতে আজ্ঞা দেন, তাহার কোন Record নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, চক্রান্ত মোকর্দ্দামাগুলি অতি সামান্য হইলেও তাহার সম্বন্ধে এইরূপ Preliminary Record আছে,কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ জাল মোকর্দ্দামার প্রথম বিচারের কোনমাত্র ইতিহাসই লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইহাতে কি সন্দেহ উপস্থিত হয় না?

শিষ্টাংশ তাঁহার বিধবা পত্নী কন্যার মধ্যে ও অন্যান্য দাতব্য ও দৈবকার্য্যে তাঁহার নির্দ্দেশ মত বিভাজিত হইবে, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। উইল করিবার পূর্ব্বে বালাকী পদ্মমোহন দাসকে স্বীয় বিষয় কর্ম্মের আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও মোহনপ্রসাদ এই সময়ে গঙ্গাবিষ্ণুর ইচ্ছানুসারে তাঁহার মোক্তার নিযুক্ত হন। মোহনপ্রসাদের এই প্রকারে নিযুক্ত হওয়ার কথা বালাকীর উইলে উল্লিখিত আছে। উইলখানি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে দেখাইতে ইচ্ছা ছিল—কিন্তু স্থান সংক্ষেপ বলিয়া তাহাতে বিরত হইলাম। বালাকীর মৃত্যুর পর চির-প্রচলিত প্রথা মত, তৎকালীন "মেয়র কোর্টে" তাঁহার উইলের "Probate" লওয়া হইল (৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৬৯)।

বালাকীর সম্পত্তির অধিকাংশই বাহিরে পড়িয়াছিল—কোম্পানী তাঁহার নিকট প্রায় দুইলক্ষ টাকা ধারিতেন। তিনি উইলে যে সমস্ত আদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন—তাহা সুসিদ্ধ হওয়া অনেকাংশে এই টাকা আদায়ের উপর নির্ভর করিত। মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার প্রধান মুরুব্বি বা Patron ছিলেন। বালাকী মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহাকে এই টাকাগুলি গবর্ণর সাহেবের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কার্য্য গতিকে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় পাঁচ মাস পরে মহারাজ নন্দকুমার, পদ্মমোহন দাস ও গঙ্গাবিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া বেলভেডিয়ারে (বর্ত্তমান বেলভেডিয়ারের ঠিক পশ্চাতেই) গবর্ণর সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হন। এই স্থলে মহারাজ নন্দকুমারের সহায়তায় টাকাগুলি প্রধানতঃ নোট এবং কোম্পানীর কাগজের দ্বারা আদায় করিয়া গঙ্গাবিষ্ণু পদ্মমোহনকে এই টাকাগুলি বালাকীর বিধবাকে প্রদান করিতে উপদেশ দেন। বালাকীর বিধবা পত্নী এই অসম্ভাবিত অনুগ্রহে আপ্যায়িত হইয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে বলিলেন—"মহারাজা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, বলিতে গেলে তাঁহার দ্বারাই আমার এই প্রচুর অর্থাগম হইল, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমি তাঁহার সহিতই মৃতস্বামীর দেনা পাওনা পরিশোধ করিব—ইহার পর অন্যান্য মহাজনদিগের সহিত তদ্রূপ করা হইবে।" বালাকীর বিধবার এই কথাই তাঁহার তত্ত্বাবধারকেরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির করিলেন ও সর্ব্বাগ্রে মহারাজার দেনা পরিশোধ জন্য তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে পদ্মমোহন দাস—গঙ্গাবিষ্ণু মোহনপ্রসাদ ও কৃষ্ণজীবন দাস (মুহুরী) কে সঙ্গে লইয়া মহারাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বালাকী তাঁহার নিকট যে টাকা ধারিতেন, তৎপরিবর্ত্তে জামিনস্বরূপ প্রয়োজন মত খত বা তমসুক দিয়াছিলেন। এই সকল তমসুকের দেনা পরিশোধ করিয়া বালাকীর ত্যক্ত সম্পত্তিকে দায় মুক্ত করাই এই আগমনের উদ্দেশ্য। মহারাজা—গঙ্গাবিষ্ণু ও পদ্মমোহন দাসকে কয়েকখানি দলিল বা তমসুক প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহার একখানি ১০,০০০৲ টাকার ও নাগরীতে লিখিত, একখানি পট্টক ও আর তিন খানি পারসী তমসুক। ইহার মধ্যে একখানি

পারসী তমসুক ৪৮০২১৲ টাকার হইবে। ইহা ভিন্ন "দরবার খরচা"র * জন্য প্রায় ৩৫০০০ হাজার টাকার দুইখানি বিল দেখান হইল। 'দরবার খরচা'র এই বিল দুখানি দেখাইবার প্রধান কারণ এই যে উল্লিখিত টাকাগুলি আদায় করিতে গবর্ণর সাহেবকে' প্রায় ৩৫০০০৲ টাকা ঐ বাবদে দেওয়া হইয়াছিল।

মহারাজ নন্দকুমারের দাবি অনুসারে বালাকী দাসের অন্যতম উত্তরাধিকারীরা, পদ্মমোহন দাস ও তত্ত্বাবধারক গঙ্গাবিষ্ণু উল্লিখিত তমসুকগুলি ফিরাইয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে সেই দলিলের তুল্য মূল্যের কয়েকখানি কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিলেন। বালাকী দাসের মুহুরী কৃষ্ণ জীবন দাস এই কাগজগুলি খাতায় জমা করিয়া মহারাজার কর্ম্মচারী চৈতন্যনাথের হস্তে দিল। মহারাজা সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল ভাবিয়া উল্লিখিত তিনখানি পারসী তমসুকের (চলিত প্রথানুসারে) মাথা ছিঁড়িয়া বালাকীর কর্ম্মচারীদের অর্পণ করিলেন। তাঁহারা বিনা আপত্তিতে ও বিনা সন্দেহে সেইগুলি ফিরাইয়া লইয়া দস্তুর মত কাজ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই কয়েকখানি ছিন্ন শীর্ষ তমসুকের মধ্যেই একখানি জাল তমসুক বলিয়া পরে উল্লিখিত হয় ও ইহার জন্যই ভবিষ্যতে মহারাজা নন্দকুমার বীভৎস চক্রান্ত বেষ্টিত হইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন। আজও এই ছিন্ন শীর্ষ পারসী তমসুকখানি হাইকোর্টের অন্ধ-তমসাবৃত প্রাচীন কাগজ পত্রের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করিলে তাহা একদিন দেখিয়া আসিতেও পারেন।

পদ্মমোহন, গঙ্গাবিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই বিনা আপত্তিতে ও বিনা সন্দেহে সেই খত গুলি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইগুলির সম্বন্ধে যদ্যপি এই সময়ে কোন প্রকার সন্দেহ তাঁহাদের মনে উদিত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা সাধ্যমতে তাহার প্রকৃত কারণানুসন্ধান করিতেন। কেহ কেহ বলেন পদ্ম-মোহনের—মহারাজা নন্দকুমারের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া এইস্থলে বিশ্বাসঘাতকতা করা অসম্ভব নহে; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বালাকীর বিধবা পত্নীর ন্যায় পদ্মমোহন দাসেরও এই আদায়ী টাকার উপর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের উভয়েরই এই সমস্ত অনাদায়ী টাকা আদায় হইলেই লাভ আছে। বালাকীর উইলানুসারে সমস্ত দেনা পত্র বাদে বিধবা উইলের স্বত্বানুসারে তাঁহার নিজ অংশ ও পদ্মমোহন দাস উদ্বৃত্ত টাকার উপর শত-

* "Durbar Expenses" বা "দরবার খরচা" শব্দের একটি গূঢ় অর্থ আছে। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সেই সময়ে বড় বড় রাজ কর্ম্মচারীরা গোপনে গোপনে ঘুষ খাইতেন ও কখন কখন প্রকাশ্য নজরাদি লইতেন। কোম্পানির সহিত কোন বিশেষ কার্য্য শেষ করিতে হইলে তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের পূজা না করিলে সেই কার্য্য সিদ্ধি হইত না। এই প্রকারে বড়লোকের সহায়তা লইবার জন্য যে টাকা প্রদান করা হইত, তাহাকে "দরবার খরচা" বলিয়া উল্লেখ করা হইত।

করা পঁচিশ টাকা ও কোন কোন স্থলে দশ টাকা কমিশন পাইবেন। কোম্পানীর নিকট হইতে আদায়ী টাকার উপর তাঁহার দশ টাকা কমিশন বরাদ্দ ছিল। এ প্রকার স্থলে যে পরিমাণে টাকা দেনা প্রভৃতি বাদে বিষয়ের সম্বন্ধে উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা হইতেই তিনি উপযুক্ত কমিশন আদায় করিয়া লইবেন। নন্দকুমারকে যে সমস্ত টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহার উপর এই প্রকারে ১০৲ হিঃ কমিশন ধরিলে পদ্মমোহনের প্রায় চৌদ্দ হাজারের উপর টাকা পাওনা হয়। এ প্রকার স্থলে আপনার লাভের ও উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মহারাজা নন্দকুমারের সহায়তা করা পদ্মমোহনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। অন্য কারণ এই—পদ্মমোহন দাস বালাকীর পরমাত্মীয়, বিশেষ তিনি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। সুতরাং এ প্রকার স্থলে সামান্য লাভের প্রত্যাশায় কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ বা বিশ্বাসঘাতকতা করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। দুঃখের বিষয় এই, জাল অপরাধের বিচারের সময় পদ্মমোহন জীবিত ছিল না। পদ্মমোহনের জীবিতাবস্থায় এই অভিযোগের বিচার হইলে আমরা হয়ত প্রকৃত ঘটনাটি বুঝিতে পারিতাম। পদ্মমোহনের সহিত মহারাজার এ সম্বন্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না, তাহার অন্য প্রমাণ এই—যতদিন পদ্মমোহন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরেই সিবিল কোর্টে মহারাজা নন্দকুমারের নামে ক্ষতিপুরণের জন্য প্রথম নালিশ রুজু করা হয়।

বালাকীদাসের বিধবা যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, ততদিন এই তমসুকের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে কেহ সাহস করেন নাই। কোম্পানীর নিকট হইতে আদায়ী টাকার মধ্যে উল্লিখিত সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া কেবলমাত্র ৬০০০০ ষাট হাজার টাকা অবশিষ্ট রহিল। যদি খতখানি প্রকৃত পক্ষে জাল হইত, বা তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সারগর্ভ সন্দেহ হইত, তাহা হইলে বালাকীদাসের উত্তরাধিকারীরা ও ট্রষ্টীরা কখন বিনা আপত্তিতে অতগুলি টাকা ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না। খতখানি যে প্রকৃত ছিল, এই বিশ্বাস দৃঢ় হইবার আরও কারণ এই—এই প্রকার গোলমাল ও সন্দেহের পরও ৩। ৪ বৎসর মধ্যে অতিবাহিত হইয়া গেল, অথচ এ সম্বন্ধে আদালতের সাহায্য লইয়া বা অন্য কোন প্রকারে সন্দেহের মূলোৎপাটন করিয়া স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষা করার কথা কাহারও মনে উদিত হইল না। পদ্মমোহনের জীবদ্দশায় তিনি নিজের হাতে খাতাপত্রে এই সমস্ত হিসাব পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া ভবিষ্যৎ কাজকর্ম্মের গোড়া বাঁধিয়া দিলেন, তখন এই সন্দেহ নিরাকরণ জন্য কোন অনুষ্ঠানই করা হইল না; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই এই সমস্ত পরিষ্কার বিষয়ের মধ্যে মোহনপ্রসাদের জন্য গোল বাধিয়া উঠিল। অন্যান্য সরিকদিগকে উত্তেজিত করিয়া মোহনপ্রসাদ মহারাজার নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সকল কার্য্যে গঙ্গাবিষ্ণুর কোন বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। সন্দেহ নাই বলিয়াই হউক

বা অন্য কারণেই হউক, গঙ্গাবিষ্ণু এ বিষয়ের জন্য মহারাজার নামে আদালতের সাহায্য লওয়ার কোন আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু অন্যান্য দুই একজন সরিকেরা ও উত্তরাধিকারীরা মোহন প্রসাদের উত্তেজনায় গঙ্গাবিষ্ণুকে এই কার্য্যে ব্রতী করিল। মোহনপ্রসাদের ইহাতে বিশেষ স্বার্থ ছিল—এই সমস্ত টাকা আদায় করিতে পারিলে সে শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন পাইবে—অন্যান্য সরিকদের সহিত এ বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছিল। দুই পক্ষ হইতেই তাহার লাভের আশা ছিল। এই প্রকার আন্দোলনে ভীত হইয়া হয়ত মহারাজা তাহার সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, প্রথমে সে ইহাই ভাবিয়াছিল; সুতরাং সেই আশায় পদ্মমোহনের মৃত্যুর পরে জোগাড় যন্ত্র করিয়া মোহনপ্রসাদ তৎকালীন দেওয়ানী আদালতে মহারাজার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত টাকা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য নালিশ উপস্থিত করিল।

এই সময়ে দেওয়ানী আদালতে Palk সাহেব নামক একজন উদ্ধত স্বভাব প্রধান বিচারপতি ছিলেন। কোন কারণে আদালত অবমাননা ঘটাতে ইনি মহারাজা নন্দকুমারকে কারাগারে প্রেরণ করেন। মহারাজা একরাত্রি মাত্র কারাগারে ছিলেন এবং স্বয়ং হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে এই সময়ে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। দুঃখের বিষয় এই, জাল মোকর্দ্দমায় যে সময়ে মহারাজা সুপ্রীমকোর্টের আজ্ঞায় কারাবদ্ধ হন, সেই সময়ে তাঁহাকে উদ্ধারের জন্য হেষ্টিংস সাহেব পূর্ব্বকার মত কোন চেষ্টা করেন নাই। এই সময়ে নন্দকুমার তাঁহার প্রধান শত্রু হইয়াছিলেন—নচেৎ তিনি যে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার সুবিধা করিতে পারিতেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। *

যাহা হউক এই সময়েও মোকর্দ্দমার কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না। ইহার পর বাউটন রুজ্ নামক একজন জজ্ দেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত হইলেন। বাউটন সাহেব মোকর্দ্দমাটির কাগজ পত্র সমস্ত নাগরীতে লিখিত বলিয়া ও মূল অভিযোগের জটিল অর্থ কোন মতে সরল করিতে না পারিয়া উভয় পক্ষকেই রফা করিতে পরামর্শ দেন। সিবিল কোর্টে যে মোকর্দ্দমা হইয়াছিল, তাহাতে জাল করার কোন কথারই উল্লেখ

* এ সম্বন্ধে হেষ্টিংসের প্রাণের বন্ধু ইম্পি স্বয়ং পার্লামেণ্টের সমক্ষে এজাহার দিতে দিতে কি বলিয়াছেন—দেখুন।

"It was in evidence that Mr. Palk, judge of the Adalat had confined (NandoKumer) and that it was notorious that Mr. Hastings had ordered him to be released. This is of itself was sufficient to prevent any Native inhabitant of Calcutta from commencing a prosecution against him. শেষের যুক্তিটির খণ্ডন আমরা পরে করিব।

ছিল না। সুতরাং এ সময়ে এ ঘটনা এক প্রকারে মিটিয়া যায়। ১৭৭৪ অব্দে সুপ্রীম-কোর্ট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই দুই চারি জন বৃকোদর গোছের উকীল আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। শিকার অন্বেষণ তাঁহাদের প্রথম কার্য্য হইল। মহম্মদ রেজাখাঁর বিচারের পর হইতেই হেষ্টিংস সাহেব নন্দকুমারের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়াছিলেন। দেওয়ানী আদালতের ব্যাপার তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। সুতরাং মোহন প্রসাদকে ডাকিয়া সেই পুরাতন ব্যাপার নূতন করিয়া মহারাজা নন্দকুমারকে ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকল কার্য্য যখন এক প্রকার সমাধা হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে মহারাজা গবর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে সুপ্রীমকোর্টে তাঁহার নামে উপর্য্যুপরি জাল ও চক্রান্ত দুইটি মোকদ্দামা আনা হইল।

মহারাজ নন্দকুমার (১৭৭৫ খৃঃ) ৬ই মে শনিবার রাত্রি দশ ঘটিকায় জজেদের আজ্ঞানুসারে সহসা কারানিক্ষিপ্ত হয়েন। তাঁহার ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সহসা এইরূপে কারানিক্ষিপ্ত হইলে দেশের লোকে অতিশয় ভীত ও আশ্চর্য্য হইল। জজ লিমেষ্টার ও হাইড এই সময়ে জষ্টিস্ অব্ দি পিসের কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহারা মোহন প্রসাদ, কমল উদ্দিন ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির সাক্ষ্য লইয়া মহারাজাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিতে তৎকালীন সরিফের উপর জোর পরওয়ানা দিলেন।* সেই সময়ে ম্যাক্রেবি সাহেব কলিকাতার সরিফ ছিলেন, কিন্তু তৎকালে তিনি কার্য্যোপলক্ষে অনুপস্থিত থাকাতে তাঁহার সহকারী টলফ্রে সাহেব মহারাজাকে জজেদের আজ্ঞানুসারে কারাবদ্ধ করেন।

কারাগারে গিয়া হিন্দু মহারাজা অন্ন জল পরিত্যাগ করিলেন—সেই সর্ব্বজাতিপূর্ণ, কোলাহলময় কারাগারে দেবার্চ্চনা ও সন্ধ্যা আহ্নিক তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইল। তিনি পর দিবসেই তাঁহার উকীল Jarret সাহেবকে আদালতে জজেদের নিকট এই কথা জানাইতে বলিলেন। এই সময়ে Farrer সাহেব নন্দকুমারের কাউ-

---

* (পরোয়ানার নকল)

"To the sheriff of the Town of Calcutta and Factory of Fort William in Bengal and to the Keeper of His Majesty's Prison at Calcutta."

"Receive unto your custody the body of Moharaja Nund Kumer herewith sent you, charged before us upon oaths of Mohun Persad, Kamaluddin Khan and others with feloniously uttering as true, a false and counterfeit writing obligatory knowing the same to be false and counterfeit in order to defraud the Executors of Balaki Das diceased, and him safely keep until he shall be discharged by due course of Law. (Vide—Touchett's Petitions – Genl. App.)

ন্সেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন এই প্রকারে অন্নাহারে থাকিলে চির-সুখী মহারাজা কয়দিন টিকিবেন ? তিনি Jarret সাহেবকে নন্দকুমারের জন্য Habeas corpus এর প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন। Habeas corpus অনুসারে সম্ভবতঃ মহারাজার অবরোধ স্থল পরিবর্ত্তন হইতেও পারে ; অথবা জজেরা ইহা স্বীকার করিলে জামিন লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেও পারেন। ফারার ভাবিলেন জজেরা তাঁহার এই যুক্তিপূর্ণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলে তিনি মহারাজাকে জামিনের উপর খোলশা দিতে অথবা কলিকাতার নূতন দুর্গে কঠিন প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া রাখিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার মান সম্ভ্রম ও শারীরিক স্বচ্ছন্দ অনেকটা বজায় থাকিবে। ইহাতেও সম্ভবতঃ যে কোন আপত্তি হইবে, তাহা তাঁহার ধারণা ছিল না। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল—জজেরা তাহার প্রার্থনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। ইহার পর কি হইল, এস্থলে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিতে চাহি না—পূর্ব্বেই ভারতীর নবম খণ্ডে এই সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছি। হেষ্টিংস সাহেব ও ইম্পি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই মহারাজার এই অসীম কারাযন্ত্রণা আইন-সঙ্গত উপায়ে উপশম করিতে পারিতেন, ইহাতে তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি বই হ্রাস হইত না। কিন্তু তাঁহারা কেহই তদ্রূপ করেন নাই। কান্ত বাবুকে যখন তুড়ুম লাগাইবার কথা হয়, তখন হেংষ্টিস সাহেব "তাঁহার মানহানি হইবে"বলিয়া ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তদপেক্ষা শতগুণে ধন মান সম্পন্ন, নবাবের প্রধান মন্ত্রী মহারাজা নন্দকুমারের মান রক্ষার জন্য তিনি এ প্রকার কোন কথা বলিতে চেষ্টা করেন নাই।

এই ঘটনার পর ৮ই জুন মোকর্দ্দামার বিচার আরম্ভ হয়। বিচারের প্রথম দিনেই জুরী নির্ব্বাচন আরম্ভ হয়। এই সময়ে মহারাজা তাঁহার ন্যায় সমাবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত দেশীয় জুরীর দ্বারা বিচারিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়া তজ্জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ইম্পি সাহেব "চার্টার" ও "বিলাতী আইনের" দোহাই দিয়া তাহাতে আপত্তি করিলেন। ইহার পর যে জুরী নির্ব্বাচিত হইল, তাহারা সকলেই ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী। তাহাদের মধ্যে এক জনও দেশীয় জুরী নির্ব্বাচিত হয় নাই। এই জুরীর নির্ব্বাচিত অধিকাংশ ব্যক্তিই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে গবর্ণরের বা ইম্পির সহিত লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং ইহাদের হস্তে সুবিচারের আশা করিয়া মহারাজা কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠক বেশ্ বুঝিতে পারেন। আজকালকার দিনেও যখন এই প্রকার পক্ষপাতপূর্ণ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়, তখন যে সেই বিশৃঙ্খলার সময়ে ইহা একটি দুর্লভ দৃশ্য হইবে, এরূপ কখন আশা করা যাইতে পারে না। আজকাল জুরীদের মধ্যে অধিক পরিমাণে বাঙ্গালী থাকিলেও যখন ইংরাজ সভ্যেরা কুসংস্কার ও জাতীয় বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া দেশীয় অপরাধীকে অপরাধী করিতে পারিলে ছাড়েন না, তখন সেই অন্ধতমসাবৃত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ প্রাচীন কালে যে মহা-

রাজা এক দল ইউরোপীয়ান ও ইউরেসিয়ান জুরীর হাতে সুবিচার পাইয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না।

জুরীর ফোরম্যান রবিন্সন সাহেবের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের মনে স্বতই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, জুরীরা প্রথম হইতেই কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলেন। যখন ফারার সাহেব নন্দকুমারের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবার পর তাহা স্থগিত রাখিবার জন্য ও দয়া প্রার্থনার জন্য রবিন্সনের নিকট একখানি দরখাস্ত তাঁহার সহীর নিমিত্ত প্রেরণ করেন, তখন রবিন্সন ইম্পিকে সেই দরখাস্ত দেখাইয়া ফারারকে যথেষ্ট তিরস্কৃত করিয়াছিলেন। ফারারের সহিত রবিন্সনের এই সময়ে যে সমস্ত চিটিপত্র চলিয়াছিল, তাহা হইতেই বেশ উপলব্ধি হয় যে, রবিন্সন অতিশয় সঙ্কীর্ণমনা ও নিষ্ঠুর হৃদয় ছিলেন। * পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার মেয়রী করিতেন। সুবিখ্যাত কাপ্তেন

---

* রবিন্সন্ কি প্রকার ধরণের লোক ছিলেন—দেখুন। দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিলে বা দণ্ডার্হ ব্যক্তির দণ্ডভার কমাইয়া দিবার জন্য দয়াপরবশ হইয়া অনুরোধ করিলে যে জুরীদের পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করা হইল,এমত নহে। ক্ষমা ও বিচার যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, রবিন্সন্ সাহেব অবশ্য একথা বুঝিতেন। তত্রাচ তিনি ফেরার সাহেবের পত্রের উত্তরে লিখিলেন—Mr. Robinson's compliments to Mr. Farrer—and begs him to reflect the nature of a British Juryman's oath and opinion, which must have been such, at the time of giving their verdict as can never with propriety be altered—Monday. 31st July 1775. ফেরার সাহেব আবার এই পত্রের উত্তরে যুক্তিপূর্ণ পত্র লিখিলেন। রবিন্সন্ উত্তর দিলেন"—I must in this case, judge and act from my conscience, and at the same time, I can not help remarking that the offering such a petition for me to sign, very much hurts my feelings, especially as it is on a subject, which in my opinion no person has a right to interfere in. (1st. Aug 1775.) রবিন্সন্ এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন বটে—কিন্তু Ellrington নামক জুরী সভ্য নন্দকুমারকে "দয়ার" জন্য অনুরোধ করিয়া দরখাস্ত সহী করিয়াছিলেন। এই প্রকার দয়া মায়াহীন, পশু প্রবৃত্তি জুরীর ফোরম্যান যে সুবিচার করিয়াছিলেন, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? প্রকৃত পক্ষে রবিন্সনের কি Conscience ছিল বলিয়া বোধ হয়? যে জুরীর বিচারের উপর অপরাধীর জীবন নির্ভর করিতেছিল—যাঁহারা কঠোর দায়িত্বে ব্রতী হইয়া শপথ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন—নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ ভাবে উভয় পক্ষের বিচার করাই যাঁহাদের কার্য্য, সেই জুরী নন্দকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ইম্পিকে সদবিচারের জন্য প্রশংসা করিয়া অভিনন্দন দিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ এই—From declaring how much we esteem ourselves indebted to the pains you have bestowed during the course of the late tedious and important Trial, in patiently investigating the evidence, and tracing the truth throughout all the intricacies of perjury and prevarication. &c.........ইহাতে ফোরম্যান রবিন্সন সর্ব্বাগ্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এ প্রকার জুরীর হস্তে মহারাজা যে ন্যায্য বিচার পাইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা বাতুল ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভবে না।

প্রাইস্ সাহেবের মতে রবিন্সন হেষ্টিংসের অতিশয় প্রিয় মিত্র। রবিন্সনের ন্যায় লোককে যে জুরীরা তাহাদের ফোরম্যান নির্ব্বাচিত করিয়াছিল, তাহাদের তীক্ষ্ণ দর্শিতা ও সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতা বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়। জুরীর অন্যান্য সভ্যগণ অতি সামান্য লোক ছিলেন। তাঁহাদের নাম কেহ কখন শুনে নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার Weston প্রভৃতি জন কয়েক ফিরিঙ্গি ছিলেন। এপ্রকার জুরীকে "ব্রিটিশ জুরী" বলিয়া ইম্পি যে কি প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হেষ্টিংস সাহেব যে এই জাল মোকর্দ্দামায় লিপ্ত ছিলেন, তাঁহার প্রথম কারণ দেখুন—বেলি সাহেব তাঁহার প্রাইবেট্ সেক্রেটারি। Farrer ও Robinson এর মধ্যে দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের পর যাহা কিছু লেখা লেখি হইয়াছিল, তাহা সমস্তই বেলির দ্বারা চিফ্ জষ্টিসের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। একথা জনশ্রুতি নহে—সমসাময়িক, স্পষ্টবক্তা, প্রাইস্ যিনি বিচারের আগাগোড়া বর্ত্তমান ছিলেন, তিনিই একথা লিখিয়াছেন। জুরীর ব্যবহার যে আদ্যোপান্ত বিশৃঙ্খল ও সন্দেহজনক ছিল ও আসামীর পক্ষে তাঁহারা নিতান্ত অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত দেখাইব। সমস্তগুলি তুলিতে গেলে স্থান সংকুলান হইবে না। বুলাকী দাসের শীলমোহর প্রমাণ করাইবার জন্য আসামী তাঁহার স্বহস্ত লিখিত কতকগুলি নাগরী ও পারসী চিঠি সাক্ষ্য স্বরূপ গৃহীত হইবার জন্য কোর্টে দাখিল করেন। এই চিঠি ও শীল সংযুক্ত কাগজগুলি দলিল স্বরূপে গৃহীত হইলে যে, বুলাকীর শীল প্রকৃত বলিয়া প্রমাণ হইত ও ফরিয়াদীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধা হইত, তাহা বলা বাহুল্য। আসামীর বারিষ্টার ফেরার সাহেব এই চিঠিগুলিকে দলিলস্বরূপ গৃহীত হইবার জন্য জুরীকে বিশেষরূপে করুণার ভাষায় অনুরোধ করেন। জুরীও এই প্রকার অনুরোধে চটিয়া গেলেন, আরও ইহা ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতির সহ্য হইল না—তিনি ফেরারের উপর চটিয়া গিয়া বলিলেন—"This is a manner in which the Jury ought not and shall not be spoke to. The prisoner ought not to suffer from the intemperance of his advocate. You, gentlemen of the Jury, ought not to receive any prejudice to the prisoner on that account, nor from the papers themselves &c." বলা বাহুল্য সেই পত্রগুলি সন্দেহের উপর অগ্রাহ্য করা হইল। সন্দেহের কারণ এই পত্রের উপর বুলাকীর মোহর ছিল বটে কিন্তু সহী ছিল না। এরূপ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা সৈএরমতাক্ষরীণ প্রণেতার নিম্ন লিখিত কথাগুলি হইতে বেশ প্রমাণ হইতে পারে। তিনি লিখিতেছেন—"সমান সমান অবস্থাপন্ন লোকেরা পত্রাদি লিখিবার সময়ে কেবলমাত্র খামের উপর স্বস্ব শীল সংযোগ করিয়া দিতেন। কখন কখনও বা তাহার উপর "বেইজ" এই কথাটি লিখিয়া দেওয়া হইত। নিম্ন অবস্থাপন্ন লোককে লিখিতে হইলে পত্রের নিম্ন ভাগে শীল সংযোগ করা হইত"। বুলাকীর পত্রের

খামের উপর শীল সংযোগ ও তাঁহার নাম স্বাক্ষর না থাকা সুতরাং যে তৎকালীন প্রথা-সঙ্গত, তাহার আর সন্দেহ নাই। সেই প্রচলিত প্রথার কথা হয়ত জুরীরা আদৌ জানিতেন না—অথবা জানিলেও তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। এ প্রকার জুরীর হস্তে বিচার কি প্রকার সূক্ষ্ম হওয়া সম্ভব, তাহা স্থির বুদ্ধি পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। একটি কথা বলিয়া রাখি, এ কথা সকলেরই মনে স্বভাবতঃই উদিত হইতে পারে—যদি নন্দকুমার এই চিঠিগুলি জালই করিতেন বা অন্য চিঠি লইয়া এই খামের ভিতর পুরিয়া দিয়া প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে যখন তিনি এতদূর করিয়াছিলেন, তখন জোগাড় করিয়া নামগুলি সহী করাইবার বন্দোবস্ত করিয়া এই ব্যাপার সম্পূর্ণ করিতে পারিতেন; তাহা হইলে ত কোন আপত্তি হইতে পারিত না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে, এইগুলি প্রকৃত চিঠি, জুরী কেবল অন্যায় করিয়া পক্ষপাত-দূষিত হইয়া এই প্রকার কার্য্য করিয়াছেন।

কি প্রকার জুরীর দ্বারা মহারাজার বিচার হইয়াছিল, তাহার পরিচয় দিয়াছি। এক্ষণে প্রধান Interpreter বা দ্বিভাষীর কথা বলিব। সেই সময়ে ইন্টারপ্রিটার না হইলে কোম্পানীর আদালতের কার্য্য কেন—কোন কার্য্যই চলিত না। বড় বড় কর্ম্মচারীদের প্রাইবেট সেক্রেটরী ছিল; তাঁহারা দেশীয় ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইত। অন্যান্য স্থলে দ্বিভাষীর কার্য্য তত দূর দায়িত্ব পূর্ণ নহে; কিন্তু আদালতে ঠিক তাহার বিপরীত। প্রথমতঃ উভয় পক্ষের সমস্ত কথা-গুলি নিস্বার্থভাবে সমান আগ্রহের সহিত প্রকৃতরূপে অনুবাদ করিয়া ধর্ম্ম বিশ্বাসে জজকে ও জুরীকে বুঝাইতে হইবে—কিছুরই এক চুল তফাৎ হইবার যো নাই। ইহাতে দেশীয় ভাষায় দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন। নন্দকুমারের বিচারের সময় যিনি (ইলিয়ট সাহেব) দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার দক্ষতার বিষয়ে আমাদের নানা সন্দেহ হয়—তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ এই—ইলিয়ট যে সময়ে আদালতের ইণ্টারপ্রিটারি করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বয়স ২০।২২ বৎসরের অধিক ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ স্যর গিলবার্ট (পরে লর্ড মিণ্টো) পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন—ইলিয়ট সপ্তদশ বর্ষ বয়সে হেষ্টিংসের বাঙ্গলায় আসিবার পর বাঙ্গলায় আইসেন। কোর্টের প্রধান ইণ্টারপ্রিটার চেম্বার্স সাহেব এই সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন, সুতরাং ইম্পি বিশেষ আগ্রহের সহিত এই অজাত-শ্মশ্রু, অপরিণত-বয়স্ক, অবিজ্ঞ যুবককে এই কঠোর ব্রত পালনে নিযুক্ত করিলেন। যদিও প্রতিভা বলে ইলিয়টের এই সময়ে পারসী ও হিন্দুস্থানী প্রয়োজন মত শিক্ষা করা সম্ভব হয়, তথাচ সেই শিক্ষা যে সম্পূর্ণ, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল অতি অল্প বয়সে গ্রীক্ লাটিন শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা সম্ভব হইলেও ইলিয়টের পারসী ও হিন্দুস্থানী সম্পূর্ণ শিক্ষা অতি অসম্ভব। ইংরাজের নিকট পারসীতে ও গ্রীক্ লাটিনে বিশেষ প্রভেদ। এ প্রকার

স্থলে ইলিয়ট সাহেব যে তাঁহার কার্য্য সুশৃঙ্খলে ও নির্ভুলে সম্পাদন করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব। তাঁহার ব্যাখ্যার দুই এক স্থলে কতকগুলি ভুল দেখা গিয়াছে। তাহা হইতেই বোধ হয় তিনি আগাগোড়া গলদ্ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ—এই ইলিয়ট সাহেব এই সময়ে হেষ্টিংসের প্রাইবেট্ সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ইলাইজা ইম্পির বাটীতে থাকিতেন ও ইম্পি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ইম্পি নিজমুখে পার্লামেণ্টে স্বীকার করিয়াছেন—"Elliot almost made a part of my family, and that no secret of my heart was unrevealed to him."—এই জন্যই বোধ হয় মহারাজ নন্দকুমার মোকর্দ্দামার প্রথমেই ইলিয়টের দ্বিভাষীর কার্য্য করা সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই আপত্তি ইলিয়ট-বৎসল ইম্পির প্রাণে বাজিল। তিনি ফারারকে গম্ভীরস্বরে ভ্রুকুটী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে এ আপত্তি করিল? ইলিয়ট নবীন যুবক—সবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, তিনি উচ্চবংশ-জাত ও কার্য্যদক্ষ—আমার মতে তাঁহার এই সমস্ত গুণরাশির জন্য কেহ তাঁহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি সুতরাং ইলিয়টের দ্বিভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করি।" ইলিয়াট এই সব বেগতিক দেখিয়া প্রথমে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে চিফ জষ্টিসের পীড়াপীড়িতে স্বীকার করিলেন। ফারার বেগতিক দেখিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"এই আপত্তি আমার নিজের আপত্তি নহে—কাহারও উপদেশক্রমে আমি এইরূপ করিয়াছি।" ইহা দ্বারা তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ দুর্ব্বলতা তিনি মোকর্দ্দামার আগা গোড়া দেখাইয়াছিলেন।

বোধ হয় কোন বিবেচক মনুষ্যই এ প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না যে এই ইলিয়ট হইতে দ্বিভাষীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার দ্বিভাষীর কার্য্য করা সম্বন্ধে আসামী এই প্রকার আপত্তি করিয়া তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন। ইহাতে ইলিয়টের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া ও প্রতিহিংসা প্রভৃতির উদ্রেক হওয়া অবশ্য অসম্ভব নহে। ইহাও সম্ভব—সুবিধা পাইলে তিনি এই প্রকার প্রতিহিংসা লইতে ছাড়েন নাই। এই ইলিয়ট সাহেবই পরে ইম্পির আদেশানুসারে বিলাতে জাল মোকর্দ্দমার আদ্যোপান্ত বিবরণ ছাপাইয়া জজেদের জন্য সাফাই গাহিতে গিয়াছিলেন। অনেক বাদ সাদ দিয়া ও কোন কোন স্থলে প্রকৃত ঘটনা লোপ ও পরিবর্ত্তন করিয়া যে এই বিবরণী মুদ্রিত হইয়াছিল—ইহা ফারার, রুস প্রভৃতি সকলেই মুক্ত কণ্ঠে পার্লামেণ্টে স্বীকার করিয়াছেন। যে ইলিয়ট গবর্ণরের ও প্রধান জজের সহিত এতদূর সংশ্লিষ্ট, তাঁহার হস্তে আসামী কতদূর বিচার ও সুবিধা লাভ করিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

এ সকল কথা এক্ষণে ছাড়িয়া দিয়া প্রধান আবশ্যকীয় কথাটি মীমাংসা করিতে

চেষ্টা করিব। মহারাজা সুপ্রীম কোর্টে (2 Geo. II., C. 25) বিধির মর্ম্মানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমেই jurisdiction লইয়া আপত্তি উঠিয়াছিল—কিন্তু জজেরা সে আপত্তি আদতে শুনিলেন না। উল্লিখিত দ্বিতীয় জর্জ্জের বিধি সেই সময়ে নন্দকুমারের মোকর্দ্দামার বিচার্য্য বিষয়ে প্রযুজ্য কি না, ইহা লইয়া জজেদের মধ্যে প্রথমে মত বিভিন্নতা হইয়াছিল। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ইম্পি, হাইড ও লিমেষ্টার প্রভৃতি জজেরাই ভুল বুঝিয়াছিলেন। নন্দকুমারের মোকর্দ্দামা যে উল্লিখিত ধারার মর্ম্মানুযায়ী চলিতে পারে না, এ বিষয়ে ইম্পির অন্যতম সহযোগী স্যর রবার্ট চেম্বার্স সাহেবের বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছিল। চেম্বার্স যথাসাধ্য ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন—কিন্তু শেষে ইম্পির মতই গ্রাহ্য হইল। এই ধারার মর্ম্মানুসারে বিচার না করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় হয় বলিয়া তিনি চেম্বার্সের আপত্তিতে বড় একটা মনোযোগ দিলেন না। চেম্বার্সের যুক্তিপূর্ণ আপত্তি ইম্পির পদোচিত ক্ষমতার মুখে প্রবলবেগে ভাসিয়া গেল। আমরা দেখাইব ইম্পি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা ভুল, এবং চেম্বার্সই ঠিক বুঝিয়াছিলেন। কোন আইনের ধারা অনুসারে এই অপরাধের বিচার চলিতে পারে, এই তর্ক উপস্থিত হইলে চেম্বার্স সাহেব Indictment তলব করিলেন। তিনি বলিলেন "আমার মতে দ্বিতীয় জর্জ্জের ধারা অনুসারে এই মোকর্দ্দামা কখনই চলিতে পারে না। পার্লামেণ্ট এই আইন কেবল যে ইংলণ্ডের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইংলণ্ডে তৎকালীন বাণিজ্য বিস্তৃতি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সহিত নানা প্রকার জালিয়াতি ও অন্যান প্রতারণা সর্ব্বদাই ঘটিতে থাকে—এই জন্যই পার্লেমেণ্ট তাহাতে বাধা দিবার জন্য উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। * বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ইংলণ্ডের তৎকালীন অবস্থার তুলনা কখনই করা

---

* আশ্চর্য্যের বিষয় এই,বাঙ্গালার কথা দূরে থাক্—এই আইন তখন স্কট্লণ্ডেও প্রচলিত ছিল না—"The most noted instance of interferance in extra—Judicial cases. of criminal process was the trial and the execution of Nundkumer for forgery. Nund kumer—a Hindu, a Bramin of the highest caste, was tried, condemned, and hanged on a Statute against forgery (2nd Geo. II. C. 25) so strictly confined and appropriated to England, that by the last clause, it is specially provided, that—nothing in this Act contained to extend or to be construed to extend to that part of Great Britain called Scotland" Robert Bisset's life of Burke Vol 11. P. 202,

কর্ণেল ফুলারটন পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন—If it was legal to hang Nundkumer on the Statute of Geo. II. against Forgery,it would be equally just and proper to hang the Nobob of Bengal, or the Great Mogul, and all his Court on the Statute of James the First against Bigamy.

যাইতে পারে না ইংলণ্ডের আচার ব্যবহার বাঙ্গলার আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এলিজাবেথের পঞ্চম বিধি ও দ্বিতীয় জর্জ্জের দ্বিতীয় বিধির মধ্যবর্ত্তী সময়ের অবস্থার সহিত বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। এই সকল কারণে আমার আপত্তি এই যে দ্বিতীয় জর্জ্জের ধারা অনুসারে অভিযোগ পত্র সংগঠিত না হইয়া এলিজাবেথের পঞ্চম বিধি অনুযায়ী ইহা সংগঠিত হউক। আমার মতে এই Indictment পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দেওয়া হউক।" কিন্তু ইম্পির ইহাতে মন টলিল না, তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছিলেন—তাহাই অভ্রান্ত ভাবিলেন।

দ্বিতীয় জর্জ্জের ধারার সমর্থন করিয়া অভিযোগের বিচার হওয়া উচিত,এ সম্বন্ধে ইম্পি যাহা প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহা ভ্রম-সঙ্কুল। পার্লামেণ্টে তিনি এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইম্পির ন্যায় আমরা উচ্চদরের বারিষ্টার নহি ও আইনঘটিত তর্কাদি বুঝিবার ততদূর স্পর্দ্ধাও রাখি না—কিন্তু মোটের উপর, ইতিহাসের সত্যের উপর ও তৎকালীন ঘটনাবলীর উপর বিশ্বাস করিয়া যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় ইম্পি ভ্রম বুঝিয়াছিলেন। এই ভ্রমে পড়াতেই তিনি নিরপরাধীর জীবন দণ্ড করিয়া মহাপাতক গ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে পার্লামেণ্টে যথেষ্ট হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। তিনি যে নন্দকুমারের জাল মোকর্দ্দামার আদ্যোপান্ত পক্ষপাত করিয়াছিলেন ও বন্ধুর মনোরক্ষার্থে, * তাঁহাকে বিপদ ও অবমাননা হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ করিয়াছেন—তাহা স্থির বুদ্ধি স্যর গিলবট ইলি-

---

* ইম্পি সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ্ নিযুক্ত হওয়াতে হেষ্টিংস সাহেব তাহাতে কতদূর আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন দেখুন—"Advices from England seldom afford either pleasure or pain unmixed but the news of your late appointment to preside over the High Court of Justice constituted by Parliament affords me every cause of satisfaction without a circumstance of regret to allay it * * I need not say how much I rejoice in the prospect of seeing *so old a friend* independently of the public advantages which that friendship cemented (if it required it) by the same connections can not fail to produce in the conduct of such affairs as are likely to fall to our respective or common lot. With respect to my own situation I shall say nothing till we meet but that *I shall expect from your friendship such assistance as the peculiar circumstances of my new office and connections will enable you effectually to afford me for prevention and the removal of the embarrassments which I fear I am unavoidably to meet with.*"

এত আশা যে ভবিষ্যতে নিষ্ফল হইয়াছিল, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না।

য়টের মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় ও শত বৎসর পরে তীক্ষ্ণদর্শী বেভারিজের সুযুক্তিতে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। স্যর গিলবার্ট ইম্পির অভিযোগের পর দিনে তাঁহার পত্নীকে লিখিয়াছিলেন—"আমরা যদিও কল্য পার্লামেণ্টে পরাজিত হইয়াছি, তথাপি তাহাতেই আমাদের জয়লাভ হইয়াছে। ইম্পির স্বপক্ষে ৭৩টি ভোট ও বিপক্ষে ৫৫টি হইয়াছে। এই তিয়াত্তর জনের মধ্যে ২০ জন ইম্পির শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও তাঁহার সহিত বিশেষরূপে লিপ্ত। স্যর জর্জ্জ কর্ণওয়াল ও স্যর পি, ফ্রান্সিস্ এ বিষয়ে আদতে ভোট দেন নাই—কিন্তু তাঁহারা আমাদের স্বপক্ষে। ইম্পির আত্মীয়বর্গ বাদ দিলে ভোট সংখ্যা আমাদের অনেক নিম্নে আসিয়া পড়ে।" বস্তুতঃ ইম্পির আত্মীয়বর্গ নিজ মুখেই পরে স্বীকার করিয়াছিলেন—"বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতি সামান্য অপরাধীর ন্যায় পার্লামেণ্টে অভিযুক্ত হইয়াছেন—ইহাতেই তাঁহার যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে।"

দ্বিতীয় জর্জ্জের বিধি বাঙ্গালায়—বিশেষতঃ কলিকাতায় প্রযুজ্য কি না—তৎসম্বন্ধে ইম্পি কেন ভুল বুঝিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। কলিকাতার সম্বন্ধে এই আইন প্রযুজ্য হইবার সম্বন্ধে ইম্পির প্রধান যুক্তি এই—কলিকাতা একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ও রাজধানী। ইহা সত্য বলিয়া ধরিলেও তাঁহার ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যে বৎসরে ঐই অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছিল, তখন (১৭৬৫) কলিকাতায় রাজধানী ছিল না। অন্যান্য স্থলের ন্যায় কলিকাতায় বাণিজ্য চলিত বটে—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুরশীদাবাদে রাজধানী ছিল ও মুরশীদাবাদের অবস্থা কলিকাতার অপেক্ষা বাণিজ্য বিষয়ে অনেক উন্নত ছিল। আদালত ও অন্যান্য রাজকার্য্যস্থল মুরশীদাবাদেই ছিল। প্রতি বৎসর ইংরাজের ও নবাবের প্রধান ও স্পৃহনীয় কার্য্য "শুভ পুণ্যাহ" মুরশীদাবাদেই হইত। ১৭৭২—৭৩ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস সাহেব নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে কলিকাতায় আদালত উঠাইয়া আনিয়া কলিকাতাকে রাজধানী করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন—"একদিন হয়ত এই নগরীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইলে আমি রোমান সম্রাট অগষ্টসের ন্যায় গৌরব লাভ করিব।" ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায়, এমন কি সমস্ত বাঙ্গালায় মহা দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে—তাহার শোচনীয় পরিণাম আজও লোকে ভুলিতে পারে নাই, সুতরাং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর কলিকাতা প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল না। ডাইরেক্টারেরা একথা নিজ পত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে কি যুক্তিতে ইম্পি কলিকাতাকে প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া দ্বিতীয় জর্জ্জের আইন খাটাইলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে দলিলখানির কার্য্য হইয়াছিল। ঐ সময়ে ধরিলেও কলিকাতার বাণিজ্য-প্রধান অবস্থা প্রমাণ হয় না। ১১৭০ সালের ত কথাই নাই—মহা দুর্ভিক্ষে লোকে খাইতে পায় না—বাণিজ্যের স্ফূর্ত্তি এ সময়ে নিতান্ত অসম্ভব। ১৭৭২ সালে কলিকাতায় প্রথম রাজধানী হইল। এ সময়ে কিছু কলিকাতা একেবারে প্রধান বাণিজ্য

স্থান হওয়া সম্ভব নহে। তবে যদি ইম্পি জবরদস্তিতে ১৭৭৫ সালের কলিকাতার অবস্থা ধরিয়া এই বিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়া চক্রান্ত করিয়া নন্দকুমারের প্রাণ বধ করা যে তাঁহার উদ্দেশ্য—তাহার আর কোন সন্দেহ থাকে না। ইম্পি প্রধান জজ বলিয়া তাঁহার Casting Voteএর ক্ষমতা ছিল। তিনি চেম্বার্সের সহিত মিশিলে অন্যান্য জজেরা বড় একটা কিছু করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করেন নাই। এরূপ না করিয়া তিনি যে বিশেষ অন্যায় করিয়াছেন, পার্লামেণ্ট সভায় তাহা বিশেষ প্রমাণ হইয়াছে। তাঁহারই কোন বন্ধু (যিনি তাঁহার স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন ও তাঁহার ন্যায় একজন বড় বারিষ্টার) বলিয়াছেন "আমরা যদি এই সময়ে বিচার করিতাম, তাহা হইলে অপরাধীকে এলিজাবেথের ধারায় বিচার করিতাম ও দণ্ডাজ্ঞার পর তাহা কিয়ৎকাল স্থগিত রাখিতাম।"

রাধাচরণ মিত্রের মোকর্দ্দামার কথা উঠাইয়া ইম্পি সাফাই গাহিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—নন্দকুমারের পূর্ব্বে রাধাচরণ মিত্র নামক এক জন বাঙ্গালীর জাল অপরাধে প্রাণ দণ্ডের হুকুম হইয়াছিল। কিন্তু ডাইরেক্টারেরা এ বিষয়ে ইংলণ্ডাধিপের ক্ষমা প্রার্থনা করাতে রাধাচরণের প্রাণদণ্ড স্থগিত হয়। রাধাচরণের মোকর্দ্দামার সহিত নন্দকুমারের মোকর্দ্দামার ঢের বিভিন্নতা। রাধাচরণ একজন আরমানীকে জাল করিয়া ঠকাইয়াছিল বলিয়া মেয়রকোর্টে তাহার বিচার হয়। জাল করা তখন দেশীয়েরা একটা বিশেষ অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিত না। কিন্তু যখন মেয়রকোর্টে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞার হুকুম বাহির হইল, তখন দেশের ছোট বড় সকলেই স্তম্ভিত হইল। একখানি যুক্তিপূর্ণ দরখাস্ত বিলাতে পাঠাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল। দেশীয়েরা এই সময়ে যে বিলাতী আইনের ধাঁর ধারিত না, তাহা এই দরখাস্ত হইতেই বেশ প্রমাণ হয়। ইম্পি বলিয়াছেন, কলিকাতার লোক বিলাতী আইনের মর্ম্ম অবগত ছিল ও তাহা পসন্দ করিত—একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বেরিলষ্ট সাহেব (গবর্ণর) এবিষয়ে কি বলিয়াছেন—দেখিলেই এ বিশ্বাস দূর হইবে। * ইহার কয়েক বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ স্যর উইলিয়ম

---

* The amazing extent of public and private credit in great Britain has induced our legislators to punish forgery with death. Under this law a Native of Bengal was condemned in the year 1766. But so extravagant did the sentence appear, where experience had never suggested the principle: such the disproportion in their eyes between the punishment and crime that the principal inhabitants of Calcutta expressed their astonishment and alarm in a petition to the Governor and Council, and upon a proper representation Radhacharan received a pardon. মহারাজা স্বয়ং এই দরখাস্তে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। জাল অপরাধের কি দণ্ড—তাহা তিনি এই সময়ে (১৭৬৫)

জোন্স জাল মোকর্দ্দামায় এই প্রকার আইন প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছিলেন। জোন্সের ও বেরিলষ্টের অপেক্ষা ইম্পি যে অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন, ইহা আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না।

মহারাজার নামে অভিযোগগুলি কুড়িটি দফায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। Indictmentখানি একটি নূতন ধরণের জিনিস। ইহাতে এতগুলি ধারার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু জাল দলিলখানি খত কি প্রমিসারী নোট, তাহা স্থির করিতে না পারাতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। জনশ্রুতি এই—স্বয়ং লিমেষ্টার এই Indictment এর খস্ড়া করিয়া দেন। যিনি বিচারক তিনিই অভিযোগপত্রের বিষয়গুলির খসড়া করিয়াছিলেন; ইহাতেই কেমন একটা সন্দেহ হয়। লিমেষ্টারের এইরূপ খসড়া করার কথা বাজে লোকের মুখে শোনা হয় নাই,ডেপুটী সরিফ্ টলফ্রে—যিনি নন্দকুমারকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন—তিনিই পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন "নন্দকুমারের মৃত্যুর পর লিমেষ্টারের হাতের লেখায় আমি Indictmentএর এক খণ্ড দেখিয়াছি, এই লিমেষ্টারই নন্দকুমারের বিচারের প্রথম দিনকে লক্ষ্য করিয়া বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলেন—"No doubt of his (Nandokumer's) guilt remaining in the breast of either of us upon the evidence on the part of the crown a commitment in the usual form was made out." এই লিমেষ্টার ও তাঁহার অন্য সহযোগী হাইডকে জজিয়তীতে নিযুক্ত করাইবার জন্য বিলাতে ইম্পি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহারা যে তাঁহার বিশেষ বাধ্য হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি?

জাল মোকর্দ্দামায় কমবেশ ছত্রিশ জন ছোটবড় সাক্ষীর জোবানবন্দী গ্রহণ করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ফরিয়াদির পক্ষে প্রধান সাক্ষী ৮ জন। (১) কমল উদ্দিন (২) হোসেন আলি (কমলের ভৃত্য) (৩) খোজা প্রিত্র্যস্ (৪) সদর উদ্দিন (নন্দকুমারের চিরশত্রু গ্রেহাম সাহেবের মুন্সী) (৫) মোহনপ্রসাদ (৬) মহারাজা নবকৃষ্ণ (৭) সবুত পাঠক (৮) কৃষ্ণজীবন দাস। মূল দলিল (Jewels Bond); বুলাকীর মোক্তার নামা—ও উইলের প্রোবেট পত্র, মহারাজা নন্দকুমারের প্রদত্ত রসিদ—ও শিলাবতের লেখা কতকগুলি কাগজ পত্র প্রধান দলিলরূপে ফরিয়াদি পক্ষ আদালতে দাখিল করেন। মোকর্দ্দামাটীর পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিতে গেলে ভারতীর ন্যায় ক্ষুদ্র কলেবর মাসিক পত্রিকায়

জানিতে পারিয়াছিলেন। এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়া জালকরা কি নিতান্ত সম্ভব বলিয়া বোধ হয়?

১৭৮৬ খৃঃ কালীপ্রসাদ ঘোষ,বনাম ইংলণ্ডাধিপ ও ১৮০০ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুপ্রসাদ শ্রীমানি বনাম ইংলণ্ডাধিপ, ও ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে মার্টিরস্ ম্যাবিন, বনাম ইংলণ্ডাধিপ মোকর্দ্দামা গুলিতে (জাল) প্রাণ দণ্ড না হইয়া অন্য প্রকার শারীরিক দণ্ড হইয়াছিল। স্থান নাই বলিয়া সেগুলি তুলিতে পারিলাম না।

অতি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং মোটামুটি দুই চারিটী কথা বলিয়া ঘটনাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা দেখিব।

Exhibit A. অর্থাৎ মূল দলিলে (বালাকীর তমস্থক) তিন জন সাক্ষীর নাম সংযোগ আছে। প্রথম মাতাব রায়, দ্বিতীয় শিলাবত, তৃতীয় মহম্মদ কমল। আসামী পক্ষ বলেন—দলিলের এই তিন জন সাক্ষীই মৃত ও দলিলখানি প্রকৃত, ইহার প্রমাণও তাঁহারা দেখাইতে পারেন। ফরিয়াদির পক্ষ বলেন—মাতাব রায় বলিয়া কোন সাক্ষী ছিল না—শিলাবত বলিয়া এক জন ছিল বটে কিন্তু সে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে ও মহম্মদ কমল এখনও বর্ত্তমান। এই মহম্মদ কমলই তাহাদের মতে চক্রান্ত মোকর্দ্দামায় কমল উদ্দিন খাঁ। এই প্রকারে ফরিয়াদি পক্ষ কমলকে বড় আবশ্যকীয় সাক্ষী করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং কমল উদ্দিনের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে হইল।

যদি ফরিয়াদি পক্ষের কথা বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে কমল মহম্মদ ও কমল উদ্দিন খাঁ একই ব্যক্তি ধরিতে হইবে। আসামী পক্ষ একথা অপ্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষ্যও দেওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু জুরী ও জজেরা তাহা বিশ্বাস করেন নাই। মোকর্দ্দামার রিপোর্টে আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাও সন্তোষকর না হইলেও সন্দেহকর বটে। ইলিয়ট স্বয়ং জজেদের আজ্ঞানুসারে বিলাতে গিয়া এই রিপোর্ট ছাপাইয়া নন্দকুমারের মোকর্দ্দামা সম্বন্ধে ইম্পির ও অন্যান্য জজেদের সাফাই গাহিয়া আসেন। স্বয়ং ফারার ইহার অসম্পূর্ণতার কথা পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন—সুতরাং ইহার উপর বিশ্বাস করিয়াও কোন প্রকারে প্রমাণের আশা করা যায় না। এই সকল কারণে মহম্মদ কমলের ব্যাপারটি একটি প্রকৃত Mystery। এ রহস্যোদ্ঘাটন আজও পর্য্যন্ত হইল না মহাত্মা বেভারিজ ও সদাশয় স্যর গিলবার্ট ও এ ঘটনা টুকুর সন্দেহময় আবরণ ঘুচাইতে পারেন নাই।

ফরিয়াদী পক্ষ দলিলখানিকে জাল বলিতে সাহস করেন নাই। মোহরগুলি যে জাল—অর্থাৎ প্রকৃত মোহরের জাল প্রতিকৃতি, একথা বলাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা কেবল এই মাত্র অভিযোগ করিতেছেন—দলিলে যে সমস্ত সাক্ষীর শীল সংযোগ আছে, তাহা তাহাদের প্রকৃত শীল মোহর বটে—কিন্তু মহারাজা তাহা অন্যায় উপায়ে হস্তগত করিয়া তাহার উপর ছাপ মারিয়াছেনও তাহার উপরে "আলাবদ্" অর্থাৎ "আমি স্বাক্ষর করিলাম" এই কথা লিখিয়াছেন; ইহাতেই দলিলখানি জাল বলিয়া ধরিতে হইবে। এই দলিল সহায়ে তিনি মৃত বুলাকীর ষ্টেট্ হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়াছেন—সুতরাং তিনি এই প্রকার অন্যায় পথ ও তঞ্চকতা অবলম্বনে বুলাকীর উত্তরাধিকারীগণের ক্ষতি করাতে বিশেষ দণ্ডার্হ। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু মাত্র বলিবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা তীক্ষ্ণদর্শী বেভারিজ সাহেবের এই সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ-এ প্রবন্ধগুলি পড়িয়াছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন যে এই দলিলখানি আদৌ জাল নহে,

কেবল চক্রান্তের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারকে ফেলিয়া অন্যায় উপায়ে রাজনৈতিক গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার জন্য গোলে মালে ইহাকে জাল খাড়া করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করান হইয়াছে। *

প্রথম ও প্রধান সাক্ষী কমল উদ্দিনের সম্বন্ধে আমরা গুটিকত কথা বলিব। যে দলিলখানি জাল বলিয়া কথিত হইয়াছিল, তাঁহাতে মহম্মদ মলের একটি শীল ও তাহার উপরে "আমি স্বাক্ষর করিলাম" এই কয়েকটী কথা লেখা ছিল। সাক্ষী কমল উদ্দিন বলে—সে নিজে ঐ শীলের ছাপ উক্ত তমসুকের উপর দেয় নাই ও তাহার উপরে "আমি স্বাক্ষর করিলাম" একথাও লেখে নাই। মহারাজা অন্যায় উপায়ে এই শীল হস্তগত করিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন। কমল উদ্দিন কি প্রকার সত্যবাদী, জাল মোকদ্দমাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এই জাল দলিলের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়াও কমল নানাবিধ গোলমালের কথা বলিয়াছে। সে বলে ১৭৬৭ অব্দে মহারাজা

---

* ভারতীর পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীযুক্ত H. Beveridge মহোদয়ের নাম জানেন না, তাঁহাদের জন্য গুটিকয়েক কথা বলিব। বেভারিজ সাহেব একজন উচ্চ-দরের বহুদর্শী ও প্রাচীন সিবিলিয়ান। "কলিকাতা রিভিউ"এর একজন বিখ্যাত লেখক ও বাঙ্গালা জাতির অতিশয় হিতৈষী। আমরা বাল্যকাল হইতে পড়িয়া আসিতেছি মহা-রাজা নন্দকুমার জাল অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ মহাত্মা বেভারিজ বহুকাল ব্যাপী পরিশ্রমের পর আমাদের দেখাইলেন "নন্দকুমার যে দলিল জাল অপরাধে প্রাণ-দণ্ডিত হয়েন, তাহা প্রকৃত জাল নহে—কেবল রাজনৈতিক গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনার্থে ইম্পি প্রভৃতি জজগণ এই প্রকার গর্হিত ও লোমহর্ষণ কার্য্য করিয়া-ছেন।" তিনি যে বাঙ্গালা সমাজের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহা আর কাহাকেও বুঝা-ইতে হইবে না। বাঙ্গালার লাঞ্ছনার মহারাজা নন্দকুমারের চরিত্র রক্ষা করিয়া তিনি যে ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিলেন, কেবল তাহা নহে—মেকলে এই নন্দকুমার-ব্যাপারে আমাদের জাতি সাধারণের চরিত্রের উপর যে তীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়া ক্ষত করিয়া দিয়াছেন, মহান্তঃকরণ বেভারিজ তাহাতে আজ অমৃত সিঞ্চন করিলেন। আমি এই নন্দকুমার লিখিবার সম্বন্ধে তাঁহার নিকট বহুমূল্য প্রাচীন কাগজ পত্রাদি সম্বন্ধে অনেক সাহায্য পাইয়াছি ও ইহার আইন-ঘটিত অংশ গুলি তিনিই আমায় সরল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি বহু কাল পরে Sir James Stephen গত বৎসর "Story of Nuncumar" নামে দুই খণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন—স্বজাতি মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ন্যায় অন্যায় ভুলিয়া গিয়া সাধ্যমত নন্দকুমারকে দোষী করিয়া নরহন্তা ইম্পির চরিত্র রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই James Stephenকে পাঠক বোধ হয় বেশ চিনেন। ইনি বর্ত্তমানে বিলাতী কুইন্স কোর্টে জজিয়তী করিতেছেন। বিলাতের লোকে তাঁহাকে Mr. Justice Buzfuz বলিয়া আদর করিয়া ডাকে। ইনিই আমাদের দেশে বর্ত্তমান কঠোর বিধিপূর্ণ পেনাল কোড প্রচলন করিয়াছেন। ইহাঁর পুস্তক যে ভ্রম পরিপূর্ণ ও অসূয়া-প্রণোদিত, তাহা মহাত্মা বিভারিজ পদে পদে দেখাইয়াছেন।

যখন মুঙ্গেরে ছিলেন, তখন নবাবের নিকট একখানি আরজী পাঠাইবার ইচ্ছা হওয়াতে সে মহারাজাকে স্বীয় মোহর ও আরজীখানি লিখিয়া পাঠাইয়া দেয়। কমলের মতে মহারাজা এই সময়ে সুযোগ পাইয়া তাহার শীল হস্তগত করিয়া উক্ত তমস্সুকের উপর ছাপ মারেন। কমলের দ্বিতীয় কথা এই—সে পূর্ব্বে মহম্মদ কমল বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে "খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার তিন চারি বৎসর পরে বাঙ্গালার নবাব নাজিম উদ্দৌলার অনুমতি পাইয়া তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। কমলের নিজ ইতিহাস মতে সে ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ্চ মাসে, অর্থাৎ মহারাজার নায়েব দেওয়ানী ছাড়িয়া দিবার ১০।১৫ দিন পূর্ব্ব হইতেই এই উপাধি ব্যবহার আরম্ভ করে। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে অর্থাৎ কমলের নূতন উপাধি ব্যবহার করিবার প্রায় ছয় মাস পরে বুলাকীর তমসুক লিখিত হয়। এ প্রকার স্থলে ইহা কি সম্ভব যে মহারাজা সমস্ত বিষয় জানিয়া শুনিয়া অকর্ম্মণ্য ও পরিত্যক্ত শীল ব্যবহার দ্বারা একখানি দলিলে কমলের নাম অন্যায়রূপে মুদ্রাঙ্কিত করিবেন? তাহার নাম যে মহম্মদ কমল ছিল, এ সম্বন্ধে সে একখানি নন্দকুমারের পত্রও দেখাইয়াছিল—একথা আমরা কেবল বর্ত্তমান Report এ দেখিতে পাই। নন্দকুমারের কৌন্সিলি ফারার সাহেব পার্লামেণ্টে এ প্রকার চিঠির কথা আদৌ স্বীকার করেন নাই। কমলের নিজের জোবানবন্দীমতে সে মোহনপ্রসাদের নিকট তাহার কোম্পানীর নিকট হইতে ফারম জমা করিয়া লইবার দুই তিন মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ মার্চ্চ অথবা এপ্রিলের (১৭৭২) শেষাশেষি নন্দকুমার কর্ত্তৃক তাহার মোহর জাল করার সংবাদ পাইয়াছিল—সে নিজ মুখে স্বীকার করিতেছে—কোম্পানীর নিকট তাহার প্রতিভূ হইবার জন্য সে ইহার পরে মহারাজা নন্দকুমারকে অনুরোধ করিতে গিয়াছিল। যে ব্যক্তি তাহার নাম জাল করিয়া সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত, তাহাকে জামিন স্বরূপে খাড়া করিবার চেষ্টা করা কমলের পক্ষে কতদূর সম্ভব, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। দুঃখের বিষয় মহারাজা এই সময়ে কমলের জামিন হইতে স্বীকৃতও হন নাই। এই প্রকারে নিরাশ হওয়াতে কমলের যে প্রচুর মর্ম্মপীড়া হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই কমল আবার হেষ্টিংসের প্রিয়তম ও বিশ্বস্ত বেনিয়ান কান্ত বাবুর সহিত কারবার ও তাহার জীবিকা উপার্জ্জন ব্যাপারে বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিল। এই প্রকার নীচ-চরিত্রের লোক যে হেষ্টিংসের মনোরক্ষার্থে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? গঙ্গাবিষ্ণু ১৭৭২ খৃঃ অব্দে মোহনপ্রসাদের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন যে, কমল উদ্দিন এই দলিলে স্বাক্ষর করে নাই। যদি এই দলিল প্রকৃত জাল হইত, তাহা হইলে কি গঙ্গাবিষ্ণু সিবিল কোর্টের মোকর্দ্দামায় এই কমলকে সাক্ষ্য মানিতেন না? এ রহস্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সন্দেহের বিষয় এই যাহাদের সিবিল কোর্টে সাক্ষ্য মানা হয় নাই, তাহাদেরই সুপ্রীমকোর্টে সাক্ষ্য দিতে আনা

হইয়াছিল। যদি দলিলখানি প্রকৃত জাল হইত, তাহা হইলে গঙ্গাবিষ্ণু প্রভৃতি অতগুলি টাকা একেবারে বিষয় হইতে বাহির করিয়া দিয়া এত দিন ধরিয়া চুপ করিয়া থাকিত না। যখন সুপ্রীমকোর্টে মোহনপ্রসাদ এই মোকর্দ্দামা উপস্থিত করে, তখন গঙ্গাবিষ্ণু রুগ্ন ও শয্যাগত। মোহনপ্রসাদই যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহাই করিয়াছে। গঙ্গাবিষ্ণু আদালতে উপস্থিত হইলে বোধ হয় অনেক রহস্য প্রকাশ হইত। কমল যেমন বলিয়াছে যে, মাধব রায় বলিয়া কোন লোক ছিল না—তেমনি রূপনারায়ণ চৌধুরী ও তেজ রায় আসিয়া নিঃসন্দেহরূপে দেখাইয়াছেন যে, মাধব রায় বলিয়া একজন লোক প্রকৃতই বর্ত্তমান ছিল। মোহনপ্রসাদের সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সে এই তমসুকখানিকে সম্পূর্ণ জাল বলিয়া অভিযুক্ত করিতে আদৌ সাহসী হয় নাই। এ সম্বন্ধে তাহার প্রধান সন্দেহ ও আপত্তি এই—বুলাকীর শীলের উপর "আমি স্বাক্ষর করিলাম" একথা তাঁহার স্বহস্তে লেখা না থাকাতে তাহার বিশ্বাস—এই দলিল জাল। মীর আসাদ আলির সাক্ষ্য হইতে বেশ প্রমাণ হয় যে তমসুকের শীলটী বুলাকীর প্রকৃত শীল। তাহার উপর বুলাকীর স্বহস্তের স্বাক্ষর নাই বলিয়া মোহনপ্রসাদ যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা ফরিয়াদি পক্ষের নিজ সাক্ষী মহারাজা নবকৃষ্ণ হইতে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। মহারাজা তাঁহার জোবানবন্দীর এক স্থলে বলিয়াছেন "যে স্থলে উভয় দলের মধ্যে এক দল নাগরী ও অন্য দল পারসী বা বাঙ্গলা জানে, সে প্রকার স্থলে দলিলের উপর স্বহস্তে স্বাক্ষর না করিয়া খালি শীল মারিয়া দিলে তাহা প্রকৃত বলিয়া বিবেচিত হয়।" ইহাতে সম্ভবতঃ মোহনপ্রসাদের আপত্তি ভাসিয়া যায়। আরও ফরিয়াদীর পক্ষই মহারাজ নন্দকুমারের হাতের লেখা ও মোহর প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার শীলসংযুক্ত বালাকীর কতকগুলি রিসিট্ আনিয়া কোর্টে দাখিল করে। ইহাতে মহারাজার নাম স্বাক্ষর আদৌ ছিল না, কেবল শীল সংযোগ ছিল। ইহা যখন প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে আদালত অগ্রসর হইয়াছিলেন—তখন বালাকীর তমসুকের বেলায় কেন তদ্রূপ করা হইবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ফরিয়াদি পক্ষের অন্যান্য সাক্ষীর মধ্যে মহারাজা নবকৃষ্ণ, সদরউদ্দিন ও খোজা প্রিত্র্যাস্ যে আসামীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে—তাহার অনেক কারণ আছে। বহুকালপূর্ব্বে গোকুল সোনারের ভগিনীর বল পূর্ব্বক সতীত্ব নাশ করাতে মহারাজ নবকৃষ্ণের নামে আদালতে যে মোকর্দ্দামা উঠে, তাহাতে নন্দকুমার নিঃসহায় গোকুল সোনারকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এই জন্য নবকৃষ্ণ সেই সময় হইতেই নন্দকুমারের শত্রু হইয়া পড়িয়াছিলেন। সদরউদ্দিন নন্দকুমারের পরম শত্রু গ্রেহামের মুন্সী খোজা প্রিত্র্যাস্ হেষ্টিংসের একজন মুখাপেক্ষী লোক, ইহারা সকলেই যে সাধ্যমতে ফরিয়াদি পক্ষ সমর্থন জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। আর একটী সাক্ষী কৃষ্ণজীবন দাস। এই ব্যক্তি যতক্ষণ ফরিয়াদির পক্ষে (১৫ বার) সাক্ষ্য দিয়াছিল, ততক্ষণ

ইম্পি হইার কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু যাই মহারাজা "করাম্ন নামার" কথা প্রমাণ করাইবার জন্য ইহাকে আহ্বান করিলেন, অমনি এই ব্যক্তি চিফ জষ্টিসের মতে, "মিথ্যা-কথা" ও "উন্মত্ত প্রলাপ" বকিতে লাগিল! ইম্পির এই ব্যবহার কি সন্দেহ-জনক নয়? Defence পক্ষের সাক্ষীদিগের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয় জনই প্রধান। (১) বাবু রূপনারায়ণ চৌধুরী (২) তেজ রায়, (৩) জয়দেব চৌবে, (৪) লালা দোমান সিং, (৫) ইয়ার মহম্মদ, (৬) মনোহর মিত্র, (৭) রামলাল দাস, (৮) মীর আসাদ আলি, (৯) আত্মারাম দাস, (১০) নিমাই দাস ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে জয়দেব চৌবে, চৈতন্য নাথ, লালা দোমান ও ইয়ার মহম্মদ দলিলের প্রকৃততার সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়াছেন। মীর আসাদ ও রূপনারায়ণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মনোহর মিত্র প্রকাশ্য আদালতে বলিয়াছিলাম—"মোহনপ্রসাদ আমাকে মহারাজার বিরুদ্ধে বলিবার জন্য অনেক টাকা দিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছিল ও অন্যান্য দুই একটি মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করিতে বলিয়াছিল।" কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কোন সাফাই দিতে মোহনপ্রসাদ কোন চেষ্টা করে নাই। এরূপ স্থলে মনোহরের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে রফার কথা উঠাতে মোহনপ্রসাদ মধ্যে বলিয়াছিল "I can not desist for so many English Gentlemen" একবার সত্য বলিয়া ধরিলে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যে একটা বিকৃত চক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয়।

এইক্ষণে আমরা দেখাইব যে ১৭৭৫খৃঃ অব্দের মে মাসের পূর্ব্বে মহারাজা নন্দকুমারকে অভিযুক্ত করিবার জন্য কোন চেষ্টাই হয় নাই। ১৭৭৪ খৃঃ মহারাজার বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে একটি মোকর্দ্দমা আনা হয়। এই সময়ে Driver সাহেব মোহনপ্রসাদ ও গঙ্গাবিষ্ণুর উকীল ছিলেন। মেয়রকোর্ট হইতে বালাকীর কাগজ পত্র ফিরাইয়া লইয়া দেওয়ানী আদালতের মোকর্দ্দমা চালান হইবে, এই উদ্দেশ্যে মোহন ও গঙ্গাবিষ্ণু মেয়রকোর্টে আবেদন করে। এই সময়ে যে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা রুজু করিবার জন্য ড্রাইভার সাহেব তাঁহার মক্কেলদের কাগজপত্র মেয়রকোর্ট হইতে উঠাইয়া লইবার জন্য পরামর্শ দেন নাই, তাহা ইম্পি জুরীদের চার্য্য দিবার সময় প্রকারান্তরে ও ড্রাইভার নিজ সাক্ষ্যে প্রমাণ করিয়াছেন। হাউস অব্ কমন্সে স্বয়ং ইম্পিই বলিয়াছেন "Palk যখন নন্দকুমারকে দেওয়ানী মোকর্দ্দামার সময়ে আদালত অবমাননার জন্য কারারুদ্ধ করেন, তখন হেষ্টিংস তাহাকে স্বীয় ক্ষমতায় ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে সকলেই বুঝিতে পারিল নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ আনা বৃথা; সুতরাং এই সময়ে কাগজ পত্র মেয়র কোর্ট হইতে বাহির করিয়া লওয়া মোহনপ্রসাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।" মেয়রকোর্ট হইতে কাগজপত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া যে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা রুজু করিতে বিলম্ব হইয়াছিল, একথা নিতান্ত অসম্ভব। ফরিয়াদীদের নিকট সমস্ত কাগজ পত্রের এক

একখানি কাপি ছিল এবং তাহারা ইচ্ছা করিলে পুনরায় সমস্ত দলিলের নকল লইতে বা তাহা আদালতে বসিয়া দেখিতে অনায়াসেই পারিতেন। এ প্রকার স্থলে যখন এ সম্বন্ধে দেরি করা হইয়াছিল, তখন স্পষ্টই বোধ হয় ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে মহারাজাকে অভিযুক্ত করিবার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। মোহনপ্রসাদকে তখন জিজ্ঞাসা করা হইল "এই সমস্ত ঘটনা জানিয়া শুনিয়া তুমি তখন শীঘ্র অভিযোগ করিতে চেষ্টা কর নাই কেন।" মোহনপ্রসাদ উত্তর দিল—"মৃত বুলাকীর বিষয় কার্য্যে আমার ক্ষমতা তখন অল্প ছিল, পদ্মমোহন দাস প্রকৃত প্রভু ছিলেন।" এস্থলে মোহনপ্রসাদ মেয়র কোর্টের দলিলাদি প্রাপ্তির বিলম্বের ওজর করিতে পারে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই গঙ্গাবিষ্ণু তখন বিলক্ষণ সবল ছিলেন। তিনি যখন জানিয়া শুনিয়া এই প্রকার অভিযোগের কোন চেষ্টা করেন নাই, তখন ইহার প্রকৃততা সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ হয়।

হেষ্টিংস যে তলে তলে চক্রান্তের কল টিপিয়াছিলেন ও এই ব্যাপারে বিশেষ লিপ্ত-ছিলেন, তাহার কতকগুলি পরিস্ফুট প্রমাণ পাওয়া যায়। নন্দকুমারকে ইহলোক হইতে সরাইবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতেই তিনি এই প্রকার নরহনন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। নন্দকুমারের সহিত হেষ্টিংসের শত্রুতা কতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই শত্রুতার চোটে ও কৌন্সিলের প্রতিযোগিতায় হেষ্টিংসকে এক সময়ে পদত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেও হইয়াছিল—কিন্তু যাই নন্দ-কুমার অভিযুক্ত হইলেন, তিনি অমনি চাপিয়া বসিলেন। নন্দকুমারের কারানিক্ষিপ্ত হইবার কয়েক দিন পরেই (১৮ই মে) তিনি বিলাতে প্রিয়বন্ধুদ্বয় গ্রেহাম ও ম্যাকলিন্‌কে পত্র লিখিতেছেন—"The visit to Nundkumer when he was to be prosecuted for a conspiracy and the elevation of his son to the first office of the Nizamut, when the old gentleman was in gaol and *in a fair way to be hanged* were bold, but successful expedients. সুপ্রীমকোর্ট কলিকাতায় বসিতে না বসিতে যখন তিনি ইম্পিকে আশাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন (পূর্ব্বে দেখুন) যখন বিচার-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রিয়বন্ধু, সহপাঠী ও তাঁহার বন্ধুবর্গ বিচারকরূপে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, যখন তাঁহার প্রাইবেট্ সেক্রেটারি ইলিয়ট দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়াছিলেন ও শুভানুধ্যায়ী রবিন্সন্ জুরীর ফোরম্যানের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং নন্দকুমারের নামে এই মোক-দ্দামা পূর্ব্বে তিনি নিজেই অভিযোগ করিয়াছিলেন, * তখন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ হয়

---

* এ সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ Clavering প্রভৃতি কি লিখিয়াছেন দেখুন। "If Mr. Hastings had been careful of his own honor, we think he would not have appeared himself as the prosecutor of his accuser, and that he would have exerted his influence with Mohun persad to suspend the other prosecution, until he had proved the falsehood of the charges brought by Nundkumer. As

তিনিই এই কার্য্যের মূল-যন্ত্র-পরিচালক। এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ দেখাইতে পারিতাম—কিন্তু স্থান সংক্ষেপে দুঃখিত চিত্তে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

সুপ্রীমকোর্ট হইতে মহারাজার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইলে তিনি পুনরায় কারাগারে প্রেরিত হইলেন। ইতি মধ্যে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখিবার জন্য কয়েকখানি আবেদন পত্র কৌন্সিলের ও জজেদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। আবেদনকারীদের মধ্যে বাঙ্গলার নবাব, বাবু শম্ভুনাথ রায় (মহারাজার খুল্লতাত পুত্র) রায় রাধাচরণ ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি ছিলেন। বলা বাহুল্য জজেরা ইহাতে কোন প্রকার মনোযোগ প্রদান করেন নাই। সুতরাং নির্দ্ধারিত দিবসে কুলীবাজারের সন্নিকটে বধমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন যজ্ঞে মহারাজার জীবন আহুতি দিয়া এই ব্যাপারে সংলিপ্ত সকলেই তৃপ্তি লাভ করিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখিতে ইচ্ছা করিলে পাঠক গত বৎসরের ভারতী দেখুন। এ স্থলে পুনরাবৃত্তি করিবার ইচ্ছা নাই। মহারাজ নন্দকুমার এই প্রকারে অবিচারে অন্যায় উপায়ে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন বটে—এই পাপ মর্ত্ত্যে ন্যায় বিচার না পাইয়া তিনি সেই সম্রাটের সম্রাট—বিচারকের বিচারক—জগৎপাতার মঙ্গলময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনা করিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার প্রার্থনা সম্পূর্ণ-

---

things are now circumstanced the world may perhaps conclude, that the man was too formidable a witness to be suffered to appear &c. অন্য স্থলে লিখিতেছেন—It may be made known, however, to the English nation that the forgery of which the Rajah was accused, have been committed several years ago that in the interim he had been protected and employed, by Hastings, his son was appointed in the first office of the Nabob's household and that the accusation which ended in his destruction, w[illegible] not produced, until he came forward with a charge against him.

মহারাজা যে নির্দ্দোষী ছিলেন—তাহা নিম্ন লিখিত আবেদন পত্র হইতে জানা যায়। ইহার ভাব এ প্রকার সরল, ও কথাগুলি এতদূর প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছে—যে ইহা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। মৃত্যুর দুই চারি দিন পূর্ব্বে তিনি এই দরখাস্ত কৌন্সিলে পাঠাইয়াছিলেন। "The Forgery of the Bond of which I am accused never proceeded from me * * I am unjustly put to death—I will with my family demand justice in the next life * * I in my last moments again request that you gentlemen will write my case particularly to the just king of England. I suffer but my innocence will certainly be known to him." মহারাজার মৃত্যুর পর দিবসে ফ্রান্সিস লিখিয়াছিলেন—Nundkumer may have been a most nefarious scoundrel—but by God! he spoke truth else why were they in such a hurry to hang him !!!

রূপে পূর্ণ হইয়াছিল। যাঁহারা ওয়ের্ষ্ট মিনিষ্টার হলের ভীষণ ব্যাপার ও হেষ্টিংসের শোচনীয় পরিণামের কথা ও পার্লামেন্টের সমক্ষে স্যর ইলাইজা ইম্পির লাঞ্ছনা ও অবমাননার বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন—হেষ্টিংস ও ইম্পি তাঁহাদের অতীত জীবনে তাঁহার (নন্দকুমারের) উপর যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাহার জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর শীর্ষ স্থানীয় মহারাজা নন্দকুমার এক্ষণে সেই মঙ্গলময় রাজ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার বংশেরও কেহ বর্ত্তমান নাই। অন্যায় ও অবিচার-কলঙ্কিত তাঁহার রাজনৈতিক চরিত্র পরিস্ফুট করিতে আমরা এই দীর্ঘকাল ধরিয়া যে পরিশ্রম করিলাম, তাহা সার্থক হইল কি না—বাঙ্গালী পাঠকই তাহার মীমাংসা করিবেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

পুরস্কার।

নিবাধই নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার দাসদত্ত মহাশয় যে ইংরাজি পদ্যটির বাঙ্গালা অনুবাদ জন্য অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে বিজ্ঞাপন দিতে অনুরোধ করিয়াছেন ভারতীর একজন গ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই পদ্যটির সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ রচনার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগে উক্ত কবিতার একটি অনুবাদ আছে, আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম কোন কোন পাঠক পদ্য পাঠের সেই অনুবাদ অবিকল রাখিয়া কেহ বা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া নিজের বলিয়া আমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। পদ্য পাঠের সেই অনুবাদ, শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ, এবং একটি বালিকার রচিত অনুবাদ ভারতীতে প্রকাশ করিলাম। পাঠকেরা মিলাইয়া দেখিবেন যে বালিকার অনুবাদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তিনি পুরস্কার গ্রহণে সম্মত নহেন এই নিমিত্ত উক্ত পুরস্কার হেমচন্দ্র বাবু পাইবেন, বাবু বরদাশঙ্কর সিংহের রচিত অনুবাদটিও উত্তম হইয়াছে।

বালিকার রচিত অনুবাদ।

কাল আর নদী ধায় সমান গমনে
চঞ্চল প্রবাহে বহি যায় দুই জনে,
নীরব সঞ্চারে দোঁহে ধীরে চলে যায়
রাখিতে না পারে তারে ধনে কি কথায়,
একবার চলে গেলে আর নাহি ফিরে
চরমে বিলীন দোঁহে মহা সিন্ধু নীরে,
যদিও সমান সব রূপে দুই জনে
এক অসাদৃশ বাজে ভাবুকের মনে,
বিফলে বহে না নদী—নদীময়ী দেশে
শস্যের মুকুট পরি, ধরা উঠে হেসে,
মহান হৃদয় শুধু শোভা করে কাল
না করে যতন যেই সে লভে জঞ্জাল।

শ্রীমতী——

পুরস্কার প্রাপ্ত অনুবাদ।

নদী আর কালগতি উভয়ি সমান,
অবিরাম স্রোতে দোঁহে করিছে পয়ান ;
তাহাদের অতি মৃদু নীরব গমন,
বিভব বা স্তুতি গানে না মানে বারণ ;
উভয়েই চলে গেলে ফিরান না যায়,
শেষে এরা মহাসিন্ধু গর্ব্ভেতে লুকায় ;
উভয়ে যদিও একে অন্যের মতন,
প্রভেদ বুঝিতে পারে চিন্তাশীল জন ,
তটিনী বহেনা বৃথা ; যেথা নদী রাশি,
প্রাচুর্য্য-ভূষিত ভূমি মুখে ধরে হাসি !
যে কাল, উদার চিতে বিভব মিলায়,
অবজ্ঞায়, পশ্চাতে সে মরু রেখে যায়।

শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাশঙ্কর সিংহের রচিত অনুবাদ।

নদী আর সময়ের একই গমন
অবিরাম স্রোতে করে উভয় ভ্রমণ ;
শব্দ শূন্য পদক্ষেপে পলাইয়া যায়,
উৎকোচ প্রার্থনা নারে রোধিতে তাহার;
একবার গত হলে ফেরে নাক আর,
অবশেষে গ্রাসে দুয়ে সমুদ্র অপার ;
একের সাদৃশ্য বটে অপরের সনে,
কিন্তু ভেদ উদে এক ভাবুকের মনে ;
বৃথা নাহি বহে নদী, নদী বহে যথা,
প্রাচুর্য্য ভূষণে ভূমি হাসে কিবা তথা ;
কিন্তু কাল, যাহে ঋদ্ধ মহত হৃদয়,
অনাদৃত ঘোর মরু পিছে রেখে যায়।

পদ্য পাঠের উদ্ধৃত।

নদী আর কাল গতি একই সমান,
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ---
ধীরে ধীরে নীরব গমনে গত হয়,
কিবা ধনে কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়।
উভয়েই গত হলে আর নাহি ফেরে
দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে।
সর্ব্ব অংশে একরূপ যদিও উভয়,
চিন্তারত চিত্তে এক ভেদ জ্ঞান হয়।
বিফলে বহেনা নদী, যথা নদী ভরা---
নানা শস্য শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা।
কিন্তু কাল সদাত্মা ক্ষেত্রের শোভাকর
উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।

বৎসর শেষে নিবেদন।

নূতন বৎসর আগত প্রায়, নূতনে পুরাতন সাজে না, তাই একেবারে কিছু অধিক মাত্রায় দিয়া এ বৎসরের 'নন্দকুমার' এই বৎসরেই শেষ করিলাম। স্থানাভাব বশতঃ কোন গল্প এ সংখ্যায় গেল না, ভরসা করি সে জন্য পাঠক মহাশয়গণ কিছু মনে করিবেন না, নূতন বৎসরে তাঁহারা প্রচুর গল্প পড়িতে পাইবেন।

মূল্য প্রাপ্তি।

নাম	স্থান	মূল্য
এন, এল, বনার্জ্জি এস্কয়ার	মৈনপুরী	৩৲
বাবু মোহনকিশোর রায়	ধল্লা	২।৵০
,, রাজকুমার রায়	ভবানীপুর	৩।৵০
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাঃ	বেরিলী	৩।৵০
,, হারাণচন্দ্র সিংহ রায়	বানিবন	৩।৵০
মিসেস এ, সী, গুপ্ত	শ্রীহট্ট	৬৷৵০
পি, সী, চট্টোপাধ্যায় এস্কয়ার	লাহোর	৩।৵০
বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ	কৃষ্ণনগর	৩।৵০
শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী	কাশিমবাজার	৩।৵০
বাবু সতীশচন্দ্র বসু	বাগেশ্বর	৩।৵০
,, উমেশচন্দ্র সান্যাল	বহরমপুর	১৲
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩।৵০
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	১৲
,, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
,, কালীপ্রসন্ন দাস	ঐ	৩৲
বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার	ভবানীপুর	১৲
মিসেস এম, ঘোষ	কলিকাতা	৩৲
বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত	ভবানীপুর	৩৲
,, শরচ্চন্দ্র মিত্র	মুরাদপুর	৩।৵০
মিসেস সাহা	পাবনা	৩।৵০
বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,, প্রমথনাথ রায়	বহরমপুর	৩৲
পি, এন বসু এস্কয়ার	দার্জ্জিলিং	৩।৵০
বাবু সুরেন্দ্রকুমার বসু	বীরভূম	৬৷৵০
,, শিবচন্দ্র শীল	চুঁচুড়া	৩।৵০
,, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	কলিকাতা	২৲
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	সিমলা পাহাড়	৩।৵০
,, মোহিনীমোহন দত্ত	ভাঙ্গা	৪৲
,, জানকীনাথ চট্টোপাঃ	কলিকাতা	১৲
,, হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ	হবিগঞ্জ	২৲

ক্রমশঃ।